কমল মজুমদার

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই উপন্যাসের কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা ও ব্যক্তিত্ব ছাড়া সমস্ত চরিত্র ও কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। জীবিত কারুর সঙ্গে কোথাও কোনো মিল খুঁজে পওয়া গেলে তা নিতান্ত কাল্পনিক হিসেবে গণ্য করতে হবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েক বছর আগে থেকে শুরু করে এ দেশের স্বাধীনতার অব্যাহিত কয়েক বছর পর পর্যন্ত যে অদ্ভুত মিশ্র সময় আমরা পার হয়ে এসেছি, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই কাহিনী। দেশ ও সামাজিক বিবর্তনের পটভূমিকায় আমার এই উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত কয়েকজন আলাদা মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও পরিণতিই প্রাধান্য পেয়েছে।

উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল দেশ পত্রিকায়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় অনেক কাটাকুটি করেছি এবং বাড়িয়েছি। রচনাকালে অনেক গ্রন্থকার এবং আমার শ্রদ্ধেয় কয়েকজন ব্যক্তি ও বন্ধুদের কাছ থেকে নানারকম সাহায্য পেয়েছি, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

—গ্রন্থকার

॥ ১ ॥

মাঝে মাঝে মনে হয়, এই যে মানুষ হয়ে জন্মেছি, এর চেয়ে বিস্ময়কর আর কিছু নেই। না জন্মাতেও পারতাম এবং তাতে আর কারুর কোনো ক্ষতি হতো না। না জন্মালে দেখতে পেতাম না এই ষড়ৈশ্বর্যময়ী পৃথিবী, আমার নিশ্বাসের জন্য বরাদ্দ বাতাসটুকু নেওয়া হতো না, মধ্যরাত্রির আকাশের দিকে যারা তাকিয়ে দেখে—তাদের মধ্যে একজন মানুষ কম পড়তো। জলের আঙুল দিয়ে একটি শিশু ছবি আঁকতো না। ছুটতে ছুটতে পাহাড়ের ওপর উঠে একটি বালকের উল্লাসে ফেটে পড়া—কখনো উপস্থাপিত হতো না সেই দৃশ্য। একটি নারীর অনাবৃত ঝকঝকে বুকে মাথা রেখে যে চাঞ্চল্যকর শান্তি পাওয়া যায়—কখনো পেতাম না তার সন্ধান।

আমি না জন্মালে—আমার মা, বাবা, কয়েকজন কাকা ও জ্যাঠা, ভাই বোন, আত্মীয়, কয়েকটি অনাত্মীয়া নারী, চার পাঁচটি নদী ও দুটি দেশ নিয়ে আমার যে সম্পূর্ণ নিজস্ব জগৎ, এত ব্যাকুলতা ও মমতা—থাকতো না এর কোনো অস্তিত্ব। বিশ্বাসই করা যায় না! বিশ্বাস করা যায় না বলেই পুনর্জন্ম, নিয়তি, কর্মফল—এই সব ভালো ভালো মায়াময় বিশ্বাস তৈরী হয়েছিল একসময়। এখন আবার আকস্মিকতায় ফিরে এসেছি, তাই ভাবতে গেলেও বুক কাঁপে। আমি না জন্মালে এই ক্ষুদ্র জগৎটিতে আমার অনুপস্থিতি কেউ অনুভব করতো না, কেউ অপেক্ষা করতো না আমার জন্য। যা নেই, তার জন্য আবার অপেক্ষা কি! আর সবাই থাকতো, 'আমি' থাকতাম না, এর চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি আর হয় না মানুষের। মৃত্যু চিন্তার চেয়েও মর্মান্তিক। কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে আমি তিন চারবার আত্মহত্যার কথা ভেবেছি। অনেকেই ভাবে। আত্মহত্যারও একটা মর্ম আছে। কখনো কখনো গৌরবও থাকে—কিন্তু না জন্মানো? মানুষ হয়ে জন্মেছি বলেই বুঝতে পারি, না-জন্মানো মানে কি অসীম শূন্যতা। আমি মনুষ্যজন্ম পেয়েছি, আমি ধন্য।

মাঝে মাঝে এ কথাও মনে হয়, এই জীবনের সার্থকতা কী? এই যে দুর্লভ সৌভাগ্য আমাকে দেওয়া হলো, কি এর শ্রেষ্ঠ ব্যবহার? অবহেলায় ঔদাসীন্যে ধুলো কাদায় ফেলে রাখার জিনিস তো এ নয়! এই দেহ নিয়ে জন্মাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, মোমবাতির ওপরে শিখাটুকুর মতন, মানুষের জীবনের সঙ্গে জুড়ে থাকে আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষার অলৌকিক চোখ নিয়ে দুর্দান্ত অবাধ্য বালকের মতন সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে চারদিক, সে আরও কিছু চায়। জীবন যেখানে থেমে আছে, তা ছাড়াও আরও কিছু। কি সেটা? যশ, অর্থ, ভোগ বা ভালবাসাও শেষ কথা নয়।

যৌবন পেরিয়ে গেলে কোনো এক বাদামী সন্ধেবেলা মানুষের মনে হয়, এই জীবন অন্যরকম হবার কথা ছিল। কৈশোরের যে মহিমা-উজ্জ্বল জীবনের ছবি ভেসে উঠতো চোখে, কোথায় গেল সেই মহিমা? মেঘলা আকাশের জ্যোৎস্নার মতন চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকে স্বপ্নের শব। মনে হয়, যদি আর একবার নতুন করে জীবনটাকে শুরু করা যেত—শৈশব থেকে আবার ফিরে আসা! রাষ্ট্রপতিকেও দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়। কোটিপতিও শ্বেতশুভ্র বাথটবের ঠাণ্ডা-গরম জলে শরীর ডুবিয়ে আরাম করতে করতে হঠাৎ ক্ষুর দিয়ে হাতের শিরা কেটে ফেলে। কেননা আমরা তো প্রায়ই ভুলে যাই, যে আমরা কুকুর অথবা পিঁপড়ে হয়ে জন্মাইনি! আমরা মানুষ, এই উত্তরাধিকারের

দায়িত্ব কি বিরাট! একটি সিংহ আর একটি সিংহকে কখনো হত্যা করে না, পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করার সময় নোখ গুটিয়ে রাখে। মানুষই শুধু তার ভাই, বন্ধু, পরিজন ও প্রতিবেশীকে খুন করার জন্য আবিষ্কার করেছে কতরকম অস্ত্র। জন্মসূত্রে যে সে একা, এই কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সে বারবার গোষ্ঠীবদ্ধ হতে গিয়ে গোষ্ঠীকে ভাঙে।

কখনো কখনো যেন একটা বিশাল কঠিন, বন্ধ দরজার গায়ে দুম দুম করে আঘাত করে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, বলো, বলো, কার নাম সার্থকতা! বলে দাও! ইতিহাসের কোনো কোনো শতাব্দীতে এক আধজন ধর্মগুরু সেই দরজা একটু ফাঁক করে বলতে চেয়েছেন, শোনো, আমি বলছি। এই পথ অনুসরণ করলে মনুষ্যজন্ম তার সম্পূর্ণতা পাবে। আমার কাছে এসো, আমি পথ দেখাচ্ছি...। কিন্তু সব কথা শোনা যায় নি, সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি, তার আগেই ধূপ ধুনোর ধোঁয়া আর চাটুকারিতার হট্টগোলে সব ঢেকে গেছে। দু'এক শতাব্দীতেই কেটে যায় ঘোর। তারপরও হাজার হাজার অতৃপ্ত মানুষ ধাক্কা মেরে সেই দরজা ভেঙে ফেলতে চায়।

হয়তো এই সার্থকতার সন্ধানও সবার মধ্যে জাগে না সারা জীবনে। কেননা, এই পৃথিবীতে অনেক নেশা আছে। বাদুড়ের ডানায় একবার হাত দিলে সেই তেল-তেলে কালো রং সহজে উঠতে চায় না, গন্ধও জড়িয়ে থাকে। অনেকের হাত একবার রুপোর টাকা ছুঁলে রুপোর দাগ লেগে যায়—তারপর সারাজীবন দু'হাতে রুপো ছানাছানি করতে ভালোবাসে। সেই রকমই, নারী। কেউ চায় অন্যের ওপর প্রভুত্ব করতে কিংবা অন্যদের নিজের মতে চালাতে। এই নেশাটাই সবচেয়ে তীব্র। একটা দেশ বা একটা শহর বা একটা দল বা একটা অফিস বা নিছক নিজের পাড়ার পাণ্ডা হবার জন্য কি আকুলি বিকুলি চেষ্টা। যে-পৃথিবীতে সে সত্তর বা আশী, বড়জোর একশো বছরের বেশি থাকবে না—সেই পৃথিবীকেও সে বদলাবার জন্য প্রাণপাত করে। এই শরীর বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু শেষ—এই কঠোর সত্যটা জেনেও কত মানুষ অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের কথা ছড়িয়ে যায়।

অনেকেই অবশ্য মায়ার ঘোরে জগৎটা খুব ছোট করে আনে, নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয়দের নিয়ে ছোট্ট সংসারের বাইরে আর কিছু দেখতে চায় না—এদের খুশী বা সুখী করার জন্য সারাজীবন ভূতের ব্যাগার দিয়ে যায়। একই মানুষ দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করে ছেলেকে আদর করে সম্পূর্ণ স্নেহে, বাড়ি থেকে বেরুবার আগে ভক্তিভরে প্রণাম করে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির সামনে এবং অফিসে গিয়ে ঘুষ নেয়—এও তো নেশার ঘোর। এমন নেশাগ্রস্ত মানুষ অনেক দেখেছি।

যাই হোক, আমি আমার ছেলেবেলা থেকেই একজন মানুষকে জানি, যিনি জীবন সম্পর্কে নানা ধরণের প্রশ্ন ও সংশয়ে কষ্ট পেতেন। তিনি আমার পিসেমশাই। তখন অবশ্য সব বুঝিনি। সেই লম্বা চওড়া, সুপুরুষ, সদাহাস্যময় মানুষটি মাঝে মাঝে দারুণ বিষণ্ণ হয়ে যেতেন। তিন চারদিন ধরে কারুর সঙ্গে কথা বলতেন না, তিন তলার ঘরে একা শুয়ে থাকতেন। বাড়ির কেউ বিরক্ত করতে সাহস করতো না ওঁকে। শুধু আমার জ্যাঠামশাই খড়ম ঠকঠকিয়ে ওপরে উঠে জিজ্ঞেস করতেন, কি হে অমর-নাথ, কি হলো আবার তোমার? চলো, শিশিরবাবু আবার ষোড়শী বই নামিয়েছেন, দেখে আসি।

জ্যাঠামশাইকে দেখে পিসেমশাই উঠে বসতেন। ফ্যাকাশে ভাবে হেসে বলতেন, জানো পি আর, ইচ্ছে করে আবার সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে বেরিয়ে পড়ি!

জ্যাঠামশাই উত্তর দিতেন, এখন বয়েস হয়েছে, এখন আর ওসব পাগলামি কোরো না। শরীরে সইবে না।

ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে আমরা এইসব কথা টুকরো টুকরো ভাবে শুনতাম। তখন পিসেমশাইয়ের বয়েস ষাটের কাছাকাছি। আমার জ্যাঠামশাইও ওঁর থেকে পাঁচ ছ' বছরের ছোট।

আমার পিসেমশাইকে আমরা সবাই ডাকতাম বড়বাবু। আমার বাবা-কাকারাও তাই বলতেন। ছেলেবেলায় এ ডাকটা আমরা স্বাভাবিক হিসেবেই গ্রহণ করেছিলাম, কারণ জানতাম না। পরে জেনেছি। পিসেমশাই-এর আসল নাম অমরনাথ ভাদুড়ী কিন্তু ওঁর চেহারার সঙ্গে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর খুব মিল ছিল। যদিও শিশির-ভাদুড়ীর পরিবারের সঙ্গে পিসেমশাইদের কোনোরকম আত্মীয়তা ছিল না। তখন রঙ্গমঞ্চে শিশির ভাদুড়ীর দেশজোড়া নাম। তাঁর ডাকনাম অনুসারেই পিসেমশাইকে বাড়ির সবাই বড়বাবু বলতো। অবশ্য ওঁর আসল নাম অমরনাথেরও একটা ইতিহাস আছে।

আমার যখন ছ'সাত বছর বয়েস, তখন একদিন বিকেলবেলা পিসেমশাই আমাকে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন এক জায়গায়। সেদিন আমার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

আমরা কলকাতায় পিসেমশাইয়ের বাড়িতেই থাকতাম। পিসেমশাই সেই সময় গোয়ালিয়র থেকে ব্যবসা গুটিয়ে কলকাতার বিবেকানন্দ রোডে একটা বাড়ি কিনেছেন। বিবেকানন্দ রোড তখন প্রায় নতুন রাস্তা, পাড়াটার ইজ্জৎ ছিল। তিনতলা বাড়ি, অনেকগুলি ঘর। তখন বসতবাড়ি ভাড়া দেবার বিশেষ রেওয়াজ ছিল না—আমরা গ্রাম থেকে এসে পিসেমশাইয়ের বাড়িতেই উঠতাম, বিসদৃশ কিছু দেখাতো না তাতে। আমার জ্যাঠামশাই বয়েসে ছোট হলেও তাঁর ভগ্নীপতির সঙ্গে কথা বলতেন ভারিক্কী চালে। পারিবারিক সম্পর্কের মূল্য তখন ছিল সামাজিক প্রতিষ্ঠার চেয়েও একটু বেশী।

আমার পিসেমশাই বিধবা বিবাহ করেছিলেন। অর্থাৎ, আমার পূর্ণিমা পিসীমা বিধবা হয়েছিলেন এগারো বছর বয়েসে। সতরো বছর বয়েসে অমরনাথ ভাদুড়ীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তখন আমার পিসিমা গর্ভবতী। এর এক বছর আগেই অমরনাথ ভাদুড়ী আমার ঠাকুর্দার কাছে পূর্ণিমা পিসীমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব জানান। আমার ঠাকুর্দা ঐ অমরনাথ ভাদুড়ী নামক উদ্ধত ছোকরাকে রুপো বাঁধানো লাঠি দিয়ে মেরেছিলেন। কেননা বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বিধবা বিবাহের তত্ত্বটি অনেকেই কাগজ-কলমে সমর্থন করলেও নিজ পরিবারে চালাতে দেন নি। তারপর পূর্ণিমা পিসীমার ঐ অবস্থাটা জানার পর আমার ঠাকুর্দা দেয়ালে কপাল ঠুকে ঠুকে রক্ত বার করে ফেলেছিলেন। হায় হায় করেছিলেন অন্তত এক হাজার বার। কারণ, তখনকার দিনে ভদ্রঘরের বিধবারা যাতে দুশ্চরিত্রা না হয়ে যায় সেজন্য নিরাপদ ব্যবস্থা ছিল তাদের কাশী পাঠিয়ে দিয়ে দশ পনরো টাকা করে মাসোহারা পাঠানো। তারপর সেখানে তারা বাঁচুক, মরুক বা চরিত্র নষ্ট করুক সে খবর এত দূরে এসে পৌঁছুবে না। আমার ঠাকুর্দা নেহাত কন্যার প্রতি মায়াবশতঃ এ ব্যবস্থা না নিয়ে ঐ ভুলটি করেছিলেন।

পূর্ব বাংলার ছোট শহরে ঐ ঘটনায় কি রকম হৈ-হল্লা হয়েছিল তা বোঝাই যায়। তাছাড়া অমরনাথ ভাদুড়ী ছিলেন অজ্ঞাতকুলশীল। তখনকার দিনে একটা চমৎকার ব্যবস্থা ছিল। জমিদার বাড়িতে বা অনেক অবস্থাপন্ন বাড়িতেই পাঁচ-দশটি দুঃস্থ

ছেলেকে থাকতে খেতে দিয়ে পড়াশুনোর ব্যবস্থা করে দেওয়া হতো। আমাদের পাড়াতেই রায়চৌধুরী বাড়িতে ঐ রকম দুটি ছেলে থাকতো, অমরনাথ ভাদুড়ী তাদের মধ্যে একজন, তিনি তখন কলেজের ছাত্র। গ্রীষ্মের ছুটিতে বিরাট বিরাট শূন্য দুপুর, রায় চৌধুরীদের বাড়িতে কত ফাঁকা জায়গা, কত বড় বাগান! পূর্ণিমা পিসীমা ঐ বাগানে জামরুল কিংবা কামরাঙা ফল পাড়তে যেতেন।

যাই হোক, অমরনাথ ভাদুড়ীর সঙ্গে পূর্ণিমা পিসীমার নমো নমো করে বিয়ে দিয়ে রাতারাতি তাদের দেশছাড়া করে দেওয়া হলো। কলকাতাতেও না, কারণ সেখানেও অনেক চেনাশুনা লোক আছে, ওঁরা গিয়ে ঘর বাঁধলেন পাটনায়। তারপর ওদের ভুলে গেল সবাই। পূর্ণিমা পিসীমা মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন, কেউ কোনো-দিন তাঁকে বাপের বাড়ি আনার কথা বলেনি। এমন কি, পূর্ণিমা পিসীমার দু' বছরের মেয়েটি যখন স্মল পক্স-এ মারা গেল, তখনও কেউ দেখতে যায়নি আমাদের বাড়ি থেকে।

আমার ঠাকুর্দা মারা যাবার পর, আমার বাবা জ্যাঠামশাইরা হঠাৎ যেন উদার হয়ে উঠলেন। ততদিন পিসেমশাইরা পাটনা থেকে এলাহাবাদে চলে গিয়ে ব্যবসা করে বেশ বড়লোক হয়েছেন। আমার বাবা দিল্লিতে চাকরির ইণ্টারভিউ দিতে গিয়ে ফেরার সময় এলাহাবাদে পূর্ণিমা পিসীমাদের বাড়িতে থেকে এলেন। কয়েকদিন পর ফিরে এসে গল্পের আর শেষ হয় না। পিসেমশাইদের এলাহাবাদের বাড়িতে তিনজন ঝি-চাকর, একজন দরোয়ান, বাগানের জন্য একজন মালি—এবং সবচেয়ে বড় কথা, একজন জমাদার রোজ সকালে এসে বাথরুম পরিষ্কার করে যায়। দোতলার বাথরুমে জমাদারের আসা-যাওয়ার জন্য বাড়ির পেছনে আলাদা লোহার ঘোরানো সিঁড়ি। পাড়াগাঁর মানুষের চোখে এসব অত্যাশ্চর্য ঘটনা।

তার পরের বছর পুজোর সময় পূর্ণিমা পিসীমারা বেড়াতে এলেন আমাদের দেশের বাড়িতে। গাঠরি বাঁধা বাঁধা সব ধুতি-শাড়ি কম্বল এনেছিলেন গাঁয়ের মানুষের মধ্যে বেলোবার জন্য। বাড়ির প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা উপহার। পূর্ণিমা পিসীমা আমার মাকে দিয়েছিলেন জারমান সিলভারে বাঁধানো বড় আয়না। পিসেমশাই-এর সুন্দর চেহারা। অঙ্গে পুরোপুরি সাহেবী পোশাক—তবু তিনি তাঁর ছেলেবেলার-পরিচিত মানুষজনের বাড়িতে গিয়ে দাওয়ায় বসে হুঁকোয় তামাক খেতেন—এইজন্য তাঁর খাতিরের সীমা ছিল না। একদিন এই জায়গা থেকে তিনি অপমানিত হয়ে বিতাড়িত হয়েছিলেন—আজ সেখানেই ফিরে এসেছেন প্রবল প্রতাপে। সব মানুষই বোধহয় এরকম ভাবে ফিরে আসতে চায়। কাউণ্ট অফ মণ্টেক্রিস্টো গল্পের মতন। পূর্ণিমা পিসীমার বয়েসী বিধবা কিংবা স্বামী না-নেওয়া অবজ্ঞাত বউ আমাদের সেই ছোট শহরে তখন অনেক ছিল।

একবারও শ্বশুরবাড়িতে যায়নি কিংবা সারা জীবনে তিন চার বারের বেশি স্বামীকে চোখে দেখে নি—ব্রাহ্মণ পরিবারের এমন মেয়েমানুষের সংখ্যা তখন অজস্র। তিন চার বছরের মেয়েকে থালার ওপর বসিয়ে বৃদ্ধ জরদ্গবের সঙ্গে সাত পাক ফেরানো কিংবা রক্ত-মাংসের স্বামীর অভাবে কলাগাছের সঙ্গে সোমত্থ মেয়েদের বিয়ে দেওয়াও বেশী দিনের ঘটনা নয়। সেই রকম কোনো বিয়ের অনুষ্ঠান আমি চোখে দেখিনি বটে, তবে সেই সব বৃদ্ধাদের আমি দেখেছি। কচি বয়েসের বিধবাকে সেই সময় চলতি কথায় বলা হতো, কড়ে রাঢ়ী। তারা পূর্ণিমা পিসীমার সৌভাগ্য দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলতো। পূর্ণিমা পিসীমারও তো ঐ রকম অবস্থাই হওয়ার কথা ছিল।

এখনও সবাই গল্প করে যে পূর্ণিমা পিসীমার স্বভাব খুব নরম, কারুর সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলতেন না। কিন্তু প্রতিবেশিনী কড়ে রাঢ়ীরা পূর্ণিমা পিসীমা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ঐ জাত-খোয়ানো মাগীর দেমাকে যেন মাটিতে পা পড়ে না! অত সুখ কপালে সইলে হয়!

সত্যিই সহ্য হয়নি। সেবার এলাহাবাদে ফিরে যাবার পর কিছুদিন বাদেই পূর্ণিমা পিসীমার চিঠিতে অন্য সুর দেখা দিতে লাগলো। প্রায়ই পিসেমশাই সম্পর্কে নানা-রকম অভিযোগ। পিসেমশাইয়ের ব্যবসায়ে মন নেই, হঠাৎ হঠাৎ কোথায় চলে যান তিন চারদিনের জন্য, বাড়িতে কিছু বলা কওয়া নেই। সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে খুব মেশেন, মানুষটা বুঝি এবার সন্ন্যাসীই হয়ে যাবেন! এক বছর বাদে আবার অন্যরকম অভিযোগ, এবার আরও গুরুতর। পিসেমশাই একটি মুসলমান মেয়ের প্রেমে পড়ে পাগল হয়েছেন। জ্যাঠামশাই এলাহাবাদ ছুটে গেলেন তাঁর বোনেক বাঁচাতে। ফিরে এসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, পূর্ণিমার কপালে দুঃখু আছে। অমরনাথকে ফেরানো যাবে না—সে বড় আত্মম্ভরী মানুষ, অন্য কারুর কথা শোনে না। তা ছাড়া, সেই মুসলমান মেয়েটির মতন সুন্দর নারী এ দুনিয়ায় দুর্লভ, তাকে দেখলে মাথা ঠিক রাখা অনেক পুরুষের পক্ষেই শক্ত। পাঁচখানা মোহর দিয়ে তার নাচ দেখতে হয় নিরালায়। অমরনাথ এবার সর্বস্বান্ত হবে।

আমার ঠাকুমা তখনও বেঁচে, তিনি ঝাঁঝের সঙ্গে বলেছিলেন, পূর্ণিমাকে তুই নিয়ে চলে এলি না কেন? ও জামাইয়ের সঙ্গে আমরা আর কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না। আগেই জানতাম—

জ্যাঠামশাই বলেছিলেন, পূর্ণিমা আসতে চেয়েছিল। আমি ইচ্ছে করে আনি নি। পূর্ণিমা একবার চলে এলে বিষয়-সম্পত্তির আর কিছুই কি ও পাবে? সব জলাঞ্জলি যাবে। তবু ও যেটুকু সামলে রাখতে পারে—

এরপর দু' চার বছরের ইতিহাস একটু অস্পষ্ট। পিসেমশাই এলাহাবাদের বাড়ি বিক্রি করে চলে গেলেন গোয়ালিয়র—পূর্ণিমা পিসীমাও সঙ্গে গিয়েছিলেন এবং নর্তকীটিও। পূর্ণিমা পিসীমার একটি মেয়ে হয়ে মারা গিয়েছিল, আর কোনো ছেলে-পুলে হয়নি। সেই নর্তকীর একটি ছেলে হয়, তার নাম সূর্য। এই ছেলেটি তার তিন বছর বয়েস থেকে পূর্ণিমা পিসিমার কাছেই বেশী থাকতো। পূর্ণিমা পিসীমা তখন তাঁর আইন বহির্ভূত সতীনের সঙ্গে মোটামুটি মানিয়ে নিয়েছিলেন। সতীন থাকা তো তখনকার দিনে খুব অস্বাভাবিক ছিল না। আমার ঠাকুর্দাই তিনটি বিয়ে করেছিলেন।

এলাহাবাদের সেই নর্তকীর নাম ছিল বুলবুল। পোশাকী নাম নাসিম-আরা বানু। এলাহাবাদ থেকে গোয়ালিয়রে আসবার পর তাঁর ভক্তসংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। এই নিয়ে পিসেমশাইয়ের সঙ্গে মন কষাকষি দেখা দেয়। তাঁর ছেলে সূর্যের বয়েস যখন পাঁচ বছর, তখন বুলবুল হঠাৎ আত্মহত্যা করেন বিষ খেয়ে। বুলবুল সেই সময় গোয়ালিয়র রাজবাড়িতে মুজরো পেতে শুরু করেছিলেন—অনায়াসেই অমরনাথ ভাদুড়ীর মতন একজন মানুষকে পরিত্যাগ করতে পারতেন, তার বদলে আত্মহত্যা করার কোনো মানেই হয় না। সূর্য সেই থেকে পুরোপুরি পূর্ণিমা পিসীমারই ছেলে হয়ে গেল।

পূর্ণিমা পিসীমার শেষ জীবনটা মোটামুটি সুখেই কেটেছিল। স্বামীকে আবার সম্পূর্ণভাবে ফিরে পেয়েছিলেন এবং শেষবার অসুখের সময় পেয়েছিলেন

স্বামীর হাতের সেবা। বাবা আর মা গিয়েছিলেন সেবার, ফিরে এসে বললেন, পুরুষ মানুষ যে ওভাবে সেবা করতে পারে, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। অমরনাথের মনটা ভীষণ নরম—

পূর্ণিমা পিসীমার মৃত্যুর পর সূর্যকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে পিসেমশাই দু'-বছরের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যান। কেউ আর তাঁর কোনো পাত্তা পায় নি। ওঁর গোয়ালিয়রের বিষয় সম্পত্তি এবং ব্যবসা অরক্ষিত অবস্থায় নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। তারপর হঠাৎ একদিন এক মুখ চুল দাড়ি নিয়ে এসে উদয় হলেন। সব কিছু বিক্রি করে দিয়ে কলকাতায় এই বাড়ি কিনলেন।

এসবই আমার জন্মের আগেকার কথা। পূর্ণিমা পিসীমাকে আমি চোখেও দেখিনি কখনো।

একেবারে বাল্যকালের স্মৃতি মাঝে মাঝে দু'এক ঝলক মনে পড়ে, কিন্তু তার সত্যতা যাচাই করা যায় না। যে-পুকুর পাড়ে তিন বছর বয়েসে খেলা করেছি মনে হয়, আসলে সে পুকুরটা ঠিক সেই রকম দেখতে নয়। একটা শিউলি গাছের তলায় ফুল কুড়োতে যেতাম, প্রত্যেকটি শিউলি ফুলই কি শিশির-মাখা থাকতো? স্মৃতি কেন সেই ছবি দেখায়? দুর্গাপুজোর এক মাস আগে কালো রঙের নিখুঁত পাঁঠা কিনে রাখা হতো বলিদানের জন্য। বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা ঘাস পাতা খাইয়ে মোটা করতো সেই পাঁঠাগুলোকে। পাঁঠাকে খাওয়াবার জন্য ধান ক্ষেত থেকে ধানের ডগা ছিঁড়তে গেছি, ধারালো ধান পাতায় আমার আঙুল কেটে গেল, ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগলো। শৈশবের শুধু এই দৃশ্যটাই বা আমার মনে গেঁথে আছে কেন? আঙুলে দাগ পর্যন্ত নেই।

এমন অনেক জায়গার স্মৃতির ছবি হুবহু দেখতে পাই, আসলে যে-সব জায়গায় আমি কখনো যাইনি। যেমন, মানুষের জন্মদিনটির কথা তো মনে রাখা অসম্ভব, তবু যেন মনে হয়, আমার মনে আছে। ভীষণ বৃষ্টির দিনে জন্মেছিলাম বলে আমার নাম রাখা হয় বাদল। নার্সিং হোমে জন্মাইনি, মামা বাড়িতে, পাড়াগাঁর আঁতুড়ঘরে। উঠোনের মধ্যে সাময়িক ভাবে বানানো। তিনদিন ধরে অশ্রান্ত বৃষ্টি—সেই সময় জন্ম গ্রহণ করে আমি বাড়ির সবাইকে খুব বিপদে ফেলেছিলাম। একজন প্রৌঢ়া ধাই-এর কৃতিত্বেই বেঁচে গেছি কোনোক্রমে। মা-মাসীদের কাছে পরে এতবার শুনেছি সেই গল্প যে, স্মৃতিতে যেন হুবহু দেখতে পাই সেই দৃশ্য অঝোর বর্ষার মধ্যে একটি সদ্যোজাত শিশুর পায়ের পাতায় টোকা মারা হচ্ছে আর সে ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে।

পাঁচ কি ছ' বছর বয়েস থেকে পিসেমশাইয়ের কথা আমার মোটামুটি স্পষ্ট মনে আছে। একদিন ওঁর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

যে-সময়কার কথা বলছি তখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লাগে নি। তার দু' এক বছর আগের কথা। তখন চাল কিনতে হতো মুদির দোকানে, অনেক রকমের চাল সাজানো থাকতো, তিন টাকা মণের খুব সরু চালের অর্ডার দিলে মুদির দোকানের লোকই বাড়ি পৌঁছে দিত। সেলুনে চুল কাটতে গেলে চুল-কাটার ডিজাইন পছন্দ করার জন্য বাঁধানো ছবি থাকতো সাহেবদের। অনেক সাহেবও তখন সিঁথি কেটে পাশে চুল আঁচড়াতো। শিয়ালদা ও হাওড়া স্টেশনের কাছে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতো ঘোড়ার গাড়ি। যে চটের থলিকে এখন র‍্যাশন ব্যাগ বলে—সে জিনিসের প্রচলন ছিল না। পরিবার পরিকল্পনা বা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কথা কেউ শোনে নি। মিষ্টির দোকানে এক টাকার মিষ্টি কেনা হলে এক আনা পয়সা ফেরৎ দিত। এক পয়সা ও আধলার

প্রচলন ছিল। ধুতির সঙ্গে শু-মোজা পরা ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। কলকাতায় অনেক রাস্তাতেই গ্যাসের আলো জ্বলতো। গান্ধীজী, সুভাষ বোস, ফজলুল হকেরও প্রচুর নিন্দুক ছিল। গলিতে গলিতে ক্রিকেটের বদলে ড্যাংগুলি বা চু-কিতকিতের খেলা চলতো। ইস্কুলে ভর্তি হবার আগে যেতে হতো পাঠশালায়। নাপিতকে বলা হতো পরামানিক।

কলকাতায় তখন বাঙালরা ছিল প্রকৃতপক্ষেই সংখ্যালঘু। নাটক নভেলে হাস্যকর চরিত্র উপস্থাপিত করার জন্য অবধারিত ভাবে ব্যবহার করা হতো বাঙাল ভাষা, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে যার শুরু। বাঙালরা কলকাতায় এসে অতি দ্রুত কলকাত্তাই ভাষা শিখে নেবার চেষ্টা করে জগা-খিচুড়ি পাকিয়ে ফেলতো। বাঙালদের মুখে অতি মিহি গলায় কলকাতার ভাষা বলতে শুনলেই হাসি পেত।

বাঙালদের সম্পর্কে তখন চিত্তাকর্ষক কয়েকটি ছড়াও প্রচলিত ছিল, সেগুলির রচয়িতার নাম জানা যায় না। পথে-ঘাটে প্রায়ই ছোটদের মুখে শোনা যেতঃ

বাঙাল মনুষ্য নয়
অদ্ভুত জন্তু
লম্ফ দিয়ে গাছে ওঠে
ল্যাজ নাই কিন্তু!

আসলে 'অদ্ভুত' কথাটার বদলে অন্য কিছু ছিল, সেটা এক ঢিলে দু' পাখি মারার ব্যাপার। সে শব্দটা এখন ব্যবহার না করাই ভালো। ছড়াটির মধ্যে কিন্তু বেশ কল্পনাশক্তির পরিচয় আছে। আরও শোনা যেতঃ

বাঙাল
চিংড়ি মাছের কাঙাল!

এটার ঠিক মানে বোঝা যায় না। কেননা বাঙালদের সঙ্গে ইলিশ মাছই বেশী জড়িত। চিংড়ি মাছও বাঙলাদেশে কম পাওয়া যায় না। সুতরাং তারা বেছে বেছে চিংড়িমাছের কাঙাল হবে কেন কে জানে।

বাঙালদের বোধহয় ছড়া বানাবার ক্ষমতা কম কিংবা সংখ্যালঘু বলে ভয় পেত। কারণ বাঙালরা কোনো ছড়া বানিয়ে কলকাতার লোকদের যোগ্য উত্তর দিতে পারে নি। কলকাতার লোকদের কোনো দুর্বোধ্য কারণে তারা ঘটি আখ্যা দিয়েছিল, এবং বড়জোর কখনো চেঁচিয়ে বলতো, ঘটি, ফুটো ঘটি!

বাঙালদের সম্পর্কে আর একটি ছড়া নিশ্চয়ই কোনো ঘটনা উপলক্ষে রচিত। কিন্তু এটিও বেশ জনপ্রিয় ছিলঃ

বাঙালো
রস খাইলো
ভাঁড় ভাঙিলো
পয়সা দি—লো—না!

শেষের 'দিলো না'টা খুব টেনে টেনে বলেই ছুটে ছুটে যাওয়া নিয়ম ছিল। কারণ, এটাতেই বেশী রেগে যেত বাঙালরা। বাঙালরা সাধারণতঃ গোঁয়ার এবং তাদের হাতের টিপ অব্যর্থ, তারা ইঁট ছুঁড়ে মারতে যায়।

সব পাড়ার মধ্যেই একটি বাড়ি 'বাঙালদের বাড়ি' বলে পরিচিত হতো তখন। সে বাড়ির ছেলে বাঙালদের ছেলে, সে বাড়ির বৌ বাঙাল বাড়ির বৌ। বাঙাল ও ঘটিদের

মধ্যে পারস্পরিক বিয়ে প্রায় নিষিদ্ধই ছিল বলা যায়। কলকাতায় আমি এই রকমই একটা বাঙাল বাড়িতে থাকতাম।

একদিন বিকেলবেলা পিসেমশাই আমাকে বললেন, বাদলা, তোর মা-কে গিয়ে বল, তোকে ভালো জামা-প্যাণ্ট পরিয়ে দিতে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, বড়বাবু, আমি কোথায় যাবো?

পিসেমশাই বললেন, চল, তোকে এক জায়গা থেকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি!

তাই শুনে বাড়ির অন্যান্য বাচ্চারা আমিও যাবো, আমিও যাবো বলে চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিল। বড়বাবু বললেন, না, আর কেউ না। শুধু ও একলা যাবে।

বড়বাবু সাধারণতঃ বাড়ির ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে যেতেন না। আমাদের বাড়িতে বাচ্চাও তখন ছ' সাতজন। বড়বাবু হঠাৎ সেদিন আমাকে কেন বেছে নিয়েছিলেন জানি না। ভাগ্যিস নিয়েছিলেন!

॥ ২ ॥

অমরনাথ যখন বাদলকে নিয়ে বেরুলেন, তখন বিকেল পাঁচটা। গ্রীষ্মের শুরু। বঙ্গোপসাগরের বিখ্যাত বাতাস এসে কলকাতাকে ভাসিয়ে দেয়। আকাশে ধোঁয়া নেই। বাড়ির ছাদে ছাদে ছেলেদের ঘুড়ি ওড়াবার খুব হুল্লোড়। মহাত্মা গান্ধী তখন কলকাতায় এসেছেন।

অমরনাথ পরেছেন ফিনফিনে কোঁচানো ধুতি ও কলিদার পাঞ্জাবি, কাঁধে উড়ুনি, পায়ে নিউ-কাট পাম্পশু, হাতে বেতের ছড়ি। চুল এখনও কালো, তবে গোঁফে পাক ধরেছে। শিশিরবাবুর মতনই মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত থাকে নামানো। জামার ঘড়ি-পকেটে মস্ত বড় গোল সোনার ঘড়ি। বাদলকে তার মা হাফ প্যাণ্ট ও সাটিনের জামা পরিয়ে দিয়েছেন, মাথার চুল পাতা কেটে আঁচড়ানো। সে মহা উৎসাহে লাফাতে লাফাতে যাচ্ছে অমরনাথের পাশে পাশে। অমরনাথ বললেন, উঁহু, ওরকম করবে না, সব সময় আমার হাতের এই আঙুলটা ধরে থাকবে।

বড় রাস্তার ওপর বাদলের বাবা চিররঞ্জন কথা বলছিলেন আর একটি লোকের সঙ্গে। অমরনাথের সঙ্গে ছেলেকে দেখে একটু অবাক হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, বড়বাবু, কোথায় চললেন! গুরুদাসে নাকি?

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্সের দোকানে প্রায়ই বিকেলের দিকে গল্প করতে যেতেন বড়বাবু। ওখানে, জীবিতকালে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আসতেন প্রায়ই।

অমরনাথ বললেন, না হে, একটু দক্ষিণে যাবো। তোমার ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছি। আমি আবার রাত্তিরে ভালো চোখে দেখতে পাই না তো! একটু দেরি হলে চিন্তা-টিন্তা করো না।

অমরনাথের দৃষ্টিশক্তি খুবই ভালো, বই পড়ার সময় একটা রিম-লেস চশমা ব্যবহার করেন মাত্র, কিন্তু তিনি সামান্য রাতকানা।

মোড়ের মাথায় এসে বড়বাবু প্লেয়ার্স নাম্বার থ্রি সিগারেটের একটা টিন কিনলেন। ধপধপে সাদা এই সিগারেটের টিন খালি হয়ে যাবার পর বাড়ির মেয়েদের কাছে খুব প্রিয় ছিল তখন। ঢাকনা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভেতরের টিন ফয়েল কেটে

অমরনাথ প্রথমে পুরো টিনটার গন্ধ নিলেন নাকে, তারপর একটা সিগারেট বার করে ধরালেন। ধোঁয়া ছেড়ে হঠাৎ উদাসভাবে তাকিয়ে রইলেন আকাশের দিকে। অমরনাথ আজ বেশ অন্যমনস্ক।

বাদলের ইচ্ছে ছিল ঘোড়ার গাড়ি চড়ার, কিন্তু বড়বাবু তা নিলেন না। বাসের জন্য দাঁড়ালেন কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে। বৃষ্টি না হলে বিকেলের দিকে হুড-খোলা দোতলা প্রাইভেট বাসে ভ্রমণ করা তখন চমৎকার বিলাসিতা। সেই রকম একটা বাসেই ওপরে জায়গা পাওয়া গেল। বাদলের উত্তেজনার শেষ নেই। এরকমভাবে এর আগে আর সে কলকাতায় বেড়ায় নি। শহরটাকে মনে হয় যেন মায়াপুরী। দু' পাশের বিরাট বিরাট বাড়ির মাঝখান দিয়ে রাস্তা—চলন্ত বাসের ওপর দিয়ে দেখতে দেখতে মনে হয়, এ সবই যেন ছবির বইতে দেখা জগৎ। সদ্য গ্রাম থেকে আসা বাদলের চোখে ট্রাম-গুলোকে মনে হয় ছোট ছোট স্টিম লঞ্চের মতন।

চৌরঙ্গিতে সাহেব-মেমের ভিড়ই বেশি। ময়দানে দেখা যায় অশ্বারোহী শ্বেতাঙ্গনর। ইলেকট্রিক অফিসের মাথায় উজ্জ্বল গ্লোব বহুদূর থেকে চোখে পড়ে। মেট্রো সিনেমায় আলো জ্বলছে, চওড়া থেকে শুরু হয়ে যাওয়া লম্বাটে কয়েক থাক আলো রয়েছে হলের মাথায়, তখনকার দিনে এর নামই ছিল মেট্রো প্যাটার্ন, লোকে আংটি তৈরী করতো এই ডিজাইনে। পাশেই হোয়াইটওয়ে লেড ল'র বিশাল দোকান। কার্জন পার্কের দিকে সার বেঁধে দাঁড়ানো গাড়ি। বালকের বিস্মিত চোখে এই সব দৃশ্যের ছাপ বুকে এঁকে নেয়। অমরনাথ চুপচাপ বসে একটার পর সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন।

বাড়িটার সামনে লোহার গেট, সেখানে নোটিস ঝোলানো, 'কুকুর হইতে সাবধান'! কিন্তু গেটের ওপাশের বাগানে কুকুর কিংবা মানুষ জনের কোনো চিহ্ন নেই। বাদল বানান করে বাংলা পড়তে পারে। অমরনাথ দু' বার চেঁচিয়ে ডাকলেন, সুরেশ্বর, সুরেশ্বর! কোনো সাড়া নেই। অমরনাথ তখন হাতের ছড়িটা দিয়ে লোহার গেটে ঠং ঠং করে আওয়াজ করতে লাগলেন। একটু বাদেই একজন বৃদ্ধ চাকর এসে উঁকি মেরে বললো, দাঁড়ান, কুকুর বেঁধে আসি। এই প্রথম একটি কুকুরের গম্ভীর হিংস্র ডাক শোনা গেল, বাদল গুটিসুটি মেরে দাঁড়ালো বড়বাবুর পেছনে।

লোহার গেট পেরিয়ে একটি ছোট বাগান। তার ঠিক মাঝখানে খানিকটা ঘেরা জায়গায় জল, সেখানে খেলা করছে লাল নীল মাছ। জলের ওপরে একটা সাদা পাথরের পরী ডানা মেলে আছে, যেন এক্ষুনি উড়ে যাবে। বাদল সেদিকে ছুটে যাচ্ছিল, অমরনাথ বললেন, উঁহু ওদিকে নয়, ভেতরে এসো!

বসবার ঘরটা মস্ত হল ঘরের মতন। দেয়ালে দেয়ালে অনেক ছবি। অধিকাংশই ফ্যামিলি পোর্ট্রেট। এ ছাড়া পঞ্চম জর্জ, এক হাতে সীতাকে ধরে রেখে অন্য হাতে রাবণ জটায়ু বধ করছেন এবং কনস্টেবলের আঁকা প্রকৃতি-দৃশ্যের কপি। ছাদ থেকে ঝুলছে মস্ত বড় ঝাড় লণ্ঠন কিন্তু সদ্য স্থাপিত ইলেকট্রিক বালবই আলো দিচ্ছে। কল টিপলেই জল পড়ে এবং সুইচ টিপলেই আলো জ্বলে—এই বিস্ময়ের ঘোর তখনও পুরোপুরি কাটেনি।

একজন মাঝবয়েসী লোক ঘরে ঢুকলেন। সিল্কের লুঙ্গি ও ও সিল্কের ফতুয়া পরে আছেন, মাথায় সম্পূর্ণ টাক। মাথায় একটাও চুল নেই, এরকম মানুষ বাদল আগে কখনো দেখেনি। বাদল বড়বাবুর চোখের দিকে তাকালো, বড়বাবু ইঙ্গিত করলেন। অর্থাৎ ইনিও ব্রাহ্মণ, এঁকে প্রণাম করতে হবে। অব্রাহ্মণ বয়স্ক ব্যক্তিদেরও তখন

ব্রাহ্মণ শিশুরা প্রণাম করে না। বড়বাবু বললেন, ইটি আমার মেজ শালার ছেলে। সুরেশ্বর, ব্যস্ত ছিলে নাকি? হঠাৎ এসে পড়লাম।

টাক মাথা ব্যক্তিটি অমরনাথকে প্রণাম করে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আজ্ঞে, না না, কিছু ব্যস্ত ছিলাম না! আপনি পায়ের ধুলো দিয়েছেন, এ তো আমাদের সৌভাগ্য! তবে একটু আগে থেকে যদি খবর দিয়ে আসতেন, তাহলে জাফর আলি খাঁ সাহেবকে বলে রাখতাম, একটু গান বাজনা করা যেত। আপনি এখনও চর্চা রেখেছেন তো?

অমরনাথ উদাসীনভাবে বললেন, না, ওসব চুকে গেছে।

সুরেশ্বর বললেন, সে কি! গোয়ালিয়রে সেই সেবার আপনার মুখে যে আলাহিয়া বিলাবল শুনেছিলাম, এখনও কানে লেগে আছে!

—সে নেশা আমার কেটে গেছে! সুরের চর্চা করে কেন মানুষ, আত্মাকে শুদ্ধ করার জন্য তো? আমার সে-সব কিছু হলো না। সুরের চর্চা করেছিলুম শুধু গলা দিয়ে, আর কিছু না—শুধু কণ্ঠস্বরের খেলা!

—ও কথা বলছেন কেন! আনন্দ পাওয়াটাই বড় কথা। যে আনন্দ—

সুরেশ্বর হঠাৎ বাদলের দিকে ফিরে বললেন, খোকা, তুমি এখানে চুপটি করে বসে আছো কেন? তুমি ওপরে চলে যাও না! তোমার বয়েসী আরও ছেলেপুলে আছে—খেলা করবে না?

বাদল লাজুক, সে একা একা ওপরে যাবে না। সে তার ছোট্ট শরীরে একটু মোড়ামুড়ি দিল।

অমরনাথ বললেন, সুরেশ্বর, আমিও একটু উপরে যাবো। তোমার মা এখন কেমন আছেন?

সুরেশ্বরের মুখে সামান্য একটু বিস্ময়ের ছায়া খেলেই লুকিয়ে গেল। বললেন, মা? এই একরকমই, মানে—

—এখন এখানেই আছেন? এই সপ্তাহে তোমার এখানে আনানো হবে শুনেছিলাম।

—হ্যাঁ, কাল এসেছেন!

—আমি একটু দেখা করবো। দেখা করা যাবে? আমি সেইজন্যই এসেছি।

—দেখা করবেন। তা বেশ তো! দেখছি, ঘুমিয়ে আছেন কিনা।

—শোনো! উনি বাইরের লোক দেখলে বিরক্ত হন না তো?

—আপনি তো বাইরের লোক নন্! অন্তত মা'র কাছে আপনি...

—সেটা যদি আমাকে চিনতে পারেন—চিনতে পারেন এখন সবাইকে? স্মৃতিশক্তি ঠিক আছে?

—মা'র স্মৃতিশক্তি এত ভালো যে, বিশ্বাসই করা যায় না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, মা'র অনেক সময় কাছাকাছি সময়ের ঘটনা মনে থাকে না—অথচ বহু পুরোনো ঘটনা এমন মনে আছে...কিন্তু কখন কথা বলবেন, কখন চুপ করে থাকবেন, তার কোনো ঠিক নেই! দাদা মারা যাবার পর সেই যে মাথাটা কী রকম হয়ে গেল—

—চলো, একবার যাই—

দোতলার সিঁড়ির পাশের ঘরেই বিরাট পালঙ্কে শুয়ে আছেন মন্দাকিনী। ঠিক শোয়া নয়, তিন চারটে বালিশে হেলান দিয়ে বসা চাদর দিয়ে শরীর ঢাকা। ঘরের সব জানালা বন্ধ, অস্বাভাবিক উজ্জ্বল একটা আলো জ্বালানো রয়েছে। ঘরের সব

আসবাবপত্রে ঐশ্বর্যের থকথকে চিহ্ন। একটা কাচের আলমারি ভর্তি দামী দামী জার্মান পুতুল। কালো মেহগনি কাঠের তৈরী আর একটি আলমারির মাথায় একটি অপরূপ ঘড়ি, প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর তার ভেতর থেকে একটা কোকিল বেরিয়ে এসে ডেকে যায়। ইংল্যান্ডের ডার্বি লটারির ফার্স্ট প্রাইজ সাড়ে সাত লাখ টাকা এক-বার পেয়েছিলেন মন্দাকিনী।

বিছানার ওপর আধোশোয়া তাঁর চেহারা দেখে ঠিক মানুষ বলে মনে হয় না। মাথা ভর্তি ধপধপে সাদা চুল। অতিরিক্ত ফর্সা ও বিবর্ণ মুখখানা মনে হয় মোমের তৈরী, ঠোঁট দুটি অস্বাভাবিক রকমের লাল। সব মিলিয়ে, যেন একটা অপ্রাকৃত পুতুল। অবিশ্বাস্য শীর্ণ একখানা হাত বুকের ওপর রাখা, সেই হাতে চারখানা আংটি, বহুমূল্য পাথর বসানো। মন্দাকিনী চোখ বুজে আছেন।

অমরনাথ সুরেশ্বরের সঙ্গে সেই ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জনে ঘর ভরে গেল। বেশ কয়েকজন মহিলা, কয়েকটি শিশু। সবাই প্রণাম করলো অমরনাথকে। বাদল প্রণাম করলো তাদের। একজন রূপসী মহিলা বাদলের হাত ধরে বললেন, বাঃ, কি সুন্দর ছেলেটি! এই, এই, মুখ নিচু করে আছো কেন? তাকাও আমার দিকে, তোমার নাম কি?

সেই ঘরের মধ্যে সবাই বেশ স্বচ্ছন্দে গোলমাল করছে।

অমরনাথ সুরেশ্বরকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘুমোচ্ছেন নাকি? তা হলে এখন যাই বরং—

সুরেশ্বর বললেন, আপনার বিব্রত হবার কিছু নেই। মা আজকাল প্রায় একদমই কানে শুনতে পান না! জেগেই আছেন বোধহয়।

অমরনাথের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। খুব নিরাশ হয়ে গেলেন মনে হয়। আস্তে আস্তে বললেন, কিন্তু, আমি যে ওঁর কাছে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম।

—কি কথা? আমাকে বলুন না!

—তুমি পারবে না। সে সব শুধু উনিই জানেন।

—ঠিক আছে, মাকেই জিজ্ঞেস করুন। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। শান্তি, তুমি মা'র পাশে একটু বসো তো!

সেই রূপসী মহিলা বসলেন মন্দাকিনীর মাথার কাছে একটা চেয়ার নিয়ে। অমরনাথ চাদরের ওপর দিয়েই মন্দাকিনীর পা দুটি স্পর্শ করলেন। চোখ না মেলেই মন্দাকিনী জিজ্ঞেস করলেন, কে?

ওঁর গলার স্বর কিন্তু আশ্চর্য রকম পরিষ্কার এবং তীক্ষ্ণ। বয়েসের কোনো জড়তা নেই।

অমরনাথ বললেন, বড়মা, আমি অমর!

মন্দাকিনীর চোখ বোঁজাই রইলো। মাথার কাছে বসা সেই মহিলা মন্দাকিনীর একেবারে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফু দেবার মতন করে বললেন, মা, অমরদাদা এসেছেন! অমরদাদা!

মন্দাকিনী এবার চোখ খুলে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন, একটুও মুখ ফেরালেন না। তারপর হাত দিয়ে পাশে কি যেন খুঁজতে লাগলেন। শান্তিলতা তাড়াতাড়ি যে জিনিসটা মন্দাকিনীর হাতে তুলে দিলেন, সেটা দেখে বাদলের মনে হয়েছিল, হাতল লাগানো গোল আয়না, কিন্তু আসলে সেটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস। সেই ম্যাগনিফাইং

গ্লাস দিয়ে মন্দাকিনী অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন অমরনাথকে। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে বলে উঠলেন, অমর, তুই বিয়ে করে নতুন বউ নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করিস নি কেন? অ্যাঁ, তোর চোখের চামড়া নেই? নিমকহারাম!

অমরনাথ লাজুকভাবে ঘরের সবার দিকে চকিতে তাকালেন। মন্দাকিনীর পায়ের কাছে বসে থাকা ঐ বিশাল চেহারার পুরুষটিকে তখন শিশুর মতন লাগছিল। পঁয়তিরিশ বছর আগেকার ঘটনা। অমরনাথ বিয়ে করেছিলেন প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর আগে—সেই সময়কার ব্যাপার নিয়ে কেউ এখন অভিযোগ করতে পারে, তিনি কল্পনা করতে পারেননি। তাঁর বিয়ে হয়েছিল অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে—সে কথা এখন বলা যায় না। তাছাড়া এই প্রশ্ন মন্দাকিনী তার আগেও কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছেন। অমরনাথ কোনো উত্তর দিলেন না।

মন্দাকিনী আবার জিজ্ঞেস করলেন, আজ বউকে সঙ্গে এনেছিস? কোথায় সে? পেন্নাম করেছে?

অমরনাথ মৃদু গলায় বললেন, পূর্ণিমা মারা গেছে।

কাকতুয়া পাখি যেরকম চিৎকার করে ওঠে, সেইরকমভাবে মন্দাকিনী চেঁচিয়ে উঠলেন, কি? কি বললি?

তখনও ম্যাগনিফায়িং গ্লাস চোখের সামনে রাখা। সোজা তাকিয়ে আছেন অমরনাথের মুখের দিকে। খুব সম্ভব ঠোঁট নাড়া দেখে তিনি কথা বোঝার চেষ্টা করেন, এখনও পারছেন না।

শান্তিলতা আবার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, উনি বললেন, ওঁর স্ত্রীর নাম পূর্ণিমা, তিনি বেঁচে নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, মারা গেছেন! পাঁচ-ছ বছর আগে।

মন্দাকিনী আবার চুপ। কথাটা তাঁর মগজে ঢুকতে কিছুক্ষণ সময় লাগলো যেন। তারপর আবার সেই রকম তীক্ষ্ম গলায় জানালেন, ভালোই হয়েছে! বেঁচে গেছে মেয়েটা! ওর মত একটা বাউন্ডুলে, অলপেয়ে, লক্ষ্মীছাড়ার হাতে পড়েছিল—

ঘরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বাদল। তার অমন গম্ভীর রাশভারি পিসে-মশাইকে কেউ অমনভাবে ধমকাতে পারে, সে কখনো কল্পনাই করতে পারেনি। পৃথিবীতে কত আশ্চর্য ব্যাপার আছে!

—ছেলেপুলে কিছু হয়েছিল? না বংশনাশ করবি?

একটু ইতস্তত করে অমরনাথ উত্তর দিলেন, আমার একটি ছেলে আছে। হাজারীবাগের বোর্ডিং ইস্কুলে পড়ে।

চাদরের তলা থেকে আর-একটি হাত বার করে মন্দাকিনী অন্য কি যেন খুঁজছেন। শান্তিলতা তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিলেন একটা পিকদানী। মন্দাকিনী নিঃশব্দে কি ফেললেন তাতে, মনে হয় টুকটুকে লাল রক্ত, অথবা পানের পিকও হতে পারে। কেননা, তিনি সঙ্গে সঙ্গে আর-এক খিলি পান মুখে দিলেন। তারপর আর একটু উঁচু হয়ে বসে বললেন, তুই কাকে যেন বিয়ে করেছিলি?

—তার নাম ছিল পূর্ণিমা।

—না-না, কাকে বিয়ে করেছিলি যেন, ঠিক মনে পড়ছে না।

—পূর্ণিমা ফুলবাড়ির মুখুজ্যের মেয়ে!

—চুপ! মনে পড়েছে। তুই বিধবা বিয়ে করেছিলি! ঠিক?

—হ্যাঁ।

শান্তিলতাকে আর বলে দিতে হল না, মন্দাকিনী ঠোঁট নাড়া দেখে নিজেই প্রায়

সব বুঝতে পারছেন। ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে তিনি কঠোরভাবে বললেন, তুই আমার বিছানা ছুঁয়েছিস কেন? যা চলে যা! বিদায় হ!

অমরনাথ এই প্রথম হাসলেন। প্রফুল্ল মুখে বললেন, বড়মা, আমি একটি মুসলমান মেয়েকেও বিয়ে করেছিলাম।

মন্দাকিনী শান্তিলতার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি? কি বললো?

শান্তিলতা অবনত মুখে বসে রইলেন। বলতে পারলেন না। মন্দাকিনী আবার তাড়া দিলেন, বৌমা, কি বললো ঐ নচ্ছারটা? এই, তুই কাছে এগিয়ে আয়, নিজে বল্, আমার কানের কাছে!

অমরনাথ দ্বিতীয়বার কথাটা উচ্চারণ করার পর মন্দাকিনী বুঝতে পেরে চোখ বুজলেন। আস্তে আস্তে বললেন, বেরিয়ে যা! দূর হয়ে যা! এক্ষুনি যা!

অমরনাথ বললেন, না, আমি যাবো না।

—এই সন্টু! একে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বিদেয় কর! এই আপদটাকে কেন ঘরে ঢুকতে দিয়েছিস!

—বড়মা, আমি যাবো না!

—সন্টু! রামপিয়ারীকে ডাক! একে দূর করে দে বাড়ি থেকে!

—বড়মা, আমি যাবো না!

সুরেশ্বর দাঁড়িয়ে আছেন দরজার কাছে। তাঁরও মুখে একটু একটু হাসির চিহ্ন। এইসব কথাবার্তা তিনি আগেও শুনেছেন, দেখেছেন এই দৃশ্য।

—তুই কেন এসেছিস্? টাকা! টাকা চাস্ আমার কাছে? আমি কারুকে এক পয়সা দেবো না। আমি আরও অনেকদিন বাঁচবো। কম্পানির কাগজ সব উইল করে রাম-কৃষ্ণ মিশনকে দিয়ে যাবো—গয়নাগাঁটিগুলো হামানদিস্তে দিয়ে গুঁড়িয়ে রাস্তার ধুলোয় মিশিয়ে দেবো। বুঝলি! আমার কাছ থেকে একটা পয়সাও পাবে না।

—আমি টাকা চাইতে আসিনি! বড়মা, আমি তোমার কাছ থেকে কি কোনোদিন টাকা-পয়সা চেয়েছি? ভগবানের ইচ্ছেয় সেরকম অবস্থা আমার কখনো হয়নি।

—কিছু পাবি না! দূর হয়ে যা!

—আমি যাবো না!

মন্দাকিনী আবার ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা তুলে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দেখলেন অমরনাথকে। তারপর হঠাৎ খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তুই কেন এসেছিস?

—আমি তোমার কাছে আমার মায়ের কথা শুনতে চাই।

—কি?

—আমাকে আমার মায়ের কথা বলো।

—মা? তোর আবার মা কে? আমিই তো তোর মা! অকৃতজ্ঞ, কুলাঙ্গার! তুই আমার বুকের দুধ খাসনি? তিন-তিনটে বছর ধরে আমি তোকে ঘুম পাড়াইনি প্রত্যেক রাত্তিরে গু-মুত পরিষ্কার করেছি পর্যন্ত। তারপর ডানা গজাতেই পাখি উড়ে গেল। আমার আর খোঁজ করেছিলি? সেবার যখন আমি মরতে বসেছিলুম, একবার এসেছিলি? এখন আসা হয়েছে মায়ের জন্য দরদ দেখাতে।

—বড়মা তোমার কাছে আমি আমার নিজের মায়ের কথা শুনতে এসেছি।

—কি বলছিস, কি? আমি কানে শুনতে পাই না, জানিস না? শুয়োরের মতন গাঁক গাঁক করে চ্যাঁচাতে হবে না তাই বলে—মুল্লুক সুদ্ধ লোককে জাগিয়ে! আরও কাছে আয়, আমার চোখের দিকে চোখ রেখে বল—

—ক'দিন ধরে আমার মায়ের কথা খুব মনে পড়ছে। মাকে কখনো দেখিনি, তুমি ছাড়া আমার মায়ের কথা এখন আর কেউ জানেও না! তুমি বলো তো, কিরকম দেখতে ছিল তাকে? খুব রাগী ছিল? কিংবা খুব জেদী ছিল?

হাত দিয়ে বিছানার একটা অংশ দেখিয়ে দিয়ে বললেন, বোস এখানে! তোকে দেখলে আমার গা জ্বলে! কেন আসিস?

মন্দাকিনী তাঁর শীর্ণ হাতখানা রাখলেন অমরনাথের গায়ে। আস্তে আস্তে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, জন্মরাত্তিরেই মা মারা গেলে, সেই ছেলে কখনও বাঁচে? লাখে একটা বাঁচে কিনা সন্দেহ। তোকে বাঁচিয়েছিল এই বামনী, বুঝলি? আমার বাবা বলতেন, ও ছেলেকে জলে ডোবালে কিংবা আগুনে পোড়ালেও মরবে না! ও অমর! তা স্বাস্থ্যটি তো এখনও দিব্যি আছে দেখছি, কত বয়স হলো?

—উনষাট!

— আমার রত্নেশ্বর বেঁচে থাকলে এই বয়েস হতো। সে তো দিব্যি আমার আগেই ড্যাং ড্যাং করে চলে গেল! একটু চক্ষুলজ্জা পর্যন্ত নেই! তা সে মরলো কেন, তার বদলে তুই যেতে পারলি না?

—আমার ওরকম নাম রেখেছিলে কেন?

—রত্নেশ্বর আর তুই একবয়েসী। দেড় মাস আগে পরে জন্ম। তোর মা চোখ বোজার আগে আমার হাত ধরে বলেছিল—মন্দ, তোর ছেলে যদি বাঁচে, তাহলে আমার ছেলেও যেন বাঁচে—

—বড়মা, ওসব জানি। তুমি আমার জন্মের আগের কথা বলো!

—কতকাল আগের কথা, সেকি আমার মনে থাকে?

—যেটুকু মনে পড়ে।

—কেন, হঠাৎ শুনতে চাইছিস কেন?

—ক'দিন ধরে খুব মনে পড়ছে। আচ্ছা, আমার মা-কে দেখতে কেমন ছিল?

—সরো আমার থেকেও লম্বা ছিল। তবে তোর গায়ের রং পেয়েছিস বাপের কাছ থেকে। সরোর রং ছিল একটু চাপা। তোর বাপ তো তোদের খোঁজও নিত না। সরো মারা যাবার খবরও পায়নি। আমার মনে আছে, তোর যখন দেড় বছর বয়েস,, তখন তোর হতচ্ছাড়া বাপ এলো একদিন। তুই তখন আমার কোলে, তোর বাপ বললো, ইটি আপনার পুত্তুর বুঝি! সে আবার শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতো তো! মরে যাই, মরে যাই! ঝাঁটা মারি ওরকম পুরুষ মানুষের মুখে!

—আমার বাবার কথা আমি জানি! তুই আমার মায়ের কথা বলো। চোখ দুটি কিরকম ছিল?

—কি আর বলবো! মুখপোড়ারা একটা ছবিও তুলে রাখেনি তার! একটা চিহ্ন পর্যন্ত নেই!

অমরনাথ পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা ভেলভেট মোড়া বাক্স বার করলেন। তার মধ্যে থেকে অনেকগুলো কাগজের পরত খোলার পর বেরিয়ে এলো একটা বহু-কালের পুরোনো বিবর্ণ কগজ। সেটার ওপরে একটি নারীর পায়ের ছাপ আঁকা। অমরনাথ সেটা সাবধানে তুলে ধরে বললেন, এই যে, আমার মায়ের শুধু এইটুকু চিহ্ন আছে আমার কাছে। তুমিই দিয়েছিলে। আচ্ছা বড়মা, ছাপটা কি বিয়ের দিন তোলা হয়েছিল, না অন্য কোনো সময়ে?

দলিল পরীক্ষা করার মতন মন্দাকিনী ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে কাগজটা দেখলেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আমার মনে নেই। আমি জানি না।

—তুমিই তো এটা আমাকে দিয়েছিলে। তুমি জানো না?

মন্দাকিনী খুব জোরে কাশতে কাশতে পিকদানীটা তুলে নিলেন। আবার তাতে ফেললেন রক্তের মতন কিছু। যখন মুখ তুললেন, দেখা গেল তাঁর চোখে জল।

অমরনাথ একটু অপেক্ষা করলেন। চোখের জল তখনও থামছে না দেখে পকেট থেকে রুমাল বার করে মুছিয়ে দিলেন মন্দাকিনীর মুখ। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হাঁপানী কি বেড়েছে?

—চুপ কর তো হতচ্ছাড়া! দরদ দেখাতে হবে না!

—বড়মা, বলো, এই ছাপটি নিশ্চয়ই—

—হ্যাঁ, যা ভাবছিস তাই। সরোজিনীকে চিতায় তোলার পর তার পায়ে আলতা লাগিয়ে এই ছাপ তোলা হয়েছিল। আমার ভাই বিষ্টু বুদ্ধি করে তুলেছিল। তুই তখন একরত্তি ছেলে; আমি তোর গায়ে গরম জলের সেঁক দিচ্ছি, বাঁচানো যাবে কিনা ঠিক নেই, বিষ্টু শ্মশান থেকে ফিরে বললো, দিদি, এর মাথায় এই কাগজটা ছুঁইয়ে দেও!

—আমার মায়ের সঙ্গে তোমার এত ভাব ছিল কি করে? আমার মা তো গরীবের মেয়ে ছিলেন—মামাবাড়িতে মানুষ।

—তুই তখন একরত্তি ছেলে, এইটুকু—এখন লম্বা চওড়া জোয়ান হয়ে মুখে খই ফুটছে।

অমরনাথ হাসতে হাসতে বললেন, এখনও জোয়ান বলছো? এখন তো বুড়ো হয়ে গেছি! তুমি অনেকদিন পরে দেখছো।

মন্দাকিনী রেগে উঠে বললেন, বুড়ো? সেদিনের ছেলে! এখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, দুপদাপ করে হামাগুড়ি দিতিস্! বড্ড নোলা ছিল তোর, খেজুরের গুড় খেতে ভালোবাসতিস্ খুব। গুড় খেয়ে পেটে এত বড় বড় কিরমি হলো—

—বড়মা, তোমার এসব কথাও মনে আছে?

—আমার সব মনে আছে। আমি কিছু ভুলি না।

—তা হলে, আর একটা কথা বলো তো! আমার জন্যই কি আমার মা মারা যায়?

—কথার ছিরি দেখো ছেলের? এতদিনেও ঘটে একটু বুদ্ধি হলো না? ছেলে কখনো মাকে মারে! তুই তোর মাকে মারবি কেন, তুই সারাজীবন আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছিস্!

মন্দাকিনী অতিকষ্টে পাশ ফিরলেন। রোগা হাতখানি ছোঁয়ালেন অমরনাথের গালে। খুব নরমভাবে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, হঠাৎ এসব কথা মনে হচ্ছে কেন?

—জানি না! এমনিই—

—শোন, রোজ রাত্তিরে ইসবগুলের ভুসি জলে ভিজিয়ে রেখে সকালবেলা খাবি। তাতে শরীর ঠাণ্ডা থাকবে।

—আমার মা কি খুব কষ্ট পেয়েছিল?

—কখন?

—আমার জন্মের সময়? না হলে, আমার জীবনটা এরকম হয়ে গেল কেন?

দোতলার চওড়া বারান্দায় বাচ্চারা তখন খেলা শুরু করে দিয়েছে। বাদলকেও টেনে নিয়ে গেছে। চোখ বেঁধে কানামাছি খেলা। কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ—ছুঁয়েই নাম বলতে হবে। বাদল ওদের কারুর নাম জানে না—ওরাও

বাদলের নাম জানে না। বাদলের চেয়ে বছর তিনেক বয়েসে বড় একটি ছেলে বললো, এই, তোর নাম কি রে? হোয়াট ইজ ইওর নেম?

—মাই নেম ইজ বাদলরঞ্জন মুখার্জি। আই রীড ইন ক্লাস টু।

—কি নাম বললি? বা—দ—অল! না বাদোল! তুই বুঝি বাঙাল?

অমনি আর সব ছোট ছেলেমেয়েরা চেঁচিয়ে উঠলো, বাঙাল! বাঙাল!

বড় ছেলেটি বললো, এই চুপ! জ্যাঠাইমা বকবে! বাদল আবার কি নাম? ওরকম নাম তো চাকরদের হয়।

বাদলের মনে খুব আঘাত লাগলো। অনেক কিছু প্রতিবাদ করবে ভেবেও সে শুধু বললো, মোটেই না!

—যাক গে, বুঝেছি, বাঙালদের ওরকম নাম হয়। তোর ভালো নাম কি? তোর ভালো নাম নেই?

বাদলের একটাই নাম। ডাকার সময় বাড়ির লোক বলে বাদলা! কিন্তু সেটা তো ওদের জানানো যায় না। সে মাথা নাড়লো দু'দিকে!

—এ মা, ডাকনাম আর ভালো নাম এক? আমাদের সকলের দুটো করে নাম। এই তো, ওর নাম গগনেন্দ্র আর ডাক নাম হেবো, ওর নাম শঙ্করী আর ডাকনাম চুটকি, এর নাম পার্থসারথি আর ডাকনাম পলতা, আর এই যে, রেণু, তোর ভালো নাম কি রে?

একটা তিন-সাড়ে তিন বছরের পুঁচকে মেয়ে আঙুল চুষতে চুষতে বললো, ইন্দ্রাণী!

সেই ছেলেটি বললো, ও তো আমার আপন বোন নয়, তাই ভালো নাম আমি জানি না। রেণু আমার মামাতো বোন! ওরা হাতিবাগানে থাকে, বেড়াতে এসেছে। তুই হাতিবাগান চিনিস্?

বাদল বললো, হ্যাঁ, চিনি।

—ঠিক বলছিস? হাতিবাগানে কটা হাতি আছে বল তো!

—একটাও না!

—ইল্লি আর টকের আলু! রোজ সন্ধেবেলা ওখানে হাতি বেরোয়—কিছু জানে না!

রেণু নামের মেয়েটি চোখ বড় বড় করে বললো, হ্যাঁ, দুটো হাতি আছে, আমাদের বাড়ির সামনে।

বাদল তার কথায় কান না দিয়ে সেই ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলো, আর তোমার নাম বললে না?

ছেলেটি গর্বিতভাবে বললো, আমার নাম জীমূতবাহন। ডাক নাম ছুটকু।

নাম বলেই ছেলেটি সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়েছিল বাদলের দিকে। বাদলের ঠোঁটে সামান্য হাসির আভা দেখেই ধমকে জিজ্ঞেস করলো, হাসছিস যে? হাসির কি আছে?

বাদল ফিক করে হেসে বললো, এরকম আবার কারুর নাম হয় নাকি? বাহন মানে তো ঘোড়া!

ছেলেটি এবার বাদলের জুলপি টেনে ধরে বললো, তোকে বুঝি লেখাপড়া শেখায় না! বাহন মানে ঘোড়া? যার পিঠে চড়ে, তাকে বলে বাহন। কার্তিকের বাহন কি, বল্ বল্, ওয়ান, টু—

—ময়ূর?

—সরস্বতীর বাহন কি?
—হাঁস!
—শিবের বাহন কি?
—গরু!
—মোটেই না। ষাঁড়।
জলপি ছেড়ে দিয়ে ছেলেটি এবার বিজ্ঞের মতন বললো, জীমূত মানে মেঘ। মেঘ কার বাহন জানিস্? গাঁট্টা খেলেও তো বলতে পারবি না। ইন্দ্র। আমার নামের মানে ইন্দ্র।
পরবর্তী জীবনে এই জীমূতবাহন নামের ছেলেটির সঙ্গে বাদলের গভীর বন্ধুত্ব হয়ে যায়। যৌবনে এরা দু'জনে এক সঙ্গে একবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল।

॥ ৩ ॥

ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে, প্রত্যেক মানুষেরই জন্মের পেছনে একটা করে রোমহর্ষক গল্প আছে। যে উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা প্রতিটি জন্মকে ঘিরে থাকে—তার সঙ্গে তুলনা চলে আর কিসের?
একজন নারীর সারাজীবনে মোট চার শো বার মাসিক হয় অর্থাৎ সেই নারী তার জীবনে চার-শো বার সন্তান জন্ম দেবার জন্য তৈরী হয়ে থাকে। একটি পুরুষ তো প্রতিদিনই লক্ষ লক্ষ স্পার্ম উৎপাদন করতে পারে। সেই লক্ষ অযুতের মধ্যে কখন একটিমাত্র গিয়ে ঠিক মিশ খাবে একটি নারীর গর্ভের ডিমে, তারপর শুরু হবে আর একটি নতুন প্রাণের ইতিহাস। এই মিলন কখনো ফলপ্রসূ নাও হতে পারে। অনেক দম্পতি বিনষ্ট হয়ে যায়। সে সব বাধা পেরিয়ে গেলেও, তার পরেও চলবে ন-দশ মাস প্রতীক্ষা, আঁতুড়ঘর বা হাসপাতাল বা নার্সিং হোমের দরজার বাইরে শংকাতুর পিতার পায়চারি, একটি সম্ভবনাকে গর্ভে ধারণ করে করে সহ্যের শেষ সীমায় আসা ভাবী-মাতার মুখ। তখনও কেউ বলতে পারে না, আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানও সঠিকভাবে বলতে পারেনি, এর পরের মুহূর্তেই যে জন্ম নিতে যাচ্ছে, সে একটি ছেলে না মেয়ে! আমাদের মনে পড়ে না যে আমাদেরও জন্ম এইভাবে। এই নানা আস্ফালনময় জীবনের মাঝখানে হঠাৎ এই কথাটা মনে পড়লে, হাসি পাবেই।
এই বায়োলজিক্যাল জন্মের আগে থেকেই কাহিনী দানা বাঁধে। একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর বিয়ের সব ঠিকঠাক। হঠাৎ জানা গেল, পাত্রী পক্ষের বংশে একটু খুঁত আছে। অমনি ভেস্তে গেল বিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের দু-জনের মিলিতভাবে যে এক সেট ছেলেমেয়ে জন্মাবার কথা ছিল, সেই সম্ভবনাটি নিহত হয়ে গেল, কোথা থেকে উড়ে এস জুড়ে বসলো আর এক সেট ছেলেমেয়ের নিয়তি। এক প্রমিকা তার প্রেমিককে শেষ মুহূর্তে নিরাশ করে বিয়ে করলো বাপ-মায়ের কথা-মতন এক গোলগাল পাত্রকে, একটি বাপের সুপুত্তুর ছেলে টাকা পয়সা কিংবা রূপের দর-কষাকষিতে শেষ পর্যন্ত বনলো না বলে বিয়ে করলো না প্রতিবেশিনী মেয়েটিকে—এরা কেউ জানে না, এরা এদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের চরিত্র নিয়ে কি রকম ছিনিমিনি খেলছে। এই ধোঁয়াটে অবস্থাকে যুক্তিসিদ্ধ করার জন্য আগেকার দিনে মাসীপিসীরা

বলতেন, যার যেখানে কপালে লেখা আছে, সেখানে বিয়েই হবেই। কেউ খন্ডাতে পারবে না।

আমি অনায়াসেই কল্পনা করতে পারি, বিয়ের আগে আমার মাকেও অন্তত আট-দশবার পাত্র পক্ষের সামনে দর্শন দিতে হয়েছে। ঘরজোড়া শতরঞ্জির একপাশে বসে আছেন গুটিকতক সুসজ্জিত গাঁট্টাগোট্টা লোক, প্রত্যেকের সামনে প্লেটে সাজানো সন্দেশ-সিঙ্গাড়া, আর শতরঞ্জির ওপাশে লাজুক, নতমুখী—আমার মায়ের কিশোরী বয়েসের শরীর। তখন পাত্রের স্বয়ং আসার রেওয়াজ ছিল না, পাত্রের বাবা-কাকারাই আসতেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে রূপ গুণের পরিমাণ। পরে খবর দেবো বলে চলে যাওয়া মানেই কোনো আশা নেই।

শেষ পর্যন্ত বরিশালের এক পাত্রের সঙ্গে আমার মায়ের বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল, অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, পাত্রের চেহারাও ভালো এবং বিশেষ দাবি-দাওয়া নেই। বিয়ের তারিখ ও লগ্নও যখন ঠিক হয়ে গেল, তারপর কে যেন একজন এসে খবর দিল যে, পাত্রের নিজের কাকা পাগল। যে-বংশে পাগলামির ধারা আছে, সে বংশে বিয়ে দেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তক্ষুনি সেই সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে তাড়াহুড়ো করে বিয়ে দেওয়া হলো আগে বাতিল-করা এক পাত্রের সঙ্গে। সেই বাতিল-করা পাত্রই আমার বাবা।

বরিশালের সেই ভদ্রলোক যথাসময়ে অন্য একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করলেন, এবং তাঁরও দুটি ছেলে হয়েছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার, ভদ্রলোক পরিণত বয়েসে সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন— তাঁর ছেলে দুটিও পাগল কিনা খোঁজ পাইনি। আমাদের যে আত্মীয়টি শেষ মুহূর্তে খবর এনে আমার মাকে বাঁচিয়েছিলেন, তিনি যদি না আসতেন বা ঐ খবরটা না পেতেন, তা আমার হওয়ার কথা ছিল ঐ পাগল পিতার সন্তান, এবং হয়তো এতদিনে আমিও পাগলামির পথে...। একা ঘরে এই সব ভাবতে ভাবতে আমি হেসে ফেলি।

আমাদের গোটা 'রঞ্জন' বংশের জন্মই একটা হাস্যকর ঘটনা থেকে। আমাদের বাড়ির পুরুষদের সকলেরই নামের মাঝখানে রঞ্জন শব্দটা আছে। যেমন, আমার বাবার নাম চিররঞ্জন, আমার জ্যাঠামশাইয়ের নাম প্রিয়রঞ্জন ইত্যাদি। আমার ঠাকুর্দার নাম সারদারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। এই সারদারঞ্জন নামের মানুষটির জীবন-কাহিনী কি রকম আলোচনা করা যাক।

সারদারঞ্জন পন্ডিত ছিলেন না, বিশেষ লেখাপড়া করেননি—পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে তা জানা যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম, কিছু সংস্কৃত শ্লোক ছেলে-বেলা থেকেই শুনে শুনে শিখেছিলেন—সেইগুলিই স্থানে অস্থানে আউড়ে পণ্ডিতীর ভাণ করতেন। সারদারঞ্জন মূলতঃ পূর্ববঙ্গের অধিবাসী নন। পূর্ববঙ্গে এক সময় ব্রাহ্মণের আমদানী করা হতো। স্থানীয় কায়স্থ ও বৈশ্য সম্প্রদায় নিজেদের ধনাঢ্যতা ও আর্যয়ানা জাহির করার জন্য স্বগ্রামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে বাইরে থেকে পুরুত আনাতেন।

আমাদের কুল গোত্র পরিচয়ে দেখা যায়, আমাদের খড়দা মেল। অর্থাৎ কলকাতার কাছাকাছি খড়দা অঞ্চলে আমাদের পূর্বপুরুষদের বাড়ি ছিল। অনেকে যেমন দার্জিলিং-এ বেড়াতে গিয়ে একজন নেপালী চাকর সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে, সেইরকম ভাবেই বিক্রমপুরের রায়েরা কলকাতা থেকে সারদারঞ্জনের বাবা অঘোরনাথকে পূর্ব-বঙ্গে নিয়ে যান। খড়দা থাকার সময় অঘোরনাথের জীবিকা কি ছিল আমি জানি

না, তবে পূর্ববঙ্গে এসে তাঁর প্রধান জীবিকা হয় বিয়ে করা। মোটমাট সাঁইতিরিশটি বিয়ে তিনি করে উঠতে পেরেছিলেন। আরও বেশী যে পারেন নি—তার কারণ অঘোরনাথ দীর্ঘজীবী হন নি। সাঁইতিরিশটি বিবাহের ফলে মোট আশী-নব্বইটি ছেলেমেয়ের একটি বিশাল বংশ তিনি গোটা পূর্ব বাংলায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। মাত্র একশো দশ বছর আগেকার ঘটনা। এদিকে জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন সদ্য জন্মেছেন এবং বিদ্যাসাগর মশাই বেদান্ত যে ভ্রান্তদর্শন, এই কথা বলে দেওয়ায় নাদান শত্রুর হাতে নাস্তানাবুদ হচ্ছেন।

কোন্ সন্তানটি পুত্র হবে, কোনটি কন্যা—তা আগে থেকে ঠিক করার কোনো উপায় নেই। তবুও, সব দেশেই নারী পুরুষের সংখ্যা একটা মোটামুটি সমতা থাকে, খুব একটা হেরফের হয় না। কোনো কারণে কোনো দেশে পুরুষের সংখ্যা অকস্মাৎ কমে যেতে পারে—যেমন হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরবর্তী জার্মানিতে। সেইরকম কোনো কারণেই কি গত শতাব্দীতে বাংলাদেশে পুরুষের সংখ্যা কমে গিয়ে বহুবিবাহের এমন পসার জমেছিল? হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সমাজেই অরক্ষণীয়া মেয়ের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল অনেক। সাধারণভাবে যেসব মেয়ের বিয়ে হবার কোনো উপায় ছিল না—সেই সব মেয়েকে ব্যবসায়ীরা নৌকো ভরে নিয়ে গিয়ে চালান দিত অন্যত্র। গ্রামের নদীর ঘাটে নিয়মিত এসে ভিড়তো সেই সব নৌকো—প্রকাশ্যে মেয়ে চালান হতো। ঐ সব মেয়েদের বলা হতো ভরার মেয়ে। তাদের কোনো জাত নেই। ঐ উপায়ের মুসলমান মেয়ের সঙ্গে হিন্দুর বিয়ে হয়ে গেছে, এবং বিপরীত। হিন্দু বাড়ির নতুন বৌ লাউকে কদু বলায় হুলুস্থুলু পড়ে গেছে—এরকম গল্প আছে।

অথচ, রাজামহারাজা কিংবা নবাব বাদশা ছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যে বহু বিবাহের প্রচলন কোনোকালেই ছিল না আমাদের দেশে। ইতিহাস পুরাণে সেরকম বিশেষ নজির নেই। এমন কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা ভোগবিলাসী ঋষিরাও এক-দার। এক-মাত্র যাজ্ঞবল্ক্যেরই দুই স্ত্রী দেখতে পাচ্ছি।

মুসলমান সমাজের মধ্যে জাতিভেদ নেই বলে তাদের মধ্যে বিশেষ কোনো শ্রেণী গত শতাব্দীতে বিবাহ ব্যাপারে একাধিপত্য করতে পারে নি। কিন্তু হিন্দুসমাজে জাতিভেদ প্রথার বীভৎসতম দিকটা তখন প্রকট। জাতির পাঁতি মানতে গিয়ে জ্ঞান, ধর্ম, ন্যায় সব ভেসে গেছে। এবং ব্রাহ্মণ সমাজ তাদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং স্বার্থ বজায় রাখার জন্য এই প্রথাকেও আরও জোরদার করছে। জ্ঞানচর্চা চুলোয় গেছে—বিনা পরিশ্রমে লোকের কাছ থেকে কলাটা মুলোটা আদায় করা, সম্বৎসর খাদ্যের বাঁধা ব্যবস্থা বজায় রাখা এবং ফাউ হিসেবে শ্রদ্ধা ভক্তি পাওয়া—এর জন্য তারা যে-কোনো নীচতার পরিচয় দিতে প্রস্তুত ছিল। কত রমণীর চোখের জল যে তখন এদেশের মাটি ভিজিয়েছে, এখন তা আর জানার উপায় নেই। এবং যেহেতু বংশমর্যাদা এবং কৌলিন্যের গৌরবই ছিল তখনকার ব্রাহ্মণদের একমাত্র ক্যাপিটাল—সেই জন্যই সেটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখবার সহস্র চেষ্টা। নানারকম বিধিনিষেধ ও ছুঁৎমার্গের প্রচলন হয় সেই সময় থেকে। বিশ্বামিত্র চণ্ডালের বাড়িতে অন্ন ভিক্ষা করেছিলেন—কিন্তু গত শতাব্দীর ব্রাহ্মণদের অন্য যে-কোনো অব্রাহ্মণের ছোঁয়া খেতেই আপত্তি। অধিকাংশ উপাধ্যায়রাই যে সেন-আমলে এফিডেবিট করা ব্রাহ্মণ, সে-তথ্য গোপন ছিল। ছুঁৎমার্গের জন্যই সেই সময় থেকে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।

যাই হোক সারদারঞ্জনের বাবা অঘোরনাথ বিয়ে করতে করতে হাঁপিয়ে গিয়েই বোধহয় মারা যান। কুলীনদের তখন খুব রবরবা। 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি' হলেও আপত্তি নেই, পুরুষদের বংশ-মর্যাদার কোনো দোষ থাকলে চলবে না। সেই সুবাদে একটার পর একটা বিয়ে করা ও সারা বছর ধরেই শ্বশুরবাড়ি নেমন্তন্ন খাওয়া। ছেলে-মেয়ে মানুষ করাও কোনো দায়িত্ব নেই। কুলীনদের ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারটা কি, তা আমি এখনও স্পষ্ট বুঝি না, তবে শুনেছি, বিয়ের ব্যাপারে ভঙ্গ কুলীনরাই ছিলেন বেশী তালেবর। বিদ্যাসাগর এদেরই বলেছিলেন, 'পাষণ্ড ও পাতকী, এই রকমই এক ভঙ্গ কুলীনকে এক সময় জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার তো এতগুলো শ্বশুরবাড়ি, সব জায়গায় যাওয়া হয়? তিনি বলেছিলেন, যেখানে ভিজিটের টাকা পাই, সেখানেই যাই।

অঘোরনাথের বহু সংখ্যক ছেলেমেয়ে মধ্যে অন্যতম সারদারঞ্জন নিজেই নিজের পথ দেখে নেন। ষোল বছর বয়েসেই তিনি ফরিদপুরের ফুলবাড়ি নামের ছোট শহরের এক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে উদ্ধার করেন ও যৌতুক বাবদ সেখানে একখণ্ড জমি আদায় করেন। ছোট্ট বাড়ি তুলে তিনি নিজের বংশ স্থাপন করলেন!

সারদারঞ্জনও পর পর বিয়ে করেই জীবনটা কাটিয়ে দেবেন ভেবেছিলেন সম্ভবত, কারণ, তাঁর আর কোনো জীবিকা ছিল না। কিন্তু তিনটি মাত্র বিয়ে করেই তিনি হঠাৎ থেমে যেতে বাধ্য হলেন। ততদিনে যুগের হাওয়া পাল্টাতে আরম্ভ করেছে। এবং আমার বাবা যে মাত্র একটি বিয়ে করেছিলেন—এটা একটি বৈপ্লবিক ঘটনার মতন। অঘোরনাথের কাল থেকে আমার বাবা চিররঞ্জনের কাল—মাত্র ষাটসত্তর বছরের মধ্যে এই রীতির পরিবর্তন। একে ইংরেজি শিক্ষার কুফল ছাড়া আর কি বলা যায়! তা ছাড়া, বীরসিংহ গ্রামের সেই খর্বকায় ব্রাহ্মণ বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ করার পর বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্যও উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। বাংলার বিভিন্ন জেলায় এক একজন কীর্তিমান পুরুষের এক ডজন দু' ডজন স্ত্রীর সংখ্যাও তিনি প্রকাশ করে দিয়ে-ছিলেন। এবং বৃদ্ধ বয়েসে একটি কিশোরী কন্যার পানিগ্রহণের অপরাধের জন্য তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষকেরও মুখ দর্শন করতে চান নি—এই গল্প এক সময় সারাদেশে ছড়িয়ে গিয়েছিল। বরিশাল জেলায় কলমকাটি গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মুখুজ্যের পঞ্চান্ন বছর বয়েসেই স্ত্রীর সংখ্যা ছিল একশো সাত। সেই তুলনায় সারদারঞ্জনের বাবা অঘোর-নাথ তো ছেলেখেলা করেছেন মাত্র।

লোকে বলে, দুটি বিয়ে করেই সারদারঞ্জনের আশ মিটে গিয়েছিল। তাঁর দুই স্ত্রী তখন একই বাড়িতে। তখন বিয়ে করে বৌকে বাপের বাড়ি ফেলে রাখার নিয়মটি আস্তে আস্তে অপসৃত হচ্ছে। নেহাত ধনীরা ছাড়া, অন্য সাধারণ গৃহস্থ মেয়ের বিয়ে দেবার পর সাধ্যমতন বস্ত্র অলঙ্কার দিয়ে তাকে শ্বশুরের ভিটেয় পৌঁছে দিয়ে যায়। তারপর তার ভাগ্য সে বুঝুক।

১২৭৭ সালে আর একটা ব্যাপার হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ সমাজে প্রায় বজ্রপাতের মতন ঘটনা বলা যেতে পারে। লক্ষ্মীনারায়ণ মুখুজ্যে নামে এক কুলীন মাত্র ছটি বিয়ে করেছিলেন, তাঁর এক স্ত্রী কৃষ্ণমণি ভারী দুঃসাহসিনী। স্বামী তাকে নেয় না—এই জন্য খোরপোষের দাবিতে তিনি আদালতে মামলা করে দিলেন। এমন কথা কেউ কখনো শোনেনি। আদালতে সাহেব হাকিমের সামনে লক্ষ্মীনারায়ণ মুখুজ্যে বললো, হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে বউদের ভরণপোষণের দায়িত্ব কুলীনদের থাকে না। তা ছাড়া, আমার এতগুলো বউ, সবাইকে আমি খাওয়াবো কি করে? জজ নর্মান সাহেব বললেন, খাওয়াতে পারবে না তো বিয়ে করেছিলেন কেন? এখন জেলে যাও!

বাড়িতে একই সঙ্গে দুই স্ত্রীকে নিয়ে সারদারঞ্জন বেশ মুশকিলে পড়েছিলেন। ঝগড়াঝাঁটির চোটে বাড়িতে কাক চিল বসতে পারে না! মাঝে মাঝে বৈরাগ্যেরও উদয় হয় সরাদারঞ্জনের মনে। টাকা-পয়সারও খুব টানাটানি, ফুলবাড়িতে তাঁর প্রথম শ্বশুর মারা গেছেন। শ্যালকরা উপুড়হস্ত হয় না। স্বল্প বিদ্যা সম্বল করে সারদারঞ্জন একটি পাঠশালা খুলেছেন, তাতেও বিশেষ আয় নেই।

সারদারঞ্জনের প্রথম পক্ষের বিয়েতে কোনো সন্তান হয় নি, সেই স্ত্রী বাঁজা ও সাংঘাতিক ভালো স্বাস্থ্য এবং দারুণ মুখরা। দ্বিতীয় বিয়েতে দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে। এই ছেলেটি ছিল সারদারঞ্জনের নয়নের মণি। সারদারঞ্জন ছেলেটিকে এক মুহূর্তও চোখের আড়াল করতেন না, তার নাম ছিল বিশ্বরঞ্জন, ডাকনাম বিশু, চেহারাটাও খুব ফুটফুটে। এই ছেলেটির একবার কঠিন অসুখ হয়েছিল। বিবরণ শুনে মনে হয় টাইফয়েড। তার সোনার বর্ণ কালি হয়ে যায়। শরীর মিশে যায় বিছানার সঙ্গে, শ্রবণ-শক্তিও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, বিশু বিশু বলে ডাকলেও সাড়া দিত না।

প্রথম দিকে, স্বাভাবিক নিয়ম মতন কবিরাজী চিকিৎসাই চলছিল। তাতে কোনো ফল দেখা যাচ্ছিল না। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা তখন সদ্য গ্রামাঞ্চলে ঢুকছে, ম্যাজিকের মতন সন্দেহ ও বিস্ময় নিয়ে লোকে গ্রহণ করছে এই পদ্ধতিটিকে। আট-দশ মাইল দূরে একজন এল এম এফ পাশ ডাক্তার আছেন, তাকে 'কল' দিয়ে আনা হলো এবং তার ওষুধে দু'এক দিনের মধ্যেই রুগীর কিছুটা উন্নতি প্রত্যক্ষ করা গেল। কিন্তু অবস্থা আবার খারাপ হয়ে পড়তেই ডাক্তারকে আবার ডাকা বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কিন্তু ডাক্তারটি চশমখোর, ভিজিটের টাকা অগ্রিম না দিলে তাকে কিছুতেই আনা যাবে না—এবং কলকাতা থেকে বিলিতি ওষুধ আনাবার অজুহাতে আরও একগাদা টাকা চেয়ে বসলেন। সারদারঞ্জনের হাতে তখন একটা পয়সা নেই। ঘটি বাটি বন্ধক দেওয়াও গেছে। সারদারঞ্জন ডাক্তারের হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, আমার ছেলেকে আপনি বাঁচিয়ে দিন এবারের মতন! আমি যেমন করে পারি, আপনার দেনা একদিন না একদিন শোধ করে দেবো।

ডাক্তারটি নিষ্ঠুরের মতন উত্তর দিয়েছিলেন, ওষুধ কোম্পানি কি আপনার একথা শুনবে? ওষুধ চাই, আসল বিলিতী ওষুধ, বুঝলেন? না-হয় তো এক কাজ করুন। কল দ্যাট কবিরাজ এগেন। মকরধ্বজ ফজ খাওয়াক। এসব পাড়াগাঁর জায়গায় এত-কাল ঐ সব কবিরাজী ওষুধ খেয়েই তো লোকে মরেছে। আমাকে এর মধ্যে জড়াবেন না। বিনা ওষুধ আমি চিকিচ্ছে করতে শিখিনি।

চিন্তায় ভাবনায় দুঃখে সারদারঞ্জন প্রায় পাগলের মতন হয়ে উঠেছিলেন। আর সহ্য করতে পারছিলেন না। নতুন বৈশ্য যুগ এসেছে, কিন্তু সারদারঞ্জন টাকা রোজ-গারের কোনো উপায় শেখেন নি। শেষ পর্যন্ত কোনোরকম দিশা না পেয়ে তিনি গৃহত্যাগ করলেন। রুগ্ন ছেলে, অনূঢ়া দুই কন্যা ও দুই স্ত্রীকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন সারদারঞ্জন।

ফিরে এলেন আটদিন বাদে। নদীর ঘাটে সারদারঞ্জনের নৌকো লাগতেই পাড়া শুদ্ধ লোক সেখানে ছুটে গিয়েছিল মজা দেখতে। কেননা, সারদারঞ্জন নৌকো থেকে নামলেন বরের বেশে, পেছনে লাল চেলি-পরা একটি তের বছরে মেয়ে। মস্ত বড় ঘোমটায় তার মুখ দেখা যায় না। বিস্তর পোঁটলাপুটলি সঙ্গে নিয়ে আরও দুটি লোকও এসেছে।

উপায়ন্তর না দেখে অর্থ সংগ্রহের একমাত্র রাস্তা হিসেবে সারদারঞ্জন ঝটিতি আর একটি বিয়ে করে এসেছেন। সম্ভবত কথাবার্তা আগে থেকেই চলছিল। এতদিন সারদারঞ্জন রাজি হন নি, হঠাৎ মনস্থির করেই নিকটতম লগ্নে বিয়ে করে ফেলেছেন, শুধু পণের টাকাটা পাবার জন্য। শোভাযাত্রা সহকারে নদীর ঘাট থেকে এসে সারদারঞ্জন যখন নিজের বাড়ির চৌহদ্দিতে পা দিলেন, তার কয়েক ঘণ্টা আগে প্রতিবেশীরা তাঁর ছেলেকে পুড়িয়ে এসেছে। সারদারঞ্জনকে দেখেই দুই স্ত্রী আর্তনাদ ও গালাগালি করতে করতে আছড়ে পড়ে মাটিতে। নতুন বৌ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল উঠোনের মাঝখানে। ঐ উটকো এবং মোটেই প্রকৃষ্টভাবে আনয়ন করা হয়নি যাকে, সেই নব পরিণীতা মেয়েটিই আমার আপন ঠাকুমা।

তৃতীয় বিবাহের পর সারদারঞ্জনের ভাগ্য অনেকটা ফিরে যায়। ছেলের শোক ভুলতে কিছুটা সময় লেগেছিল। তবে নতুন বউ এসেই অতি দ্রুত দুটি পুত্র সন্তান উপহার দিলেন। তারপর একটি মেয়ে, আবার দুটি ছেলে। সবচেয়ে ছোট ছেলেটির মুখ চোখ অবিকল সারদারঞ্জনের সেই প্রথম মরা ছেলের মতন, যার চিকিৎসার কারণে এই বিয়ে। লোকে বলাবলি করতে লাগলো, সেই ছেলেই আবার তার বাবার কাছে ফিরে এসেছেন। একেই বলে মহামায়ার খেলা। সেই ছেলেরও নাম রাখা হলো বিশ্বরঞ্জন, কিন্তু ডাকনাম বিশুর বদলে রঞ্জু। ডাক্তারের খরচ জোটাতে না পারার জন্যই প্রথম বিশ্বরঞ্জন মারা গিয়েছিল, তাই সারদারঞ্জন ঘোষণা করলেন, এই কনিষ্ঠ ছেলেকে তিনি ডাক্তারি পড়াবেন। ঢাকায় তখন মেডিক্যাল কলেজ হয়ে গেছে, সেখান থেকে পাশ করিয়ে এনে দেশের বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত করাবেন ডাক্তার ছেলেকে। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে লোকেরা এসে তাঁর বাড়িতে ধর্না দেবে।

তৃতীয় বিবাহের টাকা থেকেই সারদারঞ্জন কিছু ধান-জমি কিনেছিলেন। রায়তদের দিয়ে চাষ করাচ্ছিলেন। হঠাৎ কে যেন একজন বুদ্ধি দিল, ঐ নাবাল জমিতে ধান চাষ করে তেমন লাভ নেই, বিঘে প্রতি পাঁচ ছয় মণ ধান হয় মাত্র, বরং ওখানে পাট লাগানো হোক। পাটের দাম ক্রমশ চড়ছে, জাপানীরা নাকি পাট দিয়ে জামা-কাপড় পর্যন্ত বানাবে। পাট কাটা হয়ে গেলে সেই সময়টা খেসারির ডাল। অলস ব্রাহ্মণ হলেও সারদারঞ্জনের কিছু পাটোয়ারি বুদ্ধি ছিল নিশ্চয়ই, কেননা ধান চাষের চিরাচরিত ব্যবস্থা ছেড়ে তিনি পাটের দিকেই ঝুঁকলেন এবং অবিলম্বে সচ্ছলতার মুখ দেখলেন। তাঁর পাঠশালাটিও ধীরে ধীরে বড় হচ্ছিল। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অন্যতম হয়ে উঠলেন এবং স্থানে অস্থানে ভুল সংস্কৃত শাস্ত্রের বচন উদ্ধার করে নানা সামাজিক বিষয়ে ফতোয়া জারি করতে লাগলেন।

আমার তিন ঠাকুমার মধ্যে অপুত্রক বড় ঠাকুমা বেঁচেছিলেন অনেকদিন। মেজো ঠাকুমা তাঁর প্রাণাধিক পুত্রের মৃত্যুর কিছুদিন পরেই মারা যান। ছোট ঠাকুমা বা আমার আপন ঠাকুমার নাম ছিল মেঘমালা। ছোট্টখাট্টো চেহারা, কথা বলতেন কম, সারা বাড়িতে তুর তুর করে ঘুরে বেড়াতেন। এক সংকটজনক অবস্থান তিনি এবাড়ির বউ হয়ে এসেছিলেন। বুঝেছিলেন, তাঁর একমাত্র কাজ হচ্ছে মুখ বুজে বাড়ির সকলের সেবা করে যাওয়া। তাঁর বাবা-মা মারা গিয়েছিলেন অনেক ছোট বয়সে, ভাইদের সংসারে মানুষ, বৌদিদের লাথি-ঝাঁটা খাওয়া অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। তখনকার দিনে শ্বাশুড়ীর হাতে বৌরা যেরকম অত্যাচারিত হতেন বৌরাও তেমনি তার শোধ তুলে নিতেন ননদের ওপর অত্যাচার করে। পুরুষদের বিরুদ্ধে মেয়েরা তো কখনো একজোট হয়ে দাঁড়াতে পারে না—অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েমানুষই হয় মেয়ে-

মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। ভাইরা তাই তাড়াতাড়ি করে কোনক্রমে মেঘমালার বিয়ে দিয়ে পার করে দেয়।

বড় ঠাকুমা ও মেজর মধ্যে খুব ঝগড়া-ঝাঁটি হলেও বড় ঠাকুমার সঙ্গে ছোটঠাকুমার কখনো সেরকম কিছু হয়নি। পুত্রহীনা অসহায় বড় ঠাকুমা মনে-মনে জানতেন, এ-সংসারে তাঁর কোনো অধিকারই নেই। সেইজন্যই জোর করে অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। চিৎকার করে, ধমকে, ভয় দেখিয়ে তিনি মাথায় করে রাখতেন সারা বাড়ি। বাসনপত্র আছড়ে আছড়ে ফেলতেন মাটিতে, রান্নাঘর থেকে চ্যালাকাঠ ছুঁড়ে মারতেন উঠোনে। বাড়িসুদ্ধ সবাই সব সময় তটস্থ। ছোট ঠাকুমা এক-দিনও গলা উঁচু করে একটাও কথা বলেনি। বরং পোষা বেড়ালটির মতন সব সময় ঘুরঘুর করতেন বড় জায়ের পায়ে পায়ে—সুযোগ পেলেই এটাসেটা খাবার জিনিস এগিয়ে দিতেন তাঁর মুখের সামনে। এবং নিজের সন্তানদেরও এক-এক করে তুলে দিয়েছিলেন বড় জায়ের হাতে।

বড় ঠাকুমা সতীনের ছেলেদের উঠোনে শুইয়ে জবজবে করে সরষের তেল মাখাতেন সারা শরীরে। পুকুরে নিয়ে ঠাণ্ডা জলেও চান করাতেন জোর করে। গামছা দিয়ে গা ঘষে ঘষে ছাল-চমড়া তুলে দিতেন প্রায়। খাবার খেতে বসে কেউ এক কণা খাবার ফেললেও তিনি কান ধরে থাপ্পড় কষাতেন ঠাস ঠাস করে। ইস্কুল থেকে ফিরতে যদি কেউ একটুও দেরি করতো, তিনি সদর দরজার কাছে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন রণরঙ্গিণী মূর্তিতে। তাদের ঘুম পাড়াবার সময় পিঠে জোর চাপড় মারতেন যে ধুপধাপ শব্দ শোনা যেত অনেক দূর থেকে।

মেঘমালা কোনোদিন এসব নিয়ে একটুও মাথা ঘামাননি। কিন্তু পাড়া-প্রতি-বেশীরা কেউ কোনোদিন যদি বলে ফেলতো, ও-বাড়ির বড়বৌ সতীনের ছেলে-মেয়েগুলোকে কষ্ট দেয়, তাহলেই ঝগড়া করার বদলে কেঁদে ফেলতেন বড় ঠাকুমা।

ওঃ, সে কি কান্না! আমার বড় ঠাকুমার কান্না প্রবাদ-প্রসিদ্ধ ছিল ঐ অঞ্চলে। একবার শুরু করলে তিন-চার ঘণ্টার আগে থামতেন না। চিৎকার করে, আদিবাসীদের ধর্মীয় প্রার্থনার চেয়েও তীব্র স্বরে তিনি যেন তাঁর ভেতরের কোনো শারীরিক কষ্টের কথা জানাতেন। চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে দম বন্ধ হয়ে আসতো প্রায়। তিনি নদীর পারে গিয়ে একলা একলা চিৎকার করে কাঁদতেন—যেন, ঐ নদীর মধ্য থেকে কোনো দেবতা এসে তাঁর দুঃখ দূর করবেন। আমাদের বাড়ির পেছনের জঙ্গলে গিয়ে কাঁদতেন—যেন অরণ্য থেকে আসবে তাঁর উদ্ধারকারী। সেই সময় সারদারঞ্জন তাঁর ধারে-কাছে গেলে বড় ঠাকুমা বোধহয় রাগের চোটে ছিঁড়েখুঁটে ফেলতেন তাঁকে। শুধু মেঘ-মালাই শেষ পর্যন্ত তাঁকে ভোলাতে পারতেন। ছেলেমেয়েদের হাত ধরে গিয়ে পড়তেন তাঁর পায়ে। তার কিছুক্ষণ পর আলুথালু চুল, উদ্‌ভ্রান্ত মুখ বড় ঠাকুমাকে সবাই টানতে টানতে নিয়ে আসতো বাড়িতে।

আবার বাবা-জ্যাঠামশাইরা এখনও যখন তাঁদের বড় মায়ের কথা বলেন, তাঁদের চোখে জল এসে যায়। মাতৃস্নেহের যে একটা আদিম হিংস্র রূপ আছে, ওঁরা শৈশবে তার স্পর্শ পেয়েছিলেন।

সাররঞ্জনের তখন বেশ সুসময় চলছে। আর্থিক দুরবস্থা ঘুচেছে। বাড়ি ভর্তি ছেলেমেয়ে, তারা পড়াশুনোতেও মোটামুটি ভালো। আমার জ্যাঠামশাই প্রিয়রঞ্জন জেলায় মধ্যে বৃত্তি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে সবাইকে চমকে দিলেন। জেলাবোর্ডের হাইস্কুলে তাঁর ফ্রি স্টুডেন্টশীপ জুটে গেল। আমরা বাবা নিরঞ্জন ছিলেন শিশু-প্রতিভাবিশেষ।

ভালো করে অক্ষরজ্ঞানের আগেই তিনি লম্বা লম্বা পদ্য গড়গড় করে নির্ভুল মুখস্ত বলতে পারতেন। শুভঙ্করের আর্যাগুলো সব ঠোঁটের ডগায়। অবশ্য অধিকাংশ শিশু প্রতিভারই পরিণতি যা, আমার বাবারও তাই হয়েছিল। চিররঞ্জন বড় হয়ে লেখা-পড়ায় খুব একটা সুবিধে করতে পারেননি। মোটামুটি পরীক্ষা পাশ করেছেন।

মেজো ঠাকুমার দুই মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে। প্রথম মেয়ের বিয়ে হয়েছিল দোজবরের সঙ্গে। বিয়ের পরদিনই তিনি পাঁচটি সন্তানের মা হয়ে যান। তার মধ্যে দুটি সন্তান তাঁর চেয়ে বয়েসে বড়। আর এক মেয়ে বিয়ের পরেই পশ্চিমে চলে যান। পশ্চিম অর্থাৎ উত্তর প্রদেশ—তখন যায় নাম ছিল যুক্ত প্রদেশ! তাঁদের সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখা হয় নি।

যাই হোক, এ বাড়িতে কন্যাসন্তান বলতে তখন একমাত্র পূর্ণিমা পিসীমা। সাত আট বছর বয়েসে, কস্তা পেড়ে শাড়ি পরে ফুরফুর করে দৌড়োদৌড়ি করতেন। মেয়েদের লেখাপড়া শেখবার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন সারদারঞ্জন। তবু দাদাদের কাছাকাছি বসে থেকে পূর্ণিমা কিছু পড়তে লিখতে শিখেছিলেন। এমন কি, আশ্চর্যের বিষয়, তিনি নাকি পদ্য লিখতে পারতেন। দশ-এগারো বছর বয়সেই তিনি বেশ কিছু রচনা করেছিলেন শিবমন্দির, শ্মশান ও নদী বিষয়ে। সেসব পদ্য রচনার কোনো নিদর্শন অবশ্য কেউ রেখে দেয়নি সংগ্রহ করে। তবে জ্যাঠামশাইয়ের কিছু কিছু মনে আছে এখনও। সম্ভবত কবি চন্দ্রাবতী বা তরু দত্তের মতন সুপ্ত কবি-প্রতিভা ছিল পূর্ণিমার মধ্যে, কিন্তু তার বিকাশের কোনো সুযোগ ঘটেনি। বিয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিধবা হওয়ার পরই এই কবিত্ব শক্তি অনেক বেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় বিয়ের পর একেবারে চাপা পড়ে যায়।

পূর্ণিমার পরের ভাইয়ের নাম নিখিররঞ্জন। অপূর্ব সুন্দর তার মুখশ্রী, ধপধপে ফর্সা রং। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই খুব গম্ভীর ও কোকা-বোকা ধরনের। সবাই বলতো, এই ছেলেটা জড়ভরত হবে। পরে অবশ্য তাঁকে ততটা বোকা মনে হয়নি, বরং ভাবুক স্বাভাবটিই প্রকট হয়েছিল। পরবর্তীকালে আমার এই কাকা যে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেবেন, তার চিহ্ন বাল্যকালেই সূচিত হয়েছিল। যদিও রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবার আগে একটি বিবাহিতা নারীর প্রেমে নিমজ্জিত হয়ে একটি ঘোরতর সামাজিক কেলেঙ্কারি প্রায় সম্পূর্ণ করে তুলেছিলেন।

একেবারে ছোট ছেলে বিশ্বরঞ্জন সম্পর্কে লোকের ধারণা যে—এই বাড়িরই এক ছেলে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয়ে এবাড়িতে আবার জন্মেছে। চোখ মুখ একেবারে যেন হুবহু বসানো, গলার আওয়াজটিও আগের বিশ্বরঞ্জনের মতন। এই কুসংস্কারটি ক্রমশ বাড়ছিল এবং লোকের মুখে মুখে বেশ ছড়িয়েছিল। এই ছেলের সম্পর্কে লোকের অনেক আশা। সারদারঞ্জন কনিষ্ঠ সন্তানটিকে সগর্বে লোকের বাড়ি দেখাতে নিয়ে যান।

সারদারঞ্জনের তখন প্রধান কাজ সকালে বিকেলে রূপো-বাঁধানো ছড়িটি হাতে নিয়ে পাড়া বেড়ানো। পরনিন্দা পরচর্চায় দিব্যি সময় কেটে যায়। ঠোঁটের ওপর পুরুষ্টু সাদা গোঁফ, ভুরুতেও দু-একটি পাকা চুল। দেখলে বেশ একটা শ্রদ্ধেয় শ্রদ্ধেয় ভাব আসে। নানা বিষয়ে তিনি ভারিক্কী চালে মতামত দেন, লোকে মানেও। সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তিনি সব সময় সচেতন। ব্রাহ্ম সমাজের কিছু লোক ওখানে বক্তৃতা দিতে এসেছিল, স্থানীয় লোকরা তাদের তাড়া করে নদী পার করে দেয়। সারদারঞ্জন তাতে খুব খুশী। শিবতলার সান্ধ্য আসরে বহুক্ষণ ধরে রসিয়ে

দাসিয়ে সেই গল্প করলেন। তার কিছুদিন পরেই দুর্গাপুজোর ভাসানের সময় মসজিদের সামনে ঢাক বাজানো নিয়ে বেশ কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। উত্তেজনা ক্রোধে বিস্তারিত হবার আগেই স্থানীয় লোকেরা একটা সালিশী সভা ডাকলো। প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ী জয়নাল আবেদিন সাহেবকে করা হলো সভাপতি। জমি-দারের নায়েব তখন অনুপস্থিত বলে হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হলো সারদারঞ্জনকে। সারদারঞ্জন সেই সভায় রীতিমতন বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ফেললেন। লোকজনের কথাবার্তা শুনেই বুঝেছিলেন হাওয়া কোন দিকে। জয়নাল আবেদিন দাপটে বক্তৃতা দিয়ে সারদারঞ্জনের দিকে ফিরে বললেন, মুখুজ্যে মশাই জ্ঞানী গুণী লোক, তিনি যা বিধান দেবেন, তাই আমরা মানবো। তিনি ভুল বিধান দিতেই পারেন না!

সারদারঞ্জন কিছু বলার আগেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। পাকা অভিনেতার মতন কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, আজকাল কি আর কেউ শাস্ত্র ধর্ম মানে? বিসর্জনের সময় বাজনা বাজাতে হবে, শাস্ত্রের কোন্ জায়গায় এ কথা লেখা আছে আমাকে দেখাও তো! মাকে জলে ফেলে দিতে যাচ্ছি, তখন তো কাঁদতে কাঁদতে যাবো। তখন কি নেচেকুঁদে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে আনন্দ করা যায়? তুমিই কও জয়নাল ভাই, তাই পারা যায়? যতক্ষণ পুজা, ততক্ষণ বাজনা—দধিমঙ্গলের পরই কান্না, এই হলো নিয়ম! ঠিক কিনা?

সবাই খুব খুশী। সারদারঞ্জন নির্দেশ দিয়ে দিলেন পুজামন্ডপে যত খুশী বাজনা হবে—প্রতিমা নিয়ে যাবার সময় কোনো বাজনা নয়। তবে হ্যাঁ, একেবারে বিসর্জনের সময়, নদীর ওপরে নৌকোয় নৌকোয় ঢাকের প্রতিযোগিতা হতে পারে বটে! সে প্রতি-যোগিতা প্রতিবারই হয়—সেই চট করে বন্ধ করার সাধ্য সারদারঞ্জনেরও নেই!

সেই মিটিং-এর পর সারদারঞ্জনের সুনাম আরও বেড়ে গেল। লোকজন আরও বেশী খাতির করে। সারদারঞ্জনের মুখে-চোখে বেশ একটা গর্বের ভাব, সাধারণ ছোটখাটো মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় মুখের দিকে তাকান না পর্যন্ত—এক মনে হুঁকোয় টান দিতে থাকেন। সব মিলিয়ে মনে হয় সারদারঞ্জন একজন সুখী মানুষ।

কিন্তু সারদারঞ্জনের জীবনে সবচেয়ে কঠিন আঘাত এলো সবচেয়ে বেশী যার ওপর নির্ভর করেছিলেন, তার কাছ থেকেই। ছোট ছেলের ওপর সারদারঞ্জনের এত আশা-ভরসা ছিল, সেই বিশ্বরঞ্জন তাঁকে পদে পদে নিরাশ করতে লাগলো। বিশ্ব-রঞ্জন বাল্যকাল থেকেই বিষম দুরন্ত, ক্রমে ক্রমে তার অত্যাচারে সবাই সন্ত্রস্ত। অন্য লোকের বাড়ির বাগান তছনছ করা শুধু নয়, সমবয়েসী ছেলেদের মারধোর করা ও নালিশ লেগেই আছে। দুরন্ত ছেলে, বাড়ির কারুর কথা সে গ্রাহ্য করে না—বড় ঠাকুরমার বয়েস হয়ে গেছে, তিনিও আর শাসন করতে পারেন না। ইস্কুলের একজন মাস্টারমশাই বিশ্বরঞ্জনকে বেত দিয়ে মারতে এসেছিলেন, দু' ঘা মারার পরই বিশ্ব-রঞ্জন বেত কেড়ে নিয়ে সেই মাস্টারের নাকে এমন ঘুষি মারলো যে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান। তারপর সবাই মিলে বিশ্বরঞ্জনকে প্রচন্ড মেরে প্রায় আধমরা করে ফেলে। এই ঘটনার পর বিশ্বরঞ্জন একটু শান্ত হয়েছিল, কিন্তু আবার অন্যরকম বিপদ ডেকে আনলো।

খুব জাঁকজমকের সঙ্গে পুর্ণিমার বিয়ে দিয়েছিলেন সারদারঞ্জন, কিন্তু মাত্র সাত মাসের মধ্যেই সে বিধবা হওয়ায় প্রথম আঘাত পেয়েছিলেন। শ্বশুরের ঘর করা বা

স্বামী সম্ভোগ কিছুই ঘটেনি পূর্ণিমার কপালে। তার স্বামী নতুন চাকরি পেয়ে চলে গেল চট্টগ্রামে, সেখানে হঠাৎ কলেরায় মারা যায়। বিধবা পূর্ণিমার দ্বিতীয় বিয়েতে আরও বেশী আঘাত পেয়েছিলেন সারদারঞ্জন—কিন্তু তাঁর বুকে মৃত্যুশেল বিঁধিয়ে দেয় তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সন্তান ঐ বিশ্বরঞ্জন।

॥ ৪ ॥

ফুলবাড়ি নামের জায়গাটিকে শহর না বলে গঞ্জই বলা ভালো। নদীর ধারে হাটখোলা, আশেপাশের কয়েকখানি গাঁয়ের মানুষ আসে সওদা করতে। সপ্তাহে দু' দিন এখানে স্টিমার আসে, সেই জন্যই জায়গাটার যা কিছু গুরুত্ব। কার অ্যান্ড টেগোর কম্পানির আমল থেকেই এখানে স্টিমারঘাটা স্থাপিত হয়েছে। সেই উপলক্ষে গোটা তিনেক পাইস হোটেলও আছে। সকাল ন'টায় স্টিমার থামে, তার মধ্যেই গরম গরম ডাল-ভাত ও মাছের ঝোল তৈরী হয়ে যায় হোটেলগুলোতে। পূর্ববঙ্গে মাছ সস্তা, তবু তিন পয়সা পীস রান্না মাছ খাবার লোক যাত্রীদের মধ্যে বেশি থাকে না। শুধু ডাল ভাত খেলেও 'ছয় পয়সার কম খাওয়া নাই'—এই নোটিশ বাইরে ঝোলানো।

হাটখোলার পেছনে মাটির বাড়িতে তিনঘর বেবুশ্যের বাস। হাটবারেই তাদের পশার জমে, অন্য অন্যদিন তারা নদীর ধারে চুল মেলে, পা ছড়িয়ে বসে চাটাই বোনে কিংবা ধামা, কুলো বানায়। অনেক হাটুরের সঙ্গেই তাদের দিদি কিংবা মাসীর সম্পর্ক। রেট আট আনা।

এছাড়া ফুলবাড়িতে আছে একটি পোস্ট অফিস, তিনটি পাঠশালা, একটি বোর্ড স্কুল—সেখানে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়ানো হয়, একটি হাই স্কুলও সদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাশেই গ্রাম হাসানবাড়ির হাইস্কুলটি সুপ্রাচীন। কোর্ট কাছারির জন্য এলাকার মানুষকে যেতে হয় ফরিদপুর জেলা সদরে। ফুলবাড়িতে পাকা রাস্তা একটিও নেই—একটি শুরকির রাস্তা তিন চার মাইল গিয়ে বড়খালে ডুব দিয়ে আবার ওপারে উঠেছে। খালে কোনো সেতু নেই। এ শহরে পাকাবাড়ির সংখ্যা দশ বারোখানার বেশি নয়। ব্রাহ্মণ আছে পাঁচ ঘর, কায়স্থ ও বৈদ্য বেশ কিছু, নমোশূদ্রের সংখ্যা অনেক। পাশের গ্রামটি মুসলমান প্রধান। ফুলবাড়ির প্রধান মাতব্বর জয়নাল আবেদীন—তাঁর ছিট কাপড় ও বেনেতি মশলার বিরাট ব্যবসা। যেখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে বাঁশবন, তার মধ্যে ডাউক বা ডাহুক আর কুবো পাখির ডাক শোনা যায় সব সময়। সন্ধ্যের পরই প্রান্তর ভরিয়ে ভেসে ওঠে শেয়ালের ডাক, দিনের বেলা কিন্তু তাদের টিকিটিও দেখতে পাওয়া যায় না। সুন্দরবন থেকে দু'একটা কে'দো বাঘ ক্বচিৎ কখনো ছটকে এদিকে আসে। একবার একটা বুনো হাতিও এসেছিল, কোথা থেকে এসেছিল কে জানে। লোকে বলে আসামের বন্যায় ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকেছিল হাসানবাড়িতে। সাপ আছে প্রচুর। এবং ভূত, প্রেত ও ব্রহ্মদৈত্যের তখনও অপ্রতিহত রাজত্ব চলেছে। ইলেকট্রিক আলো কেউ চোখে দেখেনি। হ্যাজাক বাতি জ্বালানো হয় শুধু উৎসবের সময়। ডিগবয়ে পেট্রোল ও কেরোসিন আবিষ্কারের পর থেকেই মাত্র হ্যারিকেনের যুগ শুরু হয়েছে, তার আগে পর্যন্ত রেড়ির তেলর সেজবাতি।

সারদারঞ্জনের বাড়ি বলতে এতদিন পর্যন্ত ছিল দু'খানি টিনের চালা দেওয়া মাটির

দেয়ালের ঘর ও একটি খড়ের চালার রান্নাঘর। সম্প্রতি তিনি একটা একতলা পাকা দালান তুলেছেন। তার সামনের দিকে বৈঠকখানা, পেছনে ছোট ছোট ঘরে ছেলেদের পড়াশুনো ও শোবার জায়গা। কাঠের সিন্দুকটাও দালানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, কিন্তু সারদারঞ্জন দুই স্ত্রীকে নিয়ে এখনও মাটির ঘরেই থাকেন।

ছেলেরা ধাঁ ধাঁ করে বড় হয়ে যাচ্ছে। প্রিয়রঞ্জন ম্যাট্রিক পাশ করেই সরকারি কালেকটারিতে চাকরি পেয়ে গেল, থাকতে হয় বরিশালে—মাসে একবার করে বাড়িতে আসে। ঝালোকাঠির এক বর্ধিষ্ণু গৃহস্থের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়েও দেওয়া হলো। পূর্ণিমা বিধবা হয়ে ফিরে এসে বাপের সেবা করে। চিররঞ্জন ম্যাট্রিক পাশ করে পড়তে চলে গেল কলকাতার কলেজে। খবরের কাগজ দেখে নিজেই চিঠিপত্র লিখে চিররঞ্জন কলকাতার একটি বাড়িতে ছেলেমেয়ে পড়াবার বিনিময়ে থাকা-খাওয়া যোগাড় করে নিয়েছে। নিখিলরঞ্জনের মনের গতি টের পাওয়া যায় না, চুপচাপ গম্ভীরভাবে থাকে ও স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়ে। একবার ম্যাট্রিকে সে ফেল করেছে। ছোট ছেলে বিশ্বরঞ্জনের পড়াশুনোয় বেশ মাথা আছে, কিন্তু একদম মন নেই। এক দন্ড তাকে ঘরের মধ্যে চুপ করে বসিয়ে রাখার উপায় নেই। গ্রামের ইস্কুলে মারামারি করার পর তাকে হাসানবাড়ির হাইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো। গোঁয়ারের মতন রোজ চার মাইল হেঁটে সে সেই স্কুলে যায়, কোনোদিন একবারও আপত্তি তোলেনি। কিন্তু ইস্কুল থেকে ফেরে অনেক দেরি করে সে। দাদারা কখনো এরকম সাহস পেত না।

সারদারঞ্জনের বাড়ির পাশেই একটা বড় পুকুর—দিঘি বলা হতো তাকে—তার ওপাশে রায়চৌধুরীদের বাড়ি। ও বাড়িতে দুর্গাপুজো কালীপুজো হতো খুব ধুমধাম করে। মস্ত বড় বাড়ি, উঠোনে বিরাট ধানের গোলা, রায়চৌধুরীদের বন্দুকও ছিল। বাড়ির কর্তারা অবশ্য প্রায় কেউই থাকতেন না—কলকাতায় ব্যবসা করতেন—উৎসবের সময় আসতেন দলবল নিয়ে। রায়চৌধুরীদের বাড়ির দু'খানা ঘরে থাকতো আট দশটি ছেলে—অনাথ, দরিদ্র বা বাড়ি-পালানো ছেলেরা দরখাস্ত করে এখানে জায়গা পেত—তাদের খাওয়া, থাকা ও পড়ার খরচ লাগতো না। ঘর দুটো জুড়ে তক্তপোশ পাতা, তার ওপর ঢালাও বিছানা—সে বিছানা গোটানো হতো না কখনো। সকালে মুড়ি ও গুড়, দু'বেলা পেটভরা ভাত, মাসে দু'টাকা হাতখরচ এবং দুর্গাপুজোর সময় দুখানা করে ধুতি ও জামা—এই ছিল বরাদ্দ। রায়চৌধুরীদের বাড়িতে ঐসব আশ্রিত ছেলেদের মধ্যে একজন পরবর্তীকালে অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী হয়েছিলেন, একজন হয়েছিলেন কলকাতায় বত্রিশ টাকা ভিজিটের ডাক্তার ও একজন চলচ্চিত্র পরিচালক।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করার পর ঐসব ছেলেরা চলে যেত, আসতো নতুন ছেলেরা। কিন্তু পুরনো ছেলেদের মধ্যে অনেকেই ও বাড়ির মায়া কাটাতে পারতো না—ফিরে ফিরে আসতো বারবার—এবং বাড়ির ছেলের মতনই তাদের জন্য ছিল অবারিত দ্বার। তারা ঐ শহরে নিয়ে আসতো বাইরের জগতের হাওয়া—তারা ফুটবল ক্লাব, যাত্রাপার্টি গঠন করতো, তারা একটা ছোটখাটো পাবলিক লাইব্রেরীও তৈরি করেছিল। ঐ রকম একজন প্রাক্তন ছাত্র ছিল অমরনাথ ভাদুড়ী। বরিশাল বি এম কলেজে বি এ পড়তে পড়তেও প্রায়ই ছুটিছাটায় সে আসতো ফুলবাড়িতে। স্থানীয় ছেলেদের মধ্যে তার খুব প্রভাব—যাত্রা থিয়েটার সংগঠনে অমরনাথ খুব ওস্তাদ—অমরনাথের গানের গলাও ছিল খুব সুরেলা। অমরনাথের পূর্ব পরিচয় কেউ জানতো না। কোনোদিন সে কারুকে নিজের বাবা-মায়ের কথা ঘুণাক্ষরেও বলেনি। সারদারঞ্জনের ছেলেরা রায়চৌধুরীবাড়ির ঐ ছাত্রাবাসে আড্ডা দিতে যেত নিয়মিত। কয়েক বছর পর পুলিশ এসে ঐ ছাত্রাবাসটি

ভেঙে দেয়—কারণ আস্তে আস্তে সেটি সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত বিপ্লবীদের ঘাঁটি হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।

অমরনাথ এসে পূর্ণিমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেবার পর সারদারঞ্জন যখন তাকে মারতে উঠেছিলেন, তখন সারদারঞ্জনের ছোট ছেলে বিশ্বরঞ্জন মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে বাপের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নেয়। বিশ্বরঞ্জনের বয়স তখন সবে চৌদ্দ, কিন্তু সবল চেহারা। লাঠিখানা কেড়ে নিয়েই হাঁটুর জোর দিয়ে মট করে ভেঙে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাবার মুখোমুখি চোখ রাঙিয়ে দাঁড়ায়। তার সেই অদ্ভুত ধরণের ঘৃণা আর ক্রোধ। সেইদিনই সবাই বুঝেছিল, এই ছেলে বিপজ্জনক। এই গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলেকে ঘাঁটানো সহজ হবে না।

পড়াশুনোয় মন ছিল না বিশ্বরঞ্জনের—কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সে সবাইকে তাজ্জব বানিয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করলো। এবং তারপরই ঘোষণা করলো, সে আর পড়াশুনো করবে না। বই পড়তে তার ভালো লাগে না।

ছেলের সাফল্যে সারদারঞ্জন যেমন গর্বিত হয়েছিলেন, তেমনি নিরাশ হলেন এই ঘোষণায়। কত সাধ ছিল, এই ছেলেকে তিনি ডাক্তারি পড়াবেন। এখন তাঁর সেই সামর্থ্যও হয়েছে। ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, পড়াশুনো করবি না, তা হলে তুই কি করতে চাস!

গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বিশ্বরঞ্জন উত্তর দিল, কিচ্ছু না!

—কিচ্ছু না মানে? একথার মানে কি?

বিশ্বরঞ্জন নীরবে সোজা চোখ তুলে বাবার দিকে তাকালো। চোখের পলক পড়ে না। অর্থাৎ সব কথার মানে সে সবাইকে বুঝিয়ে বলতে প্রস্তুত নয়। নিজের বাবাকেও নয়।

ক্রমশ আবিষ্কৃত হলো, বিশ্বরঞ্জন একজন শিল্পী। বাড়ির পেছনের আমবাগানে বহুকালের পরিত্যক্ত একটা গোয়ালঘর ছিল। সেখানে বিশ্বরঞ্জন মাটি দিয়ে নানা রকম মূর্তি তৈরী করে। সরস্বতী, মহাদেব, লাঙলকাঁধে কৃষক, সম্রাট শাহজাহান, গাছের নীচে গৌতম বুদ্ধ। একটি মূর্তি খুব বিরাট, বাঙালী চেহারার সিন্ধুবাদ নাবিকের কাঁধের ওপর বৃটিশরূপী দৈত্য। সেই গোয়ালঘরে সাপখোপের বাসা—কিন্তু বিশ্বরঞ্জন ওসব কিছু গ্রাহ্য করে না। তার সেই শিল্পকলার চর্চার স্থানটি বিশ্বরঞ্জন বহুদিন গোপন রেখেছিল, আস্তে আস্তে সেটি পাড়া প্রতিবেশীর গোচরে আসে।

শিল্পী বলতে যে-রকম মানুষের কথা মনে হয়, বিশ্বরঞ্জনের মোটেই সেরকম ছিল না। তার গুন্ডার মতন চেহারা, লোকের সঙ্গে মারধোর করে, শাসায়—আবার কখনো কখনো সে আমবাগানের গোয়ালঘরে একা একা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে মাটি দিয়ে মূর্তি বানায়। তখন নাওয়া-খাওয়ার কথাও মনে থাকে না তার। অথচ তার চরিত্রে একটা নিষ্ঠুরতা ছিল সব সময়েই। তার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল না, প্রায় কৈশোর থেকেই তাকে কেউ কাঁদতে দেখেনি—হাল্কা রসিকতা বা আমোদপ্রমোদে তার কখনো রুচি দেখা যায়নি। পাশের গ্রামের শেয়ালমারা পার্টিতে বিশ্বরঞ্জন অগ্রণীর ভূমিকা নেয়। শেয়ালের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হাসানবাড়ির লোকেরা একদিন দল বেঁধে শেয়াল মারতে বেরোয়। তাদের সঙ্গে সঙ্গে বল্লম হাতে বিশ্বরঞ্জন। দিনেরবেলা শেয়ালগুলো লুকিয়ে থাকে মাটির তলায়—ওপরে অনেকগুলো গর্ত। একটা দিয়ে খোঁচাখুঁচি করলে আর একটা দিয়ে পালায়। খুঁজে খুঁজে সব কটা গর্তের মুখ বন্ধ করে, শেষ গর্তটায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়, ধোঁয়ায় আর আগুনের আঁচে শেষ পর্যন্ত শেয়াল বেরুবেই। দূরে

লোকজন লাঠি হাতে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে— বেরুলেই লাঠিপেটা করে মারা। কিন্তু অসীমসাহসী বিশ্বরঞ্জন একটা শেয়ালকে বল্লম দিয়ে গেঁথে সেই গগনভেদী চিৎকাররত প্রাণীটিকে পুনর্বার আগুনে নিক্ষেপ করলো। দগ্ধ শরীরে শেয়ালটা যতবার ছুটে আসছে, বিশ্বরঞ্জন সেটাকে আবার আগুনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সেই শিয়াল বিশ্বরঞ্জনের উরু কামড়ে ধরেছিল—ইফতিকার নামে একটি ছেলে কোন-ক্রমে ছাড়িয়ে না দিলে বিশ্বরঞ্জনের প্রাণ বাঁচানো শক্ত হতো। এই বিশ্বরঞ্জনই আবার তন্ময় হয়ে বসে বসে নিজে গড়া মূর্তির চোখের পাতা আঁকে।

একদিন সারদারঞ্জন এসে হাজির হলেন সেই আমবাগানের স্টুডিওতে। বহুক্ষণ ধরে বিশ্বরঞ্জনকে খেতে ডাকা হচ্ছিল, তার কোনো সাড়া নেই, সারদারঞ্জন নিজেই চলে গেলেন সেই গোয়ালঘরে। সেই সব মূর্তিটুর্তি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এসব কি?

বিশ্বরঞ্জন কোনো উত্তর দিল না। দু'হাতেই কাদা মাখা, কি যেন একটা অতিকায় প্রাণী তৈরী করছিল সে।

সারদারঞ্জন আবার জিজ্ঞেস করলেন, এসব কি হচ্ছে কি? শেষ পর্যন্ত কি তুই কুমোর হবি নাকি? না পটো হবি? এইসব লক্ষ্মী, সরস্বতী—এসব বানিয়েছিস কেন? বিক্রী করবি?

—না।

—তাহলে? জানিস না, এসব ঠাকুর দেবতার মূর্তি বানালে পুজো করতে হয়? এমনি এমনি কেউ রাখে? পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে এইসব? ছি ছি ছি!

—আমি মেজদাকে চিঠি লিখেছি। আমি কলকাতায় গিয়ে আর্ট স্কুলে ভর্তি হবো।

—আর্ট ইস্কুল? সে আবার কি? কোনো ভদ্রবংশের ছেলে সেখানে যায়? আর্টের আবার ইস্কুল! ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে তুই কি আবার ইস্কুলে ভর্তি হবি?

—আপনি সব খবর রাখেন না......

পরিবারিক প্রথা অনুসারে বিশ্বরঞ্জন বাবাকে আপনি সম্বোধন করে কথা বলতো বটে, কিন্তু কথাবার্তায় বিনয় বা শ্রদ্ধা দেখানোর ভাব তার ধাতে ছিল না। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরই সারদারঞ্জন হঠাৎ রাগে দপ করে জ্বলে উঠলেন। ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য হুংকার দিয়ে বললেন, এসব চলবে না! এসব চলবে না বলে দিলাম!

বিশ্বরঞ্জন একটুও ভয় পায় না। ক্রোধে অন্ধ হয়ে সারদারঞ্জন হাতের লাঠি দিয়ে সিন্ধুবাদ মূর্তির ওপর জোরে আঘাত করলেন। মূর্তিটার অনেকখানি ভেঙেগ গিয়ে বেরিয়ে পড়লো ভেতরের অন্ধকার।

এতটা বাড়াবাড়ি করে সারদারঞ্জন বোধহয় একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু বিশ্বরঞ্জনের প্রতিক্রিয়া হলো অন্যরকম। নিজেই সে লাথি মেরে মেরে অন্য মূর্তিগুলো ভাঙতে লাগলো। সরস্বতী, শিব মূর্তি তার সবল পদাঘাতে ছিটকে পড়তে লাগলো চতুর্দিকে।

সারদারঞ্জন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এ ছেলেকে তিনি চেনেন না। বাবা মায়ের মনে সবচেয়ে বশী আঘাত লাগে যখন কোনো সন্তানের আচরণ তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। যে সন্তানকে চোখের সামনে এইটুকু থেকে বড় হতে দেখলেন, সেই-ই যখন একদিন স্নেহ-মমতায় ঘেরা বোধের সীমানা ভেঙে দিয়ে বাইরে দাঁড়ায়—তখন এই পৃথিবী রসশূন্য হয়ে যায়।

পূর্ণিমার বিয়ের পর ফুলবাড়িতে আর একটি আলোড়ন ঘটালেন গঙ্গাধর দত্ত। লোকের মুখে মুখে এ'র নাম হয়ে গিয়েছিল, মরু-গরু-কি ঘাস-খায় দত্ত! এরকম নামের উৎস এই, গঙ্গাধর তাঁর বাবা মারা যাবার পর শ্রাদ্ধ করেননি, মাথাও ন্যাড়া করেননি। স্থানীয় হিন্দু সমাজকে চমকে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, মরা মানুষের আত্মা আবার পিন্ডি খাবে কি? মরা গরু কি ঘাস খায়? এর উত্তরে দত্তবংশের কুলপুরোহিত মন্তব্য করেছিলেন, বৎস গঙ্গাধর, তোমার ব্যবহারটা কিয়ৎ পরিমাণে গো-বৎসের মতন, কিন্তু তোমার বাপও যে গরু ছিলেন, তা তো আমরা জানতাম না!

গঙ্গাধর বেশ কিছুকাল দেশ ছাড়া ছিলেন। তাঁর বিধবা দিদি ও বুড়ো-বুড়ী বাবা-মা থাকতেন শহরের একটেরে বাড়িতে। বুড়ী আগেই মরলেন—সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রেখে সতীলক্ষ্মীর মতন। কিন্তু বুড়ো মরার কিছুদিন আগে ফিরে এলেন গঙ্গাধর। মুখে এক মুখ দাড়ি ও অনর্গল হিন্দী ও ইংরিজি বুলি! লম্বা চওড়া চেহারা, ব্যবহারে একটা বেপরোয়া ভাব। মফঃস্বল শহরের নিস্তরঙ্গ জীবনে এইসব মানুষ এক একটা ঝড়ের মতন। গঙ্গাধর তার বাবার শ্রাদ্ধ করতে অস্বীকার করায় সকলের মনে হলো, এরকম কান্ড ইতিহাসে কোনোদিন ঘটেনি। শুধু পারলৌকিক কাজ করতে অস্বীকারই নয়, 'মরা গরু কি ঘাস খায়' কিংবা বামুন নেবে টাকা সিকি আর স্বগ্যে আমার বাপ বগল বাজাবে, ফুঃ ফুঃ—' এই ধরনের অশ্রদ্ধেয় উক্তি। যদিও এর বহু আগেই প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের ছেলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যাঁর ডাকনাম ছিল মহর্ষি, তিনিও যে পিতৃশ্রাদ্ধ করতে অস্বীকার করেছিলেন, সে খবর ওখানে কেউ রাখে না।

গঙ্গাধর দত্তকে শাস্তি দেবার জন্য স্থানীয় হিন্দুসমাজ রে রে করে উঠলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, শাস্ত্র বহির্ভূত নিছক লোকাচার নির্ভর হিন্দু সমাজের নিয়মকানুন খুব কড়া হলেও ভেতরে ফক্কা, শাস্তি দেবার বিশেষ কোনো অস্ত্র তাদের হাতে নেই। বিশেষত গঙ্গাধরের মতন শক্ত সবল গোঁয়ার মানুষকে। যত জারিজুরি মেয়েদের ওপর। সামাজিক অনুশাসন অসহায় বিধবাদের একাদশীর দিন জলও খেতে না দিয়ে মাটি চাটিয়েছে, কিন্তু পুরুষের রাস আলগাতে পারে নি। গঙ্গাধর দত্ত চণ্ডীমণ্ডপের বৃদ্ধমণ্ডলীর প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন। গঙ্গাধরের ধোপা নাপিত বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হলো। গঙ্গাধরের মুখ ভর্তি দাড়ি আর মাথায় লম্বা লম্বা চুল—তার নাপিতের দরকার নেই। বাড়িতে বিধবা বোনটা রয়েছে, জামা কাপড় সে-ই কেচে দেয়। গঙ্গাধর হা-হা করে হেসে বললো, আউর কেয়া হ্যায়, বোলো! আউর ক্যা? সামাজিক ক্রিয়াকলাপে তার নেমন্তন্ন বন্ধ—তাতেও কিছু যায় আসে না, কারণ ইতিমধ্যেই আশেপাশের কয়েকখানা গাঁয়ের ছেলেছোকরারা গঙ্গাধরের অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল।

তখন চারদিকে রটে গেল যে, গঙ্গাধর দত্তের বাবার অতৃপ্ত প্রেতাত্মা রোজ রাত্তিরে এসে শ্মশানতলার পাশে বাঁশবাগানের মধ্যে কাঁদে। অনেকেই সেই কান্না শুনেছে। এক রাত্তিরে দলবল নিয়ে গঙ্গাধর নিজে গেলেন শ্মশানতলায়। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সত্যিই শুনতে পেলেন সেই কান্না। একটা প্রকাণ্ড কাঁপা-কাঁপা অতিপ্রাকৃত আওয়াজ সাইরেনের মত উঁচুতে উঠে আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে। কোনো মানুষ বা জীবজন্তুর গলা থেকে এরকম শব্দ বেরুতে পারে না। এরপর একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। অত সাহসী ও প্রচণ্ড নাস্তিক গঙ্গাধর দত্তের ভূতের ভয় ছিল খুব। রাত্তির বেলা তাঁর ভূতের ভয়ের কাছে কোনো যুক্তিতর্ক টিঁকতো না। ভয় পেয়ে পাশের

গঙ্গাকে জড়িয়ে ধরে গঙ্গাধর কাতরভাবে বলতে লাগলেন, ট্রু অর ফল্‌স্? ট্রু অর ফল্‌স্? ভোলা, শিগগির বল্, আমি একাই শুনতে পাচ্ছি, না তোরাও শুনেছিস?

সে রাত্তিরে ভয় পেয়ে তারা সদলবলে পালিয়ে আসে। তারপর গঙ্গাধর তিন চার দিন জ্বরে ভুগলেন। কিন্তু হার মানলেন না। সেরে উঠে আবার একদিন গেলেন শ্মশানে। সেদিনও শোনা গেল, সেই দুর্বোধ্য আর্তনাদ। গঙ্গাধর চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, আপনি কিছু বলবেন? শব্দটা একবার হয়েই থেমে যায়। তারপরই প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা ও বাঁশবনে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। ওদের সঙ্গে একটা টর্চ পর্যন্ত নেই—দুটি হ্যারিকেন। সেদিন ঐ দলে আর একজন যুবক ছিল। একটি হ্যারিকেন নিয়ে সে একা এগিয়ে গেল বাঁশবনের দিকে। বলাই বাহুল্য, সেই যুবকটি বিশ্বরঞ্জন।

কিন্তু তারপরই আর একটা কান্ড হল। হঠাৎ হাওয়ায় নিভে গেল গঙ্গাধরদের সঙ্গের হ্যারিকেনটা। তখন আলৌকিক বিশ্বাসের হাওয়া বইছে চারদিকে। হ্যারিকেন নিভে যাওয় তো ভয়ের ব্যাপারই। সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, রঞ্জু, রঞ্জু ফিরে আয়! শিগ্‌গির!

বাঁশবনের সেই শব্দ কিছুদিন পর আপনা-আপনি থেমে যায়। কিন্তু রহস্যের মীমাংসা হলো না। গঙ্গাধরের বাবার প্রেতাত্মার কান্নার গল্প স্থায়ী হয়ে গেল মুকুলবাড়িতে।

একদিন জয়নাল আবেদীন সারদারঞ্জনকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, পণ্ডিতমশাই আপনার ছেলেকে সামলান।

ছোট ছেলের সম্পর্কে নিত্য নতুন অভিযোগ শোনা গা-সহা হয়ে গিয়েছিল সারদারঞ্জনের। কিন্তু জয়নাল আবেদীনের মতন গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর ছেলে কি করতে পারে?

বিবর্ণ মুখে সারদারঞ্জন জিজ্ঞেস করলেন, কেন, সে কি করেছে? আপনার কোনো ক্ষতি করেছে সে হারামজাদা?

জয়নাল আবেদীন অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন, ওরা দল বেঁধে গুন্ডামি করতে আসে আমার দোকানের সামনে। কিন্তু সেটুকু সামাল দেবার ক্ষমতা আমার আছে। সে সব আমি পরোয়া করি না। তবে, আপনি মানী লোক, আপনাকে সাবধান করে দেওয়া আমার কর্তব্য। আপনার ছেলে অস্থানে কুস্থানে যায়! ছেলের এবার তাড়াতাড়ি বিয়ে শাদী দিন!

—কোথায় যায়? কোথায় যায় বললে?

—স্টিমারঘাটায় কসবীদের ঘরের সামনে রোজ সন্ধ্যেবেলা সে ঘোরাঘুরি করে। আমার লোক দেখেছে।

সারদারঞ্জনের অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা। তাঁর ভাগ্যে এমন ছিল, এরকম কথাও শুনতে হলো তাঁকে? তাঁর ছেলে বেশ্যাপল্লীতে যায়!

তক্ষুনি ছেলের খোঁজে ছুটলেন সারদারঞ্জন। কিন্তু কাথায় পাওয়া যাবে তাকে? সে তো বেশীর ভাগ সময় বাড়িতেই থাকে না। আমবাগানের গোয়ালঘরেও আজকাল যায় না। পাড়াপ্রতিবেশীদের বাড়িতেও নেই। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যেবেলা সারদারঞ্জন নিজেই গেলেন স্টিমারঘাটায়।

সেদিন হাটবার, বেশ ভিড়। সবে একটু একটু শীত পড়তে শুরু করেছে। নদীর ওপর পাতলা আস্তরণের মতন জমে আছে কুয়াশা। টাটকা সতেজ তরিতরকারি এসেছে দোকানে। চাষীদের হাতে আউস ধান বিক্রির কাঁচা টাকা। বেশ্যাদের ঘরগুলোর সামনে

আটদশজন মানুষ হাতে হাত ধরাধরি করে শিকল বানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে গঙ্গাধর এবং বিশ্বরঞ্জন। তারা কোনো খদ্দেরকে ঢুকতে দেবে না। আর ঘরের ভেতর থেকে মেয়েগুলো ওদের উদ্দেশ্যে বর্ষণ করছে পৃথিবীর কুৎসিততম গালাগাল। গঙ্গাধরের দলবল একটু আগে জয়নাল আবেদিনের দোকানের সামনে বিলিতী বস্ত্র বর্জনের আবেদন জানিয়ে পিকেটিং করে এসেছে।

ভিড় ঠেলে সারদারঞ্জন সামনে এসে দাঁড়লেন। অপমানে তাঁর মাথা কাটা যাচ্ছে। চিৎকার করে বললেন, রঞ্জু, এক্ষুনি চলে আয়।

বিশ্বরঞ্জন শুনেও শুনতে পেল না। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলো। গঙ্গাধর এগিয়ে এসে হাত জোড় করে বললেন, মুখুজ্যে কাকা, আপনি বাধা দেবেন না। আমরা এদের ভালোর জন্যই...

সারদারঞ্জন কুঁকড়ে উঠে বললেন, ছুঁয়ো না, তুমি এত কাছে এসো না—নিজে কুলাঙ্গার, এখন আমার ছেলেকেও—

টেলিগ্রাম পাঠিয়ে সারদারঞ্জন বড় দুই ছেলেকে বাড়িতে আনালেন। তিনি তাদের বললেন, ফুলবাড়িতে থেকে বিশ্বরঞ্জন যদি এ-সব কীর্তি করে বেড়ায়, তা হলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন। একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে।

দাদারা অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিশ্বরঞ্জনকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে কলেজে ভর্তি করে দিল। বাবার ইচ্ছে মতন তাকে ডাক্তারী পড়াবার পরিকল্পনাই বহাল রইলো।

ঢাকায় যাবার পর বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় ঘুচেই গেল বিশ্বরঞ্জনের। মেজদা চিত্তরঞ্জনের বিয়ের সময় একবার মাত্র বাড়িতে এসেছিল, তারপর আর এক বছরের মধ্যে ছুটিছাটাতেও তার দেখা পাওয়া যায় না। কদাচিৎ মাসে দু'এক লাইন চিঠি লেখে।

এক বছর পরেও বিশ্বরঞ্জন বাড়ি ফিরলো না, কিন্তু তার খোঁজে এলো পুলিস।

ফুলবাড়ির মানুষ জলজ্যান্ত সাহেব বেশী চোখে দেখে নি। কদাচিৎ স্টিমারের রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়ানো সাহেব মেমদের দেখা গেছে দূর থেকে। ক্বচিৎ কখনো জেলার কালেক্টর সাহেব কয়েক ঘণ্টার জন্য থেকেছেন ফুলবাড়িতে। তাঁকেও সকলের চোখে দেখবার সৌভাগ্য হয় না। কর্মোপলক্ষে যে-সব গ্রাম্য মানুষ কখনো বরিশাল বা ঢাকায় যায়, তারাই বাড়ি ফিরে এসে স্বচক্ষে সাহেব দেখার গল্প বলে। সাহেবরা তখনও রূপকথার মানুষ। এদের গায়ের রং দেবতাদের মতন। এই টুপীওয়ালারা অসাধ্যসাধন করতে পারে, ভয়ডর বলে কোনো বস্তু এদের শরীরে নেই। সাত সমুদ্দুর তের নদীর পার থেকে এসে এরা এত বড় দেশটাকে হাতের মুঠোয় পুরে রেখেছে।

ফুলবাড়ির রাস্তা দিয়ে প্রথম একজন সাহেব, স্থানীয় দারোগা আর তিনজন সিপাইকে সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ্যে হেঁটে এসে সারদারঞ্জনের বাড়ির সামনে দাঁড়ালো। সারদারঞ্জনের নাকের সামনে ব্যাটন তুলে বললো, হোয়ার ইজ ইওর সান? টুম ব্রাহমিন, ঝুট বাৎ মাৎ বোলো! হোয়ার ইজ হি হাইডিং?

সারদারঞ্জন এক বর্ণ ইংরেজি জানেন না। দারেগা তর্জনগর্জন করে অনুবাদ করে দিল। তোমার ছেলে বিশ্বরঞ্জন কোথায় লুকিয়ে আছে, বলো! মিথ্যে কথা বলে লাভ নেই। ব্রিটিশ শাসনের লম্বা হাত তাকে ঠিক খুঁজে বার করবে!

অত ছোঁয়াছানির বাতিক সারদারঞ্জনের, কিন্তু সেই ম্লেচ্ছ সাহেব ও যবন সেপাইরা জুতো পরেই ঢুকে গেল ঘরে ঘরে। সমস্ত জিনিসপত্র উল্টে পাল্টে তছনছ করে

দেখলো।

বড় শহরের খবর এখানে তিন চার দিনের আগে পৌঁছায় না। তবু পুলিশ পক্ষ ধারণা করতেই পারেনি যে, সারদারঞ্জন কিছুই জানেন না। দু দিন আগে সারদারঞ্জনের ছেলে বিশ্বরঞ্জন ঢাকায় পুরো পল্টনে সাহেব পুলিশ কমিশনারকে গুলি করে মেরে ফেলে পালিয়েছে। হিউবার্ট সাহেব তখন যুব সমাজের ত্রাস। বিশ্বরঞ্জন তিনটি গুলিতে তার মস্তক ভেদ করে দেয়। সারা দেশে তাই নিয়ে হইচই, শুধু জানে না আসামীর বাবা মা।

বিশ্বরঞ্জন আর ধরা পড়েনি। সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। এর পর পঁচিশ বছরের মধ্যেও তার কোনো সন্ধ্যান পাওয়া যায়নি। লোকের ধারণা সে সাধু হয়ে হিমালয়ে আছে কিংবা জাভা-সুমাত্রার দিকে পালিয়ে গেছে।

প্রথম পুলিস আসার দিন দশেক বাদে আবার পুলিশ এসে সারদারঞ্জনকে ঢাকা শহরে নিয়ে যায়। মর্গে তিনটে পচা গলা শব দেখিয়ে তাঁর ছেলেকে সনাক্ত করতে বলে। কয়েকদিন আগে নদীর ওপর পলাতক অবস্থায় এই তিনজনকে পুলিস গুলি করে মারে। সারদারঞ্জন দু দিকে মাথা নেড়ে জানিয়েছিলেন, এর মধ্যে তাঁর ছেলে নেই।

বাড়ি ফিরে আসার কয়েক ঘণ্টা বাদেই সারদারঞ্জনের পক্ষাঘাত হয়। সেই অবস্থায় বেঁচে ছিলেন দেড় মাস। বাকশক্তিও রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। হাঁ করে মাঝে মাঝে কিছু বলতে চাইতেন, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতেন শুধু, চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়তো। মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত আগে হঠাৎ যেন অপ্রাকৃত শক্তিতে তিনি বিছানার ওপর উঠে বসলেন, গলা দিয়ে অদ্ভুত কাতর শব্দ বার করতে লাগলেন। উপস্থিত আত্মীয় স্বজনদের ধারণা, বিশ্বরঞ্জনের নাম ধরে ডাকতে ডাকতেই তিনি মারা গেছেন।

পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে বিশ্বরঞ্জনের নিরুদ্দেশ থাকাটা সম্ভবত গুজব। নানাসাহেব কিংবা সুভাষ বসু সম্পর্কে যে-রকম গুজব প্রচলিত আছে, ওরকম সাধারণতঃ হয় না। এমনও হতে পারে, মর্গের মৃতদেহগুলির মধ্যে সারদারঞ্জন তার ছেলেকে চিনতে পেরেছিলেন, কিন্তু প্রকাশ করেন নি সে কথা। নইলে তার পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন কেন? বিশ্বরঞ্জনের পক্ষে কোথাও অপঘাতে এবং অজ্ঞাতনামা হিসেবে মৃত্যুবরণ করাই সম্ভব। কিন্তু বিশ্বরঞ্জনের আত্মা মরে নি।

এই পরিবারে প্রথম বিশ্বরঞ্জন মারা যায় অতি অল্প বয়েসে—তাকে বাঁচানোর কত চেষ্টা হয়েছিল। লোক-বিশ্বাস অনুসারে সে-ই আবার ফিরে এসেছিল দ্বিতীয় বিশ্বরঞ্জনের মধ্যে। সেই বিশ্বরঞ্জনও পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় পূর্ণ যৌবনের আগে। বহু বছর বাদে বিশ্বরঞ্জনের আত্মা আর একবার ফিরে এসেছিল এই পরিবারে --সম্পূর্ণ অন্য চেহারায়, অন্য চরিত্রে।

॥ ৫ ॥

সেই বয়স মানুষ খুব দ্রুত হারিয়ে ফেলে, যে-বয়সে প্রত্যকটি সকালকেই মনে হয় নতুন। ঘুমভাঙার পর চোখে খানিকটা বিস্ময়ের ঘোর লেগে থাকে। শরীরে ভর করে না পৃথিবীতে দীর্ঘকাল বসবাসের অবসাদ। বিছানা থেকে তড়াক করে লাফিয়ে নেমে বাইরে ছুটে যাওয়া যায়।

বাদল তার মায়ের থেকেও আগে ওঠে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটু একটু পিচুটি লেগে থাকা চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে তাদের বাড়ির সামনের চওড়া রাস্তার দিকে। কিছু কিছু দৃশ্য, কিছু মানুষকে সে প্রত্যেকদিন দেখে। যেন এদের সঙ্গে তার অ্যাপয়েন্ট-মেণ্ট আছে, দেখা না করলে চলবে না। প্রথমেই সে দেখে দু'জন মানুষকে, তারা রাস্তার চাপাকলের সঙ্গে লম্বা হোসপাইপ লাগিয়ে জল ছড়ায়। হোসপাইপটা নেতিয়ে পড়ে থাকে,—তার মধ্যে জল ঢুকলেই সেটি আস্তে আস্তে সাপের মতন জীবন্ত হয়ে ওঠে, নিজে নিজেই নড়েচড়ে। একজন লোক সেটা হাতে তুলে নিয়ে জল ছড়ায়—তখন ফট ফট করে আওয়াজ হয়—কত দূর পর্যন্ত যায় জল, হঠাৎ মনে হয় রাস্তার সব পথিককে ভিজিয়ে দেবে—কিন্তু কারুর গায়ে কোনদিন জল লাগে নি, ঠিক পায়ের কাছে এসে থেমে যায়। বাদলের মনে হয়, এটা একটা খেলা।

সাত সকালেই পথে অনেক মানুষ থাকে। অধিকাংশই গঙ্গাস্নান যাত্রী, কেউ কেউ শীতের জড়তা কাটাবার জন্য গান গাইতে গাইতে যায়। মহিলারা যান রিক্‌শায়—অনেক ঠুং ঠুং শব্দ পরস্পরকে পাল্লা দেয়। একজন বৃদ্ধ মাড়োয়ারী গিরিশ পার্কের সামনে রোজ পায়রাদের গম খাওয়ান। ছড়িয়ে দেন মুঠোমুঠো গম—ঝাঁক ঝাঁক পায়রা এসে বসে রাস্তার মাঝখানে—দূর থেকে তাদের মনে হয় চঞ্চল ফুলের মতন। একটু বাদেই একটা বিশাল চেহারার ষাঁড় এসে ঢুকে পড়ে পায়রার ঝাঁকের মধ্যে। পায়রাদের খাবারে সে ভাগ বসাতে যায়। বৃদ্ধ মাড়োয়ারীটি পরম স্নেহে ষাঁড়টির গায়ে হাত বুলিয়ে বলেন, আয় বেটা চুঃ চুঃ—

একটা লোক কলাপাতায় মুড়ে মাখন বিক্রী করে। সাদা ও হলদে দু'রকম মাখন—নুন ছাড়া ও নুন মেশানো—ছোট ছোট কলাপাতার প্যাকেট দাম দু পয়সা। লোকটি বাদলদের বারান্দার তলায় এসে রোজ মুখ তুলে বলে, মাখন চাই নাকি, খোকাবাবু? মাখন?

বাদল ঘাড় নেড়ে 'না' জানায়। লোকটি একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে দু' চারবার যেন বাদলকেই শোনাবার জন্য দু'তিন রকম সুরে মাখন, মাখ্‌খন, মাখন্‌ন্‌ হাঁক ছাড়ে। বাদল কোনোদিন কেনেনি, তবু লোকটা বিরক্ত হয় না।

পর পর ধামা মাথায় করে আসে আর একটি লোক, সে ঠোঁট দুটোকে গোল করে বলে, মুড়ির চাক, ছোলার চাক, চিঁড়ের চাক চাই-ই! বাদল বেশ কিছুদিন, এই লোকটি কি বলে যে চ্যাঁচায়, তা বুঝতেই পারে নি! সেই জন্যই মায়ের কাছে ঝুলো-ঝুলি করে এই লোকটিকে একদিন ডেকেছিল। ওমা, এই লোকটি মোয়া বিক্রি করে। তবে চিড়ের মোয়াগুলো গোল নয়। চ্যাপ্‌টা, আর ছোলার মোয়া বাদল আগে কখনো দেখেনি। কিন্তু মুড়ির মোয়াকে এ কেন মুড়ির চাক বলে, বাদল তা বুঝতে পারে না।

হঠাৎ ঝনঝন আর কপ্‌ কপ্‌ শব্দে চতুর্দিক সচকিত হয়ে যায়। রাস্তা ছেড়ে দেয় লোকজন। সেই ঘোড়ার গাড়িটি আসছে। দুটি বিশাল অশ্ব টেনে আনছে একটা কালো রঙের চকচকে গাড়ি, কি সুন্দর তার পালিশ—ঝকমক করে। গাড়ির ওপরে উর্দি-পরা কোচয়ান বসে থাকে চাবুক হাতে নিয়ে—পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে আর একজন উর্দি-পরা লোক, সে একটা পেতলের জিনিসে ঝনঝন আওয়াজ করে। গাড়িখানা দেখলেই সম্ভ্রম হয়—কিন্তু গাড়িটার দুটি দরজাই বন্ধ, ভেতরে কে আছে বোঝা যায় না। বাদল কোনোদিনই জানতে পারেনি, ঐ সুদৃশ্য গাড়ির রহস্যময় অতিথি প্রতিদিন ভোরে কোথায় যায়।

আর একটু পরেই মা হাতে খানিকটা ছাই নিয়ে এসে বলেন, এই নে। সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে কখন, আর তুই এখনও দাঁড়িয়ে আছিস!

ছাই দিয়ে দাঁত মেজে ফেলে বাদল, মুখ নিজেই ধোয়, কিন্তু চোখ ধুইয়ে দেন মা নিজে। মা চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে দিয়ে ভালো ভাবে পরিষ্কার করে দেন দেন। একবার জ্বরে ভোগার পর বাদলকে সর্ষের তেল আর নুন দিয়ে দাঁত মাজতে হয়েছিল, কিন্তু তার চেয়ে ছাই দিয়ে মাজাই তার পছন্দ হয়।

মুখ ধুয়ে এসে চট করে দুধ মুড়ি খেয়ে নেয়, তার পরেই জামা প্যাণ্ট বদলে মাথা আঁচড়ানো। বাদলকে পড়তে হয় সকালের ইস্কুলে। বাদলের দুই দিদি—সান্ত্বনা আর শ্রীলেখার ইস্কুলও সকালে, বাদল তাদের সঙ্গে যায়। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বাদল দেখতে পায় একতলায় বসবার ঘরে খবরের কাগজ সামনে মেলে বসে আছেন বড়বাবু, হাতে সিগারেট। বড়বাবু কখনো চোখ তুলে তাকান ওদের দিকে, কোনো কোনোদিন একটাও কথা বলেন না। আবার কোনো কোনোদিন বাদলকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকেই দু হাতে তাকে শূন্যে উঁচু করে তোলেন, কি রকম লেখাপড়া শিখছিস, দেখি! বলতো, পিপীলিকা বানান কি?

বাড়ির চাকর সঙ্গে সঙ্গে আসে, কিন্তু বাদল দিদিদের হাত ধরে যায়। শ্রীলেখাদির কাছে পয়সা থাকে, বাদল এক একদিন আব্দার বায়না করে শ্রীলেখাদিকে দিয়ে লাঠি লজেঞ্চুস কেনায়। তারপর দিদিরা তাকে ইস্কুলের দরজায় পৌঁছে দিয়ে নিজেদের ইস্কুলে চলে যায়।

বাদলদের ইস্কুলের নাম যদু পণ্ডিত বিদ্যালয়—কিন্তু লোকের মুখে মুখে এর নাম যদু পণ্ডিতের পাঠশালা। এই ইস্কুল ক্লাস সিক্স পর্যন্ত, সুতরাং ছাত্ররা সবাই শিশু। সকালবেলার গাছ ভর্তি পাখির মতন গোটা স্কুল বাড়িটা জুড়ে শিশু কণ্ঠের রিনিরিনি আওয়াজ। ঠিক সাতটার সময় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজলেই সব আওয়াজ থেমে যায়। সবাই ক্লাস ঘর ছেড়ে বারান্দায় দাঁড়ায়। দোতলায় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড টাকওয়ালা হেড মাস্টার মশাই দু' হাত উঁচু করে বলেন, রেডি! ওয়ান টু থ্রি—

সবাই একসঙ্গে গান শুরু করেঃ

জয় ভগবান
সর্ব শক্তিমান
জয় জয় ভবপতি...ইত্যাদি।

গান শেষ হওয়া মাত্রই ছেলেরা দৌড়োয় যে-যার ক্লাসঘরের দিকে। যে আগে যাবে সে সামনে বসবে।

ইস্কুলে বাদলের মন ভালো থাকে না। তখনও অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে তার ভাব হয়নি। একেই সে লাজুক, তার ওপরে বাঙাল উচ্চারণের জন্য সে কথাই বলতে চায় না সহজে। অন্যান্য ছেলেরা মাস্টারমশাইকে লুকিয়ে কাটাকুটি খেলে স্লেটে, ছুরি দিয়ে কাঠের ডেস্কে নাম খোদাই করে—বাদল আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকে। পরিতোষ বলে একটা ছেলে মাঝে মাঝেই নিজের পকেটে হাত ঢোকায়, তারপর সেই হাতটা মুখের কাছে এনে ভেতরে একটা কিছু পুরে দেয়, খুট খুট করে চিবোয়। বাদল সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে বলে একদিন সে বাদলকে বললো, খাবি?

বাদল কিছু উত্তর দেবার আগেই পরিতোষ তার মুঠো-করা হাতটা এনে বাদলের মুখের কাছে চেপে ধরলো। খেয়েও বাদল বুঝতে পারছে না, জিজ্ঞেস করলো, কি? পরিতোষ বললো, মসলা!

দুপুরে ভাত খাবার পর বাদল তার বাবা-জ্যাঠাকে মশলা চিবুতে দেখেছে বটে। কিন্তু এমনি এমনি কেউ বসে বসে মশলা খায়—এটা তার ধারণাই ছিল না। তাও ঐটুকু ছেলে।

দিদিদের ছুটি হবার আধ ঘণ্টা আগেই বাদলের ছুটি হয়ে যায়। সেই সময়টা তাকে একলা একলা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় গেটের কাছে। অন্য ছেলেরা দল বেঁধে চলে যায়, কেউ কেউ তাকে ডাকে—তবু বাদল যেতে পারে না। বাদলের ওপর কড়া হুকুম, কক্ষনো সে একলা একলা রাস্তা দিয়ে হাঁটবে না। কলকাতায় ছেলেধরা আছে, তারা একলা বাচ্চা ছেলে পেলেই ছালায় (বস্তায়) ভরে নিয়ে চলে যায়—তারপর তাদের হাত-পা কেটে ভিখিরি বানিয়ে দেয়। বাদল বাড়ির রাস্তা চেনে, তার ইচ্ছে করে এক ছুটে বাড়ি চলে যেতে—কিন্তু হুকুম অমান্য করার সাহস সঞ্চয় করতে পারে না।

স্কুলের অন্যান্য ছেলেরা আলুকাবলি কিংবা হজমি কিনে খায়, কিন্তু বাদলের হাতে পয়সা দেওয়া হয় না। সবচেয়ে লোভনীয় হচ্ছে 'বুড়ির মাথার পাকা চুল'—লাল তুলোর মতন মিষ্টি জিনিস—এই জিনিসটা বাদলের বাড়ির কাছে কেন যে পাওয়া যায় না!

লাল পাগড়ি মাথায় একজন জমকালো চেহারা পুলিস দাঁড়িয়ে থাকে বাদলদের ইস্কুলের কাছেই। কলকাতার রাস্তার পুলিস সে সময় বেশ একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার ছেলেরা পুলিসটিকে দেখলেই চেঁচিয়ে বলে, পুলিস, সেলাম! পুলিস, সেলাম!

পুলিসটি উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসে। কয়েকটা দুষ্টু ছেলে অবশ্য একটু দূরে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে,

বন্দে মাতরম
পুলিসের মাথা গরম!

বলেই তারা দৌড়োয়।

এরকম ভাবেই ছেলেরা 'পাগলা হাবু'কে ক্ষ্যাপায়। পাগলা হাবু অত্যন্ত ভালোমানুষ পাগল। মোটাসোটা চেহারা, খালি গা। সারা পিঠ জুড়ে কালসিটে পড়ে গেছে। সে একখানা মোটা লাঠি নিয়ে নিজের পিঠে নিজেই মারে—আর কি যেন চ্যাঁচায়। আগে বাদলের মনে হতো, ও বলছে বাংলা কাবু। পরে মনোযোগ দিয়ে শুনে বুঝেছে, ও বলে, পাগলা হাবু। যেন নিজের পাগলামির জন্য নিজেকেই শাস্তি দেয় সে।

কিন্তু কৈশোরে অধিকাংশ মানুষই নিষ্ঠুর। অমন যে নিরীহ পাগলা হাবু তাকেও ছেলেরা নিষ্কৃতি দেয় না। যেহেতু পাগলা হাবু নিজেকে ছাড়া আর কারুকে কখনো মারে না—তাই ছেলেরা নির্ভয়ে তার কাছে গিয়ে চিলুবিলু করে—তাকে খোঁচায়, চিমটি কাটে, কেউ কেউ ইঁটের টুকরো ছুঁড়ে মারে। পাগলা হাবু তখন কাঁদে ভেউ ভেউ করে।

সপ্তাহে একদিন বাদল মাকে নিয়ে গঙ্গায় যায়। আগে মা আর জ্যাঠামশাই দু'-জনে মিলে যেতেন—ইদানীং জ্যাঠামশাই বাতে শয্যাশায়ী হওয়াতে মাকে একাই যেতে হয়, তিনি বাদলকে সঙ্গে নেন।

রিক্শা করে গিয়ে ঘাট থেকে একটু দূরে নামতে হয়। পথের দু' পাশে বসে থাকে অসংখ্য ভিখিরি। পুণ্য অর্জনের জন্য লোকেরা তাদের এক পয়সা বা আধলা দেয়। কেউ কেউ বাড়ি থেকে চাল নিয়ে আসে। কেউ কেউ আবার অধিকতর পুণ্য অর্জনের জন্য ভিখিরিদের পয়সা না দিয়ে সেই পয়সা গঙ্গায় ছুঁড়ে দেয়। বাদল

শুনেছে, গঙ্গার জলে ডুব দিলেই সব পাপ চলে যায়। জলে ডুব দিয়ে থাকলে পাপগুলো শরীর ছেড়ে অদৃশ্য ফড়িং-এর মতন জলের ওপর অপেক্ষা করে, মাথা তুললেই আবার চেপে বসে। বারবার ডুব দিলে, পাপগুলো হয়তো বিরক্ত হয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারে। সেই জন্যই অনেককে মরার একটু আগে গঙ্গার কিনারায় নিয়ে আসা হয়—গঙ্গার জল ছুঁয়ে থেকে মরতে পারলে তার আর কোনো পাপ সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় না। এই সব শোনার পর—বাদল একদিন গঙ্গায় স্নান করতে নেমে জলের মধ্যেই পেচ্ছাপ করে ফেলেছিল—তখন তার কি ভয়! কিন্তু বাদলের যে কোনো উপায় ছিল না—ঠাণ্ডা জলে নামা মাত্রই তার এমন পেচ্ছাপ পেল—কিছুতেই সে আটকাতে পারেনি—কেউ দেখেনি অবশ্য, মা-ও কিছু জানতে পারেননি—কিন্তু ঠাকুর দেবতারা যে সব টের পেয়ে যান।

বেশীর ভাগ দিনই অবশ্য বাদল স্নান করে না। বাদলের কাজ হলো মায়ের কাপড় চোপড় পাহারা দেওয়া। এখানে খুব চোরের উপদ্রব। গঙ্গায় শুধু লোক পুণ্য করতেই আসে না, এখানে পাপ করতেও অনেকে আসে। মায়ের কাপড়-জামা বুকে চেপে ধরে বাদল দাঁড়িয়ে থাকে। এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না অবশ্য। এখন তার আট বছর বয়েস, এখন আস্তে আস্তে তার সাহস বাড়ছে। মায়ের স্নান সেরে আসার মোটামুটি সময়টা তার জানা। সেই সময়টুকু সে এদিক-ওদিক ঘুরে আসে।

মানুষ গিসগিস করছে চারদিকে। গঙ্গায় বুক জলে দাঁড়িয়ে কেউ কেউ স্তোত্র পাঠ করে। কোনো কোনো দুঃসাহসী সাঁতরে ভাসমান বয়ার কাছে চলে যায়। দুরন্ত স্রোত। এক একটা স্টিমার চলে গেলে বড় বড় ঢেউ এসে বাঁধানো ঘাটে আছড়ায়। স্টিমারের গম্ভীর বিষণ্ন ভোঁ অনেকক্ষণ কানে লেগে থাকে।

ঘাটলায় ছোট ছোট কাঠের চৌকি পাতা। সেইখানে উপুড় হয়ে শুয়ে মোটা-সোটা লোকেরা সারা শরীরে তেল মাখায় পয়সা দিয়ে। তাদের ঘাড়ের ওপর, পিঠের ওপর চড়ে তৈলমর্দনকারীরা প্রচণ্ড শব্দে চপেটাঘাত করে, গুম গুম করে কিল মারে --আর নিচের লোকটি মহানন্দে পড়ে আছে। বাদল হাঁ করে এই দৃশ্য দেখে।

পাশেই শ্মশান। বাদল একবার মাত্র মায়ের সঙ্গে শ্মশানে ঢুকেছিল, তারপর থেকে একা একা প্রত্যেকদিন যায়। মা জানতে পেরে বারণ করেছিলেন, বাদল তবু যায়। এটা তার নেশার মতন। সব সময় দু' তিনটে চিতা জ্বলে, মানুষ আছড়ে-পিছড়ে কাঁদে—বাদল চুপটি করে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। আগে তার ধারণা ছিল, কোনো যুক্তি নেই এ ধারণার, যে মানুষ বুঝি শুধু রাত্তিরবেলাই মরে, রাত্তির বেলাই তাদের পোড়ানো হয়। কিন্তু গঙ্গার ঘাটে এসে সে কোনো দিন সবকটা নেবানো চুল্লি দেখেনি।

সেদিন ছিল কি যেন একটা বিশেষ তিথি। ভিড়ে ভিড়াক্কার। কিন্তু বাদল এখানে অনেকবার এসেছে বলে এখন সব কিছু চেনে। তার ভয় করে না। মেয়েদের কাপড় ছাড়ার জায়গাটার পাশেই সে দাঁড়িয়েছিল মায়ের অপেক্ষায়। এত ভিড় যে ভলান-টিয়াররা অনেক চেষ্টা করেও সমলাতে পারছে না। বিভিন্ন গেটে ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে। এত ভিড়ের মধ্যেই আবার কোনো একজন গণ্যমান্য লোকের মৃতদেহ নিয়ে এসেছে একটি দল। মস্ত বড় পালঙ্ক, ফুলে ফুলে ছয়লাপ, মৃতদেহ দেখাই যায় না, সেটা বয়ে নিয়ে আসছে যারা—তারা এই ভিড়ের মধ্যে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে একজন আবার খইয়ের সঙ্গে পয়সা ছড়াচ্ছে—তার ফলে কাঙালীদের হুটোপুটি।

মা এসে কাপড় ছেড়ে নিলেন, তারপর বাদলকে বললেন, শক্ত করে আমার হাত চেপে ধরে থাকবি। বড় রাস্তা পর্যন্ত না গেলে রিক্শা পাওয়া যাবে না।

ভিড় ঠেলে এগোচ্ছে ওরা। একটা জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেক লোক, তাদের এড়িয়ে এগোনো যায় না। চুক চুক আওয়াজ করছে—বাইরে থেকে কৌতূহলী মানুষরা ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করছে, কি হয়েছে? এখানে কি হয়েছে?

একটি বাচ্চা মেয়ে হারিয়ে গেছে। অনেকক্ষণ ধরে সে এখানে দাঁড়িয়ে একা একা কাঁদছে। চেহারা ও পোশাক দেখলে মন হয় সম্ভ্রান্ত বাড়ির মেয়ে। ফুটফুটে রং, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল।

একজন মাতব্বর ধরনের লোক হেঁড়ে গলায় জিজ্ঞেস করছে, ও খুকি, তোমার নাম কি? নাম জানো না?

মেয়েটি কিছুই বলছে না, শুধু কাঁদছে ফুলে ফুলে। এত মানুষ দেখে তার মাথার ঠিক নেই।

—তোমার বাবার নাম জানো না?

—তুমি কোথায় থাকো?

—কার সঙ্গে এসেছো?

মেয়েটি একটা কথাও বলতে পারছে না। কয়েকজন সখেদে মন্তব্য করলো, এ মেয়েকে তো এখানে ফেলেও যাওয়া যায় না। কোন চোর-জোচ্চোরের খপ্পরে পড়বে! কলকাতা শহর যা জায়গা—

বাদলর মা বললেন, আহা রে, ঐ মেয়েটার মা বাবার মন এখন কি রকম আকুলি-বিকুলি করছে। ঐটুকু মেয়ে—

সেই সময় ভিড়ের ফাঁক দিয়ে বাদল এক ঝলক দেখতে পেল মেয়েটিকে। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বললা, মা, ওকে আমি চিনি!

মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুই চিনিস? কি করে চিনলি? কে?

বেশী উত্তেজিত হয়ে গেলে বাদলের দম বন্ধ হয়ে আসে, কথা বলতে পারে না। কোনোক্রমে বললো, বড়বাবুর সঙ্গে সেই যে গিয়েছিলাম,...ভবানীপুরে...সেই বাড়িতে।

মা বললেন, যাঃ, সেই ভবানীপুর থেকে এতদূর আসবে কি করে? যাঃ!

—ভবানীপুর নয়, ওরা হাতিবাগানে থাকে।

—কি নাম ওর?

—ওর নাম রেণু।

মা তাঁর পার্শ্ববর্তী একজন স্থূলকায়া মহিলাকে বললেন, আমাকে একটু মেয়েটির কাছে যেতে দেবেন? আমি ওকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো।

ভিড় সরিয়ে মাকে কাছে যাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো। মা জিজ্ঞেস করলেন, খুকি, তোমার নাম কি রেণু? তুমি কি হাতিবাগানে থাকো?

মেয়েটি বড় বড় চোখ মেলে মায়ের দিকে তাকালো। তারপর ছুটে এসে মায়ের হাত চেপে ধরলো শক্ত করে।

॥ ৬ ॥

রেণুদের বাড়ি গ্রে স্ট্রীটে, স্টার থিয়েটারের কাছাকাছি। এরই কাছাকাছি আর একটি বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দ থাকতেন কিছুদিন। লোকে বলে, সেই বাড়ি থেকেই শ্রীঅরবিন্দ গোপনে শেষবারের মতন ব্রিটিশ রাজত্ব ছেড়ে চলে যান।

রাস্তা থেকে রেণুদের বাড়ির ভেতরটা কিছুই দেখা যায় না। এই ধরনের বসতবাড়ি পরবর্তীকালে কলকাতা শহর থেকে লোপ পেয়ে যায়। মস্ত বড় কাঠের গেট দিয়ে সামনেটা সম্পূর্ণ ঢাকা, পাল্লার মাঝখানটা কেটে একটা হাফ দরজা—সেখান দিয়ে ঢোকা যায়। ঢুকলেই একটা ছাতঢাকা চওড়া গলি, গলির দু-পাশে শ্বেতপাথরের রক তারপর একটা গোল উঠোন, উঠোনের একদিকে ঠাকুর-দালান, অন্য তিনদিকে এলো-মেলো ঘর—একতলায় অবশ্য কেউ থাকে না। দোতলায় তিনতলায় কত যে ঘর, কত যে মানুষজন তার ইয়ত্তা নেই। গোটা বাড়িটা একটা উপনিবেশের মতন, কে কখন আসছে যাচ্ছে, তার কোনো হিসেব রাখা অসম্ভব।

ঠাকুর-দালানের স্তম্ভের দু-পাশে দুটি কালো পাথরের হাতি। ছেলেমেয়েরা ওদের পিঠে চড়ে খেলা করে বলে পিঠগুলো মসৃণ হয়ে গেছে। দালানের ভেতরে শূন্য বেদী, কোনো দেবতার মূর্তি নেই।

এ বাড়ির ভেতরে পা দিলেই বোঝা যায়, এককালে সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যে বাড়িটা গমগম করতো, কিন্তু কোনো এক মধ্যরাত্রে কুললক্ষ্মী চুপি চুপি এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। আর ফিরবেন না। দেয়ালের নোনাধরা দাগের মতন দারিদ্র্যের শাখাপ্রশাখাবহুল হাত চতুর্দিকে ছাপ লাগিয়ে দিচ্ছে। এ বাড়ি রং করা হয়নি অনেক দিন। দোতলা-তিনতলার কার্নিশ থেকে বেরুনো বট ও অশ্বত্থ গাছের চারা মহীরুহ হবার স্বপ্ন দেখছে। তিনতলার একটি ব্যালকনি দেখলে মনে হবে যে-কোনো মুহূর্তে সবসুদ্ধু ভেঙে পড়তে পারে—সেখানে কারুর যাওয়া নিষেধ, তবু ছোট ছেলেমেয়েরা খেলার ঝোঁকে সেখানে কখনো কখনো চলে যায়। শিশুদের তো মৃত্যুভয় থাকে না! মেরামত করার বদলে সেই ব্যালকনিটা সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়াই নিরাপদ, কিন্তু কারুর সেটা খেয়াল হয় না।

এই ধরনের একদা-ধনী বাড়িতে দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে ঔদাসীন্যও এসে জেঁকে বসে। পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই 'যে-রকম চলছে, যতদিন চলছে চলুক',—এই রকম মনো-ভাব নিয়ে আছেন, আর দু-একজন আবার বিনা উদ্যমে, ফাঁকতালে হঠাৎ বড়লোক হয়ে যাবার চিন্তায় মশগুল। তখন পর্যন্ত হঠাৎ বড়লোক হবার একমাত্র মরীচিকা ছিল রেস খেলা। কয়েক বছর বাদেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে গেলে অবশ্য হঠাৎ বড়লোক হবার আরও অনেক সুযোগ এসে যায়। তবে, অনভিজাত মধ্যবিত্ত এবং বানিয়া সম্প্রদায়ই সে সুযোগ গ্রহণ করেছে বেশি।

গঙ্গার ঘাটে হারিয়ে যাওয়া মেয়ে রেণুকে পৌঁছে দিতে বড়বাবুই এসেছিলেন এ বাড়িতে। বাদলও সঙ্গে এসেছিল। ওরা ভেবেছিল, এ বাড়িতে পা দেওয়া মাত্রই একটা হৈ-চৈ পড়ে যাবে। কিন্তু ঢুকেই যার সঙ্গে দেখা হলো, রেণুর সেই কাকা কিছুই খবর জানেন না। ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে বড়বাবু রেণুকে কোলে করে নিয়ে দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকেছিলেন, রেণু তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। চোখের জলে তার জার্মান সিল্কের ফ্রকের বুকের কাছটা ভিজে গেছে। রেণুর বয়েস তখন পাঁচের কাছাকাছি—মাথা ভর্তি কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল।

রেণুর কাকা বিস্মিতভাবে বললেন, কি ব্যাপার? আবার বুঝি রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলি? এই মেয়েটা যখন তখন বাইরে চলে যায়—

বড়বাবু গম্ভীরভাবে বললেন, যাক, তা হলে আপনাদের বাড়ির মেয়ে? ওকে গঙ্গার ঘাটে পাওয়া গেছে। হারিয়ে গিয়েছিল।

রেণুর কাকা ভুরু তুলে বললেন, গঙ্গার ঘাটে? হোয়াট, দ্যাট ইজ নেক্সট টু ইম-পসিবল্! এই মেয়েটা, তুই কার সঙ্গে গিয়েছিলি, অ্যাঁ?

রেণুর কাকা চালিয়াৎ ধরনের মানুষ। চুলে টেরি কাটার খুব বাহার, কানের ডগা পর্যন্ত লম্বা জুলপি, বুকের বাঁ পাশের দিকে বোতাম লাগানো বড়ুয়া-কায়দার পাঞ্জাবি পরা। বড়বাবুকে তিনি একটিও ধন্যবাদ বাক্য জানাননি বা বসতে বলেননি। কথাবার্তা হচ্ছিল উঠোনে দাঁড়িয়েই।

বড়বাবু খানিকটা শাসনের সুরে ওকে বললেন, আপনি মেয়েটির বাবা কিংবা মায়ের কাছে খবর পাঠান। আমি এ বাড়িতে একেবারে অপরিচিত নই, অনেককাল আগে একবার এসেছি—একটি গানবাজনার আসর হয়েছিল ঐ দরদালানে। সুরেশ্বর আমাকে নিয়ে এসেছিল।

—কোন্ সুরেশ্বর?

—সুরেশ্বর রায়। ভবানীপুরে থাকে। সে আমার সহোদর ভাইয়ের মতন।

—ও, মেজ জামাইবাবু!

একটু বাদেই জানা গেল রেণুর মা ভেতরে অজ্ঞান হয়ে আছেন। বাড়ির এক অংশে কান্নাকাটি হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। আর একটা অংশে কোনো খবরই এসে পৌঁছোয়নি। রেণুর মা, ঐ বাড়ির আরও তিনজন মহিলা ও দু-জন দাসী ও একটি দারোয়ান সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে গিয়েছিলেন, তার মধ্যেই রেণু কি করে যেন হারিয়ে যায়। সবার ধারণা, সে চুরি হয়ে গেছে। তখন ছেলেধরা মেয়েধরার গল্প আকছার শোনা যায়—ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে ভিখিরি বানানো হয়, আর বাঙ্গালী মেয়েদের নাকি বিক্রী করা হয় আরব দেশে। কয়েকদিন আগে এ বাড়ির সামনে নিশির ডাক শোনা গিয়েছিল, সেইজন্য আরও ভয়।

তিনমহলা বাড়ির একেবারে ভেতর মহলে নিয়ে বসানো হলো ওদের। রেণুর মা হেসে কেঁদে অস্থির হয়ে উঠলেন। কতবার যে বাদলের কাছে গল্পটা শুনতে চাইলেন, তার শেষ নেই। তিনি কক্ষনো বাইরের পুরুষ মানুষদের সামনে এসে কথা বলেন না, কিন্তু তখন বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলতে একটুও লজ্জা নেই। রেণুর বাবা বাড়িতে ছিলেন না তখন, রেণুর জ্যাঠামশাই এসে বড়বাবুর সঙ্গে রাজনীতি বিষয়ে গল্প জুড়ে দিলেন। তখন দেশের শিক্ষিত মানুষ মাত্রই কংগ্রেস ও লীগ মিনিস্ট্রির ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব চিন্তিত।

সেই থেকে বাদল এ বাড়িতে প্রায়ই আসে। বাদলের তখনও কোনো ভাই ছিল না। তার নিজের দিদি ছাড়াও জ্যাঠামশাইয়ের সব কটিই মেয়ে। বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে থেকে থেকে বাদলও পুতুলের বিয়ে ও রান্নাবাড়ি খেলা শিখছিল। মা বলতেন, আমার যা-ও একটা ছেলে হলো, তারও মেয়েলি স্বভাব। এর পর ওকে শাড়ি পরিয়ে রাখতে হবে দেখছি!

দিদিদের সঙ্গে মিশে মিশে বাদল ব্রতকথার ছড়া মুখস্থ করে, ফুলের মালা গাঁথে, এমন কি কাঁটা দিয়ে উল বোনারও চেষ্টা করে। বাড়ি থেকে তার বেরুবার হুকুম নেই, সে আর খেলার সঙ্গী পাবে কোথায়? রেণুদের বাড়িতে এক গাদা ছেলেমেয়ে,

সারা বিকেল তারা ঠাকুর-দালানের সামনের উঠোনে হুটোপুটি করে কিংবা সারা বাড়ি কাঁপিয়ে চোর-চোর খেলে। দুই বাড়ির মহিলাদের মধ্যে আরও দু-একবার যাতায়াত হবার পর ঠিক হলো, বাদল বিকেলবেলা এ বাড়িতে খেলতে আসবে। বাদলদের বাড়ির চাকর তাকে রেখে যায়, এ বাড়ির দারোয়ান তাকে পেঁাছে দিয়ে আসে।

এ বাড়িতে রেণুই বয়েসে সবচেয়ে ছোট। রেণুর খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো এগারো ভাইবোন তাকে যতটা না ভালোবাসে, তার থেকেও বেশী জ্বালাতন করে। রেণুও বড্ড ছিঁচকাঁদুনে, কথায় কথায় ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে। তখন সবাই মিলে সুড়সুড়ি বা কাতুকুতু দিয়ে অথবা চুল টেনে তাকে আরও রাগিয়ে দেয়। অবিলম্বেই বাদল এই খেলাটায় বেশ মজা পেয়ে গেল, এবং অন্য সবার সঙ্গে যোগ দিয়ে রেণুকে কাঁদাতে লাগলো।

এই এগারো জন ছেলেমেয়ের সঙ্গে কখনো কখনো ভবানীপুরের বাড়ির ছেলে-মেয়েরাও এসে যোগ দেয়, তখন চেঁচামেচি আর দুপদাপ শব্দে সারা বাড়িতে আর কান পাতা যায় না। জীমূতবাহন এসেই সব ছেলেমেয়েদের নেতৃত্ব নিয়ে নেয়। তার মধ্যে নেতা হবার একটা সহজাত গুণ আছে। লুকোচুরি খেলার জন্য এতবড় বাড়িতে প্রচুর লুকোবার জায়গা—তাও ছেলেমেয়েদের ঠেলাঠেলিতে কখনো শোবার ঘরের আলনা উলট পড়ে, জলের কলসী ভাঙে, কাঠের সিঁড়ির ওপর পাতা জরাজীর্ণ কার্পেট ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে যায়।

বাড়ির ছাদখানা ফুটবল গ্রাউণ্ডের মতন প্রকাণ্ড। রেণুর চার ভাইবোনের মধ্যে বড় দাদা থাকেন দিল্লিতে। সদ্য কলেজে ভর্তি হওয়া দাদা সুপ্রকাশ বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের দেখে কৃপার দৃষ্টিতে। বিশেষত তার কলেজী বন্ধুদের সঙ্গে সে যখন আড্ডা দেয়, তখন ছেলেমেয়েদের গোলমাল করা একেবারে বারণ। কলেজী বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ দাড়ি রাখে এবং মোহিতলাল মজুমদারের চেয়ে নজরুল ইসলাম যে অনেক বড় কবি, এ সম্পর্কে তারস্বরে আলোচনা জুড়ে দেয়। দু'একজন আবার তৎ-কালীন ফ্যাশান অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গজদন্ত মিনারবাসী আখ্যা দিয়ে খুব এক চোট নিন্দে করে।

সুপ্রকাশের আর একটি শখ হচ্ছে ঘুড়ি ওড়ানো। এই ঘুড়ি ওড়ানোর ব্যাপারটাকে সে আর্টের পর্যায়ে এনে ফেলেছে। বিশেষভাবে অর্ডার দেওয়া শুধু কড়ি টানা দেড়-তে কালো চাঁদিয়াল ঘুড়িই সে ওড়ায়—পাড়ায় অন্য ঘুড়িরসিকরা বলে, ওটা হচ্ছে কালো-চাঁদিয়ালের বাড়ি। তখন বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যেও অনেকের ঘুড়ি ওড়াবার বাতিক ছিল, বাগবাজারে বোসদের বাড়ির মাঠে কিংবা ধর্মতলার ময়দানে সাড়ম্বরে ঘুড়ি-ওড়ানোর প্রতিযোগিতা হতো। সুপ্রকাশ যখন ঘুড়ি ওড়াতো, তখন চুপ করে থাকতো বাড়ির সব ছেলেমেয়েরা। দুর্ধর্ষ বাজপাখির মতন সুপ্রকাশের কালো চাঁদিয়াল ঘুড়ি টহল মারতো ঐ এলাকার আকাশে। কখনো কখনো বাজপাখির মতন ছোঁ মেরে নেমে এসে সেই ঘুড়ি পড়তো অন্য ঘুড়ির ঘাড়ে—সুপ্রকাশের দু-হাত চলতো বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রের মতন, বাচ্চারা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠতো ভো-ম্-মারা!

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘাড় ব্যথা হয়ে আসতো বাদলের, কিন্তু সর্বক্ষণ উত্তেজনায় শরীর টং হয়ে থাকতো। সুপ্রকাশের ঘুড়ি অন্যরা কেটে দিয়েছে, এমন ঘটনা ক্বচিৎ ঘটেছে। যদি বা কখনো কাটতো, সুপ্রকাশের সুতোর হাত্তা ধরতে সচরাচর সাহস করতো না কেউ, কোনো হটকারী দৈবাৎ ধরে ফেললেও সুপ্রকাশ বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠতো, এই এই! মাথা ভেঙে দেবো!—বাড়ির অন্যান্য ছেলেরা ইঁট

পাটকেল হাতে নিয়ে তৈরী হয়ে থাকতো ছুঁড়ে মারার জন্য।

সন্ধ্যে ঘোর হয়ে এলে, আকাশ থেকে পক্ষীরাও ফিরে গেছে বাসায়—সুপ্রকাশ তখন অনবরত সুতো ছেড়ে ছেড়ে ঘুড়ি আরও বাড়িয়ে যেত। কালো চাঁদিয়াল ঘুড়ি একটু অন্ধকার হলেই আকাশের সঙ্গে মিশে যায়—অতি কষ্টে দেখা যায় শুধু ভেতরের সাদা চাঁদটুকু—অনবরত উঁচুতে উঠে উঠে সুপ্রকাশের চাঁদমার্কা ঘুড়ি যেন আকাশের চাঁদ ধরতে যাচ্ছে। ঘুড়িটা সম্পূর্ণ দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে হাতের কাছ থেকে সুতো ছিঁড়ে দিয়ে সুপ্রকাশ সেটাকে পাঠিয়ে দিত নিরুদ্দেশে। একবার আকাশে উড়িয়ে সেই ঘুড়িকে আর মাটিতে নামিয়ে আনতো না সুপ্রকাশ। তারপর সে লাটাই গুটিয়ে দলবল নিয়ে ছাদ থেকে নামতে নামতে গুনগুন করে গান গাইতো পরম তৃপ্তির সঙ্গে। তার গলায় একেবারেই সুর ছিল না অবশ্য।

মাঝে মাঝে দু-একদিন বাদল সকালেই এ বাড়িতে চলে এসে সারাদিন থেকে যেত। তার স্বভাবের মধ্যে মেয়েলিপানা তখনো একটু থেকে গেছে। কিন্তু এ বাড়িতে এসে সে মেয়েদের বদলে ছেলেদের সঙ্গেই বেশী মেশে। এ বাড়িতে ছ'টি মেয়ে ও পাঁচটি ছেলে—তারা বিকেলবেলা সবাই একসঙ্গে খেলাধুলো করলেও সকালে দুপুরে তারা আলাদা আলাদা। স্কুল ছুটি থাকলে দুপুরে ছেলেরা ক্যারাম খেলে কিংবা হুটোপুটি করে, মেয়েরা পুতুলের ঘর সাজায়। বাদলের বেশী ভাব রেণুর খুড়তুতো ভাই বিষ্ণুর সঙ্গে। বিষ্ণু আবার গল্পের বইয়ের পোকা, কত বই সে পড়েছে—বাদল তার নামও জানে না।

এই প্রথম বাদল তার নিজের বাড়ি ছাড়া অন্য একটা পরিবারের মানুষজনকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেল। নিজের বাড়িতে সে কনিষ্ঠ সন্তান, সবাইকেই জন্ম থেকে দেখছে—সুতরাং তাদের অস্তিত্ব আকাশ, জল ও হাওয়ার মতন অবধারিত। কিন্তু এ বাড়ির সকলেই তার চোখে নতুন মানুষ, এদের কথাবার্তা রীতিনীতিও আলাদা। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বাদল টের পেয়ে গেল, এখানে সবাই এক বাড়িতে থাকলেও সকলের মধ্যেই কেমন যেন একটা আলাদা আলাদা ভাব। এমন কি ছোট ছেলেমেয়েরাও কখনো কখনো এটা আমাদের জিনিস, এটা তোমাদের জিনিস—এই রকম বলে। বাড়ির বউরা চেঁচিয়ে ঝগড়া করে পাড়া মাত করে দেয়। রেণুর বাবারা পাঁচ ভাই তিন বোন, তার মধ্যে বড় ভাই মারা গেছেন, তাঁর বড় দুই ছেলে বিবাহিত, এ-বাড়িতেই আছেন। এক বোন বিধবা হয়ে দুটি সন্তান নিয়ে ফিরে এসেছেন এ-বাড়িতে। তা ছাড়া মাসীমা পিসীমা শ্রেণীরও আছে বেশ কয়েকজন—সবার আলাদা আলাদা ঘর। তিনজন ঠাকুর সারাদিন ধরে রান্না করে যাচ্ছে, বাড়ির যার যখন খুশী খেয়ে নেয়।

রেণুর মা খুব ভালোবাসেন বাদলকে। ইতিমধ্যে বাদলের মা-র সঙ্গেও তাঁর খুব ভাব হয়ে গেছে। রত্নপ্রভা বাদলকে দেখলেই জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁ রে, তোর মাকে নিয়ে এলি না কেন? কালকে ঠিক মাকে নিয়ে আসবি, কেমন? রত্নপ্রভা মানুষটি ছোটখাটো, এবং অসম্ভব ভুলো মন। হ্যাঁ রে, চাবিটা কোথায় ফেললুম দেখ তো! কিংবা, এই যা, দুলটা বোধহয় ফেলে এসেছি কলঘরে—এই করতে করতেই তাঁর সারাদিন কেটে যায়। দুপুরবেলা বারান্দায় শীতলপাটি পেতে বাড়ির অন্যান্য কয়েকটি নারীকে ডেকে খুব মন দিয়ে টুয়েন্টি নাইন খেলতে বসেন—অন্য খেলুড়েরা যে তাঁকে বার বার ঠকাচ্ছে, তিনি বুঝতেও পারেন না। রেণুর বাবা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার, সারাদিন তাঁকে দেখা যায় না বাড়িতে।

বস্তুত এ বাড়ির বয়স্ক পুরুষদের প্রায় সকলকেই খুব কম সময় বাড়িতে দেখা

যায়। বাড়িটিতে মহিলা ও শিশুদেরই রাজত্ব। রেণুর পরের ভাই অংশু'র সঙ্গে বাদলের তেমন ভাব হলো না কোনোদিনই। অংশু তার থেকে মাত্র দু' বছরের বড় হলেও হাবভাব পাকা পাকা। তা ছাড়া অংশু সারা বছরই আমাশয় রোগে ভোগে বলে তার মেজাজটাও খিটখিটে।

কোনোদিন সকালবেলা এসে পড়লে বাদল আগে রত্নপ্রভার কাছেই আছে। রত্নপ্রভা যত্ন করে তাকে খাবার খাইয়ে দেন—তারপর বাদল এক ছুট্টে চলে যায় বিষ্ণুদের ঘরে। রেণুরা থাকে দোতলায় উত্তরের দিকের ঘরে, আর বিষ্ণুরা থাকে তিনতলায় একেবারে দক্ষিণে। সুতরাং বাদলকে সারা বাড়িটাই পেরিয়ে যেতে হয়—এ বাড়ির সব কিছুই তার জানা।

বিষ্ণু তার বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে এবং এ বাড়িতে ভাইদের মধ্যে বিষ্ণুর বাবার অবস্থাই খানিকটা স্বচ্ছল। এক ছেলে বলে বিষ্ণুর আদরের শেষ নেই—কত তার খেলনা, কত রকম তার পোশাক। বিষ্ণুর জন্য নিজস্ব একটি চাকর রাখা আছে, বিষ্ণু একটু হোঁচট খেলেই তার মা হা-হা করে ছুটে আসেন। এত আদরেও কিন্তু বিষ্ণুর মাথা খারাপ হয়নি—সে ন্যাকা কিংবা আব্দারে ছেলে হয়নি। প্রায় শিশুকাল থেকেই সে স্বপ্নদেখা মানুষের দলের অন্তর্গত হয়েছে। সে নানান বই পড়ে এবং মনে মনে সংকল্প করে—একদিন সে সমুদ্রের বুকে জাহাজ ভাসিয়ে ম্যাগেলানের মতন ভূপ্রদক্ষিণ করবে। কিংবা, যে এভারেস্টের চূড়ায় এ পর্যন্ত কোনো মানুষ উঠতে পরেনি, একদিন বিষ্ণু নিশ্চয়ই সেখনে উঠবে। সে বাদলকে জিজ্ঞেস করে, তুই আমার সঙ্গে যাবি?

বাদলের চোখে এ বাড়ির সবচেয়ে বিস্ময়কর মানুষ ছিলেন হৈমন্তী। একবার তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না। হৈমন্তীর মতন লম্বা চেহারার মহিলা বাদল আগে কখনো দেখেনি, পরেও দেখেনি। শুধু লম্বা নয়, হৈমন্তীর স্বাস্থ্যও ছিল সেই রকম ভালো, সব মিলিয়ে বিশাল নারী। ঐ শারীরিক বিরাটত্বের জন্য মনে মনে হৈমন্তীর নিশ্চয়ই খুব লজ্জা ছিল, কেননা তাঁর মুখখানা ছিল লাজুক শিশুর মতন। অন্য যে-কোনো নারীর চেয়ে হৈমন্তী ছিলেন লম্বায় অন্তত আধ হাত উঁচু। ছেলেবেলায় সব কিছুই বড় মনে হয়, বাদলের মনে হতো হৈমন্তীর মত আকারের কোনো মানুষ পৃথিবীতে আর কোথাও নেই, থাকতে পারে না। কিছুদিন আগেই সে স্কুলে জ্যাক অ্যান্ড দা বীন স্টকের গল্পটা পড়েছিল। একটা সীম গাছ বেয়ে বেয়ে মেঘের মধ্যে উঠে গেলে সেখানে থাকে এক কৃপণ দৈত্য আর তার বৌ। হৈমন্তীকে দেখলেই বাদলের মনে পড়তো সেই দৈত্যের বউয়ের কথা। সেই দৈত্যের বউয়েরই মতন দয়াবতী ছিলেন হৈমন্তী।

তিনতলায় বিষ্ণুদের ঘরের কাছেই হৈমন্তীর ঘর। ঝকঝকে তকতকে করে সাজানো। কেন কে জানে, হৈমন্তীর ঘরে বাড়ির অন্য কেউ বিশেষ আসে না। সমস্ত দিন, বিকেল, সন্ধ্যে ও রাত্রি হৈমন্তীর অসীম নিঃসঙ্গতা ভরা। কোনো কোনো সন্ধ্যেবেলা তাঁর ঘর থেকে ভেসে আসতো অর্গানের আওয়াজ, রীডগুলোর ওপর যেন আক্রোশভরে জোরে জোরে চাপ দিচ্ছেন হৈমন্তী। এ কথা জানতে বাদলের বহু দিন লেগে গিয়েছিল যে হৈমন্তীর স্বামী শঙ্করনাথ এক থিয়েটারের অভিনেত্রীকে নিয়ে আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকেন রামবাগানে। মাসে একবার কি দুবার তিনি এ বাড়িতে আসেন। তখন তাঁর অসম্ভব তিরিক্ষে মেজাজ, টাকা-পয়সার হিসেব ছাড়া আর কোনো বিষয়ে কারুর সঙ্গে কথা বলেন না।

একদিন সকালবেলা বাদল যাচ্ছিল বিষ্ণুদের ঘরে, হৈমন্তী তখন উল্টো দিকের

কলঘর থেকে স্নান সেরে নিজের ঘরে আসছিলেন। গায়ে ভিজে শাড়িটা জড়ানো, সমস্ত শরীরটা স্পষ্ট। বাদলের বুকের ভেতর ছমছম করে উঠলো। বাদলের তখন সবে ন' বছর পূর্ণ হয়েছে, কোনো নারীকে দেখে বুকের ভেতর ছমছমানি জাগার সেই শুরু। লজ্জায় মুখ নিচু করার বদলে সে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে রইলো হৈমন্তীর দিকে। মায়ের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে যে বিস্ময় নিয়ে সে মড়া পোড়ানো দেখে, সেই জাতীয় বিস্ময় নিয়েই সে দেখতে লাগলো এই অতি-জীবিত শরীর। মর্মর মূর্তির মতন সুগঠিত হৈমন্তীর দেহে পাতলা ভিজে শাড়িটি জড়ানো—স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তাঁর তাজা বাতাবি লেবুর মতন দুই স্তন, তাদের চূড়ায় গোলাপী আভা। থুতনি থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে। পিঠখানা সোনার ঢালের মতন। অত বড় শরীরের তুলনায় আশ্চর্য রকমের সরু কোমর। অনাবৃত পেটে ছোট্ট নাভি। নিতম্বের ওপর শাড়ীটা কুঁকড়ে আছে, জঙ্ঘার খাঁজ স্পষ্ট। এই সব রমণীর শরীরে একটা অসম্ভব তেজী আহ্বান থাকে। ইহকাল পরকাল লুপ্ত-করা ডাক শোনা যায়। মসৃণ উরুর কাছে হৈমন্তীর একটা হাত রাখা, অন্য হাতে ভিজে সেমিজ ও ব্লাউজ। সেই দেব-দুর্লভ রূপ এক মিনিটের মধ্যে বাদলের চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। হৈমন্তী বাদলকে দেখতে পাননি। আশেপাশে কোনো পুরুষের উপস্থিতি মেয়েরা ঘুমন্ত অবস্থাতেও বুঝতে পারে। এমনকি পিঠের দিকে, তাদের দৃশ্য-অনুভূতি থাকে। বাদল নেহাত ছেলেমানুষ, তাই খেয়াল করেননি হৈমন্তী।

বাদল এর আগে এই একই রকম অবস্থায় কতবার নিজের মাকে দেখেছে, তার দিদিদেরও দেখেছে। কিংবা আসলে দেখেনি। এই প্রথম সে দেখলো, কাকে বলে নারী। কিন্তু ঐটুকু ছেলে তো, প্রথম দেখার ঝাপটায় অবসন্ন বোধ করল সে, বেশ কিছুক্ষণ তারপর কথা বলতে পারেনি। তার বোঝার কোনো ক্ষমতাই ছিল না যে তার মধ্যে কি ব্যাপার ঘটে গেল। এর পরেও আরও বেশ কয়েক বছর সে এ ব্যাপারে আবার ঘুমন্ত ছিল। কিন্তু এই দৃশ্যটা তার মনে চিরস্থায়ী হয়ে এঁকে যায়।

বিষ্ণুর সঙ্গে হৈমন্তীর কাছে বাদল তারপর কয়েকবার গেছে। ওদের দেখলে হৈমন্তী খুব খুশী হয়ে উঠতেন, অনর্গল গল্প জুড়ে দিয়ে আর ছাড়তেই চাইতেন না। চাকরকে দিয়ে তেলেভাজা বেগুনি—ফুলুরি আর আলু কাবলি আনতে দিতেন। এই সব খাবারই তাঁর পছন্দ ছিল, বেশী ভালোবাসতেন টক খেতে। আলু কাবলি খেতে খেতে টক আর ঝালের রমণীয় সুস্বাদে জিভ দিয়ে টকাস টকাস শব্দ করেন, অবিকল ছেলেমানুষের ভঙ্গিতে—এমন কি খাটে বসে পা দোলানও সেই রকম। এত বড় চেহারার একটি শিশু, তাঁর জীবনে এই রকম কষ্ট প্রাপ্য ছিল না।

হৈমন্তী যখন বাদলের মাথার চুলে হাত দিয়ে আদর করতেন, বাদল একেবারে লজ্জায় লাল হয়ে যেত। এত লজ্জা তার কোথা থেকে আসে, সে বুঝতে পারে না। হৈমন্তী ঠিক দিদির মতন স্নেহে বাদলের বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, প্রত্যেক দিনই একটা না একটা কিছু উপহার দেন। হৈমন্তী বাদলকে একটা চমৎকার মাউথ অর্গান দিয়েছিলেন।

হৈমন্তী সম্পর্কে আর একটি দৃশ্যও বাদলের খুব মনে আছে। শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে একেবারে চলে যাবার আগে হৈমন্তী এ বাড়ির নৈতিকতায় বেশ একটা ঘা দিয়ে-ছিলেন। তাঁর নিঃসঙ্গতা অসহ্য হয়ে ওঠার পর তিনি সুপ্রকাশের কলেজে পড়া বন্ধু-দের নিজের ঘরে ডেকে নিলেন। একতলার বৈঠকখানা থেকে কি উপায়ে তারা তিনতলায় উঠে এলো, সেটা একটা রহস্য বটে, কিন্তু এই ছেলেরা সকাল বিকেল নিয়মিত আসতে

লাগলো এখানে। সুপ্রকাশও হঠাৎ খুব ভক্ত হয়ে গেল তার কাকীমার। ঐ ঘর থেকে তখন প্রায়ই শোনা যায় হাসির আওয়াজ ও হৈ-হৈ করে গল্পগুজব, কখনো কখনো কোরাস গান ভেসে আসে—। শোনা গেল, হৈমন্তীর ঘরে থিয়েটারের রিহার্সাল চলছে।

বলাই বাহুল্য, বাড়ির সকলে এই ব্যাপার মোটেই ভালো চোখে দেখলো না। কিন্তু যে-হেতু এ পরিবারের একজন কেউ সর্বময় কর্তা নেই, ভাইরা সবাই স্বাবলম্বী ও সম্পত্তির অংশ পেয়ে গেছে—তাই কেউ কারুর শাসন মানে না। আড়ালে নিন্দা করা ছাড়া আর কোনো শাসনের উপায় নেই। পরনিন্দার ভ্রূক্ষেপ নেই হৈমন্তীর।

একদিন শেষ বিকেলে বাদল ঐ বাড়ির সব বাচ্চাদের সঙ্গে নিচের উঠোনে খেলা করছিল, হঠাৎ সচকিত হয়ে দেখলো, তিনতলার সেই ভাঙ্গা ব্যালকনিতে এসে হৈমন্তী দাঁড়িয়েছেন, হাসতে হাসতে দুলে পড়ছেন। যে ব্যালকনিতে শিশুদের যাওয়া নিষেধ, সেখানে হৈমন্তীর মতন বিশাল চেহারার একজন—সবাই ভয়ে আঁতকে উঠলো। কয়েকজন যুবক দূর থেকে আতঙ্কিত হয়ে বলছে, এ কি করছেন, এ কি করছেন, চলে আসুন! হৈমন্তী তত বেশী হাসছেন।

কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি অবশ্য। কয়েকটি চাপড়া ঝুপ ঝুপ করে ভেঙে পড়লো নীচে। হাস্যমুখে হৈমন্তী পা ঠুকে ঠুকে আরও ভাঙতে লাগলেন।

বেশ কিছু বছর পর হৈমন্তীর সঙ্গে আবার দেখা হলে বাদল এই দৃশ্যটার কথা উল্লেখ করেছিল। হৈমন্তী তখনও হেসেছিলেন।

॥ ৭ ॥

চিররঞ্জন এই পৃথিবীর একজন হেরে যাওয়া মানুষ। প্রথম যৌবনে যখন শরীর সোজা থাকে, স্নায়ু সব সময় সজাগ, আনন্দের উপকরণ আপনা থেকে চলে আসে কাছে, একা একা হেঁটে যাবার সময় গোপনে মনে হয় এই পৃথিবীটা আমার—সেই সময়েই তিনি পর পর দুটি আঘাত পেয়েছিলেন, তাতে তাঁর মন ভেঙে যায়। আর রুখে দাঁড়াতে পারেন নি, বরং নিরাসক্ত হয়ে যান। পৃথিবীতে দাপটের সঙ্গে বেঁচে থাকার বদলে আরও কিছুদিন কাটিয়ে যাবার মনোভাব দেখা দেয়। কোনো জায়গায় চিররঞ্জন উপস্থিত থাকলেও তাঁর উপস্থিতি সহজে বোঝা যায় না।

যদিও প্রথম জীবনটা চিররঞ্জন ভালোই শুরু করেছিলেন। গ্রামের মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসতে পেরেছিলেন নিজের চেষ্টায়। তাঁর বাবা সারদারঞ্জনের কাছে ম্যাট্রিক পরীক্ষাই ছিল শিক্ষার চূড়ান্ত মান। সদরের হাইস্কুলে প্রতি বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয় দশ বারোটি ছেলে, তার মধ্যে পাশ করে দুটি ব তিনটি, তারাই বংশের মুখ উজ্জ্বল করা সন্তান। অত খেটে খুটে পরীক্ষা পাশ করার পর ছেলেরা চাকরি বাকরি যোগাড় করবে—গভর্নমেন্টের চাকরি হলে তো কথাই নেই। সারদারঞ্জনের ইচ্ছে তারপর ছেলেদের বিয়ে দিয়ে ঘরে বউ আনবেন, নাতি-নাতনীতে সংসার ভরে যাবে। সুখ তো এরই নাম। বড় ছেলে প্রিয়রঞ্জন একবারেই ম্যাট্রিক পাশ করে অল্পদিনের মধ্যেই চাকরিও পেয়ে গিয়েছিলেন, বিয়েও দেওয়া হয়েছিল যথারীতি। কিন্তু চিররঞ্জনের শখ হলো কলেজে পড়ার।

খরচ চালাবার জন্য নিজেরই চেষ্টায় চিররঞ্জন কলকাতার একটি বাড়িতে থাকা-খাওয়ার টিউশানি যোগাড় করে নিয়েছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই পরিবারটি খুব

ভালো, সকলের ব্যবহার বেশ আন্তরিক। আমহার্স্ট স্ট্রীটের রায়বাড়িতে চিররঞ্জন দুটি ছেলের গৃহশিক্ষক, এক তলায় একটি ঘর পেয়েছেন—সকালবেলার জলখাবার আসে ওপর তলা থেকে, তবে দুপুর আর রাত্তিরের খাবারটা খেয়ে নিতে হয় বরোয়ারি রান্নাঘরে গিয়ে। রান্নার ঠাকুররা বাড়ির মাস্টারকে একটু অবজ্ঞা করে, মাছের টুকরো প্রায়ই অদৃশ্য হয়ে যায়, কিন্তু চিররঞ্জন তা নিয়ে কখনো অভিযোগ করেন নি। ছাত্রদের বিধবা পিসীমা মলিনা তাঁকে খুব স্নেহ করেন, প্রায়ই খোঁজ খবর নেন। বাড়িতে নারায়ণের পুজো হয় নিত্য তিরিশ দিন, যদি কোনোদিন পুরুতঠাকুর আসতে না পারেন, তখন চিররঞ্জনকেই নমো নমো করে ঘণ্টা নাড়তে হয়।

চিররঞ্জন আই-এ পাশ করার পর সারদারঞ্জন ছেলেকে আর একবার তাড়া দিলেন দেশে ফেরার জন্য। তিনি তখন ছেলের জন্য চারদিকে পাত্রী দেখে বেড়াচ্ছেন—তাঁর এই ছেলে দুটো পাশ দিয়েছে, এখন তার বাজার দর অনেক বেশী। তা ছাড়া কলকাতা শহরে কত রকম ডাকিনী-যোগিনী ঘুরে বেড়ায়—বয়েসকালের ছেলেকে কি সেখানে একা ফেলে রাখতে আছে! সিনেমা-থিয়েটারে যোগ দিয়েই বেশ্যাপল্লীর মেয়েগুলো এক একজন দেবী হয়ে উঠছেন! ঘরের বউরাও ঐ ম্লেচ্ছ শহরে ফিটনে চেপে বরের সঙ্গে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে যায়!

কিন্তু চিররঞ্জন গ্র্যাজুয়েট না হয়ে ছাড়বেন না। তার আগে বিয়েও করবেন না। এদিকে মলিনার সঙ্গে তাঁর স্নেহ-মমতার সম্পর্ক আস্তে আস্তে প্লেটনিক প্রেমের দিকে মোড় নিচ্ছে।

বি-এ পরীক্ষা দেবার পর চিররঞ্জন দেশে ফেরার জন্য তৈরি হলেন। তখনও রেজাল্ট বেরোয়নি। ততদিনে সারদারঞ্জন অনেক দেখাদেখি করে তিন জায়গায় ছেলের বিয়ের সম্পর্ক প্রায় ঠিক করে ফেলেছেন, এখন দর কষাকষি চলছে। সেই সময় পরীক্ষা দিয়েই ছাত্ররা এগজামিনারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতো রেজাল্ট জানার জন্য। তখন ছাত্রসংখ্যা এত বিপুল ছিল না—এগজামিনারও ছিল বাঁধা-ধরা। তাঁদের বাড়ির সামনে লম্বা লাইন পড়তো সকাল থেকে—এগজামিনারের কোনো দয়ালু-হৃদয় আত্মীয় এক একজনের রোল নাম্বার দেখে নিয়ে নাম্বার বলে দিতেন।

চিররঞ্জন পরীক্ষা মোটামুটি ভালোই দিয়েছিল, মনে কোনো আশংকা ছিল না --তবু হঠাৎ খবর পেলেন তিনি অংকে ফেল করেছেন! নিজেই গরজ করে তিনি অর্থনীতির সঙ্গে অঙ্ক কম্বিনেশান নিয়েছিলেন। খবর শুনে চিররঞ্জনের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো! পরের বাড়িতে আশ্রিত থেকে যারা লেখাপড়া করে, তাদের পক্ষে ফেল করা যে কতখানি গ্লানির ব্যাপার, তা অন্য কেউ বুঝবে না। এখন কি উপায়? এরপর আর আমহার্স্ট স্ট্রীটের রায়বাড়িতেও সম্মানের সঙ্গে থাকা যাবে না!

চিররঞ্জনের এক বন্ধু পরামর্শ দিলেন স্যার আশুতোষ নাকি গরীব ছাত্রদের অবস্থা শুনলে দু-এক সাবজেক্টে ফেল হলেও পাশ করিয়ে দেন। বন্ধু ভবশংকরের সঙ্গে চিররঞ্জন একদিন গেলেন রসা রোডে স্যার আশুতোষের বাড়িতে। সকালবেলা লোকজনের ভিড়ে দেখা করাই যায় না। একটু দুপুর-দুপুরে দুই বন্ধু সট করে ঢুকে পড়লেন ভেতরে। বাংলার বাঘ তখন স্নানের আগে তেল মাখছেন। মস্ত বড় গোঁফসমেত বিরাট মুখখানা তুলে জিজ্ঞেস করলেন, আবার কি হলো? কি চাই তোদের, অ্যাঁ?

লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে চিররঞ্জনকে কি বললেন তা শোনাই গেল না। নগ্নগাত্র স্যার আশুতোষ হুঙ্কার দিলেন, পেন্নাম করলিনে?

দুই যুবা তখনই বসে পড়ে ঝুপঝাপ করে প্রণাম করলো পায়ে হাত দিয়ে। চাকরকে দিয়ে তেল মাখাতে মাখাতে স্যার আশুতোষ সব শুনলেন, খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন চিররঞ্জনের পরিবারের খবর, গ্রামের খবর। কিন্তু পাশ করিয়ে দিতে রাজী হলেন না। ধমকে বললেন, ফেল করেছো, আবার পড়ো ইউনিভার্সিটিতে; কি আমি দানছত্তর খুলেছি? খরচ চালাতে না পারো, কলেজের ফি মকুব করে দেবার ব্যবস্থা করবো। তোমার থেকে আরও অনেক গরীব ছেলে ভালো রেজাল্ট করে!

চিররঞ্জন নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন। দুঃখে-লজ্জায় আমহার্স্ট স্ট্রীটের রায়বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন। ভেসে বেড়াচ্ছেন এখানে-সেখানে।। এই সময় হঠাৎ তাঁর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল এক লগ্নছাড়া পাত্রীর সঙ্গে। এই পাত্রীপক্ষ ফেল করার খবর শুনে চিররঞ্জনকে একবার বাতিল করেছিল, পরে তারাই আবার সাধাসাধি করতে এলো নিজেদের গরজে। নববধূ বেশ সুন্দরী, শ্বশুর বড়লোক—চিররঞ্জন কিছুদিন কাটালেন আমোদ আহ্লাদে। শ্বশুরবাড়িরই উদ্যোগে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ (হোম) পুলিস বিভাগে একটা চাকরিও জুটে গেল তাঁর। পাকা চাকরি, কম কাজ, উপরি আছে। সরকারী চাকরি সে আমলে ছিল স্বর্ণপ্রসূ হাঁসের মতন। কাজ না করলেও চাকরি যাবার সম্ভাবনা নেই। করপোরেশন অফিসে চেয়ারে কোট ঝুলিয়ে সরে পড়া কিংবা সরকারী অফিসে সাহেবের গতিবিধি অনুযায়ী টিফিন করা ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। ঘুষের সুযোগ প্রায় সব বিভাগেই। বিয়ের বাজারে সরকারী চাকুরে পাত্রকে প্রকাশ্যেই জিজ্ঞেস করা হতো—মাইনে কত, আর উপরি কত? মাইনে খুব কম, উপরি তার তিন-চার গুণ। ব্রিটিশ শাসকরাই খুব সযত্নে এই ব্যবস্থাটি পাকা করে রেখে-ছিল। দেশের একটি মুষ্টিমেয় শ্রেণীকে কিছু বেশী সুবিধা দিলে বাকি লোকদের শোষণ করার অনেক সুবিধে হয়। দেশের মানুষ পরস্পরকে অবিশ্বাস করে, লাভ হয় বিদেশীদের। তবে দেশ স্বাধীন হবার পরও যে এই ব্যবস্থা টিঁকে থাকবে—তা বোধহয় ব্রিটিশরাও কল্পনা করতে পারে নি।

এমন ভালো চাকরি থেকেও চিররঞ্জন হঠাৎ একদিন বরখাস্ত হয়ে গেলেন। হোম পুলিস বিভাগে কাজ করে যে ব্যক্তি, তারই ভাই খুন করেছে সাহেব পুলিস কমিশনারকে, এ যে বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা! শুধু যে এই চাকরিটাই গেল, তা নয়, সমস্ত রকম সরকারী চাকরির দরজা চিরকালের মতন বন্ধ হয়ে গেল। এর পরেও নিস্তার নেই, চিররঞ্জন লক্ষ্য করলেন, তিনি যেখানেই যান সব সময় দু'জন লোক ছায়ার মতন তাঁর পেছনে পেছনে ঘোরে। নিদারুণ ত্রাসে চিররঞ্জনের সারাটা দিন কাটে। কোথাও চাকরি খুঁজতে যাওয়ারও উৎসাহ পান না। তাঁর ছোট ভাই ওরকম একটা কান্ড করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, এজন্য শোক করারও অবকাশ নেই, নিজের চিন্তাই তখন প্রবল।

চাকরি পাবার পর স্ত্রী আর কন্যাকে নিয়ে সবে মাত্র সংসার পেতেছিলেন কলকাতায়, সে সংসার ভেঙে দিতে হলো। ততদিনে সারদারঞ্জন মারা গেছেন, দেশের বাড়িতে থাকাও নিরাপদ নয়। বড় ভাই প্রিয়রঞ্জন বরিশাল শহরে বাসা করেছেন, সেখানে থাকার জন্য আহ্বান জানালেন ও'দের। কিন্তু দাদার সংসারে বোঝা বাড়ানোর বদলে অনেক ভেবেচিন্তে শ্বশুর বাড়িতে গিয়েই আশ্রয় নিলেন—তাঁদের বিরাট বড় সংসার, এমন কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না।

শুরু হয়ে গেল চিররঞ্জনের আশ্রিত জীবন। ছাত্র বয়েসেও তিনি পরের বাড়িতে থেকেছেন, তারপর থেকে সারাটা জীবনই প্রায় তাঁকে পরের বাড়িতে কাটিয়ে যেতে

হলো। বাকি জীবনটা চিররঞ্জন আর বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি, সেই উদ্যমই হারিয়ে ফেলেছিলেন। মাঝে মাঝে আরও কয়েকটা চাকরি করেছেন, একবার ব্যবসা করতেও গিয়েছিলেন, কোনোটাই ঠিক মতন দানা বাঁধলো না। চিররঞ্জনের শ্বশুর একজন নামকরা পণ্ডিত লোক, আবার সাংসারিক ব্যাপারেও খুব অভিজ্ঞ, এই জামাইটিকে তিনি জীবনে দাঁড় করিয়ে দেবার অনেক রকম চেষ্টা করছেন, কিন্তু যার নিজের পায়েই জোর নেই, সে দাঁড়াবে কি করে! শ্বশুরের সুপারিশে পাওয়া দিল্লিতে একটা ভালো চাকরিতেও চিররঞ্জনের মন বসলো না।

শুভাথীদের পরামর্শে কিছুদিন নিজের গ্রামে গিয়ে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার সেজেও বসেছিলেন। গ্রামে তখনও ডাক্তারের অভাব। মেটিরিয়া মেডিকা একখানা কিনে আর কিছু ওষুধ-পত্তর নিয়েই হোমিওপ্যাথি শুরু করা যায়। কিন্তু যে-লোক সত্যিই ডাক্তারি বিদ্যে জানে না, তাকে ডাক্তার সাজতে হলে মিথ্যে কথা বলায় খুব ধুরন্ধর হতে হয়। চিররঞ্জনের সে গুণও ছিল না। তার ফলে, কেশো রুগী চোর কিংবা মুখচোরা বার-বণিতাদের যা অবস্থা হয়, চিররঞ্জনেরও তাই হলো। কিছু অর্থদণ্ড দিয়ে ডাক্তারখানার ঝাঁপ ফেলে দিলেন।

স্ত্রী-কন্যাকে শ্বশুরবাড়ি রেখে চিররঞ্জন মাঝে মাঝে চলে আসেন কলকাতায় কাজের খোঁজে। এই বিরাট শহরের ভিড়ে মিশে থাকতে তাঁর ভালো লাগে। চিররঞ্জনের চেহারাটা খুব রোগা পাতলা, এখন অল্প বয়েসেই তাকে খানিকটা বুড়োটে দেখায়। মাঝে মাঝে যান আমহার্স্ট স্ট্রীটের সেই রায়বাড়িতে। তাঁর ছাত্র দু'জনের মধ্যে একজন ব্যারিস্টারী পড়তে গেছে বিলেতে, একজন পৈতৃক ব্যবসা দেখছে—সে বেশ খাতির করে মাস্টারমশাইকে। প্রায়ই সে মাস্টারমশাইকে একটা-না-একটা চাকরির প্রস্তাব দেয়, চিররঞ্জন প্রত্যেকটিই প্রত্যাখ্যান করেন হাসিমুখে। স্যার আশুতোষ মারা গেছেন। এ বাড়িতে মলিনারও বয়েস বেড়েছে বোঝা যায়, চুলে সাদা ছোপ ধরেছে একটু। নিয়মিত সন্ধ্যেবেলা এসে চিররঞ্জন মলিনার থেকে তিন-চার হাত দূরত্ব রেখে বসে গল্প করে যান ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কখনো কখনো দু'জনের কেউই একটাও কথা বলেন না, দুই দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন চুপচাপ। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, এ'দের দু'জনের মধ্যে কোনো একটা জায়গায় খুব মিল আছে।

চিররঞ্জন তখন কলকাতায় একটা কো-অপারেটিভ মেস-এর মানেজার। চাকুরে বাবুদের মেস, একমাত্র চিররঞ্জনকেই নির্দিষ্ট হিসেবে অফিসে যেতে হয় না বলে তাঁকে ম্যানেজার করে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর চার্জ অর্ধেক। এই সময় টেলিগ্রাম পেলেন শ্বশুরবাড়িতে তাঁর স্ত্রী আর একটি সন্তান প্রসব করেছেন, এবার পুত্র। খবরটা পেয়ে চিররঞ্জন প্রথম দু'দিন বিষণ্ণ হয়ে রইলেন। অনুভব করলেন, সংসার তাঁকে আরও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াচ্ছে। যাঁর স্ত্রীকে চিরকাল বাপের বাড়ি ফেলে রাখতে হয়, তাঁর পুত্র-কন্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আনন্দিত হবার কথা নয়। টেলিগ্রাম পেয়েও চিররঞ্জন গেলেন না। কয়েকদিন পর চিঠিতে বিস্তারিত খবর এলো। বর্ষাকাল সেবার ঝড়-বৃষ্টির প্রকোপ অত্যন্ত বেশী, আঁতুড়ঘরের চাল উড়ে গিয়েছিল, কয়েকটি দিন খুব সংকটজনক অবস্থায় কেটেছে জননী ও নবজাতকের। ছেলের নাম রাখা হয়েছে বাদল।

এই চিঠি পেয়ে চিররঞ্জন হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। যেন তাঁর মনে হলো এই ছেলেই তাঁর সব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে। নিজের জীবনে তিনি যা পারেন নি, এই ছেলে সার্থক করবে সেই স্বপ্ন। পুন্নাম নরকের ভয় ছিল না চিররঞ্জনের, কিন্তু পুত্রই পিতাকে ভরসা দেয়। খেয়ালের মাথায় এক রাশ টাকা ধার করে তিনি স্ত্রীর

জন্য শাড়ি এবং ছেলের জন্য বিলিতি খেলনা পাঠালেন পার্সেল করে।

বড় ভাই প্রিয়রঞ্জন বেশ গুছিয়ে নিয়েছিলেন বরিশালে। ফরিদপুরে নিজেদের বাড়িতে বিশ্বরঞ্জনের খোঁজে তখনও ঘন ঘন পুলিশ আসে, তাই দেশের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় চুকিয়েই দিয়েছিলেন একরকম। ছোট ভাই নিখিলরঞ্জন তাঁর কাছেই থাকে, পড়াশুনোয় মাথা নেই, ম্যাট্রিক পাশ করতে পারে নি শেষ পর্যন্ত। বি. এম. কলেজের উল্টোদিকে প্রিয়রঞ্জন একটা কাগজ-কলম-পেন্সিল-এর দোকান খুলে ছোট ভাইকে বসিয়ে দিলেন সেখানে। দোকানটা দেখতে দেখতে বেড়ে উঠলো।

প্রিয়রঞ্জন একটু রগচটা ধরনের মানুষ। ছোট ভাইয়ের সামান্য দোষ-ত্রুটি দেখলেই মারধোর করতেন। নিখিলরঞ্জন যখন বড় রকমের একটা কেলেংকারি করে ফেললেন, তখন প্রিয়রঞ্জন এমন মার খেতে লাগলেন যে, পাড়া-প্রতিবেশীরা এসে না আটকালে একটা কিছু অঘটন ঘটে যেত। হাঁপাতে হাঁপাতে প্রিয়রঞ্জন বলেছিলেন, মারবো না তো কি করবো? নিজের ভাইকে তো পুলিশে দিতে পারি না? আহত নিখিলরঞ্জন ধুঁকতে ধুঁকতেই সে রাত্রে বাড়ি থেকে সরে পড়লেন। এক মাস বাদে চিঠি এলো আসাম থেকে, দাদা আমি ভালো আছি। আমার জন্য চিন্তা করিও না। আমি ঠাকুরের পাদপদ্মে আশ্রয় পাইয়াছি।—সেই থেকে নিখিলরঞ্জন রামকৃষ্ণ মিশনে—সাদা কাপড় থেকে আস্তে আস্তে গেরুয়া পেয়েছেন।

চাকরির থেকেও কাগজের দোকানের ব্যবসাতেই প্রিয়রঞ্জনের বেশী উন্নতি হতে লাগলো। অমরনাথ যখন কলকাতায় এসে বাড়ি কিনলেন, তখন প্রিয়রঞ্জন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে সেই সঙ্গে কলকাতার ব্যবসার বাজারটিও পর্যবেক্ষণ করলেন। তাঁর তীক্ষ্ম চোখে বড় শহরের বিস্তৃত সুযোগটা ঠিক ধরা পড়লো। চাকরি ছেড়ে প্রিয়রঞ্জন কলকাতাতেই ব্যবসা করবেন ঠিক করে ফেললেন। অমরনাথের অত বড় বাড়ি, থাকারও কোনো অসুবিধে নেই। উদাসীন প্রকৃতির অমরনাথ এ প্রস্তাবে এক কথাতেই রাজী, এমন কি প্রিয়রঞ্জনের পীড়াপীড়িতে তিনি ও'র কাগজের ব্যবসায় লগ্নিও করলেন কিছু টাকা। এক বছরের মধ্যে প্রিয়রঞ্জনের দোকানের দুটি শাখা স্থাপিত হলো কলকাতায়—তিনি চিররঞ্জনকে সপরিবারে টেনে আনলেন এ বাড়িতে এবং প্রায় জোর করেই ছোট ভাইকে পার্টনার করে নিলেন ব্যবসায়। যদিও তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন, এ ভাইটির কাছ থেকে বিশেষ কিছু কাজ পাওয়া যাবে না।

এ বাড়িতে অমরনাথ কর্তা হলেও দেখাশুনোর সব ভার প্রিয়রঞ্জনের। বাড়ির চুনকাম থেকে বাথরুমের দরজা সারানোর তদারকি তিনিই করেন। কোথায় কলের মিস্ত্রি পাওয়া যায়, সিমেন্ট কোথায় সস্তা—এসব তাঁর নখদর্পণে। প্রিয়রঞ্জনের স্ত্রী সুপ্রভাই বাড়ির গৃহিণী। সুপ্রভা একটু বেশী মুখরা—এ ছাড়া সংসার সামলাবার সব গুণই তাঁর আছে। ঝি অনুপস্থিত হলে বাড়ির তিনতলা থেকে একতলা তিনি নিজেই ধুয়ে মুছে ফেলতে পারেন। কার পাতে ক'টুকরো মাছ পড়বে সেদিকেও তাঁর সমান দৃষ্টি। ঝি চাকরদের ওপর তিনি একটু বেশী অত্যাচার করেন বটে, কিন্তু চিররঞ্জনের স্ত্রী হিমানীকে কখনো ঘাঁটান না। হিমানী বড়লোকের মেয়ে—এজন্য তাঁর মনে একটু সমীহের ভাব আছে। যদিও সুপ্রভার স্বামীর অবস্থা এখন যথেষ্ট সচ্ছল—কিন্তু তিনি সাধারণ গরীব ঘরের মেয়ে—এই মানসিক বৈষম্য কখনো ঘোচে নি।

শ্বশুরবাড়ি থেকে স্ত্রী ও সন্তানদের নিজের কাছে এনে রেখেছেন বটে, তবু চিররঞ্জনের মনে সুখ নেই তেমন। এটাও তো পরেরই বাড়ি। তিনি পরবাসী হয়েই রইলেন। মাঝে মাঝে কাগজের দোকানে গিয়ে বসেন, কখনো-সখনো আলাদাভাবে তিনি

নিজেও কিছু রোজগার করে ফেলেন কোনো উপায়ে—তখন বাড়ির সকলকে কিছু-না-কিছু উপহার কিনে দেন। মোটমাট তিনি সারা জীবন বেকার হয়েই রইলেন। আগেও কম কথা বলতেন, এখন প্রতাপশালী দাদার ছত্রছায়ায় আরও চুপচাপ হয়ে যেতে লাগলেন ক্রমশ। সাংসারিক কোনো ব্যাপারে তিনি মাথা ঘামান না।

যে-কোনো কারণেই হোক প্রিয়রঞ্জনের চেয়ে চিররঞ্জনকেই বেশী পছন্দ করে ফেললেন অমরনাথ। এই নিরাসক্ত মানুষটির প্রতি তাঁর কৌতূহল জাগ্রত হয়েছিল। প্রিয়রঞ্জনের সঙ্গে কাজের কথা, দরকারী কথা সেরে নিতেন চট করে, আর চিররঞ্জনের সঙ্গে প্রাণের কথা বলতেন। অমরনাথ একটু ভালো করেই বুঝতেন যে ব্যবহারিক সুবিধের জন্য প্রিয়রঞ্জন তাঁকে খাতির করলেও মনে মনে তাঁকে পছন্দ করেন না। অমরনাথ একসময় প্রিয়রঞ্জনের নিজের বোনকে কষ্ট দিয়েছিলেন, মুসলমান নর্তকীর সঙ্গে বসবাস করেছেন, এসব প্রিয়রঞ্জন কখনই পুরো ক্ষমা করতে পারবেন না। নেহাত বাইরে বাইরে মানিয়ে চলছেন। চিররঞ্জন ওসব পুরোনো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান না। অমরনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, চিররঞ্জন চুপচাপ থাকলেও আশেপাশের সব কিছুই খুব সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করার একটা প্রবণতা আছে তাঁর মধ্যে। এই এক ধরনের মানুষ, যারা ইচ্ছে করে ঠকে। অর্থাৎ যে ঠকাচ্ছে, তাকেও বুঝতে দেয় না যে সে তো বুঝেসুঝেই ঠকছে। অন্যদের মূর্খতা দেখে যে মনে মনে হাসে, অথচ নিজে কখনো তার ওপর টেক্কা দেবার জন্য বেশী চালাকের মতন ব্যবহার করে না। এই নেশায় যারা মজে যায়, তারা সুখী হয় কিনা সেটা বিতর্কের বিষয়, কিন্তু তারা জীবনে উন্নতি করার চেষ্টায় মাতে না কখনো।

অমরনাথ ক্রমশ জানতে পেরেছিলেন, চিররঞ্জন কয়েকটি নিজস্ব ধারনা মিলিয়ে এক ধরনের দর্শন গড়ে তুলেছেন। সেই দর্শনের মধ্যে খানিকটা সিনিসিজম আছে, তবু শুনলে হঠাৎ চমকে উঠতে হয়।

প্রিয়রঞ্জন একদিন বাড়িতে ঢুকলেন চিৎকার করতে করতে। সদর দরজার সামনেই পাশের বস্তির ছেলেরা হেগে রেখে গেছে, প্রিয়রঞ্জন অন্যমনস্কভাবে তাতে পা দিয়ে ফেলেছেন। ঘেন্নায় ছটফট করছেন একেবারে। বালতি বালতি জল ঢেলে পা ধোওয়া হলো, তবু ঘেন্না যায় না। সুপ্রভা মাথায় গঙ্গার জল ছিটিয়ে দিলেন। প্রিয়রঞ্জন তবু ওপরে উঠতে পারছেন না, বালতি সুদ্ধু সাবানগোলা জলে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, এবং চিৎকার করে বলতে লাগলেন, এর একটা বিহিত করতেই হবে!

দোতলার বারান্দায় অমরনাথ আর চিররঞ্জন দাঁড়িয়ে ছিলেন পাশাপাশি। একটু পরে চিররঞ্জন আপন মনেই বললেন, সবই মন। একবার ধুলেও যা, দশবার ধুলেও তা। সবাই জানে। তবু মনে থাকে না।

অমরনাথ শুনতে পেয়ে বললেন, তা তো বটেই; মনই তো সব।

চিররঞ্জন বললেন, অপরের টুথব্রাশও ধুয়ে নিয়ে ব্যবহার করা যায় অনায়াসে, তবু আমরা করতে পারি না। কিন্তু জল খাবার গেলাস ধুয়ে নিয়ে ব্যবহার করতে পারি।

অমরনাথ এবার শুধু হাসলেন। চিররঞ্জন আবার বললেন, আমরা ভুলে যাই, আমাদের প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে খানিকটা গু আছে। সারাদিন শরীরের মধ্যে গু নিয়ে ঘুরছি! অথচ নিজের শরীরটাকে অপবিত্র মনে হয় না।

অমরনাথ এবার বললেন, কিন্তু এটা তো ভুলে থাকাই ভালো। তাই না?

চিররঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিয়ে বললেন, তা ঠিক!

কিন্তু একটা কথা চিররঞ্জনের মাথায় ঢুকলে আর সহজে ছাড়ে না। সারাদিন

সেইটাই বোধহয় ভাবতে থাকেন। সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা তিনি অমরনাথকে নিভৃতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বড়বাবু, এমন কোনো সাবালক মেয়ে পুরুষ আছে এ পৃথিবীতে, যারা প্রতিদিন সকালে পায়খানা ঠিক মতন হলো কিনা এই নিয়ে ভাবে না?

বড়বাবু মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, বলা শক্ত।

—সন্ন্যাসীদের কি এইরকম হয়? মহাত্মা গান্ধীরও হয়?

—হঠাৎ এসব কথা মনে এলো কেন?

—মানুষের মনে বেশীর ভাগ চিন্তাই তো হঠাৎ আসে। তার কি কোনো ঠিক ঠিকানা আছে?

সন্ন্যাসীদের তো এই জন্যই জিতেন্দ্রিয় বলে। তাঁরা নিশ্চয়ই এ সবের ঊর্ধ্বে। আমি কিছুদিন ও'দের সঙ্গে মিশেছিলাম, তখন অবশ্য আমার মনে এ প্রশ্ন আসেনি। তা হলে জেনে নিতুম।

—জিতেন্দ্রিয় বলতে তো কামনা-বাসনা জয় করাই বোঝায়। নিছক যেগুলো শারীরিক প্রয়োজন, যেমন খাওয়া এবং অপ্রয়োজনীয় খাদ্য শরীর থেকে বার করে দেওয়া—এগুলো কি এড়ানো যায়?

—কামনা-বাসনাও শারীরিক প্রয়োজন। তুমি মানো কিনা জানি না, আমি মানি। কামনা-বাসনাকে যারা দূরে সরিয়ে রাখে, তাদের শরীর সেটা সহজে মেনে নেয় না, অনেকে শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যায়। অধিকাংশ সাধু সন্ন্যাসীই এক ধরনের উন্মাদ, আমি লক্ষ্য করেছি। ভাবোন্মাদও বলতে পারো। লোকে তাই বলে।

—কিন্তু সব মানুষের সব ইন্দ্রিয় তো সমান শক্তিশালী নয়। কারুর স্পর্শে বেশী আনন্দ, কারুর দর্শনে। পর নারীকে স্পর্শ করা অন্যায়, দর্শনে তো কেউ দোষ দেয় না। অথচ এমন মানুষও তো আছে, যাদের রূপ দেখার চোখ আছে, যারা বিভিন্ন ফুলের রং চিনতে পারে—তারা কোনো নারীর রূপের দিকে কয়েক পলক চেয়ে থেকে যে আনন্দ পায়...

বড়বাবু টেবিলে টোকা মারতে মারতে বললেন, বুঝতে পারছি, তোমারও বয়েস হয়ে যাচ্ছে। বুড়ো হয়ে গেলেই এই সব মনে পড়ে। অল্প বয়েসে শুধু চোখে মন মানে না, ছুঁয়ে দেখতেই হয়!

—বুড়ো হয়ে গেলেও আমার দুঃখ নেই। অভিজ্ঞতা না হলে উপভোগ গাঢ় হয় না। ছোকরা বয়েসে তো ছটফট করেই সময় কেটে যায়!

অমরনাথ যেদিন সূর্যকে খুব শাস্তি দিচ্ছিলেন, সেদিন চিররঞ্জন পেছন থেকে এসে আস্তে তাঁর কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, কেন শুধু শুধু নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন?

॥ ৮ ॥

সূর্যকুমার বছরে একবার কলকাতায় আসে। হাজারীবাগের সাহেবী স্কুলে সে পড়ে, সেখানে বছরে দু'বার লম্বা ছুটি। গ্রীষ্মের পাহাড়ী জায়গায় এক্সকারশানে যায়, বড়দিনের ছুটি কামায় কলকাতায়—বড়দিনের সময়ও চার-পাঁচ সপ্তাহ ছুটি থাকে।

সূর্যকুমারের কলকাতায় আসবার সময় হলে আমি ভেতরে ভেতরে বেশ উত্তেজনা ও চাপা আনন্দ বোধ করতাম। এই সময় সারা বাড়িতেই বেশ একটা উৎসাহের

সঞ্চার হতো। এ বাড়িতে আমিই একমাত্র ছেলে, আর একজন ছেলে এলে আমি তবু একজন সংগী পেতাম। আমার দিদিরাও খুশী হতো। আমার দিদিরা তো আমাকে পুরুষ মানুষ হিসেবে গ্রাহ্যই করতো না—একমাত্র মা-জ্যাঠাইমার সংগে হাসাহাসির গল্পের সময় আমাকে তাড়া দিত, এই তুই এখানে কেন রে? তুই তো ছেলে—তোর এসব গল্প শুনতে নেই। আমাদের পাশের বাড়িতে একটা নতুন বাচ্চা হওয়ায় হিজড়েরা এসে নেচেছিল—সেটাও আমাকে দেখতে দেওয়া হয়নি, কারণ ছেলেদের নাকি ওসব দেখতে নেই।

সূর্যকুমার বয়েসে আমার থেকে ছ' বছরের বড়, আমি দাদা বলতাম, কিন্তু বন্ধুর মতন সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে সূর্যকুমারের একটা ঘর রাখা ছিল আলাদা, বছরের অন্য সময় আমার দুই দিদি রাত্তিরে শুতো ঐ ঘরে, কিন্তু বড়দিনের সময় তাদের আবার চলে আসতে হতো মায়ের ঘরে। বড়দিন যত কাছে এগিয়ে আসতো, আমরা অধীর হয়ে অপেক্ষা করতাম। তারপর একদিন বড়বাবু স্কুল কর্তৃপক্ষের চিঠি পেয়ে আমাদের জানাতেন, পরশুদিন সূয্যি আসছে, তোমরা যাবে নাকি হাওড়া স্টেশনে?

প্রথমবার সূর্যকুমারকে দেখে আমরা অবশ্য খুব নিরাশ হয়েছিলাম। যদিও তাকে আনতে গিয়েছিলাম কত উৎসাহের সংগে। তখন আমরা নতুন কলকাতায় এসেছি, কলকাতার সব কিছুই বিস্ময়কর লাগে। বাড়ির সব ছেলেমেয়ে বড়বাবুর সংগে ঘোড়ার গাড়ি চেপে স্ট্র্যান্ড রোড ধরে গিয়েছিলাম চাঁদপাল ঘাটে। যাবার পথে মাঝ-রাস্তায় দুটো ষাঁড় মল্লযুদ্ধ বাঁধিয়ে থামিয়ে দিয়েছিল সব গাড়ি, আমাদের গাড়ির ঘোড়া দুটোও ভয় পেয়ে পা তুলে চিঁহিহি করে চ্যাঁচাচ্ছিল। আমি জানলার ধারে বসতে পাইনি বলে ভালো করে দেখতে পাইনি অবশ্য। চাঁদপাল ঘাটে আমরা বেশ খানিকক্ষণ আগেই এসেছিলাম, তখন জাহাজ চলাচল করছে বলে ব্রিজ খুলে দেওয়া হয়েছে। জাহাজগুলো অবিকল ছবির বইতে জাহাজের মতন। জাহাজের ভোঁ শুনলে সব সময়ই আমার মন খারাপ লাগে।

হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আমরা সবাই সুশৃংখলভাবে দাঁড়িয়ে আছি, ট্রেন আর আসে না! সওয়া ঘণ্টা লেট। মা আমাকে পই পই করে বলে দিয়েছিলেন, হাওড়া স্টেশনের ভিড়ের মধ্যে একটু এদিক-ওদিক গেলেই আমি হারিয়ে যাবো, আর আমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বড়দি আমার হাত শক্ত করে চেপে ধরে আছে। জ্যাঠামশাইয়ের মেয়ে শ্রীলেখা আমাদের সবার বড়দি। আমাদের কাছেই কয়েকজন চীনেম্যান দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের দেখে দেখেই সময় কেটে যাচ্ছিল বেশ। তখন আমরা পথেঘাটে কোনো চীনেকে দেখলেই বলতাম, চীনেম্যান চ্যাং চুং মালাই কা ভ্যাট! অবশ্য একজন মাত্র চীনেম্যানকেই আমরা দেখেছি তখন, যে একসংগে ছ'টা বল নিয়ে লোফালুফির খেলা দেখাতো পাড়ায় পাড়ায়।

শেষ পর্যন্ত ট্রেন এলো, অনেক লোকজন নামলো, কিন্তু সূর্যকুমারের দেখা নেই। বড়বাবু সুস্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তখন পর্যন্ত সূর্যদাদাকে দেখিইনি, সুতরাং যে কোনো কিশোরের দিকে উৎসুকভাবে তাকাচ্ছি। বেশ খানিকটা বাদে দেখলাম, একজন আলখাল্লা পরা বুড়ো সাহেব তিন চারটি ছেলেকে নিয়ে দূরে থেকে আসছেন। বড়বাবুর সামনে এসে থেমে গিয়ে হাত বাড়িয়ে হাসিমুখে বললেন, হাল্লো, মিঃ ভাদুড়ি! গড ব্লেস ইউ!

সাহেবটি একটি ছেলের কাঁধে হাত রেখে বড়বাবুর সংগে কিছুক্ষণ কি সব যেন

বললেন ইংরেজিতে। আমরা ভেবেছিলাম, সে ঐ সাহেবেরই ছেলে। আমাদের চমকে দিয়ে বড়বাবু তাকেই বললেন, এই যে সূর্য, মিট ইওর কাজিনস।

ছেলেটি আমাদের দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে হেসে শুধু মাথা নোয়ালো।

নাবিকদের মতন নীল রঙের প্যান্ট ও কোট পরে আছে সূর্য, কোটের বুকের কাছে সোনালি সুতোয় কি যেন আঁকা। গলায় টাই, বুট জুতোয় ঝকঝকে পালিশ। তার গায়ের রং সাহেবদের মতন ফর্সা, চোখের তারা দুটোও খয়েরি। এ সবের জন্যও কিছু না, কিন্তু সে আমাদের নিরাশ করে দিল একটা ব্যাপারে। সূর্য এক বর্ণও বাংলা জানে না। আমি তখন প্যারি সরকারের ফার্স্ট বুক পর্যন্ত পৌঁছেছি, ওয়ান মর্নিং আই মেট আ লেম ম্যান-এর পাতা পড়তে পারি। আমি হাঁ করে আমার এই নতুন দাদার দিকে তাকিয়ে রইলাম। বড়দি ক্লাস এইটে পড়ে, তিনখানা ইংরেজি বই—কিন্তু নিজের মন থেকে এক লাইনও বানিয়ে বলতে গেলে কান লাল হয়ে যায়।

সূর্যকুমারের আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—তার মুখখানা অদ্ভুত ধরনের বিষণ্ণ আর ম্লান। প্রথম যখন তাকে দেখি, তখন তার বয়েস তেরো বছর—অথচ তার মুখে হাসি দেখা যেত কদাচিৎ। কারুর সঙ্গে কথা বলার সময় চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতো, সেই খয়েরি রঙের অচেনা চোখ।

সূর্যকে মনে হতো আমাদের মধ্যে যেন একটা অন্য জগতের মানুষ। ভুল করে এখানে এসে পড়েছে। তার চেহারা, ব্যবহার সবই আলাদা। সে প্রত্যেক রাত্তিরে শুতে যাবার আগে মোজা আর গেঞ্জি নিজের হাতে কেচে নেয়। বাড়িতেও কক্ষনো সে খালি পায়ে থাকে না। প্রথম দু'একদিন সে চামচে দিয়ে ভাত খেয়েছিল, তারপর যখন হাত দিয়ে খেতে শুরু করলো, তখনও সব কটা আঙুল উঁচু করে এমনভাবে ভাত তোলে যে দেখলেই হাসি পায়। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, সে খেতে বসেও বাঁ হাত দিয়ে জলের গেলাস ধরে এবং সেই হাত আবার জামায় লাগায়। দু' হাত দিয়ে মাছের কাঁটা বাছে। কেউ তার এসব দেখে হাসলে সে স্থির চোখ তুলে তাকায়, হাসে না, কথা বলে না।

সূর্যদাদার দেখা পাবার জন্য আমি এত উদ্‌গ্রীব হয়েছিলাম, কিন্তু সে আসার পর আমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতাম, তার সামনেই যেতাম না। একদিন আমি ছেলেমানুষী অভিমান নিয়ে বড়বাবুর কাছে নালিশ করেছিলাম, বড়বাবু, সূর্যদাদা কেন বাংলায় কথা বলে না? আমরা কিছু বুঝতে পারি না।

বড়বাবু হেসে বলেছিলেন, তোমরা সবাই মিলে ওকে শেখাও! ও তো বিহারের স্কুলে পড়ে, সেখানে কেউ বাংলা জানে না—তাই সব ভুলে গেছে। খুব ছোটবেলায় কিন্তু বাংলা শিখেছিল তোমার পিসীর কাছে।

আমি অবশ্য পরে সূর্যদার কাছে জেনেছিলাম, ওদের স্কুলে বেশ কিছু বাঙালী ছেলে আছে, কিন্তু তারাও বাংলা বলে না। শিক্ষকদের কড়া নির্দেশ ছিল, হস্টেলেও পরস্পরের সঙ্গে সব সময় ইংরেজীতে কথা বলতে হবে।

শুরু হয়ে গেল সূর্যকুমারকে বাংলা শেখানো। শ্রীলেখা আর সান্ত্বনা—বড়দি আর মেজদি পাখি পড়ানোর মতন সূর্যকুমারকে বাংলা শব্দ মুখস্থ করাতে লাগলো। কিন্তু উচ্চারণ কিছুতেই শুধরোয় না—সূর্যদা মাছের ঝোলকে বলে মাচ্ছের জোল, পোকাকে বলে পকা। আমাদের রান্নার ঠাকুর মহাজনকে বলবে মৌজন। গেলাস কিংবা টেবিল কিছুতেই বলবে না, বললে গ্লাস আর টেব্‌ল। সেবারে ছুটির শেষে ফিরে যাবার সময় সূর্যদা এই রকম বাংলা শিখেছিলঃ বড় মামীমা, তোমার আচার খুব

বিউটিফুল, বাট এত জাল না দাও (এত ঝাল দিও না), আমি সুটকেস ভর্তি আচার নিয়ে যাবো এক শিশি।...মৌজিন খুব ডার্টি, নুনের ভেতরে পকার পা, নট ওনলি ওয়ান বাট টু!

একবার নুনের ভেতরে আরশোলার ঠ্যাং বেরিয়েছিল ঠিকই। সূর্যদার মুখে এরকম আধো-আধো বাংলা খুব মিষ্টি শোনাতো।

সূর্যকুমার এলে আমাদের অনেক জায়গায় বেড়ানো হতো। শীতের কলকাতায় অনেক রকম উৎসব আর আকর্ষণ। বড়বাবু কিংবা বাবার সঙ্গে আমরা যেতাম ইডেন গার্ডনস-এ ব্যান্ড শুনতে। গার্ডনস-এর গোল উঁচু জায়গাটায় ঝলমলে পোশাক-পরা সাহেব সিপাহীরা ব্যান্ড বাজাতো। আমরা প্যাগোডার নিচে বসে কমলালেবু আর চীনেবাদাম খেতে খেতে বিভোর হয়ে সেই বাজনা শুনতাম। ক্রীসমাস উপলক্ষে ফোর্ট উইলিয়ামের সামনেও এই রকম বাজনা শুনেছি—সবাই সেটাকে বলতো গড়ের বাদ্যি।

কিংবা আমরা গঙ্গা পেরিয়ে হাওড়া যেতাম সার্কাস দেখতে। সার্কাসের খেলোয়াড়রা অধিকাংশই মাদ্রাজী, কয়েকজন সাহেব এবং জাপানী। বিরাট উঁচু উঁচু ট্রাপিজে ফ্রক-পরা মেয়েরা একটা থেকে লাফিয়ে চলে যেত অন্য একটায়—নিচে জাল পাতা থাকতো না তখন। বাঘ আর হাতির খেলাতেই সবচেয়ে বেশী রোমাঞ্চিত হতাম—আগাগোড়া সোনালি পোশাক-পরা একজন বেঁটে লোক মস্ত লম্বা চাবুক নিয়ে বাঘদের হুকুম করতো। অদ্ভুত ধরনের সট্ সট্ শব্দ হতো সেই চাবুক থেকে—সবাই বলতো ইলেকট্রিকের চাবুক।

একটা সিনেমাও দেখেছিলুম সূর্যদার দৌলতে। তখন ছোটদের সিনেমা দেখা মহাপাপ। ইস্কুলের ছেলেদের পক্ষে সিনেমাদেখা মানেই চূড়ান্ত বখে যাওয়া। সূর্য-কুমারের বায়নাতেই আমাদের একবার একটি মাত্র ছবি দেখতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সিনেমাকে আমরা বলতাম বাইসকোপ, সূর্যদা বলতো মুভি। মনে আছে, বাইস-কোপটার নাম, মার্ক অব জোরো—তরোয়াল হাতে মুখোস পরা একটা লোক ঘোড়া ছুটিয়ে এসে সব জায়গায় ক্রস এঁকে দিয়ে যেত। সেই সঙ্গে ছিল আর একটা ছোট ছবি, সেটাই বেশী ভালো লেগেছিল। ছেঁড়া জুতো, ছেঁড়া টুপি, হাতে ছড়ি ও ছোট গোঁপওয়ালা চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।

সূর্যকুমার এইসব নানা জায়গায় বেড়ানো উপভোগ করতো ঠিকই কিন্তু কথা খুব কম বলতো। তাছাড়া তার মুখে একটা বিষন্ন ভাব লেগে থাকতো সব সময়। সূর্যদার ছেলেবেলার চেহারাটা আমি যখনই ভাবি—তার সেই বিমর্ষ মুখের ছবিটাই চোখে ভেসে ওঠে। ঐটুকু বয়েসে অতখানি গাম্ভীর্য আমি আর কোনো ছেলের দেখিনি।

তখন আমরা মনে মনে ভাবতাম সূর্যদা'র মা নেই তো, তাই অত কষ্ট। মা না থাকার ব্যাপারটা ভাবাই যায় না। মা থাকা তো একটা অবধারিত সত্যের মতন, আর সবারই মা আছে, শুধু সূর্যদার নেই। সূর্যদার মুখে ছেলেবেলায় কখনো তার মায়ের নাম শুনিনি।

সূর্যদা বদলে গিয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি। পরের বছর ছুটিতে এসে আমাদের সঙ্গে অনেক খোলামেলাভাবে মিশেছিল, বাংলাও শিখে গিয়েছিল বেশ ভালোই, কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যাওয়া কিংবা মুখের সেই বিষন্ন ভাবটি যায় নি অনেকদিন।

দু'তিন বছরের মধ্যেই আমি সূর্যদার ভক্ত চ্যালা হয়ে উঠলাম। যে ক'দিন সূর্যদা কলকাতায় থাকতো, আমি সব সময় ছায়ার মতন ওর পেছন পেছন ঘুরতাম, ওর

হুকুম তামিল করার জন্য আগে থেকেই তৈরী। সূর্যদা অবশ্য কোনো হুকুমই করতো না।—সাহেবী কায়দায় রপ্ত হলেও হোস্টেলে থাকার জন্য কয়েকটি অন্যরকম গুণও ছিল। নিজের কাজ অন্যকে করতে দিত না কক্ষনো—এমন কি খাওয়ার পর নিজের এঁটো থালাও নিজেই তুলে নিয়ে যেত। মা জ্যাঠাইমার আপত্তি কিছুতেই মানেনি। নিজের জামা কাপড় তো নিজে কাচতোই। কখনো এক গেলাস জলও অন্যকে দিতে বলেনি। আমরা তো কিছুতেই নিজে জল গড়িয়ে খেতাম না—মনে হতো, ওটা বিশুদ্ধ মেয়েদের কাজ। দিদিরা কখনো জল আনতে আপত্তি করলে নালিশ করতাম মায়ের কাছে। সূর্যকুমারের দেখাদেখি আমি নিজের এঁটো থালা তুলতে শুরু করলেও জল খাওয়ার ব্যাপারে দিদিদের হুকুম করতে ছাড়িনি।

রোজ সকালবেলা সূর্যদা নিজেই বিছানা ছেড়ে ছাদে চলে যেত। শীতের মধ্যেও হাফপ্যান্ট হাফসার্ট পরে ব্যায়াম করতো একা একা। আবার রাত্তিরে ঘুমোতে যাবার আগে বাইবেল খুলে প্রেয়ার করতো কয়েক মিনিট। অত কম বয়েসী একটি ছেলের এরকম নিয়ম-শৃঙ্খলাবোধ দেখে আমাদের খুব চমক লাগতো। আমি তো অন্ধের মতন নকল করতে শুরু করলাম সূর্যদাকে, দিদিরা তাই নিয়ে আমাকে ক্ষ্যাপাতো। সূর্যদা অবশ্য কয়েক বছরের মধ্যে বাইবেল পড়া ছেড়ে দিয়েছিল এবং ক্রমে ক্রমে ঘোরতর ইংরেজবিদ্বেষী হয়ে উঠেছিল।

সূর্যদা ছিল বাড়ির সকলের নয়নের মণি। সবাই সূর্যদাকে খাতির করার জন্য শশব্যস্ত। একে তো তার অমন সুন্দর চেহারা, সেই সঙ্গে ভদ্র বিনীত ব্যবহার, পড়াশুনোতেও ভালো। তাছাড়া যে ছেলে সাহেবদের মতন ইংরেজিতে কথা বলতে পারে—তার প্রতি বিশেষতঃ বাড়ির মেয়েদের একটা সমীহের ভাব থাকবেই। একমাত্র জ্যাঠামশাই মনে মনে পছন্দ করতেন না সূর্যদাকে—গোড়া থেকেই একটা বিরূপ ভাব নিয়েছিলেন। সূর্যদার সঙ্গে কথা বলার সময় জ্যাঠামশাই এমন একটা কাষ্ঠহাসি ও শুকনো স্নেহের ভাব দেখাতেন—যা আমাদের ছেলেমানুষী চোখেও ধরা পড়তো।

জ্যাঠামশাইয়ের স্নেহের অভাব পুষিয়ে দিয়েছিলেন জ্যাঠাইমা। জ্যাঠাইমার পর পর তিন মেয়ে হবার পর একটি ছেলে জন্মেও কয়েক মাস বাদে মারা যায়। জ্যাঠাইমা আমাকেও খুব ভালোবাসতেন, কিন্তু সূর্যদাকে ভালোবাসতেন অনেক অনেক বেশী। সেজন্য আমার কোনোদিন হিংসে হয়নি। আমি সবদিক থেকেই সূর্যদাকে আমার চেয়ে অনেক বড় মনে করতাম। এবং মনে হতো, এ সবকিছুই সূর্যদার প্রাপ্য। কিন্তু যারা যারা ওকে ভালোবেসেছে, তাদের প্রত্যেকের মনে একটা করে গভীর আঘাত দেবার অদ্ভুত প্রতিভা ছিল সূর্যকুমারের।

স্কুলজীবনের শেষদিকে সূর্যদা বছরে দু'বার করে কলকাতায় আসতে লাগলো। তখন সূর্যদা বেশ বড় হয়েছে বলে ওর একাই রাস্তায় বেরুবার অনুমতি মিলেছিল, আমি অনেক সময় থাকতাম সঙ্গে। সূর্যদাকে আমি গ্রে ষ্ট্রীটে রেণুদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম। বিষ্ণু কিংবা জীমূত ওরা অবিলম্বেই সূর্যদার ভক্ত হয়ে গেল। এমন কি সুপ্রকাশদা পর্যন্ত একদিন সূর্যকুমারের ইংরেজি জ্ঞান পরীক্ষা করে মুগ্ধ হলেন, তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন এই প্রতিভাবান কিশোরের।

রেণুদের বাড়ির কাছেই একদিন একটা ঘটনা ঘটলো। আমি আর সূর্যদা দাঁড়িয়েছিলাম হাতিবাগানের বাজারের সামনে, ট্রামে ওঠবার জন্য। শ্যামবাজারের দিক থেকে কিসের যেন একটা মিছিল আসছিল, তেরঙ্গা ঝাণ্ডা নিয়ে একদল লোক খুব চিৎকার করছে। আমরা সেদিকেই তাকিয়েছিলাম। মিছিলটা যখন আমাদের খুব কাছে

এসে পড়েছে, তখন দুটো পুলিসের গাড়ি এসে থামলো—টপাটপ পুলিসরা নেমেই তাড়া করে গেল মিছিলকে। মুহূর্তে সব ছত্রভঙ্গ—রাস্তার সব লাকজন যে দৌড়োচ্ছে আর পালাচ্ছে আমরা সেটা খেয়ালই করিনি। তাছাড়া পালাবার কথা আমরা জানতামই না—তখনকার কলকাতার ছেলেরা পুলিসের সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় এখনকার মতন দক্ষ ছিল না। আচমকা একটি গোরা পুলিস আমাদের দিকে তেড়ে এলো—আমাকে এক ধাক্কায় ছিটকে ফেলে দিল রাস্তায়—সূর্যদার মাথায় ব্যাটন দিয়ে মারলো। সেই আমি বৃটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পেলাম।

পুলিস আমাদের ছোট ছেলে বলে বুঝতে পারেনি—এলোপাথাড়ি মারতে মারতে আমাদের গায়ে লেগেছে—তা কিন্তু মোটেই নয়। স্পষ্ট মনে আছে সেই ঘটনা। একজন পুলিস সার্জেন প্রথমে তাকালো আমাদের দিকে, তার প্রকান্ড মুখখানা তখন লালচে রঙের, আমাদের দেখে তার চোখে যেন বেশী করে রাগ জ্বলে উঠলো—এগিয়ে এসে একটা হাত বাড়িয়ে দিল আমার মুখের দিকে। হাত না বলে থাবাই বলা যায়—পাঁচটা আঙুলের বিস্তারে ঢেকে যায় আমার গোটা মুখ—সেই আঙুলগুলো আমার মুখখানা চেপে ধরে একটা ধাক্কা মারলো। একটি ছোট ছেলেকে মারার জন্যই মারা।

মাথায় ব্যাটনের ঘা খেয়ে সূর্যদা প্রথমে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তারপর ইংরেজিতে অনর্গল বকতে বকতে ছুটে গেল সেই পুলিস সার্জেনেরই দিকে। তার বিষণ্ণ ধরনের মুখখানায় তখন অসম্ভব রাগ। সার্জেনের সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন বলতে লাগলো। সার্জেনটি সূর্যদার ঘাড়ে আর এক ঘা মেরে উঠে গেল গাড়িতে। আমি ধুলো ঝেড়ে উঠে এসে দেখলাম, সূর্যদার মাথা থেকে রক্ত পড়ছে।

সূর্যদাকে নিয়ে আবার রেণুদের বাড়িতে চলে এলাম। রেণু আর দীপ্তি নিচের তলাতেই ছিল, আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, রেণু, শিগগির যা, সুপ্রকাশদাকে ডাক, ওর মাথা ফেটে গেছে।

রেণু বললো, মাথা ফেটেছে? কই? কোথায়? দেখতে পাচ্ছি না তো!

—এই যে রক্ত দেখতে পাচ্ছিস না!

রেণু কাছে এসে খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে সূর্যদার মাথাটা দেখে বললো, একটু তো মোটে রক্ত বেরিয়েছে, মাথা তো ফাটে নি!

রেণু তখন খুব ছোট, ও ভেবেছিল মাথা ফেটে যাওয়া মানে নারকোলের মালার মতন মাথার খুলিটা ফাঁক হয়ে যাওয়া।

দীপ্তি গিয়ে সুপ্রকাশদাকে ডেকে আনলো। সুপ্রকাশদা বলেলন, একি সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! তোমরা মিছিলে গিয়েছিলে! যাও নি! এমনি এমনি মারলো? যাক গে মেরেছে মেরেছে—ভাগ্যিস ধরে নিয়ে যায়নি—তাহলে আর জীবনে কখনো গভর্নমেণ্টের চাকরি পেতে না। সূর্য নিশ্চয়ই আই সি এস হবে—।

সুপ্রকাশদা যত্ন করে বেঞ্জিন আর তুলো দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিলেন। তারপর আমরা রিক্সা করে চলে এলাম বাড়িতে।

এরপর দু'তিন দিন সূর্যদা খুবই বিমর্ষ হয়ে রইলো। কারুর সঙ্গেই প্রায় কথা বলেনি। ওর মনে নিশ্চয়ই একটা আঘাত লেগেছিল। স্কুলের সাহেব শিক্ষকরা কত ভালো, কি চমৎকার তাদের ব্যবহার—ইংরেজ সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে কতটা উন্নত সে কথাও সূর্যদাকে পড়তে হয়েছে—তার সঙ্গে এই ঘটনাটা যে একদম মেলে না।

বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যদার চরিত্রে দুটি ব্যাপার খুব প্রকট হয়ে ওঠে। একটি হচ্ছে, ইচ্ছে করে বিপদে পড়ার ঝোঁক, অন্যটিকে বলা যায় বেশী রকমের নারী-

প্রীতি। পৃথিবীতে যে কয়েকজন বিখ্যাত প্রেমিক তাঁদের অসম্ভব নারী-লিপ্সার জন্য অমর হয়ে আছেন, সূর্যকুমারের নাম তাদের পাশে অনায়াসে লিখে রাখা যায়। আমরা সব মিলিয়ে যাকে প্রেম বলি, এটা ঠিক তাও নয়, সম্ভোগ বাসনাই বলা উচিত। যৌবনে একমাত্র নারীদের সান্নিধ্যেই সূর্যদার বিষণ্ণ ভাবটা খানিকটা কেটে যেত। সূর্যদার প্রথম এই ধরনের প্রেম হয় আমার বড়দির সঙ্গে।

বিপদে পড়ার ঝোঁক কি রকম ছিল তার একটা উদাহরণ দিই। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষা দেবার পর সূর্যদা যখন কলকাতায় এসে রয়েছে, তখন আমরা কয়েকজন মিলে ইডেন গার্ডেনস্-এ একদিন বেড়াতে এসেছিলাম। বড়রা কেউ সঙ্গে আসেননি, সূর্যদাই আমাদের গার্জেন। ওখানকার ঝিলে কয়েকটি নৌকো ভাড়া পাওয়া যায়—তাতে চড়ে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছেলেমেয়েরা খুব হৈ-হল্লা করছিল।

আমার মেজদি সান্ত্বনা হঠাৎ বললো, আঃ, আমরাও যদি নৌকো চড়ে বেড়াতে পারতাম, কি মজাই না হতো!

সূর্যদা উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে বললো, চলো, নৌকোতেই চড়বো।

আমরা তো সঙ্গে সঙ্গে রাজী। বড়দি সূর্যদাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি নৌকো চালাতে জানো?

সূর্যদা এবারও গম্ভীরভাবে বললো, জানি না। তবে শিখে নিতে কতক্ষণ?

প্রথম তো নৌকো পাওয়ার ব্যাপারেই অসুবিধে দেখা দিল। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছেলেদের প্রতাপ বেশী—তারা তখন নিজেদের শাসক-সমাজের প্রতিচ্ছায়া মনে করে খুব তেজ দেখাতো। তারা দু'ঘণ্টার আগে কোনো নৌকো ছাড়বে না। সূর্যদা নেবেই। শেষ পর্যন্ত সূর্যদার চোস্ত ইংরেজি শুনে অ্যাংলো ছেলেরা পিছু হটলো।

নৌকো ঝিলের মাঝামাঝি যেতেই ভীষণ দুলতে লাগলো আর ঘুরতে লাগলো এদিক ওদিক। সূর্যদা একদম চালাতে জানে না, আনাড়ির মতন ত বৈঠা চালাতে গিয়ে আরও মুশকিল। দিদিরা ভয় পেয়ে চ্যাঁচামেচি করতে লাগলো, পার থেকে লোকেরা দেখে হাসছে। আমরা অবশ্য সাঁতার জানতাম, আমি হেদোতে দিদিদের সঙ্গে চান করতে করতে সাঁতার শিখে নিয়েছি। শেষ পর্যন্ত এমন হলো, নৌকো আর পারে এনে ভেড়ানোও যায় না—অ্যাংলো ছেলেদের অসহ্য টিটকিরিতে কান পাতা যায় না, কিন্তু সূর্যদার ভ্রূক্ষেপ নেই।

ভয় পেয়ে দিদিরা উঠে দাঁড়াতেই কাণ্ডটা ঘটলো, নৌকো উল্টে গেল। আমরা সাঁতরে পারে পেঁৗছে দেখলাম সূর্যদা ডুবে যাচ্ছে। বাগানের দু'জন মালি তক্ষুনি জলে ঝাঁপিয়ে না পড়লে সূর্যদা'র কপালে কি ছিল সেদিন কে জানে। তখন আমরা টের পেলাম, সূর্যদা সাঁতারই জানে না।

সাঁতার না জেনে, নৌকো চালাতে না জেনে, আর কে ঝিলের মাঝখানে নৌকো নিয়ে যায়, সূর্যদা ছাড়া?

॥ ৯ ॥

সূর্য পড়াশুনোতে ভালোই ছিল। কিন্তু পাদ্রী স্কুলের কড়া শাসন সত্ত্বেও সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষার আগের দু বছর সে বেশী অমনোযোগী হয়ে ওঠে। স্কুল থেকে বড়বাবুর কাছে মাঝে মাঝে অভিযোগের চিঠি আসতে লাগলো। যে বুড়ো

পাদ্রী বড়বাবুর সঙ্গে দেখা হলেই তাঁর ছেলের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন, তিনিই চিঠি লিখে জানালেন যে, সূর্য এমন অবাধ্য হয়ে উঠছে যে তাকে আর স্কুলে রাখা সম্ভব হবে না। সূর্যর মতন শান্ত, ভদ্র ছেলের নামে অবাধ্যপনার অভিযোগ কল্পনাই করা যায় না। চিঠি পেয়ে বড়বাবু অবিলম্বে চলে গেলেন হাজারীবাগে। কিছু একটা ব্যবস্থা করে ফিরে এলেন। সূর্যর পরীক্ষার তখন আট মাস বাকি।

ফিরে আসার পর বড়বাবুকে বেশ চিন্তিত দেখা গেল। তাঁর প্রশান্ত সুন্দর কপালে প্রায়ই সিঁড়ি দেখা যায়। স্থির চোখে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়েন। এতখানি বয়েস হলেও বড়বাবুর চেহারা দেখে তা বোঝার উপায় নেই, শরীরে নেই এক ছিটে মেদ, টকটকে গায়ের রং, কয়েকগাছি পাকাচুল এমনিভাবে লুকিয়ে আছে যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

বড়বাবু একদিন চিররঞ্জনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, চিরু, ছেলেটাকে নিয়ে কি করা যায় বলো তো?

চিররঞ্জন কিছুই খবর রাখতেন না। বললেন, সূয্যি? কেন, তাকে নিয়ে চিন্তার কি হলো?

বড়বাবু বললেন, এই ছেলেটাই আমার বন্ধন। ও যদি না থাকতো, আমি যেমন খুশি জীবন কাটাতে পারতাম। যা টাকাকড়ি আছে তা নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম দেশ বিদেশে। কিংবা কোনো যাত্রাদলে ভিড়ে গিয়ে ক্লারিওনেট বাজাতাম। কিন্তু এই ছেলেটার কথা ভেবে কিছুই পারি না। ছেলেটা ওর মায়ের সঙ্গ পায়নি, আমার কাছেই বা কতটুকু থেকেছে! অথচ ওরও তো জীবনে কিছু পাওয়া দরকার!

—ছেলেটাকে কোনো একটা লাইনে দিয়ে দিন, তারপর নিজের পায়ে নিজেই দাঁড়াবে। কি পড়াবেন ঠিক করছেন?

—সেটাই তো ঠিক করতে পারছি না। দ্যাখো, এ দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ তাদের ছেলেমেয়েদের কোনো রকম শিক্ষা দেবারই সুযোগ পায় না। আমার সব রকম সুযোগ আছে। আমি ওকে ডাক্তারি পড়াতে পারি, এঞ্জিনিয়ারিং পড়াতে পারি, ব্যারিস্টারি পড়াবার জন্য বিলেতে পাঠাতে পারি, কিংবা আই সি এস—কিন্তু বুঝতে পারি না কোন্ শিক্ষায় ও সত্যিকারের মানুষের মতন মানুষ হবে। দ্যাখো চিরু, আমার এতখানি জীবনে আমি ভারতবর্ষের বহু জায়গায় ঘুরেছি—এমন কয়েক-জন মানুষ দেখেছি—যাঁরা একবর্ণ লেখাপড়া শেখেননি, কিন্তু তাঁরা দেবতুল্য মানুষ। তাঁদের মত উদারতা, তাঁদের মত চরিত্রবল তো বহু শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও দেখি না। বিহারে রামপ্রসাদ পাণ্ডে, লক্ষ্ণৌ-এ হরিশ মজুমদার, ইমাম বক্স, হরিদ্বারের স্বামী অঘোরানন্দ।

—শিক্ষিত লোকের মধ্যেও মহৎ মানুষের অভাব নেই। যেমন আশু মুখুজ্যের কথাই ধরুন না।

—তুমি তো দেখছি খুব আশু মুখুজ্যের ভক্ত! ভদ্দরলোক কি তোমায় জামাই করতে চেয়েছিলেন নাকি?

—আমাকে? আর লোক খুঁজে পেলেন না?

—একবার ভেবেছিলাম, ছেলেটাকে আই সি এস-এর জন্য পাঠাবো বিলেতে। কিন্তু মনস্থির করতে পারি না। আই সি এস হয়ে তো ইংরেজদের গোলামি করবে। আজ না হোক, দশ পনেরো কি কুড়ি বছর বাদে তো এ দেশ স্বাধীন হবেই। তখন কি দেশের মানুষ ইংরেজদের এই গোলামগুলোকে সহ্য করবে? এই সব আই সি এস-দের

আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে না? দ্যাখো অরবিন্দ ঘোষ, সুভাষবাবু এঁরা আই সি এস পাশ করেও শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিলেন।

—কুড়ি বছরের মধ্যে এ দেশ স্বাধীন হবে? বড়বাবু, আপনি কি স্বপ্ন দেখছেন? দেশ স্বাধীন করবে কে, ঐ গান্ধী? না বোমা-ছোঁড়া ছেলেগুলো? সূর্য সেন-টেনকে যেমন ফাঁসিতে ঝোলালো, তেমনি গান্ধী সুভাষ বোসকেও ইংরেজ যে দেয়ালে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরে ফেলেনি, সেটা ইংরেজদের দয়া। লালা লাজপত রায়ের মতন মানুষকে লাঠিপেটা করে মেরে ফেললো, কি হলো তাতে?

—সারা পৃথিবীতে একটা ওলট-পালট আসছে। আমাদের দেশটাও বাদ পড়বে না। জার্মানিতে দেখছো, হিটলার কি রকম শক্তিশালী হয়ে উঠছে? একটা সামান্য কর্পোরাল আজ সে দেশের সর্বময় কর্তা। অস্ট্রিয়াকে গ্রাস করেছে, এবার অন্য দিকে হাত বাড়াবে। তোমার মনে আছে নাইনটিন ফোরটিনের কথা? যতীন মুখুজ্যে আর তার দলবল জার্মানি থেকে অস্ত্র আনিয়ে দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেবার তাল করেছিল। সেবার পারেনি, পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। আবার কি কেউ সে রকম চেষ্টা করবে না ভাবছো? জার্মানরা ইংরেজদের ল্যাজে আগুন লাগাবার জন্য ভারতে গণ্ডগোল পাকাবার সুযোগ ছাড়বে না। রাশিয়ার লেনিন সাহেবও তো প্রথমে জার্মানির সাহায্য নিয়েছিলেন। তারপর ধাঁ ধাঁ করে দেশটাকে কি করে ফেললেন!

—বড়বাবু আপনি সূর্যিকে ডাক্তারি পড়ান। আমার বাবার খুব শখ ছিল, আমার ভাইদের মধ্যে কেউ ডাক্তার হোক। তা তো আর হলো না। সূর্যিকে ডাক্তারি পড়ান, সেটাই সব দিক থেকে ভালো হবে। বুড়ো বয়েসে আপনাকে দেখতে পারবে।

—বুড়ো বয়েসে আমার ছেলে আমাকে দেখবে, সে প্রত্যাশা আমি করি না। বুনো জন্তুরা কি করে জানো তো, তারা যখন মৃত্যুর সময়টা টের পায়—তখন সবাইকে ছেড়ে চলে গিয়ে নির্জন কোনো জায়গায় গিয়ে মরে। আমিও সবার চোখের আড়ালে গিয়ে মরবো। দ্যাখো, আমার জন্মরাত্রে আমার মা মারা যান, আমার বাবা আমাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। আমার কোনো মাতৃঋণ কিংবা পিতৃঋণ নেই। সূর্যির কপাল ভালো যে আমি ওকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিইনি কিংবা অনাথ আশ্রমে ভর্তি করে দিইনি। জীবনে যাদের কাছ থেকে আমি স্নেহমমতা পেয়েছি—তাদের ঋণ শোধ করার জন্যই আমি সূর্যিকে লেখাপড়া শেখাচ্ছি। অবশ্য সূর্যির কিছু টাকাকড়ি আছে আমার কাছে—ওর মায়ের অনেক মোহর ছিল—যেদিন চাইবে, সেদিনই দিয়ে দেবো।

—বড়বাবু, আপনি আবার একটা বিয়ে করুন।

চিররঞ্জনের এই কথা শুনে বড়বাবু একটু চমকে উঠলেন। তারপর বললেন, হঠাৎ এই বদবুদ্ধি দিচ্ছো কেন আমাকে?

—আপনার কথাবার্তা একটু যেন কেমন কেমন শোনাচ্ছে। আপনার একটা কিছু টান থাকা দরকার! আপনার বয়েসে তো কত লোক আবার বিয়ে করছে।

—পাত্রী টাত্রী আছে নাকি তোমার হাতে?

—একবার খবরি ছড়িয়ে দিলে দেখবেন কত ঘটক এসে চিলুবিলু করবে আপনাকে নিয়ে।

—তাই বলো। আমি ভাবলাম, তুমি নিজেই বুঝি ঘটকালির পেশা ধরলে। একটা বয়েস এসে গেলে সব কিছু সম্পর্কেই টান কমে যায়। লালসা যাদের বেশী তারা বুড়ো বয়েসেও মেয়েদের নিয়ে মজে থাকে। যেমন পেটুকরা বুড়ো বয়েসেও বেশী খায়। এই

বয়েসে ধর্মকর্ম নিয়েও অনেকে মেতে থাকে, আমি তো সে-দিকেও তেমন মন বসাতে পারলাম না। কেউ কেউ দেশ উদ্ধার করার জন্যও মাতে। আমার ইচ্ছে করে কি জানো, সারাদিন চুপ করে বসে থাকি—সারা জীবনের সব ঘটনার কথা ভাবি—খুঁজে দেখি, কোথায় আমার ভুল হলো। প্রবৃত্তিবেগ মানুষকে যেখানে নিয়ে যায় সেখানে সে যাবেই। মেয়েদের নিয়ে এক সময় খুব মেতেছিলুম, শরীরে যতখানি আগুন জ্বলে সব জ্বালিয়েছি—তৃষ্ণা এখনও মেটেনি, প্রবৃত্তিবেগ তেমন প্রবল নয় বলে বিয়ে করতে চাই না বা রক্ষিতা রাখতে চাই না। যৌবনবতী রূপসী মেয়েছেলে দেখলে চোখ জুড়োয়—কিন্তু মনে মনে ভাবি, এরা আর আমার নয়, এদের জন্য আমার ছেলের বয়েসী ছেলেরা বড় হচ্ছে। আমি পয়সা দিয়ে ও-রকম দুটো একটা মেয়েকে কিনতে পারি, কিন্তু ওরা আর আমার হবে না। বুড়োর জন্য একটা বুড়ী দরকার—তা বলে কি আমি বুড়ী বিয়ে করবো?

—আপনি বুড়ো হননি! তা হলে আমরা তো থুত্থুড়ে—

—ওসব কথা বাদ দাও। তুমি তোমার ছেলেকে কি পড়াচ্ছো?

—বাদল? ও তো মাত্তর ক্লাস ফাইভে পড়ে। এখন কি ভাববো?

—এখন থেকেই ভেবে রাখা ভালো। কম বয়েস থেকেই ছেলেদের মধ্যে একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ঢুকিয়ে দিতে হয়।

—আমি ওকে কিছুই পড়াবো না। ম্যাট্রিক পর্যন্ত চালাবো—তখন যদি ওর কিছু জ্ঞানগম্যি হয়, তা হলে নিজেই নিজের লাইন বেছে নেবে। আমার ছোট ভাই রঞ্জুর খুব শখ ছিল আর্ট স্কুলে পড়ার—আমার বাবা তাতে রাজী হয়নি—ছেলেটা সেই রাগে অভিমানে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। আমি আমার ছেলেকে বাধা দেবো না, তার যা খুশি পড়বে। পড়ার খরচও নিজেকেই চালাতে হবে—আমি ততদিন বাঁচবো কিনা ঠিক নেই।

—কেন, তোমার ছেলেকেই ডাক্তারি পড়িয়ো।

—ছেলেকে ডাক্তারি পড়াতে হলে আমাকে টাক-পয়সা রোজগার করা শুরু করতে হবে। তা কি আর আমি পারবো?

স্বল্পভাষী সূর্যকুমার স্কুলের ছেলেদের সঙ্গেও বেশী মিশতো না। নিঃশব্দে স্বাবলম্বী জীবন যাপন করাই ছিল তার স্বভাব। কিন্তু স্কুল জীবনের শেষ দিকে সে কিছু বখাটে ছেলের পাল্লায় পড়ে।

তার স্কুলে উচ্চবিত্তপরিবারের ছেলেরাই বেশী পড়তে আসতো। যে সব সরকারী অফিসারের বদলির চাকরি, তাদের ছেলেরাও যেমন ছিল, তেমনি ছিল বিহারের নানা ছোটখাটো জমিদারের ছেলেরা। এদের মধ্যে অনেকের বংশেই প্রথম লেখাপড়ার প্রচলন। বংশের প্রথম কেউ স্কুলে পড়তে এলে দু'রকম ফল দেখা যায়। হয় সে ছাত্র তাদের পরিবারের সকলের যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত মেধা একা তার মাথায় নিয়ে পড়তে এসে দারুণ ব্রিলিয়ান্ট হয়, অথবা তার মাথায় সমস্ত জ্ঞানের কথাই ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। যেমন, ক্রিশ্চান মিশন বা অনাথ আশ্রমের কয়েকটি ছেলে, তাদের মধ্যে দু'তিনজন সাঁওতাল—পড়াশুনোয় চমকপ্রদ ফল করেছে—আবার কয়েকটি জমিদারের ছেলে একেবারে মগজে কিছু ঢোকায় নি—কোনোক্রমে ইংরেজিতে কথা বলতে শেখাই তাদের একমাত্র লাভ।

সেইরকম কয়েকটি ছেলে কড়া নিষেধ সত্ত্বেও হস্টেল থেকে রাত্তিরবেলা বাইরে বেরিয়ে যেত। তারা সূর্যকুমারকেও প্রলুব্ধ করে। সূর্যকুমার শুধুমাত্র আকৃষ্ট হয়েছিল তাদের দুঃসাহসিকতায়। হস্টেলের প্রধান দরজা দিয়ে সন্ধেবেলা বেরুবার কোনো উপায় নেই। কম্পাউন্ডের চার পাশে উঁচু দেয়াল। তিনটি ছেলে অন্ধকার হয়ে গেলে উঠে পড়তো পাঁচিলের পাশে একটা আমগাছে। সেই গাছের একটি ডাল ধরে ঝুলে পড়লে পাঁচিলের ওপর পা রাখা যায়। পাঁচিলের ওপর থেকে লাফ দিলে পা ভাঙা সুনিশ্চিত। সেই পাঁচিল ধরে বাইরের দিকে ঝলে পড়ে শেষ পর্যন্ত ধুপ করে নেমে পড়া। তারপরই ছুট। ফেরার সময় ব্যাপারটা আরও কঠিন। তখন একজনের কাঁধে একজনকে উঠে দাঁড়াতে হয়—শেষ জনকে তুলতে হয় হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে। প্রথম প্রথম এই নৈশ অভিজানের লক্ষ্য ছিল বাজারের দোকানগুলিতে গিয়ে পুরী মেঠাই খাওয়া আর সিনেমা হলে গিয়ে চ্যাচামেচি করা। ক্রমে ক্রমে অন্য ব্যাপারও এসে যায়।

অ্যাডভেঞ্চারের লোভেই সূর্যকুমার ওদের দলে ভিড়ে গেল। পাঁচিল টপকে নেমেই ছুটতে ছুটতে ওরা এলো বড় রাস্তায়। কাচারি পেরিয়ে, ডাক বাংলোর পাশ দিয়ে গিয়ে ওরা হাজির হতো একটা একতলা বাড়িতে। সে বাড়িতে ভেতরের ঘরে হ্যারিকেন জেবলে কয়েকটি লোক জুয়া খেলে। হরতন-চিড়িতন-রুহিতন-ইস্কাবন আঁকা একটা বোর্ডের ওপর মস্ত বড় একটা ছক্কা উল্টে ফেলে জুয়া।

সূর্যকুমারের কিশোর মন এই অনিশ্চিত খেলাটায় বেশ আকর্ষণ পেয়ে গেল। বড়বাবু তাঁর ছেলেকে টাকা পাঠাবার ব্যাপারে অনুদার ছিলেন না—সূর্যকুমারের হাতে যথেষ্ট টাকা থাকতো। গভীর মনোযোগে সে বসে যেত জুয়া খেলতে। প্রতি রাত্রে সব টাকা হারতো।

জুয়ার পরবর্তী ধাপ নারী। সূর্যকুমারের দুর্দান্ত প্রকৃতির বন্ধুরা মেয়েদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যতরকম নাম আছে এবং নারী পুরুষের যতরকম ক্রিয়াকলাপ আছে সে সব আলোচনায় খুবই আনন্দ পেত। পিউবার্টি আসার পর পরই এই ঝোঁকটা বেশী থাকে। এই সব আলোচনা হিন্দীতেই বেশী হতো—সূর্যকুমারের বুঝতে অসুবিধে হতো না। কারণ ছেলেবেলা থেকেই সে উর্দু জানে। অন্যদের তুলনায় এই সব আলোচনায় সূর্যকুমারের ওপর প্রতিক্রিয়া হতো অন্যরকম। শৈশব থেকেই তার কোনো পারিবারিক জীবন নেই, মা-কে মনে নেই, কোনো নারীকেই কাছাকাছি দেখেনি কখনো, সুতরাং এই বিষয়টি তার অচেনা। শিশু যেমন আগুন, জল, খাদ্য এবং লাল, নীল প্রভৃতি রং ক্রমশ আলাদা আলাদা করে চেনে—সূর্যকুমারও তেমনিভাবে মেয়েদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কথা শুনতে লাগলো ঘোর বিস্ময় নিয়ে।

সহপাঠীদের এই সব কথাবার্তা সূর্যকুমারের মনের মধ্যে ছাপ ফেলেছিল। কেন না, সেবারই কলকাতায় এসে সে শ্রীলেখার প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তখনও সেই গম্ভীর স্বভাব থাকলেও মাঝে মাঝে সে শ্রীলেখার বুকের দিকে চেয়ে থাকতো এক দৃষ্টে। যেন একটা চুম্বক তাকে টানছে। বাদল একদিন দেখেছিল, সূর্যকুমার তার বড়দির কোমর ধরে উঁচু করে তুলেছে। শ্রীলেখা ছটফট করতে করতে বলছে, এই কি হচ্ছে, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, মা এসে পড়বে। সূর্যকুমার শ্রীলেখাকে মাটিতে নামিয়ে জোর করে তার ঠোঁট চুষতে শুরু করে। শ্রীলেখা তখন ধরা পড়া পাখির মতন ছটফট করছিল। শ্রীলেখা তখন ক্লাশ নাইনে পড়ে—তার বিয়ের জন্য পাত্র দেখা চলছিল। পরে অবশ্য ব্যাপারটা আরও অনেক দূর গড়ায়।

জুয়া খেলার দলবল একদিন একটি মেয়েকে এনে হাজির করে। জড়ির চুমকি

বসানো কাঁচুলি ও ঘাঘড়া-পরা সেই মেয়েটি যারপর নাই নির্লজ্জ। তার পেশা নাচ দেখানো, আসল উদ্দেশ্য হোস্টেলে-থাকা এই সব বড়লোকের ছেলেদের কাছ থেকে যত দূর সম্ভব টাকা-পয়সা খিঁচে নেওয়া। সূর্যকুমারের সহপাঠীদের মধ্যে দু'একজন বেশ বয়স্ক, দামড়া ধরনের ছেলে, আদি রসে যথেষ্ট অভিজ্ঞ, নাচনেওয়ালীর সঙ্গে সাক্ষাতের দিন কানে আতরমাখা তুলো গুঁজে আসতেও জানে।

হ্যারিকেনের বদলে সেদিন হ্যাজাক জ্বালানো হয়েছিল। নাচ শুরু করার আগে মেয়েটি পায়ের ঘুঙুর ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করে আর টিয়াপাখির ঠোঁটের মতও তীক্ষ্ম চোখে সকলের দিকে তাকায়। একজন লোক একটা বোতল থেকে মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে, আর হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে তবলা বাঁধছে। তারপর 'বানাওরে বাতিয়াঁ বলো কাঁহেকো ঝুটি' ধরনের গানের সঙ্গে নাচ শুরু হয়।

অনিন্দ্যকান্তি কিশোর সূর্যকুমার উদগ্র কৌতূহল নিয়ে বসে থাকে। নাচের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘাঘড়া উড়তে থাকে, হাঁটু থেকে উরু পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়—ফর্সা মেয়েটির পা দুখানি পারস্য দেশের বাঁকা ছুরির মতন ঝলসায়। মেয়েটি তার দৃষ্টিতে চতুর্দিকে আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে। সূর্যকুমারের বুক কাঁপছে, রক্ত চলাচল অসম্ভব দ্রুত, শরীরের মধ্যে কি যেন একটা ছটফট করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মেয়েটির ঘাঘড়াকে মনে হচ্ছে একটা রহস্যের যবনিকা—আরও অনেক অনেক রহস্য চাপা রয়েছে, সময় দুলছে, ঘর দুলছে, যেন পরের মুহূর্তেই পৃথিবীতে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটবে। সূর্যকুমারের মুখখানা সাদা কাগজের মতন ফ্যাকাসে। যেন সমস্ত অন্তরীক্ষ সাগ্রহে লক্ষ্য করছে এই কিশোরের সুশিক্ষার দৃশ্য।

সেদিন ফিরতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। সেদিনই ধরা পড়লে সূর্যকুমার। অন্য সঙ্গীরা পালাতে পেরেছিল, কিন্তু সূর্যকুমার সেদিন এক গেলাস সিদ্ধি পান করার ফলে সুস্থ ছিল না।

তিনজন ফাদার সারারাত ধরে সূর্যকুমারকে জেরা করেন। কে কে তার সঙ্গে গিয়েছিল? কোথায় গিয়েছিল? সূর্যকুমার একটিও কথা খুলে বলে নি। প্রত্যেকবার বলেছিল, সে একা দোষী, সে যেখানে গিয়েছিল সেখানকার ঠিকানা বলবে না।

পাদ্রীরা মারধোর করেন না। মিষ্টি কথায় অনেক শেখাবার চেষ্টা করছিলেন, পাপের ভয় দেখিয়ে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সূর্যকুমারের আত্মা পরিশুদ্ধ করার জন্যে পুরো একদিন অনাহারে এবং তিন দিন তিন রাত একতলার একটি নির্জন ঘরে যীশুর মূর্তির সামনে প্রার্থনা করতে হয়। তারপর প্রধান পাদ্রী সূর্যকুমারকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এরকম কাজ আর কখনো করবে?

সূর্যকুমার মাথা হেলিয়ে বলেছিল, না।

পাদ্রীদের নজর একটু শ্লথ হতেই প্রথম রাত্তিরে সুযোগ পেয়েই সূর্যকুমার পাঁচিল টপকে আবার সেখানে চলে যায়।

ঐ জুয়া খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে মেশার সময়েই এমন একটা ঘটনা ঘটে যাতে সূর্যকুমারের জীবনটা বদলে যায়।

একদিন ঐ জুয়ার আড্ডায় পুলিশের হামলা হলো। পুলিশ সম্পর্কে এমনিতেই তখন ভীতি ছিল যথেষ্ট,—তার ওপর হস্টেলের ছাত্রদের পক্ষে পুলিশের হাতে ধরা পড়াই ছিল চরম সর্বনাশের ব্যাপার। পাদ্রীদের অভিযোগ অভিভাবকরা বিশ্বাস না-ও করতে পারে—কিন্তু পুলিশের সংসর্গে এলে আর রক্ষে নেই।

ছাত্ররা দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটলো। যেদিকেই যায়, পুলিশের হুইশল-এর

আওয়াজ শুনতে পায়। মাঠঘাট পেরিয়ে ওরা ছুটছে—সবাই ছত্রভংগ হয়ে গিয়েছে।

হাজারীবাগে ধনী ব্যক্তিদের অনেকগুলো বাড়ি আছে—সারা বছর সেগুলি প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। সে রকম একটি বাড়ির বাগানে সূর্য আর একটি ছেলে ঢুকে পড়লো। এবং বাড়ির প্রধান দরজা খোলা দেখে আর কোনো কিছু না ভেবে ভেতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল।

গোটা বাড়িটা অন্ধকারই ছিল। হঠাৎ টর্চ জ্বলে উঠলো। সূর্যকুমার আর তার সংগী দেখলো, সিঁড়ির ওপর মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা, গেঞ্জি গায়ে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর বাঁ হাতে টর্চ, ডান হাতে রিভলবার। লোকটি কর্কশ গলায় বললে, হাত তোল।

ক্রমশ ওপর থেকে চার-পাঁচজন লোক নেমে এলো। প্রত্যেকেই সবলকান্তি যুবা-পুরুষ। ভদ্রলোক বলেই মনে হয়, ঠিক ডাকাতের মতন চেহারা নয়। দু'জনের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। যার চেহারা দলপতির মতন, সে বাংলাতেই জিজ্ঞেস করলো ,কি চাও এখানে?

সূর্যকুমারের সংগী হাঁউমাউ করে হিন্দীতে বললো, আমাদের বাঁচান। আমাদের পুলিশ তাড়া করেছে।

পুলিশের নাম শুনেই লোকগুলোর মুখ অন্যরকম হয়ে গেল। দু'জন চলে গেল বাহিরে লক্ষ্য করতে। আর ক'জন ওদের জেরা করতে লাগলো। প্রথমত ওদের বিশ্বাসই করানো যায় না যে, সদর দরজাটা খোলা ছিল। ওদের প্রত্যেকেরই দৃঢ় ধারণা, দরজা বন্ধ ছিলই। জুয়ার আড্ডার কাহিনী শেষ পর্যন্ত বলে ফেলায় শেষ পর্যন্ত ওদের খানিকটা যেন বিশ্বাস হলো। পুলিশের হুইশল আর শোনা যাচ্ছে না।

দলপতি তখন অন্য লোকদের বললেন, এরা সাধারণ বখাটে ছেলে। এদের ছেড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ওরা ফিরে গিয়ে গল্প করবে। এসব ছেলেকে তো চিনি!

সূর্যকুমার কোনো কথা বলে নি। তার সংগীই সব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল। এবার সে বললো, কিসিকো নেহি বোলুংগা। ম্যায় কসম খাঁ রাহা হুঁ।

দলপতি তখন বললেন, কারুকে যদি এ বাড়ির কথা বলিস, তোদের গলা কেটে নেবো। কোনোদিন আর অসবি না, যাঃ!

ঐ দলের একজন লোক সূর্যকুমারকে তীক্ষ্নভাবে লক্ষ্য করছিল। এবার সে বললো, হরদা, এই ছেলেটিকে কি ছাড়া ঠিক হবে? এ তো মনে হচ্ছে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। ওদের বিশ্বাস নেই!

সূর্যকুমারের মুখখানা টকটকে লাল হয়ে গেছে। ভীষণ রেগে গিয়ে বললো, আই অ্যাম নো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান! মাই ফাদার ইজ বেঙ্গলি ব্রামিন!

সেই লোকটি এগিয়ে এসে সূর্যকুমারের গালে এক চড় মেরে বললো, হারামজাদা, বাঙালী বামুনের ছেলে যদি হও—তাহলে বাংলা বলতেও শেখো নি?

চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পরই বাংলার তরুণ সমাজের এক অংশ কংগ্রেসের সংস্রব ছেড়ে আবার বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের কথা চিন্তা করে। উনিশশো কুড়ি-একুশ সালের পর থেকে বিপ্লববাদ একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল। গান্ধীজীর আগমনের পরই ভারতীয় রাজনীতিতে একটা নতুন রূপ এসেছিল। গান্ধীজী অক্লান্ত-ভাবে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়ে বোঝাচ্ছিলেন অহিংসার শক্তির কথা। দু' চারটে বোমা পিস্তলের চেয়ে দেশজোড়া গণ-আন্দোলন যে শাসক শক্তিকে বেশী ভয় পাইয়ে দিতে পারে, এটা তিনি প্রমাণ করেছিলেন। সমস্ত দেশকে তিনি করতে চেয়েছিলেন তাঁর সংগ্রামের সাথী।

গান্ধীজীকে বিপ্লবীরা বরাবরই সন্দেহের চোখে দেখেছে। এই মানুষটির ব্যক্তিগত সততা সমস্ত সন্দেহের ঊর্ধ্বে। এমন শান্ত ধরনের সাহসী মানুষ আগে কেউ দেখে নি। অথচ তিনি কি চান, তা সঠিকভাবে বুঝতে পারে নি যুবসমাজ। তিনি কি চান ইংরেজের কাছ থেকে স্বাধীনতা নামক বস্তুটা ভিক্ষে হিসেবে পেতে? তা কেউ দেয়? ভারতের বিশাল ধনভাণ্ডার ইংরেজ এমনি এমনি ছেড়ে যাবে? সশস্ত্র প্রতিরোধ ছাড়া সিংহ কখনো পশ্চাদপসরণ করে? এর উত্তরে গান্ধীজী একবার বলেছিলেন,

"Had India sword, I would have asked her to draw it. But she had no sword—I ask her to adopt non-violent non-cooperation".

অস্ত্র যখন নেই, তখন অহিংস সত্যাগ্রহই তো শ্রেষ্ঠ উপায়। বিপ্লবীদের তখন প্রধান সম্বল রডা কোম্পানির কাছ থেকে লুট করা পঞ্চাশটি মাউজার পিস্তল। গান্ধীজী বিপ্লববাদকে চাপা দিতে চেয়েছেন, নিন্দে করেছেন, কলকাতা করপোরেশান নিহত শহীদদের নামে শোক প্রস্তাব নিলে চটে গেছেন—অথচ জেলখানা থেকে বিপ্লবী বন্দীদের মুক্ত করার জন্যও চেষ্টা করেছেন।

উনিশশো কুড়ি-একুশ সালে বিপ্লববাদ একটু গা ঢাকা দেয়। অনবরত জেলে যেতে যেতে বিপ্লবী নেতারা ক্লান্ত। পুলিসের কাছে সবাই পরিচিত, কোথাও একটা অ্যাকসান হলেই সব্বাইকে ধরে জেলে পুরে দেয়। এই সময় চিত্তরঞ্জন সবাইকে আহ্বান জানালেন কংগ্রেসের আশ্রয়ে এসে সংগঠন জোরদার করতে। প্রবীণ বিপ্লবীদের কাছে মনে হলো, এ ছাড়া আর উপায়ান্তর নেই তখন।, পাঞ্জাব থেকে ভগৎ সিং ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর কাছে কয়েকটা বোমা ও পিস্তল চাইতে এলে তিনি বললেন, এখন মাথা গরম করো না। দলের সংগঠন শক্ত না করে এখানে সেখানে এক আধটা ক্ষুদ্র জখম করলে পুলিসের অত্যাচারে আবার দল ভেঙে যাবে।

কিন্তু অতি তরুণরা এসব সাবধানী নীতি মানতে চায় নি। তারা ভেতরে ভেতরে ধূমায়িত হচ্ছিল। দেশের জন্য প্রাণ দেবার দুর্দান্ত নেশায় তারা চঞ্চল। ফাঁসীতে মৃত্যুর চেয়ে গর্বের আর কিছু নেই তাদের চোখে। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসের পর বিপ্লবীরা আবার কংগ্রেস সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বেরিয়ে এলো—সারা দেশে তারা আবার আগুন জ্বালালো।

অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর, আত্মোন্নতি সমিতি, মুক্তি সংঘ (বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স বা বি ভি নামে পরিচিত) প্রভৃতি দলের নবীন বিপ্লবীরা আবার অ্যাকসন শুরু করলো। চট্টগ্রামে সূর্য সেন স্থাপন করলেন ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি,

লাহোরে শচীন সান্যালের নেতৃত্বে ভগৎ সিং, রাজগুরু, চন্দ্রশেখর আজাদ, বটুক দত্ত, যতীন দাসেরা প্রতিষ্ঠা করলেন হিন্দুস্থান স্যোসালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি।

দিল্লি অ্যাসেম্বলি হলের মধ্যে বোমা পড়লো, চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত, রাইটার্স বিল্ডিং-এর বারান্দায় তিনটি ছেলে গুলির লড়াই চালিয়ে গেল। সারা দেশ এই সব সংবাদে সরগরম। উনিশশো পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত এসে এই সব কর্মকাণ্ডে আবার একটু চাপ পড়ে। গান্ধী-আরউইন চুক্তি ভেঙে যাওয়ায় পুলিস আবার সবাইকে জেলে ভরেছে—বিপ্লবীদের ফাঁসী দিতে দেরী করে নি।

এই সব কাণ্ডে দেশের স্বাধীনতা কতটা ত্বরান্বিত হয়েছে সে প্রশ্ন ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু এই সব যুবা পুরুষদের অসম সাহসিকতা, নিষ্কলুষ আত্মত্যাগ ভারতবাসীর মনে একটা সম্ভ্রমবোধ জাগিয়ে দিয়েছিল ঠিকই। এরা দেশকে মা বলে জানতো, রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে মৃত্যু জয় করার সাহস পেয়েছিল, পরজন্মে তীব্র বিশ্বাস ছিল। সবাই বিশ্বাস করতো যে, আবার ফিরে আসবো। অনেক ক্ষেত্রেই এরা ইচ্ছে করে ধরা দিয়েছে, কারণ এদের ফাঁসীর ঘটনা এবং শেষ বার্তা প্রচারিত হয়ে যেত সারা দেশে—তাতে নতুন ছেলেরা প্রেরণা পেত।

এ সবই জানা ইতিহাস। তবু তখনকার ছেলেদের রোমাণ্টিক মনে এই সব মৃত্যুজিৎ যুবকদের জীবন ও কাজ কিরকম উদ্দীপনার সৃষ্টি করতো সেটা বোঝাবার জন্য কয়েকটি দৃষ্টান্তের পুনরুল্লেখ করা দরকার।

সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাচ্ছিল লাহোরের মানুষ—পুলিস ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠি পেটা করে হাত-পা ভেঙে দিল অসংখ্য মানুষের। লালা লাজপত রায় তো সেই মার খেয়ে মারাই গেলেন। এই অত্যাচারের নায়ক পুলিস কমিশনার স্কট। হিন্দুস্থান সোসালিষ্ট রিপাব্লিকান আর্মি সিদ্ধান্ত নিল স্কটকে খুন করার। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর কাছ থেকে ভগৎ সিং শেষ পর্যন্ত কিছু পিস্তল ও বোমা আদায় করেছিল। পুলিস দপ্তরের সামনের রাস্তায় উনিশশো আঠাশের ডিসেম্বরের এক বিকেলে দাঁড়িয়ে রইলো ভগৎ সিং, রাজগুরু, চন্দ্রশেখর আজাদ। সাহেব বেরিয়ে আসতেই তিনজন তিনদিক থেকে গুলি চালালো—রক্তাপ্লুত অত্যাচারীকে রাস্তায় ফেলে রেখে পালিয়ে গেল ওরা—কেউ ধরা পড়লো না। পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল ওরা স্কটের বদলে স্যাণ্ডার্স নামে আর একজন অফিসারকে মেরেছিল।

পরের বছর দিল্লিতে অ্যাসেম্বলিতে হঠাৎ প্রচন্ড শব্দে বোমা ফাটলো, তারপরই সমস্ত হল ঘর ভরে উড়তে লাগলো লাল৷ ইস্তাহার। সেই ইস্তাহারের প্রথম বাক্য, 'বধিরকে শোনাবার জন্য এইরকম জোর আওয়াজ দরকার।' পুলিস ধরতে পারেনি, তবু ধরা দিলেন ভগৎ সিং এবং বটুক দত্ত। গান্ধীজীর প্রচুর চেষ্টা সত্ত্বেও ফাঁসী হয়ে গেল ভগৎ সিং আর দু'জনের। অন্যদের দ্বীপান্তর।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সময়েই সেখানকার জেলখানায় স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করলেন কলকাতার যতীন দাস। মানুষের প্রতি মানুষের যা ব্যবহার পাওয়া উচিত জেলখানায় তার চিহ্নমাত্র নেই বলে তেষট্টি দিন না খেয়ে রইলেন। হাজার চেষ্টা করেও তাঁর প্রতিজ্ঞা ভাঙা যায় নি। যতীন দাসের চিতার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর বৃদ্ধ পিতা হাত তুলে বললেন, ওঁ নারায়ণ। যে দেশদ্রোহীরা মাতৃভূমিকে বিদেশীর হাতে তুলে দিয়েছে, তাদের সকলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমার আদরের যতীনকে তোমার পায়ে দিলাম।

১৯৩০ সালে ইস্টারের ছুটির দিনে শীর্ণকায় প্রাক্তন স্কুলশিক্ষক সূর্য সেনের

নেতৃত্বে একটি বাহিনী চট্টগ্রামে সাফল্যের সঙ্গে লুঠ করলো অস্ত্রাগার। এই বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার হাতে পেয়েও তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার এঁরা করতে পারলেন না দু' একটি সামান্য ভুলের জন্য।

অস্ত্রাগার আক্রমণের নিখুঁত পরিকল্পনা সত্ত্বেও বিপ্লবীরা আগে থেকে খবর রাখেননি যে অস্ত্র আর গোলা বারুদ এক জায়গায় রাখা হয় না। সুতরাং অস্ত্র দখল করেও নষ্ট করে দিতে হলো, কারণ রসদ পাননি। তাঁরা আর একটি ভুল করেছিলেন, তাঁরা জানতেন না যে ইস্টারের ছুটিতে সাহেবরা ক্লাবে যায় না—বাড়িতে উৎসব করে। তাই ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেও কারুকে পাওয়া গেল না।

তবু সূর্য সেন চট্টগ্রামে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। জালালাবাদের যুদ্ধে অন্তত একবার পরাজিত করেছিলেন ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে। লোকনাথ বল, নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ প্রভৃতিকে সবাই মনে করলো মহাকাব্যের বীর পুরুষদের মতন। এবং সূর্য সেন প্রবাদপ্রসিদ্ধ নায়ক।

ঐ বছর অগাস্ট মাসে ঢাকার হাসপাতাল পরিদর্শনে গেছেন পুলিসের ইন্সপেক্টার লোম্যান এবং ঢাকা জেলার পুলিস সুপার হাডসন। মেডিক্যাল স্কুলের সুদর্শন ছাত্র বিনয় বসু একলা রিভলবার নিয়ে আক্রমণ করলো তাদের চোখের নিমেষে সবাই দেখলো, সব প্রহরীদের তুচ্ছ করে বেরিয়ে যাচ্ছে এক তরুণ যুবা। লোম্যান নিহত, হাডসন আহত, বিনয় পলাতক। চাষীর ছদ্মবেশে কলকাতায় পালিয়ে এলো সে। বিনয়ের এই চমকপ্রদ কীর্তিতে সারা দেশ স্তম্ভিত। বিনয়ের মাথার দাম তখন দশ হাজার টাকা। শরৎ বোস, আচার্য পি সি রায় গোপনে পরামর্শ দিলেন বিনয়কে স্মাগল করে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হোক, না হলে তাকে বাঁচানো যাবে না। কিন্তু বিনয় বাঁচতে চায় নি। বাদল আর দীনেশকে সঙ্গে নিয়ে সে আবার গেল রাইটার্স বিল্ডিং-এ —ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ প্রিজন্স কর্নেল সিম্পসনকে হত্যা করলো। তারপর সারা রাইটার্স বিল্ডিং কাঁপিয়ে দিল বন্দেমারতম ধ্বনিতে। বিনয়ের লক্ষ্য কখনো ব্যর্থ হয়নি, একমাত্র সে ব্যর্থ হয়েছিল আত্মহত্যা করতে গিয়ে। একই সঙ্গে সায়েনাইড খেয়ে মাথায় গুলি চালিয়েছিল ওরা তিনজন—বাদল সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়—বিনয় এবং দীনেশ বিষ ও গুলির প্রতিক্রিয়া কাটিয়ে উঠেছিল। হাসপাতালে জ্ঞান ফেরার পর বিনয় মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলে সেলাই ছিঁড়ে দেয়—সে জেলখানায় যাবে না প্রতিজ্ঞা করেছিল, যায় নি।

ফাঁসীর আগে দীনেশ গুপ্ত তার বউদির কাছে চিঠিতে লিখেছিল, "আমি অমর। আমাকে মারিবার সাধ্য কাহারো নাই।" সে আবৃত্তি করতো,

এ তো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন
বজ্র হেন ভারী—
এ যে তোমার তরবারি।

এই দেশেই সে আবার জন্মাবে, আবার সুখী স্বাধীন ভারতবর্ষে ফিরে আসবে—এ সম্পর্কে তার কোনো সন্দেহই ছিল না, তার কারণ পরজন্ম তত্ত্বে তার ছিল অগাধ বিশ্বাস। বউদিকে সে লিখেছিল, "দেহের মৃত্যু হইলেই আমাদের সব শেষ হইয়া যায় না, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। আমরা হিন্দু, হিন্দুধর্মে এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছে, কিছু কিছু জানি। মুসলমান ধর্মও বলে, মানুষ যখন মরে, তখন খোদার ফেরেস্তা

তার রূহ কবজ্ করিতে আসেন। মানুষের আত্মাকে ডাকিয়া বলেন, "অ্যায় রূহ্, নিকাল ইস কালিব্সে চল্ খুদাকা জান্নৎমে।" অর্থাৎ তুই দেহ ছাড়িয়া ভগবানের কাছে চল্। তাহা হইলে বোঝা গেল মানুষ মরিলেই তার সব শেষ হইয়া যায় না; মুসলমান ধর্মের এই বিশ্বাস আছে। খৃস্টান ধর্ম বলে,

Very quickly there wil be an end of thee here; consider what will become of thee in the next world".

বোঝা গেল খৃষ্ট ধর্মও বিশ্বাস করে মানুষের দেহের মৃত্যু হইলেও আত্মা মরে না।...গীতা বলিয়াছেন, শাস্ত্র সকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নিতে দহন করিতে পারে না, জলে ভিজাইতে পারে না, বায়ুতে শুষ্ক করিতে পারে না। এ আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্ববাপী!...এ তিন ধর্মের কোনো একটি মানিলেই আমাকে মানিয়া লইতে হইবে যে, আমার মৃত্যু নাই।"

কলকাতা থেকে বি এ পাশ করে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার চট্টগ্রামে চলে এলেন পলাতক সূর্য সেনের খোঁজে। এত বড় বৃটিশ শক্তির চোখে ধুলো দিয়ে সূর্য সেন তখনও বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং দল সংগঠন করে ছেলেদের অ্যাকসনে পাঠাচ্ছেন। প্রীতিলতা সূর্য সেনকে চোখে দেখার আগেই ব্রত নিয়েছিলেন, এই মানুষটির নির্দেশ অনুযায়ী তিনি দেশের জন্য কোনো একটা কাজ করে যাবেন। সূর্য সেন প্রীতিলতাকে পাঠালেন পাহাড়তলির ইওরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে—যে ইওরোপীয়ান ক্লাবের সদস্যরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরই চমকপ্রদ দ্রুত গতিতে এসে বিপ্লবীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই কঠিন কাজে সূর্য সেন প্রীতিলতাকে নেত্রী করে পাঠালেন একটি বিশেষ কারণে —যাতে পৃথিবীর মানুষ জানতে পারে যে বাঙালী মেয়েরাও বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যে-হেতু ধরা না পড়লে প্রীতিলতার অংশগ্রহণের কথা কেউ জানবে না—তাই ইওরোপীয়ান ক্লাবে সার্থক আক্রমণ চালিয়ে—বহুজনকে রিভলবারের গুলিতে হতাহত করে—পালাবার পথ খোলা থাকলেও প্রীতিলতা বিষ খেলেন। তাঁর শরীর তল্লাস করে পাওয়া গেল, তাঁর নিজের লেখা ইংরেজী ঘোষণা পত্র। যার প্রথমেই আছে—"বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। আমি একজন সৈনিক। আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি।"

এদিকে, পর পর তিন বছরে মেদিনীপুরের তিনজন ম্যাজিস্ট্রেট খুন হয়। ১৯৩১-এ পেডি, ১৯৩২-এ ডগলাস, ১৯৩৩-এ বার্জ। ডগলাসকে খুন করে প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ও প্রভাংশু পাল—প্রভাংশু পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন কিন্তু পিস্তলের গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় প্রদ্যোৎ ধরা পড়ে। তার ফাঁসি হয়। এরা কেউই গুণ্ডা বা ডানপিটে ধরনের ছেলে ছিল না—এরা আদর্শব্রতী, স্বপ্ন দেখা যুবক। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য জেলখানা থেকে তার মাকে লিখেছিলঃ

"মা, তোমার প্রদ্যোৎ কি কখনো মরতে পারে? আজ চারিদিকে চেয়ে দেখ, লক্ষ লক্ষ 'প্রদ্যোৎ' তোমার দিকে চেয়ে হাসছে। আমি বেঁচেই রইলাম মা, অক্ষয় অমর হয়ে—বন্দেমাতরম!"

বার্জ হত্যা মামলায় ফাঁসি হয় রামকৃষ্ণ রায়, ব্রজকিশোর চক্রবর্তীর এবং নির্মল জীবন ঘোষের। ফাঁসির আগে ব্রজকিশোর চক্রবর্তী তাঁর মাকে লিখেছিলেন, "এই সবপেয়েছি'র দেশ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি, তথাপি আমি নিশ্চয় করে বলে যাচ্ছি, আপনার ঘর কখনো অন্ধকার হবে না।...মা, ফিরে আসবার যদি কোন পথ থাকে, তবে এই সব-পেয়েছির দেশে আবার ফিরে আসবো—তখন চরণে স্থান দেবেন।"

কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে মেরে এলো দুটি মেয়ে, শান্তি ঘোষ আর সুনীতি চৌধুরী। তখন অনেক মেয়েই অংশ নিয়েছে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে। কল্পনা দত্ত, বীণা দাস, উজ্জ্বলা মজুমদার—এই সব বীরাঙ্গনার নাম ছড়িয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে কেউ হারমোনিয়ামের মধ্যে রিভলবার লুকিয়ে নিয়ে যায়, কেউ কনভোকেশনের সময় সরাসরি গভর্নরকে গুলি করে।

১৯৩৪-এ দার্জিলিং-এর রেস কোর্সে কয়েকটি ছেলে আর মেয়ে গুলি ছুঁড়ে মারতে গেল গভর্ণর জন এন্ডারসনকে। সেই মামলায় ফাঁসি হয় ভবানী ভট্টাচার্যের। সদ্য ম্যাট্রিক পাশ এই নবীন যুবকটি মৃত্যুর আগে তার ছোট ভাইকে পোস্টকার্ড লিখেছিলঃ

"অমাবস্যার শ্মশানে ভীরু ভয় পায়—সাধক সেখানে সিদ্ধি লাভ করে। আজ আমি বেশি কথা লিখবো না, শুধু ভাববো। মৃত্যু কত সুন্দর!"

সূর্য সেন ধরা পড়ার পর বিপ্লবীরা বেশ খানিকটা দমে গেল। এমন একটা প্রায় অলৌকিক বিশ্বাস লোকের মনে জন্মে যাচ্ছিল যে, সূর্য সেনকে ধরার ক্ষমতা কারুর নেই। কিন্তু সূর্য সেনেরও ফাঁসি হয়ে গেল ১৯৩৪ সালে। এদিকে ম্যাজিস্ট্রেট ও গভর্নর পর্যায়ে শারীরিক আক্রমণের ফলে পুলিস ক্ষেপে উঠে সারা দেশ তছনছ করে ফেললো, গ্রামে গ্রামে পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল গুপ্তচর। বিপ্লবীরা অধিকাংশই জেলে—বাকীরা আত্মগোপন করলেন। সমগ্র দেশে নেমে এলো শ্মশানের শান্তি।

কিন্তু যুবকদের অদম্য প্রতিরোধ শক্তি আবার মাথা চাড়া দিয়েছিল। ফাঁসির আগে কারাগার থেকে সূর্য সেন পাঠালেন তাঁর শেষ বাণীঃ

"আমার শেষ বাণী—আদর্শ ও একতা।

ফাঁসির রজ্জু আমার মাথার উপর ঝুলছে।...এই আনন্দময়, পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য কি রেখে গেলাম? শুধু একটি মাত্র জিনিস, তা হলো আমার স্বপ্ন। একটি সোনালী স্বপ্ন। এক শুভ মুহূর্তে আমি প্রথমে এই স্বপ্ন দেখেছিলাম। উৎসাহভরে সারা জীবন তার পেছনে উন্মত্তের মতো ছুটেছিলাম।... বন্ধুগণ, ওঠো, জাগো, জয় আমাদের সুনিশ্চিত।...

বিদায়!

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! বন্দেমাতরম।"

সূর্য সেনের এই বাণী ব্যর্থ হয়নি। বস্তুতঃ, প্রতিটি মৃত্যু, প্রতিটি আত্মদানই নতুন প্রেরণা দিয়েছে। কয়েক বছর একটু সুপ্ত থাকার পর সাম্রাজ্য-বিরোধী লড়াইতে আবার অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শোনা যায়। আবার বুলেট, বিস্ফোরণ, রক্তপাত—এরই পরিণতি বেয়াল্লিশের অগাস্ট আন্দোলন।

১৯৩৮ সালের শেষ দিকে কয়েকটি যুবক হাজারীবাগের জেল ভেঙে বন্দীদের মুক্ত করার এক পরিকল্পনা নেয়। হাজারীবাগের দুটি বাগানবাড়িতে ছিল তাদের আস্তানা। তারা দিনের বেলা কক্ষনো বাইরে বেরুতো না, স্থানীয় লোকদেরও সঙ্গেও তারা বিশেষ যোগাযোগ রাখে নি।

সূর্যকুমার আর তার বন্ধু ছুটতে ছুটতে এদের গোপন আস্তানায় গিয়ে পড়ে হঠাৎ। ওই বাড়িতে ওঁদের উপস্থিতির কথা ফাঁস হয়ে যাবার আশঙ্কায় ওঁরা ছেলে দুটিকে নামিয়ে খুব মুশকিলে পড়েছিলেন। সাহেবী স্কুলে পড়া এই সব বড়লোকের বাচ্চাদের ওঁরা বিশ্বাস করবেনই বা কি করে? শেষ পর্যন্ত সূর্যকুমারকে ওঁরা ভোর রাত্রি পর্যন্ত আটকে রেখে জেরা করলেন—সূর্যকুমারের চেহারায় ও কথাবার্তা শুনে

ও'দের সন্দেহ হয়েছিল।

॥ ১১ ॥

দলের নেতার নাম হরকুমার। মানুষটি অসম্ভব রোগা, গলার অ্যাডমস্ অ্যাপেল বা কণ্ঠমণিটি অনেকখানি বেরিয়ে আছে, কাঁধ দুটো এমন বেখাপ্পা ধরনের উঁচু যে মনে হয়, হাতের বদলে দুটি ডানা লাগানো আছে। কিন্তু হরকুমারের চোখের দৃষ্টি তীব্র, বেশীক্ষণ চোখাচোখি করে থাকা যায় না। হরকুমার কঠোরভাষী নন, বরং কথা বলার মধ্যে একটা ক্লান্ত ভঙ্গি আছে। মাঝে মাঝেই কাশির দমক ওঠে, তখন জলের গেলাসে চুমুক না দিলে আর কথা বলতে পারেন না।

মেঝের ওপর ছেঁড়া শতরঞ্জি পাতা। হরকুমার সূর্যকে বললেন, বসো ওখানে।

এই দলের আর চারজনের নাম পরেশনাথ, বিষণ সিং, ব্রজগোপাল এবং আলিমুদ্দিন। আলিমুদ্দিনকে সবাই মাস্টার সাহেব বলে ডাকে।

আলিমুদ্দিন সাহেব বললেন, হরদা, আপনার মনে আছে, এই রকম একটা ছোঁড়াই মজঃফরপুরে পুলিসের ইনফর্মার ছিল?

হরকুমার ক্লান্তভাবে বললেন, হুঁ। এই যে ছেলে, তোমার নাম কি?

—সূর্যকুমার ভাদুড়ী।

—বাবার নাম কি? কি করেন তিনি? কোথায় থাকেন?

অনেকক্ষণ ধরে জেরা করা হলো সূর্যকুমারকে। সূর্যকুমারের উত্তরগুলো শুনে ও'রা খুব একটা সন্তুষ্ট হচ্ছিলেন না। এ ছেলেটির ভাবভঙ্গিই একটু বিচিত্র। অনেক কথার উত্তর দেয়, অনেক কথার উত্তর দেয় না। সব কিছুই যেন তার পছন্দ-অপছন্দের ওপর নির্ভর করছে। এ রকম একটা পরিবেশের মধ্যে—হ্যারিকেনের টিমটিমে আলোয় শতরঞ্জির ওপর বসা পাঁচজন অপরিচিত মানুষ—একজনের কোলের ওপর তখনও পিস্তল রাখা—কিন্তু সূর্যকুমার এতে ভয় পাবার বদলে আকৃষ্ট হয়েছিল বেশী। সে এক একবার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সকলের মুখের দিকে দেখছিল।

হরকুমার বললেন, ছেলেটিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। ও যখন পাদ্রীদের ইস্কুলে পড়ে, ওকে কেউ সন্দেহ করবে না। শোনো খোকা, ইংরেজের গোলামী করার জন্য তুমি জন্মাও নি। যদি দেশের স্বাধীনতার জন্য তোমাকে প্রাণও দিতে হয়—তবুও জানবে তোমার জীবনটা ধন্য। দরকার হলে সে-রকম প্রাণ দিতে পারবে?

সূর্যকুমার কোনো উত্তর দিল না।

ব্রজগোপাল জিজ্ঞেস করলেন, তুমি দীনেশ গুপ্তের নাম শুনেছো? সূর্য সেনের নাম শুনেছো?

সূর্যকুমার ওসব নাম শোনে নি।

আলিমুদ্দিন মাস্টার বললেন, এ দেখছি সূর্য নামের কলঙ্ক। লোকনাথ বলের ছোট ভাই ট্যাগরা তো তোমারই বয়েসী ছিল। সে কি রকম ভাবে লড়াই করতে করতে জান দিয়েছিল জানো?

হরকুমার বললেন, মাস্টার সাহেব, ওকে একটু একটু তালিম দেবেন। এই রকম ভাবেই তো দেশের ছেলে তৈরী করতে হবে। বিষণ সিং, ছুরিটা দাও তো!

বিষণ সিং-এর কাছ থেকে ছুরিটা নিয়ে হরকুমার সেটা এগিয়ে দিলেন সূর্যকুমারের

দিকে। তারপর বললেন, নিজের হাতে তোমার একটা আঙুল চিরে একটু রক্ত বার করো তো! পারবে না?

সূর্যকুমার ছুরিটা নিয়ে ধরে পরীক্ষা করতে লাগলো। তারপর হঠাৎ খ্যাঁচ করে বসিয়ে দিল বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে। গলগল করে রক্ত পড়তে লাগলো। দু' তিনজন চমকে হা হা করে উঠলো, অত না, অত না!

হরকুমার শান্ত ভাবেই বললেন, ঠিক আছে, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। একটু রক্ত পড়লে কিছু যায় আসে না। তুমি ঐ রক্তের ছাপ দাও নিজের কপালে, তারপর বলো, আমি দেশের জন্য সর্বস্ব পণ করিলাম। এ শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত আমি ইংরাজের দাসত্ব কিংবা পরাধীনতার শৃঙ্খল সহ্য করিব না! বন্দেমাতরম!

হরকুমার তারপর মুখ ফিরিয়ে বললেন, না হে মাস্টার সাহেব, ছেলেটার মুরোদ আছে। দিন, এবার ছেলেটার হাতটা একটু ব্যান্ডেজ করে দিন!

এখানে একটা কথা বলা দরকার। সূর্যকুমারের তখনও তেমন বাংলা ভাষার জ্ঞান ছিল না যাতে দেশমাতৃকা, দাসত্ব শৃঙ্খল, সর্বস্ব পণ ইত্যাদি শব্দের ঠিক ঠিক মানে বুঝতে পারবে। তা ছাড়া, ঐ সব শব্দের অন্তর্নিহিত ভাবও তার পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নয়—কারণ ছেলেবেলা থেকে সে সেরকম কোনো শিক্ষা পায় নি। মাতৃভূমির কোনো ভাবমূর্তি তার চোখে ছিল না। ঐ সব আঙুল কেটে প্রতিজ্ঞা ট্রতিজ্ঞার ব্যাপারগুলো সে করেছিল নিছক নতুনত্বের লোভে—তা ছাড়া নিষিদ্ধ ও বিপজ্জনক কাজ করার প্রতি তার সহজাত ঝোঁক ছিল। আঙুলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার পর সে জিজ্ঞেস করেছিল, আমাকে ঐ রিভলবার ছুঁড়তে দেবেন?

হরকুমার বলেছিলেন, হ্যাঁ দেবো। বুকের মধ্যে যেদিন শত্রুকে আঘাত হানার আগুন সত্যিকারের জ্বলে উঠবে—সেদিন অস্ত্রও ঠিক পেয়ে যাবে।

একটু গালভারী ধরনের আদর্শবাদী বাক্য বলা স্বভাব হরকুমারের।

তারপর থেকে সূর্যকুমার সহপাঠীদের সঙ্গে জুয়ার আড্ডায় যাবার বদলে একা একা চলে আসতো এই বিপ্লবীদের গোপন আস্তানায়। ব্রজগোপালের কাছে সে কুস্তির প্যাঁচ শিখতো। হরকুমার শোনাতেন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-বিষয়ক কবিতা। এ ছাড়া বিপ্লবীদের সম্পর্কে অসংখ্য গল্প। কার্ল মার্কস, ডি ভ্যালেরা, স্ট্যালিন সম্পর্কেও আলোচনা হতো। একদিন হরকুমারের কাছে এমন একটা গল্প শুনলো, তার আর তুলনা নেই।

হরকুমার প্রায়ই সূর্যকে দেখে বলতেন, ওই ছেলেটাকে দেখলেই আমার বৈকুণ্ঠ সুকুলের কথা মনে পড়ে। চেহারায় খুব মিল আছে। প্রথম দিন ওকে দেখেই সে কথা মনে পড়েছিল বলে ছেলেটার ওপর আমার মায়া পড়ে যায়।

সূর্যকুমার জানতো না বৈকুণ্ঠ সুকুল কে। একদিন জানলো।

ঐ গোপন আস্তানায় প্রায়ই একজন পাগলা মতন লোক আসতো। একজন মাঝ-বয়েসি মুসলমান, মুখ ভর্তি দাড়ি, নোংরা ছেঁড়া খাকি জামা ও প্যান্ট। মাটিতে শুয়ে পড়ে সে হরকুমারের পা জড়িয়ে ধরতো আর কাঁদতো হাউ হাউ করে। পাগল হলেও খুব নিরীহ পাগল। হরকুমার খুব স্নেহের সঙ্গে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, তাকে জোর করে বসিয়ে খাবার খাওয়াতেন। তারপর দুজনে খুব নিকট আত্মীয়ের মতন কথা বলতেন কিছুক্ষণ।

একদিন সূর্যকুমার জিজ্ঞেস করেছিল, হরদা, ঐ পাগলটা তোমার কাছে আসে কেন?

হরকুমার বলেছিলেন, শুনবি ওর কথা? পরেশ, তুমি বলে দাও তো ওর কাহিনীটা।

পরেশ বললেন, না, হরদা, আপনিই বলুন। আপনার মতন কেউ বলতে পারবে না।

হরকুমারের সেদিন কাশি বেড়েছে। অনবরত কাশছেন আর মুখে রুমাল চাপা দিচ্ছেন। হরকুমারের শরীর যেভাবে ভেঙে পড়ছে—আর ক'দিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন তার ঠিক নেই। কিন্তু হরকুমার কিছুতেই চিকিৎসা করাবেন না, নিজস্ব টোটকা ওষুধ খেয়েই থাকবেন।

একটু কাশি থামিয়ে হরকুমার বললেন, আমি যখন গয়া জেলে ছিলাম, তখন ঐ যাকে এখন পাগলা দেখছিস, ও ছিল একজন হাবিলদার। ওর পুরো নাম আমি আজও জানি না, তবে সবাই ওকে বলতো হাবিলদার রেজা। ইউ পি-র লোক, উর্দুতে কথা বলে। প্রথম মহাযুদ্ধে ও ভার্দুনে, মেসোপটেমিয়ায় লড়েছে। লেখাপড়া কিছু জানে না, কিন্তু ঘুরেছে অনেক দেশ। তারপর যুদ্ধ থেমে গেল নানান ঘাটের জল খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত গয়া জেলে রক্ষীর কাজ পেয়েছিল। এটা বছর চারেক আগের কথা। হাবিলদার রেজাকে তখন ভালো করে চিনতাম না—চেনার দরকারও ছিল না। আমরা সব রাজাবন্দী, ও একজন বিশাল চেহারার গার্ড, জুতো খটখটিয়ে সেলের বাইরে দিয়ে চলে যায়। ওকে চিনলাম এক রাত্তিরে।

তখন জেলখানা রাজবন্দীতে ভর্তি। গান গেয়ে, হইচই করে আমরা সব ভুলে আছি। হঠাৎ একদিন শুনলাম, সাত ডিগ্রি কন্‌ডেম্‌ড্ সেলের একজন আসামীর ফাঁসী হবে। আমরা তখন আছি পনরো ডিগ্রিতে। কার ফাঁসী হবে, নাম জানতে পারলাম না—ভীষণ কৌতূহল জেগে রইলো।

ফাঁসীর আগের দিন আসামীকে পনরো ডিগ্রির এক নম্বর সেলে আনা হলো। সেদিন বিকেলে আমাদের জেনারেল লকআপ হয়ে গেল তাড়াতাড়ি। আমাদের সবাইকে এনে ঢোকানো হলো যার যার নির্দিষ্ট ব্যারাকে আর সেলে। পাশাপাশি কয়েকটা সেলে আছি আমি, রঘুনাথ পাণ্ডে, ত্রিভুবন আজাদ আর বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত। লোহার গরাদ ধরে উৎসুকভাবে তাকিয়ে আছি, কখন আনা হবে ফাঁসীর আসামীকে।

সন্ধ্যের সময় তাকে আনা হলো। অনেকগুলো বুটের শব্দ, জেলার, ডেপুটি জেলার, বড় জমাদার, সেপাই সান্ত্রী সবাই মিলে নিয়ে আসছে একজনকে—কে এমন মহাপুরুষ? দেখলাম হাত পায়ে শিকল বাঁধা ফুটফুটে চেহারার এক কিশোর। শিকল ঝনঝনিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছে উৎফুল্ল মুখে, ঠিক যেন সিংহের বাচ্চা! ফাঁসীর আগে এক নম্বর সেলে ঢোকাবার সময় আসামীর হাত পায়ের শিকল বেড়ি খুলে দেওয়াই নিয়ম, হারামজাদারা ওর বেলায় তা-ও করেনি। পুলিসের চোখেও নাকি ডেঞ্জারাস ক্রিমিনাল। অথচ কি বলবো তোমাদের, কি সরল নিষ্পাপ তার মুখ—এই আমাদের সূর্যর থেকে মাত্র দু'তিন বছরের বড় হবে—তাকে দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, সে নাকি বিপজ্জনক আসামী!

আমাদের সেলগুলোর পাশ দিয়ে যখন সে যাচ্ছে, তখন বিভূতিদা হঠাৎ অস্ফুট-ভাবে বলে উঠলেন, আরেঃ, এ যে বৈকুণ্ঠ সুকুল।

আসামীও বিভূতিদাকে চিনতে পেরে মহা-উল্লাসের সঙ্গে বলে উঠলো, দাদা, আ গয়া! ফির মুলাকাত—

বিভূতিদা কম্পিত গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, বন্দে মাতরম্! তখন অন্য সব সেল থেকেও সবাই গর্জন করে বন্দে মাতরম বলে সেই আসামীকে সম্বর্ধনা জানালো!

আমি বিভূতিদাকে জিজ্ঞেস করলাম, দাদা, বৈকুণ্ঠ সুকুল কে? আগে তো শুনিনি

এর কথা!

বিভূতিদা বিষণ্ণ ভাবে বললেন, ওকে বছর চারেক আগে একবার দেখেছিলাম পাটনা ক্যাম্প জেলে। একেবারে বাচ্চা! তার কাল ফাঁসী হবে?

পরে আমরা জেনেছিলাম, বৈকুণ্ঠ সুকুল অত্যন্ত দুঃসাহসী অ্যাকশান করেছে। ও মজঃফরপুরের ছেলে—ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকির যোগ্য উত্তরসাধক। ভগৎ সিংদের ফাঁসীর মামলায় রাজসাক্ষী হয়েছিল যে ফণী ঘোষ সে তখন ঐ জেলাতে এসে দোকান খুলেছে, দিন রাত তাকে পুলিসের লোক পাহারা দেয়। সেই অবস্থাতেই তাকে খতম করে দিয়েছে বৈকুণ্ঠ সুকুল। রাজসাক্ষীর প্রতি কোনো দয়া নেই। বৈকুণ্ঠ সুকুল তখন ধরাও পড়েনি, ছদ্মবেশে পালিয়ে ছিল বেশ কিছুদিন, তারপর ধরা পড়লো শোনপুরের মেলায়।

যাই হোক, সে রাত্রে আমাদের ঘুমোবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, সবাই লোহার গরাদ ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। সবাই মনে মনে প্রার্থনা করছি, এ রাত্রি যেন ভোর না হয়। সূর্য ওঠার পর সুকুল আর ইহ জগতে থাকবে না।

হঠাৎ এক নম্বর সেল থেকে সুকুলের ডাক শোনা গেল, বিভূতিদা—

বিভূতিদা সাড়া দিলেন। তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দু'জনে কথা হতে লাগলো। সুকুল বলছে, দাদা, আপনার পাটনা জেলের কথা মনে আছে? কত গান শুনিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছিলেন—সেই কবিতা, মরণ, হে মোর মরণ!

খট্ খট্ করে সেপাইয়ের পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। আমরা চুপ। বিভূতিদার সেলের সামনে এসে দাঁড়ালো হাবিলদার রেজা। চুপ করে একটুক্ষণ কি যেন ভেবে আবার চলে গেল। ফিরে এলো খানিকটা বাদে। এবার তার হাতে এক গোছা সাদা ফুল। আমরা অবাক। কোথা থেকে সে এই ফুল জোগাড় করে এনে দিয়েছিল সুকুলকে, সুকুল আবার তার খানিকটা পাঠিয়েছে বিভূতিদাকে।

বিভূতিদা হাত পেতে ফুলগুলি নিলেন, একটাও কথা বলতে পারলেন না, হাবিলদার তখনও দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ সে বিভূতিদাকে জিজ্ঞেস করলো, ক্যা শোচ রহা হ্যায়, বাবুজী!

বিভূতিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কি আর ভাববো!

হাবিলদার গরাদ ধরে ঝুঁকে এলো বিভূতিদার দিকে। তারপর অদ্ভুত আর্ত গলায় ফিসফিসয়ে বললো, বাবুজী, এই লেড়কাকে বাঁচানো যায় না? লাটের ওপরে লাট আছে, তারও ওপরে আছে বিলেতের বাদশা—বাঁচানো যায় না! যে-কোনো উপায়ে সুকুলজীকে বাঁচানো যায় না!

সেই রুক্ষ, কঠিনহৃদয় সৈনিকের মুখে একথা শুনবো আমরা কেউ আশা করিনি। কথা শুনেই টের পেলাম ওর হৃদয়ে খুব একটা ধাক্কা লেগেছে। হাবিলদার রেজা আরও বললো, সে অনেক মানুষকে মরতে দেখেছে, নিজের হাতেও যুদ্ধের সময় মানুষ মেরেছে। এ জীবনে বাহাদুর সে কম দেখেনি—কিন্তু সুকুলজীর মতন দেখেনি কারুকে। বীরপুরুষের এরকম চেহারা সে কী কখনো কল্পনা করতে পেরেছিল, মরতে যার একটুও ভয় নেই! এরকম একটা মানুষ যদি দুনিয়া থেকে চলে যায়—তাহলে দুনিয়াটা কি শুধু ডরপুক-এর জন্য?

সুকুল এমনিতেই খুব রূপবান, তারপরও হাবিলদার বললো, ফাঁসীর হুকুম পাকা হয়ে যাবার পর তার শরীরটা গোলাপের মতন হয়ে উঠছে! গুলাব জ্যায়সা—গুল জ্যায়সা খিল রহা থা বাবুজী! আমার জীবন দিয়েও যদি ওকে বাঁচানো যেত। কিছু

একটা হয় না।

প্রায় ফোঁপাতে ফোঁপাতেই চলে গেল হাবিলদার। সেই সঙ্গে সে আমাদেরও রুদ্ধবাক করে দিয়ে গেল। রাত গভীর হয়ে উঠছে, কত রাত জানি না, জানি না ভোরের কত দেরী। হঠাৎ সুকুল আবার বলে উঠলো, বিভূতিদা, গান শুনবো! সেই যে, হাসি হাসি পরবো ফাঁসী?

ক্ষুদিরামের ফাঁসীর এই গান বাঙালী অবাঙালী সবারই প্রিয়। রাজবন্দীরা এ গান শোনে মন্ত্রমুগ্ধের মতন। বিভূতিদা উদাত্ত গলায় গান ধরলেন:

একবার বিদায় দে মা
ঘুরে আসি
হাসি হাসি পরবো ফাঁসি মা
দেখবে ভারতবাসী...
দশমাস দশদিন পরে
জন্ম নেবো মাসির ঘরে
চিনতে যদি না পারিস, মা,
চিনবি গলায় ফাঁসী—

বিভূতিদা একবার গানটা শেষ করছেন, আর বৈকুণ্ঠ সুকুল চেঁচিয়ে বলছেন, আবার! আবার! কতক্ষণ সে গান চলেছিল খেয়াল নেই—আমরা সেই গানের মধ্যে মিশে গিয়েছিলাম।

খানিকক্ষণ বাদে সুকুল বললো, দাদা বাঁশী শুনবো! আমরা অবাক। জেলখানার মধ্যে বাঁশী কোথা থেকে আসবে। বিভূতিদা মলিনভাবে হাসলেন। তারপর বললেন, একটা দেশলাই যদি পেতাম—! হাবিলদার রেজা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, আমরা খেয়াল করিনি, সে সঙ্গে সঙ্গে এসে একটা দেশলাই বাড়িয়ে দিল। সেই দেশলাইয়ের খোলের মধ্যে এক টুকরা পাতলা কাগজ দিয়ে বিভূতিদা একটা জিনিস বানিয়ে ফেলেছেন, সেটা দিয়ে অনেকটা বাঁশীর মতনই অওয়াজ হয়। পাটনা জেলে বিভূতিদা এই রকম বাঁশী বানাতেন, সুকুলের ঠিক মনে আছে।

সেই বাঁশীতে একটা তীব্র করুণ সুর ভেসে উঠলো। জেলখানার সমস্ত কঠিন পাথরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো সেই সুর। সুকুল বললো, দাদা, এটা কি গান বাজাচ্ছেন? সুরটা যেন চেনা-চেনা—

বিভূতিদা বললেন, এটা বিসমিলের সর ফরোশী কি তমান্না‌র সুর!

সুকুল যেন লাফিয়ে উঠলো। চেঁচিয়ে বললো, দাদা গানটার সব পদ মনে আছে? দাদা একবারটি গান!

তখন আমাদের মনে পড়লো কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলার রামপ্রসাদ বিসমিল ফাঁসির মঞ্চে ওঠার আগে নিজের লেখা এই উর্দু গান গেয়েছিলেন। অপূর্ব তার বাণী।

সর ফরোশী কি তমান্না অব্ হমারে
দিল মেঁ হ্যায়
দেখনা হ্যায় জোর্ কিতনা বাজু এ
কাতিল্ মেঁ হ্যায়!

[মৃত্যুকে স্পর্শ করার ভাবনা এখন আমার মনে। দেখতে চাই ঘাতকের বাহুতে কত বল আছে।]

এ গানটা অনেকক্ষণ ধরে গাওয়া হলো। শেষ পংক্তিতে এসে সুকুল নিজেও গলা

মেলালো। শেষ দিকে বিসমিল বলেছিলঃ

অব্‌না অগ্‌লে ওয়ল্‌লে হ্যায় আউর
না আর মানোকী ভীড়।
সিরফ্‌ মর্‌ মিটনেকি হসরৎ আপ্‌
দিলে এ বিসমিল মে' হ্যায়।

[এবার থেমে গেছে পূর্বেকার কলগুঞ্জন, মিটে গেছে সব বাসনা। এখন শুধু মৃত্যুকে বরণ করার বাসনা বিসমিলের হৃদয়ে।]

শেষ লাইনে বিসমিলের নাম বদলে দিয়ে সুকুল গাইতে লাগলো, দিলে এ সুকুল মে' হ্যায়, দিলে এ সুকুল মে' হ্যায়, দিলে এ সুকুল মে' হ্যায়—কতবার যে, তার ঠিক নেই। খানিকটা বাদে থেমে রইলো কিছুক্ষণ। আবার বললো, দাদা, আউর একঠো গান—

বিভূতিদা সেদিন কত গান গেয়েছিলেন খেয়াল নেই। আমরা নিস্পন্দ হয়ে শুনেছি। কাছেই ছায়ার মতন দাঁড়িয়ে আছে হাবিলদার রেজা। সারা পৃথিবী তখন ঘুমন্ত, শুধু জেলখানার কটি প্রাণীই জেগে আছে। তাদের মধ্যে একজন কয়েক ঘণ্টা পরেই অনন্ত ঘুমের মধ্যে চলে যাবে।

এক সময় বিভূতিদার গানের স্টক শেষ হয়ে গেল। হাবিলদারকে জিজ্ঞেস করলাম ক'টা বাজে? সে বললো, এক বাজ গয়া।—আর মাত্র চার ঘণ্টা।

বিভূতিদার গানের স্টক শেষ, সুকুল তবুও অনুরোধ করে যাচ্ছে। সে যেন তখন একটা সুর-পাগল মানুষ, পৃথিবীতে আর কিছু জানে না। শেষ পর্যন্ত সে বললো, দাদা, সেই গান একবার গাইতে হবে।

—কোন গান?

—রবীন্দ্রনাথের ঐ, মরণ, হে মোর মরণ!

—ওটা তো গান নয়, কবিতা!

—না, না, ওটাই গাইতে হবে।

—ওটা আমার মুখস্ত আছে, সুকুল, কিন্তু ওর তো কোনো সুর নেই?

—তা জানি না—ওটা গান গেয়ে শোনান!

সেই ভাবে বিভোর কিশোরকে কে তখন নিরস্ত করবে? ওর কোনো অনুরোধ তখন অগ্রাহ্য করা যায়? রবীন্দ্রনাথের মরণ-মিলন কবিতাটা সুকুলের খুব প্রিয় ছিল—বিভূতিদার কাছ থেকে শুনে শুনে হিন্দী অক্ষরে লিখে নিয়ে মুখস্ত করেছে। বিভূতি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি মানে বুঝতে পারো সব? সে বলেছিল, কেন পারবো না! এই তো, 'আমি করব নীরবে তরণ' তরণ তো হিন্দিতে যাকে বলে ত্যায়রনা—মানে সাঁতার দেওয়া, তাই না?

সেই দীর্ঘ কবিতা সুকুল তখন গান হিসেবে শুনতে চাইছে। বিভূতিদা তাকে বিমুখ করতে পারলেন না। তিনি তখন দরবারী কানাড়ায় সুর লাগিয়ে গোটা কবিতাটা গেয়ে যেতে লাগলেন—অত চুপি চুপি কেন কথা কও, ওগো মরণ, হে মোর মরণ!

ওরকম গান কেউ কখনো গায়নি, ওরকমভাবে কেউ কখনো গান শোনেনি। শুধু তো সুর নয়, কথা নয়—সমস্ত মন প্রাণ ঐ গানের মধ্যে বিভূতিদা ওরকম গান জীবনে আর কখনো গাইতে পারবেন না!

কখন চারটে বেজে গেছে খেয়ালও করিনি। চমকে উঠলাম জেলের পেটা ঘড়িতে যখন ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজলো। অমনি জেগে উঠলো ভারী ভারী বুটের আওয়াজ।

সুকুল তখন হেসে বললো, দাদা, এবার 'তো সময় হইল নিকট'—এবার শেষ গান হোক! বন্দে মাতরম্ ? সমস্ত জেল কাঁপিয়ে, আকাশ-বাতাস পৃথিবী কাঁপিয়ে আমরা সকলে মিলে গেয়ে উঠলাম, বন্দে মাতরম্—সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা—।

ঝনঝন করে শব্দ হতে লাগলো গেট খোলার। হাত পা বাঁধা সুকুলকে বাইরে আনা হলো। আমার তখন ইচ্ছে হচ্ছিল জেলের দরজা ভেঙে বেরিয়ে গিয়ে একবার ওকে ছুঁই। কিন্তু তার তো উপায় নেই। সুকুলের মুখখানা কিন্তু প্রফুল্ল—সেই অপরূপ চেহারার কিশোরের মুখে একটু ক্লান্তিরও ছাপ নেই। চেঁচিয়ে বললে, দাদা, তবু তো চল্ না হ্যায়! আমাদের সকলের নাম করে বললো, চলি তবে। আবার আমি আসবো, দেশ তো স্বাধীন হয় নি—আবার আসবো—বন্দে মাতরম্!

আমাদের চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে গেল সুকুলকে। আমরা তখন...

সূর্যকুমার এতক্ষণ নিঃশব্দে শুনছিল। এবার তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। তার মুখখানা লাল হয়ে গেছে, সারা শরীর কাঁপছে।

হরদা কাশতে কাশতে বললেন, হাবিলদার রেজা তার পরদিনই চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল, সেই থেকে একটু পাগলাটে ধরনের হয়। আমরা জেল থেকে ছাড়া পাবার পর ও আমাদের কাছেই ঘুরে ফিরে আসে—আর অনবরত সুকুলের কথা বলে। সুকুলের জন্য ও এমন আঘাত পেয়েছে যে মানুষ নিজের ছেলে মরলেও বোধ হয় এতটা পায় না।

একটুক্ষণ চুপ করে হরকুমার বললেন, ও, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি! শেষ সময়ে বৈকুণ্ঠ সুকুল একবার মাত্র একটুক্ষণের জন্য নরম হয়েছিল। যাবার সময় বিভূতিদার সেলের সামনে এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তারপর মাথা নিচু করে বলেছিল, দাদা, একটা অনুরোধ শুধু রইলো। আপনারা এবার জেল থেকে বাইরে বেরিয়ে বিহারের "বাল্যবিবাহ" প্রথাটা তুলে দেবার চেষ্টা করবেন!—তারপর ও চলে গেল গটগট করে!

সূর্য আর নিজেকে সামলাতে পারলো না, কেঁদে উঠলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কক্ষনো তার চোখে জল দেখা যায় না, মার খেলেও সে কাঁদে না—তবু ঐটুকু বয়েসের মধ্যে কোনোদিন সে ওরকমভাবে কাঁদেনি।

আলিমুদ্দিন মাস্টার সূর্যকে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছিলেন—হরকুমার হাত তুলে নিষেধ করলেন ইশারায়। আস্তে আস্তে বললেন, কাঁদুক! কান্না ওর পক্ষে ভালোই!

॥ ১২ ॥

গরমের ছুটিতে বিষ্ণু তার বাবা মায়ের সঙ্গে চলে গেল দার্জিলিং। বাদলকে সে সঙ্গে নিয়ে যাবেই! বিষ্ণু তার বাবা মায়ের নয়ণের মণি, তার কোনো ইচ্ছেই অপূর্ণ থাকে না। বিষ্ণু তার মাকে বললো, মা, বাদল কিন্তু আমাদের সঙ্গে যাবে। না হলে আমি যাবো না।

বিষ্ণুর মা ঠাণ্ডা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, বেশ তো চলুক না! বাদল, তুই যাবি আমাদের সঙ্গে?

বিষ্ণুর মা বাদলকে যে খুব অপছন্দ করেন, তা নয়। তবে কিছু কিছু রমণী থাকেন এরকম, যাঁরা নিজের সন্তানের ওপর এত বেশী স্নেহ দিয়ে ফেলেন যে

অন্যদের জন্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। বেশী বয়েসের ঐ এক ছেলে বিষ্ণু তাই অন্নপূর্ণার আর অন্য কোনো দিকে চোখ নেই। অন্নপূর্ণা বাদলকে বললেন, তুই তোর বাবা মাকে বলে রাখিস, আমরা আসছে সোমবার যাবো। পনরো দিন থাকবো কিন্তু তোর মা'র জন্য মন কেমন করবে না তো?

বিষ্ণু আর বাদল তখন বসে গেল পরিকল্পনা আঁটতে। বাদল এ পর্যন্ত কোনো পাহাড় দেখেনি। সমুদ্রও দেখেনি। বড় বড় নদী দেখেছে অতি শৈশবে, মনে আছে অস্পষ্ট। যে কখন কোনো পাহাড় দেখেনি, তার কল্পনায় যে-কোনো পাহাড়ই হিমালয়ের চেয়েও বিশাল। সেই পাহাড়ের ওপর দার্জিলিং শহর, বাদলের চোখে তা স্বর্গের চেয়েও সুন্দর। বিষ্ণু প্রত্যেক ছুটিতেই বাবা-মায়ের সঙ্গে কোথাও না কোথাও বেড়াতে যায়, এমন কি দার্জিলিং-এও আগে একবার গেছে, সেখানে ওদের একটা বাড়ি আছে। বিষ্ণুরা একাই যাবে, রেণুরা বা অন্য কাকাকাকীমারা ছেলেমেয়েরা যাবে না।

বিষ্ণু তাকে শোনাতে লাগলো পথের বর্ণনা। বড় ট্রেনের পর ছোট ট্রেন। সেই ছোট ট্রেনের ইঞ্জিনের সামনে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে বালি ছড়ায় অনরবত, ট্রেনটা খেলনার মতন এঁকেবেঁকে ওঠে পাহাড়ের গা দিয়ে, জানলা দিয়ে হাত বাড়ালেই পাহাড় ছোঁয়া যায়। দার্জিলিং-এ পেঁাছেই ওরা ঘোড়ায় চড়বে। বাদল ঘোড়ায় চড়তে জানে না তো! তাতে কি হয়েছে, একদিনেই শিখে যাবে। এবার দার্জিলিং-এ গিয়ে বিষ্ণু একটা কাজ করবেই, বাদলকে সঙ্গে নিয়ে সে চলে যাবে দূরে কোনো একটা অচেনা পাহাড়ে। দু'জনে মিলে তার চূড়ায় উঠবে। আগে কারুকে কিছু বলবে না—চূড়ায় পেঁাছে একটা ফ্ল্যাগ পুঁতে দিয়ে নেমে এসে সেই কীর্তির কথা বলে সবাইকে অবাক করে দেবে। বিষ্ণুর কল্পনাপ্রবল মন এই সব চিন্তায় দারুণ আনন্দ পায়।

বাদলকে শীতের জামা-কাপড় নিয়ে যেতে হবে অনেক। তার যদি কোট না থাকে সে জন্য কোনো চিন্তা নেই, বিষ্ণুর দুটো অলেস্টার আছে—একটা সে বাদলকে দিয়ে দেবে। বিষ্ণুর দস্তানাও আছে তিন জোড়া। পাহাড়ে উঠতে গেলে দস্তানা তো লাগবেই। বাদল তক্ষুনি বিষ্ণুর দস্তানা হাতে দিয়ে দেখলো, ফিট করে কিনা।

শেষ পর্যন্ত বাদলের যাওয়া হল না। বাড়িতে এসে মাকে বলতেই মা বললেন, তুই দার্জিলিং যাবি কি করে? সে তো অনেক দূর! দাঁড়া, তোর বাবা আসুক, জিজ্ঞেস করে দ্যাখ—

বাদল অনুনাসিক আব্দারের সঙ্গে বললো, না, বাবাকে তুমি বলবে। আমি ঠিক যাবো—বিষ্ণু বলেছে কোনো অসুবিধে হবে না!

মা বললেন, তুই অতদিন ধরে ওদের সঙ্গে থাকতে পারবি? তুই কখনো কোথাও একা থেকেছিস?

বাদল অতি উৎসাহের সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, থাকতে পারবো। খুব থাকতে পারবো!

—কিন্তু দার্জিলিং যেতে তো অনেক টাকা লাগে। অত টাকা আসবে কোত্থেকে?

ন' বছরের ছেলের পক্ষে টাকার ব্যাপারটা বোঝা অবশ্য কঠিন। সে অবাক হয়ে বললো, বাঃ, টাকা লাগবে কিসে, আমি তো বিষ্ণুদের সঙ্গেই যাবো!

—সঙ্গে গেলেই বা, ট্রেনের টিকিট কাটাতে হবে না? তাছাড়া অতদিন বাইরে থাকা—

বাবা বাড়ি না-ফেরা পর্যন্ত জেগে বসে রইলো বাদল। ঘুমে চোখ টেনে আসছে, তবু ঘুমোবে না। চিররঞ্জন খেতে বসার পর বাদল সামনে দাঁড়িয়ে নোখ খুঁটতে খুঁটতে বললো, বাবা, আমি দার্জিলিং যাবো।

চিররঞ্জন মুখ তুলে বললেন, ইস্কুল থেকে নিয়ে যাচ্ছে বুঝি?

—না, বিষ্ণুদের সঙ্গে যাবো। বিষ্ণুর বাবা-মা যাচ্ছেন।

—বিষ্ণু কে?

মা বললেন, ঐ যে গো রেণু, সেই যে গঙ্গার ঘাটে হারিয়ে গিয়েছিল, তার খুড়তুতো ভাই। বেশ ভালো ছেলে!

চিররঞ্জন ভুরু কুঁচকে বললেন, ওদের সঙ্গে যাবে কি করে? ওদের সঙ্গে কি আমাদের খাপ খায়!

মা বললেন, এত করে যেতে চাইছে, যাক্ না। কোথাও তো বেড়ানো হয় না! ওর বন্ধুরা যায়—

আশ্চর্যের ব্যাপার, বিকেলবেলা মা বাদলকে দার্জিলিং যাওয়ার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দিচ্ছিলেন, এখন তিনিই স্বামীর সামনে ছেলের পক্ষ নিয়ে নিলেন। বোঝাতে লাগলেন অনেক করে। কিন্তু চিররঞ্জন মানলেন না। বাদলকে বললেন, সময় তো অনেক পড়ে আছে। বড়ো হও, লেখাপড়া করো, তারপর নিজেই ওইরকম অনেক জায়গায় বেড়াতে পারবে।

হিমানী রেগে উঠে বললেন, আমি যে এত করে বলছি, সেটা বুঝি তোমার কানে যাচ্ছে না? ছেলেটা এত-করে বলছে—কি হয় গেলে? তোমার কোনো ক্ষতি হবে! এমনিতে তো সারাদিনে ছেলের একবার খোঁজও নাও না!

চিররঞ্জন ক্লান্তভাবে বললেন, কিন্তু আমি এখন ওকে পাঠাবো কি করে? আমার হাতে তো একদম টাকা নেই?

—ওদের সঙ্গে এক সঙ্গে যাচ্ছে। ওরা কি আর টাকা নেবে?

—ওরা টাকা না নিলেও আমি টাকা না দিয়ে আমার ছেলেকে পাঠাবো কি করে? আমার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।

হিমানী তখন হাত থেকে দু' জোড়া সোনার চুড়ি খুলে মাটিতে ছুঁড়ে মেরে বললেন, তোমার হাতে তো কোন সময়েই টাকা থাকে না! তা বলে আমার কোনো সাধ আহ্লাদ নেই? তুমি আমার গয়না বিক্রী করে টাকা নিয়ে এসো!

তখন ঝগড়া লেগে গেল স্বামী-স্ত্রীতে। বাদল আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়ালো দরজার কাছে। চিররঞ্জন পুরোটা না খেয়েই উঠে পড়েছেন। বাদলের কান্না পেতে লাগলো, তার জন্যই এই সব হচ্ছে। এর আগে সে তো কখনো বোঝে নি টাকা জিনিসটা এরকম জরুরি। বাবা আর মায়ের ঝগড়ার মধ্যে বেশ কয়েকবার টাকা কথাটার উচ্চারণে তার মাথার মধ্যে ঘা মারতে লাগলো। এতকাল তার ধারনা ছিল, টাকা জিনিসটা ছোটদের কাছে থাকে না, শুধু বয়স্কদের কাছে থাকে। তার বাবাও তো বয়স্ক লোক, অথচ বাবার কাছে নেই কেন? ছোট ছেলেরা যেমন মার্বেল গুলি নিয়ে ঝগড়া করে, তেমনি তার বাবা-মা-ও ঐ সাহেবের মুণ্ডু-ছাপ দেওয়া রুপোর গোল গোল জিনিসগুলোর জন্য ঝগড়া করছে। সে একবার ভাবলো, বড়বাবুর কাছে চাইলেই হয়, বড়বাবুর তো অনেক টাকা। আবার সে তীব্র অভিমানের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করলো, বড় হয়ে সে অনেক অনেক টাকা রোজগার করবে—তখন সে প্রত্যেক বছর দার্জিলিং যাবে—তখন তো কেউ কিছু বলতে পারবে না!

এদিকে বিষ্ণু বেঁকে বসলো, বাদল না গেলে সে কিছুতেই যাবে না। তখন বাধ্য হয়ে বিষ্ণুর মা নিজেই একদিন এলেন এ বাড়িতে, বাদলের মাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাতে। তাতেও কোনো ফল হলো না। হিমানী কৃত্রিম হেসে অন্নপূর্ণাকে

বললেন, না দিদি, বাদল না হয় অন্য কোনোবার তোমাদের সঙ্গে যাবে। এবার কি করে পাঠাই। বটঠাকুর বলছেন, এবার আমাদের সবাইকে নিয়ে কাশী যাবেন—এখনো ঠিক হয়নি অবশ্য, তবু যদি যাওয়া হয়, তাহলে বাদলকে না নিলে...

বাদলের সামনেই এই আলোচনা হচ্ছিল, অথচ বাদল জানে ও-কথা সত্যি নয়। প্রিয়রঞ্জনের দেশভ্রমণের বাতিক নেই—তাঁর মতে ওসব নেহাত বাজে খরচ। বড়বাবু মাঝে মাঝেই বেড়াতে যান, কিন্তু একা। একবার বেরুলে কবে ফিরবেন তা-ও বলে যান না। আর চিররঞ্জন ট্রেনে চেপে কোথাও যাবার বদলে কলকাতার পথে পথে অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়াতেই বেশী ভালোবাসেন। প্রিয়রঞ্জন তাঁর ব্যবসার কোনো সঙ্কটের সময় কাশী বিশ্বনাথের কাছে কিছু একটা মানত করেছিলেন—সঙ্কট কেটে যাওয়ায় এখন তিনি বিশ্বনাথকে পুজো দিতে যাবেন। প্রিয়রঞ্জনের সঙ্গে যাবার জন্য বাড়ির কেউ কেউ বায়না তুলেছে—কিন্তু প্রিয়রঞ্জন তাতে রাজী নন্!

বিষ্ণুরা চলে যাবার পর বাদল কিছুদিন মন-মরা হয়ে ঘুরে বেড়ালো। সবাই মিলে তার কাছ থেকে একটা স্বর্গ কেড়ে নিয়েছে। এতদিন তার কল্পনায় দার্জিলিং-এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না—কিন্তু বিষ্ণুর সঙ্গে সেখানে বেড়াতে যাবার সব পরিকল্পনা করে ফেলার পরও না-যাওয়া যে কি মর্মান্তিক, তা আর কেউ বুঝবে না। বালকের যুক্তিহীন মনের গহন অভ্যন্তরে যে বেদনা-অভিমানের আলোছায়া ঘোরে তার মর্ম বোঝার সাধ্য আর কারুর নেই। বাদল একা একা চিলেকোঠায় গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে কথা বলে, টবের ফণীমনসার গাছের কাছে তার দুঃখ জানায়, ট্যাঙ্কের জলে হাত ডুবিয়ে খেলা করতে করতে সে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। গঙ্গাজলের ট্যাঙ্কে বহুদিনের মাটি জমেছে এবং আশ্চর্যের বিষয় দুটি ছোট ছোট কাঁকড়া সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। অন্য সময় বাদল লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে কাঁকড়া দুটোকে মারার চেষ্টা করে, কিন্তু এখন সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে—যেন ওরা ছাড়া তার আর বন্ধু নেই।

ছেলের মন-মরা ভাব দেখে চিররঞ্জন একদিন বললেন, দেওঘরে যাবি? ফ্রেস এয়ার ক্যাম্পের সঙ্গে? দেওঘর খুব সুন্দর জায়গা—বৈদ্যনাথের মন্দির, তপোবন, পাহাড়ও আছে ওখানে—। যদি যাস তো অসীমদাকে বলে দেখি—

চিলড্রেন্স ফ্রেস এয়ার অ্যান্ড এক্সকারশান সোসাইটি নামে একটি চমৎকার প্রতিষ্ঠান ছিল তখন। ধনী ব্যক্তিদের দানে ধন্য এই প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর গরীব ছেলেদের বেড়াতে নিয়ে যেত কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায়। প্রত্যেকের খরচ হতো মাত্র পাঁচ টাকা—পড়াশুনোয় যারা ভালো অথচ গরীব, শুধু তাদেরই জন্য। দরখাস্ত পড়তো অনেক, কিন্তু এই ক্যাম্পের যিনি ইন চার্জ থাকতেন সেই স্কাউট মাস্টার অসীম দত্তর সঙ্গে কি সূত্রে যেন চেনা ছিল চিররঞ্জনের।

চিররঞ্জন ছেলেকে দেওঘর পাঠাবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। কিন্তু কি কারণে যেন সেটাও শেষ পর্যন্ত সার্থক হলো না। আসলে, চিররঞ্জন নিজেও চেষ্টা করেছিলেন ঐ দলের সঙ্গে কোনো ছুতায় ভিড়ে পড়তে, সেটাতেই অসুবিধে দেখা দেয়। দুর্বল ধরনের মানুষ চিররঞ্জন, ছেলেকে একলা কোথাও পাঠাবার মতন মনের জোর তাঁর নেই। দেওঘর যাওয়া হলো না, চিররঞ্জন বুঝতেও পারলেন না, ছেলের কাছ থেকে তিনি আর একটি স্বর্গ কেড়ে নিলেন। বাদল এর মধ্যেই দার্জিলিং-এর কথা অনেকখানি ভুলে মনে মনে দেওঘর নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। বিশেষত দেওঘরে তপোবন আছে, শুনেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছিল সে। ঐ নাম শুনেই সে মানস-

চক্ষে দেখতে শুরু করেছিল বাল্মিকীর তপোবন, আহা, বিষ্ণু বেচারা দেখতে পাবে না! উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছোট রামায়ণ' তখন বাদলের পুরো মুখস্ত। সে একা একা আবৃত্তি করতোঃ

> বাল্মীকির তপোবন তমসার তীরে
> ছায়া তার মধুময়, বায়ু বহে ধীরে,
> সুখে পাখি গায় গান ফোটে কত ফুল,
> কিবা জল নিরমল, চলে কুল—কুল।
> মুনির কুটিরখানি গাছের তলায়,
> চঞ্চল হরিণ খেলে তার আঙিনায়।...

দেওঘর যাওয়া হলো না, সেই তপোবন বাদলের কাছে আরও সুদূর—সুন্দর হয়ে রইলো।

রেণুদের বাড়িতে গেলেও আর বিশেষ খেলা জমে না। বিষ্ণু নেই, সেই কথাটা সব সময় খচ্ খচ্ করে। অন্য ছেলেমেয়েরাও অনেকেই এ বছর বেড়াতে গেছে তাদের বাবা মায়ের সঙ্গে। রেণুর অসুখ বলে ওরা যেতে পারে নি, কিন্তু সুপ্রকাশদা বন্ধুদের সঙ্গে গেছেন উটকামণ্ড।

হৈমন্তী কাকীমার ঘরটা তালাবন্ধ হয়েই পড়ে থাকে। আগে হৈমন্তী কাকীমার সঙ্গে গল্প করতেও কত ভালো লাগতো। বিষ্ণু একদিন ফিসফিস করে বাদলকে বলেছিল, জানিস, হৈমন্তী কাকীমা হারিয়ে গেছে?

বাদল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় হারিয়ে গেছে?

বিষ্ণু বলেছিল, সেটাই তো কেউ জানে না। কাকীমা কারুকে কিছু না বলে কোথায় যেন চলে গেছেন। বাপের বাড়িতেও নেই।

এই বিশাল পৃথিবীতে হারিয়ে যাবার কথা শুনলেই কি রকম যেন অসহায় লাগে। বাদলের খুব কষ্ট হয়েছিল। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, বড় হয়ে সে আর বিষ্ণু ঠিক হৈমন্তী কাকীমাকে খুঁজে বার করবে।

রেণু প্রায়ই অসুখে ভোগে, ঘুরে ফিরেই তার জ্বর হয়। জ্বরে বিছানায় শুয়ে থাকে কয়েকদিন, একটু সেরে উঠলেই আবার দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেয়। গত কয়েক মাসে বেশ রোগা হয়ে গেছে, রেণু, শীর্ণ মুখে দুটি টলটলে চোখ, মাথায় সিল্কের মতন কোঁকড়া চুল।

এ বাড়িতে এখন ছেলেমেয়ে মাত্র তিনজন। রেণু, তার ওপরের ভাই অংশুমান আর ওদের জ্যাঠতুতো বোন দীপ্তি। এর মধ্যে দীপ্তি বারো ছেড়ে তেরোয় পা দিয়েছে এবং ফ্রক ছেড়ে প্রায়ই শাড়ি পরে। শরীরেও পরিবর্তন দেখা দিয়েছে দীপ্তির। কিন্তু তার মনটা এখনও অপরিণত রয়ে গেছে। তার এই নতুন রকমের শরীর নিয়ে সে কি করবে বুঝতে পারে না। পড়াশুনোয় তার মন নেই বলে ইস্কুল ছেড়েই দিয়েছে প্রায়, তা ছাড়া সে 'আটক' করা মেয়ে, অর্থাৎ শোভাবাজারের বোসদের বাড়ির একটি ছেলের সঙ্গে অতি শৈশব থেকেই তার বিয়ে ঠিক করা আছে। সেই ছেলে এখন বিলেতে, আগামী বছর বিলেত থেকে ফিরলেই দীপ্তির বিয়ে হয়ে যাবে। দীপ্তি এসব জানে বলেই তার ব্যবহারটা একটু পাকা-পাকা। সে এখন বিকেলবেলা গা ধুয়ে ছাদে দাঁড়ায়, আকাশের দিকে তাকায় উদাস চোখে, পাড়ার ছেলেরা তার দিকে ইসারা ইঙ্গিত করে। গত বছর বিষ্ণুর জন্য যে মাস্টারমশাই রাখা হয়েছিল, সেই মাস্টারটি নাকি দীপ্তির

প্রতি রসস্থ হয়ে কি একটা কান্ড করে ফেলেছিল, যে-জন্য অবিলম্বে তার চাকরি যায়।

আগে দশ বারোজন ছেলেমেয়ে মিলে যে খেলা খেলতো, তার অধিকাংশই ছিল ছুটোছুটির খেলা। এখন তিন চারজনে মিলে খেলার ধরনটা বদলে যায়। এখন হয় বসে বসে ক্যারাম পেটা অথবা দোকান-দোকান খেলা। তারপরই এসে যায় বর-বউ খেলা। এই খেলাটা দীপ্তিই ওদের শেখায়। দীপ্তি বাদলের হাতটা টেনে ধরে বলে, তুই বেশ বর, আমি বেশ তোর বউ, তারপর বর-বউ কি করে জানিস তো? হি-হি-হি! দীপ্তি হেসে লুটোপুটি খায়, বাদল তার মানে বুঝতে পারে না। তার মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ধারণা আস্তে আস্তে দানা বাঁধতে থাকে, একটি ছেলের সঙ্গে একটি ছেলে, আর একটি মেয়ের সঙ্গে একটি ছেলে—এর মধ্যে কি যেন একটা তফাৎ আছে। মেয়ের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয় না, ছেলের সঙ্গে ছেলের বিয়ে হয় না—শুধু ছেলে আর মেয়েতেই বিয়ে হয়—এটা একটা ঘোর রহস্যময় ব্যাপার। চড়াক চড়াক করে তার মাথার মধ্যে কয়েকটা দৃশ্য ঘুরে যায়। সূর্যদা একদিন বড়দির ঠোঁট কামড়ে দিয়েছিল অথচ বড়দি হাসছিল, এর মানে কি? তার বাবা একদিন তার মাকে—।

অংশুর সঙ্গে বাদলের কিছুতেই বনে না। বয়েসের তুলনায় বাদল একটু বেশী লম্বা হয়ে গেছে, তাকে অংশুর চেয়ে বড় দেখায়। অংশু একটু স্বার্থপর ধরনের, আর সব সময় খালি নালিশ করে। খেলতে খেলতেই চেঁচিয়ে ওঠে, মা দ্যাখো, বাদল আমার বই নিয়েছে! মা, বাদল আমার লেত্তি ছিঁড়ে দিল! নালিশ শুনে রত্নপ্রভা এসে ছেলেকেই বকুনি দেন, অংশু তবু খেলার মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া করে উঠে চলে যায়। তখনই দীপ্তি বলে, ও যায় যাক! আয় রে আমরা বর-বউ খেলি! তুই আমার এই খানটায় হাত দে! হি-হি-হি-হি—।

বাদল একলা রাস্তায় বেরোয় না, এ বাড়িতে আসে সে চাকরের সঙ্গে। চাকরটি বড় ফাঁকিবাজ। অনেকদিন সে বেশ খানিকটা দূর থেকেই বলে, এইবার দাদাবাবু তুমি সোজা চলে যাও! যেতে পারবে তো? আমি দাঁড়িয়ে রইছি, আমাকে আবার বাজার যেতে হবে তো! সেই পথটুকু বাদল একা একা হেঁটে আসবার সময় খানিকটা স্বাধীনতার স্বাদ পায়। একদিন দুটো বয়স্ক ছেলে তাকে রেণুদের বাড়ির কাছেই দাঁড় করালো। তারপর বললো, এই খোকা শোন্, একটা কাজ করতে পারবি?

বাদলের কাঁধে হাত দিয়ে দেয়ালের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ ওরা নানা কথা জিজ্ঞেস করলো। রেণুদের বাড়িতে এখন কে কে আছে, বাবা-কাকারা কে-কখন বাড়িতে থাকে ইত্যাদি। বাদলের কথায় এখনও একটু একটু বাঙাল টান আছে। ছেলে দুটি সেটা অবিলম্বে বুঝে গেল। একজন আর একজনকে বললো, এ রে মাইরি, এ যে বাঙাল দেখছি! বাঙালের বুদ্ধি তো, সব কিছু না গুবলেট করে দেয়! আর একজন বললো, এই ছোড়া, তোকে যা বলবো, তাই করবি! এই গল্পের বইটা দীপ্তিকে দিবি, খবর্দার অন্য কেউ যেন দেখতে না পায়! কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেও কিন্তু কিছু বলবি না! যদি না পারিস, তা হলে কিন্তু কান মুলে দেবো!

বাদল বইটা হাতে নিয়েই বুঝলো সেটা বড়দের বই। কেননা ছোট ছোট অক্ষর, আর ভেতরে কোনো ছবি নেই, দীপ্তি কি বড়দের বই পড়তে পারে? বইটার মধ্যে একটা আলাদা সাদা কাগজে কি সব হাতে লেখা, বোধহয় চিঠি, বাদল সেটা পড়ার সাহস পেল না। কিন্তু ছেলে দুটির ব্যবহার দেখেই সে বুঝেছিল, এর মধ্যে কিছু অন্যায় আছে। আর কোনোদিন সে চাকরকে না নিয়ে একলা আসবে না।

দীপ্তি বইখানা পেয়েই ঝট করে লুকিয়ে ফেললো। তারপর বাদলের কাছে তার

হাজার প্রশ্ন। বাড়িতে ঢোকার পর বাদলকে কেউ দেখেছে কি না। বিশেষ করে ছোট কাকা। বইটা বাদলকে কে দিয়েছে, কল্যাণ না সত্যেন? বাদল কারুরই নাম জানে না। দুজন ছেলে এক সঙ্গে ছিল? কি রকম চেহারা বল্ তো?

যাই হোক, প্রশ্নের উত্তর পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিল দীপ্তি। বাদলের ওপর খুব খুশী হয়ে সে বললো, কি ভালো ছেলে রে! তারপর ফটাস করে সে দিয়ে ফেললে বাদলের গালে একখানা চুমো। বাদল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গালে হাত দিয়ে দেখলো, সেখানে থুতু লেগে আছে। তার ঘেন্না করতে লাগলো! দীপ্তিটা একটা কিরকম যেন!

রেণু যখন বেশ কয়েকদিন টানা জ্বরে ভোগে, তখন বাদল গেলে রত্নপ্রভা বলেন, বাদল, লক্ষ্মী ছেলে আমার—আজ তোমরা এই ঘরেই বসে খেলো। তোমরা অন্য কোথাও গেলে রেণুও উঠে যেতে চাইবে! কিংবা রেণুকে তোমরা গল্প শোনাও না—ও বেচারী অ্যাদ্দিন ধরে বিছানায় শুয়ে আছে।

দীপ্তি কিংবা অংশু বেশীক্ষণ বসে না, যে-যার ইচ্ছে মতন উঠে চলে যায়। বাদল রেণুর মাথার পাশে বসে বই পড়ে শোনায়। 'টম কাকার কুটির', 'রবিনহুড', হেমেন্দ্রকুমারের যখের ধন, সুকুমার রায়ের 'পাগলা দাশু' অ্যান্ডারসনের 'রূপকথা'।

রেণু তার জ্বর-ছলছল চোখ মেলে এক মনে গল্প শোনে। গোটা একখানা বই না শুনলে বাদলকে কিছুতেই যেতে দেয় না। কান্নাকাটি করে, ওষুধ খেতে চায় না। রত্নপ্রভা বাদলদের বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দিয়ে দুপুরে তাকে সেখানেই খাইয়ে দেন প্রায়ই।

রেণু সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে রামায়ণের গল্প শুনতে। বারবার শুনেও তার তৃপ্তি হয় না। বাদল তখন চোখ বুজে আবৃত্তি করেঃ

দুঃখিনী সীতার কথা শুন তারপর
মায়ের চোখেতে জল ঝরে ঝরঝর
ময়লা কাপড়ে মাতা পড়িয়া ধুলায়
এমন সময় হনু আইল সেথায়।
হনু বলে, 'শুন মাগো, মরিল রাবণ
মুছ মা চোখের জল, উঠগো এখন।'
সুখেতে সীতার মুখে কথা নাহি সরে
পাবেন রামের দেখা এতদিন পরে!
হায় রে দুঃখের কথা কি কহিব আর—
সেই রাম না করিল আদর সীতার!
ভ্রূকুটি করিয়া তিনি কহিলেন তাঁরে,
যেথা ইচ্ছা যাও সীতা, চাহিনা তোমারে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রত্নপ্রভাও শোনেন। এই অনাত্মীয় বালকটির এক মনে কবিতা পাঠ শুনে তাঁর মনের মধ্যে অদ্ভুত ধরনের মায়া এসে যায়। মনে মনে বলেন, আহা, এ ছেলেটির ভালো হোক, জীবনে উন্নতি হোক!

সকালবেলা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে বড়বাবু হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। চিররঞ্জনকে ডেকে বললেন, চিরু, শুনে যাও, দেখে যাও একবার!

বড়বাবু চিররঞ্জনকে খবরের কাগজের সেই বিশেষ খবরটা দেখালেন। মাঝে মাঝেই এ রকম খবর বেরোয়। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর গ্রামে একজন ইস্কুল মাস্টারের সাত বছর বয়সের ছেলে হঠাৎ একদিন এক জায়গায় একজোড়া বাঁয়া তবলা দেখে বাজাতে শুরু করে। নিখুঁত লয়ে অপূর্ব বাজনা। ছেলেটি তার আগে বাঁয়া তবলা কখনো ছুঁয়েও দেখেনি, শেখা তো দূরের কথা। ছেলেটির তখন মনে পড়ে যায়, পূর্ব জন্মে সে তবলা শিখেছিল, তখন সে থাকতো মালদা শহরে। পূর্ব জন্মে তার বাবার নাম ছিল এই, তারা তিন ভাই বোন ছিল, সেই বাড়িটি দোতলা এবং হলদে রঙের। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে মালদায় সত্যিই সেই রকম একটি বাড়িতে সেই রকম একটি পরিবার আছে, সেই পবিবারের একটি ছেলে মারা গেছে আট বছর আগে। ছেলেটি তার পূর্ব জন্ম বিষয়ে আরও যা-যা বলে, সবাই মিলে যায়! অর্থাৎ ছেলেটি জাতিস্মর। আশে-পাশের বহু গ্রামের লোক ভিড় করে দেখতে আসছে ছেলেটিকে।

বড়বাবু বললেন, আমিও দেখতে যাবো। চিরু, তুমি যাবে আমার সঙ্গে!

চিররঞ্জন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এখন সেই পুরুলিয়া ছুটবেন? আপনি বিশ্বাস করেন এসব?

—তুমি বিশ্বাস করো না?

চিররঞ্জন আমতা আমতা করে বললেন, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু যায় আসে না। তবে খবরের কাগজে যখন লিখেছে, তখন কি আমার আর মিথ্যে লিখেছে?

বড়বাবু হো-হো করে হেসে বললেন, তুমি যে রামকৃষ্ণদেবের মতন বললে হে! সেই যে এক বাবু খবরের কাগজের ওপর এত ভক্তি যে একটা বাড়ি ভেঙে পড়েছে সেটা নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছেন না, লোকটা বললেন, দ্যাখো তো খবরের কাগজে লিখেছে কি না। খবরের কাগজে সব সত্যি লেখে?

—আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি এসব বিশ্বাস করেন না—তাহলে যেতে চাইছেন কেন?

—আমি প্রমাণ না পেলে বিশ্বাসও করি না, অবিশ্বাসও করি না। তবে এই রকম ঘটনা প্রায়ই দেখি। আমার মনে হয় এর মধ্যে একটা কিছু রহস্য আছে।

—জন্মান্তরবাদের তত্ত্বটা যদি সত্যি নাও হয়, তবু বড় মধুর। কার না ইচ্ছে করে, আবার এই পৃথিবীতে জন্মাই, আবার নতুন করে জীবন ফিরে পাই!

—মানুষ মরে গিয়ে আবার জন্মায় কিনা সেটা প্রমাণ করার কোনো রাস্তা নেই। আগের জন্মের কথা তো কারুর মনে থাকে না—আর মনেই যদি না থাকে, তাহলে বার বার জন্মানোর এমন কিছু মূল্য নেই। দুটো জীবন যদি তুলনা করে দেখা না যায়—তাহলে আর মজা কি! এইসব জাতিস্মরের ঘটনা যদি সত্যি হয়, তাহলে সেটাই হতে পারে একমাত্র প্রমাণ। তাই না? যে-সব জাতিস্মরের ঘটনা একবার কাগজে ওঠে, দু'চার বছর বাদে তাদের কি অবস্থা হয়, তখনও সব মনে থাকে কি না—সেটা তো আর বেরোয় না!

—আমার কি মনে হয় জানেন। সত্যি হোক মিথ্যে হোক, এইসব ঘটনা কাগজে ছাপাবার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। এই যে সব ছেলে দেশের জন্য লড়াই করছে,

ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিচ্ছে—এরা অনেকেই পরজন্মে খুব বিশ্বাস করে। এইসব খবর পড়লে তাদের বিশ্বাসটা অনেক জোরদার হয়।

বড়বাবু দু'এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন চিররঞ্জনের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, তোমার কথায় যুক্তি থাকতে পারে। যাই হোক—এ ছেলেটির তো বাপের নাম, গ্রামের নাম সবই দেওয়া আছে। নিজের চোখে দেখে যাচাই করে আসতে দোষ কি! আমি কাল সকালেই রওনা হচ্ছি।

বড়বাবুর মাথায় প্রায়ই এ রকম বাতিক চাপে। তাঁর মনের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তিটা প্রবল। এ বাড়িতে একজন ছুতোর মিস্ত্রি আসে প্রায়ই, দরজা-জানলা সারায় কিংবা রান্নাঘরের র‍্যাক বানায়। লোকটি বেশ বুড়ো, মুখভর্তি দাড়ি, লুঙ্গি পরে খালি গায়ে আসে, তার বুকের লোমগুলোও সাদা। লোকটির একটি অদ্ভুত স্বভাব হচ্ছে এই, সে প্রায় সব সময়েই নিজের মনে মনে কথা বলে। অনেক সময় বেশ জোরে জোরে। উঠোনের এক কোণে সে কাঠকুটো নিয়ে র‍্যাঁদা বা তুরপুন চালাতে চালাতে আপন মনে বকবক করে।

বড়বাবু এই লোকটিকে দেখে আকৃষ্ট হলেন। কাঠের মিস্তিরি যখন কাজ শুরু করতো, বড়বাবু একটু দূরে দাঁড়িয়ে শোনার চেষ্টা করতেন ও কি কথা বলে। দু চারদিন শোনার পর বড়বাবু সেই মিস্তিরিকে তাঁর বন্ধু করে ফেললেন। চিররঞ্জনকে বললেন, আমাদের এই রজ্জব মিস্তিরি খাঁটি কর্মযোগীন্। কাজের সময় ও যন্ত্রপাতির সঙ্গে কথা বলে, যেন ওরা সবাই তার আপনজন। কি বলে জানো, র‍্যাঁদা ঘোরাতে ঘোরাতে বলে, আরে র‍্যাঁদার পো র‍্যাঁদা, এদিকে যা, ওদিকে যা! এদিক যা, ওদিক যা! আমি যেদিকে যাওয়ামু, হিদিকে যাবি! এই কম্মেই তোর জম্মো! তোর কি আমোদ আহ্লাদ করার টাইম আছে! যেদিকে যাওয়ামু, হিদিকে যাবি! ও হাতুড়ি, তোর কাম পেরেকের মাথা পিটানা, তুই আমার আঙুলের মাথা পিটাইতে চাস ক্যান?—লোকটি মাঝে মাঝে আল্লার সঙ্গেও সরাসরি কথা বলে। যেন কর্মে মগ্ন থাকার সময় আল্লা ওর সামনে এসে দাঁড়ান। আল্লার কাছে ও হাতুড়ির নামে নালিশ জানায়!

সেই মিস্তিরি এর পর থেকে এ বাড়িতে কোনো কাজ না থাকলেও আসে। বড়বাবুর সঙ্গে কি সব গল্প করে—বড়বাবুর কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে লজ্জিতভাবে ধরায়, পাশ ফিরে ধোঁয়া ছাড়ে। দুজনের বেশ মনের মিল হয়েছে বোঝা যায়।

বড়বাবু আর একবার একটা ভূতুড়ে বাড়িতে রাত কাটাবেন ঠিক করেছিলেন। কলকাতা শহরে তখন অনেক খালি বাড়ি থাকতো, পথে পথে 'টু-লেট' নোটিশ দেখা যেত। মালিকের অভাবে বা অযত্নে দু' চারটে পোড়ো বাড়িরও অভাব ছিল না। সেই সব বাড়ি ঘিরে আস্তে আস্তে ভূতুড়ে গল্প দানা বাঁধে। দেশ বিভাগের পর রিফিউজিরা এসে কলকাতার সব ফাঁকা বাড়ি দখল করে নিয়েই কলকাতায় ভূতদেরও তাড়িয়ে দিয়েছে।

তবে নিছক বাজে গুজব কিংবা গাল-গল্প শুনে ছোটার লোক ছিলেন না বড়বাবু। সেই সময় উত্তর কলকাতার রামধন মিত্তির লেনের একটা হানাবাড়িকে কেন্দ্র করে একটি চাঞ্চল্যকর ভূতের গল্প খুব ছড়িয়ে পড়েছিল। বড়বাবু সেখানে যেতে চেয়েছিলেন সত্যের সন্ধানে। তিনতলা এই বাড়িটি বহুকাল পরিত্যক্ত, সদর দরজায় ঘাস গজিয়ে গেছে, দেয়ালে কার্নিসে বড় বড় বট, অশ্বত্থের শিকড়। মধ্য রাত্রে সেই বাড়ি থেকে বাচ্চা ছেলের চিৎকার, নারীকণ্ঠের কান্না শোনা যেত এবং দেখা যেত একটা সবুজ আলো ছাদের ওপর ঘেরাফেরা করছে। যে-সব দুঃসাহসী দিনের বেলাতেও সে বাড়িতে

ঢুকতে চেষ্টা করেছে, তারা নাকি রক্ত বমি করতে করতে মারা গেছে। একটি প্রাইভেট ব্যাঙ্কের মালিকের ডাকাবুকো সন্তান নিজস্ব এরোপ্লেনে সেই বাড়ির ছাদের ওপর চক্রাকারে পরিভ্রমণ করেও সেই সবুজ আলো দেখতে পেয়েছে এবং তার কোনো মানে বুঝতে পারে নি।

তখন সেই বাড়ির রহস্য উদ্ঘাটনে যান কালীকিঙ্কর ঘোষাল। এই কালীকিঙ্কর ঘোষাল শ্যামবাজার এ ভি স্কুলের হেড পণ্ডিত, তান্ত্রিক মানুষ, মুখ ভর্তি দাড়ি, মাথায় জটা। তিনি ভূত-প্রেতে অবিশ্বাস করে যান নি, গিয়েছিলেন ভূত-প্রেতদের বশ মানাতে। বড়বাবু এই কালীকিঙ্করকে ঘোষালকে চিনতেন।

বেশ বলশালী, লম্বা-চওড়া পুরুষ ছিলেন কালীকিঙ্কর ঘোষাল। কিন্তু রামধন মিত্তির লেনের ভূত তাঁকে আচ্ছা রকম জখম করে দেয়! তাঁর গল্পটি এই রকমঃ হাতে একটা লাঠি এবং হ্যারিকেন নিয়ে সন্ধের পর সে বাড়িতে ঢুকেছিলেন তিনি। সারা বাড়ি ঘুরে এবং ছাদে পায়চারি করেও কিছু দেখতে পান নি। সারা বাড়ি ধুলোয় ভর্তি মানুষের আনাগোনার কোনো চিহ্ন নেই। দোতলার একটি ঘর কোনো রকম বাসযোগ্য, সেটাকেই সাফ-সুতরো করে তিনি বসলেন মন্ত্র পড়তে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, কোথাও কোনো শব্দ নেই, ভূতের টিকিটিরও দেখা নেই। কালীকিঙ্কর ঘোষাল ধৈর্য হারালেন না। ভূত এ বাড়িতে না থাকলেও তিনি মন্ত্রবলে প্রেতাত্মা ডেকে আনবেন। যে-কোনো প্রেতাত্মা এলেই তিনি জেনে নিতে পারবেন এ বাড়ির অশরীরী বাসিন্দাদের সঠিক খবর।

ঠিক মধ্য রাত্রিতে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কালীকিঙ্কর আসন ছেড়ে উঠলেন না। গঙ্গাজলে আচমন সেরে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। তৎক্ষণাৎ দেখলেন দরজার সামনে একটি দীর্ঘকায় মনুষ্যমূর্তি। তাকে দেখে কালীকিঙ্কর প্রথমে খুবই চমকে উঠেছিলেন। চমকাবারই কথা, কারণ সেই পুরুষ মূর্তিটির চেহারা হুবহু কালী-কিঙ্করেরই মতন। ঠিক বেন কালীকিঙ্করের যজম ভাই। অথচ কালীকিঙ্করের যমজ কেন, কোনো ভাই-ই নেই। দরজার কাছে দাঁড়ানো কালীকিঙ্করের চেহারা এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো ঘরের মধ্যে উপবিষ্ট কালীকিঙ্করের দিকে।

কালীকিঙ্কর ঘোষাল বিচলিত হলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন, এটা মায়া। অবিকল প্রতিমূর্তি সৃষ্টি করা এক প্রকার রাক্ষসী মায়া। কালীকিঙ্কর বসে আছেন লোকটি দাঁড়ানো, না হলে বলা যেত তিনি যেন আয়নায় নিজের ছায়া দেখছেন।

কালীকিঙ্কর জিজ্ঞেস করলেন, তুই কে? কি চাস?

লোকটি উত্তর না দিয়ে অদ্ভুতভাবে হাসলো। তারপর ঘরের মধ্যে এক পা বাড়ালো। কালীকিঙ্কর গঙ্গাজল ছিটিয়ে বলেন, যাঃ যাঃ! অমনি মূর্তিটা মিলিয়ে গেল।

এর পর দরজার কাছে এলো একটি বারো-তের বছরের মেয়ে। কস্তা পেড়ে ধনেখালির শাড়ি পরা, আঁচলটা জড়িয়ে গাছ-কোমর করে বাঁধা। একে দেখে কালী-কিঙ্কর আরো বেশী চমকে উঠলেন। মেয়েটিকে দেখতে অবিকল কালীকিঙ্করের নিজের মেয়ে লীলার মতন। তাঁর একমাত্র মেয়ে। মেয়েটিকে দেখে কালীকিঙ্কর দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু আসন ছেড়ে উঠলেন না।

মেয়েটি ঘরের মধ্যে এক পা এগিয়ে তীক্ষ্ম গলায় বললো, তুই কেন এসেছিস্?

(ভূত প্রেতরা সব সময় তুই বলে। তুমি বা আপনি তাদের অভিধানে নেই।)

কালীকিঙ্কর এর দিকে গঙ্গাজল ছোটাতে পারলেন না। কুমারী মেয়ের প্রতি মন্ত্র

খাটে না। অপাপাবিদ্ধা কুমারী অভিশাপের অতীত।

কালীকিঙ্কর জিজ্ঞেস করলেন, তুই কে রে বেটি!

মেয়েটি আর এক পা এগিয়ে এসে ফের জিজ্ঞেস করলো, কেন এসেছিস তুই এখানে কেন? তোর মেয়ে বাড়িতে মরতে বসেছে, আর তুই এখানে বসে আছিস?

কালীকিঙ্করের বুক কেঁপে উঠলো। তবু তিনি হেসে উঠে বললেন, আমার মেয়েকে জলজ্যান্ত সুস্থ দেখে এসেছি কয়েক ঘণ্টা আগে—আর এর মধ্যেই সে মরতে বসেছে?

মেয়েটি বললো, যা, বাড়ি গিয়ে দ্যাখ!

কালীকিঙ্কর বললেন, আমার সঙ্গে ছলনা করে তোর সুবিধে হবে না! তুই এই মূর্তি ধরেছিস কেন? আমার মেয়ের কথা আমি বুঝবো। তুই কে বল্!

মেয়েটি তখন হঠাৎ মাটিতে শুয়ে পড়লো। মনে হলো যেন অভিমান করে কাঁদবে। ঐ বয়েসের মেয়েরা যেমন কাঁদে। তা কিন্তু নয়, মাটিতে শুয়ে গড়াতে গড়াতে চলে এলো কালিকীঙ্করের দিকে। কালীকিঙ্কর জোড়াসন করে বসেছিলেন, মেয়েটি কাছে এসেই কালীকিঙ্করের বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল কামড়ে ধরলো।

কালীকিঙ্কর চেঁচিয়ে উঠলেন, একি ছাড়্ ছাড়্!

মেয়েটি কালীকিঙ্করের বুড়ো আঙুল সম্পূর্ণটা মুখে ভরে প্রচণ্ড জোরে কামড়ে ধরেছে। কালীকিঙ্কর পাশে রাখা লাঠিখানা তুললেন তাকে মারবার জন্য। কিন্তু তিনি সাধক মানুষ, একটি মেয়েকে মারার জন্য তাঁর হাত উঠলো না, বিশেষত যে-মেয়ের চেহারা তাঁর নিজের কন্যার মতন। লাঠি রেখে কালীকিঙ্কর হাত দিয়ে মেয়েটিকে টেনে ছাড়বার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মেয়েটির গায়ে যেন অসীম শক্তি।

যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কালীকিঙ্কর উঠে দাঁড়ালেন। আসন ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জোর কমে গেল, দরজার কাছে ফিরে এলো আগের সেই মূর্তি, তার পেছনে আরও কে যেন। কালীকিঙ্করের মানসিক দৃঢ়তা নষ্ট হয়ে গেল, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চ্যাঁচাতে লাগলো, ওরে, ওরে, ছাড়, ছাড়, আর আসবো না, ছেড়ে দে, মরে গেলাম, মরে গেলাম—

পাড়াসুদ্ধু লোক শুনেছিল সেই চিৎকার। আশে পাশের সমস্ত বাড়ির দরজা-জানলা খুলে দিয়েছিল। কালীকিঙ্কর তখন সেই মেয়েটাকে সুদ্ধু ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে ছুটে এসেছিলেন বারান্দায়, সেখান থেকে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে লাফ দিয়েছিলেন নীচে। তাঁর বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল ছিঁড়ে উড়ে গেছে।

খবর পেয়ে বড়বাবু ছুটলেন হাসপাতালে কালীকিঙ্করকে দেখবার জন্য। সত্যি কালীকিঙ্করের এক পায়ের বুড়ো আঙুল নেই। এবং সে রাত্রে কালীকিঙ্করের মেয়ে লীলার সত্যিই কলেরা হয়েছিল।

বড়বাবু বাড়ি ফিরেছিলেন খুব চিন্তিত ভাবে। চিররঞ্জনকে বলেছিলেন, এ সব গাঁজাখুরি গল্প আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু কথা হচ্ছে কি, কালীকিঙ্কর পণ্ডিত এ মিথ্যে গল্প ছড়াবেনই বা কেন? তা ছাড়া, পায়ের ঐ আঙুলটা—দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়লেও কি পায়ের আঙুল ঐভাবে উড়ে যায়? ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে।

বড়বাবু সেই ভূতুড়ে বাড়িতে যাওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। বাড়ির সবাই তাঁকে ভীষণভাবে বারণ করলো, বড়বাবু কিছুতেই কারুর কথা শুনবেন না। বিশেষভাবে তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল ঐ প্রতিমূর্তি দেখার ব্যাপারটা। তিনি তাঁর প্রতিমূর্তির সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন—বোধ হয় বিশেষ কোনো কথা তাঁর বলার ছিল।

শেষ পর্যন্ত বড়বাবুর যাওয়া হয় নি। কালীকিঙ্কর ঘোষালের ঘটনাটা এমনভাবে রটে যায় যে, হাজার হাজার মানুষ গিয়ে ভিড় করে সেই বাড়ির সামনে, পুলিস জায়গাটা ঘিরে রাখে এবং শেষ পর্যন্ত কর্পোরেশন বাড়িটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়।

খবরের কাগজে জাতিস্মরের ঘটনাটা পড়ার পরদিন বড়বাবু চিররঞ্জনকে নিয়ে পুরুলিয়া রওনা হয়ে গেলেন। পুরুলিয়া স্টেশন থেকে রঘুনাথপুর গ্রামে যেতে হলে গরুর গাড়ি ছাড়া আর কোনো যানবাহন নেই। কিছু খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করার পর একখানা গরুর গাড়ি ভাড়া নিয়ে তাঁরা চেপে বসলেন।

প্রায় এক বেলার পথ। রাস্তার অবস্থা কহতব্য নয়। ঝাঁকুনি খেতে খেতে হাড়-গোড় ভেঙে যাবার উপক্রম। পেঁৗছোতে পেঁৗছোতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে, সেদিন আর ফেরার প্রশ্ন উঠে না। সেই গন্ডগ্রামে কোনো থাকার জায়গা পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। ভরসার কথা এই, গ্রীষ্মকাল, শেষ পর্যন্ত দরকার হলে গরুর গাড়িতেই শুয়ে থাকতে পারা যাবে। পুরোটাই যাতে মরীচিকার পিছে ছোটা হয়ে না যায়, সেইজন্য পুরুলিয়া স্টেশনে তাঁরা খবর নিয়ে এসেছেন। স্টেশনের দু'চারজন লোকও সেই অলৌকিক ব্যাপারের কথা শুনেছে।

বড়বাবু চিররঞ্জনকে বললেন, বুঝলে, গিয়ে যাতে সম্পূর্ণ নিরাশ না হতে হয়, সেজন্য প্রস্তুত থাকা ভালো। যদি গিয়ে দেখি পুরো ব্যাপারটাই বানানো, তাহলেও একটা জিনিস ভাবতে হবে। এই রকম এক গন্ডগ্রামের একজন ইস্কুল মাস্টারের মাথায় হঠাৎ এরকম একটা ঘটনা বানাবার কথা জাগলো কি করে? সবার মাথায় তো এরকম চিন্তা জাগে না। এটাও তো একটা রহস্য।

চিররঞ্জন বললেন, মনে হচ্ছে, হঠাৎ যেন আমাদের বয়েস কমে গেছে। ছেলে ছোকরারাই এই সব অ্যাডভেঞ্চারে যায়।

বড়বাবু সচকিত হয়ে বললেন, তোমার ভালো লাগছে না? কষ্ট হচ্ছে খুব?

না, না! খুব বেশি ভালো লাগছে বলেই এ কথা বললাম। বয়েস কমে যাবার অনুভূতির চেয়ে প্রিয় আর কি আছে এ বয়েসে।

—তুমি বড্ড বেশি বুড়ো বুড়ো ভাব করো। তোমার কী-ই বা বয়েস। তোমার বয়েসে আমি লছমনঝোলায় থাকতাম—রোজ একখানা পাহাড় ভেঙে যেতাম গঙ্গায় স্নান করতে।

—আপনার গায়ে বয়েসের আঁচড় লাগে না। আচ্ছা বড়বাবু, হরিদ্বার-লছমনঝোলায় আপনি যে বছরখানেক কাটিয়েছিলেন, কি পেয়েছিলেন সেখানে। ঈশ্বরকে পেয়েছিলেন?

—ঈশ্বরকে কেউ পায়?

—পায় না?

—আমি অন্তত ঈশ্বরকে পেতে যাইনি। আমি দেখতে গিয়েছিলাম সত্যিই ঈশ্বরকে কেউ পায় কি না।

—সেরকম কারুকে পান নি?

—নিঃসন্দেহ হতে পারি নি। যাঁরা খুব জোর দিয়ে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দর্শনের কথা বলেছেন, তাঁদের আমার মনে হয়েছে মানসিক ভাবে অসুস্থ। তবে এ কথাও ঠিক ঈশ্বর-চর্চা যাঁরা খুব মন দিয়ে করেন—তাঁদের মধ্যে এমন একটা পরিবর্তনের চিহ্ন দেখেছি—যা বেশ আনন্দেরই ব্যাপার। ঈশ্বর-সন্ধানী লোকদের আমার খারাপ লাগে না, কিন্তু ধার্মিক লোকদের আমি পছন্দ করতে পারলাম না। ঈশ্বর আছেন

কিনা আমি জানি না, থাকুন তাতে কোনো ক্ষতি নেই—কিন্তু ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে যে কতগুলি ধর্ম গড়ে উঠেছে—সেগুলো মানুষের বড় ক্ষতি করে।

—কেন, এ কথা বলছেন কেন?

—প্রত্যেক ধর্মে আলাদা-আলাদা ঈশ্বর বড্ড হিংসুটে। ওল্ড টেস্টামেন্টে খোলাখুলিই বলা হয়েছে, তিনি জেলাস গড্। এক ধর্ম আর এক ধর্মকে সহ্য করে না। আবার এক একটা ধর্মের মধ্যেও ফাটল ধরে বিভিন্ন টুকরো হয়—তারা আবার নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। এক একটা ধর্মের নামে পৃথিবীতে যত মানুষ খুন হয়েছে, প্লেগ, কলেরা বা সাপের কামড়েও অত মানুষ মরে নি।

—আমাদের বেদে তো হিংসার কোনো কথা নেই।

—তুমি বেদ পড়েছো?

—তেমন ভালো করে পড়ি নি।

—পড়ে দেখো, বেশ মজা পাবে। আমি এক সময় ঝোঁকের মাথায় পড়ে ফেলেছি। বেদকে অনেকে বলে হিন্দুদের একটা ধর্মগ্রন্থ, কিন্তু ওটা একটা গাঁজাখুরি কথা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই বেদকে বলেছেন পলগ্রেভ সাহেবের গোল্ডেন ট্রেজারির মতন একখানা পদ্যের বইয়ের সংকলন। উনি ভূয়োদর্শী লোক, বলেছেন ঠিক কথাই। যে-সব প্রাচীন আর্যরা হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খৃস্টান, জরাথুষ্ট্রিয়ান—সবারই পূর্বপুরুষ, তাদের লেখা কিছু কবিতাই তো বেদ নামে চলে। ওরা ছিল প্যাগন, প্রকৃত-পূজারী। আগুন, হাওয়া, বৃষ্টি এগুলোকেই দেবতা বানিয়ে পুজো করার তবু একটা মানে বুঝতে পারি, কিন্তু জগৎ সংসারের সৃষ্টিকর্তা একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব তো দূরে থাক, এরকম কল্পনার কোনো প্রয়োজন আছে বলেও আমি বিশ্বাস করি না। বেদেও কোনো ধর্মের কথা নেই, ওটা পুরোপুরি ভোগবিলাসপ্রিয় মানুষদের সাহিত্য। বৈরাগ্য, আত্মোপলব্ধি, ঈশ্বরানুভূতি—এসব ভালো ভালো কথা এসেছে অনেক পরে—উপনিষদের আমলে, অনার্য আর দ্রাবিড়দের কাছ থেকে পাওয়া। পুজো শব্দটাই তো বৈদিক সংস্কৃত নয়—দ্রাবিড়দের কাছ থেকে এসে সংস্কৃতে ঢুকেছে। আমরা এখন যেটুকু হিন্দুধর্ম বলে জানি, সেটা কোনো ধর্মই নয়, একটা জগাখিচুড়ি ব্যাপার। এরা ভালো ভালো সাহিত্য বানিয়েছে, কিন্তু সেগুলোকে উপদেশ হিসেবে নেওয়ার কোনো দরকার নেই। দ্যাখো না, এই ধর্মের মূল শাস্ত্রগুলোতে কোথাও মূর্তিপুজোর কথা নেই, অথচ সারা ভারত জুড়ে কতরকম পুতুলের কতরকম পুজো। আমাদের ব্রাহ্মরা এই ধর্মটা সাফসুফ করে একটা পরিষ্কার চেহারা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বেম্মদের সেই ধর্ম বাজারে তেমন চললো না। কুসংস্কার ছাড়া ধর্ম টেঁকে না। প্রত্যেকটা ধর্মই কুসংস্কারের ডিপো।

চিররঞ্জন আস্তে আস্তে বললেন, মানুষ যদি কুসংস্কার মেনেই আনন্দ পায়—

বড়বাবু ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠলেন, আনন্দ পাওয়ার কথা আলাদা! কিন্তু যখন কেউ এর মধ্যে তত্ত্বের কথা বলে, তখনই আমার রাগ ধরে। বললেই পারিস্, আমার গায়ে জোর আছে, মানুষ খুন করে আমি আনন্দ পাই—এর মধ্যে আবার ধর্ম টেনে আনা কেন?

গাড়োয়ান বললো, বাবু, হুই যে দেখা যায় রঘুনাথপুরের আলো, আপনারা কার বাড়িতে যাবেন? বালক-ঠাকুর দেখতে যাবেন নাকি?

বড়বাবু মুচকি হেসে চিররঞ্জনকে বললেন, দেখেছো, এর মধ্যেই ঠাকুর বানিয়ে ফেলেছে!

॥ ১৪ ॥

রসময় চক্রবর্তীর বাড়িতে মাটির দেওয়াল ওপরে খাপরার ছাদ। প্রাইমারি স্কুলের রসময় চক্রবর্তীর অবস্থা বোধহয় এবার ফিরবে। তাঁর ছেলে পিতু অর্থাৎ সম্পতিকে দেখবার জন্য এত বেশী ভিড় হচ্ছে যে ভিড় সামলাবার জন্য রসময় চক্রবর্তীকে বাড়ির সামনে কাঁটাতারের বেড়া তুলতে হয়েছে—লোকজন এখন লাইন দিয়ে ভেতরে ঢোকে এবং দর্শনী এক আনা। পিতুর সঙ্গে কথা বলার জন্য রেট আট আনা, তবলা শুনতে হলে এক টাকা। তাতেও সারাদিন হাজার হাজার মানুষ আসছে। জায়গাটায় ছোটখাটো মেলা বসে গেছে, গজিয়ে উঠেছে চায়ের দোকান, পানের দোকান, মুড়ি-মশলা, বেলুন। দুতিনটে হ্যাজাক জ্বলছে।

বড়বাবু আর চিররঞ্জন কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে দেখলেন। ভিড় থেকে একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন নিম্নস্বরে। চিররঞ্জন বললেন, এত লোক যখন আসছে, তখন একটা কিছু ব্যাপার আছে নিশ্চয়ই। লোকে পয়সা দিয়ে দেখছে!

বড়বাবু বললেন, তুমি মাটির মধ্যে একটা গোল ধরনের পাথর পুঁতে রটিয়ে দাও যে সেটা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছে, তুমি স্বপ্নে সেটা জানতে পেরেছো—আর প্রত্যেক দিন একটা গরু এসে ঐ পাথরটার ওপর বাঁট থেকে দুধ দিয়ে যায়—দেখবে তাতেও হাজার হাজার লোক আসবে। পয়সাও দেবে!

—কিন্তু লোকজন বলাবলি করছে, জেলার ডি এস পি সাহেবও এসে দেখে গেছেন। বুজরুকি কিছু হলে কি তিনি চলতে দিতেন? ইংরেজ।

—ওঃ চিরু, তোমার ইংরেজ-ভক্তির তুলনা নেই! ইংরেজদের মধ্যে বুঝি কুসংস্কার নেই? কত যে আছে, তা ওদের সাহিত্য পড়লেই বোঝা যায়। ইংরেজি ভাষায় ভূতের গল্প নেই? তাছাড়া আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে কুসংস্কার টিঁকিয়ে রাখার ওদের স্বার্থ আছে।

—আপনি যে দেখছি পুরোপুরি অবিশ্বাস নিয়েই এসেছেন। তবু এতদূর ছুটে এলেন!

বড়বাবু হঠাৎ লাজুকভাবে হাসলেন। তারপর বললেন, একটা জিনিস বুঝতে পারো নি? আমি বিশ্বাস করতেই চাই—তাই তো আমার এত অবিশ্বাস।

রাত বাড়তে থাকলে আস্তে আস্তে ভিড় কমতে লাগলো। শেষ দর্শকটি চলে যাবার পর ওঁরা দুজন এগোলেন বাড়ির দরজার দিকে।

রসময় চক্রবর্তী তখন একগাদা খুচরো পয়সা নিয়ে গুণতে ব্যস্ত, ওঁদের দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন, আর হবে না, আর হবে না, এখন বন্ধ! এখন চলে যাও!

তারপর বড়বাবুর রাসভারি চেহারার দিকে ভালো করে তাকিয়ে একটু থতমত খেয়ে গেলেন। মনে করলেন, বিশেষ কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তি এসেছেন বুঝি! রসময় চক্রবর্তী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পয়সার বাক্সটা উল্টে পড়ে গেল। তখন তিনি হাঁউমাঁউ করে কেঁদে ফেলে বললেন, আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলবে বসাই। আমার ছেলে বাঁচবে না! আমি পয়সা কড়ি কিছু চাই না। আমার ছেলেকে বাঁচান! এক মিনিট ছুটি নেই—লোকজন কথা শোনে না, এক মিনিট ওকে বিশ্রাম দেয় না—খাবার পর্যন্ত সময় পায় না ছেলেটা—কেন আমার কপালে এই হলো!

বড়বাবু তাঁর কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনার কোনো চিন্তা নেই। আপনার ছেলেকে এখন বিরক্ত করতে চাই না, আপনার সঙ্গেই দুটো কথা

বলতে চাই।

রসময় চক্রবর্তী একটু ধাতস্থ হয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

—কলকাতা থেকে।

পুরুলিয়ার ক্ষুদ্র গ্রামে কলকাতা শহরের নাম তখন ম্যাজিকের মতন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে খাঁটি কলকাতার মানুষ সচরাচর গ্রামে পদার্পণ করেনি, তখন দক্ষিণেশ্বর-বরানগর ঘুরে আসাই ছিল পল্লীভ্রমণ। সেই কলকাতা থেকে দু'জন সম্ভ্রান্ত চেহারার ব্যক্তি শুধু তাঁর ছেলেকে দেখার জন্যই এসেছেন, এতে রসময় চক্রবর্তী বেশ অভিভূত হয়ে পড়েন। শশব্যস্ত হয়ে বললেন, আপনারা উঠেছেন কোথায়? এই রাত্তিরে ফিরবেন কি করে?

অমরনাথ বললেন, সেজন্য চিন্তা করবেন না, একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—কিসের ব্যবস্থা করবেন? এ পাড়া গাঁ জায়গা, হোটেল বলে তো কিছু নেই—

—আমরা গরুর গাড়িতেই শুয়ে থাকবো।

—সেও কি হয়! আপনারা শোবেন গরুর গাড়িতে? এ গাঁয়ের তাহলে কোনো ইজ্জৎ থাকবে? দয়া করে আপনারা যদি আমার বাড়িতেই—

রসময় চক্রবর্তী কিছুতেই ছাড়লেন না! তাঁর অতিথিপরায়ণতাই প্রবল হয়ে উঠলো। বাড়ির ভেতরে গিয়ে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করে আবার ফিরে এলেন ঢাকা বারান্দায়। বললেন, নিন স্যার, আপনারা জামা কাপড় ছেড়ে আরাম করে বসুন! যা গরম এ বছর, মা বসুমতী একেবারে দগ্ধ হচ্ছেন। পুকুর-নালা সব শুকিয়ে গেল!

পিতু অর্থাৎ সুপতির সঙ্গে তখনও কোনো কথা হয়নি। একবার মাত্র তাকে চোখে দেখা হয়েছে। মস্তবড় একটা কাঁসার থালায় নানারকম খাদ্যদ্রব্য সাজিয়ে তাকে খাওয়ানো হচ্ছে মহা সমারোহে। যেন সে এ বাড়ির ছেলে নয়, কোনো একজন গণ্যমান্য অতিথি! ক'দিন আগেও সে নিশ্চয়ই বাপ-মায়ের কাছ থেকে চড় চাপড় খেয়েছে, খিদে পেলে ঘ্যানঘ্যান করেছে—আজ সে বাড়ির চোখে সম্পূর্ণ অন্যরকম! তার মায়ের ধারণা, ছেলের ওপর কোনো দেবতা ভর করেছে। অপদেবতা কিংবা ভূতে প্রায়ই মানুষের ওপর ভর করে, এ গ্রামেই দু'মাস আগে একজন বিবাহিতা রমণীর ওপর ভূতের ভর হয়েছিল, চওরা এসে সর্ষে চালান দিয়ে সেই ভূতকে ছাড়িয়েছে! রসময় চক্রবর্তীর স্ত্রীর জন্ম-জন্মান্তরের সৌভাগ্য যে তাঁর ছেলের ওপর ভূতের বদলে দেবতার ভর হয়েছে। সে দাঁত কিড়মিড় করে না। অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দেয়!

ছেলেটার বয়েস আট নয় বছর হবে, অসম্ভব রোগা। তাকে একটি নতুন কোরা ধুতি এবং নতুন মখমলের পাঞ্জাবি পরানো হয়েছে, কিন্তু চুলে চিরুনি দেওয়া হয়নি! মাথার চুলগুলো খোঁচা খোঁচা, চোখ দুটি অসুস্থ মানুষের মতন ছলছলে। তার খাওয়ার ভঙ্গিও অস্বাভাবিক! সে এক এক রকম খাবারে খামচা মেরে মেরে এক খাবলা তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিচ্ছে, সবটা না খেয়েই ছিটিয়ে দিচ্ছে থু থু করে! তার মা এক হাতে পাখার হাওয়া করতে করতে অন্য হাতে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলছেন, খাও বাবা, মানিক আমার, সোনা আমার, একটু খাও! পায়েসটা ভালো লাগছে না? একটু দই খাবে? তোমার জন্য মালপোয়া বানিয়েছি—।

রসময় চক্রবর্তী দুটি হুঁকো সেজে এনেছিলেন, বড়বাবু একটি নিয়ে টানতে লাগলেন! চিররঞ্জন ধূমপান করেন না। অনেকক্ষণ ধরে তিনি একটাও কথা বলেন

নি, সব কিছু দেখে যাচ্ছিলেন চুপচাপ করে। এখন বারান্দার তক্তাপোশে বসে তাকিয়ে আছেন বাইরের দিকে। দোকানপাট উঠে গেছে, যতদূর চোখ যায় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার! মাঝে মাঝে শিয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে—সে ডাকও যেন অনেকটা ফেউয়ের মতন! একটু আগেই শুনেছেন, এখান মাঝে মাঝে চিতবাঘ বেরোয়!

তক্তাপোশের ওপরেই রাখা আছে বাঁয়া তবলা! সেদিকে তাকিয়ে বড়বাবু রসময় চক্রবর্তীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নিজে তবলা বাজাতে জানেন?

রসময় বিনীতভাবে বললেন, আজ্ঞে, একটু একটু! একসময় গান বাজনার চর্চা করতাম! কুমীরপোতার রাজবাড়িতে ওস্তাদ বাদল খাঁ সাহেব কিছুদিন এসে ছিলেন—

—আপনার ছেলে বোধহয় আপনার শুনে শুনেই তবলা শিখেছে!

—আজ্ঞে না, শুনে শুনে কি শেখা যায়? এসব যন্তরে হাত না পড়লে—আমি নিজেই তো তাকে শিখিয়েছি!

বড়বাবু চমকে উঠে বললেন, আপনি আপনার ছেলেকে তবলা বাজানো শিখিয়েছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—তবে যে খবরের কাগজে লিখেছে, ও জীবনে কখনো তবলা ছুঁয়ে দেখেই নি! হঠাৎ বাজাতে শুরু করেছে!

—ওটা ঠিক নয়। আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলবো কেন?

বড়বাবু বিমূঢ়ভাবে তাকালেন চিররঞ্জনের দিকে। দু'জনে চোখাচোখি হলো। এতটা রাস্তা বৃথাই আসা হলো তাহলে?

রসময় বললেন, আপনাদের কাছে স্যার লুকোছাপা কিছু নেই! সব খোলাখুলি বলছি। এর মধ্যে একটা কিছু ব্যাপার আছেই। মিস্ট্রি যাকে বলে। আপনারা মানী গুণী লোক, আপনারাই বিচার করে আমাকে বলে দিন। আমি নিজের হাতে আমার ছেলেকে তবলা শিখিয়েছি। এই একটু ধা ধিন না, না তিন না—মানে একটু দাদরা, কাহারবা আর ত্রিতাল—মানে কোনো রকমে ঠেকা দিতে পারা আর কি! আমার ছেলে কতটুকুনি শিখেছে তা তো আমার বেশী আর কেউ জানে না! আমার কাছ থেকেই তো শিখেছে—আর আমিও তো এর বেশী জানি না। তার পর একদিন কি হলো, ওরেঃ বাস রে বাস্, ভাবতে গেলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দেয়, আমার হাতের লোম কি রকম খাড়া হয়ে গেছে।

বড়বাবু মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কি হলো একদিন?

—কি বলবো স্যার আপনাকে। হঠাৎ একদিন সন্ধেবেলা আমি শুনতে পেলাম পাশের ঘরে তবলার বোলের যেন খই ফুটছে! কোনো ওস্তাদ যেন বসে লহরা বাজাচ্ছে! তাড়াতাড়ি উঁকি মেরে দেখি, ঘরে আর কেউ নেই। আমার ছেলে পিতু! এ দৃশ্য দেখলে গায়ে কাঁটা দেবে না!

—আপনার ছেলে হঠাৎ খুব ভালো তবলা বাজাতে শিখে গেছে, এই তো? এতে খুব বেশী আশ্চর্য হবার কি আছে! ঐ বয়েসী ছেলের পক্ষে ভালো তবলা বাজানো তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। আগেও দেখা গেছে!

—আপনি কি বলছেন স্যার? আশ্চর্য নয়? তবলার বোল কি গাছে ফলে? গুরুর কাছে নাড়া বেঁধে কত সাধ্য সাধনা করে তবে শিখতে হয়। আমার ছেলে কোনোদিন এ গাঁ ছেড়ে বাইরে যায়নি, তার শিক্ষা আমার কাছে—আমিও নিজেও

জানি অতি সামান্যই—আর আমার ছেলে হঠাৎ এতখানি শিখে ফেলবে—এ কি মুখের কথা? এখন তার বাজনা শুনলে কণ্ঠে মহারাজ কিংবা হীরু গাঙ্গুলি পর্যন্ত অবাক হয়ে যাবেন! আর কি দুর্দান্ত নয়! এত দ্রুত লয়ে বাজাতে পারে যে আঙুল দেখা যায় না—সারা জীবন সাধনা করলেও অনেকে এমনটি পারে না—আপনি নিজের কানে শুনলে, নিজের চোখে দেখলে তবে বুঝতে পারবেন!

—আপনি আপনার ছেলেকে সেদিন কিছু জিজ্ঞেস করেন নি!

—করেছি বইকি! আমি বললাম, পিতু, তুই বাজাচ্ছিলি এতক্ষণ? আবার বাজা তো দেখি! একি, এ যে অসম্ভব! অসম্ভব! আমার ছেলে কি বললো জানেন? সে বললো, পিতু কে? আমার নাম বিশ্বেশ্বর! আমি এখানে কেন? ছেলের মুখের ভাবই তখন অন্যরকম। যেন একজন বয়স্ক লোক। আমার গিন্নীও তখন এসে হাজির হয়েছে। সে ছেলের গায়ে হাত দিয়ে বললো, ও পিতু, তুই কি বলছিস কি? ছেলে উত্তর দিল, আমি পিতু নয়, আমি বিশ্বেশ্বর। আমার গিন্নীর তখন ধারণা হলো ছেলের ওপর শিবের ভর হয়েছে। গত বছর গাজনের মেলায় ঐ ছেলে শিব সেজে নেচেছিল কিনা! শিবের ভর না হলে সে অমন করে তবলা বাজাবে কি করে!

বড়বাবু বললেন, শিবঠাকুর ভালো তবলা বাজাতে জানেন—এমন কথা কখনো শোনা যায়নি। উনি তো ডমরু বাজান—তার সঙ্গে তো বাঁয়া তবলার মিল নেই। চিরু, তুমি কি বলো?

চিররঞ্জন একাগ্রভাবে শুনছিলেন। উত্তর না দিয়ে শুধু হাসলেন।

রসময় বললেন, সে কথা কি বলছেন, ঠাকুর দেবতারা সবই পারেন। ওঁদের কাছে তবলাই বা কি আর বেহালাই বা কি! তবে, আমি অবশ্য ঠাকুর দেবতার কথা ভাবিনি। ঠাকুর দেবতারা আমার মতন অভাগার বাড়িতে আসবেনই বা কেন? আমি ছেলেকে আরও অনেক কথা জিজ্ঞেস করলুম। ছেলে বললো, তার নাম বিশ্বেশ্বর হালদার, তার বাড়ি মালটা টাউনে, সেখানে তার বাপের দোতলা বাড়ি। বারবার আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, আমি এখানে কেন? আমি এখানে কেন? আমি বুঝতে পারলাম, এ ছেলে জাতিস্মর। দৈবাৎ পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে গেছে। কোটিতে গুটিক এমনটি হয়।

বড়বাবু সন্দিগ্ধভাবে বললেন, বিশ্বেশ্বর হালদার নামে কোনো বিখ্যাত তবলচীর নামে তো আমি শুনিনি!

—মফঃস্বলে কত ভালো ভালো গুণী লোক পড়ে আছে, কলকাতার লোকরা কি সব খবর রাখে!

—আচ্ছা বেশ। আপনি মালদায় আপনারা ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলেন?

—তা এখনও যেতে পারিনি। তবে এ গাঁয়ের একজন লোক মালদায় গিয়ে খবর নিয়ে এসেছে—মালদা টাউনে সত্যিই অনন্ত হালদার নামে তেজারতের কারবারী এক ভদ্রলোক আছে। তেনার দোতলা বাড়ি, বিশ্বেশ্বর নামে এক ছেলে মারা গেছে বছর দশেক আগে।

বাড়বাবু একটা বিরক্ত হলেন। কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে না হলে তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়ে। এই লোকটি তার ছেলেকে চিড়িয়াখানার জন্তুর মতন টিকিট কেটে মানুষজনকে দেখাচ্ছে। তার কি উচিত ছিল না—প্রথমেই ছেলেকে মালদায় নিয়ে সত্যা-সত্য যাচাই করা!

বড়বাবুর ভাবভঙ্গী দেখে রসময় চক্রবর্তী একটু যেন ঘাবড়ে গেলেন। তাড়া-

তাড়ি বললেন, ছেলেকে ডাকবো স্যার? আপনি নিজের চক্ষে দেখবেন?

বড়বাবু বললেন, না, তার দরকার নেই। সে এখন বিশ্রাম করুক। আপনার সঙ্গেই কথা শেষ হয়নি। আমি অকপটে কথাবলা পছন্দ করি। সত্যি কথা বলতে কি, মালদার ব্যাপারটা আমার উড়ো কথা বলে মনে হচ্ছে। তবলা বাজানো কিংবা এ রকম এক আধটা উড়ো কথায় কিছুই প্রমাণ হয় না। আপনি বুঝতে পারছেন না, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার!

রসময় এবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। খানিকটা তোতলাতে তোতলাতে বললেন, আপনি বিশ্বাস করছেন না? আমি কি মিথ্যে কথা বলছি! এ যে আমারও বুদ্ধির অতীত! ডি এস পি সাহেব এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে ছেলে আমার গড়গড় করে ইংরেজি বলে গেল! এ গাঁয়ের একটা লোকও ইংরেজি জানে না, আমি নিজেও জানি না! ভাবতে গেলে আমার নিজেরই মাথা ঘোরে!

দুটো শেয়াল বাড়ির কাছ থেকেই ডেকে উঠলো, ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করে গেল একটা কুকুর। অনেকক্ষণ বাদে উঠেছে একটা ক্ষীণ মতন চাঁদ। সেই চাঁদ আড়াল করে উড়ে গেল একটা প্যাঁচা। একদিকের অন্ধকার দিগন্ত থেকে উড়ে এসে কেন সে অন্যদিকের অন্ধকারে উড়ে যায়, তার মানে বোঝা যায় না।

চিররঞ্জন ধড়ফড় করে খাট থেকে নেমে বললেন, এসো খোকা, তুমি এখানে এসে বোসো!

ঘর থেকে বেরিয়ে কখন সুপতি সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। অবোধ বালকের মতন তার মুখে একটা আঙুল। এক দৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে আগন্তুক দু'জনের দিকে। সারাদিন ধরে অসংখ্য মানুষজন তাকে দেখে গেছে, এখন সে নিজে দেখছে অন্য মানুষদের।

ছেলেটিকে দেখে চিররঞ্জনের হঠাৎ মনে পড়লো তাঁর নিজের ছেলের কথা। বদলেরই বয়েসী হবে—যদিও স্বাস্থ্য এর ভালো না। ছেলেটির দিকে তাকালে একটু অন্যরকম অনুভূতি হয়ই—ঠিক যেন আর পাঁচজনের মতন না।

রসময় বললেন, আয় পিতু, এ'রা কলকেতা থেকে এয়েছেন। প্রণাম কর!

ছেলেটি প্রণাম করলো না, গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বড়বাবু বললেন, থাক্, থাক। তারপর উঠে গিয়ে বতবাবু ছেলেটির একেবারে সামনে গিয়ে শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি?

ছেলেটি চেঁচিয়ে বললো, বিশ্বেশ্বর হালদার! মাই নেম ইজ বিশ্বেশ্বর হালদার! মাই ফাদারস্ নেম ইজ অনন্ত হালদার!

ছেলেটি এত জোর চেঁচিয়ে উঠলো যে শুনে হকচকিয়ে যেতে হয়। কথা বলার সময় সে কারুর চোখের দিকে তাকায় না; মাটির দিকে চেয়ে থাকে। এবং সেই সময় তার শরীর একটু একটু দোলে।

রসময় বললেন, পিতু, বাবা, এনাদের একটু তবলা বাজিয়ে শোনাও তো!

বড়বাবু বললেন, থাক, এখন থাক। এখন দরকার নেই। কিন্তু ছেলেটি পূর্ববৎ চেঁচিয়ে হুকুমের সুরে বললো, মানি! গিভ হিম মানি! আই শ্যাল প্লেতবলা, গিভ হিম মানি!

রসময় বললেন, দেখলেন! দেখলেন? এক অক্ষর ইংরেজি জানার কথা নয়। কোনোদিন পড়েইনি, এ কি করে সম্ভব বলুন!

ছেলেটির ইংরেজি বলার ধরন খুবই অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকেরই মতন। এই

ইংরেজি জ্ঞানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া যায় না। যে-গ্রামে শুধু একটি প্রাইমারি স্কুলই সম্বল—সেখানে অধিকাংশ ছেলেই ইংরেজি বলতে পারে না বটে, কিন্তু শিখে নেওয়া এমন কিছু অসম্ভব নয়।

বড়বাবু পকেট থেকে দুটি রুপোর টাকা বার করে রাখলেন তক্তাপোশের ওপর। ছেলেটি কাঠের পুতুলের মতন খাড়া ভাবে এগিয়ে এসে খাটে উঠে বসলো। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে একটুও দেরি না করে ধাঁই ধপাধপ করে বাজতে লাগলো তবলা। বড়বাবু সঙ্গীতে অভিজ্ঞ, খানিকটা শুনেই তিনি বুঝতে পারলেন ছেলেটির তবলায় হাত আছে ঠিকই, খুব একটা উচ্চাঙ্গের বাজনা নয় অবশ্য—তবে অন্য কারুর কাছে না শেখার ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়, তাহলে আশ্চর্যই বলতে হবে। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে ছেলেটির ভাবভঙ্গি। তার হাঁটা, তার কথা বলা. তবলা দুটো টেনে নিয়ে বসা—এর মধ্যে শিশুসুলভ কোনো ভাবই নেই। তর ভেতর থেকে যেন একটা অন্য মানুষ তাকে চালাচ্ছে—এরকম একটা ধারণা হয়ই।

চিররঞ্জন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন, ফিসফিস করে বললেন, সত্যিই বিস্ময়কর, সত্যিই বিস্ময়কর!

বড়বাবু বললেন, খুব সম্ভব ছেলেটির মৃগী রোগ আছে। ছেলেটি যে অসুস্থ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হাত তুলে ছেলেটিকে বাজনা থামাতে বলে বড়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, খোকা, তুমি কার কাছে বাজানো শিখেছো?

ছেলেটি বললো, ওস্তাদ দীনেশ সিং যাদব। গুরুর নাম উচ্চারণ করেই সে এক হাত কানে ছোঁয়ালো—অবিকল পেশাদারদের মতন।

—কোথায় থাকেন তিনি?

—মালদায়।

রসময় তাড়াতাড়ি জানালেন, আমার ছেলে জীবনে কখনো এ গ্রামের বাইরে যায় নি।

বড়বাবু রসময়ের দিকে ফিরে বললেন, শুনুন মশাই, আপনার ছেলেকে কালই মালদায় নিয়ে যেতে হবে—আমি সব খরচপত্তর দেবো, আপনি রাজি আছেন? তার-পর এ ছেলেকে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে—আপনারা সবাই গিয়ে আমার বাড়িতে থাকবেন—বড় বড় ডাক্তার এনে দেখাতে হবে একে। আর একটা কথা, আপনার ছেলে জাতিস্মর হোক বা না হোক এ যে অসুস্থ তাতে কোনো সন্দেহ নেই! এর চিকিৎসা না করিয়ে আপনি একে দেখিয়ে পয়সা রোজগার করছেন! আপনার লজ্জা করে না!

রসময় চক্রবর্তী এবার ভেঙে পড়লেন! কান্না আপ্লুত গলায় বললেন, আমি চাইনি, আমি চাইনি—ছেলে দেখিয়ে পয়সা রোজগার করবো—এমন মানুষ আমি না! এই পৈতে ছুঁয়ে বলছি, আমার কথা যদি মিথ্যে হয়, আমি মহাপাতকী হবো। কি করে যেন ওর কথা রটে গেছে—রোজ হাজার হাজার লোক আসছে দেখতে—ছেলেটাকে এক দণ্ড বিশ্রাম দেয় না।

—লোকে দেখছে, তার জন্য পয়সা নিচ্ছেন কেন?

—উপায় নেই। পয়সা না নিলে সবাই এক সঙ্গে ভিড় করে আসে—আমার বাড়ি ঘর দোর ভেঙে ফেলতো! আপনি আমার ছেলেকে বাঁচান। আপনি ওকে যেখানে নিয়ে যেতে বললেন, যাবো। আমার ছেলেটা বাঁচুক, আমি একটা পয়সা চাই না!

বড়বাবু ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, খোকা, তোমার নাম বিশ্বেশ্বর বলছো

কেন? তোমার নাম তো সম্পতি!

ছেলেটি কড়া গলায় বললো, না, আমার নাম বিশ্বেশ্বর!

বড়বাবু এরপর যা করলেন, তাতে সবাই আঁতকে উঠলো। বাড়বাবু হঠাৎ প্রচন্ড এক চড় কষালেন ছেলেটির গালে। দারুন ধমক দিয়ে বললেন, ঠিক করে নাম বলো! ছেলেটি তবুও বললো, বিশ্বেশ্বর। এবার অন্য গালে আর এক চড়।

ছেলেটি কেঁদে ফেললো। এতক্ষণ বাদে সে কনুইয়ের ভাজে মুখ গুঁজে শিশুর মতন কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। অন্যরা স্তব্ধ। বড়বাবুর রুদ্র মূর্তি দেখে কেউ কিছু বলতে সাহস করছে না।

চিররঞ্জন উঠে এসে ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। তার কপালে একবার হাত ছুঁইয়ে বললেন, ইস, এর তো দেখছি খুব জ্বর!

রসময় আস্তে আস্তে বললেন, জ্বর নয়, বরাবরই ওর এরকম—সেই বাচ্চা বয়েস থেকেই ওর টেম্পারেচার বেশী থাকে। গায়ে হাত দিলে ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে।

বড়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, ডাক্তার দেখিয়েছিলেন কখনো?

—এখানে ডাক্তার কোথায় পাবো! কবরেজ মশাই দেখে বলেছেন, ও কিছু নয়, ওর পিত্তির ধাত আছে।

চিররঞ্জন তখন ছেলেটিকে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করছেন, তোমার কি হয়েছে বলো তো!

ছেলেটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললো, আমি অন্য বাড়িতে ছিলাম!

—কোন্ অন্য বাড়িতে?

—অন্য রকম বাড়িতে। আমার অন্যরকম বাবা-মা। আমার দু'জন দিদি ছিল। আমার জামাইবাবু যাত্রায় অ্যাক্টো করতেন। তারপর আমার মায়েরদয়া হলো। এই দেখুন না, আমার গায়ে বসন্তের দাগ।

—কই তোমার গায়ে তো কোনো বসন্তের দাগ নেই!

—ছিল! আমার আগের জন্মে ছিল!

—আগের জন্ম? তোমার আগের জন্মের কথা মনে আছে!

—সব মনে আছে!

—আর কি কি মনে আছে বলো তো!

—কেন বলবো? মানি! গিভ মি মানি! গিভ মি মানি!

—টাকা নিয়ে তুমি কি করবে?

—খাবো। লুচি খাবো! অনেক লুচি খাবো!

চিররঞ্জনের ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে গেল। বড়বাবু পকেট থেকে আরও টাকা বার করে চিররঞ্জনকে চোখের ইশারা করলেন। তারপর ছেলেটিকে বললেন, এই নাও, টাকা নিয়ে যাও।

ছেলেটি আসতে চাইছে না, বড়বাবুকে ভয় পাচ্ছে। বড়বাবু মিষ্টি গলায় বললেন, এসো, কোনো ভয় নেই, আর মারবো না।

ছেলেটি টাকার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাকিয়ে এগিয়ে এলো এক পা এক পা করে। বড়বাবু খপ করে তার হাত ধরে ফেললেন। খুব আদর মিশিয়ে বললেন, তুমি আমার বাড়িতে যাবে? তোমাকে লুচি খাওয়াবো।

ছেলেটি কোনো উত্তর দিল না। সে যেন খুব লজ্জা পেয়েছে।

—আগের জন্মে তুমি বুঝি লুচি খেতে ভালোবাসতে?

—হ্যাঁ।
—আর কি ভালোবাসতে?
—নতুন গুড়ের সন্দেশ।
—বাঃ! কলকাতায় খুব ভালো ভালো সন্দেশ পাওয়া যায়। যাবে কলকাতায়?
—যাবো!
—তোমার গায়ে তো জ্বর রয়েছে, দেখছি। তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

—না।
—আগের জন্মে তুমি কার সঙ্গে তবলা বাজাতে!
—জামাইবাবুর সঙ্গে। জামাইবাবুর যাত্রা পার্টিতে।
বড়বাবু ঘাড় ঘুরিয়ে রসময়কে জিজ্ঞেস করলেন, এ কখনো যাত্রা দেখেছে?
—আজ্ঞে হ্যাঁ, দু' তিনবার।
বড়বাবু চিররঞ্জনকে বললেন, দিস কুড বি এ ড্রিম! প্রোলন্‌গ্‌ড ড্রিম!
চিররঞ্জন বললেন, এ জগতের সব কিছু আপনি ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। যতই চেষ্টা করুন।
বড়বাবু ছেলেটিকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার আর কি মনে আছে?
—একটা মটর গাড়ি।
—মটর গাড়ি?
—নীল নীল রঙ। সামনে দুটো বড় বড় চোখের মতন আলো। ভ্যাঁপো ভ্যাঁপো করে আওয়াজ হয়!
রসময় বললেন, স্যার স্যার, এ কথাটা আমিও আগে কখনো ওর মুখে শুনিনি। আমাদের এ গাঁয়ে কোনোদিন মটর গাড়ি ঢোকেনি।
—আপনি একটু চুপ করুন। শোনো খোকা, তুমি সেই গাড়িতে চেপেছিলে?
—সেই গাড়িতে চেপেই তো আমি বিয়ে করতে গেলাম।
চিররঞ্জন হো-হো করে হেসে ফেললেন। ঐটুকু ছেলের মুখে বিয়ের কথা শুনলে হাসি পেতে আর দোষ কি! বড়বাবুও হাসি চেপে রেখেছেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বউটি বেশ সুন্দর ছিল?
ছেলেটির মুখে ঠিক নব-বিবাহিত যুবকের মতন লজ্জা। ঘাড় হেলিয়ে জানালো, হ্যাঁ।
—তারপর তুমি যখন মরে গেলে, সেই কথা তোমার মনে আছে?
—আমার মায়ের দয়া হলো। খুব কষ্ট, চোখ খুলতে পারি না। তারপর কারা যেন নিয়ে গেল আমাকে একটা ভাঙা বাড়িতে। বাড়ি না মন্দির, ঠিক মনে নেই। সেখানে একটা নদী আছে। নদী দিয়ে ভাসতে ভাসতে ভাসতে ভাসতে—
—ভাসতে ভাসতে কোথায় গেলে?
—মেঘের মধ্যে। অনেক মেঘ, তুলো তুলো মেঘ—তারপর আর মনে নেই।
—আচ্ছা শোনো। তোমার কোন্ জীবনটা বেশী ভালো লাগে! এই যে এখানে আছো, এই বাবা-মা, এই বাড়ি—এটা বেশী ভালো লাগে, না আগেরটা?
—আগেরটা!
একথা শুনে বড়বাবু যেন খুবই অবাক হয়ে গেলেন। ব্যগ্রভাবে ফের জিজ্ঞেস

করলেন, আগেরটা? তুমি সেই আগের জীবনে ফিরে যেতে চাও?

—হ্যাঁ।

—কেন? এখানে সব কিছু নতুন, তাও তোমার ভালো লাগে না?

—না!

বড়বাবু চিররঞ্জনের দিকে ফিরে বললেন, আমি নিশ্চিত, এ একটা স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে আছে। স্বপ্নের ফিক্সেশান।

চিররঞ্জন সায় দিতে পারলেন না সে কথায়। তিনি বললেন, আমার কিন্তু সবই বিশ্বাস হচ্ছে। অতীতকালটাই সবার চোখে সুন্দর।

কথাবার্তা আর বেশী দূর এগুলো না। ছেলেটি অবিলম্বে মাটিতে পড়ে গিয়ে ছটফট করে গোঙাতে লাগলো। তার চোখ দুটি স্থির, মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে। তার তড়কা কিংবা মৃগী রোগ আছে ঠিকই। রসময় বললেন, ব্যস্ত হবেন না। এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে। আমি জল নিয়ে আসছি।

—আগেও এরকম হয়েছে?

—প্রায়ই হয়। একটু বাদেই ঠিক হয়ে যায়!

—আপনি কি মানুষ? তাও এর চিকিৎসা করান নি, ছেলেটিকে তিলে তিলে মেরে ফেলছেন?

—এ রোগের কি চিকিৎসা হয়?

পরদিন মালদায় যাওয়া হলো না। ছেলেটির শরীরের অবস্থা দেখে বড়বাবু তাকে নিয়ে যেতে সাহস পেলেন না। তিনি প্রচুর টাকা দিয়ে সতেরো মাইল দূর থেকে একজন ডাক্তারকে আনতে পাঠালেন। ডাক্তার এসে পুরো একদিন থেকেও কিছুই করতে পারলেন না। ডাক্তারটি সহৃদয়, ছেলেটির প্রতি নিজেও কৌতূহলী হয়েছিলেন, তবু তিনি স্বীকার করলেন যে চিকিৎসা করার ক্ষমতা তাঁর নেই। ছেলেটির রোগ বেশ কঠিন, বিশেষত সর্বক্ষণ তার শরীরে টেম্পরেচার থাকা নাকি সত্যিই ভয়ের ব্যাপার। ওকে শহরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করা দরকার।

এদিকে বাড়ির সামনে হাজার হাজার মানুষের ভিড়। বহু রকমের গুজবে কান পাতা যায় না। রোগীর প্রতি কারুর কোনো সহানুভূতি নেই। সবাই তাকে একবার অন্তত চোখের দেখা দেখতে চায়। ছেলেটির অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। এতদিন সে মোটামুটি চলে ফিরে বেড়াতে পারতো, ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে তার অবস্থার আরও অবনতি হলো। শোনা গেল, এর আগে সে কোনোপ্রকার আলোপ্যাথিক ওষুধ খায়নি। প্রথম ওষুধ খেয়েই তার রোগলক্ষণ প্রকট হয়ে উঠলো, নিস্তেজ হয়ে পড়ে রইলো বিছানায়।

বড়বাবু তখন তাকে কলকাতায় নিয়ে আসতে চাইলেন। রসময় তাতে রাজি, কিন্তু রসময়ের স্ত্রীর তাতে ঘোর আপত্তি। তকাতর্কি আর ঝগড়া করে যত সময় কাটতে লাগলো, ততই ছেলেটিকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত বড়বাবু এরকম প্রায় জোর করেই বাবা-মা সমেত ছেলেটিকে নিয়ে এলেন কলতাতায়।

সুপতিকে আমি দেখেছিলাম। আমাদের বাড়িতে এসে সে বেঁচেছিল মাত্র দু' দিন। বড়বাবু তার চিকিৎসার সবরকম চেষ্টা করেছিলেন। কল দিয়েছিলেন বিধান রায় মশাইকে। তখন ডঃ অ্যাটকিনসন সাহেবেরও খুব নামডাক, বিধানবাবুর পরামর্শে

তাঁকেও আনা হয়েছিল—আমাদের বাড়ি তখন সর্বক্ষণ সরগরম। তবুও বাঁচানো গেল না তাকে! সুপতি মারা যাবার পর কলকাতার সব খবরের কাগজে তার ছবি ও জীবনী ছাপা হয়েছিল। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সদস্যরা ব্রসময় চক্রবর্তীকে আরও একমাস কলকাতায় রেখে নানারকম প্রশ্নাদি করেছিলেন। সাহেবরাও খুব উৎসাহ দেখিয়েছিলেন ঘটনাটি সম্পর্কে।

আমার দেখা সেই প্রথম মৃত্যু। আমারই বয়েসী একটি ছেলেকে আমি প্রায় চোখের সামনে মরতে দেখলাম। একজন অজানা, অচেনা রহস্যময় প্রকৃতির বালক হঠাৎ আমাদের বাড়িতে এসে আমাকে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা দিয়ে গেল। আমার মা বলতেন, আমাদের বাড়িতে জল পাওনা ছিল সুপতির, তাই মরার জন্য তাকে আমাদের বাড়িতে আসতে হয়েছিল। আমাদের বাড়িতে আসার পর থেকে সুপতির একবারও জ্ঞান ফেরেনি, আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। সর্বক্ষণ সে ভুল বকতো। তার বাপ মায়ের সম্পূর্ণ অচেনা লোকজনের নাম ধরে ডেকে তাদের সঙ্গে কথা বলতো। একটা ভাঙা মন্দিরের কথাও ঘুরে ফিরে আসতো তার কথায়। সুপতি মারা গিয়েছিল সন্ধেবেলা—আমার স্পষ্ট মনে আএে সেই সময়ের কথা। তাকে রাখা হয়েছিল সূর্যদার ঘরে। আমাদের সে-ঘরে ঢুকতে দেওয়া হতো না—মৃত্যুর দৃশ্যও যেন শুধু বড়দের ব্যাপার—তাই বাবা আমাকে ঐ ঘরের কাছাকাছি দেখলেই বলতেন, বাদল এখানে না, যাও, এখান থেকে যাও! আমি তবু যেতাম না, অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতাম মৃত্যুকে দেখার। সেই সন্ধেবেলা আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম ঘরের বাইরের দিকে, শিয়রের কাছের জানালার শিকের কাছে। মৃত্যুর আগে সে ফিক ফিক করে হাসছিল আর বলছিল, একটা নদী...মস্ত বড় নদী...ভাসতে ভাসতে ভাসতে ভাসতে...

সেই অজানা অচেনা বালকটির জন্য আমি কেঁদেছিলাম।

॥ ১৫ ॥

ওদিকে সূর্যদা আর এক মৃত্যু দেখছিল।

সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষা দেবার পর অত্যন্ত বদলে গিয়েছিল সূর্যদা। খুব বাল্যকাল থেকেই সে গম্ভীর প্রকৃতির, কিন্তু এই সময়কার গাম্ভীর্য সম্পূর্ণ অন্য-রকম। তার মনের মধ্যে সব সময় যেন একটা অস্থিরতা রয়েছে, মুখ চোখ দেখলেই সেটা বোঝা যায়, অথচ কথায় বার্তায় তার কোনো প্রকাশ নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ তাকে তার টেবিলে বসে থাকতে দেখেছি।

আমি সব সময় সূর্যদার কাছে কাছে ঘুরঘুর করতাম, কিন্তু সূর্যদা সেই সময় আমাকেও বেশী সহ্য করতে পারতো না। অনেক সময়েই কথার উত্তর পেতাম না। এক কথা বারবার জিজ্ঞেস করলে বিরক্ত হয়ে বলতো, এখন যা তো এখান থেকে! তা সত্ত্বেও আমি না গেলে ধমক উঠতো, তোকে যেতে বলছি না! গেট লস্ট!

আমার অভিমান হতো, তবু ফিরে আসতাম একটু বাদেই। সূর্যদার প্রতি আমার ভালোবাসায় কোনো খাদ ছিল না।

ঐ সময়েই সূর্যদার দাড়ি গোঁফ উঠতে শুরু করে। আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম সূর্যদার দাড়ির রং সম্পূর্ণ কালো নয়, খানিকটা লালচে রঙের। এবং তখন বুঝতে পারি, সূর্যদার মাথার চুলও ঠিক কুচকুচে কালো বলা যায় না—এটা আগে

টের পাওয়া যায়নি, কিন্তু তার ফর্সা গালের ওপর দাড়ি দেখে আরও স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। আগেই বলেছি, সূর্যদার চোখের মণি দুটোও খয়েরি ধরণের। যে কেউ প্রথম দেখে সাহেবের বাচ্চা বলে ভুল করতো। অদ্ভুত সুন্দর দেখাতো সূর্যদাকে, শুধু ঐ কিশোর বয়েসে হাসিখুশী মুখের বদলে তার গাম্ভীর্যটুকুই ছিল বেমানান।

আমার বড়দি শ্রীলেখা তো সূর্যদার প্রেমেই পড়ে গিয়েছিল। আমার আপন দিদি সান্ত্বনারও ঐ রকম কিছু হয়েছিল কিনা ঠিক জানি না, তবে আমার দুই দিদির মধ্যে ঐ সময় থেকে খানিকটা রেষারেষি শুরু হয়।

মামাতো-পিসতুতো ভাই বোনের মধ্যে প্রেম জন্মাবে তখন এমন কিছু অলীক ব্যাপার ছিল না, বন্ধ-সমাজের মধ্যেই এর প্রাদুর্ভাব ঘটে। কোনো কোনো বন্ধ-সমাজে এই সব সম্পর্কের মধ্যে বিয়ে-থাও হয়।

বাঙালী মেয়েরা তখন কিছু কিছু পড়াশুনো শিখতে শুরু করেছে বটে কিন্তু পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা প্রায় নিষিদ্ধ। বিয়ের আগে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় ছাড়া আর কারুর সঙ্গে কথা বলারও সুযোগ নেই। কলকাতার যে-দুটি একটি কলেজে কো-এডুকেশন চালু হয়েছে, সেখানেও ছাত্রীরা ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে ক্লাসে যায় না—ঘণ্টা পড়লেও দল বেঁধে ক্লাস রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে প্রফেসারের সঙ্গে ঢোকে, প্রফেসারের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। অথচ মধ্য যুগের অন্ধকার পেরিয়ে এসে মেয়েরা আবার শিক্ষার সুযোগ পাবার ফলে এবং ইংরেজি রোমান্টিক সাহিত্যের অনুকরণে বাংলা গল্প-উপন্যাস রচিত হওয়ায় বিবাহ সম্পর্ক বিরহিত প্রণয় বেশ প্রসিদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং মধুর অভাবে গুড়ের মতন, চঞ্চল স্বভাবের মেয়েরা মামাতো, পিসতুতো দাদা কিংবা জামাইবাবুর ভাইয়ের সঙ্গে খানিকটা হৃদয় সম্পর্ক পাতিয়ে প্রণয় লিপ্সা মেটায়। আয়েষা জগৎ সিংহকে কখনো দাদা বলেনি, কিন্তু প্রেমিকদের প্রকাশ্যে ওমুকদা তমুকদা বলে ডাকার রেওয়াজ এই শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই চালু হয়।

সেই সময়কার সাধারণ গল্প উপন্যাসে প্রেমিকরা অধিকাংশই ব্যর্থ প্রেমিক এবং তারা টিউবারকুলোসিসে ভোগে। প্রেমিকাদের অবধারিতভাবে পরপুরুষের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়। কদাচিৎ বাড়ির ড্রাইভার কিংবা লাজুক প্রাইভেট টিউটরের সঙ্গে প্রেম হলেও শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, তারা আসলে ছদ্মবেশী রাজপুত্র। অর্থাৎ হয় ডবল এম এ অথবা জমিদার-তনয় অভিমান করে ঐরূপ পেশা নিয়েছিল। মর্ডান মেয়ে বলতে বোঝায় রায়বাহাদুর দুহিতা কিংবা স্কুল শিক্ষয়িত্রী। তেজস্বিনী নায়িকা তার লম্বা বেণী চাবুকের মতন ধরে শপাং করে মারে ভিলেনের মুখে। নায়ক নায়িকার হঠাৎ দেখা হয়ে যায় সাঁওতাল পরগণায় কিংবা হিমালয়ে—সভ্যতার কড়া দৃষ্টির বাইরে।

আমার বড়দি ও সূর্যদার ব্যাপারটা অবশ্য অন্যরকম ছিল। সূর্যদা আমার বড়দির সঙ্গে এমন ব্যবহার করতো যেন বড়দি তার একটা নিজস্ব পোষা প্রাণী। সূর্যদা যখন তখন যে-কোনো হুকুম করতো বড়দিকে। অথচ সূর্যদা অদ্ভুত রকমের স্বাবলম্বী, চিরকাল নিজের জামা-কাপড় নিজে কেচেছে, নিজের এঁটো থালাবাসন অন্যকে তুলতে দেয়নি। কিন্তু বড়দির ব্যাপারটা ছিল আলাদা। নরম করে কিংবা মধুর করে কোনো কথা বলার স্বভাব ছিল না সূর্যদার। হঠাৎ গাম্ভীর্য ভেঙে ডাকতো, শ্রীলেখা, শুনে যাও! এইখানে এসো, আরো কাছে এসো! বড়দি কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই সূর্যদা খপ করে চেপে ধরতো বড়দির হাত, তারপর হিড়হিড় করে টেনে

এনে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে ধরতো। আমাদের সামনেই।

আমি জানি, এইরকম শুরু হবার প্রথম দিকে বড়দি খুব ভয় পেত সূর্যদাকে। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতো। একদিন সূর্যদার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদেছে পর্যন্ত। সূর্যদা ভুরু কুঁচকে বিরক্তভাবে তাকিয়ে থেকেছে বড়দির দিকে। তার কোনো কাজে বাধা পড়া তার একটুও পছন্দ নয়। এমনও এক একদিন হয়েছে, সূর্যদা হয়তো টেবিলে বসে খাতায় অঙ্ক কষছে খুব মনোযোগ দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আমি মেঝেতে বসে দুলে দুলে পড়া মুখস্ত করছি, হঠাৎ সূর্যদা মুখ তুলে আমাকে বললো, এই বাদল, একবার শ্রীলেখাকে ডাক তো! বলবি এক্ষুনি আসতে। আবার অংক কষায় মনোযোগ। আমি বড়দিকে ডেকে আনলাম। সূর্যদা খাতা-পেন্সিল রেখে উঠে দাঁড়িয়ে হাম হাম করে কয়েকটা চুমো খেল বড়দিকে। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে ফের ফিরে গেল পড়ার টেবিলে।

এই ধরনের ব্যবহার সত্ত্বেও বড়দি সম্পূর্ণ পোষ মেনে গেল সূর্যদার! নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দিল ওর কাছে। তার মানে অবশ্য এই নয় বড়দি সূর্যদার সঙ্গে ঘোরতর কোনোরকম শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিল। সেদিকটা তখনও সূর্যদার মাথায় আসে নি। সূর্যদা সেরকম কিছু হুকুম করলে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা বড়দির ছিল কিনা আমি জানি না। বড়দির প্রেম দেখা দিয়েছিল প্রবল স্নেহের রূপ নিয়ে। বড়দি সূর্যদার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকতো যেন পুরুষটির সকল রকম ভালো-মন্দের দায়িত্ব তারই। আমি দেখেছি, বড়দি সূর্যদার মাথার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। সূর্যদার মাথায় একটু কোঁকড়া ধরনের খুব ঘন চুল। সূর্যদা বাথরুম থেকে স্নান সেরে যে-ই নিজের ঘরে ঢুকেছে, অমনি কোথা থেকে বড়দি এসে হাজির, হাতে চিরুনি। বড়দি ঠিক লক্ষ্য রেখেছে। সূর্যদা আয়নার সামনে যেতেই বড়দি বললো, দাঁড়াও। এক হাতে সূর্যদার গাল চেপে ধরে অন্য হাতে কি যত্ন করে বড়দি আঁচড়ে দিচ্ছে চুল, শিশুর প্রতি মায়ের স্নেহের মতন। আবার কখনো কখনো সূর্যদা হয়তো বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে, বড়দি দরজার আড়াল থেকে ডেকে বললো, এই শোনো, এই নাও। এটা নিয়ে যাও! সুগন্ধমাখা একটা রুমাল। সূর্যদা অবশ্য এর উত্তরে এক টুকরো হাসিও কখনো উপহার দেয়নি। তবু বড়দি নিঃস্বার্থ ভাবে স্নেহ মমতা মাখানো ভালোবাসা দিয়ে গেছে সূর্যদাকে।

আমাদের বাড়ির লোক তো অন্ধ কিংবা উদাসীন নয়, এসব তাদের চোখে পড়বেই। বিশেষতঃ জ্যাঠামশাই, জ্যাঠাইমা এবং আমার মা—এই তিনজনের নৈতিক শুচিবাই কিছু কম ছিল না। তবুও ধরা পড়তে একটু দেরি হয়েছিল। তাছাড়া বড়দির বিয়ের জন্য তখন পাত্র দেখা চলছে পুরোদমে।

পরীক্ষার পরের ছুটিতে সূর্যদা আমার সঙ্গে রেণুদের বাড়িতে বিশেষ যেতে চাইতো না। একা একাই বেরিয়ে পড়তো মাঝে মাঝে। বাড়ির কারুকে কোনো কিছু বলে যাওয়া ধাতে ছিল না তার। বড়বাবু একদিন খেয়াল করলেন, সন্ধের পর অন্য ছেলেমেয়েরা সবাই বাড়িতে থাকলেও সূর্যদা প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। ছেলের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা খুবই কম হতো। রাত্তিরবেলা খেতে বসে বড়বাবু হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, সূয্যি এখনো ফেরেনি?

কেউ কিছু উত্তর দেবার আগেই বড়দি টপ করে বললো, এই তো সিংহীদের বাড়ির মাঠে বোধহয় ব্যাডমিণ্টন খেলছে—বাদল, একটু যা না, ডেকে নিয়ে আয় না!

আমি জানি, সূর্যদা সেখানে নেই, তাই গা করলুম না। সিংহীদের বাড়িতে

রাত্রে আলো জেবলে ব্যাডমিন্টন চালু হয়েছিল, এখন তা বন্ধ। এখন রোজ সন্ধের পর খুব হাওয়া দেয়—এই হাওয়ায় কেউ ব্যাডমিন্টন খেলতে পারে?
—জ্যাঠামশাই বললেন, প্রায়ই তো তাকে দেখি না, কোথায় থাকে সে?

বড়বাবু আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না, চুপচাপ খাওয়া শেষ করলেন। তারপর চটি ফট ফট করে নেমে গেলেন একতলার বসবার ঘরে।

বড়বাবুর নিজস্ব ঘরটি তিনতলায়। সকালে কিছুক্ষণ মাত্র বসবার ঘরে থাকেন, বাকি সময়টা তিনতলায় নিজের ঘরেই কাটান। তিনতলায় আর কোনো ঘর নেই বলে বাড়িতে তাঁর উপস্থিতি সব সময় টের পাওয়াও যায় না। আজ তিনি একতলায় নেমে এলেন নিশ্চিত সূর্যদার সঙ্গে কথা বলার জন্য।

একটু বাদে নেমে এলেন জ্যাঠামশাই, হাতে কিছু কাগজপত্র। তিনি বড়বাবুর সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু আলোচনা করবেন। চাকর নিয়ে এলো গড়গড়া। জ্যাঠামশাই গড়গড়ার নল ধরে টান দিয়ে বললেন, অমর, এবার ভাবচি, একটা কার্ডবোর্ড কম্পানির এজেন্সি নেবো। আস্তে আস্তে এসব জিনিসের চাহিদা বাড়ছে—

বড়বাবু অন্যমনস্কভাবে বললেন—বেশ তো, নাও না!

—আমি তো একা আর সবদিক পেরে উঠছি না। তুমি নিজে কিছু দেখো টেখো।

—কেন, চিরুকে লাগিয়ে দাও।

—ওর দ্বারা বিশেষ কিছু হবে না। দিনরাত কি যে এত ভাবে। ঢাকুরিয়ার দিকে খানিকটা জমি দেখেছি, বুঝলে, একটা বড় মতন গোডাউন না তৈরী করলে তো আর চলছে না।

—ঢাকুরিয়া? ও তো জলা জায়গা। ভিত গাঁথার খরচ পোষাবে না। ইটের হাজার এখন কত করে যাচ্ছে?

—গত মাসেও পৌনে আট টাকা ছিল, এ মাসে বোধহয় আট।

—আট টাকা এ যে সাংঘাতিক কথা! গোয়ালিয়রে কিনেছিলাম সাড়ে তিন টাকা হাজার।

—জিনিস পত্তরের দাম কি রকম বাড়ছে, তুমি কিছু খবর রাখো? পোনা মাছের সের ন' আনা! গত রোববারেও কিনেছি সাড়ে সাত আনায়, ব্যাটারা এক লাফে ন' আনা করে দিল! দিনকাল সুবিধের না হে! চালের মণও দেখতে দেখতে চার টাকা হয়ে গেল। যুদ্ধ বোধ হয় এবার একটা লাগবে। শেয়ার বাজারে দাপাদাপি শুরু হয়েছে!

বড়বাবু সিগারেট নিবিয়ে বললেন, কোথায় আর যুদ্ধু লাগবে। আর লাগবে না বোধহয়! সবাই মিলে হিটলারকে তোয়াজ করছে। চেমবারলেন যেভাবে ঐ দেশ-টাকে... কি যেন দেশের নামটা? মনেও থাকে না ছাই।

—কোন্ দেশটা?

ঐ যে, যেটার খানিকটা অংশ আগে বোহেমিয়া ছিল, হ্যাঁ, চেকোশ্লোভাকিয়া, সে দেশটাকে তো সন্দেশের বাক্সর মতন হিটলারের হাতে তুলে দিল।

—আমাদের কাগজের দামও বাড়ছে। এই সময় কিছু স্টক ধরে রাখা যায় যদি।

ব্যবসায়ের আলোচনা আর বেশী দূর এগুলো না। এই সময় সূর্য বাড়ি ফিরলো। বাইরে কখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে, সূর্যর সর্বাঙ্গ বৃষ্টিতে ভেজা। ভেতরে যেতে হলে বসবার ঘরের মধ্য দিয়েই যেতে হয়, সূর্য দু'জন গুরুজনকে সেখানে উপবিষ্ট দেখেও কোনো কথা বললো না, জামা থেকে নিঙড়ে জল ফেলতে লাগলো দরজার

বাইরে। মাথার চুল জবজবে।

প্রিয়রঞ্জন বললেন, একি, একেবারে ভিজে গেলে যে! ছাতা নিয়ে বেরোওনি কেন?

এটা নিছক কথার কথা। সূর্য বেরিয়ে ছিল দুপুরে, তখন বৃষ্টির নামগন্ধও নেই, তা ছাড়া ঐ বয়েসের ছেলে সচরাচর ছাতা নিয়ে বেরোয় না। সূর্য উত্তর দিল না।

বড়বাবু খুব স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গিয়েছিলি রে?

সূর্য সংক্ষিপ্তভাবে জানালো, বেলেঘাটায়!

—সে তো অনেক দূর! এত রাত পর্যন্ত ওখানেই ছিলি?

—হ্যাঁ।

—কে আছে ওখানে?

সূর্য একটু ইতস্তত করে বললো, আমার এক বন্ধু।

বড়বাবু বললেন, ও। কি, তোর স্কুলের বন্ধু?

—হ্যাঁ।

—বন্ধুর বাবা কি করেন,

—ওর বাবা নেই।

—গার্জিয়ান কে?

—ওর কাকা।

—কি করেন তিনি?

—আমি ঠিক জানি না।

—কাল আমি তোর সঙ্গে বেলেঘাটায় তোর বন্ধুর বাড়িতে যাবো। ওর বাড়ির লোকজনের সঙ্গে আলাপ করে আসবো।

সূর্য কোনো কথা না বলে তার বাবার দিকে তাকিয়ে রইলো। যে কেউ সূর্যকে দেখলেই বুঝতে পারবে, সে মিথ্যে কথা বলছে। তার প্রশান্ত সুন্দর মুখে প্রতিটি অভিব্যক্তির ছায়া পড়ে। মিথ্যে কথা বলার অভ্যেস তার একেবারে নেই, কেন সে এরকম অসম্ভব চেষ্টা চালাচ্ছে কে জানে। তার বাবা তাকে জব্দ করে দিয়েছে।

তৎক্ষণাৎ উত্তর না দিয়ে সূর্য দু' এক মুহূর্ত ভাবলো, তারপর বললো, ওরা সবাই কাল বেড়াতে যাচ্ছে বাইরে—

—কোথায়? কাছকাছি?

—পুরীতে।

—ও তাহলে কাল থেকে আর ফিরতে দেরি করিস না। এখন সাড়ে ন'টা বাজে, এত রাত পর্যন্ত বাড়ির বাইরে থাকা ভালো নয়। কাল থেকে সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরিস। মাথাটা ভালো করে মুছে নে!

পরক্ষণেই বড়বাবু প্রিয়রঞ্জনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, হ্যাঁ, তুমি গোডাউন তৈরীর কথা যা বলছিলে। অর্থাৎ সূর্যর সঙ্গে তাঁর কথা শেষ হয়ে গেছে। সূর্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, ভিজে পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে। নিজের ঘরে গিয়ে দেখলো শ্রীলেখা তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পরের দিন সূর্য ফিরলো আরও অনেক দেরি করে। সমস্ত পাড়া তখন নিঝুম, ঘোড়ার গাড়ির শব্দও শোনা যায় না, কুলপি-মালাই বরফ-ওয়ালাদের ডাকও থেমে গেছে।

বড়বাবু সেদিন খেতে বসে সূর্যর কথা একবারও জিজ্ঞেস করেন নি। কিন্তু

বারবার ঘড়ি দেখছেন। তিনি সূর্যর জন্য সেদিন আর নিচে নামলেন না, ওপরে উঠে যাবার সময় বললেন, সূর্য ফিরলে যেন তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে বলা হয়।

সূর্য সেদিন দরজা ধাক্কাতেই তরতর করে নেমে গিয়েছিল শ্রীলেখা। দরজা খুলে দারুন আশঙ্কার সঙ্গে ফিসফিস করে বললে, এই, তুমি আজও দেরি করে ফিরলে? রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলে নাকি?

—না।

—বড়বাবু তোমার ওপর ভীষণ রেগে গেছেন!

—হুঁ।

শ্রীলেখা সূর্যর হাত জড়িয়ে ধরে কাতর ভাবে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোথায় গিয়েছিলে? কেন এত দেরি করলে? বলো, আমাকে বলবে না?

সূর্য নির্লিপ্তভাবে শুধু প্রশ্ন করলো, আমার খাবার কি ঢাকা দেওয়া আছে?

—বড়বাবু তোমাকে একবার দেখা করতে বলেছেন। খেয়ে নিয়ে তারপর যাবে? তাই যে-ও বরং।

—না, আগেই দেখা করে আসি।

দোতলার রেলিং থেকে দেখা যায়, বড়বাবুর ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে। কাচের জানালায় তাঁর বসে থাকা চেহারার সিলুয়েট। হাতে বই। সূর্য সে ঘরে প্রায় পনেরো মিনিট ছিল। সেদিন দুজনে কি কথা হয়েছিল তা জানি না। কিন্তু কোনো বকা-বকি ধমকানির আওয়াজ শোনা যায় নি।

নিচে নেমে এসে সূর্য বললো, আমি আজ খাবো না। আমার খিদে নেই।

পরদিন সকালে সূর্যদা অতি সামান্য কারণে আমার কান মুলে দিয়েছিল। আমি শুধু সূর্যদার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সূর্যদা, তোমার ঘড়িটা কোথায়? সূর্যদার সোনার হাতঘড়ি ছিল, ভারী সুন্দর দেখতে। কোনো কোনো-দিন সূর্যদা সেটা আমার হাতে জোর করে পরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তখন সেই সামান্য প্রশ্নেই সূর্যদা রেগে গিয়ে আমার কান মুলে দিয়ে বললো, তোর অত কথায় দরকার কি রে?

সূর্যদা যে ঘড়িটা বিক্রি করে দিয়েছে, সে কথা তখন আমি জানাবো কি করে? সূর্যদা কোনোদিন আমার গায়ে হাত তোলেনি, কোনোদিন একটাও বিসদৃশ ব্যবহার করেনি—সেদিন আমার এমন অভিমান হলো যে আমি সূর্যদার সঙ্গে সারাদিন আর কথাই বললাম না।

এর কয়েকদিন পরে এক রাত্রে সূর্যদা বাড়িই ফিরলো না। বাবা পুলিসে এবং হাসপাতালে খোঁজ নেবার কথা বলেছিলেন, বড়বাবু বারণ করলেন।

সূর্যদা ফিরলো পরদিন সকাল ন'টায়। নিদ্রাহীন চোখ, পোশাক বিস্রস্ত, বিষণ্ণ মুখ। বাইরের ঘরে তখন অনেককেই উপস্থিত। সূর্যদাকে দেখেই সবাই চুপ করে রইলো। বড়বাবু মোটামুটি শান্তভাবেই জিজ্ঞেস করলেন, রাত্রে ফিরিস নি যে?

—ফিরতে পারিনি। আটকে গিয়েছিলাম।

—কোথায় ছিলি?

—এক বন্ধুর বাড়িতে।

—সেই বেলেঘাটায়? তাদের যে বাইরে বেড়াতে যাবার কথা ছিল।

—যেতে পারে নি। আমার বন্ধুর খুব অসুখ।

বড়বাবু চেয়ার ছেড়ে যেন লাফিয়ে উঠলেন। সিংহের মতন হুংকার করে উঠলেন,

বললেন, চল, এক্ষুণি আবার চল। আমিও যাবো বেলেঘাটায়! আমি তোর বন্ধুকে দেখবো।

বড়বাবুর ওরকম ক্রুদ্ধ মূর্তি কেউ কখনো দেখেনি। তাঁর চিৎকারে সবাই হকচকিয়ে গিয়েছিল। সূর্যদা আস্তে আস্তে বললো, সেখানে আপনার যাবার অসুবিধে আছে।

বড়বাবু নিজেকে সামলাতে পারলেন না। ঠাস ঠাস করে চড় মারলেন সূর্যদার দু'গালে। জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি করে বল কোথায় গিয়েছিলি?

সূর্যদা একটুও নড়লো না, মুখের একটি রেখারও পরিবর্তন হলো না, ফর্সা গাল দুটি শুধু লাল টকটকে হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললো, বলার অসুবিধে আছে।

বড়বাবু আবার প্রচন্ড জোর মেরে বললেন, অসুবিধে? কিসের অসুবিধে? বল আগে?

সূর্যদা পুনরাবৃত্তি করলো—আমার অসুবিধে আছে।

বড়বাবু কতগুলো চড় মেরেছিলেন তার ঠিক নেই। সূর্যদা আর মুখ খুললো না। দোকানে বেরুবার আগে জ্যাঠামশাই এইসব কান্ড দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। কিছুক্ষণ সূর্যদার দিকে তাকিয়ে থেকে অস্ফুটভাবে বললেন, আশ্চর্য! আশ্চর্য! অবিকল বিশ্বরঞ্জনের মতন!

বাবার দিকে ফিরে জ্যাঠামশাই বললেন, চিনু তোর মনে পড়ে? রঞ্জুও ঠিক এই রকম ছিল! রঞ্জুর সঙ্গে ওর চেহারারও পর্যন্ত একটু একটু মিল আছে না? একই বংশের রক্ত তো!

বাবা কোনো উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেলেন। বড়বাবু তখন সূর্যদার চুলের মুঠি ধরে দেয়ালে মাথা ঠুকে দিতে যাচ্ছিলেন, বাবা মাঝখানে বাধা না দিলে রক্তারক্তি ব্যাপার হয়ে যেত।

সারাদিন আমাদের বাড়িটা থমথমে হয়ে রইলো। সূর্যদা স্নান করলো না, খেল না, ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে রইলো। অন্যদের কথা শোনা তো দূরে থাক, বড়দি কত করে অনুনয় বিনয় করলো, সূর্যদা একবারও দরজা খুললো না, কারুর সঙ্গে একটিও কথাও বললো না। ভাগ্যিস জানলাটা খোলা ছিল, সেই জানলা দিয়ে বার-বার উঁকি মেরে আমরা দেখতে লাগলাম সূর্যদাকে।

দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর বাবা গেলেন তিনতলায় বড়বাবুর ঘরে। বড়বাবু অন্যমনস্কভাবে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন। বাবাকে দেখে প্রশ্ন করলেন, সূর্য্যি খেয়েছে?

বাবা বললেন, না।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। বাবা খুব ভালো করেই জানেন, বড়বাবু নিজে কখনো সূর্যদাকে খেতে অনুরোধ করবেন না। বড়বাবু কাছ থেকে সে রকম ব্যবহার আশাই করা যায় না।

বাবা একটু বাদে জিজ্ঞেস করলেন, কি, খুব কষ্ট পাচ্ছেন তো?

বড়বাবু চমকে উঠে বললেন, আমি? তুমি আমার কথা বলছো?

বাবা, একটু হেসে বললেন, হ্যাঁ আপনার কথাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

বড়বাবু কাতরভাবে হাসলেন। তারপর বললেন, তুমি ঠিকই ধরেছো। কিন্তু কেন এমন হয় বলো তো? আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। বাবার ইচ্ছে হচ্ছে, সূর্য্যিকে

বুকে জড়িয়ে ধরি। ওর কাছে ক্ষমা চাই। অথচ দেখো, ওকে যে শাস্তি দিয়েছি, অন্যায় তো কিছু করিনি। ওকে আমি সুযোগ দিয়েছিলাম। কথা শুনলো না। অবাধ্য সন্তানকে মারবো না? শাস্তি দেবো না? তবু কেন কষ্ট হয়?

বাবা বললেন, এটাই তো মহামায়া! আপনারাই আত্মার একটা অংশ তো। কষ্ট তো হবেই!

এত মারধোর বাধা-নিষেধও সূর্যদাকে আটকাতে পারে নি। সূর্যদা তবু আবার গেছে বেলেঘাটায়। সেখানে কাঠগোলার পিছনে একটা টিনের দোতলা বাড়িতে হর-কুমার মুমূর্ষু হয়ে পড়ে আছে।

হাজারীবাগের জেলখানা ভেঙে বন্দীদের উদ্ধার করার পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। বিপ্লবীদের অধিকাংশ পরিকল্পনার মতন এটিও গুপ্তচরদের উপ-দ্রবে মাঝপথে ফেঁসে যায়। আলিমুদ্দিন মাস্টার ও আর একজন ধরা পড়ে। হর-কুমার পুলিসের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়েও পালিয়ে আসতে সমর্থ হন।

কিন্তু হরকুমার আগে থেকেই যক্ষ্মায় ভুগছিলেন। কোনোদিন চিকিৎসা করান নি, এই মারখাওয়া আর সহ্য হলো না। তাঁর নামে তখনও হুলিয়া রয়েছে। কলকাতার বাড়িতে আত্মগোপন করে তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছেন।

হরকুমারের প্রতি সূর্যদার ভালোবাসা ছিল যেন অনেকটা প্রাণীসুলভ, যারা কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না। যে-কোনো কারণেই হোক, হরকুমারের প্রতি সূর্যদার অদ্ভুত একটা আকর্ষণ জন্মে গিয়েছিল। সূর্যদার চরিত্রে স্নেহ-দয়া-মায়ার প্রকাশ কখনো তেমন দেখা যায় নি। কিন্তু হরকুমারের সেবা সে করেছিল প্রাণ দিয়ে। নিজের জিনিসপত্র বিক্রি করে টাকার জোগাড় করেছে। নিজের আস্তানার কথা গোপন করার প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন হরকুমার। সূর্যদার পক্ষে সেইটাই খুব অসুবিধাজনক হয়ে গিয়েছিল। সব মানুষ তো আর অভিনয় করতে পারে না কিংবা মিথ্যে কথা বলতে পারে না!

হরকুমার শেষ পর্যন্ত মরলেন সূর্যদার কোলেই মাথা রেখে। মৃত্যুর কিছু আগে হরকুমারকে সূর্যদা ফিসফিস করে বললোঃ হরদা, তোমার পিস্তলটা আমাকে দেবে বলেছিলে?

হরকুমার বালিসের তলা থেকে পিস্তলটা বার করলেন, শেষ কয়েকটি নিশ্বাস বুকে এক সঙ্গে জমা করে অতি কষ্টে বললেন, তোর সঙ্গে আমার আরও কথা আছে। তুই আমার কথা রাখবি তো?

॥ ১৬ ॥

মন্দাকিনী খবর পাঠিয়েছেন, বড়বাবু সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন ভবানীপুরে, ভবানী-পুর তখন ঠিক কলকাতা নয়, হাইকোর্টের অরিজিনাল সাইডের বাইরে, রীতিমতন মফঃস্বল।

মন্দাকিনীর এখন উঠে বসার ক্ষমতা নেই, কানে একদম শুনতে পায় না। ঘরে কেউ ঢুকলেই ম্যাগনিফাইং গ্লাস চোখের কাছে এনে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখেন। মৃত্যু খুবই কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, তবু এখনও মন্দাকিনীর চেহারায় এক ধরনের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য আছে। মাথায় চুল ধপধপে সাদা, মুখখানা মোমের পুতুলের মতন, ঠোঁটের পান কিংবা

রক্তের লাল লাল ছোপ এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর এই, চোখ দুটো দেখলেই মনে হয় সব সময় সেখানে যেন কিছু একটা কৌতুক খেলা করছে। ময়লা পোশাক কিংবা কম দামী পোশাক তিনি কখনো ব্যবহার করা পছন্দ করেন না, এখনও তিনি পরে আছেন ঝকঝকে গরদের থান, গলায় হীরে-বসানো সাতনরী হার। বিছানায় আরও অনেক গয়না ছড়ানো—মনে হয় মন্দাকিনীর হুকুমে তাঁর গয়নার বাক্সগুলো কেউ খুলে বিছানায় উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে।

সব গেছে, কিন্তু গলার আওয়াজটা এখনো নষ্ট হয়নি, অনেকটা শিশুর মতন। হাতের ইশারায় বড়বাবুকে কাছে ডাকলেন। ঘর ভর্তি লোকজন, সবাই নিঃশব্দ, সুরেশ্বরের স্ত্রী শান্তিলতা পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মন্দাকিনীর।

বড়বাবু কাছে এগিয়ে গেলেন, মন্দাকিনী পাশে জায়গা দেখিয়ে বললেন, বোস।

—বড়মা, তোমার কষ্ট হচ্ছে?

নিষ্ফল এই প্রশ্ন। মন্দাকিনী কিছুই শুনতে পারেন না। বড়বাবুর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, অমর, তুই নিমোখারাম, ইতর, তুই ছোটলোক!

বড়বাবু একটু হেসে বললেন, বড়মা, আমি কি দোষ করেছি?

—তোর মুখে আমি মুড়ো ঝাঁটা মারবো।

—মারো!

—তোর গায়ে জল বিছুটি দিয়ে বাঁদর নাচালে তবে ঠিক হয়!

—কি দোষ করলুম?

—তুই এইখানে চুপটি করে বসে থাকবি, যতদিন না আমি মরি। যদি এক পা কোথাও যাস তো আমার মাথার দিব্যি রইলো!

—থাকবো। কোথাও যাবো না। কিন্তু তুমি, এত তাড়াতাড়ি মরবে কেন?

—আমার রত্নেশ্বর ঠিক তোর বয়েসী ছিল। আজ সে বেঁচে থাকলে সে তার মাকে ছেড়ে কোথাও থাকতে পারতো? সে মরে গেল, আর তুই বেঁচে রইলি কেন? হারামজাদা, তার বদলে তুই মরতে পারলি না?

—বড়মা, এত কথা বলা তোমার পক্ষে উচিত নয় এখন।

—তোর মা-টা ডাইনি ছিল। তোকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সরে পড়লো। পরের ছেলে মানুষ করতে গিয়ে আমি নিজেরটাকে বাঁচাতে পারলুম না। মানুষের কপালে এও থাকে! কি পাপ যে করেছিলাম!

—আমাকে বাঁচিয়েছিলে বলে এখন তোমার অনুতাপ হচ্ছে?

—তোকে আমার বুকের দুধ খাইয়েছি। নিজের হাতে তোর গু-মুত পরিষ্কার করেছি, নাইয়েছি, ঘুম পাড়িয়েছি—নিজেরটাকে যত্ন করতে পারিনি—তাই আমার নিজের ছেলেটা অকালে মারা গেল! কি লাভ হলো তোকে বাঁচিয়ে?

বড়বাবুর মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে মন্দাকিনী এরকম কথা বলবেন, তিনি প্রত্যাশাই করতে পারেন নি। তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আফসোস করছেন মন্দাকিনী—জীবনের একষট্টি বছর পার হবার পর এই কথা শুনতে হলো। এখন তো আর কিছুই ফেরত দেওয়া যায় না! আস্তে আস্তে বললেন—বড়মা, আমিও তো তোমার ছেলের মতন।

মন্দাকিনী কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না বলে তাঁর সমস্ত কথাই একতরফা। অনেক সময় বড়বাবুর কথার মাঝখানেই তিনি কথা বলছেন। তীব্রভাবে বললেন, কুলাঙ্গার! কুলাঙ্গার! বিয়ে করে একবার বউকে নিয়ে পেন্নাম করতেও আসেনি। সেই ছেলেকে

আমি বাঁচিয়ে রেখেছি!

সুরেশ্বর কাছে এগিয়ে মন্দাকিনীর দিকে ঝুঁকে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করার ইঙ্গিত করলেন। কথা বলা এই সময় সত্যিই ক্ষতিকর। সেই ইঙ্গিত দেখে মন্দাকিনী যেন নতুন রকম কৌতুক পেয়ে গেলেন। চারদিক তাকিয়ে নিয়ে বললেন, ঘরে কতকগুলো শকুন বসে আছে। আমি মরলেই আমার গয়নাগাটি, কোম্পানির কাগজ সব ছোঁ মেরে নেবার জন্য রয়েছে। কারুকে কিছু দেবো না। কাঙালীদের বিলিয়ে দেবো!

অত্যন্ত আঘাত লাগার মতন কথা! সুরেশ্বরের মুখখানা পাংশু হয়ে গেল। দু' একজন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বড়বাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, ছি ছি, বড়মা, এসব কি বলছো! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! সুরেশ্বর তোমার নিজের ছেলে, আর এমন ভালো ছেলে—

সত্যি কথাই। সুরেশ্বর মোটেই লোভী প্রকৃতির মানুষ নন এবং তাঁর মাতৃভক্তিতে কোনো খাদ নেই। মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি ছেলে পাবে—এতো স্বাভাবিক ব্যাপার।

সারাজীবন মন্দাকিনী তাঁর তেজে সবাইকে কাঁপিয়ে রেখেছেন। তাঁর মুখের ওপর কেউ কোনোদিন কথা বলতে পারেনি। ডার্বি লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়ার পর সেই টাকায় স্বামীর সঙ্গে বিলেতেও বেড়াতে গিয়েছিলেন একবার। সেই সময়কার একটা ছবি টানানো আছে দেয়ালে—লাউঞ্জ সুট-পরা স্বামীর পাশে কালো শাড়ি-পরা চেহারা, কাঁধের কাছে একটা ব্রোচ আঁটা। শুধু রূপসী নয়, কতটা তেজস্বিনী ছিলেন, তাও ছবি দেখলে বোঝা যায়।

এখন মৃত্যুর কাছাকাছি এসে মন্দাকিনী যেন ছটফট করছেন। কিছুতেই হার স্বীকার করতে চান না—অথচ জেনে গেছেন হেরে যেতে হবেই এবার। তাই বুঝি সবাইকে আঘাত করে নিজের অস্তিত্ব বুঝিয়ে দিতে চান।

কিছুক্ষণ সবাই নিস্তব্ধ। সূচ পড়লেও বুঝি শোনা যাবে। এই সময় আলমারির মাথায় রাখা সুদৃশ্য কারুকাজ-করা ঘড়িটা টুংটাং করে বেজে উঠলো। যেন সময় মনে করিয়ে দিল, সময় নেই।

মন্দাকিনী শান্তিলতার দিকে তাকিয়ে বললেন, বড়মা, তোমরা এখন একটু যাও তো। অমরের সঙ্গে আমার কথা আছে।

সবাই বেশ স্বস্তির সঙ্গেই চলে গেল ঘর থেকে। সুরেশ্বর বড়বাবুকে ফিসফিস করে বলে গেলেন, হঠাৎ শ্বাস কষ্ট হলে কোন্ ওষুধটা কিভাবে দেওয়া হবে।

ঘরে এখন শুধু দুজন। উনআশী বছরের একজন রমণীর পাশে একষট্টি বছরের একজন পুরুষ। মন্দাকিনী অবশ্য এমনভাবে কথা বলছেন যেন অমরনাথ একটি তিন চার বছরের শিশু।

বিছানার ওপর ছড়িয়ে থাকা অলংকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে মন্দাকিনী একটা হার তুলে নিলেন। চোখের সামনে এনে সেটা পরীক্ষা করলেন ভালোভাবে। তারপর বড়বাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, নে, এটা তোর বউকে দিবি!

—বড়মা, আমার স্ত্রী মারা গেছে অনেকদিন আগে।

—এই হারটি দিল্লিতে গড়িয়েছিলুম। তোর বউয়ের পছন্দ হবে। নে!

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। পরে সুরেশ্বরকে দিয়ে দিলেই হবে, এই ভেবে বড়বাবু হাত বাড়িয়ে নিলেন হারটা। খুব মূল্যবান জিনিস, হাতে নিলেই বোঝা যায়।

মন্দাকিনী এবার এক জোড়া বালা তুলে নিয়ে বললেন, এ দুটো দিবি তোর ছেলের বউকে। নে, ধর!

সে দুটোও বড়বাবুকে নিতে হলো।

এবার ষড়যন্ত্র করার মতন ফিসফিসিয়ে বললেন, আরও নে। তোর যা খুশী বেছে নে, যত ইচ্ছে নে!

বড়বাবু হাতের গয়নাগুলো বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে বললেন, আমি কিছু চাই না! তুমি আমাকে এইজন্য ডেকেছো? আমি তোমার কাছ থেকে কখনো কিছু নিয়েছি?

—তুই আমার বুকের রক্ত শুষে খেয়েছিস।

—তাতো আর ফিরিয়ে দেবার উপায় নেই।

—তুই আমার বড় ছেলে। আমি মরলে তুই আমার মুখে আগুন দিবি। রত্নেশ্বর নেই, তুই আছিস! কাল রাত্তিরে সরো-কে স্বপ্ন দেখলাম!

বড়বাবুর বুকের ভেতরটা ধক করে উঠলো। সরোজিনী বড়বাবুর নিজের মায়ের নাম—যাঁর চেহারাটাও তিনি কল্পনা করতে পারেন না।

মন্দাকিনী বলে চললেন, সরো ঠিক তেমনি ছেলেমানুষটি আছে, আমিই শুধু বুড়ী হয়ে গেছি। সেই রকম শ্যামলা রং, বড় বড় টানা-টানা চোখ, নাকছাবি-পরা—আমায় কি বললে জানিস? আমায় বললে, গঙ্গাজল, তুই আমার ছেলেকে মানুষ করেছিস—আমিও এখন তোর ছেলে রত্নেশ্বরের দেখাশুনো করি। তার কোনো কষ্ট হয় না। সে পানবসন্তে মরেছিল—কিন্তু এখন তার গায়ে কোন দাগ নেই। সরো তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়! আমি বললুম, সরো, আমি কি তোর ছেলেকে মানুষ করতে পেরেছি? সে অমানুষ হয়েছে! সে বিধবা বিয়ে করেছে, সে আমার মুখ দেখতেও আসে না!

মন্দাকিনীকে অনেক রকম প্রশ্ন করবার জন্য বড়বাবুর মনের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করতে লাগলো। অথচ কোনো উপায় নেই। ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে রইলেন ওঁর মুখের দিকে।

—সরো বললে, বিধবা বিয়ে করুক, ম্লেচ্ছ বিয়ে করুক, যা খুশী করুক। তবু তো সে বেঁচে আছে। ওকে তুই বাঁচিয়ে রাখিস। ও ছেলে যদি তোর কথার অবাধ্য হয়, তাহলে কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনতে পারিস না!

বড়বাবু অদ্ভুতভাবে হাসলেন। তারপর মাথাটা নুইয়ে এনে মন্দাকিনীকে বললেন, এই তো এখন এসেছি। আমার কান ধরো!

মন্দাকিনী শীর্ণ হাতখানি তুলে বড়বাবুর মুখে বোলাতে লাগলেন। বড়বাবু চোখ বুজে ভোগ করতে লাগলেন সেই আদর। জীবনে তিনি নারী সঙ্গ পেয়েছেন, কিন্তু প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর তিনি তাঁর শরীরে পেলেন স্নেহের স্পর্শ। তাঁর শরীর জুড়িয়ে গেল। মন্দাকিনী বড়বাবুর থুতনিতে হাত রেখে বললেন, তুই রোগা হয়ে গেছিস! আমি যখন থাকবো না—।

বড়বাবু গঙ্গার ঘাটে গিয়ে মাথা ন্যাড়া হলেন। এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে তর্পণ করলেন মন্দাকিনীর নামে। তখন তাঁর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছিল। ধর্মে তাঁর বিশ্বাস নেই, নিজের বাবা-মায়ের পারলৌকিক কাজ তাঁকে করতেও হয়নি—কিন্তু মন্দাকিনীর মৃত্যুর প্রতিটি আচার অনুষ্ঠান তিনি মেনে চললেন অক্ষরে অক্ষরে। সুরেশ্বরের সঙ্গে এক সঙ্গে বসে তিনিও শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়লেন— মধুবাতা ঋতায়তে,

মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে অনর্গল জল পড়ে।

এগারো দিনের দিন খুব ধুমধাম করে নেমন্তন্ন খাওয়ানো হলো। ন্যাড়া মাথা, কোরা কাপড় পরা, মুগার চাদর গায়ে বড়বাবু নিমন্ত্রিতদের কাছে গিয়ে হাতজোড় করে আপ্যায়ন করতে লাগলেন। খোয়া ক্ষীর পরিবেশন করার সময় বলতে লাগলেন, এটা একটু চেখে দেখুন, এটা আমার মায়ের খুব প্রিয় ছিল। সুরেশ্বরের অনেক আত্মীয়-স্বজন বড়বাবুকে চেনেই না—তারা অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো।

মন্দাকিনীর মৃত্যুতে বড়বাবুর জীবনে একটা ইন্দ্রপতন হয়ে গেল। মন্দাকিনীর সঙ্গে তাঁর দেখা হতো খুব কম, মাঝখানে তো বেশ কয়েক বছর কোনো যোগাযোগই ছিল না—তবু মন্দাকিনীর অস্তিত্বই যেন ছিল তাঁর কাছে একটা সান্ত্বনার মতন। এ পৃথিবীতে বড়বাবুকে দেখা হলেই গালমন্দ করার কিংবা তুই সম্বোধন করার আর কেউ রইলো না। প্রথম কয়েকদিন তিনি সর্বক্ষণ গুম হয়ে থাকতেন। চিররঞ্জন কোনো সান্ত্বনা দিতে এলেও অবুঝের মতন বলতেন, আমার কেউ নেই, আমার আর কেউ নেই। বড়বাবু এবার যেন সত্যিই একটু বুড়ো হয়ে গেলেন। তাঁর চরিত্রে দু'-একটা পরিবর্তন দেখা দিল।

যেমন তিনি হঠাৎ তাঁর ছেলের দিকে খুব ঝুঁকে পড়লেন। এর আগে তাঁর সঙ্গে সূর্যর কথাবার্তাই হতো খুব কম। ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে জমিয়ে গল্প করার স্বভাব তাঁর নয়। সূর্যও একাচোরা ধরনের, গম্ভীর প্রকৃতির। কিছুদিন আগে সূর্যকে মারধোর করার পর বড়বাবুর সঙ্গে তার কথাবার্তা প্রায় একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এখন বড়বাবু সূর্যকে বারবার ডেকে পাঠান, তাকে সামনে বসিয়ে নানারকম কথা বলতে চান। কখনো কখনো নিজ থেকে সূর্যর ঘরে চলে আসেন, তার খাটের ওপর বসে হাল্কা গলায় জিজ্ঞেস করেন, ভেবে দ্যাখ, তুই পড়াশুনোই করবি, না ব্যবসায় লেগে যাবি? আমি কিছু জোর করবো না। প্রেসিডেন্সী কলেজের ফর্ম আনিয়ে রেখেছি। সকালে উঠে এক্সারসাইজ করিস? ভোরে যদি উঠতে না পারিস, আমি তোকে ডেকে দেবো। কল-তোলা ছোলা খাবি, পেট ভালো থাকে।

যেন বড়বাবু তাঁর রক্ত সম্পর্কের একমাত্র আত্মীয়টিকে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন। তার কাছাকাছি আসতে চাইছেন। না হলে এ পৃথিবীতে তিনি সত্যিই একা হয়ে যাবেন।

কিন্তু সূর্যর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এর আগেই। কথাবার্তায় সে সহজ হতে পারে না। মুখ গোঁজ করে বসে থাকে, একটা আধটা উত্তর দেয়।

তা ছাড়া ঐটুকু বয়েসে সে বুকের মধ্যে সব সময় একটা গোপন ব্যাপার বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, অন্যের কাছে সে সহজ হবে কি করে? হরকুমারের মৃত্যুর কথা সে কারুকে বলেনি, তার কোলের ওপর মাথা রেখেই মুখে রক্ত তুলতে তুলতে হরকুমারকে সে মরতে দেখেছে। সূর্য হরকুমারের একটা হাত সর্বক্ষণ চেপে ধরেছিল—পুলিসের অত্যাচারে যে হাতের দুটো আঙুল থেঁতলানো। তা ছাড়া হরকুমারের রিভলবারটাও তখন সূর্যর কাছে—সেটার কথাও কারুকে বলা যাবে না। এই গোপনীয়তা পাষাণ-ভার হয়ে তার বুকে চেপে ছিল। মন্দাকিনীর মৃত্যুসংবাদে সূর্যর মনে একটুও দাগ কাটেনি—কারণ মন্দাকিনীর অস্তিত্ব সম্পর্কেই সে আগে অবহিত ছিল না। খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যে দুটি মৃত্যুতে পিতা ও পুত্রের মধ্যে দু'রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল।

মন্দাকিনীর উইলে বড়বাবুর নামে পঁয়তিরিশ হাজার টাকা ছিল। সে টাকা বড়বাবু ফেরত দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সুরেশ্বর কিছুতেই নিলেন না। তখন বড়-বাবু সেই টাকা বাগবাজারের একটি অনাথ আশ্রমে দান করলেন। দানের একটি শর্ত হলো এই যে, পিতৃ-পরিচয় নেই, এমন অনাথ শিশুকেও যদি কেউ পাঠায়, তাহলেও তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা হবে।

শুধু তাই নয়, বড়বাবু নিজেও সেই অনাথ আশ্রম সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। আশ্রমের পরিচালনা, কার্যপ্রণালীর খুঁটিনাটি সম্পর্কেও খোঁজ নিতে লাগলেন, রোজ বিকেলবেলা গিয়ে বসতে লাগলেন সেখানে।

ক্রমশ দেখা গেল, সন্ধেবেলা আশ্রমের মাঠে একগাদা ছেলে বড়বাবুকে ঘিরে বসে থাকে—বড়বাবু তাদের নানারকম গল্প শোনান। এই সময়ে বড়বাবুকে বেশ হাসি-খুশী দেখা যায়। নিজের ছেলেকেও কাছে টানতে না পেরে বড়বাবু অনাথ ছেলেদের সঙ্গে মিশে আনন্দ পাবার চেষ্টা করছেন।

॥ ১৭ ॥

এক একটা দিন এমন চমৎকার ভাবে আসে, সকালবেলা থেকে সব কিছুই মনে হয় অন্যরকম। মেঘ নীচু হয়ে নেমে এসেছে, পৃথিবীময় সেই ছায়া, বৃষ্টি নামে নি। মেঘের ছায়ায় সমস্ত বস্তুর চেহারা বদলে যায়। মনে হয়, পৃথিবীতে কোনো ভারী জিনিস নেই, সব কিছুই হালকা হালকা। ফুরফুর করছে হাওয়া, গায়ে সিল্কের কাপড়ের ছোঁয়া লাগলে যে-রকম লাগে, ঠিক সেইরকম।

ইস্কুল ছুটি, সকালবেলা আমরা সুজি দিয়ে লুচি খেলাম। সূর্যদার পাস করার উপলক্ষে বাবা নবীন ময়রার রসগোল্লা এনেছেন। আমরা সবাই খুব আনন্দ করছি, কিন্তু সূর্যদা সেই একই রকম গোমড়া-মুখো। কাল রাত্রে টেলিগ্রাম এসেছে—সূর্যদা এ ওয়ান পেয়ে পাস করেছে। পাসের খবর শুনলে অন্য সব ছেলেরা কত লাফা-লাফি করে, অথচ সূর্যদা এমন ভাব করছে যেন এতে তার কিছু যায় আসে না!

বড়দি ফিসফিস করে সূর্যদাকে বললো, বড়বাবুকে প্রণাম করেছো? পাসের খবর পেলে গুরুজনদের প্রণাম করতে হয়। সূর্যদা এমন ভাবে বড়দির দিকে তাকালো, যেন এরকম একটা অদ্ভুত কথা সে জীবনে শোনে নি।

ঠিক হয়েছে ম্যাটিনী শোতে একটি বাইস্কোপ দেখা হবে। বলাই বাহুল্য, তাতে আমাকে নেওয়া হবে না, কারণ বাংলা বই ছোটদের দেখতে নেই। যাক গে, তার জন্য আমার কোনো দুঃখ নেই। আমি তো এক পয়সা দিয়ে যখন তখন বাইস্কোপ দেখতে পারি—আমাদের মোড়ের মাথায় আসে পেতলের একটা গোল বাক্স, ফুটোয় চোখ রাখলেই দেখা যায়।

কি যেন একটা যোগ আছে, মা গঙ্গা স্নান করতে যাবেন। আমাকে অবশ্য নিয়ে যেতে হবে না—আমার দুই দিদি যাবে মায়ের সঙ্গে। আমার আর এক জ্যাঠতুতো বোন পান্তুর জ্বর হয়েছে। আমার খেলার সঙ্গী নেই। আমার খুব ইচ্ছে করছিল বিষ্ণুদের বাড়িতে যেতে। কিন্তু আমায় কে নিয়ে যাবে? চাকর দেশে গেছে।

আমি আর দু' মাস বাদেই নয় পেরিয়ে দশে পা দেবো, আমি একলা যেতে পারি। কিন্তু মা আমাকে কিছুতেই একলা ছাড়বেন না। অথচ রাস্তা আমার চেনা—এই তো

আমাদের বাড়ি থেকে খানিকটা গেলেই কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, তারপর বাঁ দিকে বেঁকলেই একটুখানি গিয়েই হেদো। হেদার পাশ দিয়ে গিয়ে বিডন স্ট্রিট পেরিয়ে কাশী ঘোষের থামওয়ালা বাড়ি। সেখানে অনেকগুলো ঘোড়ার গাড়ি থাকে। সেটা পেরিয়ে গেলে, যদি এদিকের ফুটপাথ দিয়ে যাই তাহলে ওদিকের ফুটপাথে পড়বে দুটো থিয়েটার, রংমহল আর শ্রীরঙ্গম, তারপর একটা বিরাট উঁচু ফ্ল্যাট বাড়ি, তারপর রূপবাণী বাইস্কোপ। এই বাইস্কোপ বাড়িটার নাম নাকি দিয়েছিলেন রবি ঠাকুর। সবাই বলে রূপ্ বাণী, কিন্তু বাবা একদিন আমাকে বলেছিলেন, এর উচ্চারণ করতে হয় রূপো বাণী। এদিকে আমি কালীদের বাড়ির পাশ দিয়ে আর একটুখানি গেলেই গ্রে স্ট্রীট, উল্টোদিকে স্টার থিয়েটার। গ্রে স্ট্রিটের বাঁ দিকে বেঁকলেই বিষ্ণুদের বাড়ি এসে যাবে।

সূর্যদাকে গিয়ে বললাম, তুমি বিষ্ণুদের বাড়ি যাবে? চলো না!

ও বাড়িতে যাওয়ার ব্যাপারে সূর্যদার আজকাল খুব একটা আগ্রহ নেই। তার কারণ, ও বাড়িতে সূর্যদার সমবয়েসী ঠিক কেউ নেই। অন্য ছেলেমেয়েরা সূর্যদার চেয়ে অন্তত চার-পাঁচ বছরের ছোট। আবার সুপ্রকাশদা চার-পাঁচ বছরের বড়। সূর্যদার কোনো বন্ধু নেই। তাছাড়া ওর যা স্বভাব, পাড়ায় কোনো ছেলের সঙ্গেও বন্ধুত্ব হলো না।

সূর্যদা একটা মোটা বই পড়ছিল, মুখ না তুলেই বললো, উঁহুঃ!

আমি সূর্যদার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললাম, তাহলে ক্যারম খেলবে?

আবার—উঁহুঁ!

—সূর্যদা, আমাকে একটা গল্প বলো!

আশ্চর্যের ব্যাপার, সূর্যদা তবু রেগে উঠলো না। বই মুড়ে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। তারপর বললো, আমি এখন বেরুবো, চল্, তোকে ও বাড়িতে পেঁৗছে দিয়ে আসি!

সূর্যদার ধুতি-পরা দেখলে আমার হাসি পায়। রীতিমতন কসরত-এর ব্যাপার। আগে কক্ষনো ধুতি-টুতি পরেনি সূর্যদা, আচার-ব্যবহার ও ছিল পুরো সাহেব, হঠাৎ দু'তিন মাস ধরে খুব ধুতি পরার ঝোঁক হয়েছে। নিজেই কিনে এনেছে এক জোড়া খদ্দরের সাদা পাঞ্জাবি।

রাস্তায় তখন অজস্র এলোমেলো হাওয়া, সূর্যদা ধুতি সামলাতে নাজেহাল। কোমরের কাছে গিঁট দিয়ে তারপর বেল্ট বাঁধা, সুতরাং খুলে যাবার ভয় নেই, কিন্তু কাছা ফুলে উঠছে বেলুনের মতন। একটা ফটোগ্রাফের মতন সেই দৃশ্যটা এত বছর পরেও আমার চোখে ভাসে। সূর্যদার মাথা ভর্তি লালচে রঙের চুল এলোমেলো, সাহেবদের মতন ফর্সা রং, থুতনিতে অল্প দাড়ি ও সদ্য-ওঠা সরু গোঁফের রেখা, ব্যায়াম করা সুন্দর স্বাস্থ্য, পাঞ্জাবির হাতা গোটানো নিচু হয়ে দু' হাত দিয়ে ধুতি সামলাচ্ছে। মনে হয়, কোনো ছদ্মবেশী রাজকুমার। আমি রূপকথা পড়তে গেলেই রাজকুমারের মুখ সূর্যদার মতন কল্পনা করতাম।

আমি পরেছিলাম কালো রঙের হাফপ্যান্ট আর চেন-লাগানো তোয়ালের মতন কাপড়ের গেঞ্জি। ওই প্রকার গেঞ্জির ফ্যাশান তখন খুব চালু। পায়ে নটি-বয় শু। হঠাৎ লম্বা হতে শুরু করেছিলাম বলে হাঁটুর তলা থেকে আমার পা-দুটো বেখাপ্পা মনে হতো।

দু'জন কাবুলিওয়ালা একজন রোগাপটকা লোকের জামা চেপে ধরে বাজখাই

গলায় খুব ধমকাচ্ছে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমরা সেই দৃশ্য দেখলাম। রোগা লোকটিকে এই অবস্থায় প্রায়ই দেখা যায়—কাবুলিদের কাছ থেকে টাকা ধার করে রেস খেলে।

রাস্তায় বেরুলে যে কত রকম কি দেখা যায়। চেনা দোকান, চেনা রিক্সওয়ালা, চেনা ভিখিরি, এদেরও দেখতে ভালো লাগে। একটি বাচ্চা ভিখিরি রোজ 'ময়ূর বনকে চিঁড়িয়া বনকে বনবন' গানটা গায়। কানা কেষ্টর গান, 'লোকে বলে কালো কালো নয় সে যে আমার চোখের আলো'—এটাও সে জানে, তবে বড্ড সুর ভুল করে। হে'দোর কাছে ভাল্লুক নাচ-দেখানো হচ্ছে—এটা আমরা পয়সা না দিয়েও দেখতে পারি। একটু ভিড়ের পেছন দিকে দাঁড়ালে আর পয়সা না দিলেও চলে। আমার কাছে তো একটাও পয়সা থাকে না—আর সুর্যদা কখন কি দিতে হয় তাই-ই জানে না। একবার ইচ্ছে হলো সুর্যদাকে বলি আমাকে একটা সিগারেট-লজেন্স কিনে দিতে, কিন্তু লজ্জা হলো।

ভাল্লুকটা বেশী বড় নয়, অথচ বেশ গাঁট্টাগোট্টা। মনে হয় যেন বামন ভাল্লুক। আমার সেই কথা শুনে সুর্যদা বিজ্ঞের মতন জানালো, মাউণ্টেন রিজিয়ানের ভাল্লুক। পাহাড়ী ভাল্লুক বেশী বড় হয় না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম,—কোন্ পাহাড়? হিমালয়?

সুর্যদা বললো,—হতে পারে!

—আচ্ছা সুর্যদা, হিমালয় তো অনেক দূর। সেখান থেকে ভাল্লুকটাকে এতদূর নিয়ে এলো কি করে? হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে?

—কেন, ট্রেনে?

—হিমালয় পাহাড়ে কি রেলগাড়ি যায়?

—খানিকটা হাঁটিয়ে, খানিকটা ট্রেনে।

—রেলগাড়িতে কি ভাল্লুকদের উঠতে দেয়? অন্য লোকেরা ভয় পায় না?

এই ব্যাপারটা সম্পর্কে সুর্যদার জ্ঞান খুব পরিষ্কার নয়। আমতা আমতা করে বললো, ফ্রেটার ট্রেনে বোধ হয়, কিংবা হাঁটিয়েও নিয়ে আসতে পারে—

কিছুক্ষণ আমরা এই বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করতে করতেই যাই। সেই দূরে হিমালয়ের জঙ্গল থেকে একটা লোক একটা ভাল্লুকের গলায় দড়ি বেঁধে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে কলকাতা পর্যন্ত নিয়ে আসছে। এই কল্পনা বেশ রোমাঞ্চিত করে।

হঠাৎ সুর্যদার হাত টেনে ধরে আমি বললাম, বাঁ দিকে তাকাও, শিগ্‌গির বাঁ দিকে তাকাও!

উল্টো দিকে থেকে একটা মরা আসছিল। খাটিয়া কাঁধে নিয়ে চারটে লোক মহা উৎসাহে বল হরি, হরি বোল—বলে চ্যাঁচাচ্ছে!

সুর্যদা অবাক হয়ে বললো, কেন, বাঁ দিকে তাকাবো কেন?

—ডান দিক থেকে মড়া গেলে সেদিকে তাকাতে নেই। অকল্যাণ হয়।

—হ্যাঁ রে বাদল, তুই এসব কোথা থেকে শিখেছিস রে?

—মা বলেছে!

—এসব হচ্ছে সুপারস্টিশন! কু...কু...কু

—কুসংস্কার!

—হ্যাঁ। একটা ইঁট, কাঠ, লোহাও যা, একটা ডেড বডিও তাই! ডান দিক বাঁ দিক তাকানোতে কিছু আসে যায় না!

—তা হলে মা বললো কেন!

—মায়েদের বোঝাতে হয়। ওঁরা তো লেখাপড়া শেখেননি—

—হ্যাঁ, আমার মা লেখাপড়া শিখেছে। মা গল্পের বই পড়ে!

—বাজে তর্ক করিস না তো! যা বলবো তাই শুনবি!

—তুমি বুঝি সব জানো?

সূর্যদা আমার দিকে ফিরে বললো, আমি সব জানি। সব। বুঝলি!

সেই ষোলো বছরের সদ্য যুবকের মুখে অহংকার ঝলসে উঠলো। এই পৃথিবী-বিস্তৃত জ্ঞানের প্রতি যেন একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে চায়। কিন্তু সূর্যদা বাংলা বানান জানে না, আমার থেকেও কম জানে—এ কথাটা আমার মুখে এসে গেলেও বললাম না।

অভয় গুহ রোডের মোড়ে একটা দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একজন লোক চিৎকার করে ডাকছে, বৈকুণ্ঠবাবু, বৈকুণ্ঠবাবু! কেউ সাড়া দিচ্ছে না, লোকটি ডেকেই যাচ্ছে। বহুক্ষণ কানে সেই ডাকটা লেগে রইলো। কেন জানি না, আমার হঠাৎ মনে হলো, বৈকুণ্ঠবাবু মারা গেছেন—একটু আগে যে মড়াটিকে নিয়ে গেল, তারই নাম বৈকুণ্ঠবাবু। আমার মাঝে মাঝে এ রকম অদ্ভুত কথা মনে হয়।

বিষ্ণুদের বাড়িতে তখন আতর কেনা হচ্ছে। ঠাকুরদালানে বসেছে আতরওয়ালা, তার কাপড়ের বোঁচকার মধ্যে প্রায় একশোটা নানা রঙের শিশি। এক একটা শিশির মুখ খুলে একটু করে তুলো ভিজিয়ে এগিয়ে দিচ্ছে—গন্ধ শুঁকে যাচাই করছে বাড়ির মেয়েরা। বিষ্ণু, দীপ্তি, রেণু, ছকু, কানাইদের পেয়ে গেলাম।

সূর্যদা আমাকে পৌঁছে দিয়েই চলে যাবে। দু'তিন মাস আগে সূর্যদা কলকাতার কোনো রাস্তাই চিনতো না—এখন সে একা একা কোথায় থোথায় যায়—কারুকে বলে না। সূর্যদাকে দেখলে এ বাড়ির ছেলেমেয়েরা খুব খুশী হয়, দীপ্তি তো একেবারে যেন গলে পড়ে! ওরা সূর্যদার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলো, কিন্তু সূর্যদা আর দাঁড়ালো না, চলে গেল। আমরা কিছুক্ষণ আতরওয়ালার কাছে উঁকিঝুঁকি মারলাম, তারপর বিষ্ণু আর আমি চলে গেলাম ওপরে।

দার্জিলিং থেকে বিষ্ণু কত রকম পাথর এনেছে। এক একটা পাথর দেখলে মনে হয়, কি অসম্ভব দামী! কত রকম রং! অথচ বিষ্ণু বললো, একটাও কেনেনি। সব ও নিজে কুড়িয়েছে! বিষ্ণুরা দার্জিলিং থেকে কালিম্পং, গ্যাংটক পর্যন্ত ঘুরে এসেছে। আমাকে বিষ্ণু বললো, তুই গেলি না তো! গেলে দেখতিস, কি মজাই যে হতো!

আমি লুকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। যে-জায়গায় এমন সুন্দর সুন্দর পাথর পাওয়া যায়—সে তো স্বপ্নের দেশ! বাবা আমাকে যেতে দেননি। ঠিক আছে, বড় হয়ে আমি একশোবার যাবো, হাজারবার যাবো—তখন তো আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না।

বিষ্ণু জানলা-দরজা বন্ধ করে ঘর অন্ধকার করে দিল! তারপর দুটো বড় সাদা পাথর আমার হাতে দিয়ে বললো, ঠুকে দ্যাখ! জোরে ঠুকবি!

ঠুকতেই ঝিলিক দিয়ে আগুনের ফুলকি দেখা গেল!

আমি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, চকমকি?

চকমকি পাথরের কথা গল্পের বইতে পড়েছি শুধু। পাথর দুটোকে মনে হলো, কোনো রূপকথার জিনিস আমার হাতে।

বিষ্ণু বললো, হ্যাঁ। এরকম কত পাথর আছে ওখানে! তোর জন্যও আনবো ভেবেছিলাম, ভুলে গেলাম!

এই সময় রেণু দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো। ছুটে কাছে এসে বললো, আমি এক-

ধার, আমি একবার আগুন জ্বালবো।

আমি পাথর দুটো রেণুকে দিতে যাচ্ছিলাম, বিষ্ণু বললো, না না, রেণু পারবে না! ওর হাত পুড়ে যাবে!

রেণু ঠোঁট উল্টে বললো, ইস্ মোটেই হাত পোড়ে না! আমি এর আগে জ্বালিয়েছি তো!

বিষ্ণু রেগে গিয়ে বললো, তুই আমাকে না বলে আমার জিনিসে হাত দিয়েছিস? কেন হাত দিয়েছিস?

—কাকীমা বলেছে!

—মা তোকে আমার জিনিসে হাত দিতে বলেছে?

—হ্যাঁ, বলেছেই তো!

—মাকে ডাকি?

রেণু আবার এক ছুটে দরজার কাছে গিয়ে বললো, হাত দিয়েছি, বেশ করেছি! আবার দেবো, কি হবে?

বিষ্ণু তাড়া করতেই রেণু পালিয়ে গেল। রেণুটা বড্ড দুষ্টু আর দুরন্ত। সবাই জানে বিষ্ণু নিজের জিনিসপত্রের দারুণ যত্ন নেয়। তবু রেণু তাতে হাত দেবেই!

বিষ্ণু কৃপণ বা স্বার্থপর নয়, তার জিনিসপত্র সে অন্যদেরও ব্যবহার করতে দিতে পারে, কিন্তু নিজের তত্ত্বাবধানে। হঠাৎ ঘাঁটাঘাঁটি করা সে পছন্দ করে না।

বিষ্ণু বললো, দার্জিলিং-এ আর একটা জিনিস কিনেছি দেখবি?

চামড়ার বাক্স খুলে বিষ্ণু সাবধানে একটা দূরবীন বার করলো। নিজের জামা দিয়ে খুব স্নেহের সঙ্গে সেটাকে মুছেটুছে বললো, খুব পাওয়ারফুল! এক সাহেবের ছিল। এটা দিয়ে অনেক দূরের জিনিস দেখা যায়—আবার যদি উল্টো করে ধরে দেখিস, তা হলে কাছের জিনিসও অনেক দূরের মনে হবে।

জিনিসটায় হাত দিয়ে আমার কেমন যেন শিরশিরে অনুভূতি হলো। কলম্বাস দূরবীন চোখে লাগিয়ে দেখলেন...গ্যালিলিও...ক্যাপ্টেন কুক...বইতে পড়া এসব যে সত্যি সত্যি কখনো নিজের হাতে নিয়ে দেখবো—।

ঘর অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বিষ্ণু বললো, চল্, ছাদে চল্!

ছাদে আমার আর বিষ্ণুর একটা চমৎকার আড্ডা দেবার জায়গা আছে। বিষ্ণুদের বাড়ির পেছনে খানিকটা পড়ো জমি, সেখানে তিনটে নারকোল গাছ তিন বন্ধুর মতন কাঁধ ধরাধরি করে বেড়ে উঠেছে, বিষ্ণুদের ছাদও ছাড়িয়ে গেছে। ছাদের এক কোণে তারা চমৎকার ছায়া দেয়। সেই কোণটাতে মাঝে মাঝে ঘোর দুপুরেও আমি আর বিষ্ণু এসে বসি, বই পড়ি, দেশ-বিদেশের গল্প করি, কিংবা খাতা-পেন্সিল নিয়ে কাটাকুটি খেলি। এক একদিন ওখানে আমরা ঘুমিয়েও পড়েছি।

আজ রোদ নেই, আকাশে মেঘ। দূরবীন চোখে লাগিয়েও মেঘের মধ্যে আর কিছু দেখা যায় না। বহু দূরের দূরের বাড়ির ছাদ বেশ স্পষ্ট দেখা যায় অবশ্য, তবু আমি একটু নিরাশ হলাম। আমার আকাশ দেখার ইচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, মেঘ না থাকলে কি এতে স্বর্গ পর্যন্ত দেখা যায়?

বিষ্ণু আমার চেয়ে অভিজ্ঞ। সে হেসে বললো, ধোৎ বোকা, স্বর্গ কি চোখে দেখা যায় নাকি? জ্যান্ত অবস্থায় কেউ স্বর্গ দেখতে পায় না—তা হলে তো সবাই দেখে নিত! তা হলে, আর যুধিষ্ঠিরকে অত কষ্ট করতে হতো না!

—তখন তো দূরবীন ছিল না?

—হ্যাঁ ছিল! পুষ্পক রথ ছিল, আর দূরবীন ছিল না? তা কখনো হয়?

—তা হলে এটা দিয়ে চাঁদের পাহাড়ের চরকা বুড়ীকে দেখা যাবে?

বিষ্ণু আমতা আমতা করে করে বললো, তা যেতেও পারে। তবে, সূর্য চাঁদ এসব দেখতে গেলেও আরও পাওয়ারফুল জিনিস লাগে। তাকে বলে টেলিসকোপ। বাবাকে বললো আমাকে একটা টেলিসকোপ কিনে দিতে!

আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম, জানিস, আমি ভূগোলের বইতে পড়েছি, এখনও অনেক গ্রহ কিংবা ধূমকেতু আবিষ্কার করা হয়নি। যদি সে রকম একটা হঠাৎ দেখতে পাই?

বিষ্ণু বললো, বাবা টেলিসকোপ কিনে দিলে আমরা রোজ সন্ধ্যেবেলা তাতে চোখ লাগিয়ে বসে থাকবো! যদি সে রকম একটা গ্রহ আবিষ্কার করে ফেলি, তা হলে ভূগোলের বইতে তোর আর আমার নাম একসঙ্গে থাকবে। সেই গ্রহটার কি নাম দেবো বল তো?

চট্ করে কোনো নাম আমার মনে এলো না। বললাম, তুই বল তো!

যেন আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, এইভাবে বিষ্ণু বললো, নাম দেবো হৈমন্তী। হৈমন্তী কাকীমার নামে। হৈমন্তী কাকীমা তো হারিয়ে গেছে!

এ নামে আমারও কোনো আপত্তি নেই। তৎক্ষণাৎ রাজি।

কি ভালো লাগছিল ছাদে দূরবীন চোখে লাগিয়ে বসে থাকতে। নারকোল গাছের চিরুনির মতন পাতাগুলো দুলছে, দুটো চিল মেতে উঠেছে ক্রমশ আরও উঁচুতে ওঠার প্রতিযোগিতায়। একটু একটু মেঘ সরে যাচ্ছে, আমি আকাশের দিকে চেয়ে আছি। হঠাৎ হয়তো চোখে পড়ে যাবে, ভাবা যায় না এমন এক দৃশ্য মাঝখানটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠিক মতন ফোকাস করতে হয়, বিষ্ণু দেখিয়ে দিচ্ছিল।

এই সময় দুপদাপ করে রেণু আবার ছাদে এলো। কাছে এসে বললো, দেখি, দেখি, আমাকে একটু দেখতে দাও!

আমরা কেউ রেণুর কথা গ্রাহ্য করলাম না। রেণু নাকি নাকি আব্দারের সুরে করে বললো, একবারটি দেখতে দাও না বাবা!

তারপর রেণু আর কোনো সুযোগের অপেক্ষায় না থেকে টপাস্ করে আমার হাত থেকে কেড়ে নিল দূরবীনটা। চলে গেল ছাদের অন্য দিকে।

বিষ্ণু একেবারে আঁতকে উঠলো। ব্যস্ত হয়ে বললো, এই, এই, ভেঙে যাবে! শিগ্‌গির এদিকে আয়!

রেণু তখন সেটা চোখে লাগিয়ে গভীর মনোযোগিনী। বললো, ভাঙবে না, বলছি ভাঙবো না, আমি আগেও এটাতে দেখেছি!

বিষ্ণু এবার রেগে গেল খুব। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, রেণু ভালো হবে না বলছি, শিগ্‌গির দিয়ে যা! এক্ষুনি!

—দাঁড়াও না বাবা! দেখা হয়নি!

—রেণু, ভালো হবে না বলছি।

তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে রেণু সত্যিই সেটা ফেলে দিল হাত থেকে। ধড়াস করে উঠলো আমার বুক। ভাঙেনি অবশ্য, কিন্তু তাতেই বিষ্ণুকে মনে হলো যেন ও শারীরিকভাবে আঘাত পেয়েছে! ও আর ধৈর্য রাখতে পারলো না। ছুটে গিয়ে ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মারলো রেণুকে।

রেণু একটুক্ষণ ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে রইলো—তারপর ই-ই-ই শব্দ করে বিষ্ণুর

ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে আঁচড়ে কামড়ে দিতে গেল। বিষ্ণুও ওকে মারতে লাগলো এলোপাথাড়ি, বড্ড বেশি। এক সময় রেণু ডুকরে কেঁদে উঠলো।

আমি ওদের কাছে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম, বেশ রাগ হয়েছিল রেণুর ওপর। এখন রেণুর কান্না দেখে মায়া হলো। রেণু বড্ড অসুখে ভোগে, দুর্বল শরীর—দুষ্টুমী করলেও ওকে বড্ড জোর মেরেছে বিষ্ণু। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, কাঁদিস না রে! তোর বেশী লেগেছে! কেন ওটা নিতে গেলি! আচ্ছা, আমি বিষ্ণুকে বকে দিচ্ছি! এই বিষ্ণু, তুই কি রে, এত জোরে কেউ মারে?

বিষ্ণুর তখনও রাগ কমেনি। ধমকে উঠে বললো, ওকে আরও মারা উচিত। ও আমার সব জিনিসে হাত দেয়!

রেণু জিভ দেখিয়ে বললো, ই-ই! মারো তো দেখি!

বিষ্ণু সত্যি সত্যি রেণুকে আবার মারতে গেল। আমি ওর হাত মুচড়ে ধরে বললাম, কি হচ্ছে কি?

রেণুটা অদ্ভুত মেয়ে। হঠাৎ কান্না থামিয়ে আমার হাতটা ঠেলে দিয়ে ঝংকার দিয়ে বললো, আমার দাদা আমাকে মেরেছে, তাতে তোমার কি? বেশ করবে মারবে! তুমি কেন আমার দাদাকে বকবে?

আমিও অবাক, বিষ্ণুও অবাক। বিষ্ণু হো হো করে হেসে উঠে বললো, দেখলি তো!

রেণু তারপরও আমাকে বললো, তুমি আমার দাদাকে খবরদ্দার বকবে না!

বিষ্ণু বললো, এই রেণু, তুই নিজে দুষ্টুমী করেছিস, আবার চোখ রাঙাচ্ছিস!

—বেশ করবো, আমার যা খুশী করবো!

—দিন দিন বড্ড অসভ্য হয়ে যাচ্ছিস! জ্যাঠাইমাকে বলে দেবো! বাদল তোকে কত গল্পের বই পড়ে শুনিয়েছে।

—ওসব গল্প আমি আগেই জানি!

—তুই ক্ষমা চা বাদলের কাছে। দোষ করলে ক্ষমা চাইতে হয়। বল্ আমি আর এরকম করবো না।

—আমি বলবো না। আমাকে আরও মারবে? মারো!

পরবর্তী জীবনে এই সব ঘটনার উল্লেখ করে কতবার রেণুকে রাগিয়েছি!

॥ ১৪ ॥

সূর্য ঘণ্টাখানেক ধরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালো উদ্দেশ্যহীনভাবে। যেন তার কোনো কাজ নেই, সে নগর দর্শনে বেরিয়েছে। কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, শিয়ালদা, আবার মানিকতলা ঘুরে সে মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের কাছে ব্ল্যাক স্কোয়ার-এর পাশে এসে দাঁড়ালো রেলিং-এ ভর দিয়ে।

তখন সকাল দশটা। এই সময় পথে বেশ ভিড় থাকে। ধুতির মধ্যে শার্ট গুঁজে, তার ওপর কালো কোট চাপিয়ে কেরানীবাবুরা হুড়োহুড়ি করে অফিস যায়। কারো পায়ে পাম্প শু-র সঙ্গে মোজা হাঁটু পর্যন্ত। ফেরিওলা, ঠেলাওলা, রিক্সাওয়ালাদের খালি গা। সামনেই একটা দশকর্ম ভাণ্ডারের গুড়ের হাঁড়ির মুখে কয়েক হাজার মাছি।

সূর্য এক পয়সার কড়াই-ভাজা কিনে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়ে মুখ দিয়ে

লুফে নিয়ে কটর মটর কর চিবোচ্ছে। প্রথমেশ বড়ুয়া 'মুক্তি'-ছবিতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মুড়ি খাওয়া দেখানোর ফলে সবাই তখন সেই অনুকরণে মুড়ি ছোলা খায়।

রাস্তা দিয়ে যত মানুষ যাচ্ছে, কারুর প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই সূর্যর। শুধু সে মাঝে মাঝে অভ্যেসবশত বাঁ হাতের কব্জির দিকে তাকালো। ঘড়ি দেখার জন্য, যদিও ঘড়ি নেই সেখানে। পার্কের অন্য দিকে বেশ ভিড় ও হৈ-হল্লা চলছে, একজন পকেটমার ধরা পড়েছে সেখানে—সূর্য সেদিকে যাওয়ার জন্য কোনো উৎসাহ বোধ করলো না।

খানিক বাদে একজন রোগা মতন লোক, গায়ে চাদর জড়ানো, সূর্যকে জিজ্ঞেস করলো, রাজবল্লভ পাড়াটা কোন্ দিকে বলতে পারেন?

সূর্য আন্দাজে হাত তুলে বললো, সে অনেকদূরে—ঐ দিকে!

—এক্ষুনি না গেলে চলবে না। কি করে যে যাই!

—আপনার কি সেখানে আর্জেণ্ট বিজনেস আছে?

—আমার মেজদা মরণাপন্ন!

—চলুন আপনার সঙ্গে আমি যাচ্ছি।

সূর্য ও সেই লোকটি পাশাপাশি হাঁটতে লাগলো। আর্জেণ্ট বিজনেস ও মেজদা মরণাপন্ন—এগুলো কোড। কিছু দূর যাবার পর সেণ্ট্রাল এভিনিউতে এসে রোগা লোকটি বললো, তুমি এখান থেকে সোজা খিদিরপুর চলে যাও। সেখানে বাজারের পাশে সিরাজুল তারিখ-এর ডেকরেটার্সের দোকান আছে। ওখানে গিয়ে তারিখ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বলবে, মেজদার অসুখ সেরে গেছে। তাহলেই তিনি তোমাকে চিনতে পারবেন। তখন উনি যা করতে বলবেন, সেরকম করবে।

সূর্য বললো, খিদিরপুরে কিভাবে যেতে হয়, আমি তো জানি না।

রোগা লোকটি এতক্ষণ পরে ভালো করে সূর্যর দিকে তাকালো। তারপর বললো, তুমি কি ব্ল্যাক স্কোয়ার আগে চিনতে?

সূর্য বললো, না।

—সেইরকম, খিদিরপুর কোথায়, সেটাও তোমাকে খুঁজে নিতে হবে।

—আজকেই যাওয়া দরকার?

—হ্যাঁ, ধর্মতলায় চলে যাও, ওখান থেকে খিদিরপুরের ট্রাম ধরবে। এই ধরো, এখান থেকে এক ঘণ্টা পরে পেঁৗছোলেই চলবে।

অকস্মাৎ কথা বলা শেষ করে লোকটি বাঁদিকে হাঁটতে আরম্ভ করলো। সূর্য হাঁটতে শুরু করলো তার বিপরীত দিকে। এটাই নিয়ম। আর একবারও পেছনে না তাকিয়ে সূর্য হেঁটে গেল অনেক দূর পর্যন্ত। তারপর একটা ট্যাক্সি ধরলো।

খিদিরপুরে একটা মাংসের দোকানের পাশে সিরাজুল তারিখ অ্যান্ড সন্সের ডেকরেটার্সের দোকান। একটা ঠ্যালাগাড়ি থেকে তেরপল আর চেয়ার নামানো হচ্ছে। দ্বিধা না করে দোকানের ভেতরে ঢুকে গল সূর্য। একজন ফর্সা টুকটুকে চেহারার লোক একমনে খাতায় হিসেব লিখছিলেন, সূর্য তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, তারিখ সাহেব আছেন?

লোকটি মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলেন, হুঁ, কি খবর?

সূর্য ফের জিজ্ঞেস করলো, তারিখ সাহেব আছেন কি?

লোকটি হিসেব শেষ করে ধীরে-সুস্থে খাতা বন্ধ করলেন। তারপর সূর্যর চেহারার দিকে চোখ রেখে বললেন, ওনার সঙ্গে আপনার কিছু দরকার আছে কি?

কি খবর?

সূর্য বলতে যাচ্ছিল যে তারিখ সাহেবের সঙ্গেই আমি কথা বলতে চাই, কিন্তু সেই সময় সে একাধিকবার 'কি খবর' এই প্রশ্নের মানে বুঝতে পারলো। এই লোকটিই তারিখ সাহেব। তখন সে তাড়াতাড়ি বললো, মেজদার অসুখ সেরে গেছে!

ফর্সা লোকটি উল্লসিত মুখে বললেন, সেরে গেছে? বাঃ, তাহলে আর চিন্তা কি! আসুন, ভেতরে আসুন!

দোকানের পেছন দিকে পর্দা টাঙানো, সেটা সরালে আর একটা ছোট ঘর। দিনের বেলাতেও সেখানে অন্ধকার। আলো জেবলে দিয়ে লোকটি বললেন, এই গরীবেরই নাম সিরাজুল। আপ তশরীফ রাখিয়ে, আরামসে বৈঠিয়ে। আরও আধ ঘণ্টা দেরি আছে। আমি একটু বাদেই আপনার জন্য এসে যাচ্ছি।

সেই ছোট ঘরে চুপচাপ বসে রইলো সূর্য। ঘরখানায় কাপ, ডিস, কাচের গেলাস—এই সবে ঠাসা। চেয়ারগুলো ভেলভেটে মোড়া সিংহাসনের মতন, সেইরকম একটা চেয়ারে সূর্য বসে আছে। বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো। আধ ঘণ্টা দেরি আছে, এর মানে কি? ঘরে একটা কোন কাগজপত্র নেই যে চোখ বুলানো যায়।

তারিখ সাহেব একটু বাদে দু' কাপ চা নিয়ে ফিরে এলেন। ঘরে আরও দুটি সিংহাসন টাইপ চেয়ার থাকতেও তিনি টেবিলের তলা থেকে একটা টুল বার করে তাতে বসলেন। চায়ে চুমুক দিলেন বেশ আবার করে। লোকটিকে দেখলেই মনে হয়, জীবন-রসে বেশ মজে আছেন। মুখে কোনো রেখা নেই। যে কটা দিন বেঁচে আছি, হাসিখুশিতে থাকা যাক, এইরকম একটা ভাব।

সূর্য চা খায় না। কিন্তু তারিখ সাহেব তাকে জিজ্ঞেস না করেই চা নিয়ে এসেছেন—এক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। সূর্য ভদ্রতা করে দু' একটা ছোট চুমুক দিল।

তারিখ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, আপনার উমর কত্ত হবে? সিক্সটিন? সেভেনটিন!

—সিক্সটিন।

—দেখুন, ঠিক ধরেছি। আমার একটা হোবি আছে কি জানেন, মানুষ দেখলেই আমি তাকে স্টাডি করি। বহুৎ জিনিস মিলে যায়। আচ্ছা, আপনার ফাদার কি রেল কোম্পানিতে নোকরি করেন?

সূর্য চুপ করে রইলো। এই সমস্ত কণ্ট্রাক্টে পরস্পরের কাছে পরিচয় দেওয়া নিষিদ্ধ, হরকুমার তাকে বারবার এই কথা বলে গেছেন। তারিখ সাহেবের আন্তরিক ব্যবহার সত্ত্বেও সে এই নিয়ম ভাঙতে পারে না। তারিখ সাহেবের প্রশ্নে সে অনায়াসেই ঘাড় নেড়ে দিলে ল্যাটা চুকে যেত—কিন্তু সূর্য তাও দিল না।

তারিখ সাহেব ওদিকে আর না গিয়ে অন্য প্রসঙ্গ তুললেন। বললেন, হরবাবুর ডেথ হয়ে গেল, এমন মানুষ আর মিলবে না! আপনি তার জন্য যা সেওয়া করেছেন—কোনো ছেলে তার বাপের জন্য এমন করে না!

সূর্যের মুখ ভাবলেশহীন। প্রশংসায় বিচলিত হবার ছেলে সে নয়। লাজুক, বিনীতভাবও তার মুখে ফোটে না।

—হরবাবুর মালপত্তর সব আপন হেপাজতে রেখেছেন তো?

—হরদা'র তো মালপত্তর কিছু ছিল না।

—ছিল না?

—আমি কখনো দেখিনি কিছু। একটার বেশী দুটো জামা ছিল না, মাদুরে শুতেন।

—একটা মাল ছিল।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর তারিখ সাহেব আবার বললেন, আপনি আমার ছোটো ভাইয়ের মতন। আপনি আমাকে জানেন না—আমি দাদালোকদের সঙ্গে বহুদিন ধরে কাম করছি। পুলিস আমায় ছুঁতে পারে না। এই বিজনেসটায় ওদের চোখের ধুলো দি। আমার টাকা-পয়সা সব আংরেজ হটাবার জন্য। আপনাকে আমি এল্ডার ব্রাদার হিসেবে অ্যাডভাইস করছি, আপনি বহুৎ ছেলেমানুষ, হরবাবুর মালটা আপনার কাছে রাখবেন না!

সূর্য উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই সময় যে ব্যক্তিটি ঢুকলো, তাকে দেখে সূর্য অবাক হয়ে গেল আরও বেশী। এই সেই রোগা লোকটি যার সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেই সূর্যর দেখা হয়েছিল পার্কের সামনে।

লোকটি একই জায়গায় আসবে, অথচ সূর্যকে সঙ্গে আনেনি। সূর্য এক ঘণ্টার অনেক আগেই এসে পৌঁছেছে।

তারিখ সাহেব খাতির করে বসালেন লোকটিকে? বললেন, শংকরবাবু, চা খাবেন?

শংকরবাবু হাতের ইঙ্গিতে বললেন, না। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, জিনিস পেয়েছেন?

—হ্যাঁ, কিছু কিছু।

—দেখি!

—এক্ষুনি দেখবেন?

—আমার বেশী সময় নেই।

—তারিখ সাহেব কাপ-ডিস ভর্তি র‍্যাকটা সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিলেন। উল্টোদিকে আর একটা র‍্যাক। সেখান থেকে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স এনে বললেন, এই নিন্। তিন ডজন।

শংকরবাবু বাক্সটা খুলে এক নজর দেখেই আবার বন্ধ করে দিলেন। বললেন, আর কিছু পেলেন না?

—না। বহুৎ টিকটিকির হুজ্জোৎ!

—কত দাম?

—সে আপনাকে ভাবতে হবে না।

—না, না, আপনি নিজে কত টাকা খরচ করবেন? আমার কাছে কিছু টাকা আছে—

—এখন থাক্।

শংকরবাবু এবার ফিরলেন সূর্যের দিকে। এতক্ষণ ওর সঙ্গে একটাও কথা বলেননি। এবার জিজ্ঞেস করলেন, হরদা'র জিনিসটা তোমার সঙ্গে এখন আছে?

সূর্য বললে, না।

—কাল এই রকম সময় ওটা এই দোকানে পৌঁছে দিয়ে যেও!

—হরদা ওটা আমার কাছেই রাখতে বলেছেন।

—তখন রাখার দরকার ছিল, আর নেই। এখন ওটা আমাদের দরকার।

—হরদা ওটা তো আমার কাছ-ছাড়া করতে বলেননি!

—ও জিনিসটা হরদার নিজের নয়। আমাদের দলের। আমাদের দলের প্রয়োজনে লাগবে।

—হরদা আমার ওপর ভার দিয়ে গেছেন ওটা কাজে লাগাতে।

শংকরবাবু এবার খানিকটা বিরক্ত হয়ে তাকালেন সূর্যর দিকে। কড়া গলায় বললেন,

হরদা তোমাকে আমার নির্দেশ মেনে চলতে বলেছেন কিনা?

—দলের নির্দেশ মানতে বলেছেন।

—আমিই দলের হয়ে কথা বলছি। আমরা ঐ জিনিসটা ফেরত চাই।

—কিন্তু হরদা আমাকে একটা বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। অন্য কারুর কথা শুনে আমি তা অগ্রাহ্য করতে পারবো না!

—তুমি ওটা দেবে না?

—না!

সূর্যর দিকে এক নজর তাকালেই বোঝা যায়, এ ছেলে কারুর কথায় নতি স্বীকার করবে না। ভয়-ডরের চিহ্নমাত্র এর মুখে নেই। এক হিসেবে সূর্যকে খানিকটা নির্বোধও বলা যায়, কারণ পরিস্থিতি অনুযায়ী কৌশল অবলম্বন করার মনোবৃত্তিও তার নেই। গোঁয়ারের মতন বিপদের ঝুঁকি নেওয়াই তার শখ।

চলে আসার জন্য সূর্য চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াতেই অপর দু'জন বললেন, বসো, বসো! ব্যস্ত হচ্ছো কেন?

সূর্য বসলো না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

তারিখ সাহেব ও শংকরবাবু আরও কিছুক্ষণ ধরে নানাভাবে সূর্যর কাছ থেকে হরকুমারের পিস্তলটা আদায় করার চেষ্টা করলেন। সূর্যকে একটুও বাঁকানো গেল না।

শংকরবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, শিগ্‌গিরই একটা বড় অ্যাকশন শুরু হবে—আমাদের এখন অস্ত্র বিশেষ দরকার!

কার্ডবোর্ডের বাক্সটা খুলে সূর্যকে দেখিয়ে বললেন, এই দ্যাখো, তারিখ সাহেব আমাদের টোটা যোগাড় করে দিয়েছেন। শুধু শুধু জিনিসটা তোমার কাছে আটকে রাখছো। ঠিক আছে, তোমাকেই একটা অ্যাকশানে পাঠাবো—তুমি পারবে?

তারিখ সাহেব বললেন, শংকরবাবু, এ তো একদম লেড়কা, একে ছেড়ে দিন! আর একটু বড় হোক।

—ও নিজেই তো কারুর কথা শুনতে চাইছে না!

—তা হোক, তবু আপনি দুসরা কারুকে পাঠান।

শংকরবাবু স্থির নয়নে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, ওকে শেষবারের মতন বলছি, ও যদি কাল দুপুরের মধ্যে জিনিসটা এখানে দিয়ে যায়—ওকে এবারের মতন ছেড়ে দিতে পারি। কি দেবে?

—না!

—তাহলে তুমি যেতে রাজী?

—হ্যাঁ।

—ঠিক আছে, তোমাকে চন্দননগরে যেতে হবে। সেখানে আমাদের বাড়ি ঠিক করা আছে, আপাতত কয়েকদিন সেখানে লুকিয়ে থাকবে। যথাসময়ে আমাদের নির্দেশ পাবে।

—কবে যেতে হবে?

—কাল! কিংবা ধরো পরশু?

—কালই যাবো।

শংকরবাবু তারিখ সাহেবের দিকে ফিরে বললেন, তারিখ সাহেব, এক গেলাশ পানি খাবো।

ইঙ্গিত বুঝে তারিখ সাহেব বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। শংকরবাবু তখন বললেন, কাল ঠিক দেড়টার সময় হাওড়া স্টেশনে ঘড়ির নিচে দাঁড়িয়ে থাকবে। সেখান থেকেই

একজন লোক তোমাকে নিয়ে যাবে চন্দননগরে। কালকে তোমার কোড হবে জিনিস আর দাম। ওদিকে কোড হবে মূল্যে আর বাঁধাকপি। চন্দননগরে কেউ তোমার নাম জিজ্ঞেস করলে, তুমি বলবে, তোমার নাম অমর। অমর পালিত কিংবা লাহিড়ী। তুমি বেকার, তোমার মাসিমার বাড়িতে বেড়াতে গেছ। ফরাসী চন্দননগর ছাড়া ইংরেজ চন্দননগরে কখনো পা দেবে না! ঠিক আছে?

সূর্যর একবার মনে হলো তার বাবার নাম অমর, সুতরাং এই ছদ্মনাম তার পক্ষে নেওয়া ভালো দেখায় না। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করলো না। নামে কি আসে যায়?

॥ ১৯ ॥

শ্রীলেখার সঙ্গে যে সূর্যর মেলামেশা বারণ হয়ে গেছে, সেটা বুঝতেই সূর্যর দিন সাতেক লেগে গেল। সে অধিকাংশ সময়েই নিজেকে নিয়ে মশগুল থাকে কিংবা বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ হঠাৎ তার শ্রীলেখার কথা মনে পড়ে।

স্নান করে এসে সূর্য চিরুনি পাচ্ছে না। খানিকটা এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করেই সে বিরক্ত হয়ে গেল। তখন মনে পড়লো শ্রীলেখার কথা। দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাঁক দিল, শ্রীলেখা—!

কোনো সাড়া নেই। দুপুরবেলা সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। নিচ তলায় কাঠের মিস্তিরি শুধু ঘ্যাস ঘ্যাস করে র‍্যাঁদা চালাচ্ছে।

ছাদের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো বাদল। হাতে ঘুড়ি আর লাটাই। রোদ্দুরে মুখ-চোখ লাল।

সূর্য বললো, এই বাদল, তোর বড়দিকে ডাক তো!

বাদল এখন কথার অবাধ্য হতে শুরু করেছে। সে এখন সেই বয়েসে এসে পৌঁচেছে, যখন একলা একলা কথা বলে বেশ সময় কেটে যায়। দেয়ালের জলের দাগে সে দেখতে পায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দৃশ্য, বাঁখারির তীর ধনুক নিয়ে সে সেই দেয়ালের পাশে অর্জুন হয়ে দাঁড়ায়। একতলার নোনা-ধরা থামটাকে সে হিরণ্যকশিপু মনে করে কোমরের বেল্ট খুলে চাবুক মারে। সিঁড়ির রেলিং-এ উঠে সরসর করে নামতে নামতে সে পক্ষীরাজ ঘোড়া চালিয়ে উড়ে যায় মায়াবতী রাজকন্যার দেশে। শিগগিরই সে কোনো জাহাজে আলু-পেঁয়াজের খোশা ছাড়াবার চাকরি নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় যাবে। তারপর একদিন কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস হয়ে ফিরে আসবে। ডক্টর লিভিংস্টোনের মতন সেও আফ্রিকার জঙ্গলে...।

সূর্যর কথা শুনে সে হালকাভাবে ছড়িয়ে দিল, বড়দি, তোমায় ডাকছে—এ-এ-এ! তারপর তরতর করে নেমে গেল একতলায়। তার এখন অনেক কাজ।

সূর্য একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো দরজার সামনে। আবার ডাকলো, শ্রীলেখা—! এবারও কোনো সাড়া নেই। তার ভুরু কুঁচকে গেল। শ্রীলেখাকে তো ডাকতে হয় না, তার দরকারের সময় শ্রীলেখাকে সব সময়েই কাছে কাছে পেয়েছে। কিছু যে একটা গোলমাল হয়েছে—সূর্য তাও বুঝলো না, সে আরও বেশী রেগে যেতে লাগলো।

ঘর ছেড়ে সূর্য এগিয়ে গেল বারান্দা দিয়ে, অন্যপ্রান্তে শ্রীলেখাদের ঘরেব দিকে। ধুতিটা ভাঁজ করে লুঙ্গির মতন পরা, খালি গা, মাথায় ভিজে চুলগুলো কপালে এসে পড়েছে।

বাড়িতে বয়স্ক পুরুষরা কেউ উপস্থিত নেই, দুপুরের আহারের আগে মেয়েরা এক জায়গায় বসে বিশ্রম্ভালাপ করছে। বাদলের মা, তার জ্যাঠাইমা, শ্রীলেখা, সান্ত্বনা। সান্ত্বনা টেনে টেনে আঁচড়ে দিচ্ছে তার মায়ের চুল। শ্রীলেখার হাতে শেলাইয়ের সরঞ্জাম। কি কথা নিয়ে যেন বেশ হাসাহাসি হচ্ছিল, দরজার কাছে সূর্যকে দেখে সবাই হঠাৎ এক সঙ্গে থেমে গেল।

সূর্য ডাকলো, শ্রীলেখা, শোন!

শ্রীলেখা কোনো উত্তর না দিয়ে তার মায়ের দিকে তাকালো। শ্রীলেখার মা বললেন, সূর্য, তোমার চান হয়ে গেছে? তুমি আগে খেয়ে নেবে নাকি?

সূর্য বললো, একটু পরে।

শ্রীলেখার মা তখন শ্রীলেখা আর সান্ত্বনার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই, তোরা চান করতে গেলি না! যা, যা! কত বেলা হয়ে গেল।

শ্রীলেখা শেলাইয়ের জিনিসপত্তর রেখে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। আলনা থেকে নিতে গেল টাটকা শাড়ী-সায়া।

সূর্য আবার ডাকলো, এই শ্রীলেখা!

শ্রীলেখা উত্তর দিল না, ফিরেও তাকালো না।

সূর্য তখন ঢুকে এলো ঘরের মধ্যে। ঘরের অন্য কারুর মুখের ভাব-ভঙ্গি লক্ষ্য করার অবকাশ তার নেই। শ্রীলেখার হাত চেপে ধরে সূর্য নিষ্ঠুরের মতন বললো, তখন থেকে ডাকছি, শুনতে পাচ্ছিস না?

শ্রীলেখা অন্যদিকে তাকিয়েই আস্তে আস্তে বললো, কি বলবে, বলো না।

—আমার ঘরে চল্।

—আমি এখন চান করতে যাবো!

—দু' মিনিট পরে গেলে কি হয়?

সূর্য প্রায় হিড়হিড় করেই টানতে টানতে নিয়ে গেল শ্রীলেখাকে। ঘরের অন্য সবাই প্রায় এক মিনিট নীরবে বসে রইলেন। দুই মা চোখাচোখি করলেন কয়েকবার। সান্ত্বনা আস্তে আস্তে উঠে গেল।

শ্রীলেখার মায়ের মুখে স্পষ্ট একটা বিষাদের রেখা। সূর্যর প্রতি তাঁর মনে বেশ খানিকটা দুর্বলতা ছিল। তাঁর নিজের পুত্র-সন্তান নেই। গোড়া থেকেই এই অদ্ভুত স্বভাবের বালকটির প্রতি স্নেহের টান ছিল তাঁর। কিন্তু মাতৃস্নেহের স্বাদ সূর্য কখনো পায়নি বলে সে ওসব তোয়াক্কাও করে না। এ বাড়িতে দুই মামীমা যখন তাকে আদর যত্ন করেছে, সে মনে করেছে, এ সবই সামাজিক নিয়ম, স্বাভাবিকভাবেই তার প্রাপ্য। স্নেহ নিম্নগামী, সহজে তাতে ভাটা পড়ে না—সূর্যর দু'একটা রূঢ় ব্যবহার সত্ত্বেও শ্রীলেখার মা তাকে স্নেহচ্ছায়া দিতে চেয়েছেন।

সূর্য ও শ্রীলেখাকে জড়িয়ে কানাঘুষো শুরু হবার পর তিনি প্রথম প্রথম এটাকে প্রবলভাবে অস্বীকার করেছেন। প্রশ্রয়ের সুরে বলেছেন, ওরা তো ছেলেমানুষ, ওরা কি এসব কিছু বোঝে? সূর্য শ্রীলেখাকে যখন-তখন ডাকে, শ্রীলেখা সূর্যর ঘরেই দিনরাত পড়ে থাকে—এসবেও তিনি কোনো দোষ দেখতে পাননি। পিঠোপিঠি বয়সের ভাইবোন, ওদের মধ্যে যেমন ঝগড়াও বেশী হয়, ভাবও বেশী হয়।

কেউ যখন মনে করিয়ে দিয়েছে যে, সূর্য শ্রীলেখার আপন পিসতুতো ভাই নয়, এই সম্পর্কের মধ্যে অনেক গোলমাল আছে—তখনও তিনি বলেছেন, আহা, ওরা তো সেসব জানে না! ওরা তো ভাই বোন বলেই জানে?

একদিন তাঁর চোখে পড়েছিল, সূর্য শ্রীলেখাকে পাঁজাকোলে করে তুলে ধরেছে, শূন্যে ছুঁড়ে দেবার ভয় দেখাচ্ছে—আর শ্রীলেখা পড়ে যাবো, পড়ে যাবো—বলে হাত-পা ছুঁড়ছে। সূর্য তাকে মাটিতে নাবিয়ে দেবার বদলে আরও কাছে এনে নিজের মুখটা ডুবিয়ে দিলে শ্রীলেখার বুকে।

এই ঘটনা ঘটেছিল একতলা ও দোতলার মাঝখানে সিঁড়িতে। একতলা থেকে উঠতে গিয়েও শ্রীলেখার মা থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। দেখিনি দেখিনি ভাব করে চলে গিয়েছিলেন অন্যদিকে। মনকে বুঝিয়েছিলেন, ওরা তো অবোধ, ওরা তো বুঝে-সুঝে কিছু করছে না। পাপ মনে করলেই পাপ। ব্যাপারটার মধ্যে গোপনীয়তার বিন্দুমাত্র চেষ্টা ছিল না বলেই তাতে পাপের স্পর্শ লাগে নি। তিনি ভেবেছিলেন, চোখে আঙুল দিয়ে ওদের এখন বুঝিয়ে দেওয়াটাই খারাপ হবে। দু'দিন বাদে মেয়েটার বিয়ে হয়ে চলে যাবে অন্যের বাড়িতে—।

মা হয়েও তিনি মেয়েকে কখনো শাসন করেননি। আভাসে ইঙ্গিতে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, শ্রীলেখাকে সব সময় অন্য কাজে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করেছেন। নিজের মেয়ে সম্পর্কে তাঁর ভয় ছিল না, তাঁর ভয় ছিল অন্যের নিন্দার। বিশেষ করে তাঁর ছোট জা, অর্থাৎ বাদলের মা, বেশ নীতিবাগিশ! এমনিতে শ্রীলেখার মায়ের বেশ ঝগড়া করার অভ্যেস আছে, কিন্তু বাদলের মা এই প্রসঙ্গ তুললে যে তাঁর ঝগড়া করারও মুখ থাকবে না!

শ্রীলেখার সঙ্গে সূর্যর মেলামেশা বন্ধ হয়েছিল প্রিয়রঞ্জনের হুকুমে। তাঁর চোখে কি পড়েছিল কে জানে, রাত্তিরবেলা তাঁর স্ত্রীকে অত্যন্ত কড়া গলায় বলেছিলেন, তোমার মেয়ে দিন দিন ধিঙ্গি হচ্ছে, তুমি দেখতে পাও না? সুয্যির সঙ্গে সব সময় ওর অত কি? বিয়ের যুগ্যি মেয়ে, পাঁচজন পাঁচ কথা বললে তোমার ভালো লাগবে? ও ছেলেকে আমার মোটেই পছন্দ হয় না! ধরন-ধারণটাই অদ্ভুত!

সুপ্রভা তখন সূর্যর পক্ষ সমর্থন করেই বলেছিলেন, সূর্যর ব্যবহার তো চমৎকার, কোনোদিন মুখ তুলে কথাটি বলে না পর্যন্ত!

—ওসব ওর শয়তানী! অজাত কুজাতকে কেউ কখনো বিশ্বাস করে?

সুপ্রভা তবু প্রতিবাদ করে বললেন, নিজের মেয়েকে ঘরে আটকে রাখতে চাও, রাখো, তা বলে সূর্যর দোষ দিও না! ও কি জানে, কি বোঝে? মা-হারা ছেলে—

এক একজন নারীর এরকম বদ্ধমূল বিশ্বাস থাকে যে পুরুষ-ছেলেরা কখনো কোনো দোষ করে না। দোষ করলেও তা তাদের স্পর্শ করে না। যারা কষ্ট করে লেখাপড়া শেখে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগার করে সংসার চালায়—তাদের কি এইসব ছোটখাটো দোষ ধরলে হয়!

প্রিয়রঞ্জন সাফ হুকুম দিয়ে রাখলেন, খুকীকে যেন কক্ষনো আর ওর সঙ্গে কথা বলতে না দেখি। এই আমি বলে দিলাম—।

সুপ্রভা বলেছিলেন, এক বাড়িতে থেকে কি আর একেবারে কথা না বলে থাকতে পারে? তুমি বরং তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করো। বয়েসও তো ষোলো হয়ে গেল। আর দেরি করলে লোকে বলবে কি? এরপর কি আর পাত্তর পাওয়া যাবে!

সূর্য শ্রীলেখার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবার পর বাদলের মা হিমানী বললেন, দিদি, তুমি বারণ করলে না?

সুপ্রভা উত্তর না দিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কি আর বলবো! ও ছেলে কি কারুর কথা শুনবে? তোরা যাই বলিস,

ছেলেটার ষোলো না সতেরো বছর বয়েস হয়েছে বটে, কিন্তু মনে মনে ও একেবারে শিশু!

হিমানী ঈষৎ কূটনৈতিকভাবে বললেন, যাই বলো, ওর মতিগতি সুবিধের নয়। আমি তো আমার মেয়ের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করতে বারণ করে দিয়েছি!

সুপ্রভা বললেন, আমার মেয়ে আর ক'দিনই বা আছে! পাইকপাড়ার এক পাত্তর পক্ষ মোটামুটি রাজিই হয়ে গেছে। সোনা চাইছে তিরিশ ভরি, নগদ আড়াই হাজারের কম না—

সূর্য শ্রীলেখাকে নিজের ঘরে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, আমার চিরুনি কোথায়?

শ্রীলেখা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঝাঁঝালো ভাবে উত্তর দিল, আমি তার কি জানি?

সূর্য চোখ গরম করে বললো, চিরুনি না থাকলে আমি চুল আঁচড়াবো কি করে? খুঁজে দ্যাখ!

শ্রীলেখা একটু খুঁজতেই আলমারিরর তলা থেকে পেয়ে গেল চিরুনিটা। কোনো কথা না বলে সেটা বাড়িয়ে দিল সূর্যর দিকে। সূর্য সেটা নিল না, এক দৃষ্টে শ্রীলেখার দিকে তাকিয়ে রইলো। সে ধরেই নিয়েছিল, শ্রীলেখা তার চুল আঁচড়ে দেবে!

শ্রীলেখা সূর্যর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বললো, নাও!

সূর্য চিরুনিটা নিয়েই আয়নার দিকে মুখ ফেরালো। পাথরের মূর্তির মতন মুখ। চুল সুবিন্যস্ত করেও সে আয়নার সামনে থেকে সরে এলো না।

শ্রীলেখা জিজ্ঞেস করলো, আমি যেতে পারি?

—হ্যাঁ, যেতে পারো। তার আগে আমার জিনিসটা দিয়ে যাও!

—কোন জিনিসটা?

—যেটা তোমার কাছে রাখা আছে!

শ্রীলেখার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করেও পারলো না। ছুটে এসে সূর্যর বুকে গুমগুম করে কিল মেরে বলতে লাগলো, তুমি কি! তুমি কিছু বোঝ না কেন! কেন বুঝতে পারো না!

সূর্য দেখলো শ্রীলেখা কাঁদছে। এতক্ষণ বাদে সূর্যর মুখে হাসি ফুটলো। হাসবার সময় তাঁর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে। থুতনিতে আঙুল দিয়ে সে তুলে ধরলো শ্রীলেখার ঘাম ও কান্নায় ভেজা মুখ। সূর্য শুধু ঘাম ও কান্নাই দেখলো, দেখলো না ভয়, দ্বিধা, অনুরাগ ও ব্রীড়ায় মেশা এক অদ্ভুত বর্ণ ছড়িয়ে আসে সেই মুখে।

স্নানের আগে চুল খুলছে শ্রীলেখা। আঁচল আলুথালু। ব্রেসিয়ার তখনও তেমন চালু হয়নি বলে ব্লাউজের নিচে একটা কাপড়ের ফালি দিয়ে তার বুক বাঁধা। সেই বন্ধন থেকেও উপচে উঠেছে তার নতুন স্তন। সূর্যর চোখ গেল সেদিকে। হেঁটে ঝরনা পার হবার সময় মানুষ যেমন হঠাৎ রুপালি মাছ দেখতে পায় কিংবা রাস্তায় হঠাৎ কুড়িয়ে পায় সোনার আংটি, সূর্যর চোখে সেই ধরনের বিস্ময়। কোনো দ্বিধা না করে সে এক হাতে কোমর জড়িয়ে অন্য হাত রাখলো শ্রীলেখার বুকে।

শ্রীলেখা চকিতে দরজার দিকে তাকিয়ে ছিটকে সরে এলো। তীব্র চাপা গলায় বললো, কি হচ্ছে কি? তুমি—

সদা গম্ভীর সূর্যর হাসিমাখা মুখখানা এখন সত্যিই শিশুর মতন। জ্ঞানোন্মেষের আগে শিশু যেমন আগুনে হাত দেয়, সেইভাবে সূর্য এগিয়ে শ্রীলেখাকে আবার ধরলো। কোনোরকম বাধা পাবার আগেই সে একটানে ছিঁড়ে ফেললে শ্রীলেখার বুকের জামা। বললো, আমি তোমার সবটা দেখবো!

শ্রীলেখার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত অন্তর্হিত। হাত দু'খানা বুকের কাছে জড়ো করে সে যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে, তার আর কথা বলারও ক্ষমতা নেই। ঘন ঘন শুধু তাকাচ্ছে সে দরজা ও জানলার দিকে। এদিকে কেউ এলে জানলা দিয়ে প্রথমে দেখা' যাবে।

অরণ্য-প্রাণীর মতন সূর্য শ্রীলেখার কাঁধ ও বুকের কাছে মুখ এনে গন্ধ শুঁকতে লাগলো। সে এখন খুবই উৎফুল্ল। তার বিমর্ষ গম্ভীর ভাবটি কোথায় মিলিয়ে গেছে। এখন একটা দারুন খেলা পেয়ে গেছে সে।

একটুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে শ্রীলেখা দূরে সরে গেল। আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো, আমি আর তোমার সঙ্গে কোনোদিন কথা বলবো না! তুমি এরকম?

অবিকল দেড়-দু' বছরের বাচ্চার মতন হি হি করে হেসে সূর্য বললো, কেন, কি করেছি? আমি তো শুধু সবটা দেখতে চেয়েছি!

শ্রীলেখা আর কোনো কথা না বলে চলে যাচ্ছিল, সূর্য দরজা আটকে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলো, কেন, কি হয়েছে কি? আমারও তো খালি গা!

—আমি তোমার সঙ্গে আর একটাও কথা বলতে চাই না।

সূর্য একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো, হাসি মুছে গেল মুখ থেকে, আবার ভুরু কুঁচকে গেল। কোনো ব্যাপার সে পুরোপুরি বুঝতে পারলেই এরকম হয়। দরজা ছেড়ে দিয়ে বললো, শোন, আমি এক্ষুনি খেয়ে নিয়ে বেরুবো। আমার জিনিসটা আমাকে দিয়ে যা!

শ্রীলেখা সূর্যর পাশ দিয়ে গলে গিয়ে দরজার বাইরে দাঁড়ালো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবে? জিনিসটা দিয়ে কি হবে?

—দরকার আছে। শিগ্‌গির নিয়ে আয়।

—ওটা আমি দেবো না।

হরকুমারের নির্দেশ ছিল, রিভলবারটা সূর্যর নিজের কাছে রাখা চলবে না। যে-কোনো সময় পুলিস তাকে সার্চ করতে পারে—যদি হরকুমারের সঙ্গে তার যোগাযোগের সন্ধান পায়। সেইজন্যই বিশ্বস্ত কারুর কাছে জমা রাখার কথা। এ পর্যন্ত শ্রীলেখাই ছিল সূর্যর কাছে একমাত্র বিশ্বস্ত আপনজন।

রিভলবারটা রাখার সময় শ্রীলেখা ভয় পেয়েছিল, নিজের জন্য নয়, সূর্যর জন্য। এ ধরনের সাংঘাতিক জিনিস নিয়ে সূর্য নাড়াচাড়া করে—একথা সে ভাবতেই পারেনি। ঐটুকু বয়েসের অভিজ্ঞতায় সে বুঝেছে, এ সব জিনিস যাদের কাছে থাকে—তাদের নিজেদের প্রাণই যে-কোনো সময় বিপন্ন হতে পারে। নিরস্ত্র লোকেরাও বিপদে পড়তে পারে—কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রাণের ঝুঁকি থাকে সশস্ত্র মানুষের। শ্রীলেখা তখনই ঠিক করেছিল, সূর্যকে ওটা কখনো ফেরত দেবে না।

সূর্য এক ধমক দিয়ে বললো, যা এক্ষুনি, নিয়ে আয়!

শ্রীলেখা স্থিরভাবে উত্তর দিল, ওটা আমার কাছে নেই। আমি ফেলে দিয়েছি।

সূর্য আর দ্বিরুক্তি করলো না, খপ করে শ্রীলেখার টুঁটি চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, কি? কোথায় ফেলে দিয়েছিস?

শ্রীলেখা এবার ভয় পেল না। আবার দরজা পেরিয়ে ঘরে ঢুকলো। সূর্যর গায়ের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে বললো, মারবে আমাকে? মারো! আমি দেবো না!

ছেঁড়া জামা ও আঁচল ভেদ করে ফুটে উঠেছে শ্রীলেখার নবোদ্ভিন্ন বুক, তার

সুকুমারী শরীরখানি এখন সূর্যের আয়ত্তের মধ্যে। কিন্তু সূর্যর আর সেদিকে মনোযোগ নেই। দারুণ উৎকণ্ঠিতভাবে সে বললো, আমাকে একটু বাদেই যেতে হবে। শ্রীলেখা, কি করছিস কি ছেলেমানুষী?

—কোথায় যাবে?

—যেখানেই যাই না কেন—

—আমাকে বলবে না! আমি যদি ওটা না দিই, তুমি কি করতে পারো? চ্যাঁচামেচি করবে?

সূর্য এটুকু অন্তত বোঝে, চ্যাঁচামেচি করে কোনো সুবিধে হবে না। ঐ জিনিসটার কথা সবাইকে জানানোর প্রশ্নই ওঠে না। সূর্য যেন একটা ফাঁদে পড়েছে—এই রকম অসহায় বোধ করলো। এর আগে তার একবারও মনে হয়নি, শ্রীলেখার কাছ থেকে রিভলবারটা আদায় করা এত কঠিন হবে। এ পর্যন্ত শ্রীলেখাকে সে যা হুকুম করেছে, সবই শুনেছে। হঠাৎ তার ব্যবহার একেবারে অন্যরকম। কিন্তু খানিকটা বাদেই তাকে তৈরী হয়ে যেতে হবে হাওড়া স্টেশনে—সে যদি যেতে না পারে, তাকে কাপুরুষ বলবে সবাই! হরকুমারের আত্মা তাকে অভিশাপ দেবে না?

সূর্য দাঁতে দাঁত ঘষে বললো, না দিলে তোকে মেরে ফেলবো!

—মেরে ফ্যালো, তাহলেও ওটা পাবে না!

শ্রীলেখার চুল মুঠো করে ধরে সূর্য বললো, তুই আমাকে চিনিস না! আমি সত্যিই মেরে ফেলতে পারি!

শ্রীলেখা বললো, তুমি ওটা নিয়ে অন্য কারুকে মারতে যাবে তো? তার বদলে আমাকেই মারো।

সূর্য কখনো যা করে না, নরম হয়ে অনুনয় করে বললো, শ্রীলেখা, প্লীজ! গীভ মি ব্যাক মাই গান! এটা ছেলেখেলা না!

—সূর্যদা, তুমি কেন মরতে চাইছো?

—আমি মরবো কেন? মরা অত সহজ নয়!

—কিন্তু এতে তোমার কোনো বিপদ নেই?

—কিছু না! আমার কিছু হবে না। আমি ঠিক ফিরে আসবো।

—আমি যদি তোমার ওটা না দিই?

সূর্য শ্রীলেখার চুল ছেড়ে দিল। আলনার কাছে জামা পরবার জন্য গিয়ে অত্যন্ত শক্ত গলায় বললো, তা হলে আমি এক্ষুনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। আর কোনোদিন ফিরবো না। আমাকে তোরা আর কখনো দেখতে পাবি না!

॥ ২০ ॥

হাওড়া স্টেশনে সূর্যর সঙ্গে সাংকেতিক কথা বলে দেখা করলো একজন দাড়ি-গোঁফওয়ালা যুবক। মাথায় বাবরি চুল, সাধু সন্ন্যাসীদের মতন মাঝখান দিয়ে সিঁথি-কাটা। মুখ ভর্তি পান। আধময়লা ধুতি ও মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি। তাকে দেখলে কোনো মন্দিরের পাণ্ডা মনে হয়।

যাবার কথা চন্দননগরে, যুবকটি তাকে নিয়ে গেল বর্ধমান। ট্রেনে একটি কথাও হলো না। বর্ধমান স্টেশনে নেমে যুবকটি একখানা মস্তবড় তরমুজের আধখানা কিনে

ফেললো। তার এক টুকরো সূর্যকে দিয়ে বললো, খাও-না, বেশ সরেস জিনিস! পেট ঠাণ্ডা হয়।

যুবকটি তার দাড়ি ও জামা রসে মাখামাখি করে বেশ তারিয়ে তারিয়ে খেল তরমুজ। পথে-ঘাটে দাঁড়িয়ে কিছু খাওয়ার অভ্যেস সূর্যের নেই। তা ছাড়া হাতে রস লেগে যাওয়া তার পছন্দ নয়। আলতোভাবে যতটুকু সম্ভব খেয়ে নিল—যেন এটাও তার কর্তব্যের অঙ্গ।

তারপর যুবকটি ফেরিওয়ালার কাছ থেকে দু খিলি পান কিনে এক খিলি সূর্যের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, নাও!

সূর্য বললো, আমি পান খাই না।

—খাও না? তা বেশ।

বিনা বাক্যব্যয়ে সে দ্বিতীয় খিলিটাও মুখে পুরে দিল। তারপর লাইনের ধারে গিয়ে পিক ফেলে এসে বললো, তোমাকে দিন সাতেক বাড়ির বাইরে থাকতে হবে। পারবে?

—পারবো।

—তা বেশ! আমার নাম হলো গে যোগানন্দ আচার্য্যি। তোমার নামটি কি ভাই? সূর্য বললো, আমার নাম অমর পালিত।

—তা বেশ! তুমি রান্না করতে জানো?

সূর্য একটু থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, রান্না?

যোগানন্দ এবার পান খাওয়া ঠোঁটে এক গাল হেসে বললো, তোমার ওপরে ভাই ভার পড়েছে রান্না করার! রান্না না জানলে যে তোমাকে না খেয়ে থাকতে হবে!

সূর্য কোনো উত্তর দিল না। হরকুমার তাকে দেশের কাজ করার জন্য দীক্ষা দিয়েছিলেন—এর সঙ্গে রান্না করার কি সম্পর্ক?

যোগানন্দ জিজ্ঞেস করলো, তুমি বর্ধমান টাউনে আগে এসেছো? আসোনি? চলো, তা হলে টাউনটা একটু ঘুরে দেখা যাক্।

ঘণ্টা খানেক ওরা ঘুরলো বর্ধমানের রাস্তায়। যোগানন্দ বেশ পেটুক ধরনের। একটু আগে অতখানি তরমুজ খেয়েও তার আশ মেটেনি, রাজবাড়ির গেটের কাছে একটা দোকানে গরম গরম তেলেভাজা হচ্ছে দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়লো। কিনে ফেললো এক গাদা বেগুনি, আলুর চপ। খানিকটা বাদেই সে দাঁড়ালো আবার একটা শরবত-এর দোকানের পাশে। এর স্বভাবটা যেন ন্যালাখ্যাপা ধরনের, স্বার্থত্যাগী দেশকর্মী বলে মনেই হয় না।

ফিরতি ট্রেন ধরে ওরা চন্দননগরে পৌঁছোলো সন্ধ্যের পর। বোড়াই চণ্ডীতলায় একটা মুদিখানায় ঢুকে যোগানন্দ কি যেন কথা বললো, তারপর হাঁটতে হাঁটতে শহর ছাড়িয়ে চলে এলো হলদে ডাঙায়। অন্ধকার, ফাঁকা মাঠের মধ্যে একটা মস্ত বড় দোতলা বাড়ি, দেখলে ভূতুড়ে বাড়ি মনে হয়। গাড়ি-বারান্দার পর চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে। যোগানন্দ পকেট থেকে চাবি বার করে সদর দরজার তালা খুললো, তারপর নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে দুজনে ঢুকলো ভেতরে। যোগানন্দ দেশলাই জ্বালতে দেখা গেল সরু বারান্দার পর একটা সিমেণ্ট বাঁধানো চাতাল, তার মাঝখানে তুলসী মঞ্চ। তুলসী মঞ্চের ওপর প্রদীপ বসানোই ছিল, সেটা জ্বালিয়েই দিয়ে যোগানন্দ বললো, এবার হ্যারিকেন খুঁজতে হবে!

হ্যারিকেন পাওয়া গেল বারান্দাতেই, সেটা নিয়ে ওরা উঠলো দোতলায়। বেশ বড়

সাইজের পাঁচ ছ' খানা ঘর—ওরা চলে এলো বাড়ির একেবারে পিছন দিকের ঘরটায়—সঙ্গে ব্যালকনি আছে। সেই ঘরের মেঝেতে খান-কয়েক মাদুর ছড়ানো, একটা কুঁজো, কিছু হাঁড়ি-কড়াই-বাটি।

হ্যারিকেন নামিয়ে রেখে যোগানন্দ বললো, এখানে তোমাকে থাকতে হবে। ভূতের ভয় নেই তো? পারবে একলা থাকতে?

সূর্য ভয় পায়নি, সে বেশ রোমাঞ্চিতই বোধ করছে। এত বড় একটা বাড়ি তার একার জন্য, এটা কি কম কথা?

যোগানন্দ বললো, এ বাড়িটা মানকুণ্ডুর বিশ্বাসবাবুদের। তাদের নায়েবের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছে ননীমাধব সান্যাল। উনি তোমার মেসোমশাই হন। লোকে জিজ্ঞেস করলে বলবে, তোমার মাসি আর মেশোমশাই পাটনায় বেড়াতে গেছেন—দু-চারদিনের মধ্যেই আসবেন। তুমি জগদ্দল, কাঁকনাড়া, গোঁদলপাড়া—এই সব জায়গায় জুট মিলে চাকরি খুঁজতে এসেছো! বুঝলে? রাত্তিরবেলাটা পারতপক্ষে ফরাসী এলাকার বাইরে থেকো না!

সূর্য জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু আমার আসল কাজটা কি?

—সেটা আমিও জানি না। জানতে পারবে ঠিক সময়ে। নাও, জামাটামা খুলে ফেল। আজকের রাতটা আমিও তোমার সঙ্গে থাকবো!

যোগানন্দ তার পাঞ্জাবি ধুতি খুলে ফেলে শুধু আণ্ডারওয়্যার পরে মাদুরে বসলো। সূর্য তাকিয়ে দেখলো, যোগানন্দর সাংঘাতিক ভালো স্বাস্থ্য। রীতিমতন ব্যায়াম না করলে এরকম স্বাস্থ্য হয় না। তবে, যোগানন্দর পিঠে অনেকগুলো লম্বা লম্বা কালসিটে দাগ। যোগানন্দ সম্পর্কে সূর্যর মনে এখন একটু একটু শ্রদ্ধা জাগছে। জিজ্ঞেস করলো, পিঠে ঐ দাগগুলো কিসের?

যোগানন্দ ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিয়ে বললো, কিছু না! শ্যামনগরে যেবার ধরা পড়লাম, থানার দারোগা খুব টেঁটিয়া ছিল।

—আপনি জেল খেটেছেন?

—বছর চারেক আটকে রেখেছিল।

—হরদাকে চিনতেন?

—হরদাই আমার গুরু। উনিই আমাকে এ লাইনে এনেছেন।

—আমাকেও।

—জানি।

—আমারও জেলের ভেতরটা একবার দেখতে ইচ্ছে করে।

—এত তাড়াতাড়ি কিসের? একদিন না একদিন যেতেই হবে।

যোগানন্দ আবার উঠে পড়ে বললো, নাও, নাও, রান্নার জোগাড়যন্তর করতে হবে না? দেখি কি আছে! শোনো, তুমি এই পাশের বারান্দাতেই রান্না করে নিও—নিচে আর যেতে হবে না। সকালের দিকে একজন মালিকে পাবে—কিন্তু সন্ধ্যের পর সে ব্যাটা গাঁজার আড্ডায় যায়—তার টিকিরও দেখা পাবে না।

যোগানন্দ হাঁড়িকুড়ি নেড়ে চেড়ে দেখে বললো, তুমি নুন ছাড়া খেতে পারবে? নুনও নেই দেখছি! শুধু আছে চাল, আর মুসুরির ডাল। খিচুড়ি হয়ে যাবে।

সূর্যর খিদে নেই, রাত্তিরে তার আর কিছুই খাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু যোগানন্দর স্বাস্থ্য দেখে বুঝতে পারলো, এই লোকের ঘন ঘন খিদে পাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

বারান্দার তোলা উনুনে যোগানন্দ চটপট আগুন ধরিয়ে ফেললো। চাল-ডাল একসঙ্গে চাপিয়ে দিয়ে আপসোসের সুরে বললা, একটা কিছু তরকারি না হলে কি ভদ্দরলোকে খেতে পারে! কাল সকালে মালিটাকে দিয়ে কিছু আনিয়ে নিও। কিন্তু এখন কি করা যায়!

একটুখানি থেমে ফের বললো, এক কাজ করা যাক্। তুমি ভাই চট করে কয়েকটা ডুমুর পেড়ে আনতে পারবে?

সূর্য জিজ্ঞেস করলো, ডুমুর কি?

যোগানন্দ সূর্যর মুখের দিকে তাকিয়ে হো-হো করে হেসে ফেললো। তারপর বললো, ডুমুর চেনো না, তুমি কোথাকার সাহেব হে? ডুমুরই তো আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এ লাইনে যখন এসেছো, ডুমুর চিনতে হবে, ডুমুরের ফুল চিনতে হবে, সাপের পাঁচ-পা চিনতে হবে, বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি চিনতে হবে, বুঝলে? তুমি উনুনে একটু হাওয়া দাও, আমিই নিয়ে আসছি ডুমুর।

হ্যারিকেন না নিয়েই বেরিয়ে গেল যোগানন্দ। খানিকক্ষণের মধ্যেই যখন ফিরে এলো, তখন শুধু ডুমুর নয়, তার সঙ্গে নুন, শুকনো লঙ্কা ও পেঁয়াজও নিয়ে এসেছে কোথা থেকে। কিভাবে যে যোগাড় করলো, সে রহস্য ভাঙলো না। মুখচোখ তার আনন্দে উদ্ভাসিত। সোনার জিনিসের মতন সাবধানে নুনটুকু একটা পাত্রে রেখে বললো, নুন ছাড়া কোনো ভদ্দরলোকে খেতে পারে? খাওয়াটাই মাঠে মারা যেত!

গরম গরম খিচুড়ি ও ডুমুর-পেঁয়াজের তরকারি হালুম হালুম করে অমৃতের মতন খেয়ে ফেললো যোগানন্দ। সূর্যরও বেশ ভালোই লাগলো খেতে। এই প্রথম সে চাল ও ডালের খিচুড়িতে রূপান্তর হওয়া আগাগোড়া দেখলো—এবং এতে তারও খানিকটা অংশ আছে বলে রান্নার স্বাদটাই অন্য রকম মনে হলো।

তৃপ্তি করে খেয়ে যোগানন্দ বললো, আমি এঁটো বাসনপত্তরগুলো নিচ্ছি, তুমি হ্যারিকেনটা নাও—চলো পুকুরঘাট থেকে সব ধুয়ে নিয়ে আসি।

পুকুর তো নয়, মস্তবড় দিঘি। বাঁধানো ঘাট। এতক্ষণে জ্যোৎস্না ফুটেছে—দেখা যায় দিঘির মাঝখানে লাল রঙের শালুক ফুটে আছে। দিঘির ওপারে কয়েকটা খোলার ঘর। চার পাশে বড় বড় গাছ। বাড়িটা এককালে বাগানবাড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হতো মনে হয়। বাড়ি থেকে দিঘি পর্যন্ত আসবার পথটুকু দু-পাশে কেয়ারি করা মেহেদীর বেড়া। দল বেঁধে বেঁধে হালকা মেঘ ওড়াউড়ি করছে আকাশে।

দোতলায় ফিরে এসেই যোগানন্দ বললো, আর দেরি করে লাভ কি? শুয়ে পড়া যাক্।

সত্যি সত্যি তক্ষুনি মাদুর বিছিয়ে সে শুয়ে পড়লো এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার নাক ডাকতে লাগলো।

খাওয়া এবং ঘুমোনোর ব্যাপারেই যেন যোগানন্দর যত কিছু উৎসাহ! এর সঙ্গে, তার পিঠের ঐ কালসিটে দাগ ও চার বছর জেল খাটার কোনো মিল নেই। হয়তো এমন হতে পারে—যখন কোনো কাজের দায়িত্ব আসে তখন সে আহার-নিদ্রা ভুলে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে—আবার যখন কাজ থাকে না, সে বেশী করে খেয়ে ও ঘুমিয়ে সব উসুল করে নেয়।

সূর্যর সহজে ঘুম আসে না। অচেনা, অন্য রকম জায়গা, কোথাও কোনো শব্দ নেই, হ্যারিকেনটা নিবিয়ে দেওয়ার পর মনে হয়, সারা দুনিয়াটা এখন যেন জ্যোৎস্নার ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে। কলকাতায় এই সময়ে তাদের বাড়িতে কারুর খাওয়াই

হয়নি। বাবা বোধহয় এখনো ফেরেননি অনাথ আশ্রম থেকে। শ্রীলেখা সারাদিন নিশ্চয়ই খুব কেঁদেছে। হঠাৎ শ্রীলেখার কথা ভেবে সূর্যর খুব মন খারাপ লাগলো। শ্রীলেখার বিয়ে হয়ে যাবে, সে অন্য বাড়িতে চলে যাবে—তখন সূর্য কি করবে? শ্রীলেখাকে যে তার খুব দরকার!

চন্দননগরের সেই বাগানবাড়ির নির্জনতা সূর্যর চিত্তে খানিকটা কোমল ভাব এনে দিতে সক্ষম হয়েছিল। সূর্য এর আগে অন্য কারুর কথা এরকমভাবে ভাবেনি। অনেকক্ষণ ধরে শ্রীলেখার কথা তার মাথায় ঘুরতে লাগলো। সে ঠিক করলো, শ্রীলেখাকে আর কখনও কষ্ট দেবে না!

সকালবেলা যোগানন্দই ডেকে তুললো সূর্যকে। তার ততক্ষণে জামা কাপড় পরা হয়ে গেছে। সূর্যকে বললো, আমি ভাই চললাম। তোমাকে বেশী দিন একা থাকতে হবে না—আজ বা কালই দাদারা এসে পড়বেন। একটু চারদিক দেখে শুনে থেকো—এই আর কি!

সূর্য ওর সঙ্গে একতলা পর্যন্ত এলো। ভালো করে ভোর হয়নি তখনও। অসংখ্য পাখির কিচিমিচি শুরু হয়ে গেছে। বাগানের গাছপালায় একটা টাটকা গন্ধ।

বিদায় নেবার সময় যোগানন্দ খুব সাধারণভাবে এমন একটা কথা বললো, যা সূর্যর বুকে খুব একটা ধাক্কা মারলো। এমন সরল সুন্দর কথা সূর্য আগে কখনো শোনেনি। যোগানন্দ বললো, ভাই অমর, তোমাকে একটা কথা শুধু বলে যাই। এই যে তুমি এ পথে এসেছো—এটা শুধু নিজের জন্য। যা করবে, শুধু নিজের কাজ ভেবে করবে। পরাধীনতার দুঃখ যদি তোমার নিজের দুঃখ বলে মনে হয়—তা হলেই তুমি সার্থক হবে। অন্যরা যদি ভুল করে, অন্যরা যদি ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়, এমনকি আমাকেও যদি ভয় পেয়ে পালাতে দেখো—তুমি পালিও না। তোমার যতটুকু সাধ্য—তুমি করে যাবে।

যোগানন্দ চলে যাবার পর সূর্য একা একা সারা বাড়িটা ঘুরে বেড়ালো কিছুক্ষণ। মালিকে দিয়ে কিছু খাবার আনালো। তার সঙ্গে কিছু টাকা আছে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সে অতিরিক্ত কোনো জামা-কাপড় আনেনি—স্নান করবে কি করে? একটা ঘরে অবশ্য কয়েকটা শাড়ী ও গামছা আছে—কিন্তু সেগুলো ব্যবহার করা উচিত কিনা সে বুঝতে পারলো না। এমনিতে তার অন্য কোনো অসুবিধে হচ্ছে না—কিন্তু সিঁড়ির মুখটাতেই একটা ভীমরুলের চাক—সেখান দিয়ে যেতে আসতে তার গা ছমছম করছে। ভীমরুলের হাত থেকে বাঁচার কোনো উপায় সে জানে না। সূর্য সেদিন বাড়ি থেকে একদম বেরুলোই না—সারাটা দিন, বিকেল, সন্ধ্যে ঘরে শুয়ে শুয়েই কাটিয়ে দিল। সন্ধ্যের পর খুবই একঘেয়ে লাগার জন্য সে বেশ কিছুক্ষণ ডন বৈঠক মেরে ক্লান্ত করে ফেললো শরীরটাকে। তারপর ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিনই শংকরবাবু আর সিরাজুল তারিখ এসে হাজির। শংকরবাবু গোড়া থেকেই সূর্যকে একটু যেন অপছন্দ করেছিলেন—এখানেও অপ্রসন্ন হয়েই রইলেন। সূর্যকে হুকুম করে কথা বলতে লাগলেন। তারিখ সাহেব আগের মতনই অমায়িক। এখানে কী উদ্দেশ্যে যে তাঁরা জমায়েত হয়েছেন—তার কোনো ইঙ্গিতই নেই—যেন বেশ একটা পিকনিক হচ্ছে। সারাদিন ধরেই রান্নার উদ্যোগ আয়োজনে কেটে যায়। সূর্য ভাত রাঁধতে গিয়েছিল, তার আনাড়িপানা দেখে তারিখ সাহেব হেসেই বাঁচেন না। নিজেই সে দায়িত্ব নিয়ে নিলেন, কোথা থেকে একটা মুর্গী যোগাড় করে আনলেন—খুব আহ্লাদ করে খাওয়া হলো।

বিকেলবেলা সূর্যকে বাড়িতে রেখে ও'রা দুজন বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন অনেক রাত্রে। মুখ চোখ খুব বেশী খুশী। সূর্য একটু মনমরা হয়ে গেল। তাকে কিছুই জানানো হচ্ছে না, সব কিছুই তাকে বাদ দিয়ে হচ্ছে—তা হলে এখানে ডেকে আনা কেন? রান্না করার জন্য?

পরদিন এলেন এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা। এই ভদ্রলোকেরই নাম ননীমাধব সান্যাল, এরই সূর্যর মেসোমশাই হবার কথা। মহিলার নাম বনলতা। এ কথা বুঝতেও সূর্যর খুব দেরি হলো না যে এ'রা স্বামী-স্ত্রী নন। এ'রা পরস্পরকে আপনি বলে কথা বলেন। এই বাড়িটাকে এমনভাবে তৈরী করা হচ্ছে, যাতে পলাতক বিপ্লবীরা এখানে এসে গোপন আস্তানা নিতে পারে। তখনও ফরাসী এলাকার লুকিয়ে থাকার সুযোগ অনেক। এই বাড়িটার আশেপাশে কৌতূহলী মানুষজনও বিশেষ দেখা যায় না।

ননীমাধব ও বনলতা আসবার পর বেশ জমে উঠলো। ননীমাধব বেশ মজলিশী ধরনের মানুষ। সূর্যর কাছ থেকে গত কয়েক দিনের বিবরণ শুনে তিনি বললেন, আর সেই জমিদারপুত্তুরটি কোথায় গেল? আমার শালীপুত্রকে এই বাড়িতে একা ফেলে সে চলে গেল?

সূর্য জিজ্ঞেস করলো, জমিদারের ছেলেটি কে?

যখন জানলো, যোগানন্দই কোনো এক জমিদারের সন্তান—সে বিস্মিত না হয়ে পারলো না। তার মনে পড়লো, শুকনো খিচুড়ি ও ডুমুরের তরকারি কি উপভোগ করে খেয়েছিল সে। হরকুমারের কাছ থেকে দীক্ষা নেবার পর কতরকমের মানুষের সঙ্গে তার দেখা হচ্ছে!

একথা ঠিক, মানুষ অনেক রকম। নিজের পরিচিত গণ্ডীর বাইরে না এলে তা বোঝা যায় না।

বনলতার মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা—সব সময় ফিটফাট সেজেগুজে থাকেন। দেখে কেউ কিছু সন্দেহই করতে পারবে না—অথচ এই বনলতাই কিছুদিন আগে হার্মোনিয়ামের মধ্যে রিভলভার ভরে নিয়ে কুমিল্লায় পৌঁছে দিয়ে এসেছেন।

বড়রা যখন নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে শলাপরামর্শ করেন, বনলতা তখন গল্পে মেতে ওঠেন সূর্যর সঙ্গে। পা ছড়িয়ে বসে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেন, এবার বলো, আমার দিদি কেমন আছেন?

সূর্য বুঝতে পারে না। বনলতার দিদির খবর সে কি করে জানবে?

বনলতা বললেন, বাঃ, বুঝতে পারলে না? আমি যদি তোমার মাসী হই, তাহলে তোমার মা আমার দিদি হলেন না? কেমন আছেন তোমার মা? কলকাতায় থাকেন? নিশ্চয়ই তাঁকে খুব সুন্দর দেখতে!

সূর্য নির্বিকার মুখে জানালো, আমার মা নেই।

বনলতার মুখখানা এক মুহূর্তে বিষণ্ণ হয়ে গেল। খানিকক্ষণ এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন সূর্যর দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, জানো, আমারও মা নেই। তোমার চেয়ে আমি যখন ছোট, তখন আমার মা মারা গেছেন। তোমার বাবা?

সূর্য চুপ করে রইলো।

বনলতা হঠাৎ রেগে উঠে বললেন, আমার সঙ্গে তোমার অত নিয়ম নিয়ে আদিখ্যেতা করতে হবে না! আমি যা জিজ্ঞেস করছি, উত্তর দাও! পুলিস যদি ধরে—

তখন কি তুমি একরকম কথা বলবে, আর আমি আর এক রকম কথা বলবো? সব মিলিয়ে নিতে হবে না? তোমার মা সত্যিই নেই?

সূর্য দু'দিকে মাথা নাড়লো।

—কতদিন আগে মারা গেছেন?

—আমার মনে নেই।

বনলতা একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তাঁর চোখ দুটো সজল হয়ে এলো। আস্তে আস্তে বললেন, হরদা-কে যখন আমি বলেছিলাম আমার মা নেই—উনি বলেছিলেন, সেজন্য দুঃখ করতে নেই—এই দেশই তো আমাদের সকলের মা। কিন্তু তোমায় আমি সে কথা বলবো না। ছোট বয়েসে যে নিজের মাকে হারিয়েছে—তার মতন দুঃখী আর কেউ নেই। তোমার বাবা আছেন তো?

—হ্যাঁ।

—আর কে আছেন? ভাই, বোন?

—কেউ না।

—তুমি এইটুকু ছেলে, সব সময় এমন গম্ভীর থাকো কেন?

—কই, না তো!

—তুমি আজ স্নান করার সময় দিঘি থেকে কয়েকটা শাপলা তুলে আনতে পারবে? ভালো তরকারি হয়।

—আমি সাঁতার জানি না।

—সাঁতার জানো না? এ মা, এ কি কথা? এক্ষুণি শিখে নাও। যে কোনো সময় দরকার লাগতে পারে।

—আপনি শিখেয়ে দেবেন?

—আমি?

বনলতা একটু যেন লজ্জা পেলেন। আরক্ত মুখে বললেন, আমি কি পারবো? তুমি অনেক বড় হয়ে গেছ। শংকরদাকে বলো।

—থাক, পরে শিখে নেবো।

—আমি কি করে সাঁতার শিখেছিলাম জানো? তখন আমরা কামারহাটিতে থাকতাম—বাড়ির সঙ্গেই একটা পুকুর। আমার বউদি আমাকে ইচ্ছে করে করে গভীর জলে ঠেলে দিতেন—আমি যা ভয় পেতাম—আঁকুপাকু করে, হাত-পা ছুঁড়ে—। তোমাকেও স্নান করার সময় যদি আমি ঠেলে দিই জোর করে—তবে তোমার সঙ্গে বোধহয় গায়ের জোরে পারবো না। তুমি কি আমার থেকেও লম্বা?

—হ্যাঁ।

বনলতা উঠে দাঁড়িয়ে সূর্যকে পাশে ডাকলেন। মেয়েদের তুলনায় বনলতা বেশ লম্বা—তবু সূর্যর মাথা তাঁকে ছাড়িয়ে গেছে। পাশে দাঁড়িয়ে সূর্য অবলীলাক্রমে বনলতার কাঁধের ওপর একটা হাত তুলে দিল। তারপর চাপ দিয়ে নিজের দিকে আকর্ষণ করলো একটু।

বনলতা প্রথমটায় বুঝতে পারেন নি, রীতিমতন অবাক হয়ে সূর্যর দিকে তাকালেন। তারপর আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, হুঁ, ছেলে এর মধ্যেই পেকে ঝুনো! আমি তোমার মাসি হই না?

সূর্যর হাতখানা ধরে খুব মিষ্টি করে বললেন, এখন এসব দিকে মন দিতে নেই, বুঝলে? তোমার বয়েসে মন বেশী চঞ্চল থাকে—নিজের মনকে ঠিক করো। আগে

দেশ স্বাধীন হোক—

কোনো উত্তর না দিয়ে সূর্য অদ্ভুত ভাবে হাসলো।

ছ'দিনের দিন বেশী রাত্তিরে আরও তিনজন মানুষ এসে হাজির। তাদের মধ্যে একজনকে দেখে সূর্য নিজেকে সামলাতে পারলো না, ডেকে উঠলো, ব্রজদা!

হাজারীবাগে হরকুমারের আস্তানায় সূর্য এই ব্রজগোপালকে দেখেছিল। এতদিন বাদে সূর্য আর একজন চেনা লোককে পেল। তার ধারনা ছিল ব্রজগোপাল পুলিসের হাতে ধরা পড়েছেন।

ব্রজগোপাল সূর্যকে জড়িয়ে ধরলেন। খানিকটা আপ্লুত গলায় বললেন, হরদাকে বাঁচাতে পারলি না?

খানিকটা সামলে নিয়ে ব্রজগোপাল বললেন, সূয্যি, শিগগিরই সারা দেশে আগুন জ্বলবে। এবার শেষ ধাক্কা মারবো ব্যাটাদের। এই সময়ে যারা এগিয়ে আসবে না—তারা পোকামাকড়, মানুষ না! আমাদের অনেক প্রস্তুতি দরকার। তোকে যা বলবো, পারবি তো?

—পারবো।

—আজ রাত্রিরে আমরা বেরোবো। একটা কথা শুধু বলে রাখি। কেউ যদি ধরা পড়ে, কেউ যদি মারা যায়—তাহলে তাকে সাহায্য করার জন্য অন্য কারুর এগিয়ে যাবার দরকার নেই। প্রত্যেকটা প্রাণের দাম আলাদা—এমন কি আমিও যদি উণ্ডেড হই—আমাকে ফেলে রেখে চলে আসবি।

বনলতা বললেন, ওর গিয়ে কাজ নেই। ও তো একেবারে ছেলেমানুষ—ও আমার কাছে থাক্।

ব্রজগোপালের সঙ্গে যে-দু'জন এসেছিল, তার মধ্যে একজনকে সূর্যর চেনা-চেনা লাগছিল। নিখুঁতভাবে দাড়ি-গোঁফ কামানো, সাহেবী পোশাক পরা, গম্ভীর ধরনের। এবার সে সূর্যর কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে বললো, না, না, ও থাকবে কেন। ও যাবে। ও ঠিক পারবে।

গলার আওয়াজ শুনেই সূর্য চিনতে পারলো। এই সেই যোগানন্দ—বাবরি চুল, দাড়ি গোঁপের চিহ্নমাত্র নেই। তার সেদিনকার চেহারাটাই ছদ্মবেশ ছিল না আজকেরটা, বোঝা যায় না। সূর্য তার হাত চেপে ধরলে। এই মানুষটিকেও সূর্যর বেশ পছন্দ হয়েছে।

॥ ২১ ॥

মাঠের মধ্যে একটা মোটর গাড়ি অপেক্ষা করছিল। সেই গাড়ি চেপে আধঘণ্টা আন্দাজ যাবার পর আবার নামা হলো। চতুর্দিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোন্ জায়গায় এসেছে সূর্য বুঝতে পারলো না।

ওরা সবসুদ্ধ সংখ্যায় পাঁচজন। ব্রজগোপাল টর্চ জ্বেলে ঘড়ি দেখলেন, রাত প্রায় দেড়টা। আকাশের দিকে তাকালেন, জমাট কালো মেঘ। ফিসফিস করে বললেন, তোমরা সবাই আমার পেছন পেছন আসবে। বাড়িটার সামনের বাগানে কাঁটাতারের বেড়া আছে, ঢুকতে হবে সাবধানে। কুকুর নেই। ও বাড়িরই একটি ছেলে দরজা খুলে রাখবে। শংকরবাবু আপনি দরজায় দাঁড়াবেন। আমরা ভেতরে ঢুকবো। নেহাত দরকার

না হলে কারুকে প্রাণে মারার দরকার নেই।

—বাড়িটা কার?

—আঢ্যিদের বাড়ি। প্রাণকৃষ্ণ আঢ্যি একের নম্বরের কঞ্জুষ। সোনাদানা, টাকাপয়সা বাড়িতেই রাখে। বাড়িতে বন্দুক আছে—সেটা আগে দেখা দরকার।

সূর্য অস্ফুটভাবে বললো, ডাকাতি?

এতক্ষণ তাকে কেউ কিছু বলে নি। কিন্তু তারা যে দল মিলে ডাকাতি করতে আসছে—এটা কল্পনাও করেনি সে। তার মন বেশ দমে গেল। এত প্রস্তুতি, এত গোপনীয়তা—সে বিরাট কিছু কাজের কথা ভেবেছিল! ইওরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ কিংবা ট্রেন উড়িয়ে দেওয়া—এই রকমের কিছু।

ব্রজগোপাল সূর্যর দিকে ফিরে বললেন, সামনে আমাদের বিরাট যুদ্ধ। এখন আমাদের হাতে প্রচুর রসদ দরকার। টাকা চাই। যদি কারুর প্রাণের মায়া থাকে এখনও ফিরে যেতে পারো।

কেউ কোনো কথা বললো না।

ব্রজগোপাল আবার ঘড়ি দেখে বললেন, চলো! দশ মিনিটের মধ্যে সব শেষ করতে হবে!

গাড়ি থেকে দুটি শাবল বার করা হলো। একটা কাপড়ের থলি। ব্রজগোপাল ও শংকরবাবুর হাতে পিস্তল। সূর্যর পিস্তলটা তার কোমরে গোঁজা—এ ক'দিন শোবার সময়েও সে ওটা হাতছাড়া করে নি।

ঘাসের ওপর শিশির ঝরে আছে। হাঁটতে গিয়ে ওদের পা ভিজে যায়। মাঠের এক পাশে দু একটা মাটির বাড়ি, সেখানে দুটি বিড়ালের খুব ডাকাডাকি চলছে। আরও দূরে কোথাও অবিকল শিশুর কান্নার মতন শকুনির বাচ্চার ডাক শোনা যায়।

বাড়িটা দোতলা ও গোল ধরনের। ব্রজগোপাল একবার টর্চ জেবলে সদর দরজাটা দেখে নিলেন। আস্তে ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। একজন রুগ্নচেহারার মধ্য-বয়সী লোক সেখানে দাঁড়িয়ে—দেখলে মনে হয় বাড়ির বাজার সরকার কিংবা আশ্রিত। ব্রজগোপালের টর্চের আলোয় দেখা গেল, লোকটি থরথর করে কাঁপছে, মুখখানা একেবারে রক্তহীন। এই লোকটিই দরজা খুলে রেখেছে বোঝা যায়। ব্রজগোপালের ইঙ্গিতে যোগানন্দ দড়ি বার করে লোকটির হাত-পা বেঁধে ফেললো। লোকটি স্বেচ্ছায় তাতে রাজি। ব্রজগোপাল জিজ্ঞেস করলেন, বন্দুকটা কোথায়? লোকটি কোনোক্রমে বললো, দোতলায়, সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানদিকে।

সেই ঘরেরও দরজা খোলা ছিল। ভেতরে বিরাট পালঙ্কের ওপর একজন মোটা-সোটা বৃদ্ধ ঘুমোচ্ছে। মেঝেতে আর একটা বিছানা পাতা—সেটা খালি। আলমারির মাথাতেই বন্দুকটা রাখা—খোঁজাখুঁজি করারও দরকার হলো না। সিরাজুল বন্দুকটা নিজের কাছে রাখলেন।

ব্রজগোপাল খুব সন্তর্পণে বৃদ্ধের গায়ে হাত রেখে বললেন, এই যে, উঠুন!

বৃদ্ধটি গভীর ঘুমে মগ্ন। ভোঁস ভোঁস করে নিশ্বাস পড়ছে। যোগানন্দ ওর পা ধরে নাড়া দিতে যেতেই তিনি ঘুমের ঘোরেই যোগানন্দকে এক লাথি কষালেন। পাশেই টিপয়ে এক গেলাস জল ঢাকা দেওয়া ছিল—সেটা তুলে নিয়ে ব্রজগোপাল সবখানি জল ঢেলে দিলেন বৃদ্ধের চোখেমুখে।

হতভম্ব বৃদ্ধ চোখ মেলতেই ব্রজগোপাল খুব বিনীতভাবে বললেন, আঢ্যি মশাই, সিন্দুকের চাবি!

এইবার বৃদ্ধের সত্যিকারের ঘুমের ঘোর কাটলো। অতবড় শরীর নিয়েও আশ্চর্য-রকম দ্রুততায় উঠে বসেই ষাঁড়ের মতন চ্যাঁচাতে লাগলেন, ওরে বাবারে, মেরে ফেললো! গোবিন্দ, রাখহরি—কে কোথায় আছিস, মেরে ফেললে—!

ব্রজগোপালের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন সিরাজুল—তিনি খপ করে চেপে ধরলেন বৃদ্ধের মুখ। যোগানন্দ হাতের শাবল তুলে বললো, টু শব্দ করলে খুন করে ফেলবো। চাবি কোথায়?

বৃদ্ধের ঐ চিৎকারেও কারুর ঘুম ভেঙেছে বলে মনে হলো না। তবু সাবধানতার জন্য ওরা কয়েকজন ঘরের বাইরে গিয়ে জায়গা নিয়ে দাঁড়ালো।

শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধের দু'গালে দুটি চড় না মারা পর্যন্ত চাবি আদায় করা গেল না। কিন্তু সে ঘরের সিন্দুকে বেশীর ভাগই কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজ। আসল সিন্দুক দোতলারই অন্য ঘরে। বৃদ্ধকে নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে। বৃদ্ধ কম্পিত গলায় ডাকলেন, বৌমা, দরজা খোলো!

সে দরজা আর খোলে না। ভেতরের লোক জেগেছে, তবু দরজা খুলবে না। বৃদ্ধকে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হলো, তবু তাদের গরজ নেই। শেষ পর্যন্ত দুমদাম করে লাথি মারা হতে লাগলো দরজায়।

ঘরের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী ও দুটি সন্তান। একটি বারো-তেরো বছরের মেয়ে তখনও খাটের ওপরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে, বছর পাঁচেকের একটি ছেলে জেগে উঠে চেয়ে আছে ফ্যাল-ফ্যাল করে। বধূটি দরজা খুলে তাকিয়ে আছে বিস্ফারিত চোখে, স্বামীটিকে দেখলে মনে হয়—তার মতন বীরপুঙ্গব পৃথিবীতে আর দুটি নেই।

আঢ্যিমশাইয়ের ঘাড় ধরে ধাক্কা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে ব্রজগোপাল জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় সিন্দুক?

আঢ্যিমশাই ছেলের দিকে তাকিয়ে হাউ-হাউ করে উঠলেন, ওরে গোবিন্দ, সর্বনাশ হয়ে গলে! আজ সর্বস্বান্ত হয়ে গেলুম।

বধূটি নিজেই আঁচলের চাবি খুলে দিয়ে বললেন, আপনাদের যা খুশী নিয়ে যান। আমার ছেলেমেয়েদের কিছু বলবেন না।

—আপনার গায়ের গয়না খুলে দিন!

বধূটির সব গয়না খোলা হলো। আঢ্যিমশাইয়ের হাতের তিনটি আংটি। সে ঘরের সিন্দুকে আশাতিরিক্ত জিনিস পাওয়া গেল। হাজার টাকার নোট এক তাড়া। বেশ কিছু গিনি। সোনার গয়না ভরি পঞ্চাশেক। ঘুমন্ত মেয়েটির গলা থেকে সরু হারটা যোগানন্দ খুলে নিল সাবধানে। যোগানন্দের হাতে থলিতেই সব কিছু রাখা হচ্ছে। এই সময় তার চোখ গেল আঢ্যিমশাইয়ের ছেলের দিকে। দেয়ালের সঙ্গে মিশে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতের আংটি খুলে দিলেও ডান বাহুতে একটা বড় সোনার তাবিজ রয়েছে তখনও।

ব্রজগোপাল ধমক দিয়ে বললেন, ওটা খোলো!

—এটা নেবেন না। আপনাদের পায়ে পড়ছি!

—শিগগির খোলো।

—এটাতে আমার মায়ের ছবি আছে।

যোগানন্দ বললো, মার না খেলে চলবে না, না? হাতের শাবলখানা দিয়ে সে সজোরে মারলো লোকটির পিঠে। সেই মুহূর্তে সেই পাঁচ বছরের শিশুটি চিৎকার করে উঠলো, বাবা! তারপরই সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, বাবাকে মেরে ফেললে, বাবাকে

মেরে ফেলছে!

ব্রজগোপাল সূর্যর দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করলো, ছেলেটির মুখ চেপে ধরতে। সূর্যর বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠলো। এতক্ষণ সে সব কিছু দেখে যাচ্ছিল নির্বিকারভাবে, কিন্তু এখন যেন তার দম আটকে আসছে। ঐ শিশুটির চিৎকার সব কিছু অন্যরকম করে দিল। এই সব কিছুর মধ্যেই একটা শিশুর উপস্থিতি যেন বেমানান। ঐটুকু ছেলের সামনে তার বাবাকে মারা—এর চেয়ে বড় নিষ্ঠুরতা যেন আর নেই। যোগানন্দ এত নিষ্ঠুর! ব্রজগোপালের নির্দেশ পেয়ে সূর্য যন্ত্রচালিতের মতন গিয়ে শিশুটির মুখ চেপে ধরলো।

বধূটি গিয়ে স্বামীকে আড়াল করে দাঁড়াল। নিজেই মাদুলিটা ছিঁড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে।

আঢ্যিমশাইয়ের ছেলে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। শাবলের ঘা-টা বেশ জোরেই পড়েছিল—সে মাটিতে পড়ে গোঁ গোঁ করতে লাগলো।

এই সময় হঠাৎ একজন প্রৌঢ় ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে। লোকটির দুঃসাহস অবাক করে দেবার মতন। অন্য কারুকে গ্রাহ্য না করে সে যোগানন্দের সামনে এসে বললো, একি যোগানন্দ, তুমি? তুমি সত্যি যোগানন্দ?

লোকটিকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ দেওয়া হলো না। সিরাজুল পেছন থেকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে শুইয়ে ফেললে।

সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনাটি অপেক্ষা করছিল নিচের তলায়। ওপরের ঘরগুলোতে মোটামুটি আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নি। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ওদের খেয়াল হলো, সিঁড়ির নিচেই একটা ঘর ভেতর থেকে খিলবন্ধ—সে ঘরটা দেখা হয়নি।

তিনটি লাথি মারতেই সে ঘরের দরজার খিল ভেঙে গেল। ভেতরের দৃশ্য দেখলে প্রথমটায় চমকে উঠতেই হয়।

ঘরটায় আসবাবপত্র কিছুই নেই। মেঝের ওপর মাদুর বিছানা পাতা। সেই বিছানার ওপর স্থির হয়ে বসে আছে একটি আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে, অসাধারণ সুন্দরী, তার সমস্ত শরীর অলংকারে মোড়া। দু'হাতে অন্তত দশ গাছা করে চুড়ি, তারপর বালা ব্রেসলেট; কানে কানবালা, কপালে টিকলি, গলায় পাথর বসানো হার। ব্রজগোপালের টর্চের আলোয় গয়নাগুলো ঝলমল করে উঠলো। দৃশ্যটা হঠাৎ অলৌকিক মনে হয়। রাত্তির বেলা ঘরের মধ্যে এত গয়না পরে বসে থাকার কোনো যুক্তি নেই।

মেয়েটির কোলে একটি পাঁচ ছ'মাসের বাচ্চা, পাশে একজন বৃদ্ধা—শোওয়ার ভঙ্গি দেখে মনে হয় অজ্ঞান।

দু'এক মুহূর্ত সবাই থমকে গিয়েছিল। তারপর ব্রজগোপাল বললেন, মা, তোমার গয়নাগুলা খুলে দাও।

মেয়েটি তীব্র গলায় বললো, না!

—আমাদের দেরি করার সময় নেই।

—আমি দেবো না!

—দিতে তোমাকে হবেই, শুধু শুধু ঝামেলা করবে।

—কিছুতেই দেবো না!

ব্রজগোপাল পিস্তল উঁচিয়ে বললেন, উঠে দাঁড়াও!

মেয়েটি বাচ্চা কোলে নিয়েই উঠে দাঁড়ালো। এমন রূপসী সচরাচর চোখে পড়ে না। কোমর ছাড়িয়ে নেমেছে চুল, মুখখানি প্রতিমার মতন, সর্বাঙ্গ লাবণ্যমাখা। অত

অলংকার ছাড়াও তার চেহারা চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতন। তার চোখে-মুখে কোনো ভয়ের চিহ্ন নেই।

ব্রজগোপাল কর্কশ গলায় বললেন, গুলি করে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়ে তারপর তোমার গয়না নিতে হবে?

—তাই নিন!

—তার আগে আছাড় দিয়ে তোমার ঐ বাচ্চাটাকে মেরে ফেলবো!

—মেরে ফেলুন!

—তবু গয়নার জন্য এত লোভ? ভালো কথা বলছি, এখনো দাও!

—আমি দেবো না তো বলেছি!

—তাহলে দ্যাখো, তোমার বাচ্চাটা আগে মরুক!

ব্রজগোপাল অসম্ভব রাগত মুখে সূর্যর দিকে তাকিয়ে বললেন, যা তো, নিয়ে যা তো বাচ্চাটাকে! আছড়ে মেরে ফ্যাল!

সূর্য চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, ব্রজগোপাল তাকে এক ধমক দিলেন। সূর্য এগিয়ে গেল মেয়েটার দিকে। মেয়েটি দু'এক পলক তাকালো সূর্যের দিকে। তাকাতেই হবে—কেন না, ডাকাতের দলে এরকম চেহারার ছেলে কেউ কোনোদিন দেখবে আশা করে না। মেয়েটি বললো, কেড়ে নেবে? নাও!

সূর্য হাত বাড়ালো। কিন্তু কেড়ে নিতে হলো না—মেয়েটি নিজে থেকেই বাচ্চাটিকে দিয়ে দিল সূর্যর হাতে। বাচ্চাটা ঘুমিয়ে আছে। সূর্য খুব সাবধানে বাচ্চাটাকে ধরে নিয়ে গেল বাইরে। এইটুকু বাচ্চাকে সে কখনো কোলে করেনি, তার গা শিরশির করে। দরজার কাছে পাহারারত শংকরবাবুকে গিয়ে বললো, কি করবো একে নিয়ে?

ওদিকে ঘরের মধ্যে মেয়েটিকে ব্রজগোপাল বললেন, এবার দেবে?

—আমাকে আগে মেরে ফেলুন। তার আগে পাবেন না!

—গা থেকে একটা একটা করে গয়না টেনে ছিঁড়ে নিতে হয়! লোভী মেয়েছেলে! এই, তাই নেতো!

যোগানন্দ এগিয়ে গিয়ে বললো, এখনো দাও বলছি!

মেয়েটি বললো, জোর করে নিতে হয় নিন!

ব্রজগোপালও এগিয়ে গেলেন, দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, তোমার মতন মেয়েছেলেকে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলে ভালো হবে, না?

মেয়েটি একটুও ভয় না পেয়ে সোজাসুজি ব্রজগোপালের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। ব্রজগোপাল তার গায়ে হাত তুলতে গিয়েও পারলেন না।

এই সময় বাচ্চাটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে কেঁদে উঠতেই সূর্য ঘাবড়ে গিয়ে তাকে নিয়ে ফিরে এলো ঘরে! ঐটুকু বাচ্চার কি গলার জোর—সূর্য ওকে নিয়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লো। কারুকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই বাচ্চাটাকে তুলে দিল মেয়েটির হাতে। মেয়েটি তাকে বুকে চেপে ধরলো। মায়ের বুকের চেনা উত্তাপ পেয়েই বাচ্চাটা সঙ্গে সঙ্গে চুপ।

ব্রজগোপাল একটা হতাশ ভঙ্গি করলেন। একটু হাসলেনও। বললেন, হরদা আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছেন, কিন্তু একটা মেয়ের গা থেকে কি করে গয়না কেড়ে নিতে হয় সেটা শিখিয়ে যান নি। কি আর হবে, চল!

যোগানন্দ বললো, এতগুলো গয়না ছেড়ে দিয়ে যাবো?

ব্রজগোপাল বললেন, উপায় কি; মেয়েমানুষের গায়ে কে হাত দেবে? দেরি করে লাভ নেই, চলো সবাই—

সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার আগে ব্রজগোপাল মেয়েটির দিকে ফিরে ঘৃণার দৃষ্টিতে বললেন, ছেড়ে দিলাম! ঐ গয়না ধুয়ে জল খেয়ো সারাজীবন।

মেয়েটি এবার বাচ্চাটিকে বিছানায় নামিয়ে রেখে বললো, শুনুন! আমার একটা কথা শুনে যান!

—কি?

—আমার শ্বশুরবাড়ি বর্ধমান, ঠিকানা বলে দিচ্ছি—সেখানে কোনোদিন যাবেন, আমার যা আছে সব দেবো।

—নেমন্তন্ন?

—আমি জানি, আপনারা স্বদেশী। সাধারণ ডাকাত নন!

—কে বললে?

—আমি দেখেই বুঝেছি। আপনারা আমার ছেলেকে কিছুতেই মারতেন না!

—ঠিক আছে, ঠিক আছে!

—আমার শ্বশুররা বড়লোক। আমি গরীবের মেয়ে। এটা আমার বাপের বাড়ি নয়। একটু দূরে যে মাটির ঘর আছে, সেখানে আমাদের বাড়ি। চুরি-ডাকাতির ভয়ে রাত্তিরে এ বাড়িতে এসে থাকি। আমার যদি সব গয়নাগাটি যায়—শ্বশুরবাড়িতে আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। সবাই বলবে, আমার মা গরীব—তাই লোভ করে সব গয়না রেখে দিয়েছে। আমার মায়ের নামে অপবাদ হওয়ার চেয়ে আমার মৃত্যুও ভালো। এমনিতেই সব সময় তারা আমার মায়ের নামে খোটা দেয়। ঐ দেখুন, আমার মা অজ্ঞান হয়ে আছেন।

—কি করেন তোমার শ্বশুর!

—দারোগা।

—তাই! দারোগা ছাড়া ছেলের বউকে এত গয়না এখন আর কে দেবে! ঠিক আছে, নেমন্তন্ন রইলো, যাবো একদিন।

মেয়েটি নির্ভয়ে, সারা গায়ের গয়না ঝলমলিয়ে ওদের এগিয়ে দিল দরজা পর্যন্ত।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক গজ যাওয়া মাত্রই চ্যাঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। আঢ্যি মশাই আর তাঁর ছেলে বোধহয় এতক্ষণ জানলা দিয়ে দেখছিলেন, ডাকাতরা বাড়ি ছাড়া হতেই সাহস ফিরে এসেছে। চিৎকারের মাত্রা এখন এত বেশী যে দূরের মাটির বাড়িগুলোতেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। জ্বলে উঠলো দু' একটা হ্যারিকেন।

ব্রজগোপাল নির্দেশ দিলেন, তোমরা সবাই ছড়িয়ে পড়ো! প্রত্যেকে আলাদাভাবে গাড়ির কাছে পোঁছোবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কেউ বাধা দিতে এলে বিনা দ্বিধায় গুলি করবে এখন।

সূর্য পিস্তলটা হাতে নিয়ে দৌড়োতে লাগলো অন্ধকারের মধ্যে। কাঁটাতারের কথা তার মনে ছিল না—সেখানে ধাক্কা লেগে পড়ে গেল আছাড় খেয়ে। পিস্তলটা হাত থেকে খসে গিয়েছিল। পাগলের মতন খুঁজতে লাগলো সেটাকে। ওদিকে লোক-জনের গলার আওয়াজ বাড়ছে। সূর্যর হাঁটুর কাছে কেটে গেছে। হঠাৎ তার মনে হলো, আকাশের সব মেঘ নিচে নেমে আসছে, আশেপাশের বাড়ি ও গাছপালা এগিয়ে আসছে তার দিকে, সে এবার ফাঁদে পড়বে। চতুর্দিকের সমস্ত জড় পদার্থ পিষে মেরে ফেলবে তাকে। সূর্য দু' এক মুহূর্তের জন্য নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। পিস্তলটা

আবার খুঁজে পেতেই, বিনা প্রয়োজনে আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়লো এক রাউন্ড। সেই সঙ্গে তার সাহস ফিরে এলো। নেকড়ে বাঘের মতন দ্রুত ছুটে পৌঁছে গেল গাড়ির কাছে।

অন্যরা তার জন্য অপেক্ষা করছিল গাড়ির মধ্যে। সিরাজুল গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছেন। ব্রজগোপাল বললেন, সবাই এসেছে? চলো!

শংকরবাবু ব্যাকুল ভাবে বলে উঠলেন, যোগানন্দ? যোগানন্দ কোথায়? অমর, তুমি তাকে দেখেছো?

সূর্য বললো, না তো!

—যোগানন্দ এখনো এসে পৌঁছোলো না!

—সে তো এরকম ভুল করে না!

কিছু কিছু লোকজন হইহই করে এদিকে ছুটে আসছে মনে হলো। ব্রজগোপাল পিস্তল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বললেন, আমি হুকুম দিলে সবাই একসঙ্গে গুলি চালাবে!

সিরাজুল বললেন, দাদা, এত লোকের সঙ্গে কনফ্রন্টেশান করা কি ঠিক হবে!

—যোগানন্দের জন্য অপেক্ষা করা হবে না তাহলে?

—আপনি বলেছিলেন, কেউ কারুর জন্য অপেক্ষা করবে না।

—সবার তাই মত?

আর কেউ কোনো সাড়াশব্দ করলে না। ব্রজগোপাল বললেন, ওরা কাছে এসে পড়ছে। তাহলে চলো!

দড়াম করে একটা ইঁট এসে পড়লো গাড়ির ওপরে। গাড়ি একটু ঝাঁকুনি খেয়েই হুস করে বেরিয়ে গেল।

মিনিট পাঁচেক পরে গাড়ি বড় রাস্তায় পড়ে যখন নিশ্চিন্তে ছুটছে তখন শংকরবাবু যেন হঠাৎ শারীরিক আঘাত পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, সর্বনাশ!

ব্রজগোপাল ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কি হলো!

—আপনারা কেউ একটা ব্যাপার খেয়াল করেন নি? গয়নার থলেটা যোগানন্দর কাছে!

—অ্যাঁ?

—গয়না টাকা পয়সা, আজকের সব কিছুই তো ওর কাছে! যোগানন্দই এ বাড়ির সন্ধান দিয়েছিল। সে আটকে পড়বে?

অচমকা গাড়ি ব্রেক কষে থেমকে গেল। আজকের রাত্তিরের সব কিছুই পণ্ডশ্রম—এই উপলব্ধি ওদের অসাড় করে দেয়। অথচ আর ফিরে যাওয়াও যায় না।

যোগানন্দ সেদিন ধরা পড়েনি। আর কোনোদিন ফিরেও আসেনি ওদের কাছে।

॥ ২২ ॥

ন্যায় অন্যায়ের যে সূক্ষ্ম সীমারেখা রয়েছে, সেটাও কি রকম হঠাৎ হঠাৎ বদলে যায়। পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুন যুক্তি খাড়া করতে একটুও দেরি হয় না। একটু দূরে থেকে, নির্লিপ্ত দর্শক হিসেবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, মানুষের তৈরী করা নিয়মনীতি, বিবেক, আদর্শ—এগুলো শিশুর অযৌক্তিকতা থেকে বেশী দূরে নয়। এমন কি সত্যও এক ও অবিচল হতে পারে না।

যোগানন্দর রহস্যময় অনুপস্থিতিতে সকলের মুখে একটা অশুভ ছায়া পড়লো। যোগানন্দর অসীম সাহস, শারীরিক শক্তিও প্রচণ্ড, সুখী বিলাসী জীবন ত্যাগ করে সে বেরিয়ে এসেছে—অথচ আজ তার ব্যবহারের তো কোনই ব্যাখ্যা করা যায় না।

শংকরবাবু জোর দিয়ে বললেন, তিনি যোগানন্দকে ও বাড়ি থেকে প্রথম বেরিয়ে যেতে দেখেছেন। দরজা দিয়ে যোগানন্দ যখন বেরিয়ে আসে, তখন শংকরবাবুর সঙ্গে তার ধাক্কা লাগে। সে চাপা গলায় বলেছিল, অ্যাকশন সাকসেসফুল! রিট্রিট! তারপর সে ছুটে বেরিয়ে যায়। তার হাতে থলিটা ছিল। সিরাজুল তারিখও বললেন, তিনি যোগানন্দকে অন্ধকারের মধ্যে থলি হাতে ছুটে যেতে দেখেছেন। তখনও লোকজন তাড়া করেনি। সুতরাং যোগানন্দর ধরা পড়ার প্রশ্নই ওঠে না!

তা হলে সে গাড়ির কাছে এলো না কেন? সে পথভুল করবে, এটাও কল্পনা করা যায় না। আর কেউ করলো না, শুধু একা তারই ভুল হবে? তা ছাড়া, ওই অঞ্চলটা যোগানন্দরই বেশী চেনা—সে-ই পুরো ব্যাপারটা পরিকল্পনা করেছিল। বাড়ির ভেতরের লোককে হাত করে দরজা খোলাবার বন্দোবস্তও সে করেছে। কোথায় গেল যোগানন্দ?

সূর্য সবচেয়ে শেষে গাড়ির কাছে পৌঁছেছিল। সেজন্য ব্রজগোপাল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই যোগানন্দকে দেখিস নি?

সূর্য বললো, না। অন্য কোনো দিকে চেয়ে দেখার মতন মনের অবস্থা তার ছিল না।

—তোর আসতে দেরি হলো কেন?

—আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম।

—ফায়ার করলি কাকে দেখে?

—ওদের ভয় দেখাবার জন্য। ওপরের দিকে ফায়ার করেছি, কারুর গায়ে লাগেনি।

ব্রজগোপাল দু-এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, যোগানন্দও আছাড় খেয়ে পড়ে যায়নি তো? হয়তো পা-টা ভেঙে গেছে।

শংকরবাবু তৎক্ষণাৎ বললেন, অসম্ভব! যোগানন্দ পা ভেঙে পড়ে থাকার ছেলেই নয়।

—জায়গাটায় বড় বড় ঘাস ছিল। যদি সাপে-টাপে কামড়ায়।

—ব্রজদা, আপনি কি বলছেন কি! এ কখনো হতে পারে?

—তা হলে যোগানন্দ কোথায় গেল?

এই প্রশ্নটা বার বার ঘুরে ফিরে আসছে সকলের মনে। যোগানন্দ কোথায় গেল? কোথায় যেতে পারে?

কিন্তু এটাও মূল প্রশ্ন নয়। সেই প্রশ্নটা এখনো কেউ উচ্চারণ করছে না। যোগানন্দের চেয়েও বড় তার হাতের টাকার থলি। টাকা পয়সা ও গয়না মিলিয়ে অন্তত তিরিশ হাজার টাকার কম নয়।

গাড়ি এসে থামলো চন্দননগরের সেই বাগানবাড়ির সামনে। ননীমাধব ও বনলতা তখনো জেগে আছেন, ব্রজগোপালের সঙ্গে আর একজন এসেছিল, বাণীকণ্ঠ, সেও তৈরি হয়ে আছে—মালপত্র নিয়ে রাত্তিরেই কলকাতায় রওনা হয়ে যাবার জন্য।

গাড়ি থেকে নেমে শংকরবাবুই প্রথম দু-হাত ঝাঁকিয়ে বললেন, দূর, দূর! ডাকাতি করার পাপও করলাম, অথচ কিছুই হলো না! শুধু শুধু নিরপরাধ লোককে মারা—

সিরাজুল বললেন, আমরা দাগী হয়ে রইলাম!

ডাকাতি করা যে একটা পাপ-কাজ এটা যাত্রা শুরুর সময় কারুর মনে হয়নি।

বরং মহৎ আদর্শের আবরণটাই ছিল প্রধান। সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা দরকার। সুতরাং কোনো কঞ্জুষ বৃদ্ধের সিন্দুকে বন্ধ করে রাখা টাকা কেড়ে নেওয়ার মধ্যে কোনো গ্লানি নেই। এবং এ কাজে বেরিয়ে যদি দু-একজন বাধাদানকারীকে মারতে হয় কিংবা নিজেদের মধ্যে কারুকে মরতে হয়—সেটাও গৌরবের। কিন্তু সেই ডাকাতিই সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ করেও খালি হাতে ফিরে আসার পর ওরা নিজেদের মনে করতে লাগলো সাধারণ ক্রিমিনাল। অদৃশ্য টাকার থলিটা মস্তবড় ছায়া ফেলে দুলতে লাগলো ওদের মাথার ওপর।

শংকরবাবু হতাশভাবে বললেন, সব গেল! সব নষ্ট হয়ে গেল!

বাকি তিনজন নেমে এসেছে নিচে। দারুণ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলো, কি হলো? যোগানন্দ কোথায়?

সূর্যর হাঁটু থেকে রক্ত পড়ছে, টনটন করছে বেশ—এখন তাকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে। বনলতা বললেন, কি করে লাগলো? ইস, অনেকখানি কেটে গেছে যে!

ওপরে আসবার পর বনলতা শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে সূর্যর হাঁটুর রক্ত মুছে ব্যাণ্ডেজ করে দিতে গেলেন। সূর্য কিছুতেই রাজী হচ্ছে না—হাত দিয়ে আড়াল করে বার বার বলছে, ও কিছু না—এমনিই সেরে যাবে! অন্যের কাছ থেকে সেবা-শুশ্রূষা নেবার অভ্যেস নেই তার। তা ছাড়া, আর কারুর কিছু হয়নি, শুধু তারই পা কেটে গেছে—এটা তার পক্ষে একটা লজ্জার ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত বনলতা তাকে এক ধমক দিয়ে বললেন, বেশী বাড়াবাড়ি করতে হবে না, চুপ করে বসে থাকো তো! যদি সেপটিক হয়, তখন বুঝবে!

সে রাত্রে কারুর আর ঘুমোনোর প্রশ্ন ওঠে না। রীতিমতন তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গলে। যোগানন্দকে স্পষ্ট করে কেউ বিশ্বাসঘাতক বলছে না, যদিও অনেকেরই মনের কথা তাই। একমাত্র ননীমাধব বলতে লাগলেন, তা কখনো হতে পারে? কামারপুকুর কেসে যোগানন্দ যে-রকম নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে এগিয়ে গিয়েছিল—

ব্রজগোপাল বললেন, তা ছাড়া টাকা-পয়সার ওপর ওর কোনো লোভ নেই! ওর বাপ জমিদার, কত সম্পত্তি—সে সব ছেড়ে-ছুড়ে এসে—

শংকরবাবু বললেন, ওর বাপ ওর সৎ মায়ের ছেলের নামে সব সম্পত্তি লিখে দিয়েছে—

—তা হলেও, ও নিজে যেটুকু পেতো—

—একটা কথা বলুন তো। আমাদের যখন টাকা পয়সার এত দরকার—তখন যোগানন্দ তার নিজের বাড়িতে ডাকাতি করার পরামর্শ দিল না কেন? অন্যের বাড়িতে—

—সব ব্যাপারেই সুবিধে অসুবিধে আছে তো! ওদের বাড়িতে নেপালী দরওয়ান।

—আপনারা একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না—এদানি ওর মাথায় নিশ্চয়ই একটু গোলমাল দেখা দিয়েছিল। কথাবার্তা যেন কি রকম কি রকম—

বনলতা বললেন, তা কিন্তু ঠিক। আমরাও আজকাল ওকে দেখলে কি রকম পাগল পাগল মনে হতো! মুখভর্তি গোঁপ-দাড়ি—ওগুলো নাকি ওর মানত করা—হঠাৎ কাল দেখলাম সব কামিয়ে ফেলেছে—

সূর্য অবাক হয়ে সব কথা শুনছিল, কিন্তু কোনো থৈ পাচ্ছিল না। যোগানন্দকে যতটুকু সে দেখেছে, তার ভালোই লেগেছে—ও রকম একটু পাগলা পাগলা ভাব তো অনেক মানুষেরই থাকে—কিন্তু সে এ রকমভাবে সকলকে ঠকিয়ে যাবে—এটা কি বিশ্বাস করা যায়? মানুষ এ রকম হতে পারে? যোগানন্দর পিঠে সেই

চাবুকের লম্বা লম্বা দাগের কথা তার মনে পড়লো। অবশ্য যোগানন্দর অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ব্যাখ্যাও সে খুঁজে পায় না।

শংকরবাবুর অনুশোচনাই সবচেয়ে বেশী। বার বার কৃতকর্মের জন্য আফসোস করতে লাগলেন। হঠাৎ সিরাজুল তারিখের দিকে ফিরে তীব্র গলায় বললেন, তারিখ সাহেব, আপনি যে ওই বুড়ো লোকটাকে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে অত জোরে মারলেন, লোকটা যদি মরে গিয়ে থাকে?

সিরাজুল থতমত খেয়ে বললেন, লোকটা যে যোগানন্দকে আইডেণ্টিফাই করে ফেলেছিল!

—তা হোক! কিন্তু খুনী কে হবে, আপনি না যোগানন্দ?

—মানে, আমি তো ঠিক—

ব্রজগোপাল হাত তুলে বললেন, চুপ! এসব কথা আর না। তারিখ সাহেব মারেননি—আমরা সবাই মিলে মেরেছি। আজকের প্রত্যেকটা কাজের জন্য আমরা সবাই একসঙ্গে দায়ী।

—সামান্য চোর ডাকাতের মতন এখন আমাদের পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে! আমি প্রথম থেকেই এর বিরুদ্ধে ছিলাম।

—শংকর, তুমি তো আগে একথা বলোনি!

—বলার সুযোগ পাইনি! এখন বলুন, এত সব খরচ চালানো হবে কি করে? এই বাড়িটা রাখার একটা খরচ আছে—কলকাতার খরচ, এক ডজন ডিটোনেটার পাওয়া যাচ্ছিল, তার জন্য ছ' হাজার টাকা লাগবে।

—মাথা ঠাণ্ডা করে আবার আমাদের নতুনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে।

—আবার? ব্রজদা, আমাদের দিন শেষ।

কথাটা শুনে ঘরের সবাই এক মিনিট চুপ করে রইলো। যদিও বোঝা যায়, সকলের মনের মধ্যে অনেক কথার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। একে বলা যায় আসন্নপ্রসবিনী স্তব্ধতা।

ব্রজগোপাল তাঁর লম্বাটে মুখখানায় বিষণ্ণ হাসি ফুটিয়ে বললেন, এত সহজেই ভেঙে পড়ছো, শংকর?

শংকরবাবু বললেন, ভেঙে পড়ার কোনো প্রশ্ন নয়। সতরো বছর বয়েস থেকে ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি। এখন আমার বয়েস ছত্রিশ। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা জেলখানার মধ্যে কিংবা বাইরে থেকেও পালিয়ে পালিয়ে কাটালাম। কত দিন হয়ে গেল নিজের বাড়িতে নিজের বালিশ মাথায় দিয়ে শুইনি। সেজন্য আমার কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে, কি করলাম? দেশের কোন্ কাজে লাগলাম? এটা শুধু আমাদের একটা নেশা না আর কিছু? সামান্য কিছু বোমা পিস্তল নিয়ে আমরা ইংরেজকে তাড়াবো? ভারতের সব জায়গায় আমাদের সংগঠন নেই—বাংলাদেশেও নানা দল—এ আমরা কি করছি? আমরা শুধু চোর-ডাকাত আর খুনের মতন—

ব্রজগোপাল তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, তুমি শুধু নৈরাশ্যের দিকটাই দেখছো। কিন্তু চরম মুহূর্ত এসে গেছে—এই আমাদের শেষ সুযোগ। ইওরোপে যুদ্ধ বেধে গেছে—এবার ইংরজকে শেষ ধাক্কা দিতে পারলেই—

ননীমাধব যুদ্ধের কথাটা হালকাভাবে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, ব্রজ, তুমি ঐ যুদ্ধের ওপর বেশী ভরসা করো না। এ যুদ্ধ দু'দিনেই শেষ হয়ে যাবে। পোলাণ্ড নিয়ে ঝগড়া—এ যুদ্ধ হবে ইংরেজ-ফরাসীর বিরুদ্ধে জার্মানির। জার্মানির সাধ্য কি একা ইংরেজ-ফরাসীর বিরুদ্ধে লড়ে?

—হিটলারকে হেলাফেলা করো না! ওনার পাওয়ার আর অ্যামবিশন দুটোই অনেক বেশী। যে-ভাবে চেকোশ্লোভাকিয়াকে পকেটে পুরলো, দেখলে না? নাৎসীদের অভ্যুত্থান যদি লক্ষ্য করো—

—হিটলারের যতই ক্ষমতা থাক—ফ্রান্সের ম্যাজিনো লাইন ভেদ করার সামর্থ্য তার হবে না। তা ছাড়া ইংরেজদের নৌশক্তি—তার বিরুদ্ধে জার্মানি? ফুঃ! ইংরেজ রাজত্বে সূর্য ডোবে না—সেই তুলনায় ঐটুকু জার্মানি কি করবে? আর একটা কথাও তোমাকে বলে দিচ্ছি—ঘরের পাশে হিটলারের এত বাড়াবাড়ি স্ট্যালিন সহ্য করবে না।

—স্ট্যালিনের কথা ছাড়ো! তুমি ভুলে যাচ্ছো—স্ট্যালিন হিটলারের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করেছে। রাশিয়ার যদি মুরোদ থাকতো তা হলে নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে এরকম-ভাবে হাত মেলাতো না। হিটলারের দেখাদেখি চুপে চুপে ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

—কিন্তু হিটলার রুশদের ঘৃণা করে। ওর মতে রুশরা খাঁটি আর্য নয়—তাছাড়া কম্যুনিজ্‌মের সঙ্গে নাৎসীবাদ কখনো পাশাপাশি চলতে পারে?

—চলছে তো দেখতে পাচ্ছি। রুশদের যদি ঠেকিয়ে রাখা যায়—তা হলে হিটলার দুর্ধর্ষ হয়ে উঠবে, সঙ্গে ঐ মুসোলিনী গুণ্ডাটা আছে—ইংরেজদের এবার শেষ করবে।

—আমেরিকা ইংরেজদের পক্ষে আসবে।

—রুজভেল্ট? অসম্ভব! রুজভেল্ট যুদ্ধে যোগ দেবে না কিছুতেই। তার কি দায় পড়েছে সাধ করে ইওরোপের যুদ্ধ ঘাড়ে নেবার। আমেরিকার জনমতও যুদ্ধের বিরুদ্ধে—তারা বরং এই মওকায় কিছু ব্যবসা করে নেবে।

শংকরবাবু এতক্ষণ ননীমাধব আর ব্রজগোপালের আলোচনা শুনছিলেন। এবার গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন, কিন্তু ইওরোপের যুদ্ধে আমাদের কি সুবিধে হবে?

ব্রজগোপাল বললেন, এই যুদ্ধে ইংরেজ ঘায়েল হলে ভারতে বৃটিশ শক্তি দুর্বল হয়ে যাবে। আমরা ওদের শেষ আঘাত দেবো।

—জার্মানি যদি জেতে?

—যদি টদি নয়, জার্মানি জিতবেই।

—আমার কথাটা শুনুন। জার্মানি যদি জেতে—তখন কি আমরা ইংরেজের বদলে জার্মানীর অধীনে চলে যাবো?

—জার্মানি এত দূর এসে কলোনি করতে চায় না। তাছাড়া, জার্মানরা ভারতীয়-দের বন্ধু মনে করে—আমরাও বিশুদ্ধ আর্য। আমাদের সাহিত্য, দর্শনকে ওরা শ্রদ্ধা করে। আমার কাছে সিক্রেট খবর আছে, জার্মানি আমাদের সাহায্য করবে। আমেরিকাও ভারতের স্বাধীনতা চায়। প্রথম মহাযুদ্ধে আমরা পুরো সুযোগ নিতে পারি নি—এবারেও যদি না পারি—তা হলে স্বাধীনতা আর কোনদিন আসবে না।

—আপনার কথা মতন না হয় ধরেই নিচ্ছি—এবারেই আমাদের বড় সুযোগ। কিন্তু নেতৃত্ব দেবে কে? কংগ্রেস এখন পুরোপুরি কনস্টিটিউশনাল রাজনীতির দিকে চলে গেছে। আমাদের ওরা ঘৃণা করে। ওরা চায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতার ভাগ পেতে। আমাদের দাদারাও অনেকে কংগ্রেসে গিয়ে ভিড়েছে। আমাদের কি আছে এখন? এখানে-ওখানে কয়েকজন ছড়িয়ে আছি—সংগঠন ভেঙে গেছে, অস্ত্র নেই, বিশ্বাসঘাতক ঢুকেছে—এই শক্তি নিয়ে আমরা ইংরেজ তাড়াবো?

—উত্তেজিত হয়ো না। ঠাণ্ডা মাথায় বুঝবার চেষ্টা করো। সুভাষবাবু কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এখন সুভাষবাবুকে আমরা দলে পাবো। সারা ভারতের যুব-

শক্তি এখন সুভাষবাবুর দিকে তাকিয়ে আছে—মোহনদাস গান্ধীর দিন শেষ! ত্রিপুরী কংগ্রেসেই তিনি কংগ্রেসী ঐক্যের কবর দিয়েছেন।

—সুভাষবাবুকে ইংরেজ জেলে পুরেই রাখবে। ইংরেজ কি বোকা যে এই অবস্থায় সুভাষবাবুকে বাইরে ছেড়ে দেবে? ব্রজদা, রাজনীতি এখন অন্য দিকে যাচ্ছে। ইংরেজের সবচেয়ে মারাত্মক চালটা আপনারা এখনও ধরতে পারছেন না। মুসলীম লীগের কথা ভুলে যাচ্ছেন? ইংরেজ এখন মুসলীম লীগকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। এখন আর স্বাধীনতা বড় প্রশ্ন নয়—এখন হিন্দুর স্বাধীনতা, মুসলমানের স্বাধীনতা? সারা দেশ জুড়ে এখন চলবে মন-কষাকষি, দর-কষাকষি—আমরা পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাবো ক্রমশ।

শংকরবাবু গাঢ় চোখে তারিখ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি, ঠিক বলছি না?

তারিখ সাহেব হাত নেড়ে বললেন, মুসলীম লীগকে অত গুরুত্ব দেবেন না। ও সব জিন্না সাহেবের খেয়াল। নিজের হাতে পাওয়ার রাখবার জন্য।

—মুসলীম লীগকে গুরুত্ব না দিয়ে আপনারাই ভুল করছেন। কংগ্রেসও এই ভুল করেছে। গোড়া থেকেই জিন্না সাহেবের সঙ্গে আঁতাত করেনি। এখন কংগ্রেস সারা ভারতে একজনের বেশী ন্যাশনালিস্ট মুসলমানকে ভোটে জেতাতে পারলো না। মুসলমানদের মনে বিশ্বাস জেগেছে যে তাঁদের অধিকার আদায় করার জন্য মুসলীম লীগ ছাড়া গতি নেই। কংগ্রেসী স্বাধীনতা এলে হিন্দুদেরই আধিপত্য হবে। আবুল কালাম আজাদ এ বিশ্বাসে একটুও চিড় খাওয়াতে পারলেন না। কংগ্রেস শুধু জোড়া-তালি দিয়ে চালাবার চেষ্টা করছে—গান্ধীজী শুধু কোরান পাঠ করে মুসলমানদের মন জয় করার কথা ভাবছেন।

তারিখ সাহেব বললেন, কংগ্রেস শুধু ফাঁকা আইডিয়ালিজম দেখাচ্ছে। মুসলমান সমাজে বহুৎ অভাব আর অভিযোগ তো আছেই! গরীব চাষীদের মহাজন আর জমিদাররা রক্ত নিংড়ে নিচ্ছে—মুসলমান সমাজে এখনো শিক্ষার সুযোগ নেই, চাকরি-নোকরির সুযোগ নেই—

ব্রজগোপাল অসহিষ্ণুভাবে বললেন, এটা সামাজিক সমস্যা! সামাজিক! এর সঙ্গে স্বাধীনতার প্রশ্নটা জুড়ে দেওয়া বোকামি! হিন্দুদের মধ্যেও অনেক শ্রেণী আছে—যারা খুবই গরীব, খুবই নির্যাতিত, শিক্ষার সুযোগ নেই! গরীবের আবার জাত কি? হিন্দু জমিদার কি হিন্দু প্রজাদের ছেড়ে কথা কয়? মুসলমান মহাজন মুসলমান চাষীর কাছে সুদ নেয় না? জাতের ভিত্তিতে সমস্যাটা তুলে ধরাই ব্রিটিশ চক্রান্ত।

শংকরবাবু বললেন, তারিখ সাহেব, এমন দিন আসছে—সেদিন আপনি আর আমি এরকম ভাবে পাশাপাশি বসে আর কথা বলতে পারবো না। আপনি আমাকে অবিশ্বাস করবেন, আমি আপনাকে অবিশ্বাস করবো!

তারিখ সাহেব বললেন, আপনি কি বলছেন কি? আপনি এত পেসিমিস্ট হয়ে যাচ্ছেন কেন?

—আমি বুঝতে পারছি, আমাদের দিন শেষ হয়ে আসছে। আমরা ওলড ফ্যাসানড্ বিপ্লবী। আমরা এখনো চোরা গোপ্তা আর দু'একটা খুন জখম করে দেশ স্বাধীন করতে চাইছি! আমি আর আপনাদের দলে নেই। আমার মতে মার্কসবাদই একমাত্র পন্থা। ধর্মের প্রশ্নটা যে হঠাৎ এরকম মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে, আমরা কি আগে ভেবেছি? সারা দেশে একটা শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে না তুলতে পারলে এ প্রশ্ন আর এখনো মিটবে না। সেজন্য অনেক ধৈর্য নিয়ে কাজ করতে হবে। সারা দেশব্যাপী

একটা অভ্যুত্থান ঘটাতে না পারলে সে সমাজ কখনো আসবে না।

ব্রজগোপাল বললেন, শংকর আমি বলছি, বিশ্বাস করো, শিগগিরই একটা দারুণ বড় রকমের ঘটনা ঘটবে। খুবই সাংঘাতিক ঘটনা। তখন আমাদের প্রত্যেককে সৈনিক হতে হবে।

শংকরবাবু পকেট থেকে পিস্তলটা বার করে মাদুরের ওপর রেখে বললেন, এই নিন। আমাকে আর আপনার দলে পাবেন না। আমি মনস্থির করে ফেলেছি।

—কোথায় যাবে? তুমি কি এতদিন বাদে নিজের বাড়িতে ফিরবে?

ক্লান্ত বিপ্লবী এবার করুণভাবে হাসলো। তারপর বললো, না, দেখি! বাড়ি আর ফিরবো কি করে! আমি তো এখন ফেরারী ডাকাত! লুঠের বখরা পাইনি, তবু তো ডাকাত!

ব্রজগোপাল কঠোর স্বরে বললেন, শংকর, হুটপাট করে কিছু করো না। আমাকে দু'একদিন ভেবে দেখতে দাও। আর একটা কথাও আমি বলে রাখছি, যোগানন্দ যদি সত্যিই আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে—তবে তার রক্তদর্শন না করে আমি থামবো না। আজ না হোক দু'চার বছর বাদে দেশ স্বাধীন হবেই—ইতিহাসের গতি সেই দিকে—কিন্তু সেই স্বাধীন দেশে বিশ্বাসঘাতকদের কোনো স্থান হবে না। আমার সেই স্বাধীন ভারতবর্ষ হবে সমস্ত রকম অন্যায়, অবিচার, থেকে মুক্ত। আমি সেদিন না বেঁচে থাকলেও ক্ষতি নেই—তবু আমার পরের মানুষরা যেন সত্যিকারের মানুষের অধিকার পায়। সেই জন্যই তো এত বছর ধরে এত কষ্ট সহ্য করলাম।

॥ ২৩ ॥

ফিটন থেকে একজন রোগা মতন প্রৌঢ় নামলেন। নেমেই ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, অনুকূলরা এখনো আসেনি?

বড়বাবু দরজা থেকে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে বললেন, আসুন, আসুন! না, ওনারা তো কেউ এখনো এসে পৌঁছোননি!

প্রৌঢ়টির পরনে একটি বড় পাড়ের ধুতি, বেনিয়ান ও সিল্কের উড়ুনি। ধুতিটি কিন্তু প্রায় হাঁটুর কাছে তোলা। চুল ও ভুরু কাঁচা-পাকা। মুখখানি শুকনো নারকোল মালার মতন, সব সময় রাগী রাগী ভাব। জামার ঘড়ি-পকেট থেকে চেন-বাঁধা গোল ঘড়ি বার করে দেখে বললেন, আমাকে বলেছিল, সাড়ে পাঁচটার সময় আসবে—এখন পঁয়তিরিশ হয়ে গেল—এর পর আলো পড়ে আসবে—

চিররঞ্জন বড়বাবুর দিকে চোখাচোখি করলেন। অর্থাৎ এই রাগী প্রৌঢ়টির মনোরঞ্জন করা খুব সহজ হবে না।

বসবার ঘরটি আজ অন্য রকমভাবে সাজানো হয়েছে। টেবিল-চেয়ার সোফা কৌচ দেয়ালের দিকে হঠিয়ে দিয়ে মাঝখানে পাতা হয়েছে কার্পেট—সেই কার্পেটের ডিজাইন—একটি সিংহ লাফিয়ে পড়ছে হরিণের ওপর। কার্পেটের ওপর পিতলের বড় ফুলদানিতে এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা। জানলার পর্দাগুলি সব নতুন।

পাম্প-শু খুলে প্রৌঢ়টি বসলেন কার্পেটে—চিররঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিকে একটি তাকিয়া এগিয়ে দিলেন। তাতে হেলান দিয়ে বসে প্রৌঢ় বড়বাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কন্যা আপনার?

বড়বাবু বললেন, আজ্ঞে না। আমিও এ বাড়ির জামাই। চিররঞ্জনকে দেখিয়ে বললেন, ইনি পাত্রীর কাকা। পাত্রীর বাবা একটু বাদেই এসে পড়বেন।

প্রৌঢ় বললেন, পাত্র আমার মেজ ভাইয়ের বড় ছেলে।

বড়বাবু বললেন, ও হ্যাঁ, আপনার কথা শুনেছি। মহাশয়ের নামই তো রাজীবলোচন হালদার?

হ্যাঁ। কালীঘাটের হালদারদের কেউ নই। আমরা নেবুবাগানের হালদার—আমাদের তিন পুরুষ ধরে আয়না কাঁচের কারবার।

আপনার জন্য একটু চা? কিংবা শরবত?

—এখন না, এখন না—

রাজীবলোচন আবার ঘড়ি দেখলেন এবং জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। দিনের আলো কমে আসছে--এটা তাঁর একদম পছন্দ নয় মনে হচ্ছে। ইলেকট্রিক আলোয় মেয়ে দেখার ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাস নেই। শ্যামলা মেয়েকেও পমেটম পাউডার ঘষে ফর্সা বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

বড়বাবু ও চিররঞ্জন খানিকটা তটস্থ হয়ে বসে আছেন। একে পাত্র পক্ষ, তাও পাত্রের জ্যাঠামশাই, এ'কে খুশী করার কি কি উপায়—চিন্তা করছেন দু'জনে। ওঁরা আগেই শুনেছেন যে, এই রাজীবলোচন নিঃসন্তান। এ'র বিষয়-সম্পত্তি ওই ভাইপোই পাবে—সুতরাং এ'র কথার ওপর কেউ কথা বলবেন না। প্রিয়রঞ্জন জরুরী ব্যবসার কাজে আটকে পড়েছেন—ফিরতে একটু দেরি হবে— পই পই করে বলে গেছেন যেন পাত্রপক্ষের অভ্যর্থনায় পান থেকে চুন না খসে। ও বাড়ির মেয়েরা একবার দল বেঁধে দেখে গেছে—মোটামুটি পছন্দও হয়েছে—আজ আসছেন বাড়ির কর্তাব্যক্তিরা—এ'দের মর্জির ওপরেই সব নির্ভর করছে। পাত্র সুদর্শন, বি. এ. ফেল, পৈতৃক ব্যবসা দেখাশুনো করে, প্রচুর সম্পত্তি।

রাজীবলোচন চিররঞ্জনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, মশাইদের আদিবাস কোতায়?

—আজ্ঞে, ফরিদপুরে।

—কোন্ মহকুমা?

—মাদারীপুর সাব-ডিভিশনে।

—কোন্ গ্রাম? বলুন, বলুন, আমার ওসব জায়গা ঘোরা আচে।

—ফুলবাড়ি, মামুদপুরের পাশেই।

—ঘুরিচি, সব জায়গায় ঘুরিচি। বড় এ'দো পচা সব জায়গা। আমরা জানেন তো, বাঙাল বাড়ির সঙ্গে এর আগে কখনো সম্বন্ধ করিনি। আমার মশাই খোলাখুলি কতা। বাঙালদের হালচাল আলাদা—আমাদের আলাদা। তা, এর আগে চৌদ্দ পনরোটি মেয়ে দেখা হলো--কারুর সঙ্গেই আমাদের ছেলের কুষ্ঠির মিল হয় না। লগ্ন মেলে তো রাশি মেলে না। এদিকে আমার মায়ের বয়েস বিরাশি বছর—তিনি বায়না ধরেছেন যে, নাতির বিয়ে দেখে যাবেন। আপনাদের মেয়ে মানিয়ে চলতে পারবে তো?

চিররঞ্জন বললেন, নিশ্চয়ই! মেয়ে আমাদের ভারী ঠান্ডা। যেমনটি আপনারা শিখিয়ে পড়িয়ে নেবেন।

—আমরা কিন্ত বাড়ির বৌদের বাপের বাড়ি পাঠাই না।

—তা, মানে, আপনারা যা—

—আপনারা শুঁটকি মাছ খান?

বড়বাবু হেসে বললেন, আমি খাই। এ বাড়ির অন্য আর কেউ খায় না। সব বাঙালরা খায় না।

—কি পান বলুন তো ওতে? গন্ধে নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসে! কুকুর-বেড়ালেও ছোঁয় না। দেশে কি মাছের অভাব আছে যে শুকিয়ে আমসি করে খেতে হবে?

বড়বাবু কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। পাত্রের গুরুত্বপূর্ণ জ্যাঠা-মশাইয়ের সঙ্গে তর্ক করা যায় না। কিছু না বলে তাকিয়ে রইলেন হাসি-হাসি মুখ করে।

এই সময় আর একটা গাড়িতে আরও পাঁচজন এসে উপস্থিত হলেন। এঁদের মধ্যে আছেন পাত্রের বাবা, এক কাকা ও বাড়ির দুই জামাই ও এক শ্যালক। ভদ্রতা, নমস্কার ও কুশলাদি বিনিময়ের পর খাবার আসতে আরম্ভ করলো, প্রথমে সকলের জন্য প্লেটে প্লেটে ফল—বাতাবি লেবু, আম, আনারস, আপেল, খেজুর। তারপর আলাদা প্লেটে লুচি, আলুরদম ও ক্ষীর। আবার আলাদা প্লেটে সন্দেশ, শোনপাপড়ি ও দই। এই বিপুল খাদ্যের অধিকাংশই নষ্ট হলো। পাত্রের পেটুক কাকা শুধু নিজের সব কিছু চেপে-পুটে খেলেন, বাকিরা নাড়াচাড়া করলেন মাত্র। জ্যাঠামশাইটি শুধু এক টুকরো ফল তুলে মুখে দিলেন। 'লুচি খেলেই তাঁর অম্বল হয়'—একথা জানালেন—এবং অম্বল হলে কি কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—এ সব বিশদভাবে আলোচিত হলো।

খাবার পর্বের শেষ দিকে উপস্থিত হলেন প্রিয়রঞ্জন। দেরি হবার জন্য ক্ষমা চাইলেন বার বার—এবং সকলকেই আর একটু খাবার মুখে তোলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। সম্পূর্ণ নির্লজ্জভাবে জানিয়ে দিলেন যে—এই সব খাবারই তাঁর মেয়ের তৈরী। কেউ কোনো প্রতিবাদ করলেন না। মেয়ের সূচকর্ম, রন্ধনপটুতা, সেবাপরায়ণতা সম্পর্কে বিস্তারিত বলার পর প্রিয়রঞ্জন অকস্মাৎ ঘোষণা করলেন, তবে হ্যাঁ, আর একটা কথাও জানানো দরকার। আমার মেয়ে নাচ-গান জানে না। ও সব শেখাবার চল নেই এ বাড়িতে।

এ সংবাদে পাত্রের জ্যাঠামশাই বেশ সন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন, বাড়ির বউ তো আর থিয়েটারে অ্যাকটো করতে যাবে না! ও সবের দরকারটা কি?

পান চিবুতে চিবুতে আরও কিছু কথা হলো। কিন্তু দেনা-পাওনার বিষয়টা ঘুণাক্ষরেও তুললেন না পাত্রপক্ষ। তাঁরা অত কাঁচা নন, ওই আলোচনা তাঁরা করবেন নিজের বাড়িতে বসে—যেখানে পাত্রীর বাবা কৃপাপ্রার্থী হয়ে যাবেন। নিজের বাড়িতে বসে দর-কষাকষি অনেক সুবিধে।

কিছুক্ষণ পর রাজীবলোচন বললেন, তা হলে এবার—

প্রিয়রঞ্জন ব্যস্ত হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! ওরে, পাঠিয়ে দেনা—

রাজীবলোচন খুঁত খুঁত করে বললেন, বেলা পড়ে গেল একেবারে—

অন্দরমহলে শ্রীলেখাকে সাজানো শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আজ দুপুরে তাকে জোর করে ঘুম পাড়ানো হয়েছে—যাতে চোখ দুটি বেশ ভরাট দেখায়। স্নান করেছে ব্যাসন ও কাঁচা হলুদ মেখে। পায়ে আলতা, চোখে কাজল, সারা শরীরে ফেস পাউডার। শ্রীলেখার গায়ের রং তেমন ফর্সা নয়—কিন্তু আজ এত প্রসাধন তার সর্বাঙ্গের চামড়ায় একটা চিক্কণ ঔজ্জ্বল্য এসেছে। তার চক্ষু দুটির চাপা উদ্বেগের জন্য তাকে আজ আরও মোহময়ী মনে হয়।

শ্রীলেখা এর আগে আরও চারবার বিভিন্ন পাত্রপক্ষের সামনে হাজির হয়েছে।

তবু তার লজ্জা ও শংকা কাটেনি। ডাক আসতেই সে যেন কেঁপে উঠলো। চেপে ধরলো তার মায়ের হাত। তখন শ্রীলেখাকে দু দিকে দুজন ধরে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে আসা হলো, যেন সে মানুষ নয়, একটা পুতুল।

অন্য মেয়েরা দরজার কাছে এসে থেমে গেল, ভেতরে যেতে হবে শ্রীলেখাকে একা। সে দরজা থেকে দু-পা গিয়ে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, চিবুক বুকে ঠেকানো। অন্য কেউ কিছু বলছে না দেখে বড়বাবুই উঠে গিয়ে তার হাত ধরে এনে বসিয়ে দিলেন।

দরজার ওপাশে মেয়েদের ভিড়। সান্ত্বনাকে শুধু নিচে নামতেই দেওয়া হয়নি—তার গায়ের রং বেশী ফর্সা—যদি তাকে দেখেই পাত্রপক্ষের পছন্দ হয়ে যায়। বাদল হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল—চিররঞ্জন তাকে চোখ দিয়ে বকলেন। বাদল তবু গেল না—দরজার চৌকাঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলো।

পাত্রের পেটুক কাকাই প্রথম প্রশ্নটা করলেন। তোমার নাম কি মা?

শ্রীলেখা চুপ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করাতেও শ্রীলেখা উত্তর না দেওয়ায় প্রিয়রঞ্জন একটু চঞ্চল হলেন। বললেন, বল্, নাম বল্!

শ্রীলেখা কার্পেটের সিংহের দিকে তাকিয়ে খুবই আস্তে আস্তে নিজের নাম বললো।

অনেকেই শুনতে পেলেন না, তবু কেউ অপ্রসন্ন হলেন না। পাত্রীর লাজুকতা তার গুণেরই পরিচয়।

এর পরের প্রশ্নগুলোও মামুলি ধরনের। কোন্ ক্লাসে পড়ো, ইতিহাস ভালো লাগে না অংক ভালো লাগে, যুদ্ধ কোন্ কোন্ দেশের সংগে বেধেছে ইত্যাদি। শ্রীলেখা অধিকাংশ প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারলো না কিংবা লজ্জায় দিল না।

তারপর রাজীবলোচন মূল ভূমিকা নিয়ে ফেললেন। রাজীবলোচনের কথায় নম্রতা বা বিনয় নেই। তিনি প্রথমেই ভূমিকা করলেন, ছেলেমেয়ে হলে মায়ের কাছ থেকেই লেখাপড়া শুরু করা দরকার। সেই জন্যই আজকালকার মেয়েদের লেখাপড়া কিছুটা জানা উচিত। এবং লেখাপড়া বলতে ইংরেজিই তো প্রধান। শ্রীলেখা কি এক ডজন ভেড়ার ইংরেজি জানে? এক ডজন জাহাজ?

রাজীবলোচন এমন কড়া গলায় প্রশ্ন করছিলেন যে উত্তর না দিয়ে উপায় নেই। এ যেন ইস্কুলের রাগী মাস্টারমশাই।

—এবার বলো তো মা গণ্ডার ইংরেজি কি?

—রাইনোসেরাস।

—রাইনোসেরাস বানান কি?

এটা রাজীবলোচন একটা কাঁচা কাজ করে ফেললেন, কেননা, রাইনোসেরাস, কনসান্স আর হাইজিন—এই বানানগুলো প্রত্যেকেই এসে জিজ্ঞেস করে বলে শ্রীলেখাকে ভালো করে মুখস্ত করিয়ে দেওয়া আছে। এর উত্তর শুনে তৃপ্ত হয়ে রাজীবলোচন বললেন, আচ্ছা বেশ! এবার দু লাইন বাংলা পদ্য বলছি—পর পর দশবার বলে যাও তো! তাড়াতাড়ি বল!

জলে চুন তাজা
তেলে চুল ভাজা!

শ্রীলেখা একবার ঠিকঠাক বললো। তার পর তাড়াতাড়ি বলতে গিয়েই বুঝতে পারলো, এটা মোটেই সহজ নয়। জিভ জড়িয়ে যায়। দু-একবার বলার চেষ্টা করেই শ্রীলেখা মুখ লাল করে চুপ করে বসে রইলো।

শ্রীলেখার প্রত্যেকটি ব্যর্থতাই তার গুণপনা বলে গণ্য হ'লো। সেইটাই আসল পরীক্ষা। কেননা, যে-মেয়ে গুরুজনদের সামনে টরটর করে কথা বলে, তার চরিত্র ভালো হয় না। রাজীবলোচন যখন রীতিমতন নরম সুরে শ্রীলেখার সঙ্গে ঘরোয়া কথা আলোচনা করতে লাগলেন, তখন সকলেরই মনে হলো, মেয়ে পছন্দ হয়ে গেছে। পাত্র পক্ষ যাবার সময় সেই রকম স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন। অবশ্য পাত্র-পাত্রীর কোষ্ঠী যে একেবারে রাজযোটক—সেটাও খুব বড় কথা।

সূর্য ফিরলো সন্ধ্যের পর, যখন বাড়ি থেকে অতিথিরা চলে গেছেন। তার পোশাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত মলিন, চোখ ভেতরে বসা। বাড়ি ফিরে সে কারুর সঙ্গে বিশেষ কথা বললো না, নিজের ঘরে চলে গেল। সূর্য বড়বাবুর হাতে দু-একদিন মার খাবার পর সবাই তার আশা ছেড়ে দিয়েছে। সে কখন কোথায় যায়—কখন বাড়ি ফেরে—এ নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামায় না। বড়বাবু বাড়ি থেকে তখন বেরিয়ে গেছেন। অন্যরা বেশ একটা আনন্দে গল্পে মশগুল। শ্রীলেখার বিয়ে প্রায় ঠিক—এতে তার বাবা-মায়ের মন খুব উৎফুল্ল। শ্রীলেখা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে—আর সান্ত্বনা তাকে খুঁজে খুঁজে রাগাচ্ছে।

বাদল সূর্যর ঘরে গিয়ে বললো, সূর্যদা তুমি এতদিন আসোনি কেন? পরশু আমাদের পাড়ায় টুয়েণ্টি ফোর আওয়ার্স সাইকেল রেস হয়ে গেল?

সূর্য জিজ্ঞেস করলো, তুই সবটা দেখেছিলি?

—হ্যাঁ। সারারাত জেগে—কত আলো—

মিথ্যে কথা। সূর্য সেটা বুঝতে পেরে হাসলো। বাদল ইদানীং বেশ বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলতে শিখেছে। সে দিনের বেলা ভূত দেখে, রাত্তিরে চাঁদের গায়ে একটা ছায়া নড়তে দেখে, বড়দের গলার আওয়াজ নকল করে অন্যদের চমকে দেয়। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বাদল সূর্যকে এই কদিনের যাবতীয় খবর পরিবেশন করে দিল। সূর্য সম্পর্কে বাড়ির কে কি বলেছে, তা-ও বাদ গেল না। মোক্ষম খবরটি জানালো সবার শেষে। জানো সূর্যদা বড়দির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

সূর্য বিশেষ উৎসাহ দেখালো না। নির্লিপ্ত গলায় বললো, আচ্ছা!

—জামাইবাবু না, খুব লম্বা। জ্যাঠামশাই বলেছেন!

—হুঁ!

—জামাইবাবুদের বাড়িতে তিনটে বড় বড় কুকুর আছে। আমি কিন্তু বরযাত্রী যাবো—ছোটরাও যায়। আমি সেদিন কাপড় পরবো।

আটটা বাজতে না বাজতেই সূর্য রান্নাঘরে গিয়ে বললেন, ঠাকুর আমার খাবার দাও। একলা একলা খাবার খেয়ে নিয়ে সূর্য আবার নিজের ঘরে ফিরে গেল। অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বললো তার ঘরে। এক সময় আলো জ্বেলে রেখেই সূর্য বেরিয়ে গেল তার ঘর থেকে।

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় শ্রীলেখা উঠে এলো ছাদে। পাজামা ও গেঞ্জি পরে সূর্য বসে আছে টিনের চেয়ারে—রাস্তার দিকে মুখ করে। শ্রীলেখা আস্তে আস্তে তার পেছনে দাঁড়ালো, সূর্য মুখ ফেরালো না। শ্রীলেখা হাত রাখলো সূর্যর কাঁধে, সে তবু নিঃসাড়।

শ্রীলেখা ডাকলো, এই?

—উঃ?

—আমার সঙ্গে কথা বলবে না?

—কেন?
—কথা বলছো না যে?
—কি বলবো?
—তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?
—কাজে গিয়েছিলাম।
—তোমার সেই জিনিসটা আর আমার কাছে রাখবে না?
—তার আর দরকার নেই।
—কেন?
—তুই তো এ বাড়িতে আর থাকবি না।
—বাঃ, আমি এক্ষুণি চলে যাচ্ছি বুঝি?
—কবে যাচ্ছিস?
—সে-সব এখনো কিছু ঠিক নেই।

সূর্য চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে ছাদের আলসেতে ভর দিয়ে দাঁড়ালো। স্পষ্টতঃ বোঝা যায়, তার মেজাজ ভাল নেই—এমন কি শ্রীলেখার সঙ্গেও সে মনোযোগ দিয়ে কথা বলছে না। হঠাৎ মেঘ সরে গিয়ে আলগা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে সারা শহরে, মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া। এত রাত্তিরেও কোন্ বাড়িতে কলের গান বাজছে।

শ্রীলেখা সূর্যর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললো, আমার বিয়ে হচ্ছে বলে তুমি রাগ করেছো?

—কেন তোর বিয়ে হবে?
—বাঃ হবে না? বাবা, মা—
—আমি তোকে বিয়ে করবো।

শ্রীলেখার মুখখানা অরুণবর্ণ হয়ে গেল।। চাপা গলায় ধমক দিয়ে বললো, কি পাগলের মত যা-তা বকছো?

—অন্য কেউ বিয়ে করতে পারে, আর আমি পারি না?
—অন্য কেউ আর তুমি বুঝি এক?
—কাজিন্‌স ক্যান অলওয়েজ ম্যারি।
—এটা বিলেত পাওনি।

লোকে যেমন বেড়ালছানা আদর করে, সূর্য এক হাতে সেইরকম ভাবে শ্রীলেখার কোমড় আঁকড়ে ধরলো। তারপর বললো, শ্রীলেখা, তোকে যদি অন্য কেউ বিয়ে করে, তাহলে আমি গুলি করে তার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো!

—সূর্যদা, প্লিজ, এরকম অদ্ভুত কথা বলো না। আমার ভয় করে। তোমার সেই জিনিসটা আমার কাছে দিয়ে দাও।

সূর্য শ্রীলেখাকে টেনে সামনে দাঁড় করিয়ে বললো, আমি সত্যি মেরে ফেলবো! বিশ্বাস কর! একটুও বানিয়ে বলছি না!

শ্রীলেখা কোনো উত্তর দেবার আগেই সূর্য তার ডান হাতের তর্জনি শ্রীলেখার ঠোঁটে ঠেকালো। তারপর আঙুলটা শ্রীলেখার সারা মুখে বোলাতে লাগলো—যেন সে কোনো ছবি আঁকছে। শ্রীলেখা কোনো বাধা দিল না। সে বিহ্বলভাবে চেয়ে রইলো সূর্যর মুখের দিকে।

সূর্য আঙুল দিয়ে শ্রীলেখার কাঁচ পেয়ারার মতন স্তনটা উঁচু করে ধরে চেয়ে রইলো, দু'এক মুহূর্ত—তারপর সেখানে নিজের ঠোঁট চেপে চুষতে লাগল। শ্রীলেখা

দ্রুতে তাকালো ছাদের সিঁড়ির দিকে।

সিঁড়ির পাশেই বড়বাবুর ঘর। বড়বাবু নিশ্চিত ঘুমিয়ে পড়েছেন এতক্ষণে—কিন্তু যে-কোনো মুহূর্তেই তো জেগে উঠতে পারেন। শ্রীলেখা প্রাণপণে চেষ্টা করলো জানলার সীমানা থেকে সরে যাবার। কিন্তু সূর্যর বজ্রমুষ্ঠি ছাড়াবার সাধ্য কি তার! ধুতনি ছেড়ে সূর্য শ্রীলেখার গলায় ঠোঁট নিয়ে এলো—তারপর আরও নিচে। শ্রীলেখা জোরে শব্দ করতেও পারছে না। আঁচল সরিয়ে শ্রীলেখার বুকে মুখ গুঁজে সূর্য বললো, তোর বুকে কি সুন্দর গন্ধ!

—সূর্যদা ছেড়ে দাও!

—তোকে আমি এক্ষুণি বিয়ে করবো।

শ্রীলেখার বুকের জামা জোর করে টেনে খুলে ফেলে সূর্য অদ্ভুত ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে রইলো সেদিকে। যেন সে কোনো মানুষের শরীর দেখছে না—দেখছে কোনো অভূতপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য। একজোড়া অনাস্বাদিত ফল, অল্প অল্প কম্পমান। যেন 'নরম' শব্দটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে তার চোখের সামনে। এর থেকে বেশী কোমলতা আর কোথায় আছে পৃথিবীতে?

খুব আলতোভাবে সূর্য সেখানে হাত রাখলো আঙুল দিয়ে ছবি আঁকতে লাগলো, মধুর উত্তাল তার রং। জিভটা নিয়ে এসে ছোঁয়ালো, তাও খুব আলতো ভাবে। ফিস-ফিস করে বললো, আমি তোকে বিয়ে করবো।

দিশেহারা হয়ে শ্রীলেখা বসে পড়লো মাটিতে। ভারী অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে বললো, সূর্যদা, আমি ঠিক মরে যাবো!

সূর্যও বসে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে। শ্রীলেখাকে নিজের বুকের ওপর টেনে এনে পাগল হয়ে গেল। শ্রীলেখার শাড়ী-সায়া-ব্লাউজের বন্ধন ছাড়াবার জন্য এলোমেলো চেষ্টা করে বারবার বলতে লাগলো, আমি তোকে বিয়ে করবো! আমি তোকে বিয়ে করবো! এক্ষুণি!

॥ ২৪ ॥

সূর্য প্রকাশ্যে জানিয়ে দিল যে সে শ্রীলেখাকে বিয়ে করবে। একথা প্রথম বললো সে শ্রীলেখার মাকে। বলার সময় সে একটুও লজ্জা পেল না, চোখ নিচু করলো না, গলা কাঁপালো না। যেন তার মতামতের ওপরই সব কিছু নির্ভর করছে।

এবং পাত্র হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য সে সেদিন থেকেই আবার কলেজে যাওয়া শুরু করলে। এর মধ্যে তাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল—প্রথম দিকে প্রায়ই সে ক্লাস করেনি। বিবাহের ঘোষণাটি জানিয়ে দিয়ে সে গম্ভীরভাবে বইখাতা নিয়ে বেরিয়ে গেল কলেজে।

সুপ্রভা প্রথমে কথাটায় গুরুত্ব দেয়নি, কিন্তু ক্রমশ এই নিয়ে একটা হুলস্থুল পড়ে গেল বাড়িতে। এ রকম অদ্ভুত কথা কেউ কখনো শোনেনি। ষোলো বছরের ছেলে আর পনেরো বছরের মেয়ে—এবং একই পরিবারভুক্ত, তারা বিয়ে করতে চায়। কি মনে করে এরা? বিয়ে মানে কি বৃষ্টির জলে কাগজের নৌকো ভাসানো?

শ্রীলেখাকে হাজার কথা জিজ্ঞেস করেও একটাও ঠিক মতন উত্তর পাওয়া যায় না। সে শুধু বারবার বলে, আমি কিছু জানি না, আমি কিছু জানি না! ভয়ে তার মুখ

নীলচে বর্ণ ধরেছে, চোখ বসে গেছে কোটরে—কান্নার ক্ষমতাও তার নেই। তার মা ও কাকীমা তাকে বারবার জেরা করতে লাগলেন, তুই কিছু বলেছিস? সূর্যর মাথায় একথা এলো কি করে? কি করে সে এত সাহস পায়?

শ্রীলেখার সেই একই উত্তর—আমি কিছু জানি না। আমি কিছু জানি না।

সন্ধেবেলা সূর্য বাড়ি ফিরে এসেই শ্রীলেখাকে ডাকলো। চেঁচিয়ে গলা ফাটালো—তবু শ্রীলেখাকে পাওয়া গেল না। তাকে তার মা কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছেন।

প্রিয়রঞ্জনের কাছে ব্যাপারটা দু' একদিন গোপন করে রাখার চেষ্টা হলো। শেষ পর্যন্ত তাঁর কানে গেলই। শুনেই প্রিয়রঞ্জন ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তাঁর চরিত্রে বিস্ময়বোধ নেই, তিনি কোনো কথা শুনে হতবাক হয়ে যান না—অপছন্দের কিছু হলেই তিনি রাগারাগি শুরু করেন। প্রথমেই তিনি বকতে লাগলেন সুপ্রভাকে। মা এত লাই দিয়েছে বলেই তো মেয়ে উচ্ছন্নে যাচ্ছে। মা যদি মেয়েকে সামলাতে না পারে তাহলে কে পারবে? অতবড় ধিঙ্গি মেয়েকে কেউ চোখের আড়াল করে? আর ঐ সূর্য তিতি তো গোড়া থেকেই জানেন, ওটা একটা নচ্ছার, হারামজাদা। বজ্জাত, কুজাত!

শ্রীলেখাকে হাতের কাছে পেলে তিনি নিশ্চিত সেদিন মারধোর করতেন। প্রধানতঃ বারবার রাগ থেকে বাঁচাবার জন্যই সুপ্রভা শ্রীলেখাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর দূর সম্পর্কের বোনের কাছে।

বাইরের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিবর্তন না করেই প্রিয়রঞ্জন চটি ফটফটিয়ে অমর, অমর বলে ডাকতে ডাকতে উঠে এলেন তিনতলায়। অমরনাথ তখন ইজিচেয়ারে শুয়ে এমাণ্ডসেনের ভ্রমণ-বিবরণী পড়ছিলেন। রাত্রে তিনি চোখে কম দেখেন বলে বইখানা একেবারে চোখের সামনে ধরা।

কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, বড়বাবু একথা শুনে স্তম্ভিত বা ক্রুদ্ধ হলেন না। হেসে উঠলেন হো হো করে। হাসতে হাসতেই বললেন, তাই নাকি? ব্যাটা এরই মধ্যে বিয়ে করতে চায়? তা মন্দ কি?

প্রিয়রঞ্জন হাসি ঠাট্টার ধার ধারেন না। তিনি কঠোরভাবে বললেন, তুমি বলছো কি অমর? তোমারও কি মাথা খারাপ হয়ে গেল!

বড়বাবু উত্তর দিলেন, কেন, তোমার এত অমত কিসে? আমার বিষয়-সম্পত্তি সব তো সূর্যিই পাবে।

—বিষয়-সম্পত্তির জন্য আমি মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেব?

—আহা, ওরা নিজে থেকেই যদি চায়—

—আমার মেয়ে কক্ষনো এ রকম চাইতে পারে না। এরকম কথা সে উচ্চারণ করলে তার দাঁত ক'খানা খুলে ফেলে দেবো না।

—ওরকম ভয় দেখালে আর সে বলবে কি করে? বরং সহজভাবে তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেই হয়।

—সে এখন এ বাড়িতে নেই।

—আসবে তো! তখন জিজ্ঞেস করলেই হবে। এত ব্যস্ত হবার তো কিছু নেই।

—তুমি বুঝতে পারছো না, অমর। তুমি মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছ না—কিন্তু মেয়ে আমার। মেয়ে-সন্তানের গায়ে যদি একটু কলঙ্ক লাগে, তাহলে সারাজীবন সে সুখ পাবে না। বাপ হয়ে মেয়েকে আমি সেই জায়গায় ঠেলে দেবো?

—আমি হয়তো সত্যিই তোমার মতন বুঝতে পারছি না। তোমার আপত্তিগুলো

কি বলো তো! আমি নিজে অবশ্য বাল্যবিবাহের মন্দের কিছু দেখি না। প্রকৃতির যা বিধান, তাকে অমান্য করলে ফল ভালো হয় না। যৌবন আর ক'দিনের!

—তা বলে ষোলো বছরের ছেলের বিয়ে?

—তোমার পিতাঠাকুর বোধহয় তার চেয়েও কম বয়েসে প্রথম বিবাহ করেছিলেন। অন্তত আমার বাবা তো করেছিলেন। যাক গে সে কথা না তোলাই ভালো—কিন্তু বিয়েটা আজই হচ্ছে না। তিন চার বছর যাক না—সূর্যটা অন্তত গ্রাজুয়েট হয়ে নিক্। এর মধ্যে যদি কথাবার্তা ঠিকঠাক হয়ে থাকে—

—এ বিয়ে হওয়া অসম্ভব!

—ধরে নিলাম অসম্ভব। কিন্তু তোমার এত আপত্তির কারণটাই বা কি?

—আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিয়ে হয়? লোকে তো জানে, ওরা আত্মীয়। আমাদের বংশে এরকম বেলেল্লাপানা কেউ কখনো করেনি।

—তোমার বংশাভিমান আছে, আমার অবশ্য তা নেই। আমার ছেলে মুচি মেথরের মেয়েকে বিয়ে করলেও আমার আপত্তি থাকবে না।

—তোমার পক্ষে সেটা বলা সহজ। ও ছেলের কোনো জাতের ঠিক আছে! ও যে তোমার ছেলে তার কোন ঠিক আছে?

বড়বাবুর মুখ থেকে হাসি মুছে গেল। স্থির চোখে প্রিয়রঞ্জনের দিকে চেয়ে রইলেন দু'এক পল। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, পি. আর, ছেলের দোষে তার মায়ের নামে কলঙ্ক দেওয়া সুরুচির পরিচয় নয়। তোমাদের চোখে ওর মা ছিলেন একজন নাচনেওয়ালি। আমার চোখে তিনি ছিলেন একজন উঁচু জাতের শিল্পী। সেই রক্ত আছে আমার ছেলের শরীরে। ও সাধারণ মানুষের মতন হবে না।

—ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর-সংসার করতে গেলে ওসব শিল্পটিল্প চলে না।

—আমি আর সে-রকমভাবে সংসার করলাম কবে?

—ঐ ছেলেকে নিয়ে তোমাকে অনেক দুঃখ পেতে হবে।

—তুমি আমাকে অভিশাপ দিচ্ছো?

—অভিশাপ না, আমার কর্তব্য তোমাকে সাবধান করে দেওয়া। ও ছেলেকে বিদায় করে দাও! কলা দিয়ে ঐ কাল সাপ পুষো না।

—নিজের ছেলেকে তাড়িয়ে দিতে বলছো!

—তাছাড়া আর কি করবে! ও ছেলেকে শাসন করার ক্ষমতাও তোমার নেই। এত তো মারধোর করলে—পারলে ওকে আটকাতে? যখন তখন বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, কুসঙ্গে মিশছে। এখন নিজের বোনের দিকেও কুদৃষ্টি দেয়।

—ওকে আমি আবার হোস্টেলে পাঠিয়ে দিতে পারি।

—হোস্টেলে থেকেও এখন আর ও ছেলে বাগ মানবে না!

—সূর্য তোমার বোনের ছেলে নয়! তোমাদের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা খুব ক্ষীণ। এত ক্ষীণ সম্পর্কে বিবাহ আটকায় না।

—ও কথাটা তুমি দ্বিতীয়বার আর আমার সামনে উচ্চারণ করো না। ওর সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার চেয়ে তাকে বিষ খাইয়ে মারবো।

—আহা, এত বিচলিত হচ্ছো কেন? বেশ তো বিয়ে হবে না। ওদের ওসব ছেলে-মানুষী কথা—নিষেধ করে দিলেই হবে। অল্প বয়েসে ওরকম কত কি ইচ্ছে হয়!

—শুধু নিষেধ করলে তোমার ছেলে শুনবে? ঐ গোঁয়ারগোবিন্দ ছেলে, কারুর কথা শোনে না। এই সব কথা যদি পাঁচকান হয়—আমার মেয়ে খুঁতো হয়ে যাবে না?

তোর আর বিয়ে হবে?

বড়বাবু হঠাৎ সূর্য সম্পর্কে খুব মায়া অনুভব করলেন। কী-ই বা বয়েস, বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু হয়নি এখনো—না হলে মুখ ফুটে কেউ নিজের বিয়ের কথা বলে? কিশোর বয়েসে কত রকম সুখস্বপ্ন থাকে!

বড়বাবুর ইচ্ছে হলো একটু চিররঞ্জনের সঙ্গে পরামর্শ করার। কিন্তু কাল থেকে চিররঞ্জনের খুব জ্বর—তাকে এখন ডাকা যাবে না। উঠে গিয়ে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তিনি সূর্যের নাম ধরে ডাকলেন।

সুপ্রভা ও হিমানী এক ঘর উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে আছেন। মহিলাদের স্বয়ম্প্রবৃত্ত হয়ে পুরুষদের আলোচনায় যোগ দেবার প্রথা নেই—কিন্তু ওঁদের মন পড়ে আছে তিনতলায় ঐ ঘরটিতে। ওঁরা দেখলেন, সূর্য ঘর থেকে বেরিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে ওপরে উঠে গেলেন।

বড়বাবু বিছানার দিকে ইঙ্গিত করে সূর্যকে বললেন, বোস ওখানে।

সূর্য বসলো না, দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে—কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই ত্রেরিয়া ভাবে বললো, আমি শ্রীলেখাকে বিয়ে করবো।

প্রিয়রঞ্জন গনগনে মুখে তাকালেন। বড়বাবুর মুখে হাসি ফিরে এলো। জিজ্ঞেস করলেন, হঠাৎ বিয়েপাগলা হয়ে গেলি কেন?

সূর্য তার সরল জেদীমুখে বললো, অন্য কারুর সঙ্গে শ্রীলেখার বিয়ে হবে না। ও এ বাড়িতেই থাকবে।

—শ্রীলেখা তোর বোন হয়—বোনের সঙ্গে কি বিয়ে হয়?

—আপন বোন তো নয়।

—হিন্দু সমাজে মামাতো বোনের সঙ্গে বিয়ে হয় না।

—আমি কি হিন্দু?

—তুমি কি তাহলে?

—আমি মানুষ।

—মানুষ তো সবাই।

—আমি শ্রীলেখাকে বিয়ে করবো।

—বিয়ে করলে অনেক দায়িত্ব নিতে হয়। পারবি? বউকে খাওয়াবি কি?

—আপনার কাছে আমার অনেক মোহর আছে। আপনি বললেন—

—হুঁ! মোহর বিক্রী করে সংসার চালাবি? কতদিন চলবে? রোজগার করতে হবে না?

—আমি পড়াশুনো করছি।

—ঠিক আছে, যদি এতই বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠিস—আমি তা হলে মেয়ে দেখছি। এদেশে পাত্রীর অভাব নেই।

—আমি শ্রীলেখাকে বিয়ে করবো।

প্রিয়রঞ্জন আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। এক ধমক দিয়ে বললেন, বাঁদর ছেলে, ওকথা খবর্দার আমার সামনে উচ্চারণ করবি না। নির্লজ্জ কোথাকার!

সূর্য কিছু বলার আগেই বড়বাবু বললেন, বিয়ে করতে হলে, পাত্রীর মা-বাবার মত লাগে। ওঁরা এ বিয়েতে রাজি নয়।

—তাহলে শ্রীলেখার জন্য অন্য কারুর সঙ্গেও বিয়ে হবে না।

প্রিয়রঞ্জন আর একটাও কথা বললেন না। ঘৃণায় মুখভঙ্গি করে বেরিয়ে গেলেন

ঘর থেকে। বড়বাবু তাঁকে আটকাবার চেষ্টা করেও পারলেন না।

দশ দিনের মধ্যে প্রিয়রঞ্জন তালতলায় একটা বাড়ি কিনে উঠে গেলেন। বস্তুত, বাড়ি কেনার ব্যবস্থা গোপনে গোপনে আগেই চলছিল—ইদানীং তাঁর কাগজের ব্যবসা বেশ ফেঁপে উঠেছে। এ বাড়ি ছেড়ে যাবার ঘটনাও খুব নির্ঝঞ্ঝাটে ঘটলো না—যাবার আগে প্রিয়রঞ্জন বড়বাবুর সঙ্গে একটা ঝগড়া বাধিয়ে তুললেন—অনর্থক বহু কটু-কাটব্য করতে ছাড়লেন না। বড়বাবু প্রাণপণে তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন—চ্যাঁচামেচি করার বদলে প্রায় ধরা গলায় বলেছিলেন, তোমরা আমাকে ছেড়ে যেও না। আমার আর কেউ নাই। ত্রিংসারে আমার আর কেউ নেই! প্রিয়রঞ্জন উষ্ণ মস্তিষ্কে এই অনুভূতিটা ঠিক ধরতে পারলেন না—কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলে বললেন, তুমি কি আমাদের অন্ন দিয়ে কিনে রেখোছো? ভগবান আমায় সুদিন দিয়েছেন—আমার কারবারে তোমার যা টাকা-পয়সা আছে সব তুমি ফেরত পাবে। তোমার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না।

সমস্যা হলো চিররঞ্জনকে নিয়ে। চিররঞ্জন এবং তাঁর পরিবার কোথায় থাকবেন? প্রিয়রঞ্জন চাইলেন ওঁদের সঙ্গে নিয়ে যেতো। তাঁর সহোদর ভাই তাঁর সঙ্গে থাকবেন না। তো কোথায় থাকবেন! কিন্তু বড়বাবুদের সঙ্গে চিররঞ্জনের অন্যরকম সম্পর্ক। তিনি চিররঞ্জনকে কিছুতেই ছাড়বেন না। এই দোটানার মধ্যে চিররঞ্জন মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন। তিনি আলগোছে জীবন কাটাতে চান—এসব গন্ডগোল তাঁর সহ্য হয় না। সমস্যার সমাধান তাঁর মাথায় আসে না। বড়বাবুর সঙ্গে তাঁর কোনো অসদ্ভাবের কারণ ঘটেনি—কিন্তু প্রিয়রঞ্জন বড়বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে ফেলায়—চিররঞ্জনের পক্ষে আরও কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। এখন বড়বাবুর সঙ্গে থাকা মানে তাঁর দাদার বিরোধিতা করা—এবং তাঁর দাদা এতে অপমানিত বোধ করবেন।

চিররঞ্জন তখন অসুস্থ। জ্বর এখন নিউমোনিয়ার দিকে গেছে। এই সময় বাড়ি বদলাবার হাঙ্গামার প্রশ্নই ওঠে না—তাই তিনি আপাতত এ বাড়িতেই থেকে গেলেন।

প্রিয়রঞ্জন তালতলায় বেশ বড় বাড়ি কিনেছেন। বাড়ির সামনে খানিকটা জমি আগাছায় পূর্ণ—এবং লোহার গেট। গেটে উর্দিপরা দারোয়ান।

সূর্যর দুর্দমনীয় তেজী ভাবটা আর নেই। হঠাৎ সে খুব বিমর্ষ হয়ে গেছে। শ্রীলেখাকে হারিয়ে সে যেন অনেকখানি মহিমাচ্যুত—তার চোখের মধ্যেও একটা দিশেহারা ভাব ফুটে ওঠে। একটা তীব্র অভিমান তার বুকের মধ্যে বাষ্প হয়ে জমে। সারা পৃথিবীর ওপর অভিমান।

গোঁয়ারের মতন সে তালতলার বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করেনি। তার কিশোর হৃদয় বুঝেছে—ও বাড়িতে ঢুকলে অপমানিত হতে হবে। এতদিন ছিল না, এখন তার মান-অপমান বোধ জেগেছে—প্রণয়লিপ্সা তার মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম অনুভূতিরও জন্ম দিয়েছে।

কলেজ পালিয়ে দুপুর বেলা এসে সূর্য তালতলার রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। একদিনও, একবার এক পলকের জন্যও শ্রীলেখার সঙ্গে দেখা হয় না।

॥ ২৫ ॥

একজন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী বসবার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বড়বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, জামাইবাবু, চিনতে পারছেন?

বড়বাবু অবাক হয়ে তাকালেন। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ভেতরে আসুন, ভেতরে আসুন।

—চিনতে পারলেন না?

—না তো!

—সেই ফুলবাড়িতে আমাকে দেখেছিলেন।

বড়বাবুর তবু মনে পড়লো না। ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলেন। সন্ন্যাসীটি বেশ লম্বা, মধ্যবয়স্ক, অসম্ভব সুপুরুষ। গাওয়া ঘিয়ের মতন গায়ের রং, টিকোলো নাক, টানা-টানা চোখ—অক্ষিপল্লবগুলি বড় বড়। ঘাড় ছাড়িয়ে নেমেছে চুল, দাড়ি বুক পর্যন্ত —এখনো পাক ধরেনি। তিনি হাসিমুখে তাকিয়ে আছেন বড়বাবুর দিকে।

—পূর্ণিমা আমার দিদি ছিল।

বড়বাবু চমকে উঠলেন। প্রবল উৎসাহে বললেন, ও নিখিল! সেই কতদিন আগে তোমাকে দেখেছিলাম! চিনবে কি করে বলো! যে-রকম ভোল পাল্টেছো—

সন্ন্যাসী এবার চেয়ারে আসন গ্রহণ করলেন। মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বললেন, আপনাকে কিন্তু চেনা যায়। চেহারা বিশেষ পাল্টায় নি।

—আমি তো আর ভেক ধরিনি তোমার মতন। শুনেছিলাম বটে তুমি কোন আশ্রমে আছো। হঠাৎ সংসারীদের কাছে এলে যে!

—আশ্রম থেকে একটি কাজে আমাকে কলকাতায় পাঠিয়েছে।

—কোথায় যেন আশ্রম তোমার?

—আসামে। গৌহাটির নিকটবর্তী।

—কলকাতায় এসে কোথায় উঠেছো? এখানেই এসে থাকো—অনেক জায়গা আছে।

উঠোনের কল খুলে আমি তখন জল ছিটোবার খেলা খেলছিলাম। বড়বাবু ডেকে বললেন, এই বাদলা, এদিকে আয়। এঁকে প্রণাম কর। তোর কাকা হন।

আমি গিয়ে ঝুপ করে প্রণাম করলাম। সন্ন্যাসী আমার মাথায় আশীর্বাদের হাত ছুঁইয়ে বড়বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, ইটি কে?

—চিরুর ছেলে, তোমার মেজদার ছেলে।

—আমি এর জন্মের কথাই শুনিনি।

—তা আর কি করে শুনবে। তুমি তো আমাদের কোনো খোঁজ খবর রাখো না।

—বছর দশেক আগে বড়দা একটা চিঠি লিখেছিলেন। তাতেই এ বাড়ির ঠিকানা পেয়েছিলাম। দিদি তো মারা গেছেন তাই না?

—বহুকাল আগে।

আমি সন্ন্যাসীর কাছ থেকে সরে আসতে চাইছিলাম, কিন্তু উনি ধরে রেখেছিলেন আমাকে। আমায় গায় হাত বুলোচ্ছিলেন। ইনি আমার সম্পূর্ণ অচেনা মানুষ, যদিও আমার আপন কাকা। পারিবারিক সূত্রে জেনেছি—বহুদিন আগে কোনো একটা অত্যন্ত গর্হিত কাজের জন্য জ্যাঠামশাই এঁকে খুব মেরেছিলেন, সেই অভিমানে ইনি বাড়ি ছেড়ে চলে যান এবং কোনো একটা আশ্রমে ঢুকে পড়েন। এঁর নাম নিখিলরঞ্জন।

তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি?

—বাদলরঞ্জন মুখার্জি।

—মুখার্জী নয়, মুখোপাধ্যায় বলতে হয়। তুমি কোন্ ক্লাসে পড়ো?

বড়বাবু বললেন, চলো, নিখিল, ওপরে চলো।

—বড়দা আছেন বাড়িতে?

—প্রিয়রঞ্জন এখন এখানে থাকে না। সে তালতলায় বাড়ি করেছে। ঠিকানা দেবো অখন—বিকেলে যেও।

বাবা সদ্য অসুখ থেকে সেরে উঠেছেন। এখনো শরীর দুর্বল, ঘর থেকে বেশী বেরোন না। বাবা কিন্তু নিখিলকাকাকে দেখেই চিনতে পারলেন। একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুই এসেছিস? কতদিন তোকে দেখিনি!

দুর্বল শরীর বলেই বোধহয় বাবার চোখে জল এসে গেল। কিংবা তিনি অন্য কথা ভাবছিলেন।

কাকা মাকে প্রণাম করে বললেন, বউদি, আপনি অনেক রোগা হয়ে গেছেন।

আমার দিদি সান্ত্বনাকে বললেন, তোকে বোধহয় আমি দেখেছিলাম, নারে! এই টুকুনি!

বড়বাবু বললেন, আমার চোখে কিন্তু নিখিলের সেই চেহারাটা এখনো ভাসছে। রোগা পাতলা একটা ছেলে—খুব শান্ত আর লাজুক।

আমাদের চোখে যিনি একজন সৌম্যকান্তি সন্ন্যাসী, বাবা আর বড়বাবু তাকেই দেখেছেন রোগা পাতলা সাধারণ একটি যুবক হিসেবে—মাঝখানে সময়ের ব্যবধানে যে অভাবনীয় পরিবর্তন—সেটা তারা ঠিক মেলাতে পারছেন না। অনেকক্ষণ বসে বসে পুরোনো কালের গল্প হলো—সেই ফুলবাড়ি, বরিশাল—সেখানকাল মানুষজন, পূর্ণিমা পিসীমার বাল্যকাল—আমরা হাঁ করে শুনতে লাগলাম।

নিখিলরঞ্জন এ বাড়িতে কয়েকদিন থেকে গেলেন, তারপর গিয়ে উঠলেন তালতলায় জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে। এই কদিনে বাড়ির ছোটদের সঙ্গে তাঁর বেশ ভাব হয়ে গেল। নতুন রকমের মানুষ দেখলেই আমার খুব কৌতুহল হয়। এত কাছাকাছি আমি কোনো সন্ন্যাসীকে আগে দেখিনি। আমার কেন যেন ধারণা ছিল সন্ন্যাসীরা বড় গম্ভীর আর রুক্ষ স্বভাবের হয়। আর কথায় কথায় অভিশাপ দেয়। কিন্তু আমাদের এই কাকা আমাদেরই মতন সাধারণ মানুষ—বেশ মজার মজার কথা বলতে পারেন। আমরা তাঁর নাম দিলাম সাধুকাকা।

সূর্যদা গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে, প্রথম প্রথম আমার এই কাকাকে বিশেষ পাত্তা দিতে চায় নি। কিন্তু কাকাই জোর করে ভাব জমিয়ে নিলেন তার সঙ্গে। সূর্যদাকে দেখে প্রথমটায় তিনি যেন একটু অবাক হয়েছিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি ছবি আঁকতে জানো?

সূর্যদা বলেছিল, না।

—মূর্তি-টুর্তিও বানাও না?

—না তো!

—কেন জানি না, তোমাকে দেখে মনে হয়, তুমি একজন শিল্পী। তোমার মধ্যে একটা কিছু সম্ভাবনা আছে—তুমি ঠিক সাধারণ মানুষ হবে না।

আমি সোৎসাহে জানালাম, সূর্যদা পড়াশুনোয় দারুণ ভালো। প্রত্যেক পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়!

সূর্যদা আমাকে এক ধমক দিয়ে বললো, এই বাদল, কেন মিথ্যে কথা বলছিস!

জানেন, এইটুকু ছেলে, কিন্তু বড্ড মিথ্যে কথা বলে আজকাল।

সাধুকাকা আমার দিকে ফিরে বললেন, তাই বুঝি?

আমি চুপ করে রইলুম। সূর্যদা বললো, আজকাল ও কথায় কথায় মিথ্যে কথা বলতে শিখেছে। ক'দিন আগে ও নাকি রাস্তায় একটা গাধা দেখেছে, তার দুটো শিং আছে। এরকম কখনো হয়?

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, কেন, সেদিন তুমি একটা গরু দেখলে না, যেটার পাঁচটা পা? গরুটাকে দেখিয়ে দেখিয়ে একটা লোক পয়সা নিচ্ছিল। গরুর পাঁচ পা হয়?

সাধুবাবা হাসতে হাসতে বললেন, আমি আসামে থাকি—জানো তো—সেখানে অনেক জন্তু জানোয়ার আছে? হাতি, গণ্ডার এসব তো প্রায়ই দেখা যায়। একদিন আমরা একটা কচ্ছপ দেখলাম—সেটার ঠোঁট ঠিক বকের মতন। নদীর ধারে লম্বা ঠোঁট দিয়ে ধরে ধরে মাছ খাচ্ছিল। আমরা সেটার নাম দিয়েছি বকচ্ছপ!

আমি বুঝতে পারলুম, এটা ডাহা মিথ্যে গল্প। আমি ততদিনে সুকুমার রায় পড়ে ফেলেছি—আমাকে ঠকানো অত সহজ নয়। সাধুরাও তাহলে মিথ্যে কথা বলে।

আর একদিন সাধুকাকা সূর্যদাকে বললেন, তোমাকে দেখে রোজই আমার কি যেন মনে পড়বে মনে পড়বে ভাব হচ্ছিল—আজ সেটা মনে পড়েছে। তোমার সঙ্গে এক-জনের চেহারার খুব মিল আছে।

আমি বলে উঠলাম, আমি বলবো? চার্লস লিণ্ডবার্গ!

সাধুকাকা অবাক হয়ে বললেন, তিনি কে?

লিণ্ডবার্গ এর কিছুকাল আগে একলা এরোপ্লেন চালিয়ে আটলাণ্টিক পাড়ি দিয়ে একটা কীর্তি স্থাপন করেছিলেন। যেমন রূপবান তিনি, তেমনি সাহসী। মৌচাক পত্রিকায় আমি এর সম্পর্কে পড়েছি—উনিই তখন আমার হীরো। আমিও একদিন এরোপ্লেন চালিয়ে সমুদ্র পার হবো—বিষ্ণুর সঙ্গে সব ঠিক হয়ে আছে।

সাধুকাকা শুনে বললেন, না, উনি নন। ওনার ছবিও আমি দেখিনি। সূর্যর চেহারা আর হাবভাবের সঙ্গে মিল আছে আমার এক ভাইয়ের। তার নাম বিশ্বরঞ্জন।

—তিনি এখন কোথায়?

—তার যখন সূর্যর মতনই বয়েস, কিংবা আর একটু বড়—তখন সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

—আপনার মতন?

—আমি তো নিরুদ্দেশ হইনি। আমি তো আশ্রমে থাকি—তোমার বাবা-জ্যাঠামশাই সবাই জানেন। কিন্তু আমাদের সেই ভাই রঞ্জু কোথায় আছে কেউ জানে না। ও একটা সাহেবকে মেরেছিল।

শেষ কথাটা শুনে সূর্যদা খরচোখে তাকালো। তারপর বললো, তার কথা তো কখনো শুনিনি।

আমিও ভালো করে জানি না আমার এই কনিষ্ঠ কাকার কথা। বললাম, সাধুকাকা তার গল্প বলো। কি করে সাহেবকে মারলো?

সাধুকাকা সূর্যদার প্রসঙ্গ নিয়ে বড়বাবুর সঙ্গেও আলোচনা করেছিলেন। বড়-বাবুকে বলেছিলেন, জামাইবাবু, আপনার রঞ্জুকে মনে আছে?

—খুব মনে আছে। ও যখন মারা যায় তখন আমি গোয়ালিয়রে।

—ও তো মারা যায় নি। ও নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

—বলো কি? তুমি জানো? তোমার সঙ্গে যোগাযোগ আছে?

—না, তা নেই। কিন্তু আমি জানি, সে মরে নি।

—এত বছর কেউ নিরুদ্দেশ হয়ে থাকতে পারে?

—দেশ থেকে এখনো তো ইংরেজ রাজত্ব যায় নি!

—তা বটে। যদি বেঁচে থাকে, খুব আনন্দের কথা। বড় তেজী ছেলে ছিল। ও রকম ছেলে বেশীদিন আত্মগোপন করে থাকতে পারে না।

—আপনার ছেলে সূর্যর সঙ্গে কিন্তু রঞ্জুর দারুণ মিল আছে। শুধু চেহারায় না, চরিত্রেও।

—হুঁ। এ কথা আগেও কে যেন বলেছিল আমাকে। অবশ্য সেটা ঠিক চোখে পড়ে না।

—যেন মনে হয় সেই রঞ্জুই এ পরিবারে আবার ফিরে এসেছে।

—সে কথা তুমি বলতে পারো না। ও তো তোমাদের পরিবারের কেউ না। আমি তোমাদের পরিবারের বাইরের লোক—আর ও তোমার দিদিরও ছেলে নয়।

—তবে কার ছেলে?

—আমি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলাম। অবশ্য গন্ধর্ব মতে। তোমার দিদির কোলে শুধু একটি মেয়ে এসেছিল—সে বেশীদিন বাঁচেনি। তোমার দিদিই একে মানুষ করেছে—ওর মা আত্মহত্যা করেছিল। যাক্, সে কথা তোমার শোনার দরকার নেই।

—ছেলেটার দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন। ও ঠিক সাধারণ ছেলেদের মতন হবে না।

—আমার ছেলেটা একটু পাগলাটে ধরনের হয়েছে। ওর নিজের ভালো মন্দ ওকেই বুঝতে হবে। আমি আর ক'দিন!

—আপনি কি এর মধ্যে মৃত্যুচিন্তা করছেন নাকি?

—বয়েস তো হলো। যাক গে, তোমার নিজের কথা বলো! তুমি শান্তি পেয়েছো?

—হ্যাঁ পেয়েছি।

—আশ্চর্য! খুবই আশ্চর্য! এ রকম মানুষ খুবই কম দেখেছি—যে এক কথায় বলতে পারে যে শান্তি পেয়েছে। সত্যিই পেয়েছো তা হলে?

—হ্যাঁ, পেয়েছি।

—কি করে পেলে? আমিও কিছুদিন সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ঘুরেছি। আমি শান্তি পাইনি। তুমি কি করে পেলে? ঈশ্বরের দর্শন পেয়েছো?

—না। তেমনভাবে ঈশ্বরের দর্শন পাবার কখনো চেষ্টাও করিনি। আমি যাঁর আশ্রমে আছি—সেই যতীন মহারাজ—তিনিও জপতপ সম্পর্কে খুব একটা উৎসাহী নন্। একটা ইস্কুল, একটা ছোট হাসপাতাল চালাই—সব্জী বাগান করি। আসামে যেখানে আছি—তার আশেপাশে মানুষ বড় গরীব—হিন্দু, মুসলমান, পার্বত্যজাতি—এদের মধ্যে যেমন অশিক্ষা, তেমনি দারিদ্র্য। খৃষ্টান মিশনারিরা কিছু কিছু কাজ করে—আমরাও সাধ্যমতন কিছু করার চেষ্টা করি। এই কাজের মধ্যেই শান্তি আছে।

—তোমরা কি খৃষ্টান মিশনারিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঐ সব গরীব লোকদের সাহায্যের নাম করে ধর্মান্তরিত করো নাকি?

—আজ্ঞে না। যার যা ধর্ম আছে থাক। আমরা শুধু সেবা করার চেষ্টা করি। ঈশ্বর দর্শনের চেয়ে এতে আনন্দ কম নয়।

—কিন্তু দারিদ্র্য তো সব জায়গায়। এই বাংলা দেশে দারিদ্র্য নেই? আমি বহু জায়গায় ভ্রমণ করেছি—মধ্যপ্রদেশ আর উড়িষ্যার কোনো কোনো অঞ্চলের মতন এত ভয়ংকর

দারিদ্র্য আর কোথাও দেখিনি। কতজনকে তুমি সেবা করতে পারবে? বেছে বেছে শুধু আসামেই কেন?

—যার নিয়তি যাকে যেখানে নিযুক্ত করে।

—তুমি নিয়তি মানো দেখছি। আচ্ছা নিখিল, আমাকে তুমি একটা রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারো? আমার এতটা বয়েস হলো, এখনো আমার ধর্মেকর্মে রুচি হলো না। কিসে শান্তি পাই বলতে পারো? সারাটা জীবন শুধু এর পেছনে ওর পেছনে দৌড়োদৌড়ি করেই মরলাম, কিছুই পেলাম না। আমার মতন মানুষ কিসে শান্তি পাবে?

—জামাইবাবু, আপনাকে পথ দেখাবার ক্ষমতা আমার নেই।

—তুমি ধর্ম মানো?

—মানি। কিন্তু গীতায় যে ধর্ম সংস্থাপন করার কথা বলা হয়েছে, সেটা বিশেষ কোনো ধর্ম নয়। মানুষের ধর্ম। আমি সেই ধর্ম মানি।

—তা হলে তুমি ঈশ্বর মানো?

—ঈশ্বর ছাড়া এই সৃষ্টি কার?

—তার অনেক উত্তর আছে। সে কথা নয়। গীতা ফিতাও বাদ দাও। সাধারণ মানুষ যে ঈশ্বরকে খোঁজে—সে তো কোনো-না-কোনো ধর্মকে অবলম্বন করেই খোঁজে। সব ধর্মেই তো ঈশ্বরের চেহারা আলাদা। এমনকি ঈশ্বরের চেহারা না-থাকাও একটা ধর্মবিশ্বাস।

—'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'—আমি এইটাই ভালো বুঝি!

—পরোপকার? হুঁ, পরোপকারের মধ্যে খানিকটা অহংকরের তৃপ্তি হয় বটে। সেটাতে ভালোই লাগে। কিন্তু এ কথাও তো ঠিক—পরোপকারের মধ্যে খানিকটা ক্লান্তিও আছে। যে ডাক্তার বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে—সে বেশ ভালোই লোক। কিন্তু প্রত্যেক দিন পঞ্চাশ জন রুগীকে চিকিৎসা করতে হলে তার মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় না?

—আপনি যদি আমাদের যতীন মহারাজকে দেখতেন—

—তিনি হয়তো মহাপুরুষ, তাঁর কথা আলাদা। আমি বলছি সাধারণ মানুষের কথা। তোমাকে আর একটা কথাও জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু সাহস পাচ্ছি না।

—বলুন না।

—তুমি তো এখন আর শুধু আমার ছোট শ্যালকটি নও, তুমি একজন সন্ন্যাসী। তোমাকে কি সব কথা বলা যায়?

—সন্ন্যাসীর কাছেই বরং সব কথা বলা যায়।

—আশ্রমবাসী হয়ে তুমি কি কোনো অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়েছো?

—তার মানে?

—অর্থাৎ বিশেষ কোনো শক্তি তোমার হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের নেই? যেমন কোনো মানুষের মুখ দেখলেই তার মৃত্যু কবে হবে সে কথা বলে দেওয়া কিংবা দুরারোগ্য রোগ সারিয়ে দেওয়া—অনেক সন্ন্যাসীর তো সে রকম থাকে শুনেছি।

—না, আমার সে রকম কোনো শক্তিই নেই।

—তা হলে তুমি কামনা-বাসনা দমন করলে কি করে? সাধারণ মানুষ তো পারে না! তোমার বয়েস এখনো বেশী না, চেহারা সুন্দর—তোমার নারীসঙ্গ পেতে ইচ্ছে

করে না? আমি বুড়ো হয়েছি, তবু সত্যি কথা বলতে গেলে কি—সেরকম কোনো সুন্দরী নারী দেখলে অমার মন আনচান করে—আর তোমাদের করে না? এর রহস্যটা কি?

—আমরা মনটা অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখি। ও-সব কথা চিন্তা করারই সময় পাই না।

—মন কি তোমার হুকুম মতন চলে? নাকি এখনো মাঝে মাঝে মন উতলা হয়—তোমরা কৃত্রিমভাবে চেপে রাখো। সেটা কি স্বাভাবিক?

—সন্ন্যাসীরা প্রেম করে না? এলোইস আর আবেলার-এর সেই বিখ্যাত কাহিনীর কথা শোনোনি? নাকি তোমরা মেয়েদের দেখলেই চোখ ঢেকে রাখো?

—আপনি এ ব্যাপারটা সম্পর্কে এত বেশী কৌতূহলী কেন?

—তোমাকে দেখার পরই মনে হচ্ছে। কিছু মনে এলে আমি বলে না ফেলে পারি না। অবশ্য তোমাকে বলতেই ইতস্তত করছিলাম। আমি যতদূর জানি, বরিশালের এক অধ্যাপকের স্ত্রী তোমার সঙ্গে গৃহত্যাগ করে যাচ্ছিলেন। সেই অবস্থায় তোমরা ধরা পড়ে যাও! আমার শুধু জানতে ইচ্ছে করে—কি করে তোমার মনে এই পরিবর্তন এলো—

নিখিলরঞ্জনের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। দুটি হাত তুলে বুকের কাছে রাখলেন। দৃষ্টি নিবন্ধ হলো মাটিতে। তারপরই নিজেকে সামলে নিলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে শান্ত গলায় বললেন, সন্ন্যাসীর পক্ষে পূর্বাশ্রমের কথা আলোচনা করতে নেই। নইলে আপনাকে এ কথার উত্তর দিতাম।

নিখিলরঞ্জনের মুখের চেহারা দেখে বড়বাবু অনুতপ্ত বোধ করলেন। তাড়াতাড়ি উঠে এসে ওঁর হাত ধরে বললেন, আমাকে মাপ করো। আমি তোমার মনে আঘাত দিতে চাইনি। আমার ঔৎসুক্য বড় বেশী—তাই মাঝে মাঝে অবান্তর কথা বলে ফেলি—।

সাধুকাকাকে তালতলার বাড়িতে আমিই নিয়ে গেলাম। এর আগে এ বাড়িতে আমি দু'বার এসেছি—মায়ের সঙ্গে। এ বাড়িতে এখনো একটা এলোমেলো অবস্থা—যত বড় বাড়ি সেই তুলনায় আসবাবপত্র বেশী নেই। বড় বড় ঘর খালি পড়ে আছে। বাড়িটা অত্যধিক ফাঁকা-ফাঁকা লাগবে বলে জ্যাঠামশাই তাঁর দোকানের এক কর্মচারীকে সপরিবারে স্থান দিয়েছেন নিচের তলায়।

ছাদটা প্রকান্ড। এখানে এসেই আমি ছাদে উঠে যাই। কতদূর দেখা যায়। বাড়িটার খুব কাছেই একটা গীর্জা—কি অদ্ভূত শান্ত শব্দে সেখানে ঘণ্টা বাজে।

ছাদে একলা দাঁড়িয়ে আমি আকাশে ঘুড়ির প্যাঁচ দেখেছিলাম—এমন সময় বৃষ্টি নামলো। আমি তখনও নিচে নেমে না-গিয়ে দেয়াল সেঁটে দাঁড়িয়ে রইলাম। এক ঝাঁক পায়রা ডানা ঝটপটিয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে ঢুকে গেল গীর্জার মধ্যে। কাকগুলো ডাকাডাকি করতে লাগলো। বৃষ্টির ঝাপটায় একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ নাকে আসে।

বড়দি ছাদে উঠে এসে বললো, এই, তোকে নিচ থেকে এত ডাকাডাকি করছে, তোর কানে যাচ্ছে না?

—শুনতে পাইনি তো!

—কানের মাথা খেয়েছিস? দেখি কি হয়েছে কানে।

বড়দি কাছে এসে আদর করে আমার বাঁ কানটা ধরে টানতে লাগলো। আমিও

কুট্‌স করে বড়দির পিঠে একটা চিমটি কেটে দিলাম।

বড়দি একটু রোগা হয়ে গেছে। ইস্কুলে যাওয়াও ছেড়ে দিয়েছে। একদিন ইস্কুল যাবার পথে বড়দির কাছ থেকে পয়সা নিয়ে লজেঞ্চুস কিনতাম। এখন আর তা হয় না। আমি আর বড়দি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখতে লাগলাম। একটু বাদে বড়দি জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁরে, সূর্যদা কেমন আছে রে?

—ভালো। বেশ ভালো আছে।

—আবার অন্য কোথাও যায়নি তো? বাড়িতেই আছে?

—হ্যাঁ।

—আমার কথা টথা কিছু বলে?

—না তো!

—বলে না?

—একদম না। সূর্যদা তোমাকে একদম ভুলে গেছে।

বড়দির মুখখানা একটু লাল হয়ে গেল। আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বললো, ও তো এমনিই গম্ভীর, কারুর সঙ্গে কথা বলে না। আজ তুই এ বাড়িতে আসবার সময় তোকে কিছু বলেনি?

—কিছু না!

—শোন, সূর্যদাকে বলবি, আমাকে ভুলে যেতে।

—বাঃ, এ আবার বলার কি আছে? এমনিতেই তো তোমাকে ভুলে গেছে। একদম ভুলে গেছে, সত্যি!

বড়দি হঠাৎ রেগে গেল। আমাকে একটা চাপড় মারার চেষ্টা করে বললে, তুই সব জানিস, না? পাকা ছেলে!

॥ ২৬ ॥

যদু পণ্ডিতের পাঠশালা ছেড়ে আমি ভর্তি হয়েছিলাম স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে। এই স্কুলে বিষ্ণু আমার সহপাঠী। আমাদের আর একজন বন্ধু ছিল মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু ক্লাস পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার আগেই ও দুম করে মরে গেল। ওর কালাজ্বর হয়েছিল। আর একজন, অপূর্ব গুঁই, প্রত্যেক দিন জোর করে আমাদের পাশে বসে—কিন্তু ওকে আমরা পছন্দ করি না। অপূর্ব খুব বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা বলে। ও আমাকে একদিন ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছিল, ওকে আমরা একদিন খুব মারবো ঠিক করেছি।

বিষ্ণু আর আমি একটা আলাদা জগৎ তৈরী করে নিয়েছিলাম। আমরা অন্যদের সঙ্গে বেশী মিশি না, সব সময় একসঙ্গে থাকি, আমাদের গল্প কখনো ফুরোয় না। প্রত্যেক দিন টিফিনের সময় বিষ্ণুর বাড়ি থেকে চাকর খাবার নিয়ে আসে, আমরা দুজনে ভাগ করে খাই। বিষ্ণুর মা দুজনের জন্যই খাবার পাঠান। আমি মার কাছ থেকে প্রতিদিন দু' পয়সা করে টিফিন পাই। তাই দিয়ে বিষ্ণু আর আমি আধ পয়সা করে আলু-কাবলি কিনি আর এক পয়সার লটারি। লটারির প্যাকেটে বেশ ঝাল-ঝাল চাটনি থাকে—এ ছাড়া পেতলের আংটি কিংবা জলছবি। বিষ্ণুর এই সব খাওয়া একদম বারণ—কিন্তু বাড়ির কেউ তো জানতে পারছে না!

ইস্কুলে যাওয়ার ব্যাপারটা আমার এত প্রিয় ছিল যে ইস্কুল ছুটি থাকলে মন খারাপ লাগতো। ইস্কুল মানেই কত রকম আনন্দ, কত গল্প। র‍্যাপিড রিডিং ক্লাসে উকিল মাস্টারমশাই আমাদের অনেক রকম গল্প শোনাতেন। ওঁর পুরো নাম ছিল সুরেন্দ্রনাথ উকিল—আমরা ওঁকে উকিল স্যার বলে বেশ মজা পেতাম। মানুষটি খুব রোগা, মুখখানি বিষণ্ণ, অথচ কত রকম বই পড়েছেন। ইউলিসিস-এর গল্প শুনতে শুনতে আমরা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতাম।

প্রায়ই সেই সময় ইস্কুলে খুব স্ট্রাইক হতে লাগলো। স্ট্রাইকের কারণগুলো ঠিক বুঝতাম না। এক একদিন স্কুলে গিয়ে দেখতাম, আগে থেকেই কয়েকটি অচেনা বড় বড় ছেলে ইস্কুলের গেট আটকে দাঁড়িয়ে আছে। একজন কি যেন সব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে। আমি আর বিষ্ণু রাস্তায় ওপারে দাঁড়িয়ে থাকতাম। ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ে গেলেও কেউ ভেতরে না ঢুকলে বুঝতাম সেদিনকার মতন ছুটি। তখন বাড়ি ফেরা।

স্ট্রাইক আমাদের পছন্দ হতো না। এক একটা দিন স্কুল নষ্ট হলে আফসোস হতো, ডাইনির দ্বীপে ইউলিসিস কি করে প্রাণে বাঁচলো সেটা সেদিন শোনা হলো না!

একদিন দেখলাম, অন্যান্য কয়েকটি ছেলের সঙ্গে সূর্যদা এসেছে আমাদের স্কুলে ধর্মঘট করাতে। পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে হাত উঁচু করে সূর্যদা কি যেন বলছে। সেদিন বিষ্ণু আর আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। যুদ্ধ উপলক্ষে দেশের বড় বড় নেতাদের গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে ধর্মঘট।

সূর্যদা আমাদের দেখে বললো, এই বাদল, বাড়ি যাবি না। মিছিলে যেতে হবে।

মিছিলে যাওয়ার কথা শুনে আমি বেশ উত্তেজিত বোধ করলেও বিষ্ণু রাজী হলো না। তার বাড়িতে ভীষণ কড়াকড়ি। স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বাড়ি না ফেরা তার পক্ষে অত্যন্ত অপরাধ। বাড়িতে গিয়ে বিষ্ণু বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথাও বলতে পারবে না। ও পারে না।

বিষ্ণু মিছিলের পাশে পাশে হাতিবাগান পর্যন্ত হেঁটে বাড়ি চলে গেল। আমি রয়ে গেলাম সূর্যদার সঙ্গে। সূর্যদা মিছিল পরিচালনা করছে, ও প্রথম বলছে বন্দে মাতরম—তারপর আমরা সবাই গলা মেলাচ্ছি। আমাদের উদ্দেশ্য টাউন স্কুল, সরস্বতী স্কুল আর শ্যামবাজার এ ভি-তে স্ট্রাইক করানো।

টাউন স্কুলে বিশেষ কোনো অসুবিধে হলো না, সেখানকার ছেলেরা আগে থেকেই ভিড় করে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, ওখানেও সূর্যদার মতন একজন বক্তৃতা দিচ্ছিল। সেখান থেকে দল ভারী করে সরস্বতী স্কুলে এলাম—এখানে স্কুল শুরু হয়ে গিয়েছিল—আমরা বাইরে থেকে চাঁচামেচি করতেই ছাত্ররা বেরিয়ে এলো হুড়হুড় করে। শ্যামবাজার এ ভি-তে গিয়েই গোলমাল।। এখানেও স্কুল শুরু হয়ে গেছে এবং বাইরে দুজন পুলিস দাঁড়িয়ে। দিশি সেপাই, সুতরাং তাদের গ্রাহ্য না করে সূর্যদা চেঁচিয়ে উঠলো, ছাত্র-বন্ধুগণ, বেরিয়ে এসো! ব্রিটিশরাজ নিপাত যাক। ইনকিলাব—।আমরা প্রবলভাবে হৈ হৈ করতে লাগলাম।

কিন্তু হঠাৎ আর এক গাড়ি পুলিস এসে গেল। তার মধ্য তিন-চারজন লাল-মুখো। এসে তারা একটুও সময় দিল না, লাঠি চার্জ শুরু করলো। চার পাঁচজন ছেলে লাঠির বাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়লো রাস্তায়। আমি দিশাহারা হয়ে গেলাম। সেই সময় কি করতে হয় কিছুই জানি না। পেছন ফিরে দৌড়োতে শুরু করেছি, একটা সবল হাত আমাকে ধরলো। তাকিয়ে দেখি সূর্যদা। সূর্যদা বললো, এই দিকে আয়।

বড় রাস্তা পেরিয়ে উল্টো দিকের একটা সরু গলির মুখে সূর্যদা আমাকে দাঁড় করালো। তীব্র গলায় বললো, এইখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্। যদি দেখিস পুলিস এদিকে আসছে—তা হলে এই গলির মধ্যে যে-কোনো বাড়িতে ঢুকে পড়বি। ভয় পাবি না।

ওদিকে স্কুলের সামনে কুরুক্ষেত্র শুরু হয়ে গেছে। লাঠি খেয়ে একদল ছেলে দৌড়ে পালাচ্ছে। মিছিলের শেষ দিকের ছেলেরা ব্যাপারটা কি হচ্ছে বুঝতে না পেরে এগিয়ে আসছে, ওই স্কুলের ছেলেরা ক্লাস ভেঙে জানালায় দাঁড়িয়ে চ্যাঁচাচ্ছে, ঝনঝন করে শব্দ হচ্ছে লোহার গেটে।

সূর্যদা বড় একটা ইঁটের টুকরো তুলে নিয়ে হুংকার দিল, ব্রিটিশ রাজত্ব নিপাত যাক্। তারপর সেটা ছুঁড়ে মারলো একজন সার্জেণ্ট-এর দিকে।

আমার মনে পড়লো একটা দৃশ্য। কয়েক বছর আগে হাতিবাগানের মোড়ে একজন গোরা সার্জেণ্ট সূর্যদাকে মেরেছিল—সূর্যদা সেদিন আহত হবার চেয়েও অবাক হয়েছিল বেশী। ইংরেজিতে কি সব বলেছিল বিড়বিড় করে। সেই সূর্যদা কত বদলে গেছে।

দেখতে দেখতে ইঁট ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়ে গেল প্রবলভাবে। রাস্তায় অনেক লোকও যোগ দিল সেই রণে। সূর্যদার ওরকম উগ্র মূর্তি আমি আগে কখনো দেখিনি। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে এক একবার ইঁট হাতে নিয়ে পুলিসের অনেক কাছে চলে যাচ্ছে—মেরেই আবার দৌড়ে ফিরে আসছে এঁকেবেঁকে। সূর্যদাকে দেখেই আরও অনেকে উদ্দীপনা পেয়ে গেল। সূর্যদার দলের লোকদের পরিকল্পনা মতন এ সময় থেকেই যে ইচ্ছে করে পুলিসের সঙ্গে গণ্ডগোল পাকিয়ে আগস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত হচ্ছে—আমি তখন তা বুঝিনি।

খানিকটা বাদে ফটফট শব্দ ও ধোঁয়া, আমার চোখ জ্বলতে লাগলো। আমি গলির মধ্যে ঢুকে গেলাম। একজন বয়স্কা ভদ্রমহিলা তাঁর বাড়ির দরজা খুলে আমাকে বললেন, এই ছেলেটা, দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন? ভেতরে আয়!

আমি ইতস্তত করছিলাম, মহিলাটি নিজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন। ধমক দিয়ে বললেন, বাড়িতে তোর মা-বাবা নেই? এইটুকু ছেলেকে ছেড়ে দিয়েছে কি আক্কেলে?

এই সময় সূর্যদা এসে উপস্থিত হলো ঝড়ের বেগে। মহিলার কাছ থেকে আমাকে একপ্রকার কেড়ে নিয়ে বললো, চল্, দৌড়ো—।

সূর্যদার সঙ্গে কি আমি দৌড়ে পারি? হাঁপাতে হাঁপাতে কোনো রকমে পৌঁছোলাম কুমোরটুলির কাছে। তারপর দ্রুত পা চালিয়ে এসে পৌঁছোলাম গঙ্গার ধারে। একটা অশথ গাছের তলায় এসে সূর্যদা বললো, এখানে চুপ করে বসে থাক।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বাড়ি যাবে না?

—এখন না। এখন বিপদ আছে।

গঙ্গার ধারে আমরা প্রায় ঘণ্টা দুয়েক সময় কাটালাম। গঙ্গার ধার আমার চেনা জায়গা—মাকে নিয়ে অনেকবার এসেছি। কিন্তু এখন কোনো ভিড় নেই। এদিকে ওদিকে দু-একটা অলস লোক শুয়ে আছে—স্নান করছে কয়েকজন। জলের ওপর মেঘের ছায়া। বিরাট বিস্ময়ের মতন দূরে দেখা যায় নতুন তৈরী হাওড়া ব্রিজ। কয়েকটা ইঁটের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে আমি জলে টুপটাপ করে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলাম।

অনেকদিন বাদে সূর্যদার সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করা গেল। সূর্যদা আমাকে

বোঝাতে লাগলো, ব্রিটিশ শাসন কত খারাপ। যে জাতি পরাধীন সে জাতি ক্রীত-দাসেরও অধম। জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ লাগিয়ে ইংরেজ ভারতের ধনসম্পদ সেই যুদ্ধের জন্য খরচ করছে, ইত্যাদি অনেক কথা। সব আমি বুঝলাম না। কিন্তু শুনতে ভালো লাগছিল।

হঠাৎ আমি বোকার মতন বলে উঠলাম, সূর্যদা, বড়দি কি বলেছে জানো তো? বড়দি বলেছে তোমাকে ভুলে যেতে।

সূর্যদা ভুরু কুঁচকে বললো, কি?

আমি কথাটার পুনরাবৃত্তি করলাম। সূর্যদা শুনে কি যেন ভাবলো। তারপর বললো, জানিস তো শ্রীলেখাকে আমি বিয়ে করবো। এখন আমি সময় পাচ্ছি না—।

এমন নিশ্চিন্তভাবে সূর্যদা কথাটা বললো, যেন সব-কিছুর ঠিকঠাক হয়ে আছে —ওর সময়াভাবটাই একমাত্র বাধা। আমি বললাম, কিন্তু বড়দির তো বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

সূর্যদা কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বললো, তা হোক গে!

—সামনের মাসে বড়দির বিয়ে।

—ধুৎ! চল, ওঠ্।

—হাঁটতে হাঁটতে চিৎপুরে এসে সূর্যদা বললো, তুই এখান থেকে একা একা বাড়ি যেতে পারবি?

আমি ভয় পেয়ে বললাম, না। আমি রাস্তা চিনি না।

—তোকে বাসে উঠিয়ে দেবো, গিরিশ পার্কে নামবি।

—আমি একা কখনো বাসে চাপিনি।

—তা হলে চল আমার সঙ্গে। বাড়ি ফিরতে দেরি হবে কিন্তু।

—সূর্যদা, বিষ্ণুদের বাড়িতে যাবে? ওখানে বেশ ক্যারাম খেলা যেত।

—আমার এখন অন্য কাজ আছে।

সূর্যদার সঙ্গে আমি শিয়ালদার কাছে এলাম। আমাকে নিয়ে সূর্যদা একটা মেস-বাড়ির অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠে এলো। একটা ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতেই সেটা খুলে গেল। ভেতরে চারজন লোক। একজনকে দেখে সূর্যদা বললো, ব্রজদা আজ এ ভি স্কুলের সামনে পুলিস লাঠি আর টিয়ার গ্যাস চালিয়েছে।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই ছেলেটি কে?

সূর্যদা বললো, আমার ভাই হয়। ও আমার সঙ্গে ছিল।

ব্রজগোপাল বললেন, এইটুকু ছেলেকে নিয়ে না গেলেই পারতে।

—সবাইকেই যেতে হবে।

ব্রজগোপার চৌকির তলা থেকে একটা টিনের কৌটো বার করে ঢাকনা খুলে বললেন, খোকা, তোমার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই? খাও।

তাকিয়ে দেখলাম, কৌটোর মধ্যে মুড়ি আর বাতাসা। আমি এক মুঠো তুলে নিলাম। ঘরের অন্যান্যরাও এক মুঠো এক মুঠো নিয়ে মুহূর্তে কৌটোটা ফাঁক হয়ে গেল।

এই ঘটনাটা আমার মনের মধ্যে একটা ছাপ রেখে যায়। তখন ঠিক না বুঝলেও পরে জেনেছিলাম, ওই ঘরে যারা উপস্থিত তারা সবাই দেশ উদ্ধার করার জন্য গৃহের সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে এসেছে। যে-কোনো সময় ওদের মৃত্যুও হতে পারে। তবু ওদের নেতা ব্রজগোপাল একটি ছোট ছেলেকে দেখে প্রথমেই কিছু খাবার খেতে দেবার

কথা ভেবেছিলেন। সেই মুড়ি ও বাতাসার স্বাদ আমার জিভে লেগে আছে।

আমি খাটের ওপর চুপ করে বসে রইলাম। সূর্যদা ওদের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলো। সেদিন কলকাতার বিভিন্ন স্থানে পাঁচ জায়গায় পুলিসের সঙ্গে ছাত্রদের গোলমাল হয়েছে। এতে সবাইকে বেশ উৎসাহিত দেখা গেল। বোঝা গেল, ছাত্ররা আপনা-আপনি স্ট্রাইক করেনি—এর পেছনে একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে।

সেই মেস থেকে বেরিয়ে সূর্যদা বললো, এক্ষুনি বাড়ি ফিরবি, না আর কোথাও যাবি?

প্রশ্ন শুনেই আমি বুঝতে পারলাম সূর্যদা কি বলতে চায়। শিয়ালদা স্টেশন দেখেই বুঝেছি কাছেই তালতলা। উৎসাহিত হয়ে বললাম, সূর্যদা বড়দাদের বাড়ি যাবে?

সূর্যদা যেন আমাকে খুশী করার জন্যই বললো, চল্ তা হলে!

তালতলায় জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ির খুব কাছে এসে সূর্যদা মত বদলে ফেললো। থমকে দাঁড়িয়ে বললো, থাক্, তুই যা। আমি আর যাবো না!

আমি সূর্যদার মুখের দিকে তাকালাম। এ তো অন্যরকম মুখ। এই মুখে মিশে আছে খানিকটা ভয় ও অনেকখানি লজ্জা। এই দুটি ব্যাপার সূর্যদার চরিত্রে আগে কখনো দেখিনি। যে-মানুষ কিছুক্ষণ আগে অকুতোভয়ে পুলিশকে ইঁট মারছিল সে হঠাৎ ভয় পাবে কেন?

আমি বললাম, কেন, চলো না! কি হয়েছে!

সূর্যদা পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে উদাসীন ভাব দেখিয়ে বললো, নাঃ, আমার অন্য কাজ আছে। আজ যাবো না।

আমি সূর্যদাকে ছাড়লাম না। হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলাম। সূর্যদা যেন এইটাই চাইছিল। যেন আমিই ওকে জোর করে ধরে নিয়ে এলাম এ বাড়িতে।

দুপুরে সব সময় গেট বন্ধ থাকে। পাশেই দারোয়ানের ঘর। জ্যাঠামশাই তাঁর বাড়িতে ক্রমশই জাঁকজমক বাড়াচ্ছে—তিনি নানা প্রকারে দেখাতে চান যে তিনি এখন বড়বাবুর চেয়েও অবস্থাপন্ন। আমরা এখন ইস্কুলে বালি কাগজে লিখি—কাগজের দাম সাংঘাতিক।

দুপরবেলা বাড়িতে বিশেষ কেউই থাকে না। জ্যাঠামশাই তো থাকবেনই না। দারোয়ান আমাকে চেনে। গেট খুলে দিল। সিঁড়ির নিচের ঘরখানাতেই সাধুকাকা থাকেন। সাধুকাকা কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন, কিন্তু বেশ কিছুদিন থেকে গেলেন।

সাধুকাকার ঘরের দরজা খোলাই ছিল, খাটের ওপর ঘুমোচ্ছেন। খালি গা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, দাড়িগোঁপ ঘামে ভিজে গেছে। এই ঘরখানাই সূর্যদার কাছে নিরাপদ মনে হলো।

সন্ন্যাসীদের ঘুম কি ভীষণ পাতলা হয়। আমরা ঘরে ঢোকা মাত্র সাধুকাকা চোখ মেলে তাকালেন। অথচ আমরা একটুও শব্দ করিনি। কাঁচা ঘুম ভাঙলে অনেকে রেগে যায়—সাধুকাকা হাসি মুখে উঠে বসে বললেন, কি খবর? সূর্যকুমারের কি খবর?

আমি সাধুকাকাকে প্রণাম করলাম, সূর্যদা জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। সূর্যদা কারুকে পায় হাত দিয়ে প্রণাম করে না। সাধুকাকা আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, জীব! জীব! তারপর সূর্যদার দিকে তাকিয়ে বললেন, সূর্যকুমার, এদিকে এসো তো!

সূর্যদা পায় পায় কাছে এগিয়ে এলো, সাধুকাকা তার বাঁ করতল নিজের হাতে তুলে নিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি রাশি, তুমি জানো?

সূর্যদা ওসব জানে না।

—তোমার কোনো কোষ্ঠি নেই।

—আছে কিনা শুনি নি।

—তোমার জন্ম তারিখ কবে?

—৭ই সেপ্টেম্বর।

—তাহলে বাংলা কত তারিখ হলো?

সাধুকাকা সূর্যদার হাত দেখতে লাগলেন। কিছুই বললেন না। হাত দেখা শেষ করে ভারী মায়ার সঙ্গে সূর্যদার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সাধুকাকা, সূর্যদার হাতে কি দেখলেন?

সাধুকাকা বললেন, আমি ভালো হাত দেখতে জানি না। মনে হলো সবই তো ভালো। ওপরে গিয়েছিলে?

—না। এখনো যাই নি।

সাধুকাকার বিছানায় তোষক বা চাদর নেই, শুধু একটা কম্বল পাতা। আমরা তার ওপরে বসলাম। এই কুটকুটে কম্বলের ওপর শুয়ে উনি ঘুমোন কি করে?

সাধুকাকা বললেন, চোখ মেলে যখন সূর্যকে দেখলাম, হঠাৎ চমকে উঠেছিলাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি আমার ছোট ভাইকে স্বপ্ন দেখছিলাম, ঘুম ভেঙে মনে হলো সে-ই যেন দাঁড়িয়েছে। সূর্য, তুমি একটু সাবধানে থেকো।

—কেন?

—এই বয়েসে তোমার একটা ফাঁড়া আছে।

সূর্যদা আর কিছু না বলে একটু হাসলো। কে জানে সূর্যদা ফাঁড়া কথাটার মানে বুঝলো কিনা। আমি বুঝেছি। আর দু'বছর বাদে আমার আগুনের ফাঁড়া আছে।

সূর্যদা জিজ্ঞেস করলো, আপনি জন্মান্তর মানেন?

—এ আবার মানামানির কি আছে? তুমি মানো বা না মানো—পাপ করলে আবার জন্মাতেই হবে।

—পাপ কাকে বলে?

—পাপ অনেক রকম। যেমন জীব হিংসা একটা পাপ।

—মাছ মাংস খাওয়াও কি পাপ?

—এক হিসেবে তো বটেই।

'—বাইবেলেও পড়েছি, হিংসা করা পাপ। কিন্তু খৃস্টানরা তো মাছ মাংস খাওয়া পাপ করে না।

তর্ক জমে উঠতেই আমি আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। উঠে এলাম ওপরে। সারা বাড়িতে সবাই ঘুমোচ্ছে। জ্যাঠাইমা ঘুমোচ্ছে ছোড়দিকে নিয়ে। জ্যাঠাইমার এক বোন কিছুদিন ধরে এখানে এসে আছেন, তিনিও পাশের ঘরে ঘুমন্ত। বড়দিকে খুঁজে পেলাম তিনতলায়—একখানা বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে এক সময়—বইয়ের ওপর তার চুলগুলো ছড়ানো।

গায় হাত দিয়ে ডাকলাম, বড়দি, এই বড়দি!

বড়দি ধড়মড় করে উঠে বসলো। যেন ভয় পেয়েছে। বোধহয় কোন দুঃস্বপ্ন দেখছিল। আমাকে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি রে, কখন এলি?

আমি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললাম, চুপ!

বড়দি ভুরু কুঁচকে তাকালো। তারপর বললো, ওরকম করছিস কেন? কি হয়েছে কি?

আমি ফিসফিস করে বললাম, সূর্যদা এসেছে।

বড়দি একটু চমকে উঠলো। তারপর বললো, কোথায়?

—এই বাড়িতে। নিচে সাধুকাকার সঙ্গে গল্প করছে। ডেকে নিয়ে আসবো ওপরে?

বড়দি একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। মুখ ফেরালো দেয়ালের দিকে। সেই ভাবেই বললো, সূর্যদা কেন এসেছে? সূর্যদাকে চলে যেতে বল্‌।

বড়দি কাছ থেকে এরকম কথা আমি আশা করিনি। চট্‌ করে বললাম, চলে যাবে কেন? জ্যাঠাইমা তো ঘুমোচ্ছে!

বড়দি এক ধমক দিয়ে বললো, কি আজে বাজে কথা বলছিস! এক্ষুনি যা—ওকে চলে যেতে বল্‌।

বড়দি আমাকে ধমকে ভয় দেখাবে ভেবেছিল। আমি বুঝি ভয় দেখাতে জানি না? চোখ গোল গোল করে বললাম, সূর্যদা কি বলেছে জানো? সূর্যদা বলেছে, ফাইভ হাণ্ড্রেড গোনার মধ্যে যদি তাকে ওপরে ডেকে না আনি—তা হলে সূর্যদা দুমদুম করে গুলি করবে?

—কি করবে?

—গুলি করবে! সূর্যদার কাছে বন্দুক আছে। সূর্যদা পুলিশের সঙ্গে লড়াই করেছে।

—কবে? কবে?

—এই তো আজকেই। আমি নিজে দেখেছি। সূর্যদা ভীষণ রেগে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, ফাইভ হাণ্ড্রেডের মধ্যে যদি না ডাকি—

বড়দি সরু চোখে তাকালো আমার দিকে। একটু একটু যেন বিশ্বাস করলো আমার কথা। মুখে একটা যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠলো। তারপর আঁচল গুছিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এখানে ডাকতে হবে না। সূর্যদাকে গিয়ে বল, আমি নিচে যাচ্ছি।

আমি তরতর করে নিচে নেমে এলাম। সূর্যদা তখন সাধুকাকার সঙ্গে দারুণ তর্কে মেতে উঠেছে। সূর্যদার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম একটুক্ষণ, একটুও ভালো লাগছিল না ঐ সব তর্ক। একটু ফাঁক পেয়েই বললাম, সূর্যদা, চলো এবার ওপরে যাই।

সাধুকাকা সঙ্গে সঙ্গে কথা থামিয়ে বললেন, ঠিক আছে, যাও ঘুরে এসো।

দোতলা আর একতলার সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বড়দি। পাথরের মূর্তির মতন স্থির। আমি আর সূর্যদা ওপরে উঠে এলাম। সূর্যদা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছিস?

—তুমি কেন এলে?

—তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।

—তুমি আর এসো না।

—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

বড়দি আমার দিকে তাকিয়ে বললো, বাদল, তুই ওপরে গিয়ে বোস তো।

আমি রাগের সঙ্গে বললাম, কেন?

—এখন একটু ওপরে গিয়ে বোস্। পরে আসবি।

—না, আমি যাবো না।

—ছেলেমানুষী করিস না। যা বলছি শোন—

বাঃ, আমিই সব ব্যবস্থা করলাম। এখন আমি ছেলেমানুষ? সূর্যদা আর বড়দির ঝগড়া আমি দেখবো না? আমি গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সূর্যদা আমার মাথায় হাত দিয়ে নরমভাবে বললো, বাদল এখন একটু সাধু-কাকার সঙ্গে গল্প কর গিয়ে। পরে তোকে ডাকবো।

সূর্যদা বকুনি দিলে কিংবা মাথায় গাঁট্টা মারলেও আমি হয়তো যেতাম না। কিন্তু সূর্যদার নরম গলায় অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় না। বিড়বিড় করতে করতে নেমে এলাম সাধুকাকার ঘরে। সাধুকাকা অবাক হলেন না, কোনো প্রশ্ন করলেন না, বললেন, বোস্। আজ তোদের ইস্কুল এত তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল কেন?

বাদল চলে যাবার পর সূর্য আর এক সিঁড়ি উঠে এলো। এখন সে আর শ্রীলেখা দোতলা ও একতলার সিঁড়ির মাঝখানে।

শ্রীলেখা জিজ্ঞেস করলো, তুমি আজ পুলিশের সঙ্গে মারামারি করেছো?

—কে বললো? ওসব বাজে কথা।

—তুমি কি এমনি এমনি মরতে চাও!

—শোন শ্রীলেখা। আমার এখন অনেক কাজ। কিন্তু তোর জন্য আমার মনটা স্থির করতে পারি না। তুই আমার সঙ্গে চল্।

—তুমি আবার এইসব কথা বলছো? তুমি জানো না যে এটা হয় না?

—কেন হবে না? তুই আর আমি কেউই কারুর বাড়িতে থাকবো না—আমরা ঘুরে বেড়াবো।

—কোথায়?

—কখন কোথায় থাকবো কোনো ঠিক নেই। আমাদের সামনে এখন অনেক কাজ। তোকেও কাজ করতে হবে।

—এসব কি বলছো। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

—তোকে আমি হরদা'র কথা বলেছিলাম। হরদা মৃত্যুর আগে আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন, দেশ স্বাধীন করার জন্য হরদা'র বাকি কাজ আমাকে করতে হবে। সে প্রতিজ্ঞা যদি আমি না রাখি, তবে আমি মানুষ নয়! হরদা কিসের জন্য মরেছেন? কোনোদিন নিজের বাড়িঘরে থাকেন নি, পুলিশের মার খেয়ে হাতের আঙুল ভেঙে গিয়েছিল—টি বি হয়েছিল, বিনা চিকিৎসায় আমার কোলে মাথা দিয়ে মরেছেন! যে সব কিসের জন্য? এই দেশের জন্য। সে কথা আমাদের মনে রাখতে হবে না?

—সেইজন্য তুমি পুলিশের সঙ্গে লড়াই করবে?

—শুধু পুলিশ কেন, দরকার হলে মিলিটারির সংগেও লড়তে হবে—গোটা বৃটিশ জাতের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। সারা পৃথিবীতে যুদ্ধ লেগেছে—এই তো সুযোগ। দেখিস, শিগগিরই বৃটিশরা এ দেশে ছেড়ে পালাবে—তার আগে ওদের প্রচণ্ড মার দিতে হবে। সেজন্য আমরা তৈরী হচ্ছি, বুঝলি। আর বেশীদিন দেরি নেই।

—আমাকে এসব কথা বলছো কেন? আমি এর কি বুঝি?

—শ্রীলেখা, তোর জন্য আমার মন ছটফট করে। শিগগিরই আমাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। কলকাতা ছেড়ে দিয়ে কাজ করতে হবে গ্রামে গিয়ে। কিন্তু তোকে ছেড়ে আমি থাকবো কি করে?

—সূর্যদা আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

—ধ্যুৎ তোরি বিয়ে! কি হবে বিয়ে করে? বিয়ে করে শুধু বাচ্চা মানুষ করবি আর মোটা হয়ে পান চিবোবি? তার চেয়ে চল আমার সঙ্গে। আমাদের কোনো বাড়ি-ঘর থাকবে না। আমরা গাছতলায়, নদীর ধারে শুয়ে থাকবো। যখন যা জুটবে, তাই খাবো। বিপ্লবীদের সাহায্য করবো, থানায় আগুন জ্বালবো। দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকবো বনে-জঙ্গলে। সেই জীবনটা ভালো নয়? হয়তো তুই কিংবা আমি কিংবা দুজনেই মরে যাবো—কিন্তু তাতে কি হবে—মরার আগে একটা শান্তি থাকবে যে আমরা দেশের জন্য কিছু করেছি।

—সূর্যদা, আমায় ক্ষমা করো। আমি এসব পারবো না।

সূর্য এক সঙ্গে এত কথা কখনো বলেনি। তার মুখ লাল হয়ে গেল। চাপা উত্তেজনায় সে কাঁপছে। শ্রীলেখার চোখে চোখ রেখে ফিসফিস করে বললো, তুই ভয় পাচ্ছিস? কোনো ভয় নেই। চল্ আমার সঙ্গে বেরিয়ে চল্। দেখবি, আর কোনো ভয় লাগবে না।

—আমি পারবো না। আমায় ক্ষমা করো।

—তোর বিয়ে করতে এত শখ? বিয়ে তো অনেক মেয়েই করে। এর মধ্যে কি আছে?

—না, শুধু সেজন্য নয়। আমি বাড়ি ছেড়ে যেতে পারবো না। তুমি বুঝতে পারছো না—তোমরা ছেলে, তোমাদের কথা আলাদা। আমি মেয়ে—

—কেন, প্রীতিলতা যায় নি? কেউ তার নিন্দে করে?

—আমি খুব সাধারণ মেয়ে।

—শ্রীলেখা, তোকে ছেড়ে আমি যেতে পারবো না। অন্য কারুর সঙ্গে তোর বিয়ে হবে, এটা আমি সহ্য করতে পারবো না। কিছুতেই পারবো না। তোকে আমার চাই।

—সূর্যদা, আমাকে ক্ষমা করো।

সূর্যদা, একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করলো। দ্বিধা বিভক্ত যাতনায় মুখখানা তার কুঁকড়ে গেছে! সে আর কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

শ্রীলেখার শরীরে একখানা আটপৌরে শাড়ী জড়ানো। সদ্য ঘুম থেকে উঠে আসার চিহ্ন তার চোখে মুখে। এবং সে ভয় পেয়েছে। তার বিয়ের আর মাত্র তিন সপ্তাহ বাকি—এই সময় সূর্যর চলে আসার পরিণাম যে কি সে বুঝতে পারছে না। এর আগে দুবার তার বিয়ে ঠিক হয়েও ভেঙে গেছে। বাবা মা সব সময় তার নিন্দা মন্দ করে। সে আর কত সহ্য করবে।

সূর্যকে চুপ করে থাকতে দেখে শ্রীলেখা আবার আস্তে আস্তে বললো, সূর্যদা, আমি হয়তো অনেক দোষ করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তুমি আমার সত্যি সত্যি দাদার মতন—তুমি ওসব কথা আমাকে আর বলো না।

সূর্য বিষণ্ণভাবে বললো, শ্রীলেখা তোকে আমার চাই!

—আমি মনে মনে তোমারই থাকবো। কিন্তু তুমি আর কোনোদিন এভাবে এসো না!

—মনে মনে নয়—আমি তোকে সব সময় চাই। তুই পাশে থাকলে আমি অনেক কিছু করতে পারবো।

—ওসব আমার জন্য নয়।

—আমি তোকে তৈরি করে নেবো। তুই আমাকে বিশ্বাস করতে পারবি না? তোকে কোনো কষ্ট পেতে দেবো না—তুই চলে আয় আমার সঙ্গে।

—আমি ওপরে যাচ্ছি। তুমি আর এসো না।

সূর্যর মুখ থেকে বিষণ্ণতা মুছে গেল। আর দু'সিঁড়ি উঠে এসে শ্রীলেখাকে বাঘের মতন জাড়িয়ে ধরে অদ্ভুত তীব্রগলায় বললো, তোকে আমার চাই!

দিনের বেলা সিঁড়ির মাথায় এই রকম ঘটনায় শ্রীলেখা এত অসম্ভব ভয় পেয়ে গেল যে ভয় তাকে প্রচণ্ড শক্তি এনে দিল। প্রাণপণে এক ধাক্কা দিল সূর্যকে! সূর্যের মতন বলশালী যুবাও সে ধাক্কা সইতে পারলো না। হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ে গেল দু'তিন সিঁড়ি। সেই আওয়াজ শুনে বাদল আর নিখিলরঞ্জন বেরিয়ে এলেন বাইরে।

সূর্য ওদের দিকে ভ্রুক্ষেপ করলো না। শ্রীলেখার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললো, তুই আমার কথা শুনলি না। তাহলে আমিও তোকে শান্তিতে থাকতে দেবো না। আমি ফিরে আসি, তারপর তোর জীবনটাও আমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবো।

নিখিলরঞ্জন উঠে এসে সূর্যর পিঠে হাত রেখে বললো, সূর্য, এ কি করছো! শান্ত হও! শান্ত হও!

॥ ২৭ ॥

বড়দির বিয়ের দিন আমি প্রথম ধুতি পরি। মা আমাকে গোলাপি রঙের সিল্কের পাঞ্জাবি ও জরিপাড় ধুতি পরিয়ে দিয়েছিল, এবং ফুলফুল আঁকা সাদা পাম্প শু। দু'তিনবার আছাড় খেয়ে ধুতিটা আমি মোটামুটি কায়দা করে নিয়েছিলাম কিন্তু নতুন জুতোর জন্যে আমার পায়ে ফোস্কা হয়ে যায়, ফলে জুতোর মধ্যে তুলো লাগাতে হয়।

খুব আনন্দ হয়েছিল বড়দির বিয়েতে। সাতদিন ধরে আমরা তালতলার বাড়িতেই ছিলাম। বিয়ের দিন সকাল থেকেই গেটের সামনে শানাই বসেছিল। শানাইয়ের বাজনার থেকেও আমার বেশী মজা লেগেছিল যে লোকটি পোঁ করে থাকে, তাকে দেখতে। একজন বেঁটে মতন লোক সারা দিন রাত ধরে শুধু সানাইতে পোঁ-ও-ও করে যায়।

সারাদিন ধরে তত্ত্ব গেল, তত্ত্ব এলো। কি বিরাট বিরাট দু'খানা মাছ এলো বরের বাড়ি থেকে। বড়দিকে গায় হলুদ মাখিয়ে চান করানো হলো। মা বড়দিকে বলে দিল, দুপুরবেলা ঘুমুবি। আজ একদম ঘোরাফেরা করবি না। বিয়ের কনেকে দুপুরে ঘুমুতে হয়—এই নিয়ম!

আমার খুব ইচ্ছে ছিল নেমন্তন্নর সময় জল কিংবা নুন পরিবেশন করার। কিন্তু আমাকে কিছুতেই তা দেওয়া হলো না। আমাকে বলা হলো, বরযাত্রীদের কাছে বেলফুলের মালা নিয়ে যেতে কিন্তু সেটা তো মেয়েদের কাজ, তাই আমি নিইনি।

বর এসেছিল একটা হাঁসের পিঠে চড়ে। মানে, একটা মটোর গাড়ি—সেটাতে ফুল দিয়ে হাঁসের মতন সাজানো। সেই মটোর গাড়ির পাদানিতে দু'পাশে দু'জন লোক

দাঁড়িয়ে ছিল—তাদের এমন পোশাক, ঠিক যেন ইতিহাস বইয়ের সৈন্য!

জামাইবাবু খুব রোগা আর লম্বা। টকটকে ফর্সা রং, চুলগুলো কোঁকড়া। তাঁর দু'হাতে তিনটে আংটি। তিনি গদিমোড়া চেয়ারে বসে খুব ঘামতে লাগলেন, একজন লোক ময়ূরের পালকের পাখা দিয়ে তাঁকে হাওয়া করতে লাগলো। জামাইবাবু দারুণ বিদ্বান, ডবল এম এ পাস! তিনি কারুর চোখের দিকে সোজাসুজি তাকান না—সব সময় চোখ নিচু করে থাকেন। জামাইবাবুরা থাকেন খড়্গপুর। বিয়ের পর বড়দিকে খড়্গপুরে নিয়ে চলে যাবেন।

সন্ধ্যের পর থেকেই বাড়িটা লোকে একেবারে ভরে গেল। বড়বাবু গেটের সামনে দাঁড়িয়ে সবাইকে হাতজোড় করে নমস্কার করছেন। জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বড়বাবুর যে ঝগড়া হয়েছিল—আজ কিন্তু সেটা দেখে কেউ বুঝতে পারবে না। জ্যাঠামশাই একদম সাজ-পোশাক করেন নি—ফতুয়া পরে ঘোরাঘুরি করছেন—মাঝে মাঝে এসে বড়বাবুর সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে কথা বলে যাচ্ছেন। বাবা আছেন মিষ্টির ঘর পাহারায়। সাধুকাকা অবশ্য বেশীর ভাগ সময় নিজের ঘরেই বসে রইলেন। সাধুকাকাকে কেউ চেনে না।

বিষ্ণু, দীপ্তি, অংশ, রেণু—ওরাও এসেছে নেমন্তন্ন খেতে। সুপ্রকাশদা আসতে পারেন নি। বিষ্ণুর সঙ্গে কয়েকদিন আমার কথা বন্ধ ছিল, কিন্তু আজ আমি নিজে থেকেই ভাব করে নিলাম। আজকের দিনে কি বিষ্ণুর সঙ্গে কথা না বলে থাকা যায়? ওরা কিন্তু কেউ ধুতি পরে নি। রেণু ফাজলামি করে আমার ধুতি খুলে দেবার চেষ্টা করছিল—কিন্তু আমার কোমরে বেল্ট বাঁধা, অত সহজে খুলবে না! রেণু মাথায় লাল রিবন, সাদা সিল্কের ফ্রক পরে এসেছে। কিছুদিন আগে ওর কান বেঁধানো হয়েছে বলে, দু'কানে এখনো একটু একটু ঘা। ওর কানে ব্যথা দিয়ে দিলে এত লোকজনের মধ্যেই বোধহয় কেঁদে ফেলবে।

আমার কাজ হলো সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ানো। একবার ছাদে কিংবা বারান্দায় খাবার জায়গায়, কিংবা একতলায় বর যেখানে বসেছে সেই আসরে কিংবা যে-ঘরে বড়দিকে সাজানো হচ্ছে। কিন্তু সব জায়গাতেই আমরা তাড়া খাই। যেখানেই যাই, কেউ না কেউ বলে, এই ছোটরা, এখানে কি করছিস, নিচে যা! আবার নিচে গেলে বলে, ওপরে যা। দীপ্তি অবশ্য শাড়ি পরে এসেছে, ওকে বেশ বড়ই দেখাচ্ছে। ও অনায়াসেই বড়দের দলে ভিড়ে গেল।

আমরা কেউই আগে খাবো না ঠিক করেছিলাম, কিন্তু আমাদের জোর করে ফার্স্ট ব্যাচে খাইয়ে দেওয়া হলো। কেউ বারণ করার আগেই আমরা একটা করে পান খেয়ে নিলাম, কিন্তু আমার জামাতেই শুধু পানের পিক লেগে গেল। আগে খাইয়ে দিক আর নাই দিক, আমরা কেউ ঘুমোবো না, বিয়ে দেখবো। লগ্ন অনেক দেরিতে। রেণুটা এমন ক্যাবলা, ওরই ঘুমে চোখ ছোট হয়ে এলো আগে। আমি ওকে চিমটি কেটে জাগিয়ে রাখতে চাইলাম। রেণু নিজেই নিজের হাতে দু'একবার চিমটি কাটলো। তারপর একটু বাদে দেখি রেণু নেই। আর একটু বাদে দেখলাম, সাধুকাকার ঘরে রেণু অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

উঠোনের ছবি-আঁকা পিঁড়িতে জামাইবাবুকে আগে এনে বসানো হলো। তিনজন বাঘা-বাঘা পুরুত মন্ত্র পড়তে লাগলেন জোরে জোরে। সেই প্রথম আমরা বুঝতে পারলাম, জামাইবাবু একটু তোতলা। প্রতিটি কথা বলছেন থেমে থেমে, মাঝে মাঝে মধুকে বলছেন ম্-ম্-মধু।

আমি একটু আড়ালে এসে বললাম, এ মা, হি-হি-হি, জামাইবাবু তোতলা!

বিষ্ণু গম্ভীরভাবে আমাকে ধমক দিয়ে বললো, ছিঃ ওকথা বলতে নেই। ডবল এম এ পাশ না!

আমার তখন ভয় হতে লাগলো, বড়দি জামাইবাবুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলবে না তো? তাহলে কি হবে?

বিষ্ণুকে বললাম, চল, বড়দিকে দেখে আসি।

অংশুর বোধহয় ঘুম পেয়েছে। ওর আর ভাল লাগছে না—ও বিষ্ণুকে বললো, এবার বাড়ি যাবি না?

বিষ্ণু বললো, কি করে যাবো? মা-দের তো এখনো খাওয়াই হয়নি। তুই ঘুমোবি!

ঘুমিয়ে পড়লে ওর আত্মসম্মানে লাগবে বলে ও ঘুমোতেও চায় না।

বড়দির ঘরে খুব মেয়েদের ভিড়। ঠেলে ঠুলে আমরা ভেতরে ঢুকে গেলাম। ইস, কি সুন্দর সাজিয়েছে, বড়দিকে! টকটকে লাল রঙের শাড়ি, সারা গায়ে ঝলমল করছে গয়না, মুখময় চন্দনের ফোঁটা, কানে কানপাশা, কপালে ঝুলছে টিকলি। কাছে গিয়ে দেখি বড়দির চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে।

বড়দিকে সাজাবার ভার নিয়েছে মা। পাউডারের পাফ দিয়ে বড়দির গালে বুলোতে বুলোতে মা ফিসফিস করে বলছে, এই, কি করছিস কি? বোকা মেয়ে! সব সাজ নষ্ট হয়ে যাবে!

বড়দির পেছনেই দাঁড়িয়ে দীপ্তি। বড়দিকে দেখে ওরও চোখ ছলছল করছে দেখলাম।

হঠাৎ দরজার কাছে আওয়াজ শোনা গেল, ভিড় ছাড়ো, ভিড় ছাড়ো!

তাকিয়ে দেখি, জ্যাঠামশাইয়ের বন্ধু অনাদি জ্যাঠামশাই। অনাদি জ্যাঠামশাই খুব ভালো ছবি তোলেন, উনি বড়দির ছবি তুলতে এসেছেন।

দরজার কাছ থেকে মেয়েদের ভিড় প্রায় ঠেলে ঠুলেই সরানো হলো। অনাদি জ্যাঠা স্ট্যান্ডের ওপর বসানো মস্ত বড় ক্যামেরাটা ঠিক করলেন। তারপর মস্ত বড় একখানা কাপড়—যেটার একদিকে লাল আর একদিকে কালো সেই কাপড়খানা দিয়ে অনাদি জ্যাঠা ক্যামেরা ও নিজের মুন্ডু সম্পূর্ণ ঢেকে ফেললেন। বেশী আলোর ব্যবস্থার জন্য দুখানা হ্যাজাক এনে রাখা হলো ঘরের মধ্যে। অনাদি জ্যাঠা ছবি তুলবেন, আমরা প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

হঠাৎ অনাদি জ্যাঠা কালো কাপড় থেকে মুন্ডু বার করে হুংকার দিয়ে উঠলেন, এ কি, মেয়ের চোখে জল কেন?

মা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, ওর চোখে পাউডার লেগে গেছে তো—

—আমি কি শুভদিনে কান্নার ছবি তুলবো নাকি!

মা নিজের আঁচল দিয়ে বড়দির চোখ মুছিয়ে দিলেন। অনাদি জ্যাঠা আবার কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে ফেললেন, সেই অবস্থাতেই হুকুম করলেন, মুখ তোলো! কনের মুখ আরো উঠবে!

মা বড়দির থুতনি ধরে মুখ উঁচু করে দিলেন।

—হাসো!

বড়দির ঠোঁট কাঁপছে। আবার মুখ নিচু করতে যাচ্ছিল, অনাদি জ্যাঠা বকুনি দিলেন, হাসো! একদম নড়বে না—

বড়দি ঠোঁট খুলে হাসার চেষ্টা করলো। ভিজে চোখ তখনও টলটল করছে, ঠোঁটে

হাসি—সেই অবস্থাতেই বড়দির ছবি অবিনশ্বর হয়ে রইলো।

ভিড়ের মধ্যে খুব গরম লাগছিল বলে আমরা আবার বাইরে চলে এলাম। বিষ্ণু আমাকে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ রে বাদল, সূর্যদা কই রে? সূর্যদাকে তো একবারও দেখি নি!

আমি চুপ করে রইলাম। আজ সারাদিনে এ বাড়িতে কেউ সূর্যদার কথা একবারও উচ্চারণ করেনি। তাই থেকেই আমি বুঝেছি, সূর্যদার কথা বলা আজ নিষেধ। সূর্যদা তো হিংসুটে, বড়দির বিয়েতে সবাই আনন্দ করুক এটা চায়নি—তাই সূর্যদাকে কেউ আসতে বলেনি।

কিন্তু আমার প্রাণের বন্ধু বিষ্ণুকে এ কথাটা না বললে চলে কি করে! অথচ অংশু রয়েছে যে! আমি অংশুকে বললাম, তুই একটু যা তো, বিষ্ণুর সঙ্গে আমার প্রাইভেট কথা আছে।

অংশু বললো, আমাকে বলবি না?

—না, শুধু বিষ্ণুর সঙ্গে—

অংশু রেগে গিয়ে বললো, তা হলে আমি মাকে বলে দেবো, তোমরা প্রাইভেট কথা বলো।

—ঠিক আছে, তাহলে বলবো না!

একটু বাদে আমি আর বিষ্ণু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে চট করে অংশুকে কাটিয়ে দিয়ে নিচে এসে সিঁড়ির তলায় লুকিয়ে রইলাম। উঁকি মেরে দেখলাম, অংশু ওপরে উঠে গেল। তখন আমি বললাম, জানিস, সূর্যদা না বড়দিকে বিয়ে করবে বলেছিল।

বিষ্ণু এত জিনিস বোঝে, কিন্তু এই কথায় হতভম্ব হয়ে গেল। আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে অবিশ্বাসের সুরে বললো, যাঃ, তা কখনো হয়?

আমি জোর দিয়ে বললাম, হ্যাঁরে, আমাকে নিজের মুখে বলেছে। গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে—সেই যে যেদিন ধর্মঘট হলো—

—এক বাড়িতে আবার বিয়ে হয় নাকি?

—এখন তো জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি আর আমাদের বাড়ি—দুটো বাড়ি—!

—তা হলেও! বর আবার কনেকে কখনো আগে থেকে চেনে নাকি?

—সূর্যদা আমাকে বলেছিল কেন?

—সূর্যদাকে জিজ্ঞেস করতে হবে তো কথাটা। সূর্যদা এখন কোথায়?

—কি জানি।

—তুই জানিস না?

—সূর্যদা তিন চারদিন আগে বাড়ি থেকে কোথায় যেন চলে গেছে।

বিষ্ণু একটুক্ষণ কি যেন ভাবলো। তারপর আপনমনে বললো, সূর্যদার খুব সাহস!

আমি খানিকটা অভিমানের সঙ্গে বললাম, ঘেঁচু সাহস! এই তো সূর্যদা বলেছিল, আর কেউ বড়দিকে বিয়ে করতে পারবে না। বিয়ে তো হলো—সূর্যদা কি করলো?

বিষ্ণু হঠাৎ অন্যদিকে কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললো, হ্যাঁরে বাদল, বিয়ে মানে কি রে?

এর উত্তর আমিও ঠিক জানি না। তবু বললাম, বিয়ে হয়, এইরকম নিয়ম আছে।

—কেন হয়? বিয়ে হলে কি হয়?

—বিয়ে হলে ছেলেমেয়ে হয়। বড়দির এবার ছেলেমেয়ে হবে।

—বিয়ে না হলে কেন হয় না?

আমিও জানি না ভাই। দীপ্তির শিগগিরই বিয়ে হবে—তখন ওকে জিজ্ঞেস

করবি?

—দীপ্তিটা ভীষণ হিংসুটে। ও বলবে না।

এই সময় এক সঙ্গে অনেক উলু ও শাঁখের আওয়াজ শোনা গেল। বিয়ে বোধহয় শেষ হয়ে যাচ্ছে—এই ভেবে আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেলাম। তখন বড়দিকে পিঁড়ির ওপর বসিয়ে জামাইবাবুর চারদিকে ঘোরানো হচ্ছে।

আমরা ভেবেছিলাম বিয়ে দেখাটা দারুন কিছু ব্যাপার। কিন্তু একটু পরেই একঘেয়ে লাগলো। খালি মন্ত্র পড়া আর মন্ত্র পড়া। বিষ্ণুদেরও বাড়ি ফেরার সময় হয়ে এলো।

রেণু কোথায় সে-কথা সবাই ভুলে গেছে। আমার মনে পড়লো। সাধুকাকার ঘরে গিয়ে দেখি রেণু দেয়ালের ধার ঘেঁষে ঘুমোচ্ছে। আমি গায়ে হাত দিয়ে ডাকতেই ধড়ফড় করে উঠে বসলে। বড় বড় চোখ মেলে জিজ্ঞেস করলো, বিয়ে হয়ে গেছে?

আমি বললাম, প্রায় শেষ হয়ে গেল। তুই তো কিছুই দেখলি না।

রেণু তখন এক ছুটে চলে গেল বিয়ের আসরে। আর সে সেখান থেকে নড়বে না। ওর ঘুম একদম ছুটে গেছে। অংশু জোর করে টানতে টানতে নিয়ে গেল রেণুকে।

বিষ্ণুদের ঘোড়ার গাড়ি চলে যাবার পর আমি দেখলাম, বাড়ির সামনের রাস্তায় এঁটো কাঁটার পাহাড় জমেছে—কয়েকজন কাঙালী হুমড়ি খেয়ে পড়েছে তার ওপর—একদল কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে তাদের পাশে। আলো ঝলমল বিয়েবাড়ির পাশে সব সময়েই এক দৃশ্য থাকে—তবু সেদিন মধ্যরাত্রে ঐ দৃশ্য যেন আমি প্রথম দেখলাম মনে হলো।

পরদিন আমার ঘুম ভেঙেছিল খুব ভোরে। সারা বাড়ি তখন ঘুমন্ত। খুব হিসি পাওয়ার জন্যই ঘুম ভেঙে যায়—আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম। কিংবা হয়তো ঘুমের মধ্যেই আমি শুনেছিলাম লোহার গেটে ঝনঝন্ শব্দ। কিছু একটা কোলাহল।

তিনতলার বারান্দা থেকে দেখলাম, বাগান পেরিয়ে লোহার গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে সূর্যদা। গেট তালাবন্ধ। গেটের এ পাশে দরওয়ান আর জ্যাঠামশাই। সূর্যদার চুল উস্কোখুস্কো। কি কথা হয়েছিল আমি কিছুই শুনতে পাইনি। দৃশ্যটা শুধু দেখেছি। সেই অবস্থায় নিচে নেমে যাবারও সাহস পাইনি—তা হলে জ্যাঠামশাইয়ের কাছে দারুণ বকুনি খেতাম। সূর্যদা নিশ্চয়ই চ্যাঁচামেচি করেনি, তাহলে তিনতলা থেকেও শোনা যেত—বোধহয় সূর্যদা অনুনয় বিনয় করেই কিছু বলছিল—জ্যাঠামশাই বরং রাগারাগি করছিলেন—তারপর দরোয়ান দৌড়ে গিয়ে বড়বাবুকে ডেকে নিয়ে এলো। বড়বাবু রাত্রে নিজের বাড়ি ফেরেননি। সূর্যদা এসে যাতে না কোনো গণ্ডগোল করে, সেইজন্যই বড়বাবু থেকে গিয়েছিলেন সম্ভবত। বড়বাবুও কি সব বলতে লাগলেন, আমি রেলিং-এ থুতনি ঠেকিয়ে সেদিকে চেয়ে রইলাম।

গেটের তালা খোলা হলো না। সূর্যদা এক সময় মুখ ফিরিয়ে হনহন করে হেঁটে চলে গেল। সেই ভোরবেলা সূর্যদাকে দেখে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। সূর্যদাকে আর কেউ ভালোবাসে না। আমি ভালোবাসি। আমি যদি নিজের প্রাণ দিয়েও সূর্যদার জন্য তখন কিছু করতে পারতাম—তাতেও রাজী ছিলাম। কিন্তু কি করবো? সূর্যদা বোধহয় একবার বড়দির সঙ্গে শুধু দেখা করতে চেয়েছিল। বাসরঘরে বড়দি, আরও অনেকে ঘুমিয়ে রয়েছে। চুপি চুপি বড়দিকে ডেকে আনবো? কিন্তু বুঝলাম, তাতেও কোনো লাভ নেই—বড়দি সূর্যদাকে চলে যেতে বলেছিল। সূর্যদাকে কেউ নেমন্তন্ন খেতেও দিল না। একবার ইচ্ছে হলো, সূর্যদার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকি। তা-ও ডাকা হলো না। সূর্যদা সেই যে দারুণ অপমানিত হয়ে চলে গেল এ বাড়ি থেকে

--তারপর আর বেশ-কয়েক বছর আমি সূর্যদাকে দেখিনি।

॥ ২৮ ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দু-তিনটি বছর এ দেশে একটা অদ্ভুত বিহ্বলতার মধ্যে কেটেছে। প্রথম সারির নেতারা প্রত্যেকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং সেটা ঢাকবার জন্য তাদের ছটফটানিও অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠলো। যুদ্ধ যখন লাগবে লাগবে মনে হয়েছিল, তখন সকলেরই মনে আশা জেগেছিল যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে একটা সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটবে। যুদ্ধ যখন সত্যি সত্যি শুরু হলো, তখন সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। স্বরাজ এবার আসবেই, কিন্তু কোন্ পথে আসবে? স্বরাজ কি অর্জন করে নিতে হবে না? দেশের লোক একটা কিছু নির্দেশ পাবার জন্য অধীর—কিন্তু কোনো নির্দেশ নেই।

মহাত্মা গান্ধী যুদ্ধটাকে নিলেন নৈতিক দিক থেকে। যে পরিচ্ছন্ন নীতি মানুষের আত্মাকে শুদ্ধ করে, সেই নীতিবোধ তিনি একটি দেশের দিকদিশারী হিসেবে গ্রহণ করতে চাইলেন। যদিও দেশের অধিকাংশ মানুষ জানে না দেশ কাকে বলে—এবং রাষ্ট্রের কোনো আত্মা নেই। প্রায় পৌনে দুশো বছর ধরে যে-ইংরাজ সম্পূর্ণ অমানবিক ভাবে ভারত শাসন ও শোষণ করলো—সেই ইংরেজই শক্তিশালী জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে বিপন্ন হওয়ায় গান্ধীজী জানালেন, ইংরেজ এখন আক্রান্ত, এই সময় তাকে চাপ দেওয়া সুনীতির পরিপন্থী। দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনেও তিনি সম্মতি দিলেন না—কারণ তার পরিণতি অরাজকতা ও ধ্বংস। তিনি বড়লাটের সঙ্গে চিঠি চালাচালি করতে লাগলেন। এই যুদ্ধে অগণতান্ত্রিক নাৎসী জার্মানীর বিজয় তিনি চান না—আবার অহিংসা নীতির সম্মান রক্ষার জন্য মিত্রপক্ষের যুদ্ধকর্মেও তাঁর দেশ সাহায্য করবে না।

ইংরেজদের সঙ্গে দর কষাকষির আগে ভারতীয় দলগুলির মধ্যে মতৈক্য আনতেও কেউ তখনো সক্ষম হয়নি। জিন্না সাহেবের মুশ্লিম লীগ ততদিনে কলসী থেকে বেরুনো মস্ত বড় দৈত্যে পরিণত হয়েছে—অথচ গান্ধীজী এবং কংগ্রেস তাকে বাস্তব বলে কিছুতেই স্বীকার করছেন না। ১৯৪০-এ লাহোরে পাকিস্তানের দাবি পর্যন্ত উঠে গেছে—কিন্তু কংগ্রেস তা নিয়ে আলোচনা করতেই রাজী নয়। এর আগে, বাংলাদেশে ফজলুল হক যখন লীগকে বাদ দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করতে চেয়েছিলেন—তখন কংগ্রেস ফজলুল হকের সঙ্গে সহযোগিতা না করে এক চরম ভুল করেছিল। এবারও লীগের সঙ্গে আপোসে মীমাংসা না করে কংগ্রেস লীগকে আরও দূরে সরিয়ে দিল—যে-লীগ আগে চেয়েছিল শুধু শাসন ক্ষমতার অংশ, এখন তারা চাইলো দেশের অংশ—সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষে এই সময়েই সত্যিকারের সার জল পড়লো। জিন্না সাহেব আরও শক্ত হলেন, পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের যে-কোনো আলোচনা মুশ্লিম লীগকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। বৃটিশ সরকারের পক্ষে এতে সুবিধে ছাড়া অসুবিধে বিন্দুমাত্র নেই।

কংগ্রেসের নিজের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব কিছুতেই আর মেটে না। সুভাষ বোসকে নিয়ে কম ঝক্কি পোহাতে হয়নি। মাঝে মাঝেই উত্তেজিত জওহরলালকে সামলাতে হচ্ছে। কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে সুভাষবাবুকে বললেন, "আমাদের উচিত হবে,

সরকারকে একটা চরম পত্র দেওয়া এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাদের জাতীয় দাবি পূরণ করা না হলে সারা দেশ জুড়ে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা।...সকল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংঘ-প্রতিষ্ঠান, কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন, সকল চরমপন্থী দল মিলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ওপর একযোগে চরম আঘাত হানতে হবে।"

সুভাষবাবুর কথাবার্তায় সন্ত্রাসবাদের গন্ধ। এতে কংগ্রেসের অহিংসার আদর্শে চিড় খায়। গান্ধীজী বলেছিলেন, অহিংসা আমার কাছে একটা আদর্শ, তোমরা যদি আদর্শ হিসেবে মেনে নিতে না-ও চাও, পন্থা হিসেবে গ্রহণ করো। সুতরাং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এ সুভাষকে বে-আইনীভাবে সরিয়ে দেওয়া হলো। রবীন্দ্রনাথ সুভাষের প্রতি সুবিচারের জন্য গান্ধীজীকে লিখলেন। উত্তরে গান্ধীজী বললেন, সুভাষকে নিয়ম মেনে চলতে বলুন। সুভাষতে তাতেও দমন করা যায় না। বাংলাদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেস তিনি তখনও দাখিল করে আছেন। সেখান থেকেও তাঁকে বাদ দেবার পর তিনি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ফরোয়ার্ড ব্লক তৈরী করলেন। সারা দেশের যুব সমাজ তাঁর কথা শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব।

যুদ্ধের গোড়ার দিকেই সুভাষ ঘোষণা করলেন, ডালহৌসি স্কোয়ারে হলওয়েলের যে কুখ্যাত স্মৃতিস্তম্ভ আছে—বাংলার যুব সমাজ সেটা উপড়ে ফেলে দেবে। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার নামে মিথ্যে কলঙ্ক লেপন করার জন্যই ব্রিটিশ সরকার ঐ স্মৃতিস্তম্ভ বানিয়ে রেখেছে। তিনি নিজে প্রথম আঘাত আনবেন ঐ মিথ্যার স্তম্ভে।

সারা দেশে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়ে গেল এই আহ্বানে। এবং এ এমনিই এক প্রশ্ন, যেখানে হিন্দু মুসলমানে কোনো মতান্তর নেই। এদিকে, ভারতের অন্যান্য রাজ্যে সমস্ত মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করলেও বাংলায় নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে লীগ মন্ত্রি-সভা তখনও পুতুল খেলা খেলছে। পাছে হিন্দুদের হাতে ক্ষমতা চলে যায়—এই ভয়ে লীগ মন্ত্রিসভা তখন সাহেবদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে দ্বিধাগ্রস্ত নয়—যদিও আসল ক্ষমতা কিছুই হাতে নেই—মনোনীত সদস্য এবং ইংরাজ ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের ভোটে যে-কোনো প্রস্তাব নাকচ হতে পারে।

সুভাষবাবু আইন অমান্য করে হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙার আহ্বান জানানোর জন্য নাজিমুদ্দীন সরকার তাঁকে বন্দী করলেন। সমস্ত দেশ প্রতিবাদে ফেটে পড়লো। বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের অন্তত কিছুটা শান্ত করার জন্য শেষ পর্যন্ত নাজিমুদ্দীন সরকারকেই সেই স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণ করতে হয়।

পরের বছর গৃহবন্দী অবস্থা থেকেই সুভাষবাবু হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে গেলেন। সে খবর রটে যাওয়ার পর সারা কলকাতা শহরে গুজবে কান পাতা যায় না। কেউ বললে, ব্রিটিশরাজ সুভাষবাবুকে খাবারের সঙ্গে রোজ একটু একটু বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে। কেউ বললে, শেষ রাত্রে তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে—শিবপুরের কাছে গঙ্গায় ভাসতে দেখা গেছে তাঁর লাশ—কেউ বলে মন্ত্রবলে তিনি অদৃশ্য—কেন না দুর্ভেদ্য বৃটিশ পাহারা ফাঁকি দিয়ে কেউ কি পালাতে পারে? মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত বিচলিত হয়ে শরৎ বোসের কাছে টেলিগ্রাম পাঠালেন, সুভাষের সঠিক কি হয়েছে, আমাকে জানাও। কিছুদিন বাদে রহস্যময় রেডিও থেকে শোনা যেতে লাগলো সুভাষের কণ্ঠস্বর।

ব্রিটেন হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের পক্ষ থেকে বড় লাট লর্ড লিনলিথগো জার্মানির সঙ্গে ভারতেরও যুদ্ধাবস্থা বলে ঘোষণা করে-

ছিলেন। ভারতরক্ষা অর্ডিনান্স জারি হয়ে গেল, বড়লাটের হাতেই তাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। কংগ্রেসী নেতারা মনে বড়ই আঘাত পেলেন। এদিক-ওদিক কিছু মন্ত্রিত্ব এবং আলাপ আলোচনার ভড়ং চলছিল এতদিন—কিন্তু এখন প্রকট হয়ে পড়লো, ভারতের সর্বৈব মালিক এখনও বৃটিশ সরকার। ভারত কার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করবে কি করবে না—সে সম্পর্কে ভারতের কোনো জননেতার সঙ্গে পরামর্শ করার পর্যন্ত দরকার নেই। এখন বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলনে নেমে না পড়লে কংগ্রেসের আর কোন মান থাকে না। কংগ্রেস প্রদেশে প্রদেশে মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিয়েছে—কিন্তু সেটাকে তো আর সংগ্রাম বলা চলে না।

কংগ্রেসের অনেক বৈঠক আর বড়লাটের সঙ্গে নরম-গরম চিঠি চালাচালির পর গান্ধীজী নির্দেশ দিলেন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের। কোনো সংগ্রাম নয়, কোনো সংঘবদ্ধ আন্দোলন নয়। রাজনৈতিক কর্মীরা আইন অমান্য করার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যুদ্ধ বিরোধী ধ্বনি দিতে দিতে গ্রেপ্তার বরণ করবেন। যে-সময় দেশের সাধারণ মানুষ পথনির্দেশ পাবার জন্য উন্মুখ, সেই সময় জননেতারা প্রায় বিলাসিতার সঙ্গে কারাগারের অভ্যন্তরে থাকাই মনস্থ করলেন। দেশব্যাপী একটা নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল।

কংগ্রেসের এই জেল ভরানোর সিদ্ধান্তে লর্ড লিনলিথগো হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন কিনা ইতিহাস তার কোনো দলিল রাখেনি। জিন্না সাহেব নাক কুঁচকে ছিলেন কিনা সে সম্পর্কেও কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নেই। তবে, জিন্না সাহেব এই সুযোগে প্রচার করেছিলেন যে, দেখো, কংগ্রেস কত পৌরুষহীন! সে আসলে স্বাধীনতা চায় না, ইংরেজের সঙ্গে একলা একলা একটা সমঝোওতা করে মুসলমানদের দমিয়ে রাখতে চায়। এই প্রচারে বহু জাতীয়তাবাদী মুসলমানও লীগে যোগ দিয়েছিল।

স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করবে আর কে? সশস্ত্র বিপ্লবী দলগুলি উনিশ শো পঁয়তিরিশের পর থেকে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। অনেকেই এসে আশ্রয় নিয়েছে কংগ্রেসের ছত্রছায়ায়। সবাই এটুকু অন্তত উপলব্ধি করেছিল—একটা বিরাট আয়োজন ছাড়া এই সময় সংগ্রাম সার্থক হতে পারে না। এবং কংগ্রেসের মতন এত বড় একটা দলের নেতৃত্ব ছাড়া সেই বিরাট দায়িত্ব আর কে নিতে পারে? এরা সবাই কংগ্রেসের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো এবং নিরাশ হতে লাগলো। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে হাজার হাজার কর্মী যখন কারারুদ্ধ, তখন গান্ধীজী বললেন, “আপাতত আমাদের বাক স্বাধীনতা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এ সংগ্রাম খুব তাড়াতাড়ি শেষ হবে না। যাদের নিজেদের স্বাধীনতাই আজ বিপন্ন, তাদের বিরুদ্ধে আমরা কেমন করে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করবো? ইংরেজের কি এখন সে সময় আছে?”

বাকি রইলো কম্যুনিস্টরা। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির সময় যারা চুপচাপ ছিল, হিটলার রুশ আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তারা সরব হয়ে উঠলো। কম্যুনিস্টরা জাতীয় স্বাধীনতার লড়াইয়ে অংশ গ্রহনের বিরোধী নয়—কিন্তু এখন ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নটা তাদের কাছে মুলতুবী রইলো। ১৯৪১ এর ডিসেম্বরে জাপানীরা পার্ল হারবার আক্রমণ করায় সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো যুদ্ধ—ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির সঙ্গে রুশের সমধর্মিতা হওয়ায়—এরাই হলো মিত্র পক্ষ, এই যুদ্ধ হলো জনযুদ্ধ। তারা দেশের মানুষকে বললো, এই যুদ্ধে ইংরেজকে সমর্থন করে পৃথিবীকে হিটলারের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। গ্রামে গ্রামে শোনা গেল, “কৃষাণ ভাই রে, কাস্তেটারে দিও জোরে শান। এক নিমেষে আসবে স্বরাজ, পালাবে জাপান...”। অর্থাৎ যে-জাপান

তখনও আসেনি, সেই জাপান ভারতের স্বাধীনতার শত্রু।

বহু বছর ধরে নিষিদ্ধ ছিল যে কম্যুনিস্ট পার্টি, এবার তার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলো। ব্রিটিশ সরকার বিনা মাইনের এক প্রচার সচিব দল পেয়ে বেশ খুশী।

যুদ্ধের আর একটি দিক হলো, যুদ্ধোদ্যমে টাটা বিড়লা প্রভৃতি শিল্পপতিরা ফুলে লাল হয়ে গেল—কংগ্রেসের এরাই প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল। হাজার হাজার লোক চাকরি পেতে লাগলো যুদ্ধের সুবাদে। কৃত্রিম অর্থের ছড়াছড়িতে ফুলে ফেঁপে উঠলো বাজার। শেষ পর্যন্ত এমন হলো, চাকরি খালি রয়েছে, অথচ লোক পাওয়া যায় না। গ্রামে আড়কাঠি পাঠিয়ে লোক ধরে আনতে হয়। রাশি রাশি খুদে কন্ট্রাকটর জন্মালো—উৎকোচ ও দুর্নীতি সত্যিকারের কাকে বলে মানুষ বুঝলো এই প্রথম।

আসলে যুদ্ধের সময় নৈতিকতার প্রশ্নই দেশের সমস্ত সৎ নেতাদের দিশেহারা করেছিল।

নাৎসী জার্মানি এবং ফ্যাসিস্ট ইটালি ও জাপানকে নীতিগতভাবে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। আবার ইংরেজকে সমর্থন করলে ভারতের স্বাধীনতা কবে আসবে? ইংরেজ বলুক, যুদ্ধ শেষে ভারতের স্বাধীনতা দেবে? কিন্তু বড়লাট ডোমিনিয়ান স্টেটাস ছাড়া আর কিছুই বলছেন না, সে ক্ষেত্রে ভারতের কাছে প্রধান শত্রু কে? সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ, না নাৎসী জার্মানি? এই ব্যাপারে কিছুতেই কেউ মনস্থির করতে পারলেন না। জাপান যখন চীনের ওপর বেপরোয়া অত্যাচার চালাতে লাগলো, তখন মহাত্মাজী বললেন, "আমার সহানুভূতি অবশ্য রুশিয়া ও চীনের দিকে। আজ দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি, আজ আমার মন আর বৃটেনকে নৈতিক সমর্থন দিতে চায় না। ভারতের প্রতি বৃটেনের ব্যবহারে আমি আজ মর্মাহত। অবশ্য আমি চাই না যে বৃটেন অপমানিত হোক বা যুদ্ধে পরাজিত হোক, কিন্তু আমার মন আর তাকে নৈতিক সমর্থন দিতে চায় না।" ভারতের দারুণ সংকটের সময় এরকম অদ্ভুত নঞর্থক কথার মানেই অনেকে বুঝতে পারে নি।

তারপর জাপান মালয় সিঙ্গাপুর দখল করে বার্মার দিকে এগুতেই ছবি আবার বদলে গেল। বৃটিশ সিংহ দৌড়াচ্ছে পেছন ফিরে—এই দৃশ্যে অনাহার ও ম্যালেরিয়া-জীর্ণ ভারতবাসীরও খানিকটা আরাম হয়—শত্রুর শত্রুকে বন্ধু বলে মেনে নিতে ইচ্ছে হয় অনেকের। সংবাদপত্রে নিদারুণ সেনসরশীপ থাকা সত্ত্বেও এ খবর ছড়িয়ে পড়লো যে সুভাষবাবু একদিন সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারত অভিযানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। ইংরেজ অবশ্য সুভাষবাবুর মিথ্যে মৃত্যু সংবাদ ছাপিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টার কসুর করেনি। এবং একথাটাও সুকৌশলে রটানো হয়েছিল যে, দেশদ্রোহী সুভাষ জাপানীদের পথ দেখিয়ে আনছে। সুভাষবাবু যে সম্পূর্ণ ভারতবাসীদের নিয়ে গঠিত এক সেনাবাহিনীর অধিনায়ক, সে কথা জানানো হলো না। লেনিন জার্মানির সহায়তায় রাশিয়াতে ছুটেছিলেন—আর জাপানীদের সাহায্য নিয়ে সুভাষ দেশ উদ্ধারে এগিয়ে আসার সময় কংগ্রেস-কম্যুনিস্টরা একযোগে তাঁর নিন্দে করলো। জহরলাল বললেন, বাইরে থেকে যারাই ভারত আক্রমণ করুক, আমি নিজে তলোয়ার হাতে নিয়ে তাদের বাধা দেবো! গান্ধীজী বললেন, জাপানীরা মুক্তিদাতা হিসেবে আসবে না, আসবে লুঠের বখরা নিতে। সুতরাং সুভাষবাবুকে সমর্থন করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

যুদ্ধের পুরো চাপটা পড়লো বাংলাদেশে। রেঙ্গুন পতনের পর বৃটেনের ঘাটি উঠে এলো চট্টগ্রামে। বাংলাদেশ আর বেশীদিন রাখা যাবে না, এই চিন্তাতেই ইস্টার্ন

কমান্ডের মূল ঘাঁটি কলকাতা থেকে সরে গেল রাঁচিতে। সেখান থেকেও আবার বোম্বাইতে পালাবার জন্য রাস্তা তৈরী রইলো। পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত এসে জাপানী সেনারা যাতে নদীনালা পেরুবার জন্য যানবাহন না পায়—তাই সমস্ত নৌকা সরকারী দখলে চলে গেল, খাবার যাতে না পায় সেজন্য সমস্ত চাল সরিয়ে নেওয়া হলো বাজার থেকে। জেলেরা খেতে না পেয়ে ধুঁকতে লাগলো, দুর্ভিক্ষের ধোঁয়া দেখা গেল দিগন্তে। কলকাতাতেও তখন পালাই পালাই রব—হাওড়া-শিয়ালদা স্টেশনে প্রতিদিন ভিড়ের চাপে মাথা ফাটাফাটি।

জাপানীদের ঘৃণা করলেও জাপানীরা যদি সত্যি সত্যি বাংলাদেশে উপস্থিত হয় তাহলে তাদের সংগে যাতে আলাপ-আলোচনায় বসা যায়—সেই মতন তৈরি হতে লাগলো কংগ্রেস। কিন্তু এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজদের চূড়ান্তভাবে তাড়াবার কোনো পরিকল্পনা তখনও নেই। গান্ধীজী তখনও 'কুইট ইণ্ডিয়া' শ্লোগান তোলেন নি।

সর্বভারতীয় নেতৃত্বের যখন এই অবস্থা, তখন দেশের বিভিন্ন স্থানে কিছু ছোট ছোট দল মরণপণ করে বৃটিশের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ব্রত নিয়েছিল। তাদের না ছিল সংগঠন, না ছিল শক্তি। কিন্তু তারা বহুকাল ঘরছাড়া—ঘরে ফেরার টান আর নেই—স্বাধীনতার স্বপ্ন একটা দুর্জয় স্নেহের মতন তাদের চোখে লেগে আছে—তারা আর কিছু দেখতে পায় না। নিজেদের ক্ষমতা তারা বোঝে না—মনে করে, নিজের প্রাণ দেওয়াই বড় কথা। একটা প্রাণ গেলে আরও দশটা প্রাণ এগিয়ে এসে জায়গা নেবে। এরাই বিভ্রান্ত বিশৃংখল বেয়াল্লিশের ভারতবর্ষে অকস্মাৎ আগস্ট আন্দোলনের ভূমিকা শুরু করে দেয়।

শিয়ালদার মেসে গভীর রাত্রে মিটিং সেরে ব্রজগোপাল এবং তাঁর দলবল ছড়িয়ে পড়লেন ব্ল্যাক আউটের কলকাতায়। এখন ওদের গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে হবে। ব্রজগোপাল সূর্যর কাঁধে হাত দিয়ে এ আর পি'র দৃষ্টি এড়িয়ে চুপিসারে হাঁটতে লাগলেন।

॥ ২৯ ॥

জাপানীরা আসছে, জাপানীরা আসছে এই রব উঠে গিয়েছিল চতুর্দিকে। মালয়, সিংগাপুরে জাপানীরা যে কি বীভৎস অত্যাচার চালাচ্ছে—ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলিতে তার রগরগে বর্ণনায় সাধারণ মানুষের মনে দারুণ আতঙ্ক। অবশেষে সত্যিই একদিন জাপানীরা এলো। রাতের অন্ধকারে কয়েকখানা জাপ বোমারু বিমান উড়ে এসে দুটো মাঝারি সাইজের বোমা ফেলে চলে গেল। সেই বোমা বর্ষণের মধ্যে কোনো রকম উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা আছে বলেও মনে হয় না—এমনিই যেন খেলাচ্ছলে একটু রঙ্গ করে যাওয়া।

বোমা দুটো পড়লো হাতিবাগান বাজারে এবং দর্জিপাড়ার ভড় লেনের একটি বাড়িতে। কলকাতার এত ভালো ভালো জায়গা থাকতে ঐ রকম সাদামাটা জায়গায়-বোমা ফেলার কি মানে হয় কেউ বুঝলো না। অনেকে বলাবলি করতে লাগলো, টারগেট ভুল হয়েছে। কিন্তু দুর্ধর্ষ জাপ বৈমানিকরা এমন কাঁচা ভুল করবে, তা-ও ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। বোমাবর্ষণে হতাহত অতি সামান্য। হাতিবাগান বাজারের কাছাকাছি তখন একটি মোষের খাটাল ছিল। গুটি পঞ্চাশেক মোষের মাঝখানে আচমকা বোমা

পড়ায় তাদের অসম্ভব বিমূঢ় চিৎকার শোনা গেছে বহুদূর থেকে। বোমার আওয়াজের চেয়েও অতগুলি মুমূর্ষু মানুষের কাতরানির আওয়াজ স্থানীয় লোকদের মনে গেঁথে গিয়েছিল অনেকদিনের জন্য।

কলকাতায় এর আগে থেকেই সাইরেন বাজে। সকালে, দুপুরে, সন্ধেয়—কোনো সময় অসময় নেই। সাইরেন বাজলেই বাড়ির সব লোক দুদ্দাড় করে এসে একতলার ঘরে কিংবা সিঁড়ির নিচে এসে জমায়েত হয়। কেউ কেউ গয়নার বাক্স নিয়ে আসে—অল ক্লিয়ার না বাজা পর্যন্ত প্রাণ ও গয়নার বাক্স হাতের মুঠোয়। রাস্তায় রাস্তায় তৈরী হয়ে গেছে ব্যাফ্‌ল ওয়াল বা বিফল প্রাচীর। শ্যামপুকুরের মাঠে ট্রেঞ্চ কাটা হয়েছে। এই সব প্রস্তুতিই মানুষের মনে ভীতি জাগায়—যুদ্ধ চলবে এক বিদেশী শক্তির সঙ্গে আর এক বিদেশী শক্তির—ভারতবাসীর পক্ষে এই যুদ্ধে প্রাণ দেওয়ার মধ্যেও কোনো গৌরব নেই। সত্যি সত্যি বোমা পড়ার পর কলকাতার লোক দলে দলে পালাতে শুরু করলো।

সারাদিন ধরে ট্যাক্সি, রিক্সা, ঘোড়াগাড়ি, ঠেলাগাড়ি বোঝাই মানুষজন যাচ্ছে শিয়ালদা আর হাওড়া স্টেশনের দিকে। হাওড়া স্টেশনের দিকেই বেশী ভিড়। যান-বাহনের রেট হলো আকাশ-ছোঁয়া। মৃত্যুভয় পাওয়া মানুষ যে কত স্বার্থপর ও নীচ হয়, তা বোঝা যায় এই সময়। ঠেলাঠেলি, মারামারি, রুগ্ন, শিশু, বৃদ্ধ কিংবা মহিলার প্রতি কোনো দাক্ষিণ্য নেই—সবাই আগে যেতে চায়—এ ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে, এ ওকে মাড়িয়ে আগে যাবে। প্রতিদিন ভিড়ের চাপে দু'একজন মারা যায়।

সিরাজউদ্দৌল্লার কলকাতা আক্রমণের পর, জাপানীদের আক্রমণ আশঙ্কায় এই দ্বিতীয়বার কলকাতার নাগরিকদের শহর থেকে পলায়ন। কলকাতায় সাধারণতঃ বাইরে থেকেই অনবরত লোকজন আসে, কলকাতার লোক দল বেঁধে কখনো এমনভাবে শহর ছাড়ে না—তাই এ দৃশ্য অনেকের কাছেই অভূতপূর্ব। শহর ছেড়ে যারা গেল, তারাও অন্য শহরে আশ্রয় নেবার বদলে ছড়িয়ে পড়লো গ্রাম দেশে। বিদেশী সৈন্য এসে গেলে শহরের বদলে গ্রামাঞ্চলই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। বহু গ্রামে এই প্রথম দেখা গেল হাতে ঘড়ি ও পকেটে ফাউন্টেন পেন গোঁজা বাবুদের। বেণী ঝোলানো তরুণীরা হিলতোলা জুতো পরে হাঁটে কাঁচা রাস্তায়। অনেক গ্রামে এই প্রথম শোনা গেল কলের গান। গেঁয়ো নদীর পাশে বসে সপ্রতিভ চেহারার শহুরে যুবক গেয়ে ওঠে পঙ্কজ মল্লিকের সুরে 'মুক্তি' সিনেমার গান, দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ঐ ছায়া, ভুলালো রে, ভুলালো মোর প্রাণ! কলকাতার প্রাচীন বাসিন্দারা তাদের তিন চার পুরুষ আগে যে গ্রাম থেকে এসেছিল, সেই গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিল। বাঙালরা ফিরে গেল বাঙালদের দেশে।

ওদিকে তখন লণ্ডনে প্রতিদিন বোমাবর্ষণে ধ্বংস হচ্ছে পাড়ার পর পাড়া। চার্চিল তবু নাগরিকদের শান্ত থাকতে বলছেন। সেই সময় শোনা গিয়েছিল তাঁর বিখ্যাত সাহসোক্তি, 'উই শ্যাল ফাইট ইন দা হাউজেজ, উই শ্যাল ফাইট ইন দা স্ট্রিটস।' জোসেফ স্ট্যালিন-এর ছেলে নাৎসীদের হাতে ধরা পড়ে হিটলারের কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে নির্যাতিত হচ্ছে—এই খবর রটে গেল। ছেলেকে মুক্ত করার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে স্ট্যালিন বললেন, আমার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ছেলে রাশিয়ার জন্য লড়াই করছে—এখন একটা ছেলের জন্য চিন্তা করার সময় নেই। এদিকে আমেরিকার সরকার এবং ব্রিটেনের লেবার পার্টির চাপে ভারতের নেতাদের সঙ্গে একটা কিছু বোঝা-পড়ার জন্য ক্রিপস মিশন এসেছে দিল্লিতে। ভারতীয় নেতারা দর কষাকষি করছেন

যুদ্ধ শেষ হলে কতটুকু ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে। জাপানীদের জয় সম্পর্কে অনেকটা বোধহয় নিশ্চিন্ত হয়েই গান্ধীজী ব্রিটিশ মিশনের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করলেন, 'একটা ফেল পড়া ব্যাঙ্কের পোস্ট ডেটেড চেক নিয়ে কি লাভ?' আর সুভাষবাবু বিদেশে বন্দী ভারতীয় সৈন্য ও প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে একটা সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলছেন।

রেণুদের বাড়ি হাতিবাগানের খুব কাছে। বোমা পড়ার পরদিনই সকালে বাদল সেখানে ছুটে গেল। হাতিবাগানের ধারে কাছে যাওয়া যায় না এত অসংখ্য মানুষের ভিড়—তা ছাড়া পুলিস ঘিরে আছে সম্পূর্ণ বাজারটা। রেণুদের বাড়ির সবাই ছাদে উঠে দেখছে, বাদলও চলে এলো ছাদে। উত্তেজনা আর গল্পের শেষ নেই। বোমা পড়ার সময় সবাই ঘুমিয়ে ছিল, প্রচণ্ড শব্দে জেগে উঠে প্রথমটায় কেউ কিছু বুঝতে পারে নি। সারা বাড়ি কেঁপে উঠেছিল, সবাই প্রথমে ভেবেছিল ভূমিকম্প। একমাত্র সুপ্রকাশই দাবি করছে যে সে বোমা পড়া স্বচক্ষে দেখেছে।

সুপ্রকাশ বোধ হয় একশো বার বলেছে এই গল্প—তবু তার ক্লান্তি নেই। ঘুম আসছিল না বলে সুপ্রকাশ তখন দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়। অল্প অল্প মেঘলা আকাশ, বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। সুপ্রকাশ গুণ গুণ করে গান গাইছিল—এমন সময় প্লেনের শব্দ পাওয়া গেল। সাইরেন বাজেনি বলে সুপ্রকাশের কোনো সন্দেহ হয়নি। সে মনে করেছে মিত্র বাহিনীর প্লেন। দুখানা প্লেন পাশাপাশি, খুব নিচু হয়ে এলো, তারপরেই বিদ্যুৎ চমকাবার মতন আকাশে চড়াৎ করে উঠলো নীল আলো। সে রকম অসম্ভব উজ্জ্বল নীল আলো কেউ কখনো দেখেনি, ঠিক যেন নীল আগুন। কিছু না বুঝেই সুপ্রকাশ মাটিতে শুয়ে পড়েছে, তারপরেই শব্দ—পর পর দুটো। মোষের চিৎকার শুনে তার মনে হয়েছিল, পৃথিবী ফুটো হয়ে নরকের একটা টুকরো ওপরে উঠে এসেছে।

সুপ্রকাশের কাহিনী বড়রা সকলে পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি, বিশেষত নীল আলোর ব্যাপারে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করলো। বোমা নিচে পড়ে ফাটবার আগেই আলো জ্বলবে কি করে? তবে এ ব্যাপারে সকলেরই অভিজ্ঞতা শূন্য বলেই কারুর আপত্তিই তেমন জোরালো নয়।

বিষ্ণু বাদলকে বললো, স্পিলনটার দেখেছিস?

বাদল অবাক হয়ে বললো, কি? দেখিনি তো?

বিষ্ণু তাকে সাধারণ ব্লেডের দ্বিগুণ সাইজের দুখানা চকচকে ইস্পাতের ফলা দেখালো। তাদের ছাদে এসে পড়েছে কাল। আশেপাশের অনেক বাড়িতেই এ রকম পাওয়া গেছে। বোমার মধ্যে এরকম জিনিস থাকে, বিশ্বাসই করা যায় না।

বিষ্ণু বললো, তুই 'কামানের মুখে নানকিং' পড়িস নি? তাইতে স্পিলনটারের কথা আছে। এইজন্যই তো বমবিং-এর সময় মাটিতে মুখ চেপে শুয়ে পড়তে হয়—নইলে অনেকেই এইগুলো লেগেই মারা যায়।

বাদলের আফসোস হলো, তাদের বাড়িটা বিবেকানন্দ রোডে না হয়ে হাতিবাগানের কাছে কেন হলো না। সে কিছুই টের পেল না বোমা পড়ার। তাদের বাড়ির কাছে এ রকম হলে সে নিশ্চয়ই সুপ্রকাশদার মতন জেগে থেকে সব কিছু দেখতো।

বড়দের মুখে চিন্তায় ছায়া। বাড়ির বাচ্চারা বোমা পড়ার ঘটনায় দারুণ উৎসাহিত। তারা এরোপ্লেন সেজে সারা বাড়ি ছোটাছুটি করছে আর মুখ দিয়ে আওয়াজ করছে বুম্ বুম্। বিষ্ণু বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ডান হাতের তর্জনি দিয়ে আঁকড়ে বন্দুক বানিয়ে গুলি ছুঁড়ছে ক্র্যাক, ক্র্যাক, ক্র্যাক।

রেণু লাফাতে লাফাতে এসে বাদলকে বললো, এই জানিস, কালকে আমরা চলে যাচ্ছি।

বাদল জিজ্ঞেস করলো, কোথায়?

—মসলানন্দপুরে। সেখানে দিদিমা আছে।

বিষ্ণু হেসে ফেলে বললো, এই, আবার মসলানন্দ বলছিস! রেণুটা এখনো ভালো করে কথা বলতে শিখলো না। ঠিক করে বল, মছলন্দপুর।

বাদল বললো, সে আবার কোথায়?

—ওখানে রেণুদের মামার বাড়ির দেশ। রেণুরা কাল চলে যাবে।

রেণু বললো, ওখানে নদী আছে, পুকুর আছে, দাদা পুকুরে মাছ ধরবে, গরু আছে—

রেণুর চোখে মুখে দারুণ খুশী। আজকাল আর রেণু অসুখে ভোগে না, স্বাস্থ্য বেশ ভালো হয়েছে, গড় গড় করে বাংলা পড়তে পারে।

বাদল বললো, বিষ্ণু, তোরা ওখানে যাবি না?

—আমরা যাবো অন্য জায়গায়। আমরা রবিবার দিন চলে যাবো ভাগলপুরে—ওখানে আমাদের একটা বাড়ি আছে।

বিষ্ণুদের বাড়ি আছে বিভিন্ন জায়গায়। ওদের কোনো অসুবিধে নেই। এই ভয়ের মধ্যে কলকাতায় থাকতে যাবে কেন। বাদলের মনটা খারাপ হয়ে গেল। রেণু, বিষ্ণু—এরা সবাই চলে গেলে সে একা একা কি করবে? সূর্যদাও তো নেই।

বিষ্ণু বললো, জীমূতরাও যাবে আমাদের সঙ্গে। বেশ মজা হবে। ভাগলপুরের কাছেই পাহাড় আছে।

রেণু বললো, মসলানন্দপুর ভাগলপুরের চেয়েও অনেক ভালো। আমরা বেশী ভালো যায়গায় যাচ্ছি।

বাদল বিষ্ণুকে বললো, এই, তোদের সঙ্গে আমাকে নিয়ে যাবি?

বিষ্ণু রেগে গিয়ে বললো, বাজে কথা বলিস না! নিয়ে গেলেও তো তুই যাবি না। সেবার দার্জিলিং যাবার কথা এত করে বললুম, তোর মা তো যেতে দিলেন না কিছুতেই।

বাদল একটুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বাবাকে রাজি করানো সত্যিই শক্ত। তাকে একলা একলাই এখানে থাকতে হবে। কলকাতায় তার আর কোনো বন্ধু রইলো না। জাপানীরা এসে পড়ে তাকে বন্দী করে নিয়ে গেলে বেশ হয়।

মনখারাপ ভাবটা কাটাবার জন্য বাদল বললো, যা না তোরা চলে যা। তোরা তো যুদ্ধ দেখতে পাবি না। আমি সব দেখবো।

রেণু বললো, মাথায় বোমা পড়ে বেশ অক্কা পাবি!

—অত সহজ নয়। একতলার ঘরে থাকবে। জাপানীরা এসে পড়লে একটু একটু জানলা খুলে—জাপানীদের হাতে যখন সাহেবেরা মার খাবে—তখন যা মজা লাগবে!

—সাহেবরা তো বড় বড় আর জাপানীরা তো ছোট ছোট—ওরা মারতে পারবে?

কলকাতায় তখন মার্কিন সৈন্যদেরও দেখা যায়। ইংরেজদের থেকে এদের চেহারার আলাদা বৈশিষ্ট্য চোখ এড়ায় না। এরা প্রত্যেকেই লম্বা চওড়া জোয়ান, মুখের রং লালচে ধরনের। অনেক সময় এরা খালি গায়েও ঘুরে বেড়ায়—কলকাতায় আগে কখনো সাহেবদের এরকম খালি গায়ে ঘুরতে দেখা যায়নি। ভিখিরি দেখলে এরা দরাজ হাতে ছড়িয়ে দেয় মুঠো মুঠো খুচরো পয়সা। পঙ্গপালের মতন ভিখিরিরা

এদের ছেঁকে ধরে 'আমারিকি রাজা সাব, আমারিকি রাজা সাব' বলে চ্যাঁচায়। কখনো কখনো এইসব আমেরিকান সৈন্যরা কোনো বাচ্চা ভিখিরিকে আদর করে কোলেও তুলে নেয়। আশ্চর্য জাত এরা।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়, এই আমেরিকানদের মধ্যে আছে কিছু কিছু নিগ্রো সৈন্য। সেই দৈত্যাকার নিগ্রোদের দেখলে রাস্তার ছেলেমেয়েরা হাঁ করে চেয়ে থাকে। এক সময় হাবসী খোজারা ভারতবর্ষে রাজত্ব পর্যন্ত করে গেছে—কিন্তু তার কোনো স্মৃতি নেই। সবার চোখেই নিগ্রোদের বিচিত্র নতুন মানুষ বলে মনে হয়।

বাদল বাড়ি ফিরে শুনলো, তাদের বাড়িতেও কলকাতা ত্যাগ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। বড়বাবু এর একেবারে বিপক্ষে। তাঁর মতে, সাধারণ মানুষ এরকম প্যানিক সৃষ্টি করে—কিন্তু এখনো সে রকম ভয় পাবার মতন কিছু ঘটেনি।

চিররঞ্জন কিন্তু বেশ উদ্বিগ্ন। তিনি বললেন, কিন্তু কলকাতায় যেভাবে জিনিস-পত্রের দাম বাড়ছে, তাতে এখানে আর থাকা যাবে কি করে? আজ বাজারে দেখলাম, সাধারণ ভেড়ির ট্যাংরা—তাও এক টাকা বারো আনা সের? ট্যাংরা মাছও কি যুদ্ধে যাচ্ছে নাকি?

বড়বাবু বললেন, রোসো, রোসো—আরও কিছু লোক কলকাতা ছেড়ে চলে যাক—তারপর জিনিসপত্রের দাম আবার সস্তা হবে। তখন আমরা আরাম করে থাকবো।

—শিগগিরই নাকি কন্‌স্‌ক্রিপশান হবে, সেটা শুনেছেন?

—তাতে তোমার আমার ভয়টা কি? আমাদের মতন বুড়োদের তো আর নেবে না। তোমার ছেলেও ছোট।

—সূর্য?

—সূর্য্যিকে ওরা পাচ্ছে কোথায়? সূর্য্যি ইংরেজের হয়ে লড়াই করার বদলে বরং আত্মহত্যা করবে। ও বড় জেদী ছেলে।

চিররঞ্জন একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, আপনি টের পেয়েছেন যে সূর্য টেররিস্টদের দলে গিয়ে ভিড়েছে? আমিও একটু একটু আন্দাজ করেছিলাম।

—ও নিজে আমাকে বলেছে। ও তো মিথ্যে কথা বলায় তেমন পারদর্শী নয়—একদিন একটু জেরা করতেই বেরিয়ে পড়েছে।

—ও কোথায় আছে আপনি জানেন?

—না জানাই তো ভালো। পুলিস আমাকে ধরে বেশী চাপ দিলে যদি বলে ফেলি? না জানলে বলতেও পারবো না।

—বড়বাবু আপনি এরকম নিশ্চিন্ত থাকেন কি করে? আপনার একটা মাত্র ছেলে—

—আমিও আমার মায়ের একটা মাত্র ছেলে ছিলাম। আমাকে নিয়ে কেউ কখনো মাথা ঘামায় নি।

চিররঞ্জন দোনামনা করলেও হিমানী কিন্তু কলকাতা ছাড়তে একেবারে বদ্ধপরিকর। হিমানী অবিলম্বে বাপের বাড়ি চলে যেতে চান—এবং চিররঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে। তাঁর বাবাও বারবার চিঠি লিখছেন। হিমানীর বাপের বাড়ি বেশ সংগতিপন্ন, সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেবার কোনো অসুবিধে নেই।

চিররঞ্জন আমতা আমতা করে বললেন, বড়বাবু কোথাও যেতে চাইছেন না—ওঁকে ফেলে আমি চলে যাই কি করে?

হিমানী বললেন, উনি একলা মানুষ, ওঁর কোনো চিন্তা নেই। ওঁর জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।

—দাদাও তো থেকে যাচ্ছেন। বৌদিকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন শুধু।

—তোমার দাদাকে ব্যবসা দেখতে হবে। তোমার কি দেখার আছে? বাবা লিখছেন, ওখানে গেলে তোমার কাজকর্মের একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—তা বলে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে কদ্দিন থাকবো!

—এটাই বা তোমার কোন্ নিজের বাড়ি?

চিররঞ্জন মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, আচ্ছা দেখি। আরও দু'চারদিন যাক না।

হিমানী তখন থেকেই জিনিসপত্তর বাঁধা-ছাদা শুরু করলেন।

॥ ৩০ ॥

ট্রেনে চেপে খুলনা, তারপর স্টিমার। বাদলটা এমন বোকারাম, ট্রেনে উঠেই ঘুমিয়ে পড়লো, কিছুই দেখতে পেল না। ওর দিদি সান্ত্বনা ওকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কতবার জাগানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু ছেলের হুঁস নেই। স্টিমারে উঠে অবশ্য সে জেগে রইলো আগাগোড়া।

খুব কম বয়েসে বাদল এই পথ দিয়েই এসেছিল কলকাতায়—কিন্তু সে সময়কার কথা তার বিশেষ কিছুই মনে নেই। এখন তার যা বয়েস, তা সব কিছু দেখেই অবাক হবার মতন। শব্দ, বর্ণ, ঘ্রাণ এই সব কিছুরই মূল্য আছে। মনের মধ্যে কোনো শূন্যতা-বোধ নেই—এখন নিজেকে পূর্ণ করার সময়। এক একটা দৃশ্য বুকের মধ্যে গাঢ় ছাপ ফেলে দিয়ে যায়—কত ছোটখাটো জিনিস মুগ্ধতার বাহন হয়ে আসে।

এই নদীর নাম পদ্মা, এর কাছে এলেই মনটা গভীর হয়ে যায়। অধিকাংশ জায়গাতেই ওপার দেখা যায় না। কোথাও মাঝখানে বিরাট চড়া পড়ে আছে, তবু এই নদী দু'চোখ ভরিয়ে দেয়। পালতোলা নৌকো ঠিক যেন ছবির মতন, অর্থাৎ সুন্দর ছবির মতন—আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে যায় আবার অন্যরা আসে।

এক জায়গায় চড়ার ওপর একটা কুমীর তার ছানাপোনা নিয়ে রোদ পোয়াচ্ছে—তাই দেখে বাদল দারুণ উত্তেজিত। তক্ষুনি ছুটে গিয়ে দিদিকে গিয়ে বলতেই সেও এলো দেখতে। কিন্তু কুমীরগুলো এর মধ্যেই জলে নেমে পড়েছে। সান্ত্বনা কিছুতেই বিশ্বাস করে না। বাদল ইদানীং বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলে, সুতরাং বিশ্বাস না করা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সত্যি কথা শুনেও কেউ বিশ্বাস না করলে খুব মন খারাপ হয়ে যায়। বাদল সান্ত্বনার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিল।

স্টিমারে বেশ ভীড়। মানুষজনের ফাঁক দিয়ে গলে গলে বাদল এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে। বাবা-মায়ের নিষেধ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বাদল একা একা নিচে নেমে যায়, ইঞ্জিনঘরের কাছে উঁকিঝুঁকি মারে—এমন কি ফার্স্ট ক্লাসের কেবিনের কাছেও অবাধ গতি।

সেখানেই বাদল দেখতে পেল হৈমন্তীকে। রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে এক দীর্ঘকায় নারীমূর্তি। চুলগুলো খোলা, শাড়ীর আঁচলখানা উড়ছে পতাকার মতন। দূর থেকে প্রথম দেখে বাদল ঠিক বিশ্বাস করতে পারলো না। এপাশ থেকে একবার ওপাশ থেকে আর একবার দেখলো। হৈমন্তী কাকীমা রেণুদের বাড়ি থেকে একদিন কোথায় চলে গিয়েছিলেন, তারপর আর তাঁর খবর কেউ জানে না। বড়রা ওদের কাছে

বলতেন, হৈমন্তী হারিয়ে গেছে। বাদল আর বিষ্ণু দারুণ ভালোবাসতো হৈমন্তী কাকীমাকে, ওরা প্রতিজ্ঞা করেছিল, বড় হয়ে ওরা তাঁকে খুঁজে বার করবে।

সেই হৈমন্তী কাকীমা, এখানে এই স্টিমারে জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছেন? বাদল এক ছুটে কাছে গিয়ে ডাকলো, হৈমন্তী কাকিমা?

হৈমন্তী ঘুরে দাঁড়ালেন। প্রথমটায় চিনতে পারলেন না। ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, ও তুই? তুই এখানে কি করছিস?

—বাবা মার সঙ্গে মামাবাড়িতে যাচ্ছি।

—কত বড় হয়ে গেছিস। চিনতেই পারছিলুম না, তোর নাম কি যেন।

হৈমন্তী কাকীমা তাকে এত ভালোবাসতেন, আর তিনি এখন ওর নামটাই ভুলে গেছেন—এতে বাদলের মনে একটা আঘাত লাগলো।

হৈমন্তী বললেন, দাঁড়া, বলিস না, আমি মনে করছি। মনে পড়েছে। তোর নাম তো সূর্য।

—সে তো আমার দাদার নাম।

—হ্যাঁ তাই তো। তোর নাম তা হলে বাদল। বেশ নাম তোদের দুই ভাইয়ের। সূর্য আর বাদল! রোদ্দুর আর বৃষ্টি।

—আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

—আমি ঢাকা যাচ্ছি। তোর মামার বাড়ি কোথায়?

—মনিকডাঙ্গা।

—সে আবার কোথায়?

হৈমন্তী বিশেষ বদলাননি এই ক' বছরে। বড় বড় দুটি চোখে শিশুর সারল্য। এই রমণীর স্বামী এঁকে অনাদর করে অপর নারীর কাছে বন্ধ হয়েছিলেন। হৈমন্তীর নিয়তি ছিল সারা জীবন সেই বনেদী বাড়ির অন্দরমহলে বন্দী থেকে সব কিছু সহ্য করা। হৈমন্তী তা মানেন নি, বেরিয়ে পড়েছেন বাইরে। হৈমন্তীর কপালে এখনো সিঁদুর।

হৈমন্তী রেণু কিংবা বিষ্ণু বা ও বাড়ির কারুর কথা জিজ্ঞেস করলেন না। বাদলকে দেখে তিনি খুশীই হয়েছেন বোঝা যায়। বাদলের কাঁধে হাত দিয়ে বন্ধুর মতন গল্প করতে লাগলেন। নদীর হু-হু করা জোলো হাওয়ায় হৈমন্তীর সুন্দর মুখশ্রী আরও অপরূপ দেখায়। তাঁর বাহুর ডৌল, ভরাট বুক, চিবুকের রেখা—এ সব কিছুর মধ্যেই একটা মাদকতা আছে। এগারো বছরের ছেলেকেও সেই মাদকতা হাতছানি দেয়। বাদলের মনে হলো, হৈমন্তী কাকীমার গায়ে কি সুন্দর গন্ধ। হৈমন্তী কাকীমার চেয়ে চমৎকার পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

হৈমন্তী বললেন, আয় একটা জিনিস খাবি?

হৈমন্তী বাদলকে নিয়ে গেলেন কেবিনের মধ্যে। সেখানে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে চেয়ারে বসে একজন লোক একটা বই পড়ছেন। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। বাদলকে দেখে তিনি কোনো কথা বললেন না, শুধু হৈমন্তীর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন।

হৈমন্তী বললেন, এ হলো বাদল। আমার দ্যাওরের ছেলে বিষ্ণু? তার বন্ধু।

লোকটি চশমাটা টিপে ধরে কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, খোকা, তোমার সঙ্গে তোমার মা বাবা আছেন?

—হ্যাঁ।

তিনি এবার হৈমন্তীকে বললেন, তুমি দেখা করবে?

—করতে পারি।

লোকটি হৈমন্তীকে ইংরেজিতে খানিকক্ষণ কি যে বললেন, বাদল বুঝতে পারলো না। হৈমন্তী উত্তরে বললেন, আমার কিছু যায় আসে না।

লোকটি এবার হেসে বললেন, তুমি যেখানে যাও, তোমার ঠিক একটা করে বাচ্চা ছেলে বন্ধু জুটে যায়।

—বাচ্চারাই একমাত্র আমাকে ভালোবাসে। আর কেউ ভালোবাসে না।

লোকটি আবার বইতে চোখ ফেরালেন। সেইদিকে চোখ রেখেই বললেন, আমিও তো বাচ্চা। ভেতরে ভেতরে বাচ্চাই রয়ে গেছি।

ওরা কথা বলছিলেন হাসিমুখেই। কিন্তু বাদলের মনে হয়, এসব দুঃখের কথা। বড়রা প্রায়ই এরকম দুঃখের কথা বলে।

লোকটিকে বাদলের মোটামুটি পছন্দই হলো। ছোট ছেলেরা অচেনা লোক দেখলেই তাকে পছন্দ অপছন্দ করার ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ ঠিক করে নেয়। কারুর সঙ্গে তারা কথা বলা পছন্দ করে। কারুর সঙ্গে কথা বলতেই চায় না। বাদল নিজে থেকেই লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, এই ইস্টিমার আর কতক্ষণ চলবে?

লোকটি বললো, কেন খোকা, তোমার খারাপ লাগছে? তাহলে তো তুমি কোনোদিন নাবিক হতে পারবে না?

—না, আমার খুব ভালো লাগছে। বাবা বলেছেন, আমাদের সাড়ে দশটার সময় নামতে হবে।

—তা হলে আর তোমাদের বেশী দেরি নেই।

হৈমন্তী কাগজের বাক্স থেকে অনেকগুলো ছোট ছোট কেক বার করে বাদলকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কোন্‌টা কোন্‌টা নিবি?

কোনো কেকের ওপর প্রজাপতি, কোনোটার ওপর ফুল বা মাছ আঁকা, নানা রঙের। বাদল লজ্জা পেয়ে বললো, যে কোনো একটা—তুমি তুলে দাও।

লোকটি বললো, পুরো বাক্সটাই ওকে দিয়ে দাও না। তুমি তো খাচ্ছো না।

হৈমন্তী তার থেকে একটা বার করে বাক্সটা সুতো দিয়ে বেঁধে বললেন, একটা এখন খেয়ে নে, বাক্সটা নিয়ে যাবি।

বাদল পুরো বাক্স কিছুতেই নেবে না, লজ্জায় তার কান লাল হয়ে যাচ্ছে। হৈমন্তী শেষ পর্যন্ত এক ধমক দিয়ে বাক্সটা জোর করে তার হাতে গুঁজে দিলেন। তারপর বললেন, আয়, আমরা বাইরে গিয়েই দাঁড়াই। সুরঞ্জন, তুমি আসবে?

—তোমরা যাও। আমি বইটা ছাড়তে পারছি না।

কেকের তলার কাগজটা জলে ফেলে দিলে সেটা ভাসতে ভাসতে অনেক দূর যায়। একটা নৌকো থেকে একজন লোক খুব চেঁচিয়ে কি যেন বলছে—কিছুই বোঝা যাচ্ছে না তার কথা—শুধু শোনা যাচ্ছে, এ-এ-এ শব্দ। একটা মাছরাঙা পাখি ঝুপ করে জলে পড়েই আবার উঠে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে স্টিমারের গতি কমে এলো। কোথাও থামবে। হৈমন্তী বললেন, এবার মা-র কাছে যা। নইলে চিন্তা করবেন। তোরা আবার কবে ফিরে যাবি?

—তা তো জানি না।

—আমরা ফিরবো এক মাস বাদেই। ফেরার সময় আবার এই স্টিমারে তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে বেশ হয়, নারে?

—তুমি কলকাতায় কোথায় থাকো? তুমি তো হারিয়ে গিয়েছিলে।

—দূর পাগল! হারিয়ে যাবো কেন? আমি এখন এলাহাবাদে থাকি।

চিররঞ্জন আর হিমানী রীতিমত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন বাদলের জন্য। সান্ত্বনা আর চিররঞ্জন দু' দিকে খুঁজে এসেছেন এর মধ্যে। মূর্তিমানকে ফিরতে দেখে চিররঞ্জন এক ধমক দিলেন।

হিমানী বললেন, তোর হাতে ওটা কি?

—কেক। হৈমন্তী কাকীমা দিলেন।

—তিনি আবার কিনি?

বাদলের মা বিষ্ণুদের বাড়িতে কয়েকবার গেছেন বটে, তবে রেণুর মা ও বিষ্ণুর মায়ের সঙ্গেই তাঁর বেশী পরিচয়। হৈমন্তীকে তিনি দু একবার দেখেও থাকতে পারেন। কিন্তু কোনো কেলেঙ্কারির ঘটনাই মেয়েদের অজানা থাকে না। হৈমন্তীর গৃহত্যাগের ঘটনা তিনি সবিস্তারেই জানেন। সেই হৈমন্তীর সঙ্গেই বাদলের দেখা হয়েছে বুঝতে পেরে তিনি একই সঙ্গে দারুণ কৌতূহলী এবং ক্রুদ্ধ হলেন। কুলটা রমণীর বর্তমান অবস্থাটা একবার চোখে দেখার কৌতূহল—এবং ওর সঙ্গে বাদল কথা বলেছে বলে রাগ।

চিররঞ্জন বারবার জিজ্ঞাসা করছেন, কে, কে? কিন্তু হিমানী পুরোপুরি সব বলতে পারছেন না। মেয়ে বড় হয়েছে, মেয়ের সামনে এসব কথা বলা যায় না। সুতরাং তিনি আরও বেশী রেগে উঠে বললেন, তুই নিতে গেলি কেন?

—আমাকে জোর করে দিয়েছেন।

—জোর করে কেউ দেয়? তোকে বলেছি না, কেউ কোনো জিনিস দিলে নিবি না? হ্যাংলা ছেলে হয়েছ একটা।

—সত্যি আমি নিতে চাইনি। জোর করে—

—যা ফেলে দিয়ে আয়।

বাদলের কেঁদে ফেলার অবস্থা। যে কেকটা খেয়েছে, তার স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে—এত ভালো। সে ভেবেছিল, দিদিকে দেখিয়ে কৃতিত্ব নেবে। কিন্তু হিমানী না ফেলিয়ে ছাড়লেন না কিছুতেই—বাদলকে হুকুম করলেন বাক্স সুদ্ধু জলে ফেলে দিতে। চিররঞ্জন পর্যন্ত সামান্য আপত্তি তুলে বললেন, একেবারে ফেলে দেবার দরকার কি। এক পাশে থাক না—গরীব দুঃখীরা খাবে। হিমানী তাতেও রাজী নন্। ভ্রষ্টা রমণীর দেওয়া জিনিস জলে ফেলে না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই।

স্টিমার থেকে নামবার সময় বাদল একবার মুখ ঘুরিয়ে তাকালো। হৈমন্তী তখনও রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেই হাওয়ার মধ্যে। বাদল মুখ ফিরিয়ে নিল সঙ্গে সঙ্গে। লজ্জায় তার শরীর অবশ হয়ে যাবার মতন অবস্থা। হৈমন্তী কাকীমা কি বুঝতে পেরেছেন? আর কোনোদিন সে হৈমন্তী কাকীমার কাছে মুখ দেখাতে পারবে না।

॥ ৩১ ॥

নৌকো থেকে যেখানে নামা হলো, সেখানে অনেক লোক ভিড় করে আছে। খালের পাড়ে উঁচু মতন বাঁধ, পাহাড়ের মতন উঠতে হয়। সেই বাঁধের ওপর বহু

লোক উন্মুখভাবে কি যেন দেখছে। আমি ভেবেছিলাম, এরা সবাই বুঝি আমাদের নিতে এসেছে। ওপারে উঠে বুঝতে পারলাম, সেখানে একটা সাপ মারা হয়েছে—তাই ওরকম জনতা।

গ্রামের মাটিতে পা দিয়ে সেই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। একটি সাপের মৃত্যু। সাপটা আমার শরীরের চেয়েও লম্বা, তখনো সে মরেনি, একটি বহুমুখী বল্লম—যার নাম ল্যাজা—তাই দিয়ে তার পেটের কাছে গাঁথা রয়েছে মাটিতে—তেজের সঙ্গে সাপটা ফণা তুলে রয়েছে—এক একবার ক্রুদ্ধ ছোবল মারছে মাটিতে। তখন সবাই হেসে উঠছে হো-হো করে।

সাপকে সবাই ভয় পায়, গ্রামের মানুষও ভয় পায়। এখন সেই ভয়ঙ্কর প্রাণী ব্যর্থ আক্রোশে ফুঁসছে—এটাই খুব হাসির বিষয়। এ ওর গা ঠেলাঠেলি করছে, কেউ কেউ হাসির দমকে দুলে দুলে উঠছে—সবাই অবশ্য নিরাপদ দূরত্বে।

ভিড় ঠেলে ঠুলে আমি গিয়ে উঁকি মারলাম। সাপটা তখন মাটি থেকে প্রায় দেড় হাত উঁচু ফণা তুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে—এক সময় তার মাথাটা স্থির হয়ে গেল। আমার মনে হলো, সাপটা ঠিক আমার দিকে তাকিয়ে আছে। স্থির দৃষ্টি। একটু একটু বেরিয়ে আসছে জিভ। ভয়ে আমার বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে গেল। আমার দিকেই শুধু ও-রকম ভয়ে তাকাচ্ছে কেন, আমি তো কিছু করিনি!

সাপটা আবার মাটিতে ছোবল মারলো। অসম্ভব শক্তি থাকে ওদের—তার টানের চোটে বল্লমটা হেলে গেল, তখন একটা আতঙ্কের চিৎকার পড়ে গেল ভিড়ের মধ্যে—ঠ্যালাঠেলি আর হুড়োহুড়ি, আমিও এক দৌড় মেরেছি। জোয়ান লোকেরা হাতের লাঠি-সোটা নিয়ে ধপাধপ করে পেটাতে লাগলো সাপটাকে। তারপর কী হলো, আমি আর দেখিনি। সেদিন রাত্রে আমি ওই সাপটাকে স্বপ্ন দেখেছিলাম—আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টে।

আমাদের নিতে এসেছিলেন বড়মামা ও বাড়ির দুজন মুনীষ। তাঁরাও দাঁড়িয়েছিলেন ওই ভিড়ের মধ্যে। বড়মামাকে আমি প্রণাম করার পর তিনি আদর করে আমার কাঁধে এমন একটা চাপড় মারলেন যে আমার হাড়-গোড় ভেঙে যাওয়ার জোগাড়। বড়মামার চেহারা বিশাল দৈত্যের মতন, কুচকুচে কালো রং। তিনি অতখানি লম্বা ছিলেন বলেই অনেকে তাঁকে ঠাট্টা করে বলতেন, শম্ভু, ঘরে বড় ঝুল জমেছে, তুমি হাত দিয়ে ঝুল পরিস্কার করে দাও তো!

বড়মামা আমার বাবাকে এক ধমক দিয়ে বললেন, কি মশাই, কি চেহারার ছিরি করছেন? কইলকাতা শহরে খাইতে পান না?

বাবা কিছুদিন আগেই অসুখে ভুগে উঠেছেন বলে শরীর দুর্বল। বাবা ফ্যাকাশে ভাবে হাসলেন।

খালের বাঁধের ওপরে ওঠার পর যে দৃশ্য দেখলাম, সেই আমার স্মৃতিতে আঁকা প্রথম গ্রামের দৃশ্য। অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ানো মাঠ, মাঝে মাঝে ঝুপসি ঝুপসি গাছ। মাঠের মাঝখান দিয়ে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে—তার দু' পাশে সবুজ ধানের ক্ষেত—ধানগাছের রং তখন খুবই ফিকে সবুজ, এবং এক বিঘতের বেশী বড় নয়। এদিকে ওদিকে ছড়ানো কয়েকটি খড়ের বাড়ি, তারই একটি বাড়ি থেকে নিয়মিত তালে ধুপ ধুপ শব্দ হচ্ছে।

অনেক দূরে যেখানে আকাশ নিচু হয়ে নেমে এসেছে মাঠের কাছে সেইখানে একটা দোতলা বাড়ি। আমরা ওইখানে যাবো। ওই বাড়ির ছাদে উঠলে আকাশ ছুঁয়ে ফেলতে

পারবো আমি।

ওই গ্রামে পাকা বাড়ি খুব বেশী ছিল না—আমার দাদুদের বাড়িটা রীতিমতন উল্লেখযোগ্যই বলা যায়। লোকে সেটিকে বাঁড়ুজ্যেবাড়ি বলে। চলতি ভাষায় বাঠ্ইজ্যা-বাড়ি। সে বাড়িতে সাতখানা ঘর, কিন্তু লোকসংখ্যা তার পাঁচ গুনেরও বেশি। বাড়ির সামনের দিকে ঠাকুরদালান, দু' পাশে অনেকগুলি মাটির তৈরী টিনের চালাঘর। আমরা প্রথমে এসে পাকা বাড়ির দোতলায় একটি ঘরেই জায়গা পেলাম—কিন্তু আমার দাদু বরদাকান্ত বরাবর একটি মাটির ঘরেই থাকেন।

আমার দাদু এ গ্রামের একজন গণ্যমান্য লোক, পৈতে গলায় খালি গায়ে সর্বক্ষণ ঘুরে বেড়ান, পায়ে খড়ম—তবু লোকজন তাঁকে দেখলেই যেন ভয় পায়। তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি এবং যথেষ্ট বিষয়ী। দিন দিন বিষয় সম্পত্তি বাড়িয়ে চলেছেন কোন মন্ত্রবলে কে জানে।

আমার দাদুর সাত মেয়ে ও চার ছেলে—সবাই বিবাহিত এবং পুত্রকন্যা সমেত অনেকেই দেশের বাড়িতে থাকেন। প্রথমবার চাকরি হারিয়ে আমার বাবাও এ-বাড়িতে বেশ কিছুদিন আশ্রিত ছিলেন। তা ছাড়াও দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন, অসহায় বিধবারা এসে এখানে জায়গা পেয়ে যায়। মনে হয়, এ বাড়িতে প্রত্যেক দিনই নেমন্তন্ন। রান্নাঘরের বারান্দায় সব সময়ই দেখা যায় একদল লোক বসে বসে খাচ্ছে।

আমার জন্ম এ বাড়িতে। পাঁচ বছর বয়েসে এই বাড়ি থেকেই, ওই খালপার ধরেই কলকাতা চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে-সব আমার অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে, কিংবা মনে পড়ে না। হঠাৎ একটা শিউলি গাছতলায় দাঁড়িয়ে মনে হয়, এই জায়গাটা আমার চেনা। আগে দেখেছি। কিন্তু কবে? মনে হয়, যেন আগের জন্মে। আগের জন্মের মতন আবছা রহস্যময়।

পুকুরপাড়ে ঘাটলার একটা ভাঙা অংশ দেখে মনে হয়, আমি জানতাম, এখানে ভাঙা থাকবে। আমি ঠিক জানতাম। অথচ, মামাদের মুখে শুনি, ও জায়গাটা ভেঙেছে মাত্র দেড় বছর আগে—অর্থাৎ আমার জানার কথা নয়।

একটি বেশ বলিষ্ঠ চেহারার বুড়ি প্রথম দিন আমাকে দেখেই আমার দু' গালে হাত রেখে বলেছিলেন, ও মা, সোনা ভাই কত বড় হইয়া গেছে! প্যান্ট পইরা সাহেব হইছে।

সেই বুড়িকে আমি একদম চিনি না—অথচ তাঁকেই আমার সবচেয়ে বেশী চেনা উচিত ছিল। এঁর নাম গণেশের মা, ইনিই প্রথম আমার নাড়ি কেটে আমাকে কাঁদিয়েছেন। ইনি আমার ধাত্রী।

প্রায়ই শুনি সেই গল্প। উঠোনের মধ্যে হয়েছিল আঁতুড়ঘর, আমার জন্মের আগে কি বৃষ্টি, কি বৃষ্টি! সকলেরই সেদিন মনে হয়েছিল, সৃষ্টি একেবারে ভেসে যাবে। সবাইকে খুব যন্ত্রণা দিয়ে জন্মেছিলাম এই পৃথিবীতে। তারপরেও বেশ কিছুদিন খুব ছিঁচকাঁদুনে ছিলাম। তাই আমাকে বলা হতো বাদলা ছেলে।

প্রথম প্রথম কয়েকদিন, ইস্কুলে যাবার কোনো ব্যাপার নেই, কোনো শাসন নেই। মামাবাড়ির আদর খাই আর যেদিকে খুশি ঘুরে বেড়াই। মামাবাড়ির সীমানাটা বেশ বড়—তিনটি পুকুর, তার ওদিকে বাগান। এক একটা বাগানকে মনে হয় অরণ্যের মত গভীর। বাগান শুনলেই ফুলের কথা মনে পড়ে—কিন্তু এই সব বাগান ফলের—আম, জাম, নারকোল, লিচু—আর বাঁশঝাড় তো সব দিকেই।

বড় পুকুরটার ওপারে বাগানটায় শিয়াল আছে। সন্ধের পরই তারা তাদের অস্তিত্ব

জানান দেয়। সবাই ওই বাগানে একা একা আমাকে যেতে বারণ করেছিল। তবু একদিন গেলাম। তখন ঠিক দুপুরবেলা, ভূতে মারে ঢ্যালার সময়। বাগানের মধ্যে নিস্তব্ধতা ঝিম ঝিম করছে। মাঝে মাঝে শুকনো পাতা উড়ে যাচ্ছে আপন মনে। বাঁশঝাড়ে এমনি খড়-খড় শব্দ হয়, কিছুই দেখা যায় না। আমি এক পা করে এগোই। হাতে একটা কঞ্চি। বুকের মধ্যে একটা ছমছমে ভয়। সেই ভয়টাই নেশার মতন—ফিরতে ইচ্ছে করে না। টুপটাপ করে খসে পড়ে পাতা, আর কোথাও হাওয়া নেই তবু নারকোল গাছের ডগাগুলো কাঁপে।

সেই নির্জন বাগান, সেই একাকিত্ব—এর মধ্যে একটা অদ্ভুত মায়া আছে। একটু একটু মন কেমন করে, একটু একটু ভালোও লাগে। মনে হয়, সেই বাগানটার কোনো শেষ নেই—অনেক অনেক গভীরে চলে যেতে পারি—সেখান থেকে আর কোনোদিন না ফিরতে হলে বেশ হয়। কি জানি কার ওপরে গুচ্ছের অভিমান আসে বুঝতে পারি না। চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাওয়ার শব্দ শুনি।

মনে হয়, এখান থেকে কলকাতা অনেক দূর। আর কোনোদিন সেখানে ফেরা হবে না। বিষ্ণু, জীমূত, রেণু ওদের সঙ্গে আর দেখা হবে না কখনো। সূর্যদা কোথায় হারিয়ে গেল।

প্রথম কয়েকদিন আমার কোনো বন্ধু হয়নি। একমাত্র বন্ধু হয়েছিল নাদের আলি। নাদের আলির বয়েসের গাছপাথর নেই। কালো কুচকুচে চেহারা, চেহারা খুব বড়সড় নয়—কিন্তু মনে হয় যেন লোহার তৈরী, মুখখানা দেহের তুলনায় ছোট এবং অমন সুন্দরভাবে হাসতে আমি আর কারুকে দেখিনি। হাসির কথা উঠলেই সে বাচ্চাদের মতন লজ্জায় মুখ নিচু করে হাসে।

আমার মামাদের কোথায় একটা বিলে খানিকটা জমিদারি আছে। নাদের আলিই সেটা দেখাশোনা করে। অনেক সময় সেখানেই সে মাসের পর মাস থাকে নৌকোর ওপরে।

নাদের আলি বলে, সেই বিলটার নাম তিন প্রহরের বিল। সেখানে যা সব কান্ড ঘটে, সে রকম আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও নেই। সেখানকার জলে কুমির আছে, তারা নৌকোর পাশে পাশে ভাসে এ'টো কাঁটা ভাত পাবার আশায়, কারুকে কামড়ায় না। আদর করে তাদের পিঠের ওপর বৈঠা দিয়ে বাড়ি মারলে তারা মোষের মতন ঘর্ ঘর্ শব্দ করে। সেখানে এক একটা পদ্ম ফুল ফোটে—সূর্যের চেয়েও বড় সাইজের। সেই পদ্ম ফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর খেলা করে একসঙ্গে।

—নাদের আলি আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে?

নাদের আলি আস্তে আস্তে দু' দিকে মাথা দোলায়। তাতে হাঁ কিংবা না—কোন্‌টা ঠিক বুঝতে পারি না। নাদের আলির সঙ্গে ভর দুপুরবেলা পুকুরঘাটে বসে আমি তিনপ্রহরের বিল দেখতে যাবার ষড়যন্ত্র করি।

॥ ৩২ ॥

ব্রজগোপাল সূর্যকে নিয়ে নামলেন খড়্গপুর স্টেশনে, তখন অনেক রাত। ট্রেন আসার সময় প্ল্যাটফর্মে ক্ষণিক চাঞ্চল্য জেগেছিল, ট্রেন চলে যাবার পরই সর্বাদক আবার নিঝুম। অন্য যাত্রীরা বেরিয়ে যাবার পরেও ব্রজগোপালরা বেশ খানিকক্ষণ বসে রইলেন

একটা বেঞ্চে। দু'জনে একটাও কথা বলাবলি হলো না। ব্রজগোপাল নিঃশব্দে সিগারেট টানতে লাগলেন।

তারপর এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে ব্রজগোপাল বললেন, চল, হাঁটতে পারবি?

সূর্য জিজ্ঞেস করলো, কত দূর?

—খুব বেশী হবে না, পাঁচ সাত মাইল বড়জোর। চল না, বেড়াতে বেড়াতে চলে যাবো।

স্টেশনের বাইরে দু'একখানা ঘোড়ার গাড়ি তখনও রয়েছে। ঘোড়াগুলো ও গাড়োয়ান সবাই ঘুমচ্ছে। ব্রজগোপাল সেদিকে গেলেন না। সোজা রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলেন। লোকালয় ছাড়িয়ে এসে পড়লো গ্রামের পথ। অন্ধকার। ওদের কাছে টর্চও নেই।

ব্রজগোপাল বললেন, এদিকে অনেক টিকটিকি ছড়িয়ে আছে। একজন ধরা পড়লে আর একজনকে পালাতে হবে—এই হচ্ছে কথা। তখন কেউ কারুকে চিনি না, বুঝলি?

সূর্য কোনো সাড়া শব্দ করলো না।

ব্রজগোপাল এবার আফসোসের সুরে বললেন, এই সময় হরদা নেই। আমরা এখন সত্যিকারের লড়াই শুরু করছি, হরদা দেখে যেতে পারলেন না। হরদার ওপর সুভাষ-বাবুর অনেকখানি আস্থা ছিল।

দু'একখানা গরুর গাড়ি মাঝে মাঝে দেখা যায়। অনেকক্ষণ বাদে বাদে একজন দু'জন লোকও চলে যায় পাশ দিয়ে। যে-কোনো রাত্রির রাস্তাতেই এরকম দু'একজন উদাসীন ধরনের লোক চোখে পড়বেই। ওরা ঐ সময় কোথা থেকে আসে, কোথায় যায় কে জানে। হয়তো ওরাও ব্রজগোপাল আর সূর্য সম্পর্কে ঐ কথাই ভাবছে।

জোর হেডলাইট জেবলে একটা গাড়িকে আসতে দেখে ওরা পুলিসের গাড়ি মনে করে রাস্তা থেকে মাঠে নেমে গেল। গাড়িটা পুলিসের নয়, মিলিটারি। গাদাগাদি করা সোলজার চেঁচিয়ে গান গাইছে।

এখন ওরা ধরলো মাঠের ভেতরের কাঁচা রাস্তা। পরিষ্কার জ্যোৎস্না রাত, পথ চিনতে তেমন অসুবিধে হয় না।

ব্রজগোপাল সূর্যর কাঁধে হাত রেখে বললেন, সূর্য, তোর মনে আছে, আমাদের হাজারিবাগের আস্তানায় তুই যেদিন প্রথম এসেছিলি? হরদা না আটকালে আমরা বোধহয় তোকে মেরেই ফেলতাম। আমি তোকে খুব জোরে একটা চড় মেরেছিলাম না রে?

সূর্য বললো, ভীষণ জোরে মেরেছিলেন।

—তখন আমরা স্পাইয়ের ভয়ে খুব সন্ত্রস্ত ছিলাম। তোর বয়সী ছেলেরাও স্পাই হয়।

—কেন হয়?

—এদের কতরকম কায়দা আছে। কতরকম লোভ দেখায়! মানুষের কি আর লোভের শেষ আছে? পরাধীন দেশ, এই দেশের লোকও রায়বাহাদুর হয়, তাই নিয়ে আবার গর্ব করে। দ্যাখ না, যোগানন্দ আমাদের কতখানি সর্বনাশ করে গেল। শুধু শুধু ডাকাতির বদনাম নিলাম। অতগুলো টাকা—দলও ভেঙে গেল। শংকর তো ভিড়লো জয়প্রকাশ নারায়ণজীর সোস্যালিস্টদের দলে।

—যোগানন্দ সম্পর্কে কিন্তু আমার এখনো ঠিক বিশ্বাস হয় না।

—আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের তো ব্যাপার নেই। অতগুলো টাকা নিয়ে স্রেফ উধাও

হয়ে গেল। বড়লোকের ছেলে, বাড়িতে অভাব নেই—আমাদের সঙ্গে থেকে কম কষ্ট সহ্য করেনি, আমরা খুব বিশ্বাস করতাম ওকে—তবু টাকার লোভ সামলাতে পারলো না। আমি কোনোদিন টাকা পয়সা ভোগ করিনি, ওর যে কি টান তাও জানি না।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ব্রজগোপাল বললেন, আমার বাবা ছিলেন পোস্টাফিসের কেরানী—চিরকাল টানাটানির সংসার। সবাই ভেবেছিল, আমি লেখাপড়া শিখে বাড়ির দুঃখু ঘোচাবো। দেশের দুঃখু ঘোচাবার কথা আর ক'জন ভাবে বল। সবাই নিজের সংসারের দুঃখই ঘোচাতে চায়। আমি একটা ইস্কুল মাস্টারীও নিয়েছিলাম, বেশী দিন পোষাল না। হেড মাস্টারটি ছিল ইংরেজের মার্কামারা গোলাম। ওকে যদি কোনদিন বিলেতে নিয়ে যাওয়া হয়, ও তাহলে বোধ হয় বিলেতের মাটি চাটবে। সব ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে পড়লাম। কতদিন বাড়ির কোনো খবরও রাখি না—আমিও কোনো খবর দিই না, আমার জন্য তারা বিপদে পড়তে পারে। ছোট ভাইটা আছে—

—ব্রজদা, আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?

—চল্ না। ভালোভাবেই থাকবি। তোর বাবাকে কিছু বলে এসেছিস?

—বলেছি বিশেষ কাজে বাইরে যাচ্ছি।

—কোনো আপত্তি করেন নি।

সূর্য চুপ করে রইলো। বড়বাবুকে সে জানিয়ে এসেছে ঠিকই, কিন্তু মতামতের জন্য সে অপেক্ষা করেনি। বড়বাবুও আজকাল ওর কোনো কাজে বাধা দেন না। একদিন তিনি সূর্যকে মেরেছিলেন, সেই একদিনই। তিনি বোধহয় বুঝেছিলেন, মারধোর বা বকুনি দিয়ে এ ছেলেকে ঠান্ডা করা যাবে না।

ব্রজগোপাল বললেন, সবারই বাবা মা আছেন। সব বাবা মা-ই ছেলের জন্য চিন্তিত থাকে। ক্ষুদিরাম কিংবা ভবানীর মা বাবা ছিল না? তোর তো মা নেই—তোর বন্ধন অনেক কম। শোন, তোকে এখানে দুটো কাজ করতে হবে। এখানকার মানুষজনের সঙ্গে মিশবি, লোককে দেশের কথা বোঝাবি। সতীশ সামন্ত মশাই এ জেলায় অনেক কাজ করেছেন, তাঁর দলের ছেলেদের সঙ্গে পারলে যোগাযোগ করে নিবি—কিন্তু নিজের কথা বিশেষ কিছু ভাঙবি না। অ্যাকশানের সময় আমি তোকে খবর পাঠাবো।

তোর আর একটা কাজ হবে যোগানন্দকে খুঁজে বার করা। আমি খবর পেয়েছি, সে এদিকেই কোথাও আছে।

—যদি খুঁজে পাই?

—প্রথমে ভাব জমাবার চেষ্টা করবি। এমনভাবে কথা বলবি, যেন তুইও দলটল ছেড়ে দিয়ে এদিকে লুকিয়ে আছিস। আমাদের নামে যত পারিস নিন্দে করবি ওর কাছে। তারপর ওর বিশ্বাস অর্জন করতে পারলে একদিন সুযোগ বুঝে শেষ করে দিবি। তখন যেন গুলি চালাতে হাত না কাঁপে একটুও। বিশ্বাসঘাতকদের কোনো ক্ষমা নেই। এদের মেরে দেশের লোকের কাছে একটা দৃষ্টান্ত রাখা দরকার।

—মারার আগে ওকে কিছু জিজ্ঞেস করবো না?

ব্রজগাপোল থমকে দাঁড়িয়ে বললো, শোন সূর্য, কোনো মানুষকে যদি মারতে যাস, তাহলে তার কাছ থেকে যুক্তি বা স্বীকারোক্তি শোনার আশা করিস না। ওসব শুনলে তাকে আর শেষ পর্যন্ত মারতেই পারবি না। সেই হিসেবে একজন ইংরেজকেও মারা যায় না। মানুষ যত দোষই করুক, মৃত্যু কখনো তার শাস্তি হতে পারে না। আমরা ভারতীয়, মানুষের প্রাণ নষ্ট করার ব্যাপারে আমাদের মন কখনো ঠিক সায়

দেয় না। ইংরেজ আজ শুধু অস্ত্রশক্তিতে বলীয়ান হয়ে আমাদের ওপর প্রভুত্ব করছে। জ্ঞান, বুদ্ধি, নিষ্ঠা—কোন্ দিকে ওরা শ্রেষ্ঠ? এই অত্যাচারীকে আঘাত হানবার জন্যই আমাদের অস্ত্র ধরতে হয়েছে। কোনো ব্যক্তিবিশেষের ওপর আমাদের হিংসে নেই।

এক কালে স্কুলে পড়াবার জন্যই বোধহয় ব্রজগোপালের আন্তরিক কথাগুলোও বক্তৃতার মতন শোনায়। সূর্য বিনা মন্তব্যে নীরবে শুনে গেল।

দূরে কয়েকটা মিটমিটে আলো দেখে বোঝা যায় সামনে কোনো গ্রাম আসছে। ব্রজগোপাল সে গ্রামটিও পার হয়ে গেলেন নিঃশব্দে। আর একখানা মাঠ পেরুবার পর আবার একটি গ্রাম। ব্রজগোপাল সেই গ্রামের শেষ প্রান্তের একটি বাড়ির সামনে দাঁড়ালেন।

বাড়িটিতে মাটির দেয়াল ও খড়ের চালা দেওয়া পাশাপাশি কয়েকটি ঘর। উঠোনের এক পাশে গোয়ালঘর, সেখানে দুটি গরুর চোখ অন্ধকারে বৃহৎ মনির মতন ঝকঝক করছে। গোটা বাড়িটাই ঘুমন্ত মনে হয়েছিল—ব্রজগোপাল দরজায় একটু আঘাত করতেই দরজা খুলে গেল। একজন মধ্যবয়স্ক লোক মুখ বাড়িয়ে বললো, দাদা নাকি?

ব্রজগোপাল বললেন, উপেন, আমি। খবর পেয়েছিলে?

—হ্যাঁ দাদা। আজ বিকেলেই এক ছোকরাবাবু বলে গেল। দাঁড়ান বাতি জ্বালি।

হারিকেন জেবলে লোকটি বাইরে বেরিয়ে এসে বারান্দায় মাদুর পাতলো। আর একজন মহিলাও এলেন, লোকটির স্ত্রী মনে হয়।

—আসেন, দাদারা, বসেন এসে।

ব্রজগোপাল বারান্দায় উঠে বললেন, উপেন, এই ছেলেটিকে তোমার কাছে নিয়ে এলাম। একে কিছুদিন রাখতে হবে এখানে।

হারিকেনের আলোয় সূর্যর মুখ ভালো করে দেখে চমকে উঠে উপেন বললো, দাদা, এ কাকে নিয়ে এসেছেন? এ যে দেখছি সাহেবের ছেলে—

—না, না।

—বলেন কি? এই রং, এই চুল, কটা চোখ!

—না হে, এ আমাদের বাঙালী ঘরেরই ছেলে। খুব ভালো ছেলে।

—একে কি লুকিয়ে রাখতে পারবো? আমাদের এসব গাঁয়ের গরীব গুর্বো লোক যে এনার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকবে। এরকম গৌরবর্ণ কি এদিকে কোথাও আছে? এ কি চাপা রাখা যায়।

ব্রজগোপাল হাসতে হাসতে বললেন, আরে, ওসব ছাড়ো। কাল সকাল থেকে ওকে গামছা পরিয়ে মাঠে নামিয়ে দেবে। ও কি বসে বসে তোমার বাড়ির অন্ন ধ্বংস করবে ভেবেছো? রীতিমতন খাটিয়ে নেবে ওকে। দু-চারদিন রোদ-বৃষ্টিতে মাঠের মধ্যে কাজ করলেই ওসব গৌর বন্ন টন্ন কালি হয়ে যাবে।

বাড়ির অন্য অনেক লোকে ভিড় করে এসেছে। গুটি পাঁচেক ছেলেমেয়ে, লাজুক মুখ—অবাকভাবে দেখছে। এই দুজন আগন্তুককে। সূর্য মুখ নীচু করে বসে আছে।

ব্রজগোপাল বললেন, উপেন, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। কিছু খাওয়াবে?

উপেন কপালে করাঘাত করে বললে, হায়, হায়, এতক্ষণ না খেয়ে আছেন? এখন কী খাওয়াবো আপনাদের? ভাত চড়িয়ে দেবো?

—সেসব খেলে কি পেট ভরে।

—হায়, হায়, নিজের মুখে খেতে চাইলেন—আমার এত সৌভাগ্য, কি যে খাওয়াবো—

—তোমার যা আছে নিয়ে এসো না—

উপেন হাঁক ডাক শুরু করে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে গেল থালা ভর্তি মুড়ির মোয়া আর বড় বড় মর্তমান কলা। ব্রজগোপাল আর সূর্য তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগলো সেগুলো।

খাওয়া শেষ হয়ে যাবার পরই ব্রজগোপাল যেতে চান। অনেক জেদাজেদি করেও তাঁকে আর রাখা গেল না। ভোরবেলাই তাঁকে কোথায় যেন যেতে হবে।

উপেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ব্রজগোপাল সূর্যকে একটু ডেকে নিয়ে বাইরে গেলেন। ওর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, সাবধানে থাকবি। এরা লোক ভালো। তোর কোনো অসুবিধে হবে না।

সূর্য তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে চুপ করে রইলো।

ব্রজগোপাল বললেন, আজকাল আমি একটু দুর্বল হয়ে গেছি। কারুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলেই মনে হয়, আর দেখা হবে না। সূর্য, যদি আর দেখা না হয়, যদি আমি মরে যাই—তবু তুই থাকবি তো?

সূর্য বললো, থাকবো।

ব্রজগোপাল আর কিছু না বলে হন হন করে মিলিয়ে গেলেন অন্ধকারে।

॥ ৩৩ ॥

সূর্যকে শুতে দেওয়া হয়েছিল একটি ছোট্ট মাটির ঘরে। মাটিতে পরিপাটি করে বিছানা পাতা, তার পায়ের কাছেই কয়েকটা ভূষির বস্তা এবং ঘরটাতে একটু ছাগল ছাগল গন্ধ। কয়েকদিন আগেই এদিকে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেছে, সেই সময় বোধহয় এই ঘরে ছাগলগুলোকে এনে রাখা হয়ে ছিল।

সারারাত সূর্যর ঘুম এলো না, ঠায় জেগে রইলো চোখ মেলে। মাথার কাছে একটা লণ্ঠন জ্বালা ছিল, সেটা সে ইচ্ছে করেই নিভিয়ে দিয়েছে। নিস্তব্ধ পল্লীতে শুধু একটানা ঝিঁঝির শব্দ ও মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক। পাশের গোয়ালঘরে গরুদের বড় বড় নিশ্বাস ও স্বপ্ন-দেখা গোঙানির শব্দ শোনা যায়।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই সূর্য বিছানা থেকে উঠে বাইরে চলে এলো। দেখা গেল, বাড়ির কিছু-কিছু লোকজন তারও আগে জেগেছে। রান্না ঘরে আঁচ পড়ে গেছে, একজন বুড়ি গোবর ছড়া লেপছে দেয়ালে।

দিনের আলোয় সূর্য বাড়িটাকে ভালো ভাবে দেখলো। একটা উঠোনকে ঘিরে কয়েকটা ঘর। উঠোনের ঠিক মাঝখানেই একটা বেশ বড় নিম গাছ। নিম গাছের নীচে ধান ঝাড়াইয়ের ব্যবস্থা। রান্না ঘরটি উঠোনের এক কোণে। মাটির ঘর হলেও দেয়ালগুলি বেশ ঝকঝকে তকতকে। মোটামুটি একজন সম্পন্ন চাষীর বাড়িই বলা যায়।

মুখ ধোওয়ার জায়গা টায়গা কোথায় সূর্য জানে না, কাকে কি জিজ্ঞেস করবে, তাও বুঝতে পারছে না। সে একটু জড়োসড়ো হয়েই উঠোনের এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, এই সময় চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলো উপেন সামন্তমশাই। বেঁটে খাটো মানুষটি, খালি গায়ে বেশ নাদুস নাদুস চেহারা।

—এই যে উঠে পড়েছো দাদা? চলো, পুকুরে যাই এক সঙ্গে।

উপেন সামন্তের বয়েস সূর্যর প্রায় তিন গুণ, তবু সে সূর্যকে আগাগোড়া দাদা বলেই সম্বোধন করতে লাগলো এর পর থেকে। এরকম অতিথিপরায়ণ মানুষ কদাচিৎ দেখা যায়। সূর্যকে সারাক্ষণ সে এমন খাতির করতে লাগলো, যেন স্বয়ং ভগবান এসেছে তার বাড়িতে। তাকে ছাপোষা গৃহস্থই মনে হয়—চাষ বাস জমি জমা নিয়েই ব্যস্ত—এর সঙ্গে ব্রজগোপালের দলের কি করে যোগাযোগ হ'লো সূর্য ঠিক বুঝতে পারে না। এ সম্পর্কে কোনো প্রশ্নও সে করতে পারে না, কারণ সে রকম নিয়ম নেই!

রান্নাঘরের পেছনে একটু দূরেই পুকুর। ঘাটে সিঁড়ি নেই। 'তাল গাছ কেটে ধাপ বানানো হয়েছে। ছোট ছোট পানা ভাসছে পুকুরের জলে। উপেন সামন্ত নিম গাছের ডাল ভেঙে একটি দাঁতন সূর্যর হাতে দিয়ে কথা বলতে বলতেই দাঁত মেজে নিয়েছে। পুকুরের পাড়ে নেমে পানা সরিয়ে সরিয়ে খানিকটা জল পরিষ্কার করে নিল, তারপর বেশ আরাম করে মুখ ধুতে ধুতে কুলকুচো করা জল আবার ছিটিয়ে ফেলতে লাগলো পুকুরে। সূর্যকে বললো, নাও দাদা, নাও।

সূর্যর ইংরেজি স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত মন একটু দ্বিধাগ্রস্ত। স্বাস্থ্য বইয়ের নানা উপদেশ মাথার কাছে ঘুর ঘুর করে। কিন্তু এখন উপায়ান্তর নেই। উপেনের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সে ভাবলো, স্বাস্থ্যের সমস্ত নিয়ম-কানুন অগ্রাহ্য করা সত্ত্বেও এর স্বাস্থ্যটি তো বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছে। তবু মুখের জল কুলকুচো করে পুকুরে ফেলার ব্যাপারটাতেই সূর্যর অস্বস্তি কাটে না। একটুক্ষণ অপেক্ষা করে সে হাত দিয়ে অনেকখানি জল সরিয়ে সরিয়ে তারপর এক আঁচলা জল মুখে পুরে দেয়। জলে একটু গন্ধ আছে, কিন্তু খুব বিস্বাদ নয়।

চায়ের পাট নেই এ বাড়িতে, সূর্যকে খেতে দেওয়া হলো এক থালা পাতলা সুজির হালুয়া। এটা যে সূর্যর খাতিরেই বানানো হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গুড় দেওয়া হালুয়া সূর্য আগে কখনো খায়নি, গরম গরম বেশ খেয়ে ফেলা যায়।

একটু পরেই উপেন সামন্ত চাষের কাজে বেরিয়ে গেল। ব্রজগোপাল বলে যাওয়া সত্ত্বেও এবং সূর্যর অনেক পীড়াপীড়িতেও সে সূর্যকে কিছুতেই সঙ্গে নিল না। এক গাল হেসে বললো, তাও কি হয়? ভদ্রলোকের ছেলেকে দিয়ে কি হাল চাষ করানো যায়? তরোয়াল দিয়ে কি কেউ দাড়ি কামায়?

সূর্য বললো, আমি তো ভদ্রলোক নই।

—তা তুমি যাই বলো দাদা—তোমার এ চেহারা—আমাকে যে শেষে পুলিসে ধরবে। তুমি দাদা কোথাও বেরিও নি!

সূর্য কিছুতেই তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাতে পারলো না। সারাদিন সে বাড়ির মধ্যে বন্দী। এ বাড়িতে বিভিন্ন বয়েসী পাঁচজন নারী আছে। উপেন সামন্তর মা এখনো বেঁচে—তার ভাই মারা গেছে, বিধবাটি এ বাড়িতেই থাকে। উপেন সামন্তর এক ছেলে বাবার সঙ্গেই চাষবাস দেখে, আর এক ছেলে খড়্গপুরে কলেজে পড়তে গেছে।

বাড়ির মেয়েরা সূর্যর দিকে, অবাকভাবে চেয়ে থাকে—কেউ সামনাসামনি কোনো কথা বলে না। বয়স্ক মেয়েরা ফিসফাস করে বলে, কী সুন্দর, কী সুন্দর। কুমারী মেয়েরা ফিকফিকিয়ে হেসে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সূর্য দারুণ অস্বস্তিতে পড়ে যায়। নিজের চেহারা বিষয়ে সে একেবারেই সচেতন নয়। অন্য কেউ এ বিষয়ে কথা বললে সে মনে মনে বিরক্তই হয় একটু—দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রায় জায়গাতেই তাকে এ বিষয়ে আলোচনা শুনতে হয়। প্রথমবার দেখে কেউই তাকে বাঙালী বলে মনে করে না।

ব্রজগোপাল বলে গিয়েছিলেন, সূর্য গ্রামের লোককে দেশের কথা বোঝাবে। কিন্তু গ্রামের লোককে সে কোথায় পাবে? কি করে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হয়, তাই-ই সে জানে না। ওরা তো প্রায় সারাদিনই মাঠে থাকে—সন্ধ্যেবেলা ফিরেই খাবার খেয়ে নেয়—এবং অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। রাত্রে কেরোসিনের আলো জেবলে রাখা রীতিমতন ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। সূর্য কথা বলার কোনো লোক খুঁজে পায় না।

বাড়ির মেয়েরা সারাদিন রান্নাবান্না করে, গরুর জন্য খড় কুচোয়, ধান ঝাড়ে—আর বাড়ির লাগোয়া বাগানে কাজ করে। বেগুন ও লঙ্কার গাছ আছে অনেকগুলো, এক ধারে আলুর গাছও লাগানো হয়েছে। প্রথম দু'একদিন সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাগানের কাজ লক্ষ্য করলো, তারপর নিজেই একদিন লেগে গেল সেই কাজে।

গাছগুলোর গোড়া খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জল দেয়, আগাছা পরিষ্কার করে। বেশ মেতে উঠলো সে এই কাজে। নিছক বসে বসে পরের অন্ন ধ্বংস করছে না—এই চিন্তাও তাকে আনন্দ দেয়। পুকুর থেকে সে নিজেই খেতের জন্য ঘড়া ঘড়া জল তুলে আনে।

প্রথম দিন একটি পনেরো ষোলো বছরের মেয়ে তার কাছে এসে লজ্জা ভেঙে বলেছিল, আপনি পারবেন নি। আমাকে দিন।

সূর্য গম্ভীরভাবে বলেছিল, ঠিক পারবো।

খানিকক্ষণ মাটি খোঁচাবার পরে সে দেখলো তার সামনে মাটিতে একটা ছায়া পড়ে আছে, মেয়েটি তখনও পেছনে দাঁড়িয়ে।

সে ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, তোমার নাম কি?

মেয়েটি লজ্জাতেই বাঁচে না। তক্ষুনি দৌড়ে পালিয়ে গেল। বছর দশ-এগারো বছরের আর একটি মেয়ে আছে, সেও আবার দেখতে এলো সূর্যকে। সূর্য তার নাম জিজ্ঞেস করলে সেও লাগালো এক দৌড়।

আস্তে আস্তে লজ্জা ভাঙে। মেয়ে দুটির নাম লক্ষ্মী আর অন্নপূর্ণা। নক্কী আর অন্নো—এই শুনে সূর্যকে আন্দাজ করে নিতে হয়েছে। ক্রমশ ওরা সবাই মিলে এক সঙ্গে কাজে লেগে যায়। বেশ একটা উৎসাহের সাড়া পড়ে যায় ওদের মধ্যে। এরকম সাহেবের মতন চেহারার কোনো মানুষকে তো ওরা কখনো মাঠে বসে কাজ করতে দেখেনি।

সূর্যকে উপেন একটা কোরা ধুতি কিনে দিয়েছে। সেটা পরে সে এখন খালি গায়েই বাগানের কাজ করে, জল তোলে। অন্য বাড়ির লোকরা দেখতে আসে তাকে।

সূর্যর একটু অসুবিধে হয়েছিল স্নান করা নিয়ে। এখনো সে সাঁতার জানে না—তাই পুকুরে নামতে ভয় পায়। দু' চারদিন পর উপেন এটা জানতে পেরে জোর করে তাকে পুকুরে নামালো এবং দিন তিনেক হাত পা ছুঁড়িয়ে শিখিয়ে দিল সাঁতার। এটা সূর্যর পক্ষে একটা মস্ত লাভ। এরপর সে মহাউৎসাহে যখন তখন পুকুর দাপিয়ে বেড়ায়।

লক্ষ্মী আর অন্নপূর্ণা কোনো রকম লেখাপড়া জানে না। অক্ষর জ্ঞান পর্যন্ত নেই। এ সব বাড়ির মেয়েদের লেখাপড়ার কথা কেউ চিন্তাই করে না কখনো। সূর্য একবার ভাবলো, ওদের একটু লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করলে কেমন হয়? এ বাড়িতে বই বা কাগজপত্রের কোনো পাটই নেই, কি কারণে যেন একটা সাত-আট বছর আগেকার পঞ্জিকা পড়ে আছে শুধু। সেটা দিয়েও কোনো সুবিধে হবে না। বাগানে কাজ করতে করতে সূর্য ঝুরো ঝুরো মাটির ওপর কাঠি দিয়ে অ আ লিখে ওদের শেখাবার চেষ্টা করে। ওদের সব কথাতেই হাসি। হেসে গড়াগড়ি যায় মাটিতে। সূর্য রীতি-

মতন গুরু মশাইয়ের মতন ওদের ধমকায়। উপেনের বউ দূর থেকে দেখে—সেও হাসে, যেন একটা মজার খেলা শুরু হয়েছে এখানে।

এখানে থাকতে থাকতে মনে হয়, পৃথিবীটা বড়ই ছোট। মানুষ জনের সুখ-দুঃখ সবই ছোট ছোট, কারুর কোনো উচ্চাকাঙ্খা নেই বলে অতৃপ্তিও নেই। দু'চার-খানা গ্রাম ছাড়া—আর কোনো জায়গার খবর এরা রাখে না। জন্ম-মৃত্যুও নিজস্ব নিয়মে চলে। রাত্তিরবেলা নক্ষত্র-ভরা আকাশের নীচে সূর্য একলা দাঁড়িয়ে থেকে ভাবে, এ দেশ সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। নিজেকে তার খুবই ছোট মনে হয়।

আস্তে আস্তে সূর্য বাড়ির বাইরে বেরুতে শুরু করে। দু'চার জন লোকের সঙ্গে আলাপ হয়। মুদিখানার সামনে গিয়ে বসে—অন্যরা সহজে তার সঙ্গে কথা বলতে চায় না, সেও নিজে থেকে কিছু বলে না, চুপচাপ শোনে। গ্রামের মানুষ ইতিমধ্যেই এই অদ্ভুত যুবকের কথা জেনে গেছে। সূর্যকে দেখলেই তারা পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। একটি দুটি লোক দ্বিধা কাটিয়ে প্রশ্ন করে, সাহেব কি কলকাতা থেকে আসছেন?

সূর্য একদিন ঐ রকম মুদিখানার সামনেই বসে ছিল, একটি বাচ্চা ছেলে তার সামনে এসে বললো, আপনাকে ডাক্তারবাবু ডাকছেন।

সূর্য অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, আমাকে?

সূর্য উপস্থিত অন্যান্য লোকদের দিকে তাকালো। একজন লোক বললো, পাগল ডাক্তার বোধ হয় টের পেইয়েছেন।

সূর্য জিজ্ঞেস করলো, আমি যাবো?

সবাই এক সঙ্গে বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ যান না। লোক ভালো। ডাক্তার লোক ভালো। গরীব মানুষদের খুব দেখে।

সূর্য একবার ভাবলো, এ বিষয়ে উপেনের সঙ্গে তার একবার পরামর্শ করা দরকার কিনা। পরক্ষণেই মনে হলো, ডাকতে যখন পাঠিয়েছে—তখন সূর্য না গেলে এই লোকগুলো ভাববে সে ভয় পেয়েছে। সেটা তার কাজের পক্ষে সুবিধাজনক নয়।

ছেলেটির সঙ্গে সে হাঁটতে হাঁটতে গেল এই গ্রাম ছাড়িয়ে অন্য গ্রামে। সেখানে একটি মাটির বাড়ির সামনে ডাক্তারের নামে বাংলা সাইনবোর্ড ঝোলানো। ডাক্তারের নাম তমোনাশ বিশ্বাস।

ভেতরে ঢুকে দেখলো একটি করে নড়বড়ে আলমারি, টেবিল ও চেয়ার এবং দুটি কাঠের বেঞ্চ পাতা। ডাক্তার একজন হাঁ-করা রুগীর মুখের মধ্যে টর্চ ফেলে দেখছেন। আরও কয়েকজন লোক নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

কোরা ধুতি পরা খালি গায়ে সূর্য সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে দাঁড়াতেই ডাক্তার কড়া চোখে তার দিকে তাকালেন। আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে বললেন, তুমিই উপেন সামন্তর বাড়িতে এসে রয়েছো? বসো ওখানে।

সূর্য বেঞ্চির এক কোণে বসলো।

॥ ৩৪ ॥

তমোনাশ ডাক্তার একে একে চার-পাঁচজন রোগীকে পরীক্ষা করলেন এবং মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকাতে লাগলেন সূর্যর দিকে। সূর্য লক্ষ্য করলো, ডাক্তারবাবুটি

কোনো রুগীর কাছ থেকে ফি নেন না। টেবিলের ওপর একটা টিনের কৌটো রাখা আছে, তাতে যার যা খুশী বা সাধ্য ফেলে যাচ্ছে। অবশ্য ওষুধও সকলেরই প্রায় এক রকম—পাতলা লাল রঙের মিকশ্চার।

ঘরের মধ্যে দুটি বেড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে, চেহারা মোটেই সুবিধের নয়—সূর্যর পায়ের কাছে এসে মিউ মিউ করতেই সে পা তুলে নেয় বেঞ্চের ওপর। পাশে যে-কজন লোক বসে আছে তারা একেবারে নির্বাক নিস্পন্দ। মনে হয়, ডাক্তারকে সবাই খুব ভয় পায়। সারা ঘর জুড়ে একটা অস্বস্তিকর গন্ধ। ডাক্তারের ঠিক পেছনেই দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের পাশে বসে থাকা গান্ধীজীর একটা ফটোগ্রাফ বাঁধানো। ভেতর দিকের একটা দরজায় ময়লা পর্দা হাওয়ায় ওড়ে। সেখানে দেখা যায় একটা টানা বারান্দা, উঠোনে তুলসী মঞ্চ, চার পাঁচটা বাচ্চা ছেলে হুটোপুটি করছে।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে সবাই চমকে ওঠে। ডাক্তার তার সামনে বসা রুগীটিকে এক চড় মেরেছেন। লোকটি মাঝবয়েসী, কিংবা বয়েস হবার আগেই বুড়িয়ে গেছে, চেয়ারের ওপর ঝুঁকে বসেছিল—মার খেয়ে মুখ দিয়ে একটা গোঙানির মতন শব্দ করলো। লোকটির ডান হাতের ওপরের দিকে একটা মস্ত বড় ক্ষত, পুরনো ব্যাণ্ডেজ খুলে ডাক্তার নতুন ব্যাণ্ডেজ লাগাচ্ছিলেন—লোকটির কাছাকাছি এসে তিনি ওর মুখে মদের গন্ধ পেয়েছেন।

ডাক্তার গর্জন করে বললেন, হারামজাদা, তুই ফের মদ গিলিছস্! তোর এত বড় সাহস, তুই আমার কাছে আসবার আগেও—হারামজাদা—

ডাক্তার আবার তার দু' গালে দু' ঘা কষালেন। রাগে তিনি রীতিমতন কাঁপছেন। ডাক্তারের রোগাটে লম্বা শরীর, ষাটের কাছাকাছি বয়েস, কিন্তু গলায় তেজ আছে।

মার খেয়ে লোকটি মুখ ঢেকে ফেলেছে আর সরু গলায় বলছে, আর করবুনি, আর করবুনি।

—যা বেরিয়ে যা, দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে—

লোকটি ডাক্তারের পা ধরতে যায়। নেশার ঝোঁকে সামলাতে পারে না, হুমড়ি খেয়ে পড়ে পায়ের ওপরে। ডাক্তার পা সরিয়ে নিয়ে অন্যদের উদ্দেশ্য করে বললেন, এসব কে বিক্রি করে এ তল্লাটে? সেদিন অত করে বললাম—

কেউ প্রথমে উত্তর করে না। এ ওর মুখের দিকে তাকায়। একজন বলে, কাছে পিঠে তো আজ্ঞে, কেউ এমন সাহস করবেনি—আপনি বলেছেন—

ডাক্তারের রাগ একটুও কমে না। তিনি আর রুগী দেখবেন না সেদিন। চেঁচিয়ে বললেন, বেরিয়ে যা। সব দূর হয়ে যা। তোরা মরতে চাস মর্। আমি কি করবো।

সব লোকই তখন সরব হয়ে ওঠে। নানা রকম কাকুতি মিনতি। ঘরের মধ্যে একটা হট্টমেলা শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারকে আবার রুগী দেখতে বসতেই হয়। কিন্তু তাঁর মুখে বেদনার ছায়া। সূর্য চুপ করে বসে নাটকের মতন এই দৃশ্য দেখে।

সব চুকে বুকে গেলে ডাক্তার সূর্যকে ডাকলেন, এবার তুমি এদিকে এসো।

সূর্যকে উঠে গিয়ে ডাক্তারের মুখোমুখি রুগীদের টুলেই বসতে হয়। রুগী দেখার মতন চোখেই ডাক্তার তার দিকে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করেন, নাম কি?

—সূর্যকুমার ভাদুড়ী।

—তুমি কোন দলের?

সূর্য চুপ করে থাকে। ডাক্তারের চোখ থেকে চোখ সরায় না।

—তোমাকে কে পাঠিয়েছে? উপেনের বাড়িতে এসে ঘাপটি মেরে রয়েছো কেন?

কিছু একটা উত্তর দিতে হবেই, তাই সূর্য বললো, আমি এখানে বেড়াতে এসেছি।

হা-হা করে হেসে উঠে ডাক্তার বললেন, বেড়াবার আর জায়গা পেলে না বাপু? এই এঁদো পচা গাঁয়ে তোমার মতন ছেলেরা বেড়াতে আসে? খোলসা করে কও দিকিনি সব কথা!

—আমার এক দাদার সঙ্গে উপেন সামন্তর চেনা আছে। তাই তিনি আমাকে এখানে রেখে গেছেন।

—তা তোমার দাদাটি কে? তিনি কোন্ দলের? দলের তো অন্ত নেই। বারো রাজ-পুতের তের হাঁড়ির হাল হয়েছে এদেশে। তুমি জেলা কংগ্রেস কমিটির কারুকে চেনো?

—না।

—শোনো, তোমাকে একটা সাফ কথা বলে দিই। কংগ্রেসের কর্মী ছাড়া এই এলাকায় আমরা আর কারুকে ঢুকতে দেবো না।

—আপনি কি বলছেন আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমি তো কোনো দলে নেই।

—সঙ সাজার চেষ্টা করো না। সেদিনের ছেলে, গাল টিপলে এখনো দুধ বেরুবে—আর তুমি আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছো? তোমার নামে পুলিসের হুলিয়া আছে?

—আমি সত্যিই এখানে বেড়াতে এসেছি।

—এখান থেকে দু' ক্রোশ দূরেই থানা। তুমি দু-একদিনের মধ্যেই ধরা পড়বে। তুমি এখান থেকে সরে পড়ো।

সূর্য এবার একটু তেজ দেখিয়ে বললো, বাঃ, মানুষ কি কোথাও বেড়াতেও আসতে পারবে না?

—আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করো না। ওই দাদা-টাদা শুনেই বুঝেছি, তুমি বোমা-পিস্তলের দলের ছেলে। দু-চারটে আলপিন ফুটিয়ে তোমরা ব্রিটিশ সিংহকে তাড়াতে চাও। আমাদের এখানে ও-সব চলবে না। তুমি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবে।

সূর্য তেড়িয়াভাবে বললো, আপনার হুকুমে?

—হ্যাঁ।

—যদি না যাই?

—যে-রকমভাবে বেড়াল পার করে দেখেছো? আমাদের ছেলেরা তোমাকে সেই রকমভাবে পার করে দিয়ে আসবে।

সূর্যর ঠোঁটে সামান্য ব্যঙ্গের হাসি। সে কটমট করে চেয়ে রইলো তমোনাশ ডাক্তারের দিকে। ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটির টুঁটি চেপে ধরতে পারে।

ডাক্তারের মুখখানিতে একটা মলিন ছায়া পড়লো। আপন মনেই বললেন, আমরা এখানে অনেক সহ্য করেছি। আর না। তোমাদের মতন হঠকারীদের জন্য সাধারণ মানুষকে মরতে হয়। পেডি, ডগলাস, বার্জকে যখন পর পর তিন বছরে মারলো তারপর মেদিনীপুরের ওপর কী অত্যাচার গেছে, সে খবর রাখো? প্রদ্যোৎ ভট্চাযের নাম শুনেছো? সে ছিল আমার নিজের ছেলের মতন। তোমারই বয়েসী হবে—ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিয়েছে। হীরের টুকরো ছেলে সব—ভুল পথ দেখিয়ে—তোমার

মাথার ওপরেও ফাঁসির দড়ি ঝুলছে দেখতে পাচ্ছি আমি, কিংবা লোকজনই তোমাদের পিটিয়ে মারবে। সে তোমার যা খুশী করতে চাও করো—কিন্তু এখানে না—আমার এলাকায় সাধারণ মানুষের ওপর আমি অত্যাচার হতে দেবো না।

সূর্য বললো, যত বেশী অত্যাচার হবে, ততই দেশের লোক জাগবে।

ডাক্তার চেঁচিয়ে বললো, ভুল! ভুল! ন্যায়ের পথ ছাড়া সারা দেশের মানুষকে সংঘবদ্ধ করা যায় না। শিগগিরই মহাত্মাজীর ডাক আসবে, সমস্ত দেশবাসীকে সত্যাগ্রহে নামতে হবে। তোমরা যদি আমাদের সঙ্গে আসতে চাও—

সূর্য প্রকাশ্য ব্যঙ্গে বললো, কি করবেন তখন? অনশন?

—দরকার হলে তাও করতে হবে। অনশনের শক্তি জানো? তাতে যে শুধু শত্রু হার মানে তাই-ই নয়, নিজের আত্মা শুদ্ধ হয়। হিংসা দিয়ে হিংসাকে জয় করা যায় না। গণদেবতা যেদিন জেগে উঠবেন—

ভেতরের দরজার পর্দা সরিয়ে একজন মহিলা ডাকলেন ডাক্তারকে। ডাক্তার হাত তুলে বললেন, দাঁড়াও, একটু পরে—ডাক্তারকে তখন বক্তৃতায় পেয়ে বসেছে। অনর্গল উপদেশ দিতে লাগলেন সূর্যকে।

সূর্য অবাধ্য ছেলের মতন অমনোযোগী। ইচ্ছে করে পা দোলাচ্ছে। সে তর্ক করতে ভালবাসে না, কিন্তু এইসব কথা শুনলে তার হাসি পায়।

একবার শুধু সে বললো, আপনি এত অহিংসার কথা বলছেন, কিন্তু আপনাকে দেখলে তো অহিংস মনে হয় না। তখন ঐ লোকটিকে অমন ভাবে মারলেন—

ডাক্তার হুংকার দিয়ে বলছেন, বেশ করেছি। বাপ ছেলেকে মারে না? শোনো বাপু, তোমাকে একটা কথা বলি, তুমি কেন এ পথে' এসেছো? তোমাকে দেখলেই মনে হয়—তুমি ধনীর ঘরের আদরের দুলাল। দেশ উদ্ধার করা মানে ছেলেখেলা নয়। বন্দুক পিস্তল ছোঁড়ার নেশায় একবারও কি ভেবে দেখো না, মানুষের প্রাণ কি অমূল্য? অন্যের প্রাণের কথা না হয় নাই-ই ভাবলে, নিজের প্রাণ? দেশের কাজ বড় পবিত্র কাজ, এ জন্য দরকার চরিত্রবল। নিয়মিত ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়। মাথা গরম লোকজনের দ্বারা একাজ হয় না। যুগমানব গান্ধীজী—

সূর্য আকস্মিকভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি চলি। সন্ধ্যে হয়ে আসছে।

তমোনাশ গভীর কৌতূহলের সঙ্গে দেখতে লাগলেন ছেলেটিকে। তারপর বললেন, ঠিক আছে। কালকেই চলে যেও এখান থেকে।

সূর্য এবার শান্তভাবে বললো, যদি না যাই, জোর করে পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না।

—আমরা জোর করে না পাঠালেও পুলিসই তোমাকে ধরবে।

—সেটা আমি বুঝবো।

এই সময়ে লালপাড় শাড়ী-পরা এক কল্যাণময়ী নারীমূর্তি হাতে একটি খাবারের প্লেট নিয়ে ঢুকলেন। চিনি মেশানো চিঁড়েভাজা এবং একটি কলা। মহিলা প্লেটটি রাখলেন সূর্যর সামনে।

সূর্য চলে আসবার জন্য উদ্যত হয়েছিল, মহিলাকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেল। খাবারের প্লেট অবহেলা করে কি তার চলে যাওয়া উচিত? মানুষজনের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করতে তার একটুও আটকায় না—কিন্তু মহিলাদের সামনে সে নিজের ব্যবহার সম্পর্কে দিশেহারা হয়ে যায়।

মহিলা কোমল গলায় বললেন, নাও বাবা, খেয়ে নাও। তোমার নাম কি? তুমি

কাদের ছেলে?

ভেতরের দরজার সামনে চার পাঁচটি ছেলেমেয়ের কৌতূহলী মুখ।

দেয়ালের পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছ'টা বাজলো। তমোনাশ ডাক্তার চমকে উঠে বললেন, আরে বাপরে, ছ'টা বাজলো। ডাকো, ডাকো, সবাইকে ডাকো।

সূর্য খাবারের প্লেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলো। ঘরে ঢুকলেন আট ন'জন মহিলা ও শিশু। সবাই হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো মাটিতে। বাচ্চাদের ভঙ্গিও বেশ বাধ্য। হাতজোড় করে চেয়ে রইলো ডাক্তারের দিকে। সূর্য বুঝলো, এবার এখানে একটা প্রার্থনা সভা হবে। প্রতিদিনই হয় বোধহয়।

ডাক্তার তাঁর ভাঙা গলায় শুরু করতেই সবাই একযোগে আরম্ভ করে দিল গানঃ

রঘুপতি রাঘব রাজারাম

পতিত পাবন সীতারাম

ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম......।

সবাই দুলে দুলে গান গায়। তমোনাশ ডাক্তার চোখ বুজে তাল দিতে থাকেন। ঘরের মধ্যে সূর্যই একমাত্র চোয়াড়ে ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, তার ঠোঁটে সেই হাসিটা লেগেই আছে।

প্রথম গানের পর তমোনাশ ডাক্তার হরিজন পত্রিকা থেকে গান্ধীজীর রচনার খানিকটা অংশ অনুবাদ করে শোনালেন। নারী ও শিশুরা তার কতটা বুঝলো কে জানে। মনে হয় বিশেষ করে সূর্যকে শোনাবার জন্যই আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠান।

পাঠ শেষ হবার পর সবাই নিস্তব্ধ। ডাক্তার বইখানা টেবিলে রাখলেন। সূর্যর দিকে ফিরে আস্তে আস্তে বললেন, আমাদের যৌবন কালে একটা গান আমরা খুব গাইতাম। আজও সে গান মনে পড়লে—'

ডাক্তার শুরু করে দিলেনঃ

যায় যাবে জীবন চলে

জগৎ মাঝে তোমার কাজে

বন্দে মাতরম বলে

বেত মেরে কি মা ভোলাবি, আমি কি

মার সেই ছেলে......

সূর্য দেখলো বৃদ্ধ ডাক্তারের চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে।

॥ ৩৫ ॥

এই এলাকায় তমোনাশ ডাক্তারের বেশ প্রতিপত্তি আছে। লোকে আড়ালে তাকে পাগলা ডাক্তার বলে, কিন্তু সামনে বেশ সমীহ করে এবং আড়ালের ডাকটির মধ্যেও রয়েছে অনেকখানি ভালোবাসা। তমোনাশ ডাক্তারের মানুষের শ্রদ্ধা অর্জনের পদ্ধতিটি সূর্য লক্ষ্য করে। দেখা গেল, ডাক্তারের জীবনের কোনো গোপন অংশ নেই, তাঁর কোনো ব্যক্তিগত জীবন বলেই কিছু নেই। এরকম মানুষকে বোঝা সকলের পক্ষে সহজ। কোনো রকম আব্রু রাখেন নি বাড়িতে, যে যখন ইচ্ছে ঢুকে যাচ্ছে ভেতরে, সারাদিনই উনুন জ্বলে—কে কখন এসে খেয়ে যায় তার ঠিক নেই। অনেক সময় খেতে বসে দেখা যায় পাতে খাবার নুন নেই, তমোনাশ ডাক্তার সামনের রাস্তা দিয়ে চলন্ত

যে-কোনো লোককে ডেকে বলেন, ওহে অমুক, দু' পয়সার নুন কিনে দিয়ে যাও তো। ঝটপট এসো বাবা, খিচুড়ি জুড়িয়ে যাচ্ছে। নুন নিয়ে এসে সেই লোকটিও খেতে বসে যায়, না খেতে চাইলেও ডাক্তার তাকে খাওয়াবেনই, নিজের এঁটো খিচুড়ি তুলে দেবেন অন্য একটি থালায়।

এই ধরনের আন্তরিকতায় সাধারণ লোকে মুগ্ধ হয়। সূর্য বুঝতে পারে, তার পক্ষে এই পদ্ধতিতে মানুষের মন জয় করা সম্ভব নয়।

ডাক্তারের ছেলে-মেয়েরা সকলের ফুট ফরমাজ খাটে, ডাক্তারের স্ত্রী সকলেরই মাসীমা। মাঝে মাঝে ডাক্তার সপরিবারে গান গাইতে বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়, পাড়া প্রতিবেশীদের যোগ দিতে বলেন। অনেক লোকই আসে। মাঠের মাঝখানে পতাকা তুলে তার নীচে দাঁড়িয়ে ডাক্তার সকলকে গান্ধীজীর বাণী বুঝিয়ে দেন। মাঝে মাঝে হাত তুলে উত্তেজিত ভাবে চিৎকার করে বলেন, জেলে যেতে হবে! সকলকে জেলে যেতে হবে। বৃটিশের জেলখানা ভরিয়ে দেবো—তাতেই ভেঙে পড়বে জেলখানার দেয়াল। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে!

তারপরেই গান, 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে মোদের বাঁধন টুটবে—'।

সূর্য দিন তিনেক পর পর গিয়েছিল ডাক্তারের বাড়িতে। তারপর সরে পড়লো। অন্য দলে আত্মগোপন করে মিশে থাকার নির্দেশ ছিল সূর্যর ওপর, কিন্তু সূর্য এখানে সুবিধে করতে পারলো না। যতক্ষণ সে থাকে, নানা জনে নানা রকম প্রশ্নে তাকে একেবারে অস্থির করে তোলে। ডাক্তারের স্ত্রীর বিশেষ স্নেহ জন্মেছিল সূর্যর ওপর, তিনি এই অদ্ভুত প্রকৃতির ছেলেটির সমস্ত কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চান। কিন্তু বানিয়ে বানিয়ে হরেক রকম মিথ্যে কথা বলার ক্ষমতা সূর্যর নেই। সে বরং খুব সহজেই রুক্ষ ব্যবহার করতে পারে—কিন্তু একজন বর্ষীয়সী নিরীহ করুণাময়ী মহিলার সামনে সে রুক্ষতা বা মিথ্যাচার কোনোটাতেই সুবিধে করতে পারে না। সুতরাং সে গা-ঢাকা দেয়।

উপেন সামন্তর বাড়িতে সে বরং অনেক স্বস্তি বোধ করে। এখানে সে পরিবারের একজন হয়ে গেছে। সারাদিন মাঠের কাজ করে, পুকুরে দাপাদাপি করে সাঁতরায়, বাড়ির ক্ষেত থেকে তুলে আনা বেগুন পুড়িয়ে মোটা চালের ভাত ও ডালের সঙ্গে মেখে খায়।

সন্ধ্যেবেলা সে মুদির দোকানটার সামনে এসে বসে বসে গল্প বলে, ইতিহাসের গল্প। সিরাজউদ্দৌল্লার আমল থেকে শুরু করে। বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা তার নেই, টুকরো টুকরো ভাবে গল্প সে বলতে পারে। কয়েকদিন এদের কথা শুনেই বুঝেছে যে সাহেবদের সম্পর্কে এই সব মানুষদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভীতির ভাব রয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সম্পর্কেও কারুর কোনো ধারণা নেই, অনেকে অস্পষ্টভাবে শুনেছে যে কোথায় যেন কি একটা যুদ্ধ চলছে—সেটাও সাহেবে সাহেবে লড়াই—সেই যুদ্ধ বেশী ধুন্ধুমার হলেই পৃথিবীতে প্রলয় কাল এসে যাবে। ইতিমধ্যে একবার প্রলয়ের গুজবে এক রাত কেউ ঘুমোয় নি।

সূর্যর গল্প তারা হাঁ করে শোনে। চোখে অবিশ্বাস ও আতঙ্ক ফুটে থাকে। সিরাজউদ্দৌলার তাড়ায় একবার সাহেবরা কলকাতা ছেড়ে জাহাজে করে পালিয়েছিল—এ কাহিনী শুনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, হুঁকোয় টান দিতে ভুলে যায়। একজন বৃদ্ধ সকলের মুখপাত্র হয়ে বলে, এ কি বলছো তুমি দাদা! শাস্ত্রে আছে কল্কি অবতার হবেন পীত রঙের। সাহেবরা কি পীত রঙের নয়? ওদের মধ্যেই আছেন কল্কি

অবতার—

সূর্য শাস্ত্রের খবর রাখে না। সে আস্তে আস্তে বলে, সাহেবরা এক হয়ে কাজ করতে জানে, আমরা জানি না। নইলে আমরা এ দেশের তেত্রিশ কোটি লোক যদি সবাই মিলে একটা হাতের ধাক্কা দিই তা হলেই সব ক'টা ইংরেজ সমুদ্রে ডুবে মরতে পারে।

বৃদ্ধটি অদ্ভুত চোখে সূর্যর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে আসর ছেড়ে উঠে চলে যায়। সূর্য তবু হাল ছাড়ে না। অন্যদের আবার বোঝাবার চেষ্টা করে। এই লোক-গুলোকে কিছুটা হাতে রাখা দরকার। আসল লড়াইয়ের সময় যে এদের কাছ থেকে খুব একটা সাহায্য পাওয়া যাবে, সূর্য সে রকম আশা করে না। কিন্তু এদের অন্তত নিরপেক্ষ করা দরকার। এর আগে অনেকবার দেখা গেছে যে পুলিশের তাড়া খেয়ে বিপ্লবীরা যখন পালাতে চেষ্টা করে, তখন সাধারণ গ্রামবাসীরাই তাদের ধরে ফেলে পুলিসের হাতে তুলে দেয়।

মাঝে মাঝে তমোনাশ ডাক্তারের দলের ছেলেরা তাকে ডাকতে আসে। কখনো তাদের সঙ্গে থাকে ডাক্তারের নিজের লেখা চিঠি—সূর্য নানা ছুতো করে কাটিয়ে দেয়।

তার আর একটি কাজ লক্ষ্মী আর অন্নপূর্ণাকে লেখাপড়া শেখানো। প্রথমে এটা হাসিঠাট্টার ব্যাপার ছিল, ক্রমশ তারা মনোযোগী হয়। সূর্য দেখে, এদের সহজাত বুদ্ধি অন্য কারুর থেকে কম নয়, লেখাপড়ার সুযোগ পেলে এরা যে-কোনো শহরের মেয়ের মতনই শিখতে পারতো।

বড় মেয়েটি, যার নাম লক্ষ্মী, তার গায়ের রং পুকুরের শ্যাওলার মতন। চামড়ায় মসৃণতা আছে। তার টানা-টানা বড় বড় দুটি চোখ—হঠাৎ শহরে আনলে বোকা বোকাই মনে হবে—কিন্তু সেই প্রান্তর মধ্যবর্তী মাটির বাড়ির আঙিনায় তারাময় আকাশের নীচে সেই চোখ স্নিগ্ধ সরল মনে হয়। সূর্যর সৌন্দর্যপিপাসু দৃষ্টি ওর মধ্যেই অনেকখানি রূপ আবিষ্কার করে ফেলে—এবং রাত্তির বেলা পুকুরে আঁচাতে যাবার সময় সে যখন লক্ষ্মীর পিঠে হাত রেখে হঠাৎ বলে, তোমাকে খুব সুন্দর দেখতে—তখন আসলে সে কোনো মিথ্যে কথা বলে না। সেই রাত্রি, ঝিঁঝির ডাক ও নিমপাতার হাওয়ার মধ্যে এক পঞ্চদশ বর্ষীয়া গ্রাম্য কিশোরী মুহূর্তে অপরূপা হয়ে উঠতে পারে। এ মুহূর্তটির আলাদা কোনো মূল্য অনেকেই দেয় না, কেউ কেউ দেয়।

লক্ষ্মীর ছোট্ট জীবনে এরকম কথা কেউ কখনো বলে নি, বিশেষতঃ তাদের বাড়িতে যে ছদ্মবেশী রাজকুমারটি অতিথি হয়ে আছে, তার মুখে এই কথা শুনে সে কেঁপে ওঠে লজ্জায়, এক ছুটে পালিয়ে যায় পুকুরঘাটে।

সূর্যর আচমকা মনে পড়ে যায় শ্রীলেখার কথা। ক্রুদ্ধ অজগরের মতন সে এদিক-ওদিকে তাকায়, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে। এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়ায়, যেন তার পা মাটিতে গেঁথে গেছে। এই নির্জন গ্রাম্য নিশীথে একবার শ্রীলেখার নাম ধরে প্রচন্ড ভাবে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করে তার। শ্রীলেখা তাকে বড় দুঃখ দিয়ে গেছে। সূর্যর হাতে এখন অনেক কাজ, তার মধ্যে হরকুমারের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাই অগ্রগণ্য: নইলে সে শ্রীলেখাকে অত সহজে ছেড়ে দিত না।

একদিন সন্ধ্যে থেকেই টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল, মাঝ রাতে চেপে বৃষ্টি এলো। সূর্য যে-ঘরে শোয়, সে ঘরের চাল দিয়ে টিপটিপ করে জল পড়ে। সূর্য প্রথম কয়েকবার বিছানাটা এদিক-ওদিক টেনে সরিয়ে নেয়। তারপর দেখা গেল, কোনো দিকেই নিষ্কৃতি নেই। তখন সে সমুদ্রে শয্যা পাতার মতন মনোভাব নিয়ে বিছানাটা ঘরের মাঝখানে

রেখেই শুয়ে পড়ে হাত-পা ছড়িয়ে। পাশের গোয়ালঘরের গরুটাও ভিজছে, তার ঘন ঘন গা ঝটপটানির শব্দ শোনা যায়।

এই সময় দরজার ঝাঁপ ঠেলে লক্ষ্মী ঢুকলো ঘরে। নিবিড় বিস্ময়ে বললো, আপনি কি এই জলের মধ্যে শুয়ে আছেন?

আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো। সেই আলোয় ঝলসে উঠলো লক্ষ্মীর মুখ— উদ্বেগ মাখা দুটি চোখ, চিবুক দিয়ে জল ঝরছে, যেন নদীর স্রোতে ভেসে আসা একটা নাম না জানা ফুল। সূর্য একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে। এই আর একটি মুহূর্ত।

বিনা বাক্যব্যয়ে সূর্য বিছানা থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে লক্ষ্মীর কাঁধ দুটো চেপে ধরলো। জিজ্ঞেস করলো, এত রাত্তিরে তুমি এসেছো কেন? ঘুম ভেঙে গেল?

লক্ষ্মীর বিয়ের কথাবার্তা চলছে, তার সারা শরীরে লজ্জা। অবনত মুখে বললো, আমি জেগেই ছিলাম, ঘুম আসে নি।

সূর্য লক্ষ্মীর বুকের কাছে শাড়ীর আঁচল চেপে ধরে টান মারতে যাচ্ছিল। এখন পৃথিবীর কোনো শক্তি তাকে থামাতে পারবে না। এই বৃষ্টির নেশাভরা রাত্রে একটি মেয়েকে নিরালায় দেখলে একটি মাত্র চিন্তাই তার মনে আসে। তার রক্তের গতিবেগ বেড়ে যায়। কিন্তু আর একবার বিদ্যুৎ ঝলকে লক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকাতেই সূর্য থমকে গেল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাত সরিয়ে নিল। এও আর একটা মুহূর্ত। সূর্যর মনে হলো, মুখটি বড় অসহায়। এই মেয়েটি সূর্যকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে—এই স্বপ্ন ভেঙে যাবার যাতনা যে কত মর্মান্তিক তা ও জানে না।

সূর্য তাকে ধমক দিয়ে বললো, তুমি ঘরে যাও। আমি ঠিক থাকতে পারবো।

সূর্যর সারা জীবনে এই একবার মাত্র সংযমের পরিচয়। সে দিকবিদিক চিন্তা করে না, ভবিষ্যতে কখনো আর সে এরকম দুর্বলতার পরিচয় দেয় নি। লক্ষ্মীকে কেন সে ছেড়ে দিল তা সে নিজেই জানে না।

লক্ষ্মী তাকে কিছুতেই ঐ চালা-ফুটো ঘরে থাকতে দিল না, জোর করে নিয়ে এলো তাদের ঘরের বারান্দায়। এর দু'দিক খোলা হলেও মাথার ওপর দিয়ে জল পড়ে না—পাশ দিয়ে ঝাপটা আসে শুধু। সেইখানেই বিছানা পেতে দিল সূর্যর জন্য। বারবার বিছানাপত্র নিয়ে আসার জন্য উঠোন দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে নিজেই বেচারা ভিজে গেল একেবারে। কিন্তু সূর্যর জন্য কিছু একটা করতে পারায় তার জীবন যেন ধন্য। সূর্য শুয়ে শুয়ে সারারাত ভাবতে লাগলো শ্রীলেখার কথা। সে শুনেছে, শ্রীলেখার শ্বশুরবাড়ি খড়্গপুরে। সময় পেলে সে সারা খড়্গপুর শহরটা একবার চষে বেড়াবে।

পরদিন তমোনাশ ডাক্তার নিজেই এলেন এ ব্যাড়িতে। সূর্যকে ডেকে চোখ গরম করে রাগত স্বরে বললেন, আমি আসতে চাই নি। আমার ইস্ত্রি জোর করে পাঠালেন। তেনার ধারণা, তুমি রাগ করে নিজের বাড়ি থেকে চলে এসেছো। এখানে বেঘোরে মরবে, তাই তোমাকে সাবধান করে দেওয়া আমাদের কর্তব্য।

উপেন শঙ্কিত ভাবে জিজ্ঞেস করলো, কেন ডাক্তারবাবু, কি হয়েছে? আমার দাদাটি কোনো অপরাধ করেছেন?

তমোনাশ ডাক্তার বললেন, কোথায় কি করে এসেছেন সে জানার আমার দরকার নেই। এদের আমি ভালো করেই চিনি। গোঁয়ার ছোকরা যত সব। এই একজনের জন্য কি গ্রামসুদ্ধু লোক বিপদে পড়তে চাও?

—কেন? কেন?

—পুলিস একে ধরতে আসছে, পাকা খবর। আজই ওবেলায় এসে পড়বে। তারপর পুলিস কি তোমাকে ছাড়বে? বাড়ি সুদ্ধু সবাইকে চালান করে দেবে বলে দিচ্ছি।

—কেন, ইনি কি করেছেন?

—জানো না? এ তো খুনে আর ডাকাতের দলের লোক। স্বদেশী করার নাম করে এই সব করে। আমি এত করে বললাম আমাদের পথে আসতে।

সূর্য বললো, আপনি আমাকে এই গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিতে চান—সেটা আলাদা কথা—কিন্তু এই সব মিথ্যে কথা বলছেন কেন এ'দের।

—শোনো ছোকরা! এসব আমি বলি নি, পুলিসের রিপোর্ট। পুলিস তোমাকে শুধু সন্দেহ করে ধরছে না—বড়বাঁকিতে যে ডাকাতি হয়েছিল, তার সঙ্গে তোমার নাম জড়িয়েছে। মহকুমা থানায় আমাদের ইনফর্মার আছে, সে পাকা খবর এনেছে।

—এসব মিথ্যে কথা।

—সত্যি মিথ্যে আমি জানি না। তোমার দলের কে নাকি একজন ধরা পড়ে সব নাম ফাঁসিয়ে দিয়েছে।

সূর্য দ্রুত চিন্তা করতে লাগলো কে ধরা পড়েছে। ঠিক বুঝতে পারলো না। ব্রজগোপালের পক্ষে ধরা পড়া অসম্ভব— তার আগে তিনি আত্মহত্যা করবেন। তা হলে কে?

তমোনাশ ডাক্তার এবার সুর নামালেন। সূর্যর মুখের দিকে অবিচল দৃষ্টি ফেলে বললেন, এই বয়েস, এর মধ্যেই পুলিসের হাতে পড়লে একেবারে ছিবড়ে করে দেবে। আমার একটা কথা শুনবে?

—বলুন।

—এক্ষুনি জিনিসপত্তর গুছিয়ে নাও। আমার সঙ্গে চলো। আমার এক ভায়রা থাকে রাজগিরে—সেখানে তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেখানে বিশেষ জনমনিষ্যি নেই, কেউ তোমার খোঁজ করবে না, তার কোয়ার্টারে থাকবে—বছর খানেক ডুব মেরে থাকো। আমার ভায়রা ভালো লোক—সে যত্ন করে রাখবে।

সূর্য একটুক্ষণ মাত্র চিন্তা করলো। ব্রজগোপালকে কোনো খবর না দিয়ে সে কি এখান থেকে চলে যেতে পারে? দলের সবাই রয়েছে গোপনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে—সূর্য যদি হঠাৎ চলে যায়—তা হলে যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যাবে। সবাই কি ভাববে না যে, সে ভয় পেয়ে পালিয়েছে? বরং জেলে যাওয়ার চিন্তা তার মধ্যে খানিকটা উত্তেজনা জাগায়। জেলখানার অনেক গল্প সে শুনেছে—ভেতরটা কখনো দেখে নি।

মুখ তুলে সে বললো, না, আমার যাওয়া হবে না।

তারপর আধঘণ্টা ধরে তাকে বোঝানোর চেষ্টা হলো। তমোনাশ আর উপেন তো সূর্যকে বেশীদিন ধরে চেনেন না—সুতরাং বুঝবেন কি করে যে এ ছেলে একবার না বললে আবার হ্যাঁ বলানো কত শক্ত।

সূর্য জিদ ধরে রইলো, সে এখান থেকে যাবে না। সে বরং গাঁয়ের বটতলায় বসে থাকবে; সেখানে পুলিস এসে তাকে ধরে তো ধরুক। তা-হলেও তার দলের লোক তার সন্ধান পাবে।

শেষ পর্যন্ত উপেন বললো, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, মুরশীদের চর? সেখানে ওনাকে রাখা যাবে না?

ডাক্তার একটুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, সেখানে ও থাকতে পারবে?

খুব সাপখোপের উপদ্রব।

—তা বলে কি এনাকে পুলিসের হাতে দেওয়া যায়?

ডাক্তার কম্পিত গলায় বললেন, এরা বেঘোরেই মরতে চায়। তুমি আমি কি করবো বলো?

একখানা মাঠ ও খানিকটা জঙ্গল পেরিয়ে সূর্যকে তক্ষুনি নিয়ে যাওয়া হলো মুরশীদের চরে। অনেকখানি জলা জায়গার মধ্যে কিছুটা অংশ উঁচু হয়ে আছে, শর আর নলখাগড়ার ঝাড় চতুর্দিকে। মাঝে মাঝে গর্ত ও কেঁচোর মাটি তোলা। দুটি ছাতিম গাছ পাশাপাশি দুই বন্ধুর মতন দাঁড়িয়ে। তার নীচে চারটা খুঁটির ওপর খড়ের চালা, কোনো দেয়াল নেই। মনে হয়, এইখানে আগে কখনো কেউ থেকেছে। সেইখানে একটা শতরঞ্চি ও বালিশ পেতে দেওয়া হলো। উপেন বললো, পুলিসের বাপের সাধ্য নেই, আপনাকে এখান থেকে খুঁজে বার করে। থাকতে পারবেন তো দাদা?

সূর্য ঘাড় নেড়ে বললো, ঠিক আছে। আপনি আমাকে মাঝে মাঝে খবর দিয়ে যাবেন। ব্রজগোপালদা যদি আসেন—

উপেন বললো, মাঝে মাঝে মানে? আমি রোজ আসবো। আপনার খাবার নিয়ে আমাকে আসতে হবে না?

উপেন চলে যাবার পর সূর্য কোমর থেকে রিভলবারটা বার করে হাতে নিয়ে জায়গাটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো।

॥ ৩৬ ॥

নীচের তলায় খুটখাট করে আওয়াজ হচ্ছে, বড়বাবু তিনতলা থেকে চেঁচিয়ে ডাকলেন, রতন, রতন?

কেউ কোনো সাড়া দিল না। গোটা বাড়িটা অন্ধকার। আলো জ্বালার উপায় নেই, বড়বাবু একটা টর্চ নিয়ে নেমে এলেন নীচে। বাড়িতে আর একটিও জনমনুষ্য নেই, পরপর ঘরগুলো তালাবন্ধ। রতনই একমাত্র সঙ্গী, ঠাকুর ও চাকরের কাজ করে—সে ছোকরারও মাঝে মাঝে বাইরে রাত কাটানোর স্বভাব আছে। কোথায় নাকি সে যাত্রা শুনতে যায়—এই ব্ল্যাক আউটের মধ্যেও কোথায় যাত্রা হয় কে জানে। বড়বাবু দু' একবার ধমক দেওয়ায় সে এখন না বলেই যেতে শুরু করেছে। ছাড়িয়েও দেওয়া যায় না—এখন লোক পাওয়া বড় মুশকিল।

বড়বাবু একতলার ঘরগুলো ভাড়া দিয়েছেন সিভিল সাপ্লাই দপ্তরকে। রাত্রে ওদের কেউ থাকে না। বড়বাবু নীচে এসে দেখলেন, সদর দরজাটা ভেজানো—তালা খুলে বেরিয়ে গেছে রতন। এ রকম ভাবে এত রাত্রে দরজা খুলে রাখা যায় না—চোর ডাকাতের উপদ্রব ইদানীং খুব বেড়েছে। রতন বাইরেই থাক—তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন।

এত বড় বাড়িতে আর দ্বিতীয় মানুষ নেই—অদ্ভুত রকমের নিস্তব্ধ—বড়বাবু নিজেই নিজের পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন। দোতলার খুটখাট শব্দটা এখন থেমেছে—তবু একবার দেখা দরকার। মাত্র কয়েক মাস আগেও এ বাড়ি লোকজনে ভরা ছিল, এই সময়টা আড্ডা হতো খাবার ঘরে। এখন গোটা কলকাতাটাকেই মৃত শহর বলে মনে হয়।

চাবির তোড়া নিয়ে বড়বাবু একটার পর একটা ঘর খুলে দেখতে লাগলেন। এটাই ছিল প্রিয়রঞ্জনের ঘর—এখন সম্পূর্ণ খালি, কোনো আসবাবও নেই। চিররঞ্জনের ঘরে তবু কিছু কিছু জিনিসপত্র রয়ে গেছে। দেয়ালে ঝুলছে বাদলের ঘুড়ি আর লাটাই। এগুলো সঙ্গে নেবার জন্য ছেলেটা অনেক কান্নাকাটি করেছিল, কিন্তু মাল-পত্র বেশী হয়ে যাওয়ায় তাকে নিতে দেওয়া হয় নি। জানলা দরজা অনেকদিন বন্ধ বলে ঘরের হাওয়ায় একটা গুমোট গন্ধ। মেঝেতে ধুলো জমেছে, তার ওপর সরু সরু দাগ। বড় বড় ইঁদুরের উপদ্রব হয়েছে খুব। তারাই শব্দ করে—ফাঁকা বাড়িতে সামান্য শব্দও অনেক বেশী মনে হয়। টর্চের আলো ফেলে ফেলে বড়বাবু প্রত্যেকটা কোণা ঘুপচিও খুঁজে খুঁজে দেখলেন।

সূর্যের ঘরে তার জিনিসপত্র সবই ঠিকঠাক রয়েছে, তার বিছানা, তার বই খাতা, আলনায় ঝুলছে জামা-প্যাণ্ট—ছেলেটা প্রায় কিছুই সঙ্গে নিয়ে যায় নি। এত অল্প বয়েসেই ছেলেটার এত অনাসক্তি। বড়বাবুর আজকাল প্রায়ই মনে হয়, সূর্যর সঙ্গে তাঁর আর দেখা হবে না। আগে তিনি ছেলের কথা বিশেষ ভাবতেন না—গত কয়েকমাস ধরে বড্ড মায়া পড়ে গেছে—ঐ বয়েসে এসে ছেলেটা খুব উদভ্রান্ত, বড়বাবু নিজেও ঠিক ঐ রকম ছিলেন।

এক সময় বাড়িটা গম গম করতো, এখন সবাই চলে গেছে। বড়বাবুর কোথাও যাবার নেই। জীবনটা যদি ফাঁকা হয়ে যায়—তা হলে যেখানেই যাও, সবই তো একরকম।

কোনো ঘরেই কিছু নেই, সুতরাং ইঁদুরেই শব্দ করছে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বড়-বাবু ঘরগুলোর দরজায় আবার তালা লাগিয়ে উঠে এলেন ওপরে। খানিকটা পরেই আবার শুনতে পেলেন সেই রকম খুটখাট খুটখাট আওয়াজ—ইঁদুর বা বেড়ালের চেয়েও বেশী সবল কোনো প্রাণীর উপস্থিতির মতন। বড়বাবু খানিকক্ষণ কান খাড়া করে শুনলেন, কিন্তু গ্রাহ্য করলেন, না। ফাঁকা বাড়িতে এরকম অনেক শব্দই হয়—হয়তো ভূত প্রেতই আসে, আসুক, আর তো কিছু করছে না তারা।

এতগুলো ঘর খালি থাকা সত্ত্বেও বড়বাবু তিনতলায় নিজস্ব ঘরটা ছাড়েন নি। রতন কখনো সারা রাত বাইরে থাকলে তিনি নিজেই ভোরবেলা এখানে স্পিরিট ল্যাম্প জেবলে চা তৈরি করে নেন। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম কমে গেছে। অনেক রাত না হলে ঘুম আসতে চায় না—আবার ঘুম ভেঙে যায় খুব ভোরে। বড়বাবু বালিশে আধো হেলান দিয়ে বই খুলে বসলেন। ঘরের সমস্ত জানলা বন্ধ, আলোয় ঠুলি পরানো—সামান্য আলোর রশ্মি বাইরে গেলেই এ আর পি'র ছেলেরা হুইস্‌ল দেয়, চ্যাঁচামেচি করে। হাতিবাগানের পর খিদিরপুরে আর একবার এলোপাথাড়ি বোমা ফেলে জাপানীরা চুপ করে গেছে।

বড়বাবুর সময় আর কাটতেই চায় না। সারা দিনটা এখন প্রায় তিনি বাগবাজারের অনাথ আশ্রমেই কাটান। তত্ত্বাবধায়করা অনেকেই পালিয়েছে—ছেলেগুলোর খুবই দুরবস্থা। যুদ্ধের বাজারে অজস্র চাকরি, বড়বাবু কিছু কিছু ছেলেকে চাকরির ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। সন্ধ্যের পর তাঁকে বাড়ি ফিরে আসতেই হয়—এমনিতেই তিনি একটু রাত কানা, এখন এই অন্ধকারের মধ্যেই একা একা রাস্তায় হাঁটা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তারপর সন্ধ্যে থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত এত বড় ফাঁকা বাড়িতে তাঁকে একা থাকতে হয়। একে একে সবাই যখন চলে যাচ্ছে—তখন এত বড় বাড়ির আর দরকার কি—যুদ্ধ থেমে গেলে তিনি এ বাড়ি বিক্রি করে দেবেন। এখন এ বাড়ি কেনার খদ্দের নেই।

এক সময় বিরক্ত হয়ে বড়বাবু হাতের বইখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এত কম আলোয় তাঁর পড়তে অসুবিধে হচ্ছে—তা ছাড়া মায়া ও ইনকাদের সভ্যতা বিষয়ক যে-বইটি তিনি পড়ছিলেন, তার লেখক ইনিয়ে বিনিয়ে বারবার প্যাগানদের সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ানিটির তুলনা না করে পারছেন না।

আলো নিবিয়ে বড়বাবু বেরিয়ে এলেন ছাদে। গতকাল পূর্ণিমা ছিল, আজও জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে আকাশ। ব্ল্যাক আউটের উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যর্থ করে দিচ্ছে। বড়বাবু কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন অন্যমনস্কভাবে, তারপর ছাদের এক কোণে এসে থেমে গেলেন। কার্নিশ থেকে একটা অশথের চারা উঠেছে। কিছুদিন আগে একবার এখান থেকে একটা অশথ গাছ কেটে দিয়েছিলেন—কিন্তু এই গাছ বড় জেদী—আবার উঠেছে মাথা ফুঁড়ে! বাড়িটা এমন কিছু পুরোনো নয়—তবু কি এরা টের পেয়ে গেছে যে এটার পোড়ো বাড়ির দশা হতে আর দেরি নেই! বড়বাবু হাত দিয়ে টেনে অশথ গাছটাকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। বয়েস অনেক হলো, এখন আর হাতে তেমন জোর পান না—তা ছাড়া এ গাছগুলোর শিকড়ে সাঙ্ঘাতিক জোর।

বয়েস অনেক হলো, এবার কোনো একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। যেতে হবেই, মায়া বাড়িয়ে তো আর লাভ নেই। দুঃখ করারও কিছু নেই তাতে। অনেকগুলো বছর তো কাটলো। জন্ম রাত্রেই যে ছেলের মা মারা যায়, সেই ছেলের তো বেঁচে থাকার কথা ছিল না। তার বদলে সে পেয়েছে বিশাল একখানা জীবন এবং অনেক কিছু। বড়বাবুর মনে হলো এই রকম কোনো রাত্রে যদি তিনি হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন—তা হলে কি হবে? দেখবার কেউ নেই, মরতে হবে একা একা। সদর দরজা বন্ধ, রতন ঢুকতে পারবে না। তাঁর মৃত দেহটা পড়ে থাকবে—পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াবে তাঁর চোখে, ইঁদুর আরশোলারা তাঁর শরীর কুরে কুরে খাবে। শেষ পর্যন্ত সিভিল সাপ্লাই অফিসের লোকেরা যদি কোর্টের ইনজাংকশন নিয়ে দরজা খুলে ঢোকে। এই চিন্তায় বড়বাবু মোটেই ভয় পেলেন না—বরং একটু মুচকি হাসলেন। হাসপাতালে গিয়ে ভুগে ভুগে মরার চেয়ে, তিনি তাঁর মৃত্যুটাকে একটু নাটকীয় করে দেখতে চাইছেন।

আকস্মিকভাবে বুলবুলের মৃতদেহটা ভেসে উঠলো তাঁর চোখের সামনে। বুল-বুল, যার পোশাকী নাম ছিল নাসিম আরা বানু, সূর্যর মা। বুলবুল বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। মৃত্যুর পরও বুলবুলের চেহারা একটুও বদলায়নি। ঘুমের থেকেও প্রগাঢ় মৃত্যু তার রূপকে যেন একটা মহিমা দিয়েছিল। অসহ্য সুন্দর ছিল বুলবুল, এ যেন ছাঁচে গড়া মানুষ নয়—আলাদা কোনো শিল্পীর বহু যত্নের সৃষ্টি। মৃত বুলবুলকে দেখে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন গল্পের সেই স্নো হোয়াইটের মতন; কোনো রাজকুমারের স্পর্শে আবার জেগে উঠবে। অমরনাথ তাকে আর জাগাতে পারেন নি। বুলবুলের হাত ধরে বার বার ঝাঁকানি দিতে দিতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বুলবুল, এ কি করলে, এ কি করলে!

কোনো উত্তর দেয়নি বুলবুল, তার মৃত্যুর কোনো কারণ রেখে যায়নি। বুলবুলের মৃত্যুতেও কাঁদতে পারেন নি অমরনাথ, কান্নার চেয়েও আরও বেশী কিছু জমে ছিল বুকের মধ্যে, তাই বুকে অসহ্য ব্যথা। সেই অসহ্য ব্যথায় বারবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে-ছিলেন, কিন্তু চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়ে নি। সূর্যর তখন তিন বছর বয়েস, মায়ের মৃত্যু সম্পর্কে তার কোনো বোধই হলো না।

পূর্ণিমাকে ছেড়ে বুলবুলকে ভালোবেসে হয়তো সামাজিকভাবে একটা অপরাধ করেছিলেন অমরনাথ—কিন্তু এ ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না। বাল্যকাল থেকেই তিনি পরের ঘরে মানুষ, পরের দয়ায় স্নেহে প্রতিপালিত হয়েছেন—নিজের রক্তের সম্পর্কের কারুকে দেখেন নি কখনো। তবু তিনি হেরে যাননি, মিশে যাননি সাধারণ ম্যাটমেটে মানুষের ভিড়ে। প্রথম যৌবনে পূর্ণিমাকে ভালো লেগেছিল, সমাজকে তুচ্ছ করে বিয়ে করেছিলেন পূর্ণিমাকে। তিনি বুঝেছিলেন, আধুনিক মানুষের সমাজ অর্থের কাছে নতজানু। সুতরাং তাঁর অর্থ চাই। প্রথম থেকেই চাকরি বাকরির জন্য লালায়িত না হয়ে ব্যবসায় মন দিয়েছিলেন। এক সময় উপার্জন করেছেন অগাধ অর্থ—অমনি সমাজ তাঁকে মাথায় তুলে নাচতে চেয়েছে। কেউ তাঁর পূর্ব পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন করে নি—বরং উপযাচক হয়ে এসেছে ক্লাবের সভাপতি করতে, শ্রাদ্ধ-বিবাহের অনুষ্ঠানে তাঁর জন্য বিশেষ শ্রদ্ধার আসন।

তবু অমরনাথের মনে হয়েছিল, এরপর কি? মানুষের আর কি কিছু পাওয়ার নেই? তৃপ্তি পাননি কখনো অমরনাথ। পূর্ণিমাও আর তাঁকে ঠিক সঙ্গ দিতে পারছিল না। প্রথম যৌবনে পূর্ণিমার মনটা ছিল খুব কল্পনাপ্রবণ, অমরনাথকে ঘিরে তার অনেক স্বপ্ন ছিল। কিন্তু অমরনাথের যত অর্থ প্রতিপত্তি বাড়তে লাগলো—ততই সেই মোহে জড়িয়ে পড়লো পূর্ণিমা। বাল্য বয়সে বিধবা হয়ে অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করেছে পূর্ণিমা—তাই সামাজিক সম্মান পাবার জন্য একটা কাঙালপনা ছিল তার মধ্যে। এক সময় পূর্ণিমা ছোট ছোট কবিতা রচনা করতো—সেসব ছেড়েছুড়ে উৎসব নেমন্তন্নে এক গা গয়না পরে যাওয়াই তার কাছে বেশী গর্বের ছিল। অমরনাথ পূর্ণিমার এই ছেলেখেলা দেখে তাকে রাশি রাশি গয়না দিয়েছেন, দেখতে চেয়েছেন শেষ পর্যন্ত আশা মেটে কি না। মেটেনি।

পূর্ণিমার আর একটা দুঃখ ছিল সন্তান সম্পর্কে। একবার একটি মেয়ে হয়ে মারা যায়। আর কোনো সন্তান হয়নি। অমরনাথ ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে বলেছিলেন, পারে কি পূর্ণিমা! পূর্ণিমার সেই দুঃখ ক্রমশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠলো—অমরনাথ সরে গেলেন তার কাছ থেকে।

তারপর কিছুদিন সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গ করলেন অমরনাথ। নকল সাধু ছেড়ে খুঁজে বেড়িয়েছেন আসল সাধু। সবাই তাঁকে বলেছেন, অত প্রশ্ন করো না, মেনে নাও। মেনে নেওয়াতেই শান্তি। কিন্তু অমরনাথের প্রশ্ন থামেনি। এক সময় বিরক্ত হয়ে ওদের পরিত্যাগ করলেন। গান বাজনার চর্চা করতেন ছেলেবেলা থেকেই, কিছু-দিন তাতেই মেতে উঠলেন আবার। সেই সূত্রে বুলবুলের সঙ্গে দেখা।

বুলবুলকে যখন তিনি প্রথম দেখেন, তাঁর মনে হয়েছিল মানুষ নয়, একটা পুতুল। প্রথম প্রথম বেশী আকৃষ্ট হননি তার দিকে, বরং তার নাচের লয়ে কোথাও কোথাও ভুল হলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। বড়লোকের অশিক্ষিত ছেলেরাই বেশী মাতামাতি করতো বুলবুলকে নিয়ে—এবং সেই সব হইহল্লাই বেশী ভালো বাসতো বুলবুল। একদিন কি কারণে যেন বুলবুলের মন খারাপ ছিল, তার সেই বিষণ্ণ মুখখানা দেখে অমরনাথ যেন একটা ধাক্কা খেলেন। বুলবুলকে এ রকম অবস্থায় কখনো দেখা যেত না—তাই বোঝা যায় নি, বিষণ্ণ হলে তাকে কত সুন্দর দেখায়। অমরনাথের মনে হয়েছিল, যেন রূপের ঝাপটা এসে লাগছে তার গায়। তিনি টের পেলেন, রূপেরও একটা পরি-শুদ্ধ করার ক্ষমতা আছে। রূপের সামনে এসে সব সময় যে শুধু রক্ত জ্বলে ওঠে তাই নয়, অনেক সময় মনটা অনেক শান্ত হয়ে যায়, অনুভূতি অনেক সূক্ষ্ম হয়।

এই রূপকে নিজের হাতে পাবার একটা তীব্র ইচ্ছে, কারুর কারুর ক্ষেত্রে নিজেকে মানুষ হিসেবে মহত্তর করে তোলার বাসনাও জাগায়। দুর্বৃত্তরা চায় রূপ কেড়ে নিতে—কেউ কেউ চায় তা পাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠতে—যে যোগ্যতার কোনো মাপকাঠি নেই। অমরনাথ মনস্থির করে ফেললেন।

পূর্ণিমাকে তিনি খোলাখুলিই বলেছিলেন সব। এ প্রস্তাবও দিয়েছিলেন যে, পূর্ণিমা ইচ্ছে করলে বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে পারে—তাকে তিনি বিষয় সম্পত্তির একটা বড় অংশ দিয়ে দেবেন। পূর্ণিমা রাজি হয় নি। একবার বিধবা ছিল, দ্বিতীয়বার স্বামী পরিত্যক্তা হতে চায় নি—অন্তঃসারশূন্য সম্পর্ক নিয়েও বাইরের ঠাট বজায় রাখতে চেয়েছিল।

ইয়ার বক্সিদের হাত থেকে বুলবুলকে ছাড়িয়ে নিতে কম হাঙ্গামা পোয়াতে হয়নি অমরনাথকে। সেই কারণেই তাঁকে এলাহাবাদের বাস তুলে দিয়ে গোয়ালিয়ারে চলে আসতে হয়। কাছাকাছি পাবার পর দেখা গেল, বুলবুল অত্যন্ত জেদী আর অভিমানী, ভেতরটা তার শিশুর মতন অপরিণত। অমরনাথকে পেয়ে সে আর সব কিছু ছাড়লো, নাচের মুজরো নেবার বদলে সে বুঝতে পারলো তাকে আরও শিখতে হবে। শেখার শেষ নেই। নিছক নর্তকীর বদলে সে শিল্পী হয়ে উঠলো আস্তে আস্তে।

পূর্ণিমা কোনোদিন বুলবুলের মুখ দর্শন করতে চায় নি, কিন্তু বুলবুলের সন্তান হবার পর পূর্ণিমা নিজে থেকে তার বাড়িতে গিয়েছিল ছেলের মুখ দেখতে। তাতে বুলবুল একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ে। পূর্ণিমা কেনই বা নিজে থেকে গেল, কেনই বা বুলবুল তাতে এত অভিভূত—এটা বুঝতে পারেন নি অমরনাথ। সন্তানের ব্যাপারে মেয়েদের মনের এই জটিল গতি কোনো দিন তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় নি। এর পর থেকেই বুলবুল অনেক বদলে গেল—তার সঙ্গে এমন ভাব হয়ে গেল যে, যেন অমরনাথ আর কেউ না। তাঁর সঙ্গে কথা বলারও সময় নেই।

এর পর বুলবুল আবার জেদ ধরলো যে অমরনাথ শুধু পূর্ণিমাকে নিয়েই থাকুক, সে অন্য কোথাও চলে যাবে। পূর্ণিমার প্রতি অবিচার করা হচ্ছে—এতে তার পাপ হবে। অমরনাথ কিছুতেই বোঝাতে পারলেন না, এক কথায় এ রকম ফেরা যায় না। তা ছাড়া, তিনি স্বার্থপর—নিজের ভালো লাগা মন্দ লাগার মূল্যই তাঁর কাছে সব চেয়ে বেশী। বুলবুল তখন ইচ্ছে করে অমরনাথকে আঘাত দেবার জন্য বাড়িতে আসর বসাতে শুরু করলো—রাজ পরিবার থেকে তার ডাক আসায় সে অরমনাথের কথা অগ্রাহ্য করে সগর্বে চলে গেল সেখানে নাচতে। অমরনাথ প্রত্যেক দিন তার কাছে যান, বুলবুল তাঁকে ফিরিয়ে দেয়। নারীর মন বড় বিচিত্র—এ বোঝা সহজ কাণ্ড নয়, অমরনাথ বুঝতে পারলেন না বুলবুলকে। একদিন তিনি সত্যিই বুলবুলের কাছে যাওয়া বন্ধ করলেন, মনস্থির করে ফেললেন যে, এবার বুলবুলকে ভুলে যেতে হবে। আর পাঁচজনের সঙ্গে এক আসরে বসে বুলবুলের নাচ দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

এত করে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে চাইছিল বুলবুল, কিন্তু সত্যিই যেদিন দেখলো অমরনাথ তাকে ছেড়েছে, সেদিন খুব খানিকটা কাঁদলো তারপর ছেলেকে পূর্ণিমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে বিষ খেল। যেন একটা ছেলেখেলা। যেন বিষের নাম অভিমান, কেউ এসে তার মান ভাঙাবে। কবরখানার অন্ধকার গহ্বরে চলে গেল বুলবুল।

বড়বাবু সেই নিস্তব্ধ বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। যেন এই মৃতের শহরে তিনি একা জেগে আছেন। সারা জীবন তিনি মানুষের সঙ্গ

চেয়েছিলেন, ঈশ্বরকে চেয়ে নিরালা হয়ে যান নি—তবু সবাই একে একে তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি মনে মনে বললেন—একটা জীবন কেটে গেল, তবু আমি মানুষের জীবনের মর্ম কি তা বুঝতে পারলাম না। সত্যিই কি কোনো মর্ম আছে, না কোনোক্রমে দিন কাটিয়ে যাওয়াই সব?

॥ ৩৭ ॥

বিয়ের পর শ্রীলেখা প্রায় একটা অকুল সমুদ্রে এসে পড়লো। এর আগে সে কখনো মা বাবাকে ছেড়ে থাকে নি, বিয়ের পরই তাকে একেবারে কলকাতা ছাড়তে হলো। খড়্গপুর শহরের প্রান্তে তার শ্বশুর বাড়িটি বেশ বড় এবং মানুষজনে ভর্তি। শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর, ভাসুর, ননদ তাদের ছেলেপুলে, ঝি চাকর মালি সব মিলিয়ে এক এলাহী কাণ্ড। নতুন বউ হিসেবে কয়েকদিন সে একটু আলাদা খাতির যত্ন পাবার পর সেই ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

এ বাড়ির লোকদের স্বভাব সর্বক্ষণ হুকুম করা। নতুন বউ, তোয়ালেটা নিয়ে এসো তো! বউদি, মশলার কৌটোটা একটু দিন না। কাকীমা, আমার জামাটা একটু ওপর থেকে এনে দিন—এইসব শুনতে শুনতেই সর্বক্ষণ তাকে দৌড়োদৌড়ি করতে হয়। শ্রীলেখা সবার হুকুম তামিল করার জন্যই তৈরী—কিন্তু মুশকিল হয় যখন একই সঙ্গে দু'জনের হুকুম হয়। একজন বললে, নীচতলা থেকে শাশুড়িকে ডেকে দিতে, আর একজন বললে, ওপর থেকে বাগানের গেটের চাবিটা এনে দিতে—তখন কোনটা আগে করতে হবে শ্রীলেখা বুঝতে পারে না।

এর ওপর আছে তার স্বামী। শ্রীলেখা তার মা কাকীমার মুখে শুনে শুনে বুঝে নিয়েছে যে, একান্নবর্তী পরিবারের বউরা দিনের বেলা স্বামীর সঙ্গে দেখা করে না। সেই অনুযায়ী শ্রীলেখা সকালবেলা নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে পারতপক্ষে আর সেখানে ঢুকতে চায় না। কিন্তু তাকে বারবার আসতে হয়।

শ্রীলেখার স্বামী প্রভাসকুমার মানুষটি বিচিত্র প্রকৃতির। তাঁর শখ হচ্ছে এম এ পরীক্ষা দেওয়া। ইতিমধ্যেই তিনি ইংরেজি ও বাংলায় এম এ পাশ করেছেন, এখন তৈরী হচ্ছেন ঐশ্লামিক ইতিহাসে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। কি উদ্দেশ্যে এই ডিগ্রী অর্জন, তা কেউ জানে না। না জানুক, তবু প্রভাসকুমারের দারুণ সম্ভ্রম সকলের কাছে। এ বাড়িতে আর কেউ গ্র্যাজুয়েট পর্যন্ত নেই, সেখানে এক ছেলে ডবল এম এ ছাড়িয়ে ট্রিপল এম এ হতে যাচ্ছে! তারপরও প্রভাসকুমার আবার সংস্কৃততে পরীক্ষা দেবার ইচ্ছে জানিয়ে রেখেছেন। পড়াশুনোর কারণে প্রভাসকুমারকে বাড়ির কোনো কাজ কখনো করতে বলা হয় না।

প্রভাসকুমারের রোগাটে লম্বা চেহারা, রোগা বলেই তাঁকে দৈর্ঘ্যের চেয়েও বেশী লম্বা দেখায়। গায়ের রং এত ফর্সা যে মনে হয় স্বচ্ছ। খাঁটি সোনার ফ্রেমের গোল চশমা, ঘাড় পর্যন্ত বাবরি চুল। মানুষটি শৌখিন, ধপধপে সাদা পাঞ্জাবি ও ধুতি ছাড়া আর কিছু পরেন না। সকালবেলা থেকেই সেজেগুজে থাকেন অথচ ঘর থেকে বেরুতে দেখা যায় কদাচিৎ। তাঁর চা জলখাবার এ ঘরেই আসে। টেবিলে বহু বইপত্র ছড়িয়ে প্রভাসকুমার ছিমছাম ভাবে বসে থাকেন, চোখের দৃষ্টি খোলা গ্রন্থের দিকে স্থির নিবদ্ধ। যখন তাঁর ঘন ঘন হাঁটু দোলে, তখন বোঝা যায়, তিনি কবিতা রচনা

করছেন।

হ্যাঁ, প্রভাসকুমার একজন কবি। ভারতবর্ষ ও সচিত্র শিশির পত্রিকায় তাঁর একাধিক কবিতা কণা ছাপা হয়েছে প্রবন্ধ ও গল্পের পাদদেশে। কলেজে পড়ার সময়েই তিনি 'বাতাসে কার ব্যাকুলতা' নামে একটি পাতলা কাব্য পুস্তক নিজ ব্যয়ে ছাপিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা আড়াই লাইন শুভেচ্ছা বাণীও তাঁর কাছে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। প্রভাসকুমারের গোপন বাসনা কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনাতেই জীবন অতিবাহিত করা। ইদানীং অবশ্য কাব্যলক্ষ্মী ও শ্রীলেখা মিলেমিশে গেছে।

পরীক্ষার পড়া করতে করতে প্রভাসকুমারের মন মাঝে মাঝে উদাস হয়ে যায়, চোখ চলে যায় বাইরে। এখান থেকে দেখা যায় রেল লাইন, টেলিগ্রাফের তারে বসে ফিঙে ল্যাজ নাড়াচ্ছে, এইটুকু দৃশ্য দেখেই প্রভাসকুমারের হৃদয় এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে যায়। ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি ডাকলেন, শ্রীলেখা—!

প্রভাসকুমার কখনো উচ্চকণ্ঠে কথা বলেন না—তাঁর গলার স্বর একটু দূরে থেকে শোনা যায় না—সেই জন্যই কাছাকাছি একজন বাচ্চা চাকর থাকে সব সময়। সে শুধু প্রভাসকুমারের ফুটফরমাজ খাটার জন্যই নিযুক্ত। সে তক্ষুনি ছুটে চলে যায়, শ্রীলেখাকে ডেকে আনে। সারা দিনে এ-রকম দশ বারো বার।

প্রভাসকুমারের টেবিলের কাচের নিচে একটি লম্বা কাগজে এই কয়েকটি শব্দ পরপর লেখা আছে ঃ

রেখা
শেখা
দেখা
ব্যাঁকা
একা
কেকা
খাঁ খাঁ
জুলেখা
ঠেকা
আঁকা

বলাই বাহুল্য, এই শব্দগুলি শ্রীলেখার নামের সঙ্গে মিল দেবার জন্য। কবিতা রচনার সময় যদি হঠাৎ মিল না মনে আসে সেই জন্য আগে থেকেই এই ব্যবস্থা। এই তালিকা ক্রমেই বাড়ে।

শ্রীলেখাকে ডাকার পরেই প্রভাসকুমারের হাঁটুর দোলানি বেড়ে গেল। মোটা বাঁধানো খাতায় তিনি কবিতা রচনায় মগ্ন, এক-একবার তাকাচ্ছেন দরজার দিকে, অত্যন্ত উত্তেজনায় তাঁর কপালে ও ওষ্ঠের ওপরে ঘাম জমে যাচ্ছে।

শ্রীলেখা লজ্জাবনত মুখে দরজার কাছে দাঁড়ালো। শাশুড়ি ননদ ভাজদের মধ্যে গিয়ে চাকর তাকে বলে যে দাদাবাবু ডাকছেন, তখন লজ্জায় তার মাথা কাটা যায়। অন্যরা মুখ টিপে হাসে আর তাড়া দেয়, শিগগির যাও! দেরি হলে উনি রাগ করবেন!

প্রভাসকুমারের বয়স শ্রীলেখার অন্তত দ্বিগুণ। সেই জন্যই শ্রীলেখা এখনো ও'র সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারে না। ব্যবহারের জড়তা কাটে না কিছুতেই।

প্রভাসকুমার মুখ তুলে বললেন, শ্রীলেখা, আজকের সকালটা কি সুন্দর?

শ্রীলেখা চুপ করে রইলো। প্রভাসকুমার জানলা দিয়ে আকাশ, রেল লাইন ও

ভূ-প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আবার বললেন, আজকের দিনটা কি সুন্দর!

শ্রীলেখা অস্ফুট গলায় বললো, আপনি আমাকে ডেকেছেন?

—হ্যাঁ।

—কিছু বলবেন?

—না।

—আমি তাহলে এবার যাই?

—তুমি কি করছিলে?

—আমি জল খাবারের লুচি বেলছিলাম।

প্রভাসকুমার ভুরু কোঁচকালেন। এমন সুন্দর সকালবেলা খাদ্যদ্রব্যের মতন গদ্যময় ব্যাপারের নাম উচ্চারণ তাঁর পছন্দ হয় না। তিনি বললেন, এদিকে এসো। আমার কাছে এসে একটু বসো—

—মাকে বলে আসি?

—বলতে হবে না। পরে যেও। বারবার তোমাকে ডাকি কেন জানো? তোমার নামটা উচ্চারণ করতেই ভালো লাগে। আহা, কি সুন্দর নাম।

লজ্জায় শ্রীলেখার মুখ অরুণবর্ণ হয়ে গেল। চিবুক ঠেকলো বুকে। এসব কথায় কি উত্তর দিতে হয় সে জানে না, কখনো তো এরকম কথা শোনে নি।

প্রভাসকুমার কোঁচার খুট দিয়ে মুখের ঘাম মুছে বললেন, কী সুন্দর তোমার ভুরু দুটি। যেন দুটি পাখির ডানা—। কালিদাস কি বলেছেন জানো?

বিয়ের পর এই চার মাসের মধ্যে শ্রীলেখা এই সব কথা কতবার যে শুনেছে তার ইয়ত্তা নেই—এমনকি কালিদাসের সংস্কৃত শ্লোকও তার মুখস্ত। সে ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইলো।

প্রভাসকুমার উঠে এসে শ্রীলেখার কাছে দাঁড়ালেন। ক্যামেরাম্যানের ভঙ্গিতে বললেন, একটু হাসো, একটু কথা বলো।

—কি বলবো?

—মন যা চায়। এমন সুন্দর সকালবেলা, মনের মধ্যে কি কোনো কলগুঞ্জন হয় না? আহা জয়দেব লিখেছেন—

বদসি যদি কিঞ্চিদপি
দন্তরুচি কৌমুদি
হরতি দরতিমিরমতি ঘোরম
স্ফুরদধরসীধবে
তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরম্!

শ্রীলেখা আমি চকোর, আমি চকোরের মতন চেয়ে আছি তোমার মুখের দিকে, একটু হাসো!

প্রভাসকুমার শ্রীলেখার খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকলেও তার অঙ্গ স্পর্শ করছেন না। দিনের বেলা ওসব না—এ সম্পর্কে প্রভাসকুমারের কঠোর নিয়ম আছে। তা ছাড়া তিনি কবি মানুষ, রূপ সুধা দু'চোখ দিয়ে পান করলেই তাঁর মন ভরে যায়।

খানিকটা বাদে শ্রীলেখা বললো, আমি এবার যাই?

প্রভাসকুমার উদাস ভাবে বললেন, আচ্ছা যাও। লুচির সঙ্গে একটু ছানা পাঠিয়ে

দিও, আমি বেগুন ভাজা টাজা খাই না।

রাত্তিরেও প্রভাসকুমার শ্রীলেখাকে প্রায় ঘুমোতেই দেন না। তাঁর নিজের ঘুমের প্রয়োজন খুব কম—তা ছাড়া, পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে, কিংবা কাব্যরচনার সময় যখন তিনি খুবই ভাবে বিভোর হয়ে যান—তখন খানিকটা করে ঘুমিয়ে নেন। রাতের এক টানা ঘুম তাঁর না হলেও চলে। এদিকে, সারাদিন খাটা খাটনি করে রাত্তিরে বিছানায় শুলেই শ্রীলেখার চোখ জড়িয়ে আসে ঘুমে। দুপুরেও সে ঘুমোবার একটুও সুযোগ পায় না। কিন্তু প্রভাসকুমার শ্রীলেখার ঘুম দেখে আশ্চর্য হয়ে যান। এমন জ্যোৎস্না উঠেছে, এই সময় কেউ ঘুমিয়ে নষ্ট করে? শ্রীলেখার হাত ধরে তিনি নিয়ে আসেন বারান্দায়, আকুল ভাবে বলেন, ওঃ, দেখো দেখো, পুকুরের জলে চাঁদের আলো পড়েছে, কী অপূর্ব, কী অপূর্ব!

শ্রীলেখা ঘুমে আঠা হয়ে আসা চোখে তাকিয়ে থাকে সেদিকে। এক এক সময় তার দৃষ্টিভ্রম হয়। মনে হয় যেন মাঠের মধ্যে কে একজন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, তারই দিকে চেয়ে আছে এক দৃষ্টে। কখনো মনে হয়, এগিয়ে আসছে কে যেন। ভালো করে চোখ কচলে দেখে বোঝা যায়, কেউ না। নীরব বৃক্ষের ছায়া, নিথর জল—যা আবহমান কাল ধরে একই রকম।

প্রভাসকুমার আঙুল দিয়ে শ্রীলেখার থুতনিটা উঁচু করে তুলে বলেন, ঐ দ্যাখো, দ্যাখো, চাঁদ তোমায় দেখছে। এই এক চাঁদ, ঐ এক চাঁদ। শ্রীলেখা, একটু হাসো—তোমার হাসিও জ্যোৎস্নার মতন।

হঠাৎ অকারণেই শ্রীলেখার চোখে জল এসে যায়। দৌড়ে সে চলে যায় শয়ন ঘরে, বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। প্রভাসকুমার সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন না। পাশে দাঁড়িয়ে দেখেন। যুবতী মেয়ের কান্নাও সুন্দর লাগে তাঁর চোখে, এ থেকেও তিনি কবিত্বের উপাদান খুঁজে পান। শ্রীলেখার নামের সঙ্গে অশ্রুরেখার মিল তক্ষুনি তাঁর মাথায় আসে।

বিয়ের চার পাঁচ মাসের মধ্যেও শ্রীলেখা একবারও বাপের বাড়ি যায় নি। প্রভাস-কুমার কিছুতেই ছাড়তে চান না। শ্রীলেখা বিহনে তিনি একটি দিনও থাকতে পারবেন না—একথা পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন। আগামী বছর পরীক্ষা উপলক্ষে তিনি যখন কলকাতা যাবেন, তখন শ্রীলেখা তাঁর সঙ্গে যাবে, এই রকম সিদ্ধান্ত হয়ে আছে।

কয়েকদিন পর আকস্মিকভাবে বাড়িটা ফাঁকা হয়ে গেল। দেওর, ভাসুর, ননদরা দল বেঁধে চলে গেল পশ্চিমে হাওয়া খেতে. প্রভাসকুমারের পড়াশুনোর ক্ষতি হবে বলে তিনি গেলেন না। শ্বশুর গেলেন ওড়িশায় বিষয় সম্পত্তির তদারক করতে। বাড়িতে শুধু স্বামী আর শাশুড়ি। তখন আবার শ্রীলেখার হাতে অখণ্ড অবসর। প্রভাসকুমারের ডাক এলে যেতেই হয়, একটু ফাঁক পেলেই পালিয়ে আসে। শ্রীলেখা তার অনুভূতি দিয়ে বুঝেছে যে তার স্বামীটি মোটামুটি ভালোমানুষ, অন্তর দিয়েই তাকে ভালোবাসে, এতখানি ভালোবাসা পেলে মানুষের অভিভূত হয়ে পড়ার কথা—অথচ যেন শ্রীলেখার অস্বস্তি কিছুতেই কাটে না।

প্রভাসকুমার বিশ্বসংসার সম্পর্কে নিরাসক্ত, যুদ্ধ বিগ্রহ সম্পর্কে কোনো খবরও রাখেন না, দেশের কোথায় কি ঘটেছে সে সম্পর্কেও আগ্রহ নেই। কোনো দিন উল্টে দেখেন না খবরের কাগজ, বাড়িতে রেডিও চললে তাঁর মানসিক শান্তির বিঘ্ন ঘটে।

সময় কাটাবার জন্য শ্রীলেখা চুপি চুপি রেডিও শোনে। ছোট দেওরের ঘর এখন ফাঁকা, সেই ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে সে রেডিও'র কাঁটা ঘোরায়। রেডিও'র নানা

রকম কণ্ঠস্বর ও সংগীতের মধ্যে সে নিজের সংগী খুঁজে পায়। কেন কে জানে, সব সময় তার একটু একটু মন খারাপ থাকে। এক এক রাত্রে রেডিও'র কাঁটা ঘোরাতে ঘোরাতে আচমকা শোনা যায় সুভাষ বসুর গলার আওয়াজ। শ্রীলেখার সমস্ত রোমকূপ শিউরে ওঠে, ঝিমঝিম করে শরীর। মনে হয় যেন বহু বহু দূর থেকে ভেসে আসছে এই গলা, বড় তেজী ও নিশ্চিন্ত—একটাই সুর ফুটে বেরুচ্ছে, আমি আসছি, আমি আসছি, আমি আসছি। অত্যধিক আবেগে শ্রীলেখার কান্না পেয়ে যায়। এইসব সময়ে তার মনে পড়ে সূর্যদার কথা। তার মনের মধ্যে কোন এক অজ্ঞাত কারণে সুভাষ বসু ও সূর্যদা'র ছবি এক হয়ে আসে। এর ফলে নিজেই সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে সবচেয়ে বেশী। সূর্যদার ছবিটা মুছে দিয়ে সে আবার রেডিওতে কান চেপে ধরে শুনতে পায়, আমি আসছি, আমি আসছি, আমি আসছি। সূর্যদা কোথায় আছে, বেঁচে আছে কি? ঐ সব ছেলে বেশীদিন বাঁচে না, অত যাদের জেদ—পৃথিবী সহ্য করে না তাদের।

ইদানীং একটা নতুন ব্যাধি দেখা দিয়েছে শ্রীলেখার। হঠাৎ হঠাৎ সে চমকে উঠে তাকায় পেছন দিকে। কেন যেন তার মনে হয়, কেউ যেন তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কেউ যেন তার কাঁধে রাখার জন্য হাত উদ্যত করেছে। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায় তারও মুখ। সদর দরজায় কোনো আওয়াজ হলেই সে ছুটে যায়। বাগানের গেটে ক্যাঁচ করে একটু শব্দ হলেই সে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। কোনো দিন ভর দুপুরে সে ছাদে উঠে উদভ্রান্তের মতন চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে কেউ আসছে কি না। কেউ আসে না।

॥ ৩৮ ॥

মুরশীদের চরে কয়েকদিন থাকার পর সূর্য বিরক্ত হয়ে উঠলো। শুধু একঘেয়েমির জন্যই নয়, তার মনে হতে লাগলো, সারাদেশে অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছে—সে সব কিছু থেকে বাদ পড়ে রইলো। এই রকম পলাতক জীবন তার কতদিন চলবে? ব্রজগোপাল বলে গিয়েছিলেন যে, তাঁর কাছ থেকে নির্দেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। কিন্তু নির্দেশ যদি শেষ পর্যন্ত না-আসে? যদি উনি নিজেই ইতিমধ্যে ধরা পড়ে থাকেন? সূর্য কি তবু ক্যাসাব্লাঙ্কার মতন অপেক্ষা করে যাবে?

তমোনাশ ডাক্তারের খবর পাকা ছিল, ইতিমধ্যে একদিন পুলিশ উপেনের বাড়ি হানা দিয়ে গেছে। তছনছ করে দিয়ে গেছে বাড়িঘর, উপেনকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল, মারধোর করে ছেড়ে দিয়েছে একদিন পর। হাসিখুশী মানুষটা চুপসে গেছে খানিকটা, কিন্তু ভেঙে পড়েনি—এখনো সূর্যকে খাবার পাঠায়।

এই ব্যবস্থাটা মোটেই পছন্দ হয় না সূর্যর। অতদূর থেকে তার জন্য কেউ কষ্ট করে খাবার নিয়ে আসবে—এটা ভাবতেও তার অস্বস্তি হয়। অথচ এখানে থাকতে গেলে আর কোনো উপায়ও তো নেই। দিন রাতের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সূর্য হ্যাংলার মতন প্রতীক্ষা করে কখন খাবার নিয়ে লোক আসবে। শুধু খাবারের জন্যই নয়, কথা বলার একজন মানুষের জন্য। যত স্বল্পভাষী মানুষই হোক, সারা দিনে একবার অন্তত কারুর সংগে কথা না বলতে পারলে দম বন্ধ হয়ে আসে।

সারাদিন এই জংলা জলাভূমিতে সূর্য একা একা ঘুরে বেড়ায় আর বিড় বিড় করে নিজের সংগে কথা বলে। এখানে তার সংগী কিছু পোকা-মাকড়, ইঁদুর আর

একটা সাপ। সাপটাকে সে বারকয়েক দেখেছে কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছোবার আগেই সেটা পালিয়েছে। সাপটাকে সে যে ঠিক মারতে চায় তাও নয়, তার উদ্দেশ্য সাপটার গতিবিধি লক্ষ্য রাখা। সময় কাটাবার জন্য সে সারাদিন ধরে সাপটাকে খোঁজে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ইঁদুরের গর্তগুলো বড় করে। পিঁপড়ের সারি দেখলে সে ওদের পাশে পাশে হামাগুড়ি দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত যায়, দু'টি গুবরে পোকাকেও সে প্রায়ই অনুসরণ করে।

বৃষ্টি ভিজে, রোদে পুড়ে তার গায়ের রং তামাটে হয়ে গেছে। নরম কচি ঘাসের মতন প্রথমবারের দাড়ি গজিয়েছে তার গালে, তার মাথা ভর্তি ঘন চুলে এখন আঠার মতন জট। এর মধ্যে কোনো অসুখ-বিসুখ হয়নি তার, কিন্তু একটা উপদ্রব দেখা দিয়েছে। সারা গায়ে চুলকুনি। ওঃ, কি অসহ্য চুলকুনি, রোদ লাগলেই চিড়বিড় চিড়বিড় করে, মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে তখন ঘ্যাস ঘ্যাস করে গোটা শরীরটা চুলকোতে হয়। এক এক সময় সূর্য আর সইতে পারে না—তখন শ্যাওলাভরা অগভীর জলে সে শরীর ডুবিয়ে শুয়ে থাকে। তখন তাকে মনে হয় অদ্ভুত কোনো জলজ প্রাণী। জলের মধ্যে চুলকুনির তেজ কম, খানিকটা সাময়িক আরাম হয়, এবং ঐ নোংরা জলের জন্যই গায়ের চুলকুনির রোগটা আরও বেড়ে যায়।

এখানে যে কখনো কোনো লোক আসে না এমন নয়। গরু ছাগল চরাতে চরাতে দু'একটি রাখাল মাঝে মাঝে চলে আসে। একদিন তিনটি ছেলে—সম্ভবত স্কুল পালানো—এখানে এসেছিল সিগারেট খেতে। ওদের সঙ্গে কথা বলার জন্য, বাইরের খবর জানার জন্য সূর্যর মন আকুলিবিকুলি করেছে। কিন্তু ষষ্ঠেন্দ্রিয়ে সে বুঝতে পেরেছে, তার এখানে আত্মগোপন করে থাকার ব্যাপারটা কোনক্রমেই বাইরে ছড়িয়ে পড়া সমীচীন নয়। সূর্যকে তখন লুকিয়ে পড়তে হয়। নিঃশব্দে চলাফেরায় সে এখন অভ্যস্ত, পায়ের তলায় শুকনো পাতা পড়লেও শব্দ হয় না। অনেক সময় এমন হয়েছে, দু'জন রাখাল মাটির ঢিবির ওপর বসে গল্প করেছে, আর খুব কাছেই কোনো গাছের আড়ালে বন্যপ্রাণীর মতন লুকিয়ে আছে সূর্য, ওদের কথা শোনার চেষ্টা করছে।

উপেনের বাড়িতে পুলিশের হামলা হবার পর দেড়দিন কোনো খাবার আসেনি সূর্যর জন্য। অত ডামাডোলের মধ্যে সূর্যকে খাবার পাঠানো হয়ে ওঠেনি। সেই সময়টা সূর্য যা খিদেয় কষ্ট পেয়েছিল, সেরকম অসম্ভব কষ্ট সে জীবনে আগে কখনো পায়নি, ভবিষ্যতেও পাবে না। ছত্রিশ ঘণ্টা না খেয়ে থাকা এমন কিছুই না—কিন্তু যেখানে খাওয়াটাই সারাদিনের একমাত্র কাজ, যেখানে প্রতি মুহূর্তে মনে হয় এই বুঝি আসবে, এই বুঝি আসবে—সেখানে এ কষ্টের তুলনা নেই। কারাগারের বন্দী-জীবনের চেয়েও বেশী, কারণ এখানে দেয়ালটা নিজের তৈরী করা। বনতুলসী গাছ-গুলোতে একরকম ছোট ছোট ফল হয়—খিদের জ্বালায় সূর্য সেইগুলো খেয়েছে, মুঠো মুঠো তেঁতুল পাতা চিবিয়েছে, মাঠের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে থেকে চোখ ব্যথা হয়ে গেছে তার।

তারপর এক সময় লক্ষ্মী এলো খাবারের ঝোলা হাতে নিয়ে। তাকে দেখে আনন্দিত হবার বদলে রেগে আগুন হয়ে উঠলো সূর্য। আশা করতে করতে সীমানাটা পার হয়ে যাবার ফলে এই রাগ। সূর্যর ইচ্ছে হলো খাবারের ঝোলাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, লক্ষ্মীকে খুন করে মাটিতে পুঁতে রাখে। কাছে আসার পর লক্ষ্মীর মলিন মুখখানা দেখে সে থমকে গেল। তখন লক্ষ্মী জানালো যে, তার বাবাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত তাদের বাড়িতেও কেউ কিছু খায়নি।

তারপর থেকে কোনোদিন লক্ষ্মী এসেছে, কোনোদিন তার ভাই। অতখানি পথ পার হয়ে তারা আসে, লোকের চোখ আড়াল করে—এজন্য সূর্যর মমতা হয়। তার ছটফটানি বাড়ে। একটা কিছু করা দরকার—এরকম ভাবে আর চলে না।

একদিন লক্ষ্মী একটা বলের মতন গোল সাবান নিয়ে এলো সূর্যর জন্য। সাবানের চল নেই তাদের বাড়িতে, এটা জোগাড় করার জন্য লক্ষ্মীকে অনেক বুদ্ধি খরচ করতে হয়েছে। চুলকুনির ওষুধ হিসেবে খানিকটা কবিরাজি মলমও এনেছে। সাবানটা দেখে প্রথমে সূর্যর মুখে উপহাসের হাসি এসেছিল, তারপর কি ভেবে সে খুব আগ্রহের সঙ্গে সেটা রেখে দিল।

সূর্যর খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত লক্ষ্মী বসে থাকে, কেননা সে বাসনপত্র নিয়ে যাবে। তারপরেও সে বসে থাকতে চায়। মদির আলস্য খেলা করে তার চোখে মুখে, গাছে হেলান দিয়ে বসে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সূর্যর দিকে। তার কাঁচ কিশোরী হৃদয় কোনো বিপদ বরণের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। এখানে অদ্ভুত নির্জনতা, শেষ জুলাইয়ের চড়া রোদ, গাছের ছায়ায় বসেও ঘন ঘন ঘাম মুছতে হয়, মাঝে মাঝে পাতার শব্দে ঝিরঝিরে হাওয়া—এই সব কিছুর মধ্যেই যেন কিছু একটা সম্ভাবনার ছমছমানি আছে।

সূর্যর কিন্তু ওসব কোনোদিকে মন নেই। সেই যে একদিন মধ্যরাত্রে সে লক্ষ্মীর কাঁধ চেপে ধরার পরেও ছেড়ে দিয়েছিল, তারপর থেকে সে আর লক্ষ্মীকে মেয়ে বলেই মনে করে না। সে সহজ সাধারণভাবে তার সঙ্গে কথা বলে, বকুনি দেয়, কিন্তু শরীরের কথা মনে স্থান দেয় না।

লক্ষ্মী চলে যাবার পর সূর্য বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়লো। খুলে ফেললো ধুতি, গেঞ্জি, আন্ডার ওয়্যার সব—এখানে উলঙ্গ হয়ে থাকলেও দেখবার কেউ নেই। তার সার্টটা লুকানো ছিল একটা ঝোপের মধ্যে সেটাকেও বার করে এনে সবকটাকে সাবান কাচা করলো অনেকক্ষণ ধরে যত্নের সঙ্গে। মাথার চুলে সাবান ঘষে, সারা শরীরে সাবান মেখে স্নান করলো। তারপর জামা কাপড়গুলো মেলে দিয়ে নিজের শরীরটাও শুকোতে দিল ঘাসের ওপর শুয়ে। তার নগ্ন শরীর এখন অনেকটা পরিচ্ছন্ন, রিভলবারটা পেটের ওপর রেখে ঘুমিয়ে পড়লো সেই অবস্থায়।

ঘুম ভাঙলো সন্ধ্যের পর। জামাকাপড় পরে ভদ্রস্থ হলো আবার। ঘুমন্ত অবস্থায় কয়েকটা লাল পিঁপড়ে কামড়ে গেছে, ফুলে উঠেছে কয়েকটা জায়গা। জামাকাপড়গুলো দোমড়ানো মোচড়ানো হলেও পরিষ্কার হয়েছে বেশ। যে-টুকু সাবান অবশিষ্ট ছিল, সেটুকু একটা কঞ্চির মাথায় গেঁথে কঞ্চিটা সোজা করে পুঁতে রাখলো মাটিতে। আর একটা কঞ্চি দিয়ে তার সামনে মাটির ওপর গোটা গোটা অক্ষরে লিখলো, চলে যাচ্ছি। ভোর হবার আগেই সে বেরিয়ে পড়লো।

সূর্যর যাবার ইচ্ছে ছিল খড়্গপুরে, পথ ভুল করে চলে গেল অন্যদিকে। তার ধারণা হয়েছিল, বিপ্লব বা লড়াই থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে—এখন দরকার খড়্গপুরের মতন কোনো বড় জায়গায় যাওয়া। তাছাড়া খড়্গপুর নামটা তার মাথার মধ্যে গেঁথে আছে। কিন্তু পথ ঠিক করতে না পেরে এসে পড়লো বেলদা পটাশপুরের দিকে। সঙ্গে তার কিছু টাকা পয়সা গোড়া থেকেই ছিল, এতদিন খরচের সুযোগ হয়নি—এবার সে পটাশপুর বাজারের কাছে একটা ভাতের হোটেলে ঢুকে অনেকদিন বাদে মাংস ভাত খেল।

এখানকার লোকের বাংলা উচ্চারণে একটা আলাদা টান আছে। সূর্য কথা বলতে

গেলেই ধরা পড়ে যাবে যে সে স্থানীয় লোক নয়। সুতরাং সে নিজে কিছু না বলে কান খাড়া করে শুনতে লাগলো অন্যদের কথা। যুদ্ধের খবর সম্পর্কে স্থানীয় লোকের যে খুব একটা মাথা ব্যথা আছে তা মনে হয় না। মহাত্মা গান্ধী, সুভাষ বোসের নামও শোনা যায় না—সবাই জিনিসপত্রের দাম বাড়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত এবং দেশের সর্বত্র যে টিকটিকি ঘুরছে এবং যাকে তাকে যখন তখন থানায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে—এটাও একটা বলবার মতন ঘটনা।

এদিকে আবার কলেরার প্রকোপ চলছে। এবং কলেরা ডাকিনী বিতাড়নের জন্য চলছে এক জায়গায় দিবারাত্র অবিরাম হরি সংকীর্তন। দিঘির পারে একটা শামিয়ানা খাটিয়ে একদল লোক ঢোল মৃদংগ করতাল নিয়ে অবিরাম চেঁচিয়ে যাচ্ছে, তাতে কান ঝালাপালা হলেও রাত কাটাবার পক্ষে জায়গাটা বেশ সুবিধাজনক। শ্রোতাদের মধ্যে কে কখন উঠে যাচ্ছে, কে ঘুমোচ্ছে, তাতে কারুর কোনো চিন্তা নেই, পুলিশের চোখ থেকেও এটা নিরাপদ। রাতটা সূর্য সেখানেই কাটিয়ে দিল।

সকালবেলা গেল বাসের খোঁজে। তার সংগে কোনো মালপত্র নেই, থাকার জায়গা নেই—এ অবস্থায় এক জায়গায় বেশীক্ষণ ঘোরাঘুরি করলেই সন্দেহের উদ্রেক করবে। বাসের খোঁজ খবর নিয়ে সে জানলো যে, এখান থেকে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ চলে যাওয়া যেতে পারে বেশ সহজেই—এবং তার পক্ষে লুকিয়ে থাকতে হলে ঐ জায়গাটাই ভালো হবে। খড়্গপুরেও যাওয়া যায় বাস বদল করে। সূর্য অনেক ভেবেচিন্তে খড়্গপুরেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলো। এই এক একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সংগে সংগে যে তার জীবনের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীও বদলে যাচ্ছে তা সে জানে না। পটাশপুর থেকে সকাল সাড়ে ন'টার বাস না নিলে পরবর্তী ঘটনাগুলো ঘটার সম্ভাবনা ছিল না তার জীবনে।

বাস নারায়ণগড়ে এসে থেমেছে, সূর্য জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একটা ফেরি-ওয়ালার কাছ থেকে ছোলা মুড়ি কিনছিল, এমন সময় একটু দূরের মুদিখানার সামনে দাঁড়ানো একটি লোকের দিকে তার চোখ আটকে গেল। সূর্যর টিকিট কাটা ছিল আরও দূরের, কিন্তু বিনা বাক্য ব্যয়ে নেমে পড়লো সেখানে। মুদিখানার কাছে গিয়ে লোকটির থেকে সামান্য দূরত্ব রেখে সে দেখতে লাগলো তাকে।

লোকটি গরম মশলা, এলাচ, লবঙ্গ ইত্যাদির দর করছিল, চিনিও তার দরকার। চিনি বাজার থেকে উধাও হবার জন্য তার মেজাজ খুব গরম। কথা বলতে বলতে হঠাৎ ডান দিকে ঘুরে তাকালো সূর্যর দিকে, কয়েক মুহূর্তের জন্য মুখখানা তার বিবর্ণ হয়ে গেল, স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো, তারপরই হাসিমুখে বললো, 'আরে, অমর না? চিনতেই পারিনি'।

যোগানন্দ সূর্যকে অমর নামেই জানে। সূর্য প্রতিবাদ করলো না। গম্ভীরভাবে বললো, যোগানন্দদা, আপনি এখানে? আমার ধারণা ছিল, আপনি মরে গেছেন!

যোগানন্দ হা হা করে হেসে বললো, বালাই ষাট, এর মধ্যেই মরবো কেন? এখনো কত কিছু বাকি।

—এতদিন আপনার কোনো খোঁজ খবর না পেয়ে—

যোগানন্দ সূর্যর কাঁধে এক চাপড় মেরে বললো, চলো, ব্রাদার, আমার বাড়ি চলো, সেখানে সব কথা হবে। কি চেহারাই করেছো, খেতেটেতে পাও না নাকি? এদিকে কোথায় যাচ্ছিলে?

সূর্য শুকনো মুখে বললো, আমার কোনো জায়গা নেই। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

এই কয়েক মাসে সূর্যর অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিছুটা শিখেছে বুঝে শুনে

কথা বলতে। এখন যোগানন্দর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা তৈরী করাই তার দরকার।

বাজার এলাকা ছাড়িয়ে এসে ফাঁকা রাস্তায় পড়ে যোগানন্দ জিজ্ঞেস করলো, দাদাদের খবর কি?

সূর্য অপ্রসন্নভাবে বললো, আমার সঙ্গে আর কারুর কোনো যোগাযোগ নেই। আমাকে ওরা দল থেকে বাদ দিয়েছে।

—কেন?

—আমি একটা অ্যাকশানে যেতে পারিনি।

—কেন, যাওনি কেন, ভয় পেয়েছিলে?

—আমার শরীর খারাপ ছিল। আমার জিনিসটাও সেই সময় নিয়ে গেল, আর ফেরৎ দিল না। হরদা আমার কাছে রাখতে বলেছিলেন—

—জিনিসটাও নিয়ে গেল? হাঃ—হাঃ—হাঃ—। এখন তুমি তা হলে কি করবে?

—বাড়িতেও ফিরতে পারছি না, পুলিস চোখ রেখেছে।

—তোমার কোনো ব্যবস্থাও করেনি দাদারা? 'অসময়ে হায় হায়, বন্ধু কেউ নয়।' আমি তখনই ভেবেছিলাম, তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে ওরা ঠকাবে। আমার এখানে থাকো কয়েকদিন, তারপর দেখা যাক, কি করা যায়।

যোগানন্দর বাড়িটি মোটামুটি ছিমছাম সাজানো। বাড়িটির বাইরে থেকে যে-রকম সুন্দর, অন্দরমহলের গৃহকর্ত্রীটিও তেমন সুন্দরী। মহিলা প্রায় যোগানন্দর সমান বয়েসী, গায়ের রং কালো—কিন্তু তার মুখে ও শরীরে এমন এক লাবণ্য আছে যাতে গায়ের রঙের কথা মনেই থাকে না।

যোগানন্দ সেই মহিলাকে দেখিয়ে সূর্যকে বললো, অমর, ইনি তোমার বৌদি হন। প্রণাম করো, প্রণাম করো—

একপ্রকার জোর করেই প্রণাম করালো সূর্যকে দিয়ে। তারপর স্ত্রীকে বললো, ভালোমন্দ কিছু খেতে দাও তো, তোমার দেওরটি না খেতে পেয়ে পেয়ে শুকিয়ে গেছে দেখছো না!

যোগানন্দ বাড়ির সংলগ্ন একটা দোকান খুলেছে টিউবওয়েলের যন্ত্রপাতির। তার অবস্থা বেশ সচ্ছল বলে মনে হয়। নিজের থেকেই সে সূর্যকে শোনালো যে তার সংসারের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় সে তার জমিদার পিতার কাছ থেকে নিজের সম্পত্তির অংশ নিয়ে এসে এখানে বাড়ি করেছে। বিপ্লব টিপ্লব নিয়ে সে আর মাথা ঘামাতে চায় না। ওসব পাগলামি ছাড়া আর কিছুই না। দেশ যখন স্বাধীন হবার আপনিই হবে—দু' চারটে বোমা পিস্তল নিয়ে যারা বিপ্লব করার কথা ভাবে—তারা স্রেফ গোঁয়ার। গোঁয়ার্তুমি করে প্রাণ দেবার সাধ তার নেই।

সূর্য এক দৃষ্টে যোগানন্দের দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবে, এই সব কথা সেই ডাকাতি করার পরেই কেন মনে হলো যোগানন্দর, ডাকাতির আগে কেন মনে পড়েনি? তখন তো ওর দারুণ উৎসাহ ছিল। ডাকাতির পরিকল্পনাটাও মোটামুটি ছিল ওরই। এই যোগানন্দকে দেখেই সূর্য এক সময় দারুণ মুগ্ধ হয়েছিল। চন্দননগরের সেই পোড়ো বাড়িতে সকালবেলা যোগানন্দ তাকে এমন আন্তরিকভাবে কয়েকটা কথা বলেছিল, যা এখনো তার বুকে লেগে আছে। যোগানন্দ বলেছিল, ভাই অমর, দেশের কাজকে যদি তোমার নিজের কাজ বলে ভাবতে পারো—তা হলেই এ পথে থেকো। কোনোদিন কোনো প্রতিদান আশা কোরো না। আর সবাই ছেড়ে চলে গেলেও তোমাকে থাকতে হবে—এই কথাটা সব সময় মনে রেখো।

এই কথাগুলো যে বলেছিল, আজ তার এই পরিণতি। কথার গুরুত্ব না বুঝে মানুষ এরকমভাবে উপদেশ দিতে পারে? এসব কি শুধু কথা, এর পেছনে আর কিছু নেই?

যোগানন্দ বরাবরই পেটুক মানুষ, খেতে ভালোবাসেন, এখন তার খাওয়া-দাওয়া একটা উৎসবের মতন। সারাদিন ধরেই খাওয়া-দাওয়ার ধুম লেগে আছে। তার স্ত্রী শ্যামলী রান্নার ব্যাপারে একজন শিল্পী। প্রত্যেকবেলা শুধু মাছই রান্না হয় তিন চার রকম। যোগানন্দর আগে ছিল শক্ত সবল চেহারা, এখন গায়ে বেশ চর্বি লেগেছে। পায়েসের বাটিতে চুমুক দিয়ে সে যখন তারিয়ে তারিয়ে খায়, তখন সূর্যর মনে পড়ে যায়, একদিন ডুমুর আর পেঁয়াজের বিচিত্র তরকারির সঙ্গে মশলা ছাড়া খিচুড়ি কি অপূর্ব তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছিল যোগানন্দ।

যোগানন্দ সূর্যকে খুবই খাতির যত্ন করে। সব সময় স্ত্রীকে বলে, অমরকে এটা দাও, অমরকে ওটা দাও। দিন তিনেক ভালো করে স্নান টান ও খাওয়া দাওয়া করে সূর্যর চেহারা ফিরে গেল। তখন শ্যামলী অন্য চোখে দেখতে লাগলো সূর্যকে।

শ্যামলী কথাবার্তা কম বলে, কিন্তু দু' একটি কথা শুনলেই বোঝা যায়, সে বেশ বুদ্ধিমতী। মাঝে মাঝেই সূর্য দেখতে পায়, শ্যামলী তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সূর্যর অনুপস্থিতিতে সূর্যর ঘরে পরিষ্কার জামাকাপড় রেখে যায়। রাত্তির-বেলা তার মাথার কাছে জল ঢাকা থাকে। প্রথম তিনদিন শ্যামলী সূর্যর সঙ্গে সাধারণ সৌজন্যসূচক দু' চারটে কথা ছাড়া কিছুই বলেনি, তারপর একদিন দুপুর-বেলা হঠাৎ পানের রসে ঠোঁট দুটি রাঙিয়ে সূর্যর ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলো, কি, এত মন খারাপ কেন?

সূর্য তখন জানলার ধারে গুম মেরে বসেছিল। গম্ভীর হয়ে থাকলেই তার মুখে এক ধরনের গাঢ় বিষণ্নতা ফুটে ওঠে। তার ফর্সা সুন্দর মুখে সেই বিষণ্নতা কেমন যেন অদ্ভুত দেখায়।

সূর্য মুখ ফিরিয়ে বললো, যোগানন্দদা কোথায়?

—ঘুমোচ্ছে।

সূর্য আর কিছু না বলে চুপ করে রইলো। মেয়েদের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয়, সে জানে না। শ্যামলী একটু বাদে এগিয়ে এসে বললো, আপনি বলবো, না তুমি বলবো? তুমিই বলি, তোমার বয়েস কত?

সূর্য বললো, আঠেরো।

—বাবা, এর মধ্যেই এত লম্বা হয়ে গেছ। তুমি তো তোমার এই দাদাটিকেও ছাড়িয়ে গেছ। আচ্ছা ভাই অমর, তুমিও কি এখন তোমার দাদার মতন দল ছাড়া?

এ বাড়িতে এদের মুখে অমর ডাক শুনে সূর্যর এখনো অস্বস্তি হয়। তার বাবার নাম অমর, বাবার নামে ছেলেকে কেউ ডাকলে ছেলের কানে সেটা অদ্ভুত শোনাবেই। কিন্তু তার দল থেকে তাকে এই ছদ্মনামটা দেওয়া হয়েছিল।

সূর্য বললো, আমি কোনোদিন কোনো দলে ছিলাম না। যোগানন্দদার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল কলকাতায়।

—হুঁ, বুঝেছি। যেই যুদ্ধ লাগলো অমনি তোমাদের সব জারিজুরি থেমে গেল? আচ্ছা, এই যুদ্ধ কতদিন চলবে বলতে পারো?

—কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

—তোমার দাদা তো বলেন, যত বেশী দিন যুদ্ধ চলে, ততই নাকি ভালো। এখন

ওর দোকানে বিক্রি খুব ভালো, যুদ্ধ থেমে গেলে আর এতটা হবে না।

একটু চুপ করে থেকে শ্যামলী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর বললো, তোমার দাদাকে আমি দশ বছর ধরে চিনি। যখন ও পুলিসের সঙ্গে লড়াই করতো, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতো—তখন ওকে আমার অনেক অনেক বেশী ভালো লাগতো। তখন ছিল একটা দুর্দান্ত প্রকৃতির মানুষ। এখন কিরকম যেন সাধারণ, আর পাঁচজনের মতন, আমার এরকম ভালো লাগে না। আগে ওর সঙ্গে ন'মাসে ছ'মাসে দেখা হতো—সেও অনেক ভালো ছিল—

সূর্য একটু অবাক হয়ে তাকালো শ্যামলীর দিকে, কিন্তু কোনো মন্তব্য করলো না। শ্যামলীর মুখে যেন সত্যিই একটা দুঃখের ছায়া। সূর্যর সঙ্গে আরও কথা বলার উদ্দেশ্যে শ্যামলী এসে বসলো সূর্যের বিছানার ওপর। মাথার বালিশটা সরাতে যাচ্ছিল সূর্য বিদ্যুৎবেগে এসে বসে পড়লো বালিশটার ওপর। বালিশের তলায় তার গোপন জিনিস আছে, শ্যামলীকে দেখানো যায় না।

সূর্যর এরকম ব্যবহারে চমৎকৃত হয়ে গেল শ্যামলী। সূর্য প্রায় তার গায়ের ওপরেই এসে বসে পড়েছে। কৌতূহলের চোখে সূর্যর দিকে তাকালো। জিজ্ঞেস করলো, তোমার বাড়িতে আর কে কে আছেন?

সূর্য দায়সারা উত্তর দিচ্ছে। শ্যামলীকে এখান থেকে ওঠানো দরকার। কিন্তু সে তো তাকে উঠে যেতে বলতে পারে না। শ্যামলী চেয়ে আছে সূর্যর গেঞ্জি পরা শরীরের দিকে। সূর্যর বাহুতে চাকা চাকা দাগ—সেদিকে আঙুল তুলে শ্যামলী বললো, এসব কি?

সূর্য বললো, আমার গায়ে চুলকুনি আছে, আপনি সরে বসুন।

সরে বসার কোনো লক্ষণ দেখালো না শ্যামলী, হাসতে হাসতে বললো, সেকথা আগে বলনি কেন? গরম তেলে কাঁচা হলুদ মিশিয়ে দেবো—কাল মাখবে সারা গায়ে—

সূর্যর পিঠে হাত রেখে শ্যামলী বললো, এমন সুন্দর চেহারা, কেউ তার এমন অযত্ন করে।

হঠাৎ রক্তের গন্ধ পেয়ে গেল সূর্য। তীব্র চোখে শ্যামলীর দিকে তাকিয়ে রইলো কয়েক পলক। তারপর আর সময় নষ্ট না করে শ্যামলীকে জড়িয়ে ধরলো।

আর্ত কণ্ঠে, নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে শ্যামলী বললো, এই কি হচ্ছে কি,—দরজা খোলা...

ধুৎ তেরি, দরজা খোলা। সূর্য কোনোদিন এসব গ্রাহ্য করেছে? ততক্ষণে সে শ্যামলীর ঠোঁট কামড়ে ধরেছে, কোমর থেকে হাত নিয়ে এসেছে বুকের কাছে।

শ্যামলী কোনোক্রমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। জ্বলন্ত চোখে বললো, ছি ছি ছি, তুমিও এই রকম? কোনো মেয়ে কোনো ছেলের সঙ্গে একটু নির্জনে কথা বলতে এলে তোমরা এ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারো না?

সূর্য রুক্ষ গলায় বললো, আপনি কেন বললেন, দরজা খোলা?

—দরজা খোলা থাক বা না থাক, তুমি এত নির্লজ্জ, এই তোমরা বিপ্লবী?

সূর্য তর্কাতর্কি করে পারবে না। সে আর কথা খরচ না করে উঠে দরজা বন্ধ করে এলো। শ্যামলীর সব বাধা অগ্রাহ্য করে তার কোমর ধরে হিড়হিড় করে নিয়ে এলো বিছানায়। কয়েকদিন ভালো খাবার ও পরিচর্যা পেয়ে তার শরীরের এই খিদেটা অসম্ভব জেগে উঠেছে। শ্যামলীর দুটো হাত বিছানার ওপর জোর করে চেপে ধরে, শরীরের ভরে পা দুটো আটকে সে চুম্বন করলো শ্যামলীকে। এত দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন

যে মনে হয় অন্তহীন। শেষের দিকে শ্যামলীর প্রতিরোধ কমে এলো, অংশ গ্রহণ করতে লাগলো তার নিজের ঠোঁট। তখন সূর্য শ্যামলীর হাত ছেড়ে তার বুকের আঁচল সরিয়ে দিল। একটানে ব্লাউজটা ছিঁড়তে যেতেই সে থমকে গেল।

শ্যামলীর গলায় সোনার সরু হার, লকেটটা মস্ত বড়। লকেটের মাঝখানে একটা লাল পাথর। এই হার সূর্য চেনে। ডাকাতির দিন আঢ্য বাড়ির যুবতী বধূটির গলা থেকে এই হার যোগানন্দ নিজে ছিঁড়তে গিয়েছিল। সেই হার যোগানন্দ তার নিজের স্ত্রীর গলায় পরিয়েছে। এ কি ধরনের মানুষ? এ কি ধরনের পৃথিবী? সূর্যর শরীরটা গুলিয়ে উঠলো।

শ্যামলীকে ছেড়ে ভূতে পাওয়া মানুষের মতন সে উঠে দাঁড়ালো। কুঁকড়ে গেছে তার মুখখানা। শ্যামলীর ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে, তাই দেখে সূর্য বিকৃত গলায় বললো, যান, মুখ ধুয়ে আসুন। আপনার রক্ত আমি খেয়ে ফেলেছি, তাই আমার বমি পাচ্ছে!

সেদিন সন্ধ্যেবেলা সূর্য যোগানন্দকে বললো, দাদা, একটু বেড়িয়ে আসি, বাড়িতে বসে আর ভালো লাগছে না।

যোগানন্দ সূর্যকে বাড়ি থেকে বেরুতে বারণ করেছিল। কিন্তু দিনের পর দিন বাড়িতে বসে থাকা কি এ ছেলের পক্ষে সম্ভব? বাইরে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, তাই দেখে যোগানন্দ বললো, ঠিক আছে, যাও, বেশী দেরি করো না। কাল তোমাকে নিয়ে আমি মেদিনীপুর টাউনে যাবো—ভোরে উঠতে হবে।

—আপনিও চলুন না। কাজ তো কিছু নেই।

যোগানন্দ বললো, ঠিক আছে, চল, তোমাকে বনের ধারটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। ও দিকটা বেশ সুন্দর। তুমি একা গেলে কোথায় যেতে কোথায় যাবে আবার!

বাড়ির পেছন দিকে মাঠের মধ্য দিয়ে রাস্তা। সূর্য এখন অসম্ভব শান্ত, সে নীরবে হেঁটে যাচ্ছে যোগানন্দের পাশে। যোগানন্দ গুন গুন করে গান ধরেছে, স্বামী বিবেকানন্দর প্রিয় গান, 'যদি কুমড়োর মত চালে ধরে রত পান্তুয়া শত শত—'।

সন্ধ্যা শুরু হতে না হতেই সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে। পরিষ্কার আকাশ। ফুরফুরে হাওয়ায় গান ও কথা উড়ে যায়। মাঠ শেষ হবার পর অল্প অল্প জঙ্গল শুরু হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে পায়ে চলা পথ। যোগানন্দের মনে কবিত্ব জেগেছে। সে ওপরে তাকিয়ে বললো, কত তারা দেখেছো? এক সঙ্গে এত তারা কলকাতায় বসে কেউ দেখতে পায় না। তারাগুলো ঠিক ফুলের মতন মনে হয়।

সূর্য বললো, অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে দেখা যায়, এক একটা তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে।

যোগানন্দ বললো, তারা নয়, সেগুলো ধূমকেতু।

তর্কের ভঙ্গিতে সূর্য বললো, না তারা।

—ওঃ, তা হলে মরা তারা। অনেক সময় দেখা যায় পৃথিবীতে খসে পড়ছে—পড়তে পড়তেই পুড়ে যায়।

—না, সেগুলো না। এক একটা তারা স্থান বদলায়। মানুষের জীবনের মতন। আমি দেখেছি।

মুরশীদের চরে থাকবার সময় সূর্যকে অনেক আকাশ দেখতে হয়েছে—এ দৃশ্য তার সত্যিই দেখা।

যোগানন্দ বিড় বিড় করে বললো, সত্যিই মানুষের জীবন বদলায়। বড্ড ঘন ঘন বদলায়। আমি অনেক বদলেছি—আমাকে দেখে তুমি অবাক হচ্ছো, না? কাল থেকে

কিন্তু আমার অনুতাপ হচ্ছে। তোমাকে একটা কথা বলবো বলবো করেও বলিনি। কাল শহরে গিয়ে আমি একটা হ্যান্ডবিল দেখলাম। মহাত্মা গান্ধী থেকে কংগ্রেসের সব নেতাকে ইংরেজ সরকার আবার জেলে ভরেছে। ৯ই অগাস্ট থেকে দেশের অনেক জায়গায় বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। রেল লাইন উপড়ে, স্টেশন পুড়িয়ে—

সূর্য বিমূঢ় গলায় জিজ্ঞেস করলো, আজ কত তারিখ?

এগার। সত্যি অমর, সারা দেশে বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। আর আমরা এখনো বসে আছি? আমার রক্ত আবার চনমন করে উঠছে। এক সময় অনেক কিছু করেছি, আর আসল লড়াইয়ের সময়েই ঘরের কোণে বসে থাকবো? আমার বুকটা পুড়ে যাচ্ছে অনুতাপে। তখন ভেবেছিলাম, আর কোনো আশা নেই—যুদ্ধ না থামলে,—তাই নিজের ঘর গুছিয়ে নেবার জন্য—কেউ কি ভাবতে পেরেছিল, সুভাষবাবু সত্যি সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসবেন। ওঃ, কি ভুল করেছি! বিয়ে করে সংসারে জড়িয়ে—

সূর্য থমকে দাঁড়িয়ে কর্কশ গলায় বললো, সেই ডাকাতির রাত্রে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

—আমি গ্রামের লোকের হাতে ধরা পড়ে গেলাম। মালপত্র তো সব কেড়ে নিয়েছেই, এমন মার মেরেছিল যে সে যাত্রা যে প্রাণে—

কথা বলতে বলতে যোগানন্দর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে সূর্যর হাত দুখানা চেপে ধরে বললো, তুই আমাকে খুন করতে এসেছিস, তাই না?

—হাত ছাড়ুন।

—আমাকে খুন করার জন্য তোকে ওরা পাঠিয়েছে, না রে অমর?

সূর্য হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু যোগানন্দের গায়েও প্রচণ্ড জোর। সে দু' হাতে সূর্যকে সপাটে চেপে ধরেছে। সূর্য প্রাণপণেও নিজেকে ছাড়াতে পারলো না, তখন কামড়ে দিল যোগানন্দের হাতে—ব্যথার জ্বালায় যোগানন্দ তাকে ছেড়ে দিয়েই প্রচন্ড এক লাথি মারলো পেটে। সূর্য ছিটকে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে রিভলবার বার করে গুলি চালালো।

হাত স্থির ছিল না, গুলি যোগানন্দের গায়ে লাগেনি। যোগানন্দ মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গড়াতে শুরু করেছে অন্ধকারের দিকে। সূর্য রিভলবার হাতে এগিয়ে আসতেই সে চেঁচিয়ে উঠলো, অমর, মারিস না, মারিস না, শোন, কথা শোন। আমি ভুল স্বীকার করছি—দাঁড়া, একটা কথা বলতে দে—

লক্ষ্য স্থির নিশ্চিত করার জন্য সূর্য অস্ত্র হাতে নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে লাগলো ওর দিকে। যোগানন্দ একটা ঝোপের পেছনে লুকিয়েছে। সেখান থেকে বলতে লাগলো, অমর, মারিস না, এরকমভাবে মারিস না—আমিও অনেক কাজ করেছি—আমাকে আর একটা সুযোগ দে—কালই আমি বাড়িঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়বো—যদি পুলিশের গুলিতে মরি, তাও একটা সান্ত্বনা থাকবে।

সূর্য হুকুম করলো, ওখান থেকে বেরিয়ে আসুন।

—মারবি না, বল? একটু সুযোগ দিবি?

—বেরিয়ে আসুন আগে। এতে এখনো পাঁচটা টোটা আছে, এইখান থেকেই আমি আপনাকে শেষ করে দিতে পারি। বেরিয়ে আসুন!

যোগানন্দ বেরিয়েই সূর্যর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সূর্যর মুখখানা পাথরের মতন শক্ত। যোগানন্দর মাথা টিপ করে রিভলবার তুলেছে, যোগানন্দ হাউ হাউ করে

কেঁদে বললো, এরকমভাবে মারিস না, আমাকে পুলিশের গুলিতে মরতে দে।

—ঠিক?

—অমর, তোর কাছে কথা দেওয়ার কিছু নেই। আমার নিজেরই অসম্ভব অনুতাপ হচ্ছে। আমি যা ভুল করেছি, আমার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবেই!

সূর্য হিংস্রভাবে বললো, আবার যদি কোনো ভুল হয়, তা হলে আমি নরকে গিয়েও আপনাকে খুঁজে বার করবো।

সেই রাত্রে শ্যামলী সূর্যর ঘরে জল রাখতে এলে সূর্য দরজার সঙ্গে তাকে চেপে ধরে, গলার হারটা একটানে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় বাইরের অন্ধকারে, ঠাস ঠাস করে তার দু গালে দুটি চড় মারে। শ্যামলী এতই অবাক হয়ে যায় যে তার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। সূর্য যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। আবার একটা প্রচন্ড চড় মেরে বলে, লোভের শেষ নেই, না? আর সব গয়না কোথায়?

একটু পরে দেখা যায়, শ্যামলী সূর্যর পায়ের কাছে বসে কাঁদছে।

॥ ৩৯ ॥

দূর থেকে আসছে একটা মিছিল। ঠিক মিছিল নয়, বিশৃঙ্খল জনতা। নদীতে যেমন ষাঁড়াষাঁড়ির বান আসে, তেমনি মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে আসছে একটা উত্তাল ঢেউ। হ্যাঁ, ছুটেই আসছে মনে হয়, প্রিয়জনের দুঃসংবাদ শুনে মানুষ যে-রকমভাবে ছুটে আসে। এই জনতার কোনো কর্ণধার নেই, যেন মনে হয় চতুর্দিকের মাঠ ঘাট জঙ্গল নদী নালা পেরিয়ে মানুষ ছুটে আসছে এই দিকে, এই মন্তেশ্বর থানার দিকে। গতকাল এই থানার সামনে গুলি চলেছিল, মারা গেছে দুজন মানুষ, আহত সাতজন, বন্দীর সংখ্যা একশো তিন।

জনতা ছুটে আসছে। এর মধ্যে আছে শিশু, বৃদ্ধ ও নারী, ছেঁড়া, ময়লা পোশাক, অনেকেরই শরীরের অর্ধেকের বেশী নগ্ন, অনেকেই রোগা, হাড়-জিরজিরে চেহারা, ম্যালেরিয়া, অনাহার ও বৃটিশ শাসন যাদের ছিবড়ে করে ফেলেছে—আজ তারা ছুটে আসছে ভূতগ্রস্তের মত। দুর্বল গলায় তারা চ্যাঁচাচ্ছে, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! বৃটিশ রাজ ভারত ছাড়ো! সমস্ত বন্দীদের মুক্তি চাই! চাই, চাই, চাই-ই—প্রতিধ্বনির মতন শোনায়।

বেলা এগারোটা। এই সময় এইসব মানুষের মধ্যে অনেকেরই খেত-খামারে থাকার কথা, কেউ ইস্কুলে, কেউ ডাক্তারখানায়, রান্নাঘরে, হাটে-বাজারে। আজ সে-সব কাজ ফেলে মানুষ এদিকে ছুটে আসছে চিৎকার করতে করতে। মাথার ওপরে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর, অনাবৃষ্টিতে ফেটে ফেটে গেছে মাটি, গাছগুলোর পাতা বিবর্ণ।

একটা বড় অশত্থগাছের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে সূর্য আর যোগানন্দ। যোগানন্দ একটা বিড়িতে ঘন ঘন টান দিচ্ছে আর পিচ পিচ শব্দ করে থুতু ফেলছে মাটিতে। সূর্য একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অগ্রসরমান জনতার দিকে। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার একটু দূরেই রেল লাইন—দু-দিন ধরে ট্রেন বন্ধ।

যোগানন্দ তিক্ত গলায় বললো, এতলোক—এদের হাতে যদি একটা করে যে-কোনো অস্ত্র থাকতো তাহলে ঐ কটা পুলিস রুখতে পারতো ওদের? গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত কুইট ইন্ডিয়া স্লোগান দিলেন আর এটা বুঝলেন না, মেরে না তাড়ালে ইংরেজ

যাবে না। লোকজন যে-রকম ক্ষেপে উঠেছে, কিছু অস্ত্র থাকলে অনায়াসে এক-একটা অঞ্চল স্বাধীন করে ফেলা যেত।

সূর্য বললো, কালকে ইস্তাহারে পড়লাম বিহার ইউ পি-র কয়েকটা জায়গা স্বাধীন হয়ে গেছে—বৃটিশ শাসনের কোনো চিহ্ন নেই।

—কিন্তু ক'দিনের জন্য?

—চিরদিনের জন্য। যুদ্ধে হারতে বসেছে ইংরেজ, আর এ দেশে ফিরতে পারবে না।

—ব্রজগোপালদা, শংকরদাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ হলো না?

—কে কোথায় আছে কোনো ঠিক নেই।

—দাদারা প্রায় সবাই গিয়ে এখন কংগ্রেসে ভিড়েছে। এ বছরই স্বাধীনতা এলে নাম হবে শুধু কংগ্রেসের। আমরা কেউ না। এক সুভাষবাবু যদি সৈন্য নিয়ে ঢুকে পড়তে পারেন, তাহলে উনি অন্তত আমাদের চিনবেন।

—সুভাষবাবু আসছেন ঠিকই।

—কিছুই তো বুঝতে পারছি না। একসঙ্গে আরম্ভ হবার কথা ছিল না? ওদিক থেকে সুভাষবাবু আসবেন, আর এদিক থেকে দেশের মধ্যে সব কিছু অচল করে দিয়ে—। যাকগে, যা থাকে কপালে, আজ আমি মরবো।

সূর্য থানার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললো, আমিও মরবো, কিন্তু মেরে মরবো।

যোগানন্দ বললো, মরে যাওয়াই ভালো। এর পর নিজেদের মধ্যে কত রকম দলাদলি, কাটাকাটি দেখতে হবে কে জানে। আমি জীবনে একবার শুধু ভুল করেছি, কিন্তু বড় বড় নেতারা আরও অনেক বড় ভুল করেছেন।

সূর্য আর যোগানন্দ এখন দু'দিকে ফিরে আছে। সূর্য নজর রেখেছে থানার দিকে। লাল রঙের থানার সামনে খানিকটা ফুলবাগান, গেটের দু' পাশে কতকগুলো সাদা রং-করা টব উল্টে বসানো। গেটের বাইরে একটা জিপ, তার সামনে সারিবন্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে আটজন পুলিস। থানাটা ছোট, কিন্তু গতকাল একটা বড় রকমের কান্ড করে ফেলেছে।

জনতার ঢেউ এর মধ্যে এগিয়ে এসেছে অনেক কাছে। চিৎকার ও সোরগোল এখন স্পষ্ট—উত্তেজিত ও আর্ত চিৎকার, কোনো শব্দ বোঝা যায় না। অনেকেরই হাতে তেরঙা ঝান্ডা। যোগানন্দ বললো, অমর, দ্যাখ, দ্যাখ, একজন বুড়িও পতাকা হাতে নিয়ে এসেছে মিছিলে।

সূর্যর গায়ে গেঞ্জি নেই। জামার মধ্য দিয়ে হাত গলিয়ে সে তার নিজের বুকে হাত বুলোতে লাগলো। শরীরটা শিরশির করছে। একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে—এই ক'টা বছর সে এরই প্রতীক্ষায় ছিল। হরকুমারদার কাছে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, দেশের স্বাধীনতা আসার আগে সে অস্ত্র ছাড়বে না। তার আগে মরতে হয় তো মরবে। আজ কি সেই মৃত্যুদিন?

সূর্য বললো, এবার চলুন। আমরা খানিকটা পেছন দিকে থাকবো!

সেই মানুষের জোয়ার অশত্থগাছটা পেরিয়ে যাবার পর সূর্য আর যোগানন্দ পেছন দিক থেকে ওদের সঙ্গে মিশে গিয়ে খুব শান্তভাবে হাঁটতে লাগলো। ওদের চোখে মুখে কোনো উত্তেজনা নেই, যেন ওরা আগে থেকেই জানে, এর পর কি ঘটবে।

থানার একটু দূরে পুলিস বাহিনী ওদের আটকালো। কিন্তু তরঙ্গ যেমন লাঠি দিয়ে আটকানো যায় না, সেই রকমই একদল লোক ঠেলে ঢুকে যেতে চাইছে ভেতরে। ওদের ভয় ভেঙ্গে গেছে। ওদের কারুর ভাই বা বাবা কাকা গতকালের ঘটনায় নিহত

বা আহত বা বন্দী। কোনো পূর্বনির্দিষ্ট শ্লোগান নেই, হাজার হাজার গলার চিৎকারে কারুর কথাই বোঝা যায় না। শুধু দেখা গেল, একজন লম্বা চেহারার প্রৌঢ় হাত তুলে পাগলের মতন ভাঙা গলায় চিৎকার করছে, বন্ধুগণ, বন্ধুগণ, বন্ধুগণ, আপনারা শুনুন—

কেউ শুনছে না। সূর্য চিনতে পারলো সেই প্রৌঢ়টিকে, তমোনাশ ডাক্তার। সূর্য আর যোগানন্দ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো পেছনে। যেন তারা দর্শক মাত্র।

পুলিসরা লাঠিগুলো আড়াআড়ি করে নিয়ে ভিড় ঠেলছে। কারুকে আহত করার চেষ্টা করছে না। জনতার চেঁচামেচি ক্রমশ বাড়ছে। এই সময় থানার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো তিনজন অফিসার, তার মধ্যে একজন শ্বেতাঙ্গ। ইনি জেলার এস পি, কালকের ঘটনার পর দুর্গ রক্ষা করতে এসেছেন। এস পি সাহেব দারোগার কানে কানে কি যেন নির্দেশ দিলেন। দারোগাটি ভেতর থেকে একটা চোঙা নিয়ে এসে সেটা মুখে লাগিয়ে বলতে লাগলেন, আপনারা শুনুন, আপনারা শুনুন, থানার সামনে জমায়েত হওয়া বেআইনী।

এক প্রবল হই-হইতে ঢেকে গেল দারোগার কথা। পুলিসরা এবার লাঠি উঁচালো মাথার ওপরে। দারোগা আবার বললেন, আপনারা শুনুন, মাননীয় এস পি সাহেব এখানে উপস্থিত আছেন—আপনাদের যদি কোনো বক্তব্য থাকে—তা আপনাদের মধ্য থেকে দুজন প্রতিনিধি শুধু এসে আপনাদের কথা ওনাকে জানাতে পারেন। উনি সুবিচারের আশ্বাস দিয়েছেন! আপনারা—

আবার প্রচণ্ড সোরগোল। মিনিট দুয়েক চিৎকার চ্যাঁচামেচিই চললো। এরই মধ্যে তমোনাশ ডাক্তার সেই জিপ গাড়িটার পাদানিতে উঠে পড়ে মৃগী রোগীর মতন হাত পা ছুঁড়তে শুরু করেছেন। হাওয়ায় উড়ছে তাঁর সাদা চুল, ঘর্মাক্ত মুখে রোদ পড়ে চকচকে, চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। বন্ধুগণ, বন্ধুগণ বলে অবিশ্রান্ত আওয়াজ করে যাচ্ছিলেন। জনতার সোরগোলের এক মুহূর্ত বিরতি পেতেই তিনি বলে উঠলেন, বন্ধুগণ, আবেদন নিবেদনের দিন শেষ হয়ে গেছে। আমরা কোনো আবেদন করতে চাই না। আমরা সমস্ত বন্দীদের মুক্তি চাই। আজই, এই মুহূর্তে। ইংরেজ সরকার যদি বন্দীদের মুক্তি না দেয়—আমরা এখানে আমরণ অনশন করবো। আমরা শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহী। আমরা এদের দেখিয়ে দিতে চাই, বন্ধুগণ, আমরা এদের দেখিয়ে দিতে চাই যে ন্যায়ের শক্তি লাঠি-গুলির চেয়ে কত বেশী। একবার বলো ভাই, বন্দে মাতরম্!

জনতা গর্জন করে উঠলো, বন্দে মাতরম্!

—বলো ভাই—ইংরেজ সরকার, ভারত ছাড়ো!

—ভারত ছা—ড়ো!

তমোনাশ ডাক্তার জনতাকে খানিকটা সংঘবদ্ধ করে ফেলতে পেরেছেন। তাঁর কণ্ঠস্বরের তীব্র আন্তরিকতা সকলকে স্পর্শ করে। তিনি আরও শ্লোগান দিতে লাগলেন—জনতা ঠিক ঠিক সাড়া দিল। দুজন সেপাই এসে হাত ধরে টেনে তাঁকে নামিয়ে দিতে এলো জিপ গাড়ি থেকে—তমোনাশ ডাক্তার আবার উদ্বেল জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, ভাইসব, মনে রাখতে হবে, আমরা সত্যাগ্রহী, আমরা হিংসার আশ্রয় নেবো না। মহাত্মাজী বলেছেন—

সূর্য আর যোগানন্দ এবার চোখাচোখি করলো। তারপর ভিড় ছেড়ে আলাদা বেরিয়ে এসে মাঠ থেকে দুটো বড় বড় ইঁটের টুকরো তুলে নিয়ে অত্যন্ত সাবলীলভাবে

দৌড়ে গিয়ে সে দুটো ছুঁড়ে মারলো থানার দরজার সামনে দণ্ডায়মান অফিসারদের দিকে। অব্যর্থ লক্ষ্য, একটা ইঁট লেগেছে স্বয়ং এস পি সাহেবের কপালে। তিনি মাথায় হাত চেপে বসে পড়লেন। যোগানন্দ হিংস্রভাবে চেঁচিয়ে উঠলো, মার, মার, মার শালাদের!

এর পরই শুরু হয়ে গেল এক অভূতপূর্ব বিশৃংখলা। দু-এক মুহূর্ত বিমূঢ় থাকার পর পুলিস শুরু করে দিল লাঠি চালানো। জনতার মধ্যে বেশির ভাগ লোকই পেছন ফিরে দৌড় দিল—সূর্য আর যোগানন্দ তখন মেশিনের মতন ইঁট ছুঁড়ছে। তাদের দেখাদেখি যোগ দিয়েছে আরও কয়েকজন যুবক। তমোনাশ ডাক্তার তখনও হাত তুলে চেঁচিয়ে যাচ্ছে বন্ধুগণ, বন্ধুগণ—। তাঁর মাথায় এক ঘা লাঠি না পড়া পর্যন্ত তিনি থামলেন না।

ছত্রভঙ্গ জনতার মধ্যে অনেকেই কিছুদূর পালিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলো, এবার কেউ কেউ বাঁশ বা গাছের ডাল ভেঙে এনেছে, ইঁট পাটকেল ছোঁড়ার দলে সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। থানা থেকে বেরিয়ে এসেছে আর একদল পুলিস। সূর্য আর যোগানন্দ ইঁট ছোঁড়া বন্ধ করে, হাতের ধুলো ঝেড়ে পরস্পর আর একবার চোখাচোখি করে এগিয়ে গেল আরো সামনের দিকে।

দু-এক মিনিটের মধ্যে সূর্যকে দেখা গেল থানার ছাদে—তার হাতে একটা তেরঙা ঝাণ্ডা। কি করে সে এত তাড়াতাড়ি ওখানে পেঁাছলো, বোঝাই যায় না। আসলে সবকিছুই ভয়ের সীমারেখা দিয়ে বাঁধা—সূর্য সেই সীমারেখাটা অবলীলাক্রমে পার হয়ে গেছে। সুতরাং তার তো আর কোনো অসুবিধে নেই। সূর্য ইউনিয়ন জ্যাকটা টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে সেখানে লটকে দিল তার হাতের পতাকা। সমস্ত জনতা এক মুহূর্ত নিশ্বাস বন্ধ করে সূর্যকে দেখলো। সূর্য গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো, ইনকিলাব, জিন্দাবাদ। জনতার উদ্দেশে হাতের ইঙ্গিত করে আবার বললো, ইনকিলাব—।

সেদিনের প্রথম গুলি চালানো হলো সূর্যর দিকে। কোনো নির্দেশ না পেয়েই একজন সেপাই গুলি চালিয়েছে—আওয়াজ হবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য ছাদের পাঁচিলের ওপাশে পড়ে গেছে—তাকে আর দেখা গেল না!

ইতিমধ্যে যোগানন্দ জীপ গাড়িটার পেট্রল ট্যাঙ্ক খুলে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন। যোগানন্দ নিজের গায়ের জামাটা খুলে সেই আগুনে ছুঁইয়ে মশালের মত হাতে নিয়ে ছুটে গেল। একজন সেপাইয়ের লাঠির বাড়ি তার ঘাড়ে লাগতেই বাঘের মতন ঘুরে দাঁড়ালো যোগানন্দ, তার বিশাল থাবা দিয়ে সেপাইটির মুখখানা চেপে ধরলো।

যে-কোনো কারণেই হোক পুলিস সেদিন দু রাউণ্ডের বেশি গুলি চালায়নি। আগের দিন বাড়াবাড়ি হয়ে যাওয়ার ফলে বোধ হয় এই রকমই নির্দেশ ছিল। জনতার একটা বেশ বড় অংশ বেপরোয়া মরীয়া হয়ে লড়লো পুলিসের সঙ্গে। লাঠিধারী পুলিসরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ার পর বন্দুকধারী পুলিসরা বেরিয়ে এসে আর কোনো সুযোগ পেল না—তখন জনতা ঢুকে পড়েছে থানার কম্পাউণ্ডে—তাদের পায়ের চাপে ফুলবাগান লণ্ডভণ্ড। এস পি সাহেব রক্তাক্ত মুখে টলতে টলতে বেরিয়ে এসে উন্মাদের মতন চ্যাঁচাতে লাগলেন, ফায়ার! ফায়ার! তাঁর নিজের হাতেও রিভলবার। এই সময় সূর্যকে আবার দেখা গেল থানার ছাদে, তার হাতে খোলা রিভলবার—সে লক্ষ্য ঠিক রেখে অত্যন্ত হিসেব করে গুলি চালাতে লাগলো।

গুলিবিদ্ধ এস পি সাহেবের মুখে এত অসংখ্য পদাঘাত পড়লো যে মানুষটিকে

আর কোনোদিন চেনা যাবে না। কয়েকজন সিপাহী সমেত দারোগাবাবু আত্মসমর্পণ করলেন, তিনজন সিপাহী এবং একজন এস আই মুমূর্ষু। জনতার মধ্যে ষোলো সতেরোজনের অবস্থা সঙ্কটজনক। তাদের মধ্যে একজন তমোনাশ ডাক্তার। ডাক্তারকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেবারও কেউ নেই।

কপাল ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে, খালি গা, যোগানন্দ বিজয়ীর মতন দাঁড়ালো থানার সিঁড়িতে। তার এক হাতে একজন সিপাহীর রাইফেল। জ্বলন্ত চোখে বললো, ভাইসব, কুত্তার বাচ্চারা হেরে গেছে। ঠিকমত মুগুর দিয়ে পেটাতে পারলে সব কটা কুত্তাই মরবে কিংবা পালাবে। আমরা কারুকে ছাড়বো না। আজ থেকে আমরা এই অঞ্চলের লোক সবাই স্বাধীন। ইনকিলাব—

সমুদ্র গর্জন শোনা গেল, জিন্দাবাদ!

যোগানন্দ আবার বললো, ভাই সব, শুধু স্বাধীন হলেই হবে না, এই স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। আপনারা জানেন কি না জানি না, সারা ভারত জুড়েই ইংরজকে পেটানো শুরু হয়েছে—অনেক জেলা স্বাধীন হয়ে গেছে। এই বেয়াল্লিশ সালেই ভারতে সব ইংরেজের কবর খোঁড়া হয়ে যাবে। তবে এ কথাও ঠিক, ভাইসব, শুনুন আমার কথা, আমরা এক্ষুনি সব বন্দীদের মুক্তি দেবো—কিন্তু তার আগে, এক মিনিট ধৈর্য ধরে শুনুন, এই কুত্তার বাচ্চাদের শক্তি কম করে দেখলে চলবে না। যে-কোনো মুহূর্তে সৈন্যবাহিনী এসে পড়তে পারে। সেজন্য আমাদের অনেক কাজ বাকি আছে। রেলে করে যাতে সৈন্যরা না আসতে পারে, সেই জন্য উপড়ে ফেলতে হবে রেললাইন, স্টেশনগুলি পুড়িয়ে দিতে হবে। টেলিগ্রাফে যাতে কোনো খবর না যায়, তাই ধ্বংস করে দিতে হবে সব পোস্ট অফিস। দেরি করার সময় নেই। এক্ষুনি আমাদের দুটো দল যাবে স্টেশন আর পোস্ট অফিসের দিকে। ভয় পেলে চলবে না। স্বাধীনতার জন্য যদি প্রাণও যায়—বলুন একবার, বন্দে মাতরম্—।

সূর্য থানার ভিতর ঢুকে পড়েছে—তার হাতে মস্ত একটা চাবির গোছা। এত কাণ্ডের পরও সে আশ্চর্য রকম অক্ষত রয়েছে—শুধু তার জামাটা ছিঁড়ে গেছে ফালাফালা হয়ে। হাজতঘরে তালা খুলে সে মুক্তি দিচ্ছে বন্দীদের—এত চিৎকার, আনন্দ, কান্নাকাটি—এর মধ্যেও তার মুখ নির্বিকার। একটুও রেখা বদলায়নি তার মুখের, কোনো উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই।

সে যখন বেরিয়ে এলো থানার বাইরে—তখনও যোগানন্দ বক্তৃতা দিয়ে চলেছে। সূর্যকে দেখে যোগানন্দ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জনতাকে উদ্দেশ্য করে আবার বললো, আপনারা দেখুন এই বীর যোদ্ধাকে—আজকের লড়াইয়ে ইনি—

সূর্য তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে রূঢ় গলায় বললো, এখন চলুন!

একটু বাদেই সূর্য আর যোগানন্দের নেতৃত্বে দুটো দল আলাদাভাবে চলে গেল পোস্ট অফিস আর স্টেশনের দিকে। পোস্ট অফিসে কোনো বাধাই পাওয়া গেল না—ক্রুদ্ধ জনতা সেখানে অগ্নুৎসবে মেতে উঠলো। রেল স্টেশনে দুজন সেপাই ছিল পাহারায়—মাত্র আধ ঘণ্টা খণ্ডযুদ্ধেই তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো রেল স্টেশনে—কিছু লোক লুটপাটের সুযোগও ছাড়লো না। সূর্যর তখনো অনেক কাজ বাকি—কিন্তু জনতা অগ্নিকাণ্ডের সম্পূর্ণ দৃশ্যটা উপভোগ না করে তার সঙ্গে যাবে না। সূর্য তখন স্টেশনের কুলি কামিন ও বন্দী সেপাইদের বাধ্য করলো রেল লাইন খুঁড়ে তুলে ফেলতে। কিছুদূর অন্তর অন্তর রেল লাইন অচল করে দেওয়া হলো। মেদিনীপুরের একটি মহকুমা সত্যিই স্বাধীন হয়ে গেল সেদিন—

সে তল্লাটে কোথাও আর বৃটিশ শাসনের চিহ্ন রইলো না। সেদিন রাস্তায় রাস্তায় শুধু চিৎকার আর উল্লাস। যে-কোনো বাড়িতেই লোকেরা হুড়হুড় করে ঢুকে পড়ে খাবার চাইছে। বাড়ির লোকেরাও সানন্দে এনে দিচ্ছে তাদের যা-কিছু আছে। সূর্যকে কোন্ বাড়িতে খাওয়ানো হবে—তা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল লোকের মধ্যে। খবর পাওয়া গেল যোগানন্দ তার দলবল নিয়ে পাশের গ্রামে চলে গেছে আঞ্চলিক কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য।

একটি বাড়ির উঠোনে খেতে বসেছে সূর্য, তাকে ঘিরে রয়েছে একদল মানুষ। অসংখ্য প্রশ্ন, অজস্র উচ্ছ্বাস। সূর্য কারুর কথার উত্তর দিচ্ছে না। মধ্যে মধ্যে খাওয়া থামিয়ে সে চুপ করে বসে থাকছে, তার দু' চোখে জলের পাতলা পর্দা। আজ সে একজন মানুষ খুন করেছে, বিদেশী শত্রু—কিন্তু আনন্দের বদলে তার বুক কাঁপছে। এতক্ষণ চেতনা ছিল না—এখন বারবার চোখে ভাসছে ছবিটা। সূর্য একদিন দেবী সরস্বতীকে স্বপ্ন দেখেছিল। স্বপ্নের মধ্যে ম্লান ছিল সরস্বতীর মুখ। তার বুক থরথর করে কেঁপেছিল সেই সময়। আজও এই হত্যা ও রক্তের দৃশ্যে তার বুক সেই-রকম কেঁপেছে। জীবনে এই শুধু দুবার।

অনেকেই সূর্যকে বারবার ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে। সেসব দিকে মন না দিয়ে সূর্য ওদের বলতে গেল যে রাত্তির বেলা পাহারা দেবার জন্য একটা দল তৈরি করতে হবে। যে পাঁচটি রাইফেল পাওয়া গেছে—সেগুলি কার কার হাতে থাকবে—এখন থেকেই ঠিক করা দরকার। গ্রামে আর কারুর কাছে যদি অস্ত্র থাকে—সেগুলোও জড়ো করতে হবে।

কিন্তু এত কথা বলতে পারলো না সূর্য। খেতে খেতে হঠাৎ উঠে গিয়ে উঠোনের এক কোণে সে বমি করতে বসলো। গল গল করে রক্ত বেরুচ্ছে তার গলা দিয়ে। কোনো এক সময় একটা প্রচণ্ড লাঠির ঘা লেগেছিল তার বুকে—বাইরে থেকে কোনো আঘাত বোঝা যায় না, কিন্তু ভেতরে কিছু গণ্ডগোল হয়ে গেছে। থু থু করে মাটিতে রক্ত ছিটিয়ে মুখ ফিরিয়ে সূর্য অন্যদের উদ্দেশ্য করে বললো, বিশেষ কিছু হয়নি। এটা আমার পুরনো অসুখ।

এগার পেরিয়ে বারোতে পা দেবার পর বাদলের পৈতে হয়ে গেল। উপনয়নের পরই সে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হল, অর্থাৎ তার দ্বিতীয় জন্ম। ভারতের একটি সুপ্রাচীন, আদর্শবান, বুদ্ধিজীবী, সুচতুর ও স্বার্থপর সম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত করার চেষ্টা হলো তাকে।

পৈতের অনুষ্ঠান বড় কষ্টকর। এরকম কষ্ট নাকি সহ্য করতেই হয়—সবাই তাকে শোনালো, ব্রাহ্মণ হবার জন্য বিশ্বামিত্রকে আরও কতগুণ বেশী কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল। বেল কাঠের ধোঁয়া চোখে লাগিয়ে প্রায় সারা বেলা ধরে যজ্ঞ করতে হলো তাকে, গরম সূঁচ বিঁধিয়ে তার দু' কান ফুটো করে সুতো বেঁধে দেওয়া হলো, মাথা তো ন্যাড়া হলোই। কাঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো গেরুয়া রঙের একটা ঝোলা, সেটা নিয়ে গুরুজনদের কাছে ভিক্ষা চাইতে হবে। অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তাকে তিনদিন বন্ধ করে রাখা হলো একটা অন্ধকার ঘরে—পাছে সে কোনো অব্রাহ্মণের মুখ দেখে ফেলে।

এর পরেও পুরো এক বছর নাকি সে বাড়ির বাইরে আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ি ছাড়া আর কোথাও খাদ্যদ্রব্য মুখে দিতে পারবে না। বাড়িতে খাওয়ার সময়ও হঠাৎ একটা কথা বলে ফেললেই তাকে পাত্র ত্যাগ করে উঠে যেতে হবে। গায়ত্রী মন্ত্র মুখস্থ করে পরীক্ষা দিতে হলো—প্রতিদিন দু'বেলা সন্ধ্যা আহ্নিক বাধ্যতামূলক।

কলকাতায় বড়বাবুর আওতায় থেকে ওদের এসব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। বড়বাবু নাস্তিক, তিনি এসবের ধার ধারতেন না। কিন্তু বাদলের দাদামশাই গোঁড়া পণ্ডিত, সনাতন ধর্মের সব কিছুই তাঁর চোখে পবিত্র। তিনি প্রতিদিন ভোরবেলা তাকে ডেকে তুলে আহ্নিক করতে বসাতে লাগলেন এবং দুপুরে রাত্তিরে খেতে বসে তীক্ষ্ণ নজর রাখলেন বাদল্ খাওয়া শুরু করার আগে থালার পাশে পাঁচটি ভাত ঠাকুরকে উৎসর্গ করেছে কি না। শুধু তাই নয়, ভাতের থালা দেবার আগে নিজের হাতে মাটিতে জল ছিটিয়ে আঙুলের গাঁট দিয়ে ওঁ লিখতে হবে—খাওয়া শেষ করার পর থালায় জল ঢেলে সেই জল এক আঙুলে তুলে জিভে ঠেকিয়ে মন্ত্র পড়তে হবে। এবং যে-আসনে সে বসেছিল—সেটা একটুখানি সরিয়ে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। যদি কোনো বেড়াল দৈবাৎ সেই আসন ডিঙিয়ে ফেলে তা হলেই তার মহা পাপ।

দু' চারদিনের মধ্যেই বাদল পাকা বামুন ঠাকুরটি হয়ে উঠলো। সব নিয়ম কানুন শিখে এমন বাড়াবাড়ি করতে লাগলো যে বাড়ির সবাই অবাক। বাদলই তখন অন্যদের ভুল ধরে। দাদামশাই খুব খুশী। খুব মজার চেহারা হয়েছে বাদলের। হঠাৎ লম্বা হতে শুরু করায় হাফ প্যাণ্টের নীচে পা দুটো ধ্যাড়েঙ্গা দেখায়। কানের ফুটো দুটো একটু একটু পেকে সুতো আটকে গেছে—আর খোলা যায় না—কেউ খোলার চেষ্টা করলেই সে বাবারে মারে চিৎকার করে। ফলে, তার দু' কানে দুটো সুতোর টুকরো, গলায় মোটা পৈতে। ন্যাড়া মাথায় খড়খড়ে চুল উঠেছে—বড়রা সুযোগ পেলেই মাথায় একবার করে হাত বুলিয়ে নেয়। ছোটরা বা সমবয়েসীরা চাঁটি মেরে দৌড়ে পালায়—কেউ কেউ একটা ছড়াও বলে, 'নাইড়া মাথা কইড়া থাল, টাক দিলে যায় বরিশাল'।

এই সময় বাদলের কিছু বিষয় সম্পত্তি হলো। উপনয়ন অনুষ্ঠানে এইটুকুই আনন্দের দিক। মুষ্টিভিক্ষার সময় গুরুজনেরা চাল দেবার সঙ্গে সঙ্গে রুপোর টাকা দিয়েও ঝুলি ভরিয়েছেন। এ ছাড়া সে পেয়েছে একটা পেন, মাউথ অর্গান, সুটকেস, জ্যামিতির বাক্স, ব্যাডমিণ্টন র‍্যাকেট এবং অনেকগুলি বই। পেনকে তখন বলা হতো ফাউণ্টেন পেন, কারুর কারুর মুখে শোনা যেত ঝরণা কলম—বাদল সেই প্রথম একটি ফাউণ্টেন পেন-এর মালিক হলো। কলমটির নাম ওয়াটারম্যান—প্যাঁচ ঘোরালে নিবটি ভেতরে ঢুকে যায়—একটি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। বাদল অবশ্য সেটি ব্যবহার করার অধিকার পেল না—কেননা ফাউণ্টেন পেন দিয়ে লিখলে হাতের লেখা খারাপ হয়ে যায়—গুরুজনরা এই নির্দেশ দিলেন। টাকা পেয়েছে সে একশো বত্রিশটি—সেগুলি তার মা নিজের কাছে রেখে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাদল তাতে কিছুতেই রাজি নয়। তার যাবতীয় সম্পত্তি সে নিজের সুটকেশটিতে ভরে খাটের নীচে রেখে দেয়—দিনের মধ্যে সাত আটবার সেটি খুলে খুলে দেখে—মহাজনের মতন রুপোর টাকাগুলো ঠং ঠং করে গোণে।

নতুন বামুন হবার ফলে বাদলকে প্রায়ই নানা বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে হয়। প্রায়ই লোকের বাড়িতে তিনজন ব্রাহ্মণ বা এগারো জন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাবার অনুষ্ঠান লেগেই থাকে—বাদল তাদের মধ্যে অতি অবশ্য একজন। শুধু পেট পুরে খাওয়াই নয়, সেই সঙ্গে সে দক্ষিণা পায় পাঁচ সিকে পয়সা, একটা নতুন পৈতে। কখনো কখনো একটা মাটির কলসি এবং গামছা। এক এক জায়গা থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে ক্ষুদে বামুনটি যখন এইসব জিনিসপত্র দু' হাতে নিয়ে বাড়িতে ঢোকে তখন হাসির ধুম পড়ে যায়। সবাই মিলে তার ন্যাড়া মাথায় চাঁটি মেরে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

বাদলের মামাবাড়ির সামনেই একটা দিঘি। দিঘিটা যেমন বড়, তেমনি সুদৃশ্য। দিঘির চার কোণে চারটি ছোট মন্দির, দু' দিকে মস্ত বড় বাঁধানো ঘাট, কচুরিপানা মুক্ত স্বচ্ছ জল। দিঘির যে-দিকে বাদলদের বাড়ি, তার বিপরীত দিকে ফুলের বাগান—দূর থেকে সেটিকে অরণ্য বলেই মনে হয়। দিঘিটিতে অনেক মাছ আছে, তা ছাড়া স্থানীয় লোকের বিশ্বাস এই যে এটির ঠিক মাঝখানে মস্ত বড় গহ্বরে একটি রহস্যময় অতিকায় জলজন্তু আছে—বছরে একবার মাত্র তাকে জলের ওপরে ঘাই মারতে দেখা যায়। এবং দুপুরের দিকে, যখন চারদিক সুনসান, ঘাটে কেউ থাকে না—সেই সময় নাকি প্রাণীটি মাঝে মাঝে ভেসে উঠে হাওয়া খায়। একবার ঐ দিঘির জলে একটা বেশ বড় গোসাপকে মরা অবস্থায় ভাসতে দেখে সকলেই সিদ্ধান্ত করেছিল—মাঝখানের সেই রহস্যময় প্রাণীটিই একে মেরেছে—কেননা গোসাপের মতন দুর্ধর্ষ প্রাণী এমনি এমনি মরবে কেন? অবশ্য সেই প্রাণীটি মানুষের কোনোদিন কোনো ক্ষতি করেনি—প্রত্যেক দিঘিতেই মাঝে মাঝে কেউ ডুবে মরে—কিন্তু এ দিঘিতে সে রকম কখনো হয়নি। এমনকি, বহুদিন আগে এ বাড়ির এক নতুন বউ এই দিঘিতে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেও বেঁচে ওঠে। পরে সেই বউটির মৃতদেহ পাওয়া যায় বাড়ির ছাদে, ভূতে তার ঘাড় মটকে দিয়েছিল।

এই দিঘির পাড়েই বাদলের দিনের অধিকাংশ সময় কাটে। এর মধ্যে তাকে মাছ ধরার নেশায় পেয়ে বসেছে। একটা ছোট ছিপ নিয়ে দিঘির ঘাটলায় এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে এবং একা থাকলেই সে নিজের সঙ্গে কথা বলে। জলের দিকে তাকিয়ে সে কখনো কখনো এত জোরে জোরে কথা বলে যে দূর থেকে শুনলে যে-কেউ ভাববে সে বুঝি কারুর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করছে। সে নিজের ডান ও বাঁ হাতের সঙ্গে কথা বলে, গাছ থেকে খসে পড়া শুকনো পাতার সঙ্গেও তার অনেক কথা আছে।

দিঘিতে লোকজন স্নান করতে এলে সে একটু বিরক্ত হয়—তখন জলে ঢেউ ওঠে, তার ফাৎনা নড়ে যায়। স্নান করতে নেমে সবাই এত গল্প করে যে মাছ আর ধারে কাছে আসে না। বাদল রোজই কিছু কিছু মাছ পায়—পুঁটি, ট্যাংরা, চাঁদা মাছ সেই জলে অজস্র। একদিন সে একটা মাঝারি সাইজের কাৎলাও ধরে ফেলেছিল, সেদিন সে বাড়ি ফিরেছে নাচতে নাচতে। মাছ ধরার আনন্দ যে কি, যে কখনো বঁড়শীতে মাছ ধরেনি, সে বুঝতে পারবে না। বাদলের মামাবাড়ির রান্নাঘরে প্রায় প্রতিদিনই রাজসূয় যজ্ঞ চলে—সেখানে অবশ্য ঐ সামান্য মাছের কোনো মূল্যই নেই—ওগুলো বাদলকে আলাদাভাবে ভাজা করে দেওয়া হয়, সে অমৃত আস্বাদের মতন মুখ করে খায়।

বাদল নিজে যখন স্নান করতে নামে, তখন সেও ঘণ্টা খানেকের কমে ওঠে না। সাঁতার সে আগে থেকেই জানতো, এখন জলের পোকার মতন সাবলীল। জলের মধ্যে দাপাদাপি করে, অন্যদের সামনে সাঁতারের কায়দা দেখায়—বাজি ফেলে এপার ওপার করে। মা কিংবা মামাদের ধমক খেয়ে শেষ পর্যন্ত যখন ওঠে, তখন তার দু'চোখ লাল।

দিঘির পাড়টা বাদল সবচেয়ে বেশী উপভোগ করে দুপুরবেলা। জলের ধারের নির্জনতার মধ্যে একটা আলাদা গাম্ভীর্য আছে। প্রখর রোদ্দুরে ঝকঝক করে জল, অনেক সময় চোখ ধাঁধিয়ে যায়—আবার মেঘ এলেই চরিত্র বদলে যায় জলের। এক এক সময় হাওয়া কতকগুলো ছোট ছোট তরঙ্গকে অনেক দূর টেনে আনে আবার ভেঙে দেয় নিজের খেয়ালে। বাদল চোখ টান করে চেয়ে থাকে দিঘির মাঝখানে—যদি সেই রহস্যময় জন্তুটিকে দেখা যায়। একটা অজানা রহস্যকে জানার আগ্রহে টন

টন্ করে তার বুক। কোথাও একটা মাছ জলের ঝাপটা দিলেই সচকিত হয়ে ওঠে সে। কোনোদিন কিছু দেখা যায় না বটে কিন্তু সেই নির্জন দুপুর, সেই একা জলের ধারে বসে থাকা, রৌদ্র ও বাতাসের খেলার মধ্যে বারো বছর বয়েসটা বড় মোহময় হয়ে ওঠে।

বিকেল শেষ হয়ে আলো কমে এলেও বাদল দিঘির ধার ছাড়তে চায় না, তার দিদি তাকে রোজ ডাকতে আসে। ছিপ গুটিয়ে মাছের খালুই হাতে নিয়ে বাড়ি ফেরে বাদল। ঠাকুর দালানের পাশে দুটো গাছে ফুটে থাকে এক ঝাঁক সন্ধ্যামালতী ফুল। ফুল না ছিঁড়ে মুখটা অনেক নীচু করে বাদল গন্ধ নেবার চেষ্টা করে। তারপর দৌড়ে গিয়ে বাড়ির মধ্যে হাত পা ধুয়ে এসেই আবার সে এসে পড়ে ঠাকুর দালানের সিঁড়িতে। প্রতিদিন পুজোর পর পুরুতমশাই ভেজা আতপ চাল আর কলা চটকে মাখা প্রসাদ দেন তাকে, তার অপূর্ব লাগে। খাঁটি বামুন হচ্ছে তো সে—তাই চাল কলার ভক্ত হয়ে উঠেছে।

একদিন দুপুরে দিঘিতে স্নান করার সময় বাদলের পৈতে হারিয়ে গেল। দিদিদের সে ডুব সাঁতারের খেলা দেখাচ্ছিল, কখন পৈতেটা খুলে গেছে। নতুন বামুনের পৈতে হারানো তো এক সাংঘাতিক ব্যাপার। যতক্ষণ না কোনো সদবিপ্র নতুন পৈতের গ্রন্থী দিয়ে দিচ্ছেন ততক্ষণ বাদল কথা বলতে পারবে না। ফ্যাকাসে মুখ করে সে উঠে এলো জল থেকে—তাকে দেখেই সবাই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে খুব মজা পেয়ে গেল। মামাতো ভাই বোনেরা প্রাণের সুখে চাঁটি মারতে লাগলো তার ন্যাড়া মাথায়। বাদল ইশারা ইঙ্গিত করছে আর হাত পা ছুঁড়ছে—এমন কি তার কাঁদবারও উপায় নেই, তা হলে শব্দ বেরিয়ে যাবে। যেখানেই সে পালাতে যায়—ভাই বোনেরা ঘিরে ধরে তাকে চাঁটি মারে। বাদলের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে আর সবাই হাসছে হো হো করে। তার মুখ দিয়ে শব্দ বার করার জন্য দু'তিনজন তাকে চেপে ধরে কাতুকুতু দিতে লাগলো। বাদল কোনোক্রমে তাদের হাত ছাড়িয়ে আশ্রয় নেবার জন্য ছুটে গেল তার মায়ের কাছে।

বাদলের মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে নাদের আলির সঙ্গে কথা বলছিলেন। ছেলেকে দেখেই বললেন, এই বাদল, তোর নামে একটা চিঠি এসেছে!

বাদল বিস্মিতভাবে বললো, কি?

মামাতো ভাই বোনেরা পেছন পেছন এসেছে, তারা চেঁচিয়ে উঠলো, এ মা, এ মা, কথা বলে ফেলছে! এ মা—।

বাদল লজ্জা পেয়ে গেল—কিন্তু একবার কথা বলাও যা, দু'বার কথা বলাও তা। সে আবার বললো, আমার চিঠি? কোথায়?

পৈতে না থাকা অবস্থায় কথা বলে ফেলার দোষে বাদলকে খাতার পাতায় একশো আটবার শ্রীশ্রী দুর্গা নাম লিখতে হয়েছিল—কিন্তু চিঠি পাওয়ার আনন্দের তুলনায় সে কষ্ট কিছুই না। তার জীবনের প্রথম চিঠি। খামের ওপর গোটা গোটা অক্ষরে তারই নাম লেখা—শ্রীযুক্ত বাদলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

চিঠিখানা প্রথমে খুলতেই ইচ্ছে করে না। বাদল বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, গন্ধ শোঁকে। মনে মনে ভাববার চেষ্টা করে, কে লিখেছে? সূর্যদা কি তাকে চিঠি লিখবে? সূর্যদা সবার ওপর রাগ করে চলে গেছে—সূর্যদার রাগ বড় সাংঘাতিক।

এক খামের মধ্যে দুটো চিঠি। ভাগলপুর থেকে লিখেছে বিষ্ণু আর রেণু। মছলন্দপুরের জল হাওয়া সহ্য না হওয়ায় রেণুরাও চলে এসেছে ভাগলপুরে। নিশ্চয়ই

খুব মজা করছে ওরা।

বিষ্ণুর চিঠি তিন পাতা আর রেণুর চিঠি পৌনে এক পাতা মাত্র। বাদল সারা দিনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চিঠি দু'খানি প্রায় দশ বার করে পড়লে—মুখস্থ হয়ে গেলেও তার আশা মেটে না। কত দূরে আছে তার বন্ধুরা—অথচ চিঠি পড়লে মনে হয় কত কাছে।

বিষ্ণু বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে শিখে গেছে এর মধ্যেই। সে তার পাহাড়ে ওঠা ও পাথর সংগ্রহ বিষয়ে লিখেছে অনেকখানি—ইতিমধ্যে ওরা একবার মণিহারিঘাটে বেড়াতে গিয়েছিল, সে বিবরণও রয়েছে বিস্তৃতভাবে—আর আছে তার নতুন পড়া বইয়ের কথা। 'লে মিজারেবল' বইখানি পড়তে পড়তে তার বারবার কান্না পেয়েছিল এ কথাও জানিয়েছে। বাদল কি পড়েছে বইখানা? না হলে, বিষ্ণু বইখানা পার্সেল করে পাঠাতে পারে। বাদলরা আর কতদিন থাকবে পাড়াগাঁয়ে? বিষ্ণুরা আর তিন সপ্তাহ বাদেই কলকাতায় ফিরবে?

রেণুর চিঠির অক্ষরগুলো আধ ইঞ্চি মাপের এবং কাটাকুটিতে ভরা। সে লিখেছে, বাদলদা, তুমি কেমন আছো? আমি ভালো আছি। আমি অনেক নদী দেখিয়াছি। নদীতে ঢেউ থাকে। আমরা এখানে খুব খেলা করি। মা বাবা ভালো আছেন। দাদা ভালো আছেন। ইল্লু খুব দুষ্টু। সে আমার কথা শোনে না। পূজ্যপদে প্রণাম। ইতি ইন্দ্রানী।

পরবর্তী কালে রেণু বাদলকে যে কয়েক হাজার চিঠি লিখেছিল—এখানেই তার সূত্রপাত। রেণু লিখেছে ইল্লু বড় দুষ্টু—অথচ ইল্লু যে কে সে কথা জানাবার প্রয়োজন বোধ করে নি। পরবর্তীকালেও রেণুর সব চিঠিতে এই রকম একটা কিছু রহস্যময় ব্যাপার দেখা গেছে।

বাদল রেণুকে লিখেছে এরও দ্বিগুণ সংখ্যক চিঠি। অধিকাংশ চিঠিই পরস্পরের হাতে হাতে দিয়েছে। কোনো কোনো দিন ওরা এক ঘণ্টা দু' ঘণ্টা গল্প করার পরেও বাদল রেণুকে বলেছে, তোমার জন্য একটা চিঠি। দাও, বলে রেণু হাত বাড়িয়েছে। কখনও এমনও হয়েছে, বাদল রেণুকে বলেছে, কাল রাত্তিরে তোমাকে একটা চিঠি লিখেছিলুম, ছিঁড়ে ফেলেছি! রেণু দপ করে জ্বলে উঠে বলেছে, কেন? বাদল মুচকি হেসে উত্তর দিয়েছে, তার মধ্যে অনেক আনসেনসরড কথা ছিল। রেণু তাও ধমকের সুরে বলেছে, আমাকে লেখা চিঠি ছিঁড়ে ফেলার কোনো অধিকার তোমার নেই।

এ সব অনেক দিন পরের ব্যাপার। তখন ওরা পরস্পরের জন্য দুঃখ পেতে শুরু করেছে। সে দুঃখবোধ এখন জাগার কথা নয়। এখন বাদল সদ্য দ্বাদশবর্ষীয় বালক, তার জীবনের প্রথম চিঠি পেয়ে আনন্দে উতলা, বাড়ির আনাচে কানাচে একটু নিভৃত স্থান দেখলেই সেই চিঠি খুলে বসছে।

চিঠির উত্তর দেবার জন্য বাদলের পুরো দেড়দিন সময় লাগলো। কত যে কাগজ সে ছিঁড়লো, তার ঠিক নেই। একটাও তার পছন্দ হল না। শেষ পর্যন্ত চিঠি খামে ভরে হাটতলার ডাকে ফেলবার জন্য দিল নাদের আলির হাতে এবং তার সঞ্চয় থেকে পুরো একটা টাকা দিয়ে ফেললো নাদের আলিকে। বাদলের চিঠি থেকে উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হলো না—! শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে তার দুটো চিঠিই মিথ্যে কথায় ভরা। বড় দিঘির রহস্যময় জলজন্তুটিকে সে সচক্ষে দেখার দাবি করেছে এবং তার বঁড়শীতে মাছগুলির আয়তন দু'হাত বিস্তার করে বোঝাতে হয় ইত্যাদি। তার কল্পনাশক্তির এই বহর দেখেই অনুমান করা যেতে পারে যে ভবিষ্যতে সে একজন

লেখক হবে।

ইতিমধ্যে এখানেও বাদলের কয়েকজন বন্ধু হয়েছে। নাদের আলির সঙ্গেও তার বন্ধুত্ব অনেক দানা বেঁধেছে—কিন্তু নাদের আলি শুধু তাকে গল্পই শোনায়—কিছুতেই তিন প্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যায় না। সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেই শুধু বলে, আর একটু বড় হও দাঠাকুর—আর একটু বড় হও!

বাদল এই নিয়ে কান্নাকাটি করেছে পর্যন্ত। গল্প শুনতে শুনতে তিন প্রহরের বিল তার কাছে স্বপ্নের দেশ হয়ে গেছে—সেখানে সত্যি সত্যি দেখা যায় সূর্যদেব জলে স্নান করতে নামছেন সন্ধ্যেবেলা, জলে গুলে যাচ্ছে তাঁর গায়ের লাল রং, আর সেই মুহূর্তেই ডানা মেলে এক হাজার হাঁস ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই জলে—এ দৃশ্য বাদল দেখবে না? নাদের আলি মিথ্যে স্তোক বাক্য দেয়। যখন তার বিলে যাবার কথা থাকে—তখন খুব ভোরবেলা বাদলকে কিছু না জানিয়ে চলে যায়।

বাদলের সমবয়েসী বন্ধু বান্ধবও হয়েছে। মাস দেড়েক বাদে তাকে পুকুর ঘাটের নিভৃত খেলা ছেড়ে স্কুলেও ভর্তি হতে হলো। এখানকার স্কুলে ক্লাস এইটে ভর্তি হয়েও দেখা গেল সে অত্যন্ত ভালো ছাত্র হিসেবে মাস্টারমশাইদের প্রশংসা কুড়োচ্ছে। বাদলের পড়াশুনোর তেমন মনোযোগ কখনো দেখা যায় নি—কিন্তু কলকাতার স্কুলের শিক্ষার মানের তুলনায় এখানকার মান এতই নীচু যে সবাই বলতে লাগলো, এ ছেলে ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হবে। আসলে সে মোটামুটি শুদ্ধভাবে ইংরেজি উচ্চারণ করতে পারে এতেই সবাই মুগ্ধ। এখানকার অধিকাংশ ছেলে অ্যাসিড-কে বলে এসিড আর গেটকে বলে গ্যাট। আর বার্ড কথাটা তো কেউই উচ্চারণ করতে জানে না—মাস্টার-মশাইরাও না। এত প্রশংসা শুনে বাদল খুবই লজ্জা পেত যদিও কিন্তু এতে তার খানিকটা উপকারও হয়েছিল। প্রশংসার যোগ্য হবার জন্য সে সত্যিই পড়াশুনোর দিকে ঝুঁকলো এবং প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা হ্যারিকেনের আলোর সামনে বই খুলে বসতে লাগলো।

ইস্কুলের সুশিক্ষার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে কুশিক্ষাও হতে লাগলো পাড়ার বন্ধুদের কাছে। মামাবাড়ির দিঘির পশ্চিম কোণে চক্রবর্তীদের বাড়ি, সে বাড়িতেও এক গাদা ছেলে মেয়ে। ও বাড়ির ছেলে পান্নালাল বাদলের চেয়ে বছর দুয়েকের বড় হলেও পড়ে নীচু ক্লাসে। কিন্তু সে খেলাধুলোয় ওস্তাদ। এবং সে অবিকল বয়স্ক লোকদের মতন গলা করে কুৎসিত গালাগালি দেয়।

পান্না নিত্য নতুন খেলা উদ্ভাবন করে এবং তার খেলায় যোগদান না করে উপায় নেই। বস্তুত শিশু ও কিশোর মহলে সে একটা সাম্রাজ্য বিস্তার করে আছে—তার হুকুম অগ্রাহ্য করার সাহস কারুর নেই। তার গায়ে যে অসম্ভব জোর। পান্নার অধিকাংশ খেলাই শেষ হয় মারামারিতে। সে বাড়ুজ্যে ও চক্রবর্তী বাড়ির ছেলে মেয়েদের নিয়ে দুটি আলাদা দল করে ফেলে—এবং কুরু পাণ্ডবের মতন এই দলে যুদ্ধ ঘোষণা হয় প্রায়ই। আমবাগানের দু'পাশে দুটো দল জড়ো হয় ইঁট পাটকেল ও কঞ্চির তীর ধনুক নিয়ে। কিছুক্ষণ এসব ছোঁড়াছুঁড়ি হয়—কিন্তু সবাই জানে শেষ পর্যন্ত পান্নার সঙ্গে কেউ পারবে না—পান্না এক একজনকে ধরে ধরে সাংঘাতিক মারে—অল্পবয়স্ক ও দুর্বল ছেলেদের মারধোর করে সে অসম্ভব আনন্দ পায়। তার মারার মধ্যে অনেক কায়দাও আছে। পরাজিত শত্রুকে সে প্রথমে বন্দী করে। তারপর বিচার হয়, তারপর শাস্তি। সে একাই সেনাপতি, বিচারক ও জল্লাদ। বাদলের কানের সুতো একটানে খুলে ফেলে সে একদিন রক্ত বার করে দেয়। আর একদিন

বাদলকে সে মাটিতে কুড়ি হাত জায়গা নাকে খৎ দিতে বাধ্য করে। এ নিয়ে কারুর কাছে নালিশ জানানো যাবে না। কারণ এ সবই তো খেলা।

মার খেতে খেতে নাজেহাল হয়ে গিয়ে বাদল শেষ পর্যন্ত একটা ফন্দি বার করে ফেললো। সে পান্নালালের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলো। এবং পান্নালালের প্রিয়পাত্র হওয়া মানেই তার সমস্ত কুকার্য সমর্থন করা। পান্নালালের হুকুমে বিড়ি কিনে আনতে হয় দোকান থেকে—এবং পান্নার এ'টো বিড়িতে টান লাগাতেও হয় তাকে। দু'এক টান দিয়েই কাশতে কাশতে বাদলের চোখ লাল হয়ে যায়, জল পড়ে—তাই দেখে পান্নালাল হি হি করে হাসে। ভারী খুশী হয় সে। বাড়ি ফেরার আগে মুখের গন্ধ লুকোবার জন্য বাদল লেবু গাছের পাতা ছি'ড়ে চিবোয়।

একদিন আমবাগানের অনেকটা ভেতরে প্রায় জঙ্গলের মধ্যে কয়েকজন ছেলে মিলে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছিল—এই সময় সেখানে চিনু নামে একটি মেয়ে হঠাৎ হাজির হলো। চিনুর মা একজন দুঃখী বিধবা—বাদলের মামা বাড়িতেই আশ্রিতা। কিছু একটা আত্মীয়তাও আছে—কিন্তু ঝি চাকরানির বেশী সম্মান নেই। চিনুও ঘর মোছার কাজ করে। চিনুকে দেখেই পান্না হুংকার দিয়ে উঠলো, স্পাই! স্পাই! ও এখানে কেন?

মহাযুদ্ধের সুবাদে তখন স্পাই ও ফিফ্থ কলামিস্ট শব্দ গ্রামে গ্রামেও পে'ৗছে গেছে। নানারকম গুজব সব সময় বাতাসে ভাসে। সুতরাং খেলার যুদ্ধে একজন স্পাইকে পেয়ে ওরা খুব উৎসাহ পেয়ে গেল। স্বয়ং হিটলারের চেয়েও কড়া গলায় পান্না হুকুম করলো, ওকে বে'ধে নিয়ে আয়।

চিনু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ছেলেরা লতা দিয়ে তাকে বে'ধে ফেললো আষ্টেপৃষ্ঠে। টানতে টানতে তাকে নিয়ে এলো পান্নার সামনে। পান্না জিজ্ঞেস করলো, কে তোকে পাঠিয়েছে? বল্?

চিনু বেচারা কিছুই বোঝে না। এমনিতেই সে একটু বোকাসোকা। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। পান্না বাদলকে হুকুম করলো, এই, ওকে মার তো এক থাপ্পড়! ওকে টর্চার করতে হবে। হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা সবাই মিলে ধপাধপ করে মারতে লাগলো চিনুকে। চিনু ভ্যাঁ করে কে'দে উঠতেই পান্না তার চুলের মুঠি ধরে বললো, চুপ। একটা শব্দ শুনতে চাই না। যদি কারুকে কিছু বলবি তো, মেরে খুন করে ফেলবো।

মাটিতে ফেলে সবাই মিলে চিনুকে আরও কিছুক্ষণ ধরে মারলো। পান্না তার নিষ্ঠুরতার আনন্দ সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। বস্তুত সব বালকই নিষ্ঠুর, পান্না সেটা উসকে দিয়েছে মাত্র।

এর পর চিনু কয়েক দিন মরণাপন্ন অবস্থায় জ্বরে ভুগলো। চিনুর মা কাঁদলো নিজের ভাগ্যকে দোষ দিয়ে। আর বাদল চোরের মতন ঘুরতে লাগলো সারা বাড়ি। যদি চিনু নাম বলে দেয়! চিনু কিছুই বলেনি। তবু একদিন মধ্যরাত্রে ঘুমের মধ্যে কাঁদতে কাঁদতে উঠে বসলো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আর থামে না। বাদলের মা তাকে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন ব্যাকুলভাবে, কি হয়েছে? কি হয়েছে? স্বপ্ন দেখেছিস? বাদল মাকে জড়িয়ে ধরে বললো, আমি আর কোনো দিন করবো না, আমি আর কোনো দিন করবো না।

॥ ৪০ ॥

সূর্য চলে যাবার পর বাদলের চোখের সামনে একটা সাময়িক শূন্যতা তৈরী হয়। অতি অল্প বয়েস থেকেই সূর্য তার হীরো, সূর্যর হাবভাব চালচলন সব কিছুতেই সে মুগ্ধ—অন্ধভাবে অনুকরণ করারও চেষ্টা করেছে। সূর্যর অনুপস্থিতিতে সূর্যর কোনো বিকল্প সে খুঁজে পেল না। অথচ বয়ঃসন্ধিকালের অস্থিরতায় সে একজন কারুকে অবলম্বন করতে চায়। সে রকম কোনো শিক্ষক নেই, সে রকম কোনো আত্মীয় নেই। এই শূন্যতার কথা বাদল বুঝতে পারে না—সে এর ওর কাছে গিয়ে জীবনের একটা প্রতিভাস পাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে।

তার মামাবাড়িতে অনেক মানুষ। দীর্ঘজীবীদের বংশ, তার দাদামশাইয়ের মা পর্যন্ত এখনো বেঁচে আছেন, একানব্বই বছর বয়েস। এমন অনেক মানুষজন আছে যাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্র খুঁজতে হলে কাগজ-কলম নিয়ে বসতে হয়। এক থেকে একানব্বই বছর বয়েসী প্রায় চল্লিশ জন মানুষ এ বাড়িতে মিলে মিশে আছে। কখনো কখনো বাদলের সেজ মাসীর এক বছরের ছেলে দুলালকে বসিয়ে দেওয়া হয় দাদা-মশাইয়ের মায়ের কোলে। একানব্বই বছরের পুরোনো একটি হাত সেই নতুন শিশুকে আদর করে।

বাদলের দাদামশাই বেশ প্রতাপশালী পুরুষ। যদিও চেহারাটি ছোটখাটো—তবু তাঁকে দেখলেই সবাই সম্ভ্রমে চুপ করে যায়। তিয়াত্তর বছর বয়েস, মাথার সব চুল সাদা কিন্তু শরীরে কোনো রোগ নেই। তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, সামান্য অবস্থা থেকে বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন--ওদিকে আবার সংস্কৃত কাব্য ও রস শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান আছে যথেষ্ট। সাহেবদের পছন্দ করেন, মেমসাহেবদের ঘৃণা করেন। তাঁর এক ছেলেকে ডাক্তারী পড়তে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন, সে মেম বিয়ে করে আর ফেরেনি।

দাদামশাইয়ের স্বভাব অনেকটা প্রাচীন আদিবাসী গোষ্ঠীর নেতার মতন। নিজ পরিবার বা গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি প্রাণপাত করতে প্রস্তুত, নিজের জাত গোত্রের কেউ বিপদে পড়ে সাহায্য চাইতে এলে তিনি তাদের প্রতি উদার ও দয়ালু, তাঁর অনেকগুলি নাতি নাতনীর মধ্যে যেকোনো একজনের সামান্য সর্দি জ্বর হলেও তিনি উতলা হয়ে পড়েন—কিন্তু বাইরের কোনো লোক সম্পর্কে তাঁর কোনো দুর্বলতা নেই। নিজের গোষ্ঠীর বাইরে বাদ-বাকি মানুষ শুধু শোষণ বা অবহেলা করার জন্য। বাড়িতে ভিখিরি এলে তিনি দারোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দেন কিন্তু তাঁর বাবার বাৎসরিক কাজের দিন একশো জনের পাতা পেড়ে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করেন। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য যে-কোনো জাতের লোকের প্রতি তাঁর একটা আন্তরিক ঘৃণা আছে, কথাবার্তাতেও সেটা প্রকাশিত হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও আবার শ্রেণীভেদ আছে—তিনি নিজে রাঢ়ী শ্রেণীর বলে অপর ব্রাহ্মণরা তাঁর কাছে উপহাসের পাত্র।

অন্ধ সংস্কারের মধ্যেও এমন একটা জোর আছে, যা চোখ ধাঁধায়। নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রচারকদেরও যেমন ভক্তের অভাব হয় না। বাদল ক্রমে ক্রমে তার এই দাদা-মশাইয়ের ভক্ত হয়ে উঠছিল। মনে মনে সে দাদামশাইকে পুজো করতে লাগলো। বড় হয়ে তুমি কি হতে চাও বাদল? আমি দাদামশাইয়ের মতন রাগী লোক হবো।

যে-বাড়িতে অনেক মানুষ, সে বাড়িতে কিন্তু আসলে অনেকেই কিছুটা নিঃসঙ্গ—অনেকেই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে থাকে। বাদলও ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে ছিল। বাবার

সঙ্গে আজকাল তার প্রায় দেখাই হয় না। চিররঞ্জন শ্বশুরবাড়ির আশ্রয়ে থেকে এরই মধ্যে বিরক্ত হয়ে পড়েছেন—এবং একটা কিছু কাজের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করছেন ইদানীং। এই গ্রামে কিংবা কাছাকাছি কোনো জায়গায় তাঁর পক্ষে চাকরি করা সম্ভব নয়—অত বড় শ্বশুরের জামাই হয়ে সাধারণ চাকরি করলে তাঁর নিন্দে হয়ে যাবে। তা ছাড়া পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েস হয়ে গেছে—এখন তাঁকে যেচে চাকরি দেবেই বা কে? যুদ্ধ কতদিন চলবে তার ঠিক নেই—ততদিন কি তাঁকে ঘরজামাই হয়ে থাকতে হবে? চিররঞ্জন নিজের দেশের বাড়ি-ঘরের খোঁজ করতে চলে গেলেন।

বাদল তার মাকেও বেশি সময় কাছে পায় না। হিমানী এই বাড়ির কর্মস্রোতের মধ্যে মিশে গেছেন। তাঁর ইচ্ছে, তাঁর মেয়ে সান্ত্বনার বিয়েটা এখানে থাকতে থাকতেই দিয়ে যাবেন। নিজের স্বামীর ওপর ভরসা নেই হিমানীর—বাবার আশ্রয়ে থেকে মেয়ের বিয়ে চুকিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া যায়। পনেরো বছর হলেও সান্ত্বনাকে বেশ বড়-সড়ো দেখায়।

মামাতো-মাসতুতো ভাই-বোনের সংখ্যা অনেক হলেও বাদলের সমবয়েসী ঠিক কেউ নেই। বড়োরা তাকে দূরে সরিয়ে রাখে, ছোটদের দলে গিয়ে সর্দারি করতেও তার ভালো লাগে না। সেইজন্যই সে তার দাদামশাইয়ের ন্যাওটা হয়ে পড়লো।

পূর্ববঙ্গের একটি নিস্তরঙ্গ গ্রাম। যুদ্ধের কোনো ঝাপটা এখানে এসে পৌঁছোয় না, বিশাল ভারতবর্ষের সঙ্গে এর যোগাযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ। গান্ধী-সুভাষ-নেহরু এগুলো নিছক কয়েকটি নাম মাত্র—মাঝে মাঝে অবশ্য পাকিস্তান তৈরীর দাবির কথা শোনা যাচ্ছে কানাঘুষোয়—বাদলের দাদামশাইয়ের মতন মানুষরা সে সব তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেন। ঠাকুর-দালানে বসে হেসে ওঠেন উঁচু গলায়। সাধারণ মানুষ শুধু ভাবে—এ বছর ভালো ফসল হবে, কি হবে না। সেই স্বপ্নের সুদিন কি কোনো-দিন আসবে—যেদিন সোনার ফসলে মাঠ ভরে যাবে, শোধ হয়ে যাবে সমস্ত ঋণ, জমিদারবাবুর সামনে হেসে কথা বলা যাবে?

বাদল ভোরবেলা দাদামশাইয়ের ডাকে জপতপ করতে বসে। প্রতিদিন উপনিষদের দুটি করে শ্লোক মুখস্ত করে দাদামশাইয়ের কাছে পরীক্ষা দেয়। তারপর দাদা-মশাই যখন বার-বাড়িতে প্রজাদের সঙ্গে কথা বলতে যান, তখন বাদল ইংরেজি-অঙ্ক নিয়ে বসে। ইস্কুলের দিনের কথা আলাদা, কিন্তু প্রতি ছুটির দিনে সে দুপুরবেলা দাদামশাইয়ের সঙ্গে একসঙ্গে খেতে বসে। এটা একটা দুর্লভ সৌভাগ্য। কারণ, দাদা-মশাইয়ের খেতে বসা মানে এক মস্ত ঘটনা। সারা বাড়িতে একটা চাঞ্চল্য পড়ে যায়—কেউ আসন পাতে, কেউ জল গড়িয়ে দেয়, কেউ পাখা হাতে নিয়ে দাঁড়ায়—এবং ঠাকুর-চাকর নয়, খাবার পরিবেশন করে বাড়ির মেয়েরা—যার কোনো কাজ নেই তাকেও কাজের ভাণ করতে হয়। কার্পেটের আসনে সিধে হয়ে বসে থাকেন দাদামশাই—কোনোদিন কোনোরকম রান্নার প্রশংসা করেন নি, কোনোদিন কোনো পদ দ্বিতীয়বার চান নি—কিন্তু একটা কিছু অপছন্দ হলেই থালা সুদ্ধ ঠেলে দিয়ে উঠে যান। তাঁর মস্ত বড় থালা ঘিরে অন্ততঃ দশটি বাটি সাজানো। ঠিক রাজা মহারাজা নয়—আদি-বাসী দল-নেতার মতনই তাঁর ভঙ্গি। তিনি গম্ভীর, এসবই তাঁর প্রাপ্য ও স্বাভাবিক ঘটনা।

তাঁর আহার গ্রহণের ব্যাপারেও বিশেষত্ব আছে। বড় বড় মাছের টুকরো থেকে তিনি খানিকটা মুখে দিয়েই বাটিটা ফেলে রাখেন। অতি সরু ও সৌরভময় চালের ভাত দেওয়া হলেও তিনি খান মাত্র দু'চামচ ভাত। তিনি আসলে স্বল্পাহারী, কিন্তু বহুরকম পদ সাজিয়ে তাঁকে দেওয়াই রেওয়াজ। তাঁর বন্ধু পীতাম্বর একদিন তাঁর

সঙ্গে খেতে বসে এই ব্যাপার দেখে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি তো কিছুই খাও না হে, তবে গয়নাগাটির মতন এত বাটি সাজিয়ে বসো কেন? দাদামশাই তখন উত্তর দেন নি, খাওয়ার সময় তিনি কথা বলেন না। পরে তিনি পীতাম্বরকে বলেছিলেন, আমাকে দিতে হয় বলেই বাড়িতে এত পদ রান্না হয়—বাড়ির অন্য অনা লোকরা খেয়ে বাঁচে। আমাকে না দিতে হলে, এরা রান্নার ব্যাপারটা সংক্ষেপে সেরে ফেলতো। মেয়েদের যত বেশীক্ষণ পারবে ততক্ষণ রান্নাঘরে রাখবার চেষ্টা করবে—না হলেই তো ওরা ঝগড়াঝাঁটি নিয়ে মেতে উঠবে।

বাদল দাদামশাইয়ের সঙ্গে খেতে বসে একটি বিশেষ আকর্ষণে। দাদামশাইকে প্রতিদিন দুটি আস্ত গলদা চিংড়িমাছ ভাজা করে দেওয়া হয়। এক একটা মাছ বাদলের এক হাত মাপের সমান। দাদামশাই একটি মাছ থেকে সামান্য একরত্তি মুখে দিয়ে বাকি মাছটা তুলে দেন বাদলের থালায়। অন্য জায়গায় খেতে বসলে এত বড় একটা চিংড়ি মাছ বাদলকে একা কক্ষনো দেওয়া হতো না। চিংড়ির মাথার ঘি খেতে যা ভালবাসে বাদল! লাল রঙের গরম গরম ঘি। বাদল আজকাল লোভী হচ্ছে।

সকালবেলা যেমন প্রজাদের সঙ্গে দরবারে বসেন দাদামশাই, বিকেলে সেই রকম বসেন বাড়ির লোকের সঙ্গে। খুঁটিনাটিভাবে প্রত্যেকের খবরাখবর নেন। কারুর কিছু আর্জি থাকলে শোনেন, প্রয়োজন বুঝলে টাকা পয়সার বরাদ্দ করেন। তিনি কথা বলেন আস্তে আস্তে, অথচ তবু যে কেন সবাই তাঁর সামনে এসে ভয়ে কাঁপে সেটাই বুঝতে পারে না বাদল! ইস, তাকে যদি সবাই এরকম ভয় করতো!

সন্ধের পর দাদামশাই বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে। তাঁর পেছনে পেছনে বর্শা হাতে বাড়ির একজন পাইক যায়। এই ব্যবস্থাটাও তাঁর নিজেরই করা। তিনি সারা গ্রাম ঘুরে বেড়ান, কখনো পাশের গ্রামে চলে যান। প্রতিদিন অন্তত দশ মাইল পথ হাঁটা তাঁর বরাদ্দ। তিনি রাত্রে ছাড়া হাঁটতে ভালবাসেন না, অন্ধকারে হ্যারিকেন নেন না, হাতে একটি টর্চ থাকে, তাও জ্বালেন কদাচিৎ। ভ্রমণ শেষে এক একদিন তিনি যান তাঁর বন্ধু পীতাম্বরের বাড়ি সেখানে গান-বাজনা হয়। পীতাম্বর কীর্তন গায়ক—প্রত্যেক সন্ধ্যেবেলাতেই সাঙ্গোপাঙ্গো খোল করতাল নিয়ে বসেন—দাদামশাই কিছুক্ষণ সেখানে বসে থেকে আবার নিঃশব্দে উঠে আসেন।

এক একদিন দাদামশাই চলে যান মাঠ পেরিয়ে নদীর ধারে। উঁচু বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ নদীর দৃশ্য দেখেন—বিশেষত জ্যোৎস্না রাতে। নদীর জলে চকচক করে জ্যোৎস্না—মাঝে মাঝে ঢেউ এসে জিভ বাড়িয়ে বাঁধের মাটি ভেঙে নেয়, ঝুপ-ঝাপ শব্দ হয়—আর কোনো শব্দ নেই। আকাশে ইতস্তত তারা, সেই রকমই নদীর অন্ধকারে বহু দূরে দূরে ছড়ানো আলোর বিন্দু। মনে হয় চরাচরময় অদ্ভুত শান্তি।

দাদামশাই অনেকক্ষণ নদীর দিকে চোখ রেখে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন। এই মানুষটি ঘোর সংসারী ও বিষয়ী, অথচ এঁর সৌন্দর্যবোধ আছে। এঁর রক্তের কোনো ঐতিহ্য নেই, অথচ ধরে আছেন একটি ঐতিহ্যময় শাস্ত্র, ইনি ঘোরতর সংস্কারাচ্ছন্ন অথচ দয়ালু—বাদল তাই এঁর কোনো থই পায় না।

একদিন দাদামশাই নিজেই বাদলকে তাঁর ভ্রমণের সঙ্গী করে নিতে চাইলেন। এরকম আর কখনো ঘটেনি। সন্ধ্যেবেলার একাকীত্ব তাঁর বহু দিনের অভ্যেস—সঙ্গে যে পাইক যায়, সে ছায়ামাত্র। কিন্তু বাদলকে যে সঙ্গে নিলেন—তার একটা কারণ আছে। দাদামশাই বাড়িতে কারুর সঙ্গেই বিশেষ কথা বলেন না। রাশভারি হয়ে থাকতে থাকতে সেটাই তাঁর মুখোশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দাদামশাই এখন যথেষ্ট বৃদ্ধ হয়েছেন—প্রত্যেক

বৃদ্ধেরই অনেক কিছু কথা বলার জন্য বুকের মধ্যে একটা আকুলি-বিকুলি থাকে। অন্যের কাছে হঠাৎ স্বভাব বদলানো যায় না যদিও, তবে একটি বালকের কাছে মুখ খুলতে বাধা নেই।

প্রথম প্রথম ভ্রমণপথে দাদামশাই বাদলকে নানারকম নীতিশিক্ষা দিতেন। আদর্শ ব্রাহ্মণ সন্তানের জীবন কি রকম হওয়া উচিত সে বিষয়ে তাঁর নির্দিষ্ট ছক আছে। আকাশের প্রতিটি তারা এবং মাটির প্রতিটি মানুষকে চিনতে হবে। পশু-পক্ষীর স্বভাবও বুঝতে হবে—সেখানেও শিক্ষণীয় আছে অনেক কিছু। ভগবান বিষ্ণু যে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি পশুর আকৃতিতেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এ-সবের তাৎপর্য কি? বেদ অতল জলে তলিয়ে গিয়েছিল, মৎস্যরূপী বিষ্ণু তাকে উদ্ধার করেন। তেমনি যে-সাধনার গভীর অতলে থাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান—

বাদল জিজ্ঞেস করলো, দাদামশাই, বিশুদ্ধ জ্ঞান কি?

দাদামশাই গভীর স্নেহে তাকালেন তাঁর নাতির দিকে। বালকের রিণরিণে কণ্ঠস্বরে বিশুদ্ধ জ্ঞান শব্দ দুটিই কত সুন্দর শোনায়। মনে হয় যেন তৈত্তিরীয় উপনিষদের বরুণ ও ভৃগুর প্রশ্নোত্তরের মতন নতুন এক অধ্যায় রচিত হতে যাচ্ছে। দাদামশাই তাঁর ঠান্ডা হাতখানা বাদলের কাঁধে রাখলেন। এতদিন তাঁর মনে মনে একটু দুঃখ ছিল যে তাঁর মেয়ে হিমানীকে তিনি ভালো ঘরে বিয়ে দিতে পারেননি। জামাইটি একটি অপদার্থ। কিন্তু এই নাতিটি মানুষ হলে বংশের মুখরক্ষা করবে।

বাদলকে নিয়ে এসে তিনি দাঁড়ান নদীর পাড়ে। বাদল দৌড়ে জলের কাছে নেমে যেতে চায়—তিনি তাকে নিবৃত্ত করেন না। তাঁর নিজেরও ইচ্ছে করে শৈশবে ফিরে যেতে, কিন্তু ঢালু পাড় দিয়ে নামার সাধ্য তাঁর নেই। আধ মাইলটাক দূরে নদীর পারেই চিতা—এখান থেকে দেখা যায় চিতার আগুন। যেন অন্ধকারকেই দহন করছে সেই আগুনের শিখা।

একদিন দাদামশাইয়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে বাদলের একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হলো। ঘটনাটা ঘটার সময় বাদল শুধু অবাক হয়েছিল, কিন্তু বেশ কয়েক বছর বাদে সে বুঝতে পেরেছিল, তার দাদামশাই আসলে একজন মনোরোগী। ওই ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য, ওই রকম কঠোর সংসারীপনা ও দয়া, কুসংস্কার ও শাস্ত্রজ্ঞানের অহঙ্কার—এর আড়ালে লুকিয়ে আছে একজন অসুস্থ মানুষ। পরবর্তী জীবনে বাদল দেখেছে—বাইরে থেকে যাকে যা মনে হয়, তার আড়ালেও আর একজন মানুষ থাকে। সকলেরই থাকে। একা একজন মানুষ কেউ নয়, প্রত্যেকেই দুজন বা বহুজন মানুষ। সেই আড়ালের মানুষটিকে সহজে দেখা যায় না। এটা কোনো কবিত্বের কথা নয়। খুব যুক্তিবাদী মানুষের মধ্যেও হঠাৎ হঠাৎ একটা যুক্তিহীন স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে। তখন চমকে উঠতে হয়। এই যুক্তিহীনতারও একটা সীমা আছে—প্রত্যেক মানুষের আলাদা—সেই সীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত সংসারে টিঁকে থাকার কোনো অসুবিধে নেই। কারুর কারুর ভেতরের এই চমকপ্রদ সত্তাটি শুধু বিশেষ একজনের চোখেই ধরা পড়ে। বাদল প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সেই আলাদা মানুষকে খুঁজে বার করার নেশায় মেতে উঠেছিল এক সময়। উত্তর কালে যখন সে একটি নারীকে বলেছিল, আমি তোমাকে চাই—একটি ফাঁকা ঘরের দেয়ালে হেলান দেওয়া নারীকে সে বলেছিল চোখের দিকে চেয়ে—তখন সে এই কথা বলতে পেরেছিল, কারণ সে সেই নারীর ভেতরের আলাদা স্বরূপটিকে চিনতে পেরেছে।

কলকাতা ছেড়ে এসে এই নিভৃত গ্রামে বাদলের অনেক রকম শিক্ষার সুযোগ

আসে। সে নানা রকম স্তর পেরিয়ে পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। পান্নালাল নামের বখাটে ছেলে কিংবা তার গুরুগম্ভীর দাদামশাই—দুজনে দু' রকমভাবে বাদলের শিক্ষাকার্যেই সাহায্য করেছে।

সেদিন নদীর পারে দাঁড়িয়ে দাদামশাই বাদলকে আকাশের তারা চেনাচ্ছিলেন। কালপুরুষ, সপ্তর্ষি, সন্ধ্যাতারা ইত্যাদি বাদল আগে থেকেই চেনে—কিন্তু দাদামশাই তাঁকে দেখাচ্ছিলেন রোহিণী, অরুন্ধতি প্রভৃতি।

ঘাটে এসে কয়েকটা নৌকো ভিড়েছে। ইলিশ মাছের ডিঙি। রুপোলি মাছ-গুলোর শরীর চকচক করছে কুপীর আলোয়। কোনো প্রয়োজন নেই, তবু বাদল বললো, দাদামশাই, মাছ কিনবে? কি টাটকা মাছ!

দাদামশাই নিজে কোনোদিন কোনো কিছু কেনাকাটি করেন না। এই সব লোকের সঙ্গে কথা বলাই তাঁর ধাতে নেই। তবু নাতির আবদার ফেলতে পারলেন না আজ। খানিকটা প্রশ্রয়ের সুরেই বললেন, কেন, মাছ কি হবে?

—বাড়ি গিয়ে ভাজা খাবো টাটকা টাটকা!

দাদামশাই গলা চড়িয়ে জেলেদের উদ্দেশ্যে বললেন, এই, দে তো রে বড় দেখে এক জোড়া মাছ।

জেলেরা দাদামশাইকে চিনতে পারেনি। জালে আজ খুব বড় বড় মাছ পড়েছে, সেই জয়ের আনন্দ, গায়ে এখনো পরিশ্রমের ঘাম শুকোয়নি, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাতেই মত্ত। প্রথমবার তারা কথা শুনলোই না। দ্বিতীয়বার বলার পর একজন তরল গলায় বললো, নেন কত্তা, টাকা টাকা জোড়া!

দাদামশাই কঠোরভাবে বললেন, কত?

—টাকা টাকা জোড়ার কম হবে না আইজ!

দামের জন্য নয়, কণ্ঠস্বরের এ তারল্যেই দাদামশাই রেগে আগুন হয়ে গেলেন। নক্ষত্র-বিলাস ছেড়ে হয়ে উঠলেন সামন্ততান্ত্রিক। সেদিন পাহারাদার পাইক হিসেবে এসেছিল কেষ্ট ঢালী। দাদামশাই কেষ্টকে বললেন, এক জোড়া মাছ নিয়ে আয়। বলিস, কাল সকালে যেন আমার কাছে দাম আনতে যায়।

কেষ্ট দাদামশাইয়ের ইঙ্গিত বুঝে তরতর করে নেমে গিয়ে সোজা সেই উত্তরদাতা জেলেটির গালে সপাটে এক চড় কষায়।

মাছ হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে কেষ্ট পেছন পেছন আসছে, সামনে দাদামশাই আর বাদল পাশাপাশি। কেউ কোনো কথা বলছে না। তার আবদারের জন্যই জেলেটি মার খেল—এজন্য বাদলের মনে কোনো রকম গ্লানি নেই—তার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ঠিকই মানান-সই। তার চেনা ছোট পৃথিবীতে দাদামশাইয়ের মুখের ওপর কথা বলার অধিকার কারুর নেই। সে শুধু এক ধরণের উত্তেজনা বোধ করছিল।

হঠাৎ দাদামশাই থমকে দাঁড়ালেন। বাদলের হাত চেপে ধরলেন শক্ত করে। একটু চেঁচিয়ে বললেন, যা যা, সরে যা! আবার এসেছিস?

বাদল সামনে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না। দু' ধারে জমির মাঝখান দিয়ে আলপথ ধরে এতক্ষণ তারা হেঁটে আসছিল। এই পথে এলে রাস্তা সংক্ষেপ হয়। এবার জমি ছেড়ে তাদের উঠতে হবে একটা বাগানে, ডান ধারে একটা ছোট পুকুর, তার পাশে বাঁশ ঝাড়। বেশ জ্যোৎস্না রয়েছে, দেখা যায় সব কিছুই।

দাদামশাই হাতের ছড়িটা তুলে ধমকের সুরে বললেন, যা যা, পথ ছাড়!

বাদল জিজ্ঞেস করলো, কে দাদামশাই?

—বিটি মাছের লোভে এসেছে। তুই চোখ বুজে থাক তো দাদুভাই।

—আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

—চোখ বুজে থাক। এই পেত্নীটা একের নম্বরের শয়তানী।

কেষ্ট একটু পিছিয়ে পড়েছিল, সে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কিছু কন নাকি বড় কত্তা?

দাদামশাই লাঠি তুলে এক পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, বিটি, তোর এত সাহস! আমি এখানে রয়েছি—

কেষ্ট হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বাদলের হাত ধরে ফিসফিস করে বললো, কানা ওলা। বড় কত্তারে কানা ওলায় ধরেছে।

—কানা ওলা কি?

—পেত্নীটা মাছ খাইতে আসে। এখন ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মারবে আমাগো।

—আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না!

—চোখ বুইজ্জা থাকো!

কেষ্ট অতিশয় বলশালী পুরুষ। তার শরীর ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে বাদল আর ভয় পায় না। কেষ্ট কিন্তু ভয় পেয়েছে, সে কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, কত্তা পিছনে চলেন, পিছনে চলেন।

বাদল বিস্ফারিত চোখে দেখলো তার দাদামশাই টর্চ-জেবলে বাঁশ ঝাড়ের ওপর লাঠির ঘা মেরে বললেন, হারামজাদী, মাছ খাওয়ার নোলা! আমার সামনে আসিস, তোর এত সাহস!

বাদল উত্তেজনায় কাঁপছে! সে দেখতে চায়। সে আজ নিজের চোখে পেত্নী দেখবে। সে জানে তার দাদামশাইয়ের কাছে ভূত পেত্নী সব হেরে যায়। এ সম্পর্কে সে অসংখ্য গল্প শুনেছে! অন্ধকার রাত্রে ঘুরে বেড়ানোর জন্য দাদামশাই বহুবার ভূত পেত্নীর সামনে পড়েছেন। কোনোদিন তিনি একটুও বিচলিত হন নি, লাঠি উঁচিয়ে ধরেছেন। দাদামশাইয়ের দিকে প্রেতযোনীরা যেন বেশী রকম আকৃষ্ট হয়—গাঁয়ের অন্য মানুষের তুলনায় তারা দাদামশাইয়ের সামনেই আসে বারবার। সাধারণ ভূত পেত্নী তো আছেই—জলাভূমির ধারে দাদামশাই আলেয়ার পাল্লায় পড়েছেন—চৌধুরীচকে একদিন একটা বেলগাছের ডাল নীচু হয়ে নেমে এসেছিল দাদামশাইয়ের সামনে—সেই গাছে ব্রহ্মদৈত্যের বাস—কোনোবার দাদামশাইয়ের গায়ে আঁচড়টিও লাগে নি।

এই মাছখেকো পেত্নীটাও নাকি দাদামশাইকে অনেকবার বিরক্ত করেছে। বাদল আজ তাকে দেখবে।

কিন্তু দাদামশাই দেখলেন, কেষ্ট ঢালী দেখলো, বাদল দেখতে পেল না। সে শুধু দেখলো, টর্চের আলো ফেলে দাদামশাই একটা বাঁশের ঝোপ পেটাচ্ছেন—সেখানে আর কিছু নেই। দাদামশাই প্রচণ্ড ঝাঁঝে গালাগালি দিচ্ছেন, কেষ্টও এক সময় বর্শা নিয়ে তেড়ে গেল সেই শূন্যতার দিকে।

তারপর বেশ কিছুদিন ধরে চলেছিল এই গল্প। সবাই বিশ্বাস করেছে। কিছু দেখতে পায়নি বলে মনে মনে নিরাশ হয়েছিল বাদল—কিন্তু সকলকে বলেছে যে সে-ও দেখেছে। এর পর অনেক বছর ধরে বাদল এই ঘটনার কথা ভেবেছে। শেষে একদিন উপলব্ধি হয়েছে যে ওখানে সত্যিই কিছু ছিল না। তার দাদামশাই পাগল ছাড়া কিছু নয়। প্রজাদের ওপর অত্যাচার করেন, বাড়ির লোকদের পদানত করে রেখে তিনি চোখের সামনে ভূত দেখেন। অলৌকিক জগতকেও শাসন করার মানসে তিনি বাঁশ

ঝাড়ের ওপর ল্যাঠিপেটা করেন শুধু।

॥ ৪১ ॥

সরকারী হিসেব মতনই গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৬০,২২৯ জন; ভারত রক্ষা আইনে অবরুদ্ধ ১৮,০০০; পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত ৯৪০ এবং আহত ১৬৩০ জন। যাট জায়গায় সৈন্য বাহিনী মোকাবিলা করেছে বিদ্রোহী জনতার, কোথাও কোথাও বিমান থেকে মেসিনগান চালানো হয়েছে—এরকম ঘটনা ঘটেছে অন্তত পাঁচবার। ২৫০টি রেলস্টেশন বিধ্বস্ত হয়েছিল, ৫০০ ডাকঘরের ওপর আক্রমণ হয়, পুড়ে ছাই হয় অন্তত ৫০টি, ১৫০টির বেশী থানা জনতা দখল করতে গিয়েছিল, এ ছাড়া আছে রেল লাইন উপড়ে ফেলার ঘটনা।

বলাই বাহুল্য, বেসরকারী হিসেবে এর বহুগুণ বেশী। বে-সরকারী হিসেব অবশ্য সে'সময় জানার উপায় ছিল না, সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল।

এইভাবে শেষ হলো বেয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন বা তথাকথিত আগস্ট বিপ্লব। মাসখানেকের বেশী স্থায়ী হয়নি। বিক্ষিপ্ত ভাবে হলেও দেশের কয়েকটি অঞ্চলে জনতা সত্যিকারের ক্ষেপে উঠেছিল—মুষ্টিমেয় বৃটিশ বাহিনীকে ধূলিসাৎ করা অসম্ভব ছিল না কিন্তু নেতৃত্বের অভাবেই সব ব্যর্থ হয়ে যায়। এত বৃহৎ কর্ম-কাণ্ডের সঠিক চরিত্রটি যাচাই করে নিভীকভাবে সারা ভারতকে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক কেউ দেয় নি। যে বিপ্লবের সম্ভাবনা শুধু দেখা গিয়েছিল, বিকলাঙ্গ অবস্থায় তার মৃত্যু হলো। আগা খাঁ প্যালেসে অন্তরীণ অবস্থা থেকে গান্ধীজী বলতে লাগলেন, এইসব হিংসাত্মক ঘটনার জন্য কংগ্রেস দায়ী নয়। এ সবই সরকারের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া।

ইংরেজ জাতির কতগুলি সুসভ্য রীতিনীতি আছে। তাদের শাসন ব্যবস্থা রুল অফ ল-এর অধীন এবং অধিকাংশ জায়গাতেই তা মানা হয়। অন্যান্য ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকদের তুলনায় ইংরেজরা যে অনেক ক্ষেত্রেই প্রচুর সংযমের পরিচয় দিয়েছে —সে কথাও ইতিহাসের খাতিরে স্বীকার করা দরকার। গান্ধী নেহরুর মতন নেতা-দের সঙ্গে দর কষাকষির বদলে যদি তাঁদের দেয়ালে দাঁড় করিয়ে সোজা গুলি করে মেরে ফেলা হতো তা হলে তাদের কে আটকাতো! গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব ও খ্যাতি বিশ্বময় ছড়াবার আগেই তাঁকে খতম করে দেওয়া যেত না? পৃথিবীর দু'চারটে কাগজে বড় জোর প্রতিবাদ বেরুতো, তা ছাড়া কোনো সরকার মাথা ঘামাতো না।

দর কষাকষির আপোস আলোচনায় ইংরেজ কখনো আপত্তি করেনি—কারণ এতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই তার। তা ছাড়া দর কষাকষির শিল্প সে নিজে খুব ভালোই জানে। কিন্তু নিজের স্বার্থে সত্যিকারের ঘা পড়লে ইংরেজ চরম নির্মমতা দেখাতেও কুণ্ঠিত হয় না। সারা পৃথিবী জুড়ে ইংরেজ যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত তখন ভারতীয় প্রজাদের এই বেয়াদবি তার একেবারে সহ্য হয়নি। প্রয়োজনের চেয়েও অতিরিক্ত নিষ্ঠুরতায় সে এই নেতৃত্বহীন আন্দোলন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। নেতাদের বন্দী করে রাখার বদলে তখুনি যে খুন করেনি সে তার নিছক নিয়ম রীতি রক্ষা বা দয়ামায়ার গুণে নয়। ইংরেজের তৎকালীন অভিভাবক মার্কিন সরকার ভারতে নিষ্পেষণ নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছে। সুতরাং প্রকাশ্যে, বড় বড় নেতাদের

বন্দী করে রেখে এবং গান্ধীজীর সঙ্গে চিঠি চালাচালির ছলে মুখ রক্ষা করে গ্রাম গ্রামান্তরে সাধারণ মানুষের কাছে ইংরেজ দেখিয়েছে তার রুদ্র রূপ। বিনা বিচারে অসংখ্য হত্যার নজির আছে সেই সময়।

পুরো তেইশ দিন মেদিনীপুরের একটি মহকুমা স্বাধীন করে রেখেছিল সূর্য আর যোগানন্দ। সতীশ সামন্তর নেতৃত্বে মেদিনীপুরে স্বাধীন সরকারও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু বাকি দেশের কোথায় কি ঘটছে তার কোনো খবরাখবর আসে না। অসহায় সংবাদপত্রগুলি মূক। নাইন্‌থ আগস্ট নামে একটি গুপ্ত পত্রিকায় গরম গরম খবর দেখলে মনে হয় সারা দেশই বুঝি স্বাধীন হয়ে গেল—অথচ এক জেলার মানুষ আর এক জেলায় গেলে হকচকিয়ে যায়। সেখানে বিপ্লবের নামগন্ধও নেই। গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো' ডাক এবং 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ধ্বনির সঙ্গে সামঞ্জস্য করে স্থানীয় কংগ্রেসী নেতারাও ভেবেছিলেন এ আন্দোলন একটা চূড়ান্ত রূপ নেবেই। অথচ সর্বভারতীয় নেতৃত্বের কাছ থেকে কোনো নির্দেশ আসে না। প্রথম সারির নেতারা জেলে গেলে দ্বিতীয় সারির নেতাদের প্রকৃত নেতৃত্ব নেবার জন্য তৈরি করা হয় নি। পদে পদে দ্বিধা ও সংশয়েই আমাদের ইতিহাস আকীর্ণ। অযথা প্রাণ দিয়েছে সাধারণ মানুষ।

সূর্য এবং যোগানন্দ তাদের ব্যক্তিগত বীর্য, সামর্থ্য ও বুদ্ধি দিয়ে যতখানি করবার করেছে, তারপর তারাও থমকে গেল। দু'জনেই মৃত্যুভয় অতিক্রম করে গেছে বলে নানা রকম অকল্পনীয় বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে, স্থানীয় লোকরা ওদের দু'জনকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত। কিন্তু এক সময় দু'জনেই থমকে গিয়ে ভাবলো, এর পর কি? খড়্গপুর থেকে সৈন্যবাহিনী মার্চ করে আসছে, ওরা শুনতে পাচ্ছে সেই নিশ্চিত পদশব্দ—কি নিয়ে সেই সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়াবে? এ রকম তো কথা ছিল না। কেন আর একদল পেছন থেকে আক্রমণ করছে না সৈন্যবাহিনীকে। জয়প্রকাশ নারায়ণের নামে কিছুদিন ধরে অদ্ভুত সব কাহিনী শোনা যাচ্ছিল, কোথায় তিনি? আসাম সীমান্তে সৈন্যবাহিনী নিয়ে কোথায় সুভাষবাবু? সুভাষবাবু তখনও অনেক দূরে।

সন্ত্রাসবাদী বা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল—বেয়াল্লিশের আগস্টে তারা শেষবার মরীয়া হয়ে নেমে পড়েছিল। এই বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ায় তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। স্বাধীনতার সোনার পাথরবাটি অর্জনের কৃতিত্ব চলে গেল নরমপন্থীদের হাতে। বাটিটা ভেঙে আধখানা করে নিতেও যাদের আপত্তি নেই।

ব্যর্থ বিপ্লবীর মতন করুণ চরিত্র আর হয় না। পরাজিত নৃপতিরও একটা মহিমা থাকে—কিন্তু এরা শুধু অপবাদ নিয়েই চলে যায়। শকুনেরও বাসা থাকে, ইঁদুরেরও গর্ত থাকে, কিন্তু এদের কোনো আশ্রয় নেই।

সামরিক বাহিনী এসে ভেঙে গুঁড়িয়ে তছনছ করে দিল মেদিনীপুরের বিপ্লবের সাধ। সন্দেহজনক পল্লীগুলোতে জ্বালিয়ে দিতে লাগলো আগুন। আগুনের নাম লাল ঘোড়া। সেই লাল ঘোড়া ছুটতে লাগলো গ্রাম থেকে গ্রামে। আন্দোলনের পান্ডাদের মধ্যে যাদের হাতের কাছে পাওয়া গেল, গুলি করে শেষ করে দেওয়া হলো তাদের—বাকিদের মাথার মূল্য ধার্য করে লটকে দেওয়া হলো নোটিশ।

সূর্য আর যোগানন্দর হাতে একটা পয়সা নেই, কিন্তু ওদের মাথার দাম পাঁচ হাজার টাকা করে। ওরা তখন তাড়াখাওয়া পাগলা কুকুরের মতন পালাচ্ছে। দু'জনেই

মরতে রাজি, তবু অকারণে পুলিসের গুলি খেয়ে মরতে চায় না। ইতিমধ্যেই ওরা ব্রজগোপালের মৃত্যু সংবাদ শুনেছে। ব্রজগোপালকে মারবার আগে সামরিক বাহিনীর লোক বুটের ঘা দিয়ে তার চোখ-নাক থেঁৎলে দিয়েছিল।

দু'জন ব্যর্থ বিপ্লবী পালাচ্ছে। মাঠঘাট জঙ্গল ভেদ করে অবিরাম ছুটে যাচ্ছে দু'জন যুবক—স্পষ্ট দেখা যায় এই দৃশ্য। এরা এখন অতি সাংঘাতিক প্রাণী, এরা না করতে পারে এমন কাজ নেই। যে কোনো মুহূর্তে এরা মানুষ খুন করতে পারে। এরা এখন পৃথিবীর কারুকে বিশ্বাস করে না। সবাই ওদের শত্রু। এরা লোকের কাছ থেকে খাবার কেড়ে খায়, সামান্য প্রতিরোধেই মারধোর করে।

অবিরাম ছুটে যাচ্ছে দুই পলাতক। কোথায় যাবে ওরা জানে না। দেশের জন্য ওরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, এখন এই দেশের কোথাও ওদের স্থান নেই। ওরা শুধু পালাতে থাকবে।

সূর্যকে নিয়ে যোগানন্দ একটু মুশকিলে পড়েছে। সূর্য প্রায়ই রক্তবমি করে। বলশালী, স্বাস্থ্যবান ছেলে, কোথাও কেটে ছড়ে গেলে কিংবা হাত-পা ভাঙলেও চিন্তার কিছু ছিল না, কিন্তু ভেতর থেকে এত রক্ত পড়া খুব খারাপ লক্ষণ। এখুনি চিকিৎসা করাতে না-পারলে আর দু'একদিনের বেশী দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

একটা খালের ধারে পড়ন্ত সন্ধ্যেবেলায় ওরা দু'জনে বসেছে, যোগানন্দ একটা বিড়ি ধরালো। চিক করে মাটিতে থুতু ফেলে বললো, তুই কখনো নৌকোর ওপর থেকেছিস?

সূর্য একটা ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে গোড়ার দিকের সাদা নরম অংশটা চিবোতে চিবোতে বললো, না।

যোগানন্দ খালের জলের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বললো, বেশ লাগে থাকতে! রাত্তিরবেলা ঘুমটা ভালো হয়। আমি একবার ছিলাম প্রায় মাস খানেক, রসুলপুরের নদীর মুখটায়। এত ভালো লাগতো, আঃ, টাটকা টাটকা মাছ ধরে নিয়ে ভেজে ফেলা, গরম গরম ভাত আর কাঁচা লঙ্কা, ডাল ফাল লাগতো না, শুকনো শুকনো ভাতই মেরে দিতাম এক থালা—মাছ যা খেয়েছি না—এক সের দেড় সের আমি একাই—

কথা বলতে বলতে যোগানন্দ হাসতে লাগলো। আপন মনে হাসি, সহজে থামতেই চায় না। তারপর উরুতে চাপড় মেরে উল্লাসের সঙ্গে বললো, শালা! সারা দিন কিছু খাইনি, রাত্তিরে কি খাবো তার ঠিক নেই—আর মনেও পড়ে যাচ্ছে যতসব খাবার গল্প! তোর বৌদি কি রকম রান্না করতো বল তো?

সূর্য মৃদু গলায় বললো, একটা নৌকো এদিকেই আসছে।

—হুঁ। আমি দেখেছি।

—উঠে পড়তে হবে?

—হুঁ!

—একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলে হয় না? যদি পুলিস ফুলিস না থাকে—যদি জেলে নৌকো হয়—তাহলে ওদের কাছ থেকে নৌকোটা কেড়ে নিলে হয় না?

—আমিও একবার তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু ঝঞ্ঝাট আছে। লোকগুলোকে মেরে তাড়ালেও এক্ষুনি গিয়ে পুলিসে খবর দেবে। এই নৌকো নিয়ে তো তাড়াতাড়ি পালানো যাবে না! এই খাল দিয়ে কোথায়ই বা যাওয়া যায়!

—তা হলে?

—আর এক কাজ করা যায়। যদি একজন বা দু'জন লোক থাকে তা হলে একদম খতম করে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু লাশ নিয়ে ঝামেলা হবে—এখানে কারুর না

কারুর চোখে পড়ে যাবেই।

—তা হলে আর বসে থাকার দরকার নেই!

সূর্য হাতটা উঁচু করলো। যোগানন্দ আগে উঠে সূর্যর হাত ধরে টেনে তুললো। সূর্য বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে, বসলে সহজে উঠতে পারে না। তবে এখনো সে দৌড়োতে পারে, বেশ জোরেই পারে, কিন্তু দম থাকে না বেশীক্ষণ। প্রয়োজনে সে যে-কোনো লোকের মুখে ঘুঁষি মেরে এখনো ধরাশায়ী করে দিতে পারবে—তারপর নিজেই অনেকক্ষণ ধরে হাঁপাবে। ওর অসুখ যে কতখানি তা ওর মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না অবশ্য।

যোগানন্দ জিজ্ঞেস করলো, ঠিক আছে তো?

সূর্য বললো, চলুন।

সন্ধ্যের অন্ধকারে আবার ওরা হাঁটতে লাগলো।

চলো মুসাফির, চলো। থেমে থেকে লাভ কি? আরও কতদিন চলতে হবে তার ঠিক কি? পালাও, পলাতক! জীবন থেকে, মৃত্যু থেকে পালাও!

ওরা দৌড়োতে লাগলো, থামতে লাগলো, আবার দৌড়। কোথাও বিশ্রামের সুযোগ নেই, কোথাও একটুও স্বস্তি নেই। তিন চার মাইলের মধ্যে কোনো খাবারের দোকান বা লোকজনের বাড়ি চোখে পড়ে না—কিন্তু পুলিসের গাড়ি দেখা যায়। সার্চ লাইটের মতন আলো ওদের খোঁজে।

ওরা লোকজনের চোখের সামনে আসতে চায় না। সাধারণ গ্রামবাসীদেরও এখন আর বিশ্বাস করা যায় না। ওদের কোনো জায়গায় দেখা গেলেই সে গল্প ছড়িয়ে যায় একটু বাদেই, পুলিসের কানে গিয়ে ঠিক পেঁছোয়। ইনফর্মার আর স্পাইতে ছেয়ে গেছে গোটা জেলা। তা ছাড়াও, গ্রামবাসীরা ওদের পছন্দ করে না এখন—পুলিসী অত্যাচারের জন্য দায়ী এই বাবুরাই—এদের জন্যেই আজ তাদের বাড়ি ঘরের সর্বনাশ। কেউ ওদের আশ্রয় দিতে চায় না, কেউ খাবার দিতে চায় না। কোথাও কারুর বাড়িতে লুকিয়ে থাকার সব পথ এখন ওদের রুদ্ধ।

চাঁদ ঢাকা পড়েছে মেঘে, পথ ঘাট ঘুটঘুটে অন্ধকার। এরই মধ্যে সূর্য একবার বসে পড়ে খানিকটা রক্ত বমি করলো। মুখ ধোওয়ার জন্য তার জল দরকার। যোগানন্দ তার হাত ধরে টেনে টেনে আন্দাজে নিয়ে এলো একটা ডোবার ধারে। ময়লা দুর্গন্ধ জলেই যোগানন্দ জোর করে মুখ ধুইয়ে দিল সূর্যর। তারপর বললো, এখানে এখন একটু শুয়ে থাক। কাছাকাছি লোকজন নেই।

—আপনি কিছু খাবেন না?

—ধুর শালা! কে আমার জন্য খাবার সাজিয়ে বসে আছে?

—আপনার খিদে পায় নি?

—পায়নি আবার? আগুন জ্বলছে পেটের মধ্যে। কাছাকাছি কোনো জন্তু জানোয়ার পেলে কাঁচাই খেয়ে ফেলতাম।

যোগানন্দদা আমি এখানে থাকছি। আপনি কিছু খাবার টাবার খেয়ে আসুন। ফাঁকায় কোনো বাড়ি টাড়ি দেখলে সোজাসুজি চাইবেন। কাল ভোরের মধ্যেই আমরা এখান থেকে সরে পড়বো। রিস্ক বেশী নেই।

—তুই থাকতে পারবি একলা?

—হ্যাঁ? খুব পারবো।

—এই অন্ধকারে রাস্তা চিনবো কি করে?

—ঐ যে তাল গাছটা দেখছেন—ওরকম লম্বা তাল গাছ এদিকে আর একটাও দেখা যাচ্ছে না। এক্ষুনি জ্যোৎস্না উঠবে, আপনি ঠিক দেখতে পাবেন।

—তুই যেতে পারবি না আমার সঙ্গে? তোরও তো কিছু খাওয়া দরকার।

—আমার খিদে নেই। আমি এখানে বসছি। আপনি ঘুরে আসুন।

—সূর্য, তুই ঠিক একলা থাকতে পারবি তো! বুকে বেশী ব্যথা করছে নাকি?

—না, না—

—তা হলে যাই ঘুরেই আসি। খিদের জ্বালায় স্থির থাকতে পারছি না। যদি কিছু পাই, তোর জন্যও নিয়ে আসবো।

—আপনি ঘুরে আসুন।

—তুই এই গাছটায় হেলান দিয়ে বোস। ঠিক আছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি।

যোগানন্দ চলে গেল, মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। সূর্য আকাশের দিকে চেয়ে দেখলো—একটা বড় মেঘের চাঁই ঢেকে আছে চাঁদ—তবে শুক্ল পক্ষের রাত, মেঘ ফুঁড়ে চাঁদ বেরুবেই। তালগাছটার ওপরে কোনো বড় জাতের পাখির বাসা আছে, শোনা যায় ডানার ঝটপটানি।

কোনো মানুষের পায়ের শব্দ শুনে সূর্য উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। রিভলবারটা বার করে ধরতেই চাপা গলায় শোনা গেল, আমি।

যোগানন্দই ফিরে এসেছে। সূর্যর পাশে ধপ করে বসে পড়ে বললো, থাক, আর যাবো না।

—কেন, গেলেন না কেন?

—খিদের জ্বালায় আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম বলেই যাবার কথা ভেবেছিলাম। না হলে, এভাবে কেউ যায় না। তোকে এভাবে একলা ফেলে কি আমি যেতে পারি?

—আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।

—না হোক্। আমি যদি খাবারের সন্ধানে গিয়ে হঠাৎ ধরা পড়ে যেতাম, তা হলে তোর কি হতো? তুই যা শরীরের অবস্থা করেছিস, একলা তো বেশী দূর যেতেই পারবি না।

—আমার জন্য আপনার ফিরে আসা উচিত হয় নি।

—এখন চুপ করে শুয়ে থাক তো।

—হরদা আমাকে বলেছিলেন, আমাদের প্রত্যেকের প্রাণের দায়িত্ব আমাদের নিজেদের। কেউ অন্য কারুর জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নেবে না। আমি নিজেকে ঠিক সামলাতে পারবো। আমার জন্য আপনার বসে থাকা উচিত নয়।

যোগানন্দ রেগে গিয়ে বললো, ওসব উচিত অনুচিতের গুষ্ঠির আমি ইয়ে করি। ওসব চুকে বুকে গেছে। এখন আর কোনো নিয়ম নেই। আমার খুশী আমি যাবো না!

—আমি একটু বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবো।

—আজ তিনবার রক্তবমি করেছিস। রোজই বাড়ছে।

—ও কিছু নয়। ভেতরে ভেতরে হেমারিজ হয়েছিল—সেই বাজে রক্তটুকু বেরিয়ে যাচ্ছে।

—খুব সায়েন্সের জ্ঞান দেখছি তোর।

—আপনি কি ভাবছেন আমার টি বি হয়েছে? যে টি বি রুগীর মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে—তার দৌড়াবার ক্ষমতা থাকে না। অসম্ভব।

—টি বি না কি তা আমি জানি না। কিন্তু আর চিকিৎসা না করলে একদিনও চলবে না। শোন, কাজের কথা বলি। এই মাঠে ঘাটে থেকে আর কোনো লাভ নেই। শহরে যেতে হবে। শহরের ভিড়ে মিশে যেতে না পারলে আর নিস্তার নেই।

—কোন শহরে যাবেন?

—যত বড় শহর হয়, ততই ভালো। তবে কলকাতা নয়। বোম্বের দিকে যেতে পারলে সুবিধে হয়, ওখানে কেউ চিনতে পারবে না।

সূর্য একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। তার বুকের মধ্যে অসহ্য ব্যথা—যেন একটা পাথর বুক ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে। জোরে নিশ্বাস ফেলতে গেলেও কষ্ট হয়। আস্তে আস্তে বললো, বোম্বে অনেক দূর। অতদূর কি পৌঁছোতে পারবো?

যোগানন্দ সূর্যর গায়ে হাত রেখে বললো, ঠিক পৌঁছে যাবো। আমি নিয়ে যাবো তোকে। আমরা খড়্গপুরের খুব কাছেই চলে এসেছি মনে হচ্ছে। খড়্গপুর শহর নিশ্চয়ই খুব গরম হয়ে আছে। দুটো তিনটে দিন সাবধানে থাকতে হবে। যদি ট্রেন চালু থাকে—

—খড়্গপুরে আমরা কোথায় থাকবো?

—একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে, অত ভাবছিস কেন? ওখানে আমার দু' তিনজন চেনা লোক আছে—তাদের বাড়িতে অবশ্য থাকা সম্ভব হবে কিনা বুঝতে পারছি না। না থাকাই বোধহয় ভালো। তবু ওরা অন্তত কিছু সাহায্য তো করতে পারবে! যদি সাহায্য করতে না চায় গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।

—খড়্গপুরে আমারও চেনা একজন থাকে। আমার এক বোন, ওর শ্বশুরবাড়ি খড়্গপুরে।

—কোন পাড়ায়?

—সে সব কিছু জানি না। ওর স্বামীর নামটা শুধু জানি, প্রভাসকুমার লাহিড়ী।

—শুধু নাম জেনে কি কারুর ঠিকানা খুঁজে বার করা যায়? কি করেন ভদ্রলোক, উকিল কিংবা ডাক্তার হলেও—

—সে সবও জানি না। ভদ্দরলোককে আমি দেখিইনি।

—তা হলে আর কি হবে! যদি বা খুঁজে পাওয়া যায়, সে ভদ্দরলোক কি তোকে থাকতে দেবেন? তোর চিকিৎসা করানো দরকার।

সূর্য চোখ বুজে শ্রীলেখার মুখখানা ভাববার চেষ্টা করলো। আশ্চর্য, শ্রীলেখার মুখ তার কিছুতেই মনে পড়ছে না। এত চেনা মুখও মানুষ এরকমভাবে ভুলে যায়! সূর্য যেন দেখতে পাচ্ছে, শ্রীলেখা তার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে, অন্ধকারের মধ্যে, টের পাওয়া যাচ্ছে তার অস্তিত্ব—কিন্তু তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। নিজের মাথার চুল খিমচে এক ঝাঁকুনি দিল সূর্য।

তারপর আস্তে আস্তে দেখতে পেল শ্রীলেখার চোখ, নাক ও মুখের একটু অংশ, শ্রীলেখা পাশ ফিরে আছে। ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠছে আলো। শ্রীলেখার চেহারা একটু-খানি বদলে গেছে। আগে খুব চুল ছিল তার মাথায়—এখন যেন একটু ছোট মনে হচ্ছে, কেটেছে কাঁচি দিয়ে? কানের পাশ দিয়ে আলাদাভাবে সরু চুলের গোছা নেমে এসেছে। তাকে আরও বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে এখন! সূর্য মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করলো, আমি কি আর কোনোদিন ওর সামনে দাঁড়াতে পারবো?

হঠাৎ যেন সত্যিই শ্রীলেখা তার সামনে এসে দাঁড়ালো। অভিমানের সঙ্গে বললো, তুমি তো একবারও আমার কাছে এলে না? তুমি আসবে বলেছিলে।

সূর্যর উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই। তার ইচ্ছে হলো, শ্রীলেখার কোমর ধরে ওঠে। শ্রীলেখার হাত জড়িয়ে ধরে বলে, আমি বাঁচতে চাই, আমি বেঁচে থাকতে চাই।

যোগানন্দ সূর্যকে আস্তে ঠ্যালা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এই, বিড়বিড় করে কি বকছিস কি? ইস, জ্বর হয়ে গেছে দেখছি।

সূর্যর তখন বুকের যন্ত্রণায় তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা। সেই অবস্থাতেই হঠাৎ তার খুব রাগ হয়ে গেল। চোখ মুখ জ্বালা করতে লাগলো তার। শ্রীলেখার কথা মনে হলেই তার এরকম রাগ হয়। সেই রাগ তাকে আলাদা শক্তি দেয়।

মাঝখানে বেশ কয়েকদিন ভুলে ছিল। এখন আবার শ্রীলেখার কথা মনে পড়তেই সে ছটফটিয়ে উঠলো। শ্রীলেখা সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাবে আর সে এখানে মাঠের মধ্যে অন্ধকারে গাছতলায় পড়ে পড়ে অসুখে ধুঁকবে? যদি মরতেও হয়, তার আগে শ্রীলেখার সংসারটা সে তছনছ করে দিয়ে যাবে।

সূর্য প্রাণপণ শক্তিতে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চলুন, খড়্গপুরেই যাওয়া যাক্।

যোগানন্দ তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করে বললো, রাত্তিরটা কাটুক। রাত্তিরটা বিশ্রাম করে নে এখানে।

সূর্য রুক্ষ গলায় বললো, বিশ্রামের কোনো দরকার নেই। চলুন, সময় নষ্ট করে লাভ কি!

আর কথা না বাড়িয়ে সে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

॥ ৪২ ॥

যারা লম্বা তাল গাছের ওপরে উঠে রসের জন্য হাঁড়ি বেঁধে আসে, শুধু তারাই জানে তাল গাছে ওঠার কষ্ট। পায়ে দড়ি বেঁধে, হাত দু'খানি টিকটিকির থাবার মতন আঠালো করে উঠতে হয়—প্রথমে বেশ তরতর করেই ওঠা যায়, যত ওপরে ওঠে ততই হাত পা ধরে আসে, পৃথিবী নীচের দিকে টানে। একেবারে শেষের দিকে, যখন আর মাত্র হাত তিনেক বাকি, তখন মনে হয় আর পারা যাবে না, এবার হাত এলিয়ে সর সর করে নীচে পড়ে যেতে হবে। মাত্র আর ঐটুকু, যার পরেই ওপরের ডাল ধরে কোমরে দড়ি বেঁধে বিশ্রাম পাওয়া যেতে পারে—সেই সব জেনেও ঐটুকু পথ পার হওয়া সবচেয়ে শক্ত। চলতি কথায় একেই বলে তাল গাছের তিন হাত।

জেদ ও উত্তেজনার বশে অনেকখানি যাওয়া যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেঁছোতে পারে ক'জন? শেষ মানে তো শুধু সাফল্য নয়, একটা বিশ্বাসের পরিণতি—যা শুধু মন নয় শরীর দিয়েও অনুভব করতে হয়। কত মোক্ষ পাগল মানুষ চৌরাস্তায় এসে ভুল পথে গেছে। মরুভূমিতে মরুদ্যানের পাশেই অনেক অনেক নরকঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখা যায়। উত্তপ্ত বালির সমুদ্র পার হয়ে যারা আসে, তারা অনেকেই জলের দৃশ্য দেখে অতিরিক্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে, জলের কাছে আর পেঁছোতে পারে না। শেষ মানেই সাফল্য নয়, বাস্তবতা নয়, নশ্বরতা জয়ী এক বিশ্বাস।

সারা রাত ধরে হেঁটে এসে যোগানন্দ আর সূর্য ব্রাহ্ম মুহূর্তে দেখতে পেল খড়্গপুর শহর। নোংরা, ধুলোয় ভর্তি একটা রেল টাউন তো শুধু নয়, যেন ঐ অমরাবতী, ওখানে অপেক্ষা করে আছে স্বর্গ সুখ। ভোরের নরম আলোয় সত্যিই যেন ঐ শহর থেকে দিব্যজ্যোতি বেরুচ্ছে। ওখানে আছে আশ্রয়, ওখানে আছে মানুষ, ওখানে

আছে পরিচিত জীবন। জল যেমন জলের দিকে যায়, মানুষও মানুষকে ছাড়া বাঁচতে পারে না। গত কয়েকদিন ধরে ওরা দু'জন মানুষজন দেখলেই আত্মগোপন করছিল, এখন মনে হচ্ছে, কতক্ষণে গিয়ে লোকজনের সঙ্গে কথা বলবে।

এতক্ষণ সূর্যই যোগানন্দকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এগিয়ে নিয়ে আসছিল, যোগানন্দ ঘুমোতে চাইলেও ঘুমোতে দেয়নি, বিশ্রাম করতে দেয়নি—এখন সূর্য আর নিজেই পারছে না। দু'তিনবার সে রাস্তায় থুবড়ে পড়েছে, আবার উঠেছে, যোগানন্দর সাহায্য নিতে চায়নি, এখন আর সে সামর্থ্যও নেই। এখন তাকে বাধ্য হয়ে যোগানন্দর কাঁধে ভর দিতে হয়েছে। যোগানন্দ তার বগলের তলায় হাত দিয়ে প্রায় হেঁচড়ে নিয়ে আসছে।

যোগানন্দও দারুণ পরিশ্রান্ত, খিদের জ্বালায় কাতর, সারারাত ঘুম নেই—তবু যোগানন্দ বেশ উল্লাসের মধ্যে আছে। হাসি ঠাট্টা, খিস্তি খেউড় করে নিজের সঙ্গে সে যেন বেশ একটা কৌতুকে মেতে উঠেছে। সূর্যকে উদ্দেশ্য করে সে যা বলছে, সূর্য তার কোনো উত্তর না দিলেও কিছু যায় আসে না। সূর্য হুঁ হাঁ ছাড়া কিছুই বলে নি। একটু বাদেই সূর্যর পা এলিয়ে গেল, হাঁটু দুমড়ে সে পড়ে যেতে লাগলো। যোগানন্দ ঘুরে দাঁড়িয়ে শক্ত করে সূর্যর কাঁধ চেপে ধরে বললো, এই অমর, ওঠ! কি করছিস কি? আর মোটে একটুখানি!

সূর্য ঘোর লাগা মানুষের মতন আচ্ছন্ন গলায় বললো, হ্যাঁ, এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাচ্ছি আমি।

—ওঠ, ওঠ, আর বড় জোর আধ মাইল। রেলওয়ে কোয়ার্টারে আমার একজন চেনা লোক আছে—তার বাড়িতে গেলেই নরম বিছানা পাবি, গরম গরম চা—

সূর্য বললো, এই তো উঠছি।

ওঠার বদলে সূর্য মাটিতে শুয়ে পড়লো। যোগানন্দ তাকে একরকম টেনে হেঁচড়ে নিয়ে এলো, কাছাকাছি একটা ক্যালভার্টের ওপর। নিজে সেখানে বসে সূর্যকে ভালো করে শুইয়ে দিল কোলের ওপর মাথা দিয়ে। দু'এক মিনিটের মধ্যেই সূর্য আবার গা ঝাড়া দিয়ে বললো, চলো!

যোগানন্দ বললো, একটুখানি বসা যাক। আর একটু আলো ফুটুক। আমরা যে বাড়িতে উঠবো, সে পাড়াতেই একটা দোকানে দারুন জিলিপি ভাজে। আর কড়াই শুটির কচুরিও পাওয়া যায়। যা খাবো না আজ, জন্মের মতন খেয়ে নেবো শালা! কচুরির সঙ্গে ম্যাড্রাসী কফি।

সূর্য মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলো, থাকতে দেবে?

—কেন দেবে না। আলবৎ দেবে। ও না দেয় ওর বাপ দেবে। ওর কাকা আমাদের স্টেটের নায়েব ছিল।

—তার মানে?

যোগানন্দ হাসতে হাসতে বললো, ভুলে যাচ্ছিস কেন, আমি একটা জমিদারের ছেলে। এখনো রাস্তায় ঘাটে অনেক লোক আমাকে দেখে প্রণাম করে। পকেটে একটাও পয়সা না থাকলে কি হয়—

নরম নীলচে রঙের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। সবে মাত্র পূর্ব দিগন্ত লাল হলো। সেই সূর্য ওঠার দিকে চোখ রাখলে মনে হয় এরই নাম আবির্ভাব! শ্রান্ত শরীরে এই ভোরের সূর্যকে খুব রমণীয় মনে হয়। অন্তত এই সময় এই সূর্য বিজ্ঞানসম্মত নয়, প্রবাদ পুরাণের দেবতা।

সেপ্টেম্বরের শেষে বাতাস ঠান্ডা হয়ে এসেছে। ভোরের হাওয়ার স্পর্শে গায়ে একটু ছমছমানি লাগে। আকাশ পরিষ্কার, তকতকে নীল, বর্ষায় ধোওয়াধুয়ির পর গাছ পালাগুলি সতেজ সবুজ। চারদিকে বেশ টাটকা রঙের সমারোহ।

যোগানন্দ বুক ভরে অনেকখানি নিশ্বাস টেনে নিয়ে আপন মনে বললো, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

সূর্য কোনো উত্তর দিল না। যোগানন্দ তাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বেশ জোরে বললো, সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার আমরা ভালোভাবে বাঁচবো। চালাকি নাকি?

সূর্য চোখ বুজে নিথরভাবে বসে আছে। যোগানন্দ তার কাঁধে হাত রেখে বললো, বড় বড় করে কয়েকবার নিশ্বাস টান্, দেখবি শরীরটা বেশ ভালো লাগবে।

—আমি অনেকটা ঠিক হয়ে গেছি।

যোগানন্দ এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলো পূর্ব আকাশের দিকে। ডান হাত দিয়ে মুখখানা কবার কচলে নিল। অকস্মাৎ দেখা গেল যোগানন্দের দু'চোখে জল। এতক্ষণ সে এমন হাসি ঠাট্টার মধ্যে ছিল যে এখন এই অশ্রু সত্যিই অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়! সে আবার হাত দিয়ে চোখ-মুখ মুছে দূরের দিকে চেয়ে বললো,

এ নহে তো ঔদাসীন্য, নহে ক্লান্তি,
নহে বিস্মরণ,
ক্রুদ্ধ এ বিতৃষ্ণা তব মাধুর্যের প্রচন্ড মরণ,
তোমার কটাক্ষ
দেয় তারি হিংস্র সাক্ষ্য
ঝলকে ঝলকে
পলকে পলকে,
বঙ্কিম নির্মম
মর্মভেদী তরবারি-সম।
তবে তাই হোক,
ফুৎকারে নিবায়ে দাও অতীতের অন্তিম
আলোক।

একটু থেমে যোগানন্দ বললো, এর পর কি যেন? মনে পড়ছে না। অমর, তোর মনে আছে?

সূর্য বললো, না।

—তুই রবিবাবুর কবিতা পড়িস নি?

—তেমন ভাবে পড়ার সুযোগ পাইনি।

—যদি কালকেই তুই মরে যাস, তাহলে তুই টেরও পাবি না—জীবনে কি একটা আনন্দের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলি। এই কবিতাটা আছে 'সানাই' বইতে। আমিও অনেকদিন আর এসব বই পড়িনি। রবিবাবুর এক একটা কবিতা পড়ে মনে হয়, উনি এগুলো নিজের জন্য লেখেননি। আমাদের হয়ে আমাদের সব দুঃখের কথা উনি লিখে দিয়েছেন।

—আর একটু বলুন না।

—ঠিক মনে পড়ছে না। বোধহয় এই রকমঃ

চাহিব না ক্ষমা তব, করিব না দুর্বল মিনতি
পরুষ মরুর পথে হোক মোর অন্তহীন গতি,

অবজ্ঞা করিয়া পিপাসারে,
দলিয়া চরণ তলে ক্রুর বালুকারে।...
আজ তব নিঃশব্দ নীরস হাস্যবান
আমার ব্যথার কেন্দ্র করিছে সন্ধান
সেই লক্ষ্য তব
কিছুতেই মেনে নাহি লব,
বক্ষ মোর এড়ায়ে সে যাবে শূন্যতলে,
যেখানে উল্কার আলো জ্বলে
ক্ষণিক বর্ষণে
অশুভ দর্শনে।

যোগানন্দ আবার থেমে যেতেই সূর্য বললো, আরও একটু বলুন।

—আর মনে নেই যে! শুনলে মনে হয় না, এ যেন ঠিক তোর কিংবা আমার মনের কথা?

দু'জনে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলো। যোগানন্দ ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো চারদিকে। তার মুখখানা থমথমে। নিজের বুকের ওপর চাপড় মারছে আনমনে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, বেশ তো ফিরে গিয়েছিলাম, সংসার টংসার সাজিয়ে বসেছিলাম—কেন যে তুই আমাকে বার করে আনলি!

সূর্য ওর মুখের দিকে তাকাতেই যোগানন্দ তাড়াতাড়ি বললো, আমি অনুতাপ করছি না। মোটেই অনুতাপ করছি না। তুই না গেলেও আমাকে বেরিয়ে পড়তে হতোই—একবার যখন ছোঁয়াচ লেগেছে—তখন কি আর ঘরের কোণে ঘাপটি মেরে থাকতে পারতাম! যা করেছি সজ্ঞানেই করেছি। বেশ করেছি! এই রকম অবস্থায় আবার পড়লে হয়তো আবার ঐ রকমই করতাম। কিন্তু এই রকম একটা শান্ত সকাল বেলা মনে হয় না, যুদ্ধ বিগ্রহ, হানাহানি—এ সবই অর্থহীন? একটা ছোট বাড়িতে নির্ঝঞ্ঝাটে জীবন কাটিয়ে দেওয়াই সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার! এবার যদি কোনোক্রমে ঘরে ফিরতে পারি, তাহলে আর এ রাস্তায় বেরুবো না।

সূর্য বললো, আপনি যদি সেই ডাকাতির সময় না যেতেন—

যোগানন্দ আফশোসের সুরে বললো, ঐ তো আমার দোষ! আমার হাতে অনেক ময়লা। আসলে কি জানিস, আমার মাথার ঠিক নেই। কিছুদিন বাদে বাদেই আমার সব হিসেবের গোলমাল হয়ে যায়।

—যোগানন্দদা, নির্ঝঞ্ঝাট জীবন মানে কি?

—তোর তো এখনও জীবন শুরুই হয়নি, ওটা বুঝতে পারবি না।

—আমি তো অনেক মানুষ দেখলাম।

—নাঃ, কোনো লাভ নেই। তোর আর আমার মাথার ঠিক পেছনেই মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে, এ সময় জীবন টিবন নিয়ে আলোচনা করার কোনো মানে হয় না।

দু'জনেই চকিত মাথা ঘুরিয়ে একবার দেখে নিল পেছনে। তারপর পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে শুকনোভাবে হাসলো। যোগানন্দ বললো, চল, যাওয়া যাক। তুই উঠতে পারবি তো?

—চলুন।

সূর্য উঠতে যেতেই তার কোমরে গোঁজা রিভলবারটা খুলে বেরিয়ে এসে প্রথমে পড়লো ক্যালভার্টের ওপরে, ঠং করে শব্দ হয়ে গড়িয়ে গেল নীচের নালায়। সূর্য

ব্যাগ্রভাবে অত্যন্ত শরীর নুইয়ে সেটা তুলতে যেতেই যোগানন্দ তার ঘাড় ধরে তুলে এক ধমক দিয়ে বললো, কি করছিস কি? মাথা ঘুরে পড়ে যাবি যে!

—ওটা তুলতে পারছি না।

যোগানন্দ রিভলবারটার দিকে তাকিয়ে চিন্তিতভাবে বললো, কি আর হবে ওটা তুলে। আমারটাও ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে রাখি বরং। এখন তো এগুলো সঙ্গে রাখাই বিপদ।

দুর্বল শরীরে কয়েকবার নিশ্বাস নিয়ে সূর্য বললো, আমাদের লড়াই কি শেষ হয়ে গেছে?

যোগানন্দ এতক্ষণ পরে গলা ভর্তি করে হা-হা শব্দে হেসে উঠলো। তারপর সূর্যর কাঁধ চাপড়ে বললো, তুই কি এরপরেও লড়াই করার স্বপ্ন দেখছিস? তুই যদি এর পর আর সাতটা দিনও বেঁচে থাকিস তা হলে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিস!

সূর্য অনুভূতিহীন গলায় বললো, আমি সহজে মরবো না!

—কেউ কি মরতে চায়? আমি কি মরতে চাই? ভেবেছিলাম তো এবার লড়াইতে পাপ চুকিয়ে দেবো। কিন্তু পুলিশের গুলি খেয়ে মরার সাধ আর আমার নেই। আমি এবারেও ঠিক বেঁচে যাবো—কিন্তু তুই যা শরীরের অবস্থা করেছিস, ক'দিন থাকতে পারবি?

—আমি শিগগিরই ভালো হয়ে উঠবো।

—তোর এত বাঁচার শখ কেন রে?

—আমার অনেক কিছু এখনো বাকি আছে।

—কি বাকি আছে?

সূর্য একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে বললো, অনেক কিছুই বাকি আছে। কিন্তু কাল থেকে মনে হচ্ছে, একজনের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত আমার মৃত্যু হবে না। আমি তার সামনে গিয়ে বলবো, আমি আর জোর করতে চাই না, তোমাকে কেড়ে নিতে চাই না, কিন্তু তুমি তোমার মনের মধ্যে আমার জন্য একটু জায়গা রেখো।

যোগানন্দ জিজ্ঞেস করলো, সে কে?

—আপনি চিনবেন না।

—তোর এত কাঁচা বয়েস, এরই মধ্যে প্রেমে ট্রেমে পড়লি কবে?

—সে সব কিছু না। আচ্ছা, আপনি কি মরতে চান?

—তোকে এ অবস্থায় ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারবো না।

—আমার হাতটা একটু ধরুন, রিভলবারটা তুলে আনি।

—ওটা আর সঙ্গে না রাখাই উচিত।

—আমি ওটা না নিয়ে যেতে পারবো না।

—ঠিক আছে, তুই দাঁড়া—

যোগানন্দ নীচে গিয়ে রিভলবারটা তুলে এনে সূর্যর হাতে ধরিয়ে দিল। এখন যোগানন্দর মুখের ভাব আবার বদলে গেছে। চিন্তার লেশ মাত্র নেই। সূর্যর কাঁধ ধরে বললো, অমর, সোজা হয়ে দাঁড়া তো! এই তো, ঠিক আছে। শোন, আমরা দু'জনেই খোলা রিভলবার হাতে নিয়ে শহরে ঢুকবো। আমরা ফাইটার, শেষ পর্যন্ত আমরা ফাইট করে যাবো। বখতিয়ার খিলজি নাকি সতেরোজন অশ্বারোহী নিয়ে বাংলা জয় করেছিলেন, আর আমরা দু'জনে এই একটা শহর জয় করে ফেলতে পারবো

না? আমাদের সামনে কে দাঁড়াবে? রাজি আছিস?

উত্তর না দিয়ে সূর্য হাসলো।

—আমরা কারুকে পরোয়া করবো না। তোর কাছে কার্তুজ কটা আছে?

—ডজন তিনেক।

—আমার কাছেও ঐ রকমই আছে। লড়ে যাবো শেষ পর্যন্ত। শেষ বুলেটটা রেখে দেব নিজের মাথার জন্য। শালা, এই কুকুর বেড়ালের মতন পালিয়ে পালিয়ে থাকা আর ভালো লাগে না।

—আমরা তো শহরেই যাচ্ছি।

—হ্যাঁ। কোনো শুয়ারের বাচ্চা ঝঞ্ঝাট করতে এলে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেবো।

যেন এটা একটা রসিকতা, এইভাবে কথাটা শেষ করে হাসলো যোগানন্দ। নিজের রিভলবারটা বার করে চুমু খেল।

কাছেই একটা নিমগাছের পাতার আড়ালে অদৃশ্য থেকে একটা দোয়েল পাখি শিস দিচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে। যোগানন্দ পাখিটাকে উদ্দেশ্য করে এবার একটা পাল্টা শিস দিল। হালকা গলায় বললো, 'যাও পাখি বলো তারে, সে যেন ভোলে না মোরে!' চল!

শহরের তখনও ঘুম ভাঙেনি। রাস্তায় কদাচিৎ একটি দুটি লোক। ম্যাড্রাসী কফির দোকানটা সদ্য খুলেছে বটে কিন্তু ওদের কফি খাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না—

রেলওয়ে স্টাফ কলোনীর মধ্যে একটি কোয়ার্টারের সামনে দাঁড়িয়ে যোগানন্দ বেশ খোলা গলাতেই ডাকলো, প্রবীরবাবু, প্রবীরবাবু!

দরজাটা একটু খুলতেই কোনো সুযোগ না দিয়ে ভেতরের লোকটিকে ঠেলে যোগানন্দ ঢুকে গেল ভেতরে। তারপর ডাকলো, আয় অমর, ভেতরে আয়!

অল্প বয়সেই বুড়োটে হয়ে যাওয়া একজন লোক হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দু'জনের চেহারা ও বেশবাসের অবস্থা দেখে ওদের সম্পর্কে কোনো ভুল ধারণা করার অবকাশ নেই। তবু লোকটি বললো, কি হয়েছে?

যোগানন্দ বললো, দরজা বন্ধ করে দাও।

—কি হয়েছে কি?

—খুব বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি। তুমি অনেকবার তোমার এখানে আসবার জন্য নেমন্তন্ন করেছিলে, আগে আসা হয়ে ওঠে নি। এখন এসেছি।

যোগানন্দর পারিবারিক নাম ছোটবাবু। লোকটি সেই নামেই ডেকে বললে, ছোট-বাবু, আপনার কথা এখানে সবাই জানে।

—কি জানে?

—আপনারা দিলনগর থানায়—

কি করে জানলো যে আমিই?

—আপনার নামে পুলিসের হুলিয়া বেরিয়েছে। পোস্ট অফিসে কাগজ সেঁটে দিয়েছে। আমার এক ভাগ্নে পোস্ট অফিসে কাজ করে সে দেখেছে।

—তাতে কি আমার ছবি আছে?

—না।

—আমরা এখানে দু'দিন থাকবো। এ আমার ছোট ভাই।—মায়ের পেটের ভাই না হলেও আপন ভাই।

—এখানে ভীষণ ধরপাকড় হচ্ছে। যে-কোনো পাড়া হঠাৎ ঘিরে ফেলে সার্চ হচ্ছে।

পরশুদিন আমাদের এখানে সার্চ হয়ে গেছে, ধরে নিয়ে গেছে দুজনকে।

—একবার যখন সার্চ হয়ে গেছে আর হবে না।

—তার কোনো মানে নেই। অনেক জায়গায় দু'তিনবার, যখন তখন—

—আমরা মাত্র দু'দিন থাকবো। তোমার কাছে শিবাঝল ট্যাবলেট আছে?

—আজ্ঞে?

—শিবাঝল ট্যাবলেট আছে বাড়িতে? এই ছেলেটাকে এক্ষুনি কিছু ওষুধ খাওয়ানো দরকার।

—ওষুধ তো নেই।

—দোকান খুললেই ওষুধ আনতে হবে। তারপর একজন ডাক্তার।

—কি হয়েছে এনার?

—সেটা ডাক্তারই বলতে পারবে।

লোকটি হাত জোড় করে বললো, ছোটবাবু, আমি এখানে বউ ছেলে নিয়ে ঘর করি—

—আমরা কোনো অসুবিধের সৃষ্টি করবো না।

—আপনি বুঝতে পারছেন না—যদি পুলিসের নজরে পড়ি—

যোগানন্দ হঠাৎ দপ করে রেগে উঠলো। উত্তপ্ত চোখে বললো, আর যারা দেশের জন্য লড়াই করছে, তাদের কারুর মা নেই, বাবা নেই, বউ ছেলেপুলে নেই, না? তাদের মায়েদের কষ্ট নেই, তাদের ছেলে মেয়েরা কাঁদে না? স্নেহ দয়া মায়া বুঝি তাদের জন্য নয়!

—আমি ছাপোষা মানুষ—

—আমাকে বেশী রাগিও না। নেহাৎ বাধ্য হয়ে না হলে কি তোমার বাড়িতে আসতাম? এখন কি আমাদের ধুলো পায়ে বিদায় করতে চাও? নিমকহারাম!

—ও কথা বলবেন না। আপনাদের বাড়ির নুন খেয়েছি এককালে। আপনারা আমাদের জন্য অনেক করেছেন। কিন্তু যদি পুলিস টের পায়, আপনাদের তো যা হবার হবেই, আমার চাকরি যাবে। তখন কোথায় দাঁড়াবো বলতে পারেন।

—পুলিস টের পাবে কেন! প্রবীর, একটা কথা ঠিক করে বলো তো—পুলিসের সঙ্গে তোমার কোনো যোগাযোগ আছে? ইনফরমারের কাজ নিয়েছো নাকি? তোমাদের রেলের কিছু ওয়ার্কার স্যাবোটাজ করতে গিয়েছিল না?

—আমি তখন ছুটিতে ছিলাম। পুলিস দেখলেই আমি আঠারো হাত দূরে থাকি!

একটা সাত আট বছরের ছেলে মুখে আঙুল দিয়ে ওদের দেখছিল। সূর্য ছেলেটির কাছে গিয়ে বললো, খোকা, তোমার নাম কি?

ছেলেটি কোন উত্তর না দিয়ে ছুটে ভেতরে চলে গেল। তার থেকে একটু ছোট আর একটা ছেলে এসে কিছুটা দূরত্ব রেখে দাঁড়ালো।

যোগানন্দ প্রবীরকে ধমক দিয়ে বললো, যাই হোক, কোনোরকম এদিক ওদিক করার চেষ্টা করো না। তাহলে সুবিধে হবে না। আমরা এখানে থাকতে এসেছি। এখানে থাকবো—যতক্ষণ না সুবিধে মতন জায়গা পাই।

যেখানে ওদের থাকতে দেওয়া হলো, সেটা বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের পড়বার ঘর। পাঁচটি ছেলেমেয়ে। তারা দূর থেকে উঁকি মেরে যাচ্ছে, ডাকলেও কাছে আসে না। সূর্য দরজার কাছে গিয়ে তাদের ধরবার চেষ্টা করলেও ওরা পালিয়ে যায়।

যোগানন্দ বললো, বাচ্চাদের আমি ভালোই বাসি। কিন্তু এখন এই বাচ্চাদের

দেখে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। এখন এরাই আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। ওরা এক্ষুনি গিয়ে পাড়ার অন্য বাচ্চাদের কাছে আমাদের সম্পর্কে গল্প করবে। তারা আবার তাদের মা বাবার কাছে বলবে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমাদের কথা এখানে সবাই জেনে যাবে। এই কলোনির মধ্যে একজন দু'জন যে পুলিসের ইনফরমার আছে, সে সম্পর্কে আমি বাজি ফেলতে পারি।

সূর্য মাথা নাড়লো। যোগানন্দ ঠিকই বলছে। সেইজন্যই সে এতক্ষণ বাচ্চাগুলোর সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করছিল। দিন দশেক আগে তারা যে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল—সেখানে বাচ্চাদের জন্যই তাদের উপস্থিতির কথা ফাঁস হয়ে যায়।

যোগানন্দ বললো, তুই হাজার চেষ্টা করেও বাচ্চাদের আটকাতে পারবি না। ওদের বারণ করলে ওরা আরও বেশী করে বলবে। আগে জানতাম না এ বাড়িতে এতগুলো বাচ্চা। প্রবীর আমার চেয়েও এক বছরের ছোট—এর মধ্যেই পাঁচটা বাচ্চা পয়দা করে ফেলেছে কি করে জানবো।

সূর্য বললো, ছোট মেয়েটাকে দেখতে ভারি সুন্দর।

—মুখটা সত্যিই সুন্দর। অন্য সময় হলে কত আদর করতাম, লজেঞ্চুস কিনে দিতাম—এখন ইচ্ছে করছে গলা টিপে মেরে ফেলি। হয়তো ঐ মেয়েটার জন্যই আমরা ধরা পড়বো।

সূর্য হেসে বললো, সো সুইট ওয়াজ নেভার সো ফেটাল!

এক বাটি করে হালুয়া এবং দু' কাপ অতি বিস্বাদ চা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ওদের জন্য। যোগানন্দ চোখের নিমেষে হালুয়াটুকু শেষ করে লোলুপভাবে তাকিয়ে রইলো বাটিটার দিকে। বেচারা! ওর এত বড় শরীর ও প্রচণ্ড ক্ষিদের কাছে ঐটুকু হালুয়া কি! অনিচ্ছুক গৃহকর্তার বাড়িতে আতিথ্য নেওয়ার গ্লানি যে কি তা ওরা ভালোভাবেই জানে। যোগানন্দর আরও মনে লাগছে এই জন্য যে তাদেরই একদা অনুগৃহীত প্রজার বাড়িতে সে এসেছে—যে এর আগে বহুবার তাকে এ বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দেবার জন্য অনুরোধ করেছে—আজ সে পেট ভরে খেতেও দেবে না? যেন তারা কোনো ঘৃণিত প্রাণী। তারা এত লড়াই করলো কার জন্য? এদের জন্য নয়? অপরিচিত লোকের বাড়িতে উঠলে সে হয়তো খাবারের জন্য জোর জুলুম করতে পারতো—কিন্তু চেনা লোকের কাছে ভয় দেখিয়ে খাবার চাওয়া যায় না।

যোগানন্দ সব কটা জানলা বন্ধ করে ঘর অন্ধকার করে ফেললো। রাগের মাথায় চেয়ারকে লাথি মেরে ফেলে দিল ঘরের কোণে। সূর্য টেবিলের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে—হাত দুখানা বুকের ওপর আড়া আড়ি রাখা। মুখখানা অসম্ভব বিবর্ণ।

যোগানন্দ তার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললো, ঘুমিয়ে পড়েছিস?

—না।

—এখন ঘুমোস না। শরীর আরও খারাপ লাগবে। স্নান-টান করে—এরা যদি ভাত খেতে দেয়, সেটা খেয়ে নিয়ে তারপর পালা করে ঘুম দিতে হবে। তুই আগে ঘুমিয়ে নিস। তার আগে কয়েকটা জরুরী কথা সেরে নেওয়া যাক। তোর এখানে কোন্ আত্মীয় থাকে বললি, তার বাড়িতে তোকে থাকতে দেবে?

—তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে কি করে?

—যদি পাওয়া যায়। থাকতে দেবে?

—মনে তো হয়।

—এখানে বেশী দিন থাকা যাবে না বুঝলি! তা হলে তোকে সেখানে রেখে আমি কেটে পড়তাম।

—আপনি কোথায় যাবেন?

—বাংলাদেশ থেকে সরে পড়তেই হবে। তোর শরীরের অবস্থা খারাপ, তোর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়—কিন্তু আমার তো এখানে পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না। দিনের পর দিন পারবো না ঘরে বসে থাকতে—বেরলে ধরা পড়বোই। ব্রিটিশদের ইনটেলিজেন্স ব্যবস্থা সাংঘাতিক। গোটা ভারতবর্ষে এতকালের মধ্যে রাসবিহারী বোস ছাড়া আর কেউ গ্রেফতার এড়াতে পেরেছে?

—লোকের বাড়িতে এরকমভাবে জোর করে থাকার চেয়ে আমার জেলে যেতে খারাপ লাগবে না।

—খুব আরামের জায়গা ভেবেছিস, তাই না? তোর যা লালটু চেহারা—যত শালা হোমো তোর বারোটা বাজিয়ে দেবে।

—আমরা কি আজই এখান থেকে চলে যাবো?

—দেখি! এক হিসেবে পুলিসের হাতে এখন তুই ধরা পড়লে তোর পক্ষে ভালোই হতো। জেলের হাসপাতালে চিকিৎসা হতে পারতো। কিন্তু তার আগেই যদি পেঁদিয়ে শেষ করে দেয়? ব্রজদাকে যেভাবে মারলো—

যোগানন্দ প্রবীরকে ডেকে পাঠালো। সে আসতেই জিজ্ঞেস করলো, ওষুধ আনিয়েছো?

প্রবীর শুকনো মুখে বললো, না, এখনো দোকান খোলেনি। দেখি, একটু পরে—

—তোমার চেনা ডাক্তার আছে?

—আমাদের তো রেল কম্পানির ডাক্তার।

—কাছাকাছি অন্য কোনো ডাক্তার নেই?

—ছোটবাবু, ডাক্তার ডাকলে লোক জানাজানি হয়ে যাবে না?

—এ ছেলেটি কি বিনা চিকিৎসায় মরবে নাকি?

—ছোটবাবু, আপনিই ভেবে দেখুন আমি কি করতে পারি! কোনোক্রমে কথাটা ছড়ালে—

—বাচ্চাগুলোকে আটতে রাখতে পারবে?

—কি বললেন!

—তোমার ছেলেমেয়েরা যাতে বাড়ি থেকে একদম না বেরোয়, সে ব্যবস্থা করতে পারবে? পারবে না, আমি জানি। অন্য বাড়ির ছেলেমেয়েরা এলে, তাদের তো আট-কাতে পারবে না। যাকগে, তোমাদের এখানে ট্রেন ঠিক মতন চালু হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—সব দিকে ট্রেন চলছে?

—হ্যাঁ। আপনি কোথায় যাবেন?

একটুও দ্বিধা না করে যোগানন্দ বললো, আমাকে কলকাতায় যেতেই হবে। আমাকে নিরাপদে ট্রেনে তুলে দেবার দায়িত্ব তোমার। আর একটা কথা, তুমি প্রভাস লাহিড়ী বলে কারুকে চেনো? খড়্গপুরেরই লোক।

—না তো!

—এখানকার স্থানীয় লোক, খুঁজে বার করতে পারবে না?

—শুধু নাম শুনে—কি করেন তিনি?

—ও—সব জানি না। তবে, খুব ইম্পর্ট্যান্ট লোক। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে দেখো। তোমার যে ভাগনে পোস্ট অফিসে কাজ করে, তাকে জিজ্ঞেস করো—রেডিওর লাইসেন্স বা টেলিফোন থাকতে পারে বাড়িতে। স্টেশন মাস্টারকেও জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। খুঁজে বার করো। এ ছাড়া আমার কিছু টাকা ধার চাই। আমি তোমাকে হুণ্ডি লিখে দিচ্ছি—তুমি আমার বাবাকে সেটা দেখালে টাকাটা ফেরৎ পেয়ে যাবে।

কলোনির এইসব বাড়িগুলির মধ্যে খানিকটা গ্রাম গ্রাম ভাব আছে। পাড়াপ্রতিবেশীরা সবাই সবার বাড়িতে যখন তখন যাওয়া আসা করে—পরস্পরের খোঁজ খবর নেয়। কার বাড়িতে কোন্ দিন কি রান্না হলো তাও গোপন থাকে না।

সারাদিন ধরে প্রবীরের বাড়িতে যে কত লোক এলো তার ঠিক নেই। স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, শিশু। ঘরের দরজা বন্ধ করে অন্ধকারের মধ্যে বেজার মুখে বসে রইলো যোগানন্দ। বিড়বিড় করে বলতে লাগলো, এর থেকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়ানোও ভালো। অমর, চল্, পাততাড়ি গুটোতে হবে আজই। এত সুখ কপালে সইছে না।

সন্ধ্যেবেলাতেই প্রবীর ভাল খবর নিয়ে এলো। প্রভাস লাহিড়ীর সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রভাসকে অনেকে না চিনলেও তার বাবা জগদীশ লাহিড়ী অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন লোক, সবাই চেনে। ওদের মস্ত বড় বাড়ি—থাকার জায়গার কোনো অসুবিধে নেই।

খবরটা আনতে পেরে প্রবীর খুব নিশ্চিন্ত বোধ করছে। এবং সে ভাবটা লুকোবারও কোনো চেষ্টা নেই। ওরা কবে সেখানে যাবে সে প্রশ্নও করলো না, বললো, আপনারা কিন্তু না খেয়ে যেতে পারবেন না। রান্না চেপে গেছে, বেশিক্ষণ লাগবে না।

যোগানন্দ বললো, আমরা রাত ন'টার আগে বেরুবো না। আর প্রবীর, তুমি আমাদের সঙ্গে গিয়ে বাড়ি চিনিয়ে দিয়ে আসবে।

প্রবীর রীতিমতন ভয় পেয়ে বললো, রাত ন'টায়? এখনও এখানে রাত্তিরবেলা কেউ বেরোয় না।

—যাদের নাইট ডিউটি থাকে?

—তাদের বাধ্য হয়ে যেতেই হয়।

—আমরাও বাধ্য হয়েই যাচ্ছি। কারফিউ তো আর নেই!

প্রবীরের বাড়িতে আসার পনেরো ঘণ্টা পরেই সে বাড়ি থেকে আবার বেরিয়ে পড়তে হলো ওদের। যোগানন্দ প্রবীরকে জোর করে ধরে এনেছে—তার স্ত্রী পর্যন্ত এসে কাকুতি-মিনতি করেছিল, যোগানন্দ ছাড়েনি। বাড়ি খোঁজার জন্য লোকজনকে জিজ্ঞাসা করা কিংবা রাস্তা হারিয়ে ঘুরে বেড়ানো কোনো কাজের কথা নয়।

প্রবীর একেবারে থরথর কাঁপছে যাকে বলে। দু' পা গিয়েই থেমে পড়ে বলছে, এবার আমাকে ছেড়ে দিন, আপনারা যেতে পারবেন।

রাস্তায় রাস্তায় বেশ পুলিসের টহল আছে। ওরা সেগুলো এড়িয়ে যেতে পারলো। ক্রমে শহরের এক প্রান্তে এসে পড়লো ওরা। এখানে বাড়িঘর কম, ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে মাঝে মাঝে।

প্রবীর দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, আমাকে আর নিয়ে যাবেন না। এবার সহজেই চিনতে পারবেন। এই যে সোজা রাস্তা—প্রথম ডান দিকে বেঁকেই সেই বাড়ি। বেশ বড় বাড়ি, সামনে বাগান আছে, গেট আছে—ও-রকম বাড়ি ওখানে একটাই—চিনতে কোনো ভুল হবে না। বাড়ির সামনে লেখা আছে 'লাহিড়ী লজ'।

যোগানন্দ বললো ঠিক আছে, তুমি যাও। সাবধানে যেও তুমি আমাদের অনেক উপকার করেছো। যদি বেঁচে থাকি, ফিরে এসে নিশ্চয়ই তোমার জন্য কিছু একটা করবো।

প্রবীর চলে যেতেই যোগানন্দ বললো, আমরা দুজনে রাস্তার দু-পাশ দিয়ে যাই। বেশ অন্ধকার অন্ধকার আছে। তুই পারবি তো?

সূর্য বললো, আজ আমার শরীরটা খুব ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে যেন অসুখই নেই।

—ভালো করে চিকিৎসা করাবি। তোর বোনের বাড়িতে আমিও দিন দুয়েক থেকে যাবো। ভালো করে একটু খাওয়া দাওয়া করা দরকার। যা শুনলাম, তোর বোনের শ্বশুর বেশ বড়লোক—বড়লোকদের পুলিস সহজে ঘাঁটায় না। তোর আপন বোন?

—না।

—আমাকে থাকতে দেবে তো?

—আমাকে দিলে আপনাকেও নিশ্চয়ই দেবে।

প্রবীরকে ছেড়ে দেবার পর দু মিনিটও সময় যায়নি। হঠাৎ একটা বাড়ি থেকে সাইকেলে চেপে একটা লোক বেরিয়ে এলো। লোকটি সাদা চামড়া, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কিংবা ইংরেজ। খুব সম্ভব লোকটি ওদের দুজনকে দেখতে পায়নি। ওরা রাস্তা থেকে নেমে গিয়ে দাঁড়ালেই পারতো। কিন্তু যোগানন্দ মাথার ঠিক রাখতে পারলো না। সে চাপা গলায় বললো, পুলিস, দৌড়ো।

বলার সঙ্গে সঙ্গে যোগানন্দ মাঠের মধ্যে নেমে দৌড়োতে গেল এবং আচমকা আছাড় খেয়ে পড়লো সশব্দে। তাতেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো লোকটির। সে সাইকেল থামিয়ে মাটিতে এক পা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে নিরীহভাবেই জিজ্ঞেস করলো, হেই, হোয়াট আর ইউ ডুয়িং দেয়ার?

যোগানন্দ আর একটা ভুল করলো। সে উত্তর দেবার বদলে গুলি চালালো। আত ব্যস্ততার জন্য গুলিটা যে শুধু সাহেবটার শরীরের এক হাত দূর দিয়ে চলে গেল তাই-ই নয়, রাস্তার অন্য দিকে দাঁড়ানো সূর্যর গায়েও লাগতো আর একটু হলে। সূর্য তৎক্ষণাৎ হুমড়ি খেয়ে রাস্তার পাশে পড়েই গড়াতে শুরু করেছে। সূর্য ফের উঠে দাঁড়াবার আগেই যা হবার হয়ে গেল।

গুলির শব্দ শুনেই সাহেবটিও সাইকেল সমেত রাস্তার ওপড়ে পড়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে উঠেই দৌড়োতে শুরু করেছে, সাইকেলটা হাতে ধরা, উঠতে পারেনি। যোগানন্দ রিভলবার হাতে তাড়া করে গেল ওকে, না মেরে ছাড়বে না! হঠাৎ সাহেবটি পেছন ফিরে যোগানন্দর ঠিক মুখের ওপর গুলি করলো। একটিমাত্র গুলি, যোগানন্দ পড়ে গেল মাটিতে। সূর্য তখন উঠে বসেছে। তার রিভলবার বার করতে করতেই সাহেবটি সাইকেলে উঠে পড়েছে। সূর্যর গুলিও তার গায়ে লাগলো না। সূর্যও রিভলবার হাতে রাস্তার পাশে পাশে দৌড়ে যেতে লাগলো, তার পরবর্তী দুটি গুলির মধ্যে একটি লাগলো সাহেবের কাঁধে—তবু সে সাইকেল থামালো না—বেরিয়ে গেল বাঁই বাঁই করে। আর কিছুক্ষণ দৌড়ে নিরাশ হয়ে থেমে গেল সূর্য। ফিরে এলো যোগানন্দর কাছে।

যোগানন্দ কোনো যন্ত্রণা পায়নি তার মস্তক ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, মৃত্যু তৎক্ষণাৎ। তার ঠোঁটের ভঙ্গিতে তখনও একটা রাগী ভাব। সূর্য যোগানন্দর নাকের কাছে হাত রাখলো, বুকে হাত রাখলো। এত তাড়াতাড়ি ঘটনাটা ঘটে গেল যে এখনো সে ঠিক

বিশ্বাসই করতে পারছে না। এ সবই যেন অর্থহীন ঘটনা। একটু আগে যোগানন্দ এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, এখন পড়ে আছে তার লাশ। সূর্য এখন কি করবে? তার থেমে থাকার উপায় নেই।

সূর্যর মাথাটা ঘুলিয়ে গেল, সে আর কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। যোগানন্দর নিশ্চিত মৃত্যু হয়ে গেছে জেনেও সে দেহটাকে ধাক্কা দিয়ে বলতে লাগলো যোগানন্দদা উঠুন, শিগগির উঠুন! কোনো সাড়া না পেয়ে সে অনবরত এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। আর কেউ আসছে না তো! অনিচ্ছা সত্ত্বেও সূর্যর মুখ দিয়ে বারবার হেঁচকি উঠছে। তারপর সে একবার যোগানন্দর দেহটা কাঁধে তুলে নেবার চেষ্টা করলো, পারলো না, দুজনেই একসঙ্গে পড়ে গেল মাটিতে। তখন সূর্যর মৃত্যুভয় জাগলো। যে মৃত্যুভয় অত্যন্ত স্বার্থপর।

সূর্য উঠেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলো। তাকে পৌঁছোতে হবে, তাকে শেষ পর্যন্ত পৌঁছোতেই হবে। শরীরের কথা তার মনে নেই। যত জোরে সে ছুটতে পারে, তার থেকেও জোরে সে ছুটছে। লাহিড়ী লজের প্রধান গেট দিয়ে না ঢুকে, বাগানের বেড়া ডিঙিয়ে ফুলগাছ পায়ে মাড়িয়ে সে দরজার কাছে এসে গতির ঝোঁক থামালো। দুম দুম করে দরজায় ঘা দিতে লাগলো তারপর। সে আর দেরি করতে পারবে না।

॥ ৪৩ ॥

যদিও শ্রীলেখা সব সময়ই একজন আগন্তুকের প্রতীক্ষা করতো, কিন্তু সূর্য যখন এলো, তখন সে টের পায়নি। সে ঘুমিয়েছিল।

দরজায় দুম দুম আওয়াজ শুনে বাড়ির একজন বৃদ্ধ চাকর খুলে দিল দরজা। সূর্য হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে দেয়াল ধরে হাঁপাতে লাগলো। তার বুক থেকে তখন হাপরের মতন শব্দ হচ্ছে, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে—সে ঘর দেখতে পাচ্ছে না, মানুষ দেখতে পাচ্ছেনা—সব কিছু ঘুরছে। সব কিছুতে রক্ত ছড়ানো, যোগানন্দর রক্ত। আঃ, কে হাতুড়ি পিটছে তার মাথায়! সূর্য তার মাথা এদিক ওদিক সরিয়ে নিচ্ছে। আর একটুখানি সময় কেউ তাকে দেবে না?

বৃদ্ধ চাকর ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কে গো বাবু? কে?

সূর্য মুখ ফিরিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললো, দরজা বন্ধ করে দাও!

পরক্ষণেই আবার মাথা ঘুরে গেল সূর্যর। দেয়াল ধরে নিজেকে সামলাতে গিয়েও হাতের জোর পাচ্ছে না। একটু দূরেই একটা লম্বা সোফা—ওই পর্যন্ত সে পৌঁছতে পারবে না? এ কি, তার হাতে রক্ত এলো কোথা থেকে? দেয়ালে রক্ত লেগে যাচ্ছে—এরা রাগ করবে। কি যেন লোকটির নাম? কার বাড়িতে সে এসেছে! আর একটু সময় কেউ তাকে দেবে না?

চোখ খুলে রক্তবর্ণ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে সূর্য বললো, ওকে ডাকো।

—কাকে? আপনি কাকে খুঁজছেন?

কি যেন নাম? কার যেন বাড়ি এটা? মাঠ ঘাট পেরিয়ে কোন দিকে সে ছুটছিল? নাঃ, পৃথিবীতে রক্তের ঢেউ ছাড়া আর কিছু নেই।

দেয়াল ছেড়ে সোফাটার দিকে এগুতে গিয়ে সূর্য ঝুপ করে পড়ে গেল মেঝেতে। এবার বেশ ভালো লাগছে, ভারী আরাম, মাটি ভেদ করে সে যেন চলে যাচ্ছে অনেক

অনেক নীচে, ঠাণ্ডা অন্ধকারে।

বুড়ো চাকর ভয় পেয়ে ডেকে আনলো আর একজন চাকরকে। সে আবার রান্নার ঠাকুরকে ডাকলো। তারপর খবর পাঠানো হলো সরকারবাবুর কাছে। বাড়ির চাকর-বাকর ও কর্মচারীদের একটি ছোট খাটো জনতা কিছুক্ষণ ঠেলাঠেলি করলো সূর্যর দেহটা—তারপর তার হাতে রক্ত দেখে আঁতকে উঠলো। এবার কর্তাদের খবর পাঠানো দরকার।

কর্তাদের মধ্যে প্রভাসকুমারই একমাত্র পুরুষ মানুষ তখন বাড়িতে উপস্থিত। প্রভাসকুমারের বাবা তীর্থ থেকে এখনো ফেরেননি। আত্মীয়-স্বজনরাও নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছেন—শিগগিরই দুর্গাপুজো উপলক্ষে সবাই আবার এ বাড়িতে এসে জড়ো হবেন।

প্রভাসকুমার তখন নিজের পাঠকক্ষে একখানি বই চোখের সামনে মেলে গভীর চিন্তামগ্ন। সরকারবাবু বাইরে থেকে ভয়ার্ত গলায় ডাকলো।

প্রভাসকুমারের ভুরু কুঁচকে গেল। মুখ না ফিরিয়েই বললেন, কাল সকালে এসো। এখন বিরক্ত করো না!

—দাদাবাবু একবার নীচে আসতে হবে।

—বলছি তো এখন বিরক্ত করো না।

সরকারবাবু দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়ে তড়বড় করে একসঙ্গে অনেক কথা বলতে গেল।

প্রভাসকুমার বই মুড়ে রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এত রাত্রে আমাকে বিরক্ত করবার মানে কি?

প্রভাসকুমার তখন শোপেনহাওয়ার বিষয়ক মোহিতলাল মজুমদার রচিত কবিতা পাঠ করছিলেন। মাঝখানে এ-রকম বিঘ্ন ঘটায় তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। চটিটা পায়ে গলিয়ে বললেন, চলো, দেখি!

বারান্দা দিয়ে যাবার সময় শয়নকক্ষের দরজা ঠেলে একবার উঁকি দিলেন। আলো জ্বালিয়ে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছে শ্রীলেখা। বালিশময় চুল ছড়ানো। মশারির মধ্যে তাকে দেখাচ্ছে সুপ্ত রাজকন্যার মতন। আবার দরজা ভেজিয়ে চটি ফটফটিয়ে নীচে নেমে এলেন প্রভাসকুমার।

মাটিতে পাশ ফিরে শুয়ে আছে সূর্য। পা দুখানা লম্বা করে ছড়ানো, হাত দুখানা বুকের ওপর গুটিসুটি করা।

প্রভাসকুমার এক নজর তাকে দেখে নিয়ে কর্মচারীদের জিজ্ঞেস করলো, এ কে?

কেউ কিছু জানে না।

—এ ভেতরে এলো কি করে?

বুড়ো চাকরটি হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো। তার কোনো দোষ নেই, সে ভেবেছিল কর্তাবাবুদের কেউ ফিরে এসেছেন।

প্রভাসকুমার বললেন, এ তো অজ্ঞান হয়ে গেছে দেখছি। এর মুখে চোখে জল দাও।

সরকারবাবু বললো, দাদাবাবু, ওর হাতে রক্ত লেগে আছে দেখছি, পুলিসে খবর দেবো?

পুলিসের নাম শুনেই প্রভাসকুমার মুখ বিকৃত করলেন। এই সুন্দর শান্ত রাত্রিতে কবিতার বই ফেলে উঠে এসে একটি রক্তাক্ত অপরিচিত মানুষ দেখাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট—এর ওপর পুলিসের দৃশ্য সহ্য করা তাঁর পক্ষে এখন অসহ্য। তিনি পুনরায় মৃদু

গলায় বললেন, আগে ওর মুখে চোখে জল দাও।

এক বালতি জল এনে ছিটিয়ে দেওয়া হতে লাগলো [illegible] বাঁচাবার জন্য প্রভাসকুমার একটু সরে দাঁড়ালেন। প্রভাসকুমার ধপধপে ধুতি ও ফর্সা বেনিয়ান পরে আছেন—তাঁকে দেখলে সব সময়ই বিস্মিত হয়ে ভাবতে হয়, পৃথিবীতে এত ধুলো বালি ময়লা বাঁচিয়ে তিনি থাকেন কি করে?

জলের ঝাপটায় সূর্য চোখ খুললো একবার, অন্য দিকে পাশ ফিরলো। ঠিক যে কাতরভাবে তা নয়, বিরক্তিসূচক উঃ আঃ শব্দ করলো আস্তে আস্তে।

প্রভাসকুমার প্রশ্ন করলেন, তুমি কে?

সূর্যর চোখে এখনো পৃথিবীটার রং লাল, ছলাৎ ছলাৎ করে সে শুনতে পাচ্ছে রক্তের শব্দ। সে কি এখনো দৌড়োচ্ছে? আর যে দৌড়োনো যায় না, পায়ের শিরা ছিঁড়ে যাবে, বুক ফেটে হাওয়া বেরিয়ে আসবে।

সূর্য ঝাপসা গলায় বললো, ওকে ডাকুন।

—কাকে? তুমি কাকে খুঁজছো?

সূর্য আবার চোখ বুজে ফেললো। এটা কার বাড়ি? তার কোথায় আসার কথা ছিল। সে যেন একটা গভীর দিঘির জলে ডুবে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, বার বার ভেসে ওঠার চেষ্টা করছে জোর করে, পারছে না।

প্রভাসকুমার বললেন, ও আবার অজ্ঞান হয়ে গেছে।

একজন চাকর বললো, আবার জল চালাবো?

প্রভাসকুমার নীচু হয়ে সূর্যর চোখের পাতা টেনে দেখলেন। কপালে হাত দিয়ে বললেন, গায়ে ভীষণ জ্বর। এত অল্প বয়েস—

উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, একে সোফাটার ওপর শুইয়ে রাখো আজ রাত্তিরটার মতন।

—দাদাবাবু, যদি চোর-ডাকাত হয়?

—দরজা বন্ধ করে দিও বাইরে থেকে।

প্রভাসকুমার ওপরে উঠে এসে আবার কাব্যগ্রন্থ খুলে বসলেন। মনটা চঞ্চল হয়ে গেছে। ঘন ঘন হাঁটু দোলাচ্ছেন। রাত্তিরবেলা তাঁরই বাড়ির বৈঠকখানায় একটি অচেনা যুবকের চেতনাহীন দেহ বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাঁর চিন্তাকে আলোড়িত করে। এ সব কি হচ্ছে চারদিকে? এত আগুন, রক্ত, চিৎকার, অত্যাচার। পৃথিবীতে কি কোনোদিন শান্তি আসবে না? ইংরেজরা বড় অদ্ভুত জাত—সব সময় এত যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত, তবু ওই জাতের মধ্যে এমন ভালো ভালো কবি জন্মায় কি করে? তবে, বাল্মীকি না জন্মালে পৃথিবীতে আর কোনো কবিই জন্মাতো না। লোকে জানতোই না, কবিতা কাকে বলে! সবই তো ইন্ডিয়া থেকে শিখেছে! আমাদের পুষ্পক রথ, আমাদের নালিকাস্ত্র—এসব কতকাল আগের। নেহাৎ আজকের এই বস্তুতান্ত্রিক জগতে...

বাতি নিভিয়ে এ ঘরের দরজা টেনে প্রভাসকুমার চলে এলেন শোবার ঘরে। শ্রীলেখাকে জাগালেন না। মশারি তুলে শ্রীলেখার শিয়রের পাশে বসে বিয়ের দিন বাসর ঘরে শ্রীলেখার দিকে যে-রকমভাবে তাকিয়েছিলেন ঠিক সেই একই দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। রূপ দেখে দেখে আর আশ মেটে না। এই চোখ, এই ভুরুর রেখা, হরিণীর মতন মসৃণ ত্বক—এ-সবের মধ্যেই কি এক যাদু আছে—নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকলেও তো ক্লান্তি বোধ হয় না কখনো।

প্রভাসকুমার শ্রীলেখার চুলের গুচ্ছ হাতে তুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকলেন। সব রমণীর

চুলেই কি রকম যেন একটা ঐতিহাসিক গন্ধ আছে। অ্যান্টনি ক্লিয়োপেট্রার চুলে নিশ্চয়ই ঠিক এই রকমই গন্ধ পেয়েছিল! আচমকা প্রভাসকুমারের মাথায় দুটি কবিতার লাইন এসে গেল ঃ

এখন কি আমি অতীত কালের ভুলে
নাক ডুবায়েছি ক্লিয়োপেট্রার চুলে?

প্রভাসকুমার খুব খুশী হয়ে উঠলেন। শুধু খুশী নয়, কবিতা রচনার সময় তাঁর মনের মধ্যে একটা দিব্য আনন্দ দেখা দেয়। পরবর্তী লাইনটির কথা তিনি যখন চিন্তা করছেন, তখন শ্রীলেখা চোখ মেলে বললো, এখন কটা বাজে?

প্রভাসকুমার প্রসন্ন মুখে বললেন, অনেক রাত।

—তুমি ঘুমোবে না?

—তুমি ঘুমোও, আমি তোমাকে দেখি।

—মশারির ভেতরে বোধ হয় মশা ঢুকে গেছে।

—কই না তো! তোমায় কামড়েছে?

—কি জানি! পিন পিন করে একটা শব্দ হচ্ছিল কানের কাছে, তাই ঘুম ভেঙে গেল।

প্রভাসকুমার সন্তর্পণে স্ত্রীর কপালে হাত রেখে বললেন, তুমি চোখ বোজো, আমি তোমায় ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

—আচ্ছা।

—শ্রীলেখা, একটু পরে আবার যদি তোমাকে জাগিয়ে তুলি, তুমি রাগ করবে?

—ও মা, রাগ করবো কেন?

—মানে, যদি ইচ্ছে হয়, মানে যদি—

—আলো নিভিয়ে দেবে না?

রূপসুধা পান করতে করতে আলো নিভিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব প্রভাসকুমারের পছন্দ হয় না। কিন্তু স্ত্রীর কথা অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। মশারি থেকে বাইরে এলেন।

আলো নেভাবার সঙ্গে সঙ্গে জানলার বাইরের দৃশ্য দেখা গেল। প্রভাসকুমার দেখলেন তাঁর বাড়ির বাইরের রাস্তা দিয়ে সার সার পুলিসের গাড়ি চলেছে। নিস্তব্ধ নিশীথে সেই মন্থরগতি গাড়ির শব্দ মনে আতঙ্ক জাগায়। প্রভাসকুমার ভয় পেয়ে গেলেন। গত কয়েকদিন ধরে এদিকে পুলিসের আনাগোনা কিছু কমেছিল—আজ রাত্তিরে আবার এই চাঞ্চল্যের কারণ বুঝতে তাঁর দেরি হলো না। তিনি দুই আর দুই-এ চার-এর হিসেব করে নিলেন। জানলার একটা পাল্লা ভেজিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে তিনি ফিসফিস করে বললেন, আজ আমাদের বাড়িতে পুলিস আসতে পারে।

শ্রীলেখা শুনতে পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসে বললো, কেন?

প্রভাসকুমারের পাতলা মুখখানি এখন বিবর্ণ। জানলার বাইরে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বললেন, কোথা থেকে একটা ছেলে আজ আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছে।

শ্রীলেখা বিছানা থেকে নেমে তাড়াতাড়ি স্বামীর পাশে এসে জিজ্ঞেস করলো, কে?

—কি জানি! নাম টাম বলতে পারছে না।

—কি করে ঢুকলো?

—চাকর বাকররা বুঝতে পারেনি।

—নাম বলছে না?

—বলার ক্ষমতা নেই। অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

—আমাদের বাড়িতে এলো কেন?

—দেখে তো চোর ডাকাত মনে হলো না। অল্প বয়েস, সবে দাড়ি গোঁপ উঠেছে।

—পুলিস ওকে খুঁজছে?

—তা জানি না। ছেলেটার হাতে রক্ত লেগে ছিল।

শ্রীলেখা মুখ দিয়ে একটা ভয়ের শব্দ করলো। প্রভাসকুমার হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন, পুলিস এলে আমি বলবো, আমার কোনোই দোষ নেই! একজন কেউ যদি আমার বৈঠকখানায় এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, আমি কি তাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসতে বলবো? কেউ তা পারে?

—এখনো সে আমাদের বাড়িতেই আছে?

—নড়বার ক্ষমতা নেই, যাবে কি করে! পৃথিবীর কেউ কি আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না?

এর পর বেশ কিছুক্ষণ স্বামী স্ত্রী জানলার পাল্লার আড়াল থেকে তাকিয়ে রইলো বাইরে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে পুলিসের গাড়ি আনাগোনা করলো রাস্তা দিয়ে।

শ্রীলেখা এক সময় বললো, তোমার পিসেমশাইকে খবর পাঠাবে নাকি?

প্রভাসকুমার বললেন, পুলিস আসুক আগে!

পুলিস শেষ পর্যন্ত এলো না বাড়ির মধ্যে। ধীর গতিতে গাড়িগুলো কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে এক সময় চলে গেল। পুলিসের মতলব ঠিক বোঝা গেল না।

বিছানায় ফিরে এসে স্বামী-স্ত্রী কিছুক্ষণ উদ্বিগ্নভাবে আলোচনা করলো। তার পর এক সময় প্রভাসকুমার শ্রীলেখাকে শক্ত ভাবে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লেন। নিজের স্বপ্নের জগতের বাইরে প্রভাসকুমার বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারেন না।

শ্রীলেখা জেগে রইলো আরও অনেকক্ষণ। তার বুকের মধ্যে মেল ট্রেনের মতন আওয়াজ হচ্ছে। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। সে কিছু ভাবতেও সাহস পাচ্ছে না। এক এক সময় হয় এ-রকম, সমস্ত অনুভূতি ভোঁতা হয়ে যায়। কে এসেছে তাদের বাড়িতে? নিজের মনে মনেও নাম উচ্চারণ করতে পারছে না শ্রীলেখা, যদি সে না হয়? এ কি সম্ভব? শ্রীলেখা কি এখন আনন্দ করবে, না কাঁদবে?

একবার শ্রীলেখা ঘুমন্ত স্বামীর বাহুপাশ ছাড়িয়ে মশারির বাইরে বেরিয়ে এলো বাথরুমে যাবার জন্য। দরজা খোলার পর তার গা ছমছম করতে লাগলো। সারা বাড়ি অন্ধকার। কেউ আর জেগে নেই। নীচের তলায় একজন অজ্ঞাত আগন্তুক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। শ্রীলেখা কি একবার নীচে গিয়ে দেখে আসবে?

এক পা দু' পা এগিয়েও শ্রীলেখা থমকে গেল। তার ভয় করছে। জীবনে সে কখনো এত ভয় পায়নি। যদি সে না হয়? যদি কোনো চোর ডাকাত বা গুণ্ডা—। না, শ্রীলেখার অত সাহস নেই। সে এই অন্ধকারে একা একা নীচে নেমে যেতে পারবে না।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীলেখা জেগে উঠলো। তক্ষুনি তার মনে পড়ে গেল সব কিছু। দিনের প্রথম আলোয় তার আর কোনো সন্দেহই নেই। সে তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কে শুয়ে আছে নীচের ঘরে। তরতর করে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। অন্য কারুকে না ডেকেই সে বসবার ঘরের দরজা খুললো।

সূর্য তখনও সোফায় দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে। চেহারা অনেক বদলে গেছে তার। মুখে সরু দাড়ির রেখা, মাথার চুলে কতকাল চিরুনি পড়েনি—রোগা হয়ে গেছে অনেক, তবু তাকে চিনতে শ্রীলেখার একমুহূর্ত দেরি হলো না। সে হাঁটু মুড়ে

বসে পড়লো সূর্যর সামনে। এক মিনিট চুপ করে থেকে শুধু দেখলো। সূর্যর উঁচু হয়ে ওঠা কণ্ঠার হাড়ে আঙুল বোলালো একবার। তারপর ওকে না জাগিয়ে শ্রীলেখা দ্রুত পায়ে আবার উঠে গেল ওপরে।

স্বামীর গায়ে ঠেলা দিয়ে বললো, এই শুনছো! শুনছো!

প্রভাসকুমার চোখ মেলে বললেন, কি?

—কাল রাত্তিরে যে এসেছে—

—কে এসেছে?

—কাল রাত্তিরে! সেই যে তুমি—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি হয়েছে? পালিয়েছে?

—না। আছে। ও আমার দাদা।

—কি? তোমার আবার দাদা কোথা থেকে এলো?

—আমার পিসতুতো দাদা। সূর্যদা। তুমি ওকে দেখো নি। আমরা আগে যে পিসেমশাইয়ের বাড়িতে থাকতাম—

প্রভাসকুমার উঠে বসে চোখ কচলে বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমার কোন্ পিসেমশাই? বড়বাবু? তাঁর ছেলে?

—হ্যাঁ, আমার বিয়ের আগেই—

—সেই যে সেই রোমাণ্টিক ক্যারেকটার? যে প্রায়ই বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়? সে কি বোমা বানাবার দলে ভিড়েছে নাকি?

শ্রীলেখা একটু ইতস্তত করে বললো, জানি না!

প্রভাসকুমার হেসে বললেন, তোমার দাদা, তার মানে আমার শালা হলো—বড় কুটুম! তা একটু খবর টবর দিয়ে আসবে তো, কাল রাত্তিরে খাতির যত্ন করতে পারিনি।

শ্রীলেখা ব্যাকুলভাবে বললো, ওকে তুমি তাড়িয়ে দিও না। ও এমনিতে খুব ভালো।

প্রভাসকুমার স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে বললেন, কাল রাত্তিরে যখন জানতাম না ওকে তোমার দাদা বলে, তখনও তো তাড়িয়ে দিইনি। মানুষের জীবনের দাম আছে আমার কাছে।

শ্রীলেখা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে গেল। চোখে জল এসে গেল তার। টলটলে চোখ দুটো সে চেপে ধরলো স্বামীর গায়ে।

প্রভাসকুমার বিছানা থেকে নেমে বললেন, ওর তো গায়ে খুব জ্বর দেখেছিলাম। দানুকাকাকে খবর পাঠাতে হবে।

—ও কি বাইরের ঘরে থাকবে?

—পাগল নাকি? ওখান থেকে সরাতে হবে। ছোটকাকার ঘরে রাখবে? ছোটকাকার তো আসতে অনেক দেরী আছে। তা ছাড়া পুলিস টুলিস যদি আসে—

প্রভাসকুমারের তদারকিতে তিনজন লোক মিলে সূর্যকে ধরাধরি করে নিয়ে এলো তিনতলার একটি ঘরে। সূর্য চোখ মেলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো শুধু। তার কিছুই করার ক্ষমতা নেই। কথাও বলছে না।

বিছানায় শুইয়ে দেবার পর সূর্য আবার পাশ ফিরে ঘুমোতে চাইলো। প্রভাসকুমার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি কষ্ট হচ্ছে খুব? কোথাও লেগেছে?

সূর্য উত্তর দিলো না, আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

একটু বাদে আর একবার জেগে ঘরখানার চারপাশে দেখে নিল, দেখে নিল দরজা

ও জানলার অবস্থান। উঠে বসতে গিয়েও পারলো না। সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো আবার।

একটু বাদেই শ্রীলেখা এক গামলা গরম জল এনে বসলো সূর্যর বিছানার পাশে। সেই জলে তোয়ালে ভিজিয়ে মুছে দিতে লাগলো সূর্যর শরীর থেকে রক্তের দাগ এবং ধুলো কাদা। সেই আরামদায়ক উষ্ণ স্পর্শে সূর্য আবার চোখ খুললো। সামনেই শ্রীলেখার মুখখানা দেখে দু-এক পলক শুধু স্থির হয়ে রইলো সে। তারপরই মুখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে।

শ্রীলেখা ডাকলো, এই সূর্যদা!

সূর্য উত্তর দিল না।

শ্রীলেখা আবার বললো, এই সূর্যদা, তোমার কি হয়েছে?

সূর্য তখনও চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। লাল রঙের একটা ঝাপসা পর্দা —এখন মাকড়সার জালের মতন সূক্ষ্ম হলেও চোখের সামনে দুলছে। শ্রীলেখার ডাক অবশ্য স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছে। এই বোধও তার ফিরে এসেছে যে, সে শুয়ে আছে নরম বিছানায়, এটা শ্রীলেখার শ্বশুর বাড়ি—এর নাম নিরাপদ আশ্রয়।

শ্রীলেখা তার মুখখানা সূর্যর মুখের কাছে এনে বললো, তোমার খিদে পায়নি? কিছু খাবে? কি খেতে ইচ্ছে করছে?

হঠাৎ সূর্যর মনে পড়লো, যোগানন্দ বলেছিল, তোর বোনের বাড়িতে গিয়ে পেট ভরে খাবো।

কতক্ষণ আগে? ঠিক যেন দু-এক মিনিট আগেই যোগানন্দ বলেছে এই কথা। খেতে খুব ভালোবাসতো মানুষটা।

সূর্য আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। রীতিমতন শব্দ করে কান্না, কান্নার ঝোঁকে তার সমস্ত শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

শ্রীলেখা প্রথম কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সূর্যকে যে সে কখনো কাঁদতে দেখেনি—তাই-ই নয়, সূর্যর যে-চরিত্র সে দেখেছে—তাতে এরকম কান্নার কথা কল্পনাই করা যায় না। একজন তেজী রুক্ষ পুরুষ অসহায়ের মতন কাঁদছে। যেন সে তার সারা জীবনের জমানো কান্না একসঙ্গে কেঁদে নিচ্ছে।

শ্রীলেখা জোর করে সূর্যর মুখখানা নিজের দিকে ফিরিয়ে এনে বললো, কি হয়েছে? কি হয়েছে কি, আমাকে বলো তো!

শ্রীলেখার নিজের চোখেও জল এসে গেছে। এত কান্না দেখলে কি কেউ স্থির থাকতে পারে। সূর্য নিজেকে সামলাতে পারছে না। কান্না থামাতে গেলে হেঁচকি উঠে যাচ্ছে তার।

শ্রীলেখা ভিজে তোয়ালে দিয়ে তার চোখ মুছে দিতে লাগলো। খানিকটা বাদে সূর্য সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে গেল। চোখ বুজে রইলো চিৎ হয়ে। শ্রীলেখা তখনও প্রশ্ন করছে, কি হয়েছে, আমাকে বলবে না?

সূর্য চোখ না খুলেই বললো, আমি কেন এখানে এলাম? আমার আসা উচিত নয়।

—কেন?

—আমার আসা উচিত হয়নি।

—তুমি আমার দিকে তাকাবে না?

—আমি এখানে এসে ভুল করেছি।

—আমি জানতাম তুমি আসবেই।

—না, আমারই মরে যাওয়ার কথা ছিল। আমি কেন মরলাম না!

—তুমি কিছুতেই মরতে পারো না। তুমি টের পাওনি, আমি সব সময় মনে মনে তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম। তুমি যেখানেই থাকো, আমি তোমার সঙ্গে আছি। তোমার সঙ্গে আবার দেখা না হলে আমি সমস্ত পৃথিবীর ওপর একটা নিদারুণ অভিমান নিয়ে চলে যেতাম।

—শ্রীলেখা আমি কারুর যোগ্য নই।

—তুমি আর কথা বলো না এখন। তোমার গায়ে খুব জ্বর। ডাক্তারকে খবর পাঠানো হয়েছে।

—এসব কিছুই পাওয়ার অধিকার আমার নেই।

—সূর্যদা, লক্ষ্মীটি, একটু চুপ করে শুয়ে থাকো।

গরম জলে ভেজানো তোয়ালে দিয়ে শ্রীলেখা নিঃশব্দে সূর্যর শরীর পরিষ্কার করে দিতে লাগলো। সূর্য আর কোনো বাধা দিল না। সূর্যর গায়ের জামাটা তুলতেই শ্রীলেখা দেখতে পেল তার কোমরে গোঁজা রিভলবার। ঝট্ করে সেটা সে খুলে নিল। এক সময় এটা তার কাছেই রাখা ছিল। এখন থেকে আবার তার কাছেই থাকবে। আর কোনোদিন ফেরত দেবে না।

॥ ৪৪ ॥

প্রভাসকুমারদের পরিবারটি খঙ্গপুরে বেশ প্রতিপত্তিশালী। ও'রা এখানকার পুরোনো বাসিন্দা, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে রয়েছে বড় ডাক্তার, উকিল, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং পুলিসের একজন বড় কর্তা। সুতরাং সূর্যকে নিয়ে খুব বেগ পেতে হলো না। এ অঞ্চলের সমস্ত বাড়ি তল্লাশী করার সময় পুলিস দু'বার এসেছে এ বাড়িতে, কিন্তু সারা বাড়ি সার্চ করে নি, বাইরে থেকে কথাবার্তা বলে চলে গেছে। প্রভাসকুমারের এক কাকা খুব গোপনে এসে সূর্যর চিকিৎসা করে যাচ্ছেন।

সূর্য একেবারে বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে। তার ছ' ফিট এক ইঞ্চি দেহটা এখন একেবারে অস্থিসর্বস্ব। কোটরে বসা চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে। তার জ্বর কমে গেছে, বুকের ব্যথাও অনেক কম, তবু মাঝে মাঝে হে'চকি ওঠার মতন হয়, তখন মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে। ভেতরের কলকব্জার যে কি গন্ডগোল হয়েছে, তা পরীক্ষা করার জন্য তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার ছিল, কিন্তু সে প্রশ্নই আপাতত ওঠে না। নিছক অদম্য জীবনীশক্তির জোরেই সূর্য আস্তে আস্তে সেরে উঠছে।

যতক্ষণ জেগে থাকে, তখনও সূর্য প্রায় কথা বলতেই চায় না। শ্রীলেখার সঙ্গেও একটা দুটোর বেশী কথা বলে না। হয় চোখ বুজে শুয়ে থাকে, অথবা বই পড়ে। শ্রীলেখা তাকে কিছু বই দিয়েছিল—প্রভাসকুমারের ঘরে বইয়ের অভাব নেই—সূর্য তার কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বই পড়তে চাইলো। সূর্যর শিয়রের কাছে স্তূপ করা বই।

বাংলা বই সূর্য আগে বিশেষ কিছু পড়ে নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষা বুঝতে তার প্রথম প্রথম অসুবিধে হয়। তবু ধৈর্য ধরে প্রত্যেকটি পাতা দু'বার তিনবার করে পড়ে। গল্পগুচ্ছের বেশ কয়েকটি গল্প ও 'পূরবী'র কবিতা পড়ে আনন্দ পেল সে। কিন্তু তার রবীন্দ্রচর্চা বেশীদূর এগোলো না। প্রভাসকুমার সূর্যর বই পড়ার আগ্রহ

দেখে নিজে থেকেই তাকে অন্যান্য কয়েকটি বইয়ের সঙ্গে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসখানি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে বইখানা পড়তে পড়তে সূর্য অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করলো এবং ছুঁড়ে ফেলে দিল খাটের নীচে। সে আর এই লেখকের কোনো বই পড়তে চায় না।

প্রভাসকুমার প্রথম থেকেই সূর্য সম্পর্কে খুব কৌতুহলী হয়ে উঠেছিলেন। মানব চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটন ব্যাপারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ আছে। এই ছেলেটি তাঁর চোখে রহস্যময়। এত অল্প বয়েসী অথচ এরকম গম্ভীর ও চাপা স্বভাবের ছেলে তিনি কখনো দেখেন নি। এর মুখ দেখলেই বোঝা যায়, এর মনের মধ্যে সব সময় নানা রকম চিন্তার প্রবাহ চলেছে, অথচ সেইসব চিন্তার কথা পৃথিবীর আর কোনো দ্বিতীয় প্রাণীকে জানাতে সে আগ্রহী নয়। মানুষ এমন একাকীত্ব নিয়ে বেঁচে থাকে কি করে? নিজের জন্য ওর কখন কি দরকার সে কথা কক্ষনো জানায় না, কক্ষনো ব্যথার কথা বা অসুখের কথা বলে না, খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে কোনো বাছবিচার বা লোভ নেই। এত কম বয়েসে এই সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ও শিখলো কবে? অথচ মুখখানি কচি ছেলেমানুষীতে ভরা। নিজের চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত বলেই হয়তো প্রভাসকুমার এই ছেলেটিকে খুব পছন্দ করে ফেললেন।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সূর্যর বিছানা থেকে অল্প দূরে চেয়ার নিয়ে বসে প্রভাসকুমার জিজ্ঞেস করলেন, আজ কেমন আছো, বড়কুটুম?

সূর্য মুখ ফিরিয়ে বললো, ভালো।

—তোমার চোখ দুটো কদিন ধরে বড্ড লালচে ছিল, আজ অনেক স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

সূর্য হাতের তালু দিয়ে চোখ কচলালো।

প্রভাসকুমার আবার বললেন, কাল রাত্তিরে খুব বৃষ্টি হয়েছিল, টের পেয়েছিলে?

—হুঁ।

—আজ আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। তুমি কি উঠে বালিশে হেলান দিয়ে বসবে? তুলে দেবো?

—না, ঠিক আছে।

—উঠে বসো না—বাইরেটা দেখতে পাবে। ভালো লাগবে।

প্রভাসকুমারের সাহায্য না নিয়ে সূর্য নিজেই একটু উঁচু হয়ে উঠে বসলো। প্রভাসকুমার জানলাগুলো খুলে দিলেন। জানলার কাছে দাঁড়িয়েই বললেন, শহরের অবস্থা এখন অনেক শান্ত। দোকান পাট সব খুলেছে। আচ্ছা, সেদিন যে এখানে একটি ছেলে খুন হয়েছিল, সে কি তোমার চেনা?

সূর্য সংক্ষিপ্তভাবে বললো, আমরা এক সঙ্গে ছিলাম।

—আঃ, ছি ছি ছি, এই রকমভাবে কেউ প্রাণ দেয়? পুলিসের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েছিলে?

—না, আমরা দুজনে সাধারণভাবেই হেঁটে আসছিলাম। হঠাৎ একটা ভুল হয়ে গেল।

—তা হলে তুমিও সেদিন মরে যেতে পারতে?

—হয়তো।

—একটু হলেই মরে যেতে পারতাম, অথচ মরলাম না—এই ফিলিংটা কি রকম?

—আমার শরীর সুস্থ থাকলে সেটা ভালো করে বুঝতে পারতাম।

—আমি মৃত্যু নিয়ে কবিতা লিখেছি—কিন্তু কখনো মৃত্যুকে খুব কাছাকাছি

দেখিনি—কখনো বড় রকমের অসুখও হয়নি আমার। রবীন্দ্রনাথও যে লিখেছেন, ‘মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান’—সেটা কি নিজের মৃত্যুবোধ নিয়ে, না অন্য কারুর মৃত্যু দেখে? নিজে কি তখন মৃত্যুর সামনা সামনি গিয়েছিলেন? অবশ্য, অনুভূতির জগতে মৃত্যুর একটা উপস্থিতি সব সময়েই টের পাওয়া যায়। মানুষ বাঁচতে ভালো-বাসে বলেই মৃত্যুর কথা এত বেশী ভাবে! তাই না?

সূর্য চুপ করে রইলো।

প্রভাসকুমার চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন। তারপর আন্তরিকভাবে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, সূর্যবাবু, আমাকে একটা কথার উত্তর দিতে পারো? মানুষের প্রাণ তার নিজের কাছে সবচেয়ে প্রিয়, তবু কেন অনেক মানুষ প্রাণ তুচ্ছ করে কোনো কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে?

প্রভাসকুমার সূর্যর চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন, তাকে উত্তর দিতেই হবে। সূর্য আস্তে আস্তে বললো, আমি তো সব মানুষের কথা জানি না। আমি শুধু নিজের কথা জানি।

—তোমার নিজের কথাই বলো তো। যে-কোনো সময়েই মরে যেতে পারতে? তা-জেনেও...তুমি কি মরতে চাও?

—না।

—তাহলে?

—আমার একটা বিশ্বাস ছিল যে আমি শেষ পর্যন্ত মরবো না।

—এরকম বিশ্বাস থাকার কোনো মানে হয়? এটা তো গোঁয়ার্তুমি!

—আমি মরে গেলেও কোনো ক্ষতি ছিল না।

—অন্য কারুর কোনো ক্ষতি না থাক্, তোমার তো ছিল। জীবনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি—

—আমি তা ভাবিনি।

—আচ্ছা, আর একটা কথা। এটারও আমি কোনো উত্তর খুঁজে পাই না। আমাদের দেশে প্রায় আটত্রিশ কোটি মানুষ। এদের মধ্যে মাত্র কয়েকশো জন তোমাদের মতন এরকম প্রাণ তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আটত্রিশ কোটির মধ্যে শুধু এই কয়েক শো জনের মধ্যেই এরকম প্রেরণা জাগলো কি করে? কে এদের মাথার দিব্যি দিয়েছে?’ এটা একটা বড় প্রশ্ন নয়?

—কারুকে না কারুকে তো এগিয়ে আসতেই হবে।

—সেটা না হয় মানলাম। কিন্তু আটত্রিশ কোটির মধ্যে তোমাদের মতন শুধু ক'জনের মধ্যেই এই চিন্তাটা জাগলো কি করে? এর ব্যাক গ্রাউন্ড কি? তোমার বয়েসী তো আরও কত ছেলে আছে, খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে! লক্ষ লক্ষ লোক যে-সম্পর্কে কিছু ভাবে না—হঠাৎ এক একজন আলাদা হয়ে যায়। এর ব্যাখা কি?

—আমি জানি না।

—তুমিও এদের মধ্যে একজন। তুমি এটা ভেবে দেখো নি।

—এ দেশের আটত্রিশ কোটি লোকই তো আর কবিতা লেখে না। শুধু আপনার মতন কয়েকশো-জন লোকই লেখে। এর ব্যাখ্যা কি?

প্রভাসকুমার চমকে উঠলেন। চিন্তিতভাবে বললেন, ঠিক, এরকমভাবে তো ভেবে দেখি নি। কবিতা লেখার মতন এটাও একটা ইনসপিরেশান বলতে চাও? এটা একটা মুট পয়েন্ট, আমি স্বীকার করতে বাধ্য। হুঁ, ইনসপিরেশান! ইনসপিরেশান ছাড়া

কোনো বড় কাজ হয় না। তবে কবিতা লেখার চেয়েও প্রাণ দেওয়া অনেক শক্ত—সুতরাং তোমাদের ইনসপিরেশান নিশ্চয়ই খুব তীব্র।

—আমি ইনসপিরেশান মানি না।

বিস্মিত হয়ে প্রভাসকুমার বললেন, মানো না! তুমি তো নিজেই বললে, যে চোজেন ফিউ এসব কাজে—

—আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম ছিল। আমি হঠাৎ এমন কয়েকজন লোকের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিলাম, যাঁরা এই ধরনের কাজে জড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের দেখে আমার ভালো লেগেছিল, আমি তাঁদের শ্রদ্ধা করতাম। সুতরাং তাঁদের দলে মিশে কাজ করতে আমার ভালো লাগতো। আমার কাছে এটা ভালো লাগা না-লাগার প্রশ্ন।

—তোমার সঙ্গে হঠাৎ ওদের যোগাযোগ হয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—হঠাৎ হঠাৎ অনেকের সঙ্গেই অনেকের দেখা হয়, সবাইকে তো আর ভালো লাগে না! তোমার মধ্যে এর বীজ আগে থেকে ছিলই।

—হতে পারে?

—ডু ইউ রিগ্রেট নাউ?

—নেভার!

—এই ভালো লাগা না-লাগার ব্যাপারটাই সবচেয়ে বড়। অনেক মানুষ, অধিকাংশ মানুষই, যা ভালো লাগে, তার জন্য অন্য সব কিছু ছাড়তে পারে না। যত সব মানুষ সমাজ সংসার সব মেনে ঘর গেরস্থালি করছে—তাদের সবারই কি এটা ভালো লাগে? তাদের অন্য কিছু করার সাহস নেই। তোমার বা আমার মত লোক—আমরা অন্য সব কিছু ছাড়তে পেরেছি। তুমি লড়াই করতে গেছ, আমি আর কিছু না করে কবিতা লিখছি। অন্যেরা এটা ভালো চোখে দেখে না—আসলে তারা ভয় পায় কিংবা হিংসে করে।

—আমি কবিতা বুঝতে পারি না।

—আমি বোমা-পিস্তলের লড়াই বুঝতে পারি না। কিন্তু তুমি যে আমার বাড়িতে এসেছো, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারছি—এটা আমার সৌভাগ্য। আমার বিয়ের সময় তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি—

লেবুর রস ও নুন মেশানো বার্লির বাটি হাতে নিয়ে শ্রীলেখা দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সূর্যকে এত কথা বলতে দেখে সে একটু অবাক হয়েছিল, কারণ সে নিজে এ কদিনে অনেক চেষ্টা করেও সূর্যর মুখ থেকে কোনো কথা বার করতে পারে নি। কিন্তু সে এখন এগিয়ে এসে স্বামীকে মৃদু ধমক দিয়ে বললো, তুমি ওকে দিয়ে কথা বলাচ্ছো কেন? ডাক্তারকাকা বারণ করেছেন না?

প্রভাসকুমার থতমত খেয়ে বললেন, আহা, দিনের পর দিন কথা না বলে কি মানুষ থাকতে পারে?

—থাক্, যথেষ্ট হয়েছে। এটা খেয়ে নিয়ে এখন ঘুমোক।

শ্রীলেখা সূর্যর মুখের সামনে বাটিটা ধরলো। প্রভাসকুমার ব্যস্ত হয়ে বললেন, বুকের কাছে তোয়ালেটা জড়িয়ে দাও। পড়ে যায় যদি।

নিজেই এসে তোয়ালেটা জড়িয়ে দিলেন। স্বামী-স্ত্রী যত্ন করে খাওয়াতে লাগলো ওকে। সূর্য সুবোধ বালকের মত তাড়াতাড়ি এক চুমুকে শেষ করে ফেললো বার্লিটুকু। মুখের স্বাদ বদলাবার জন্য শ্রীলেখা এলাচ এনেছে, তার কয়েকটা দানা মুখে দিয়ে

সূর্য চোখ বুজলো। শ্রীলেখা যত্ন করে চাদর টেনে দিল তার গায়ে। সূর্যর মুখে যাতে রোদ না পড়ে সেই জন্য প্রভাসকুমার ভেজিয়ে দিলেন জানলার একটা পাল্লা। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন।

আস্তে আস্তে সূর্যর শরীরের জোর ফিরে আসছে। সে এখন নিজে নিজেই বিছানা থেকে উঠে ঘরের মধ্যে একটু একটু ঘোরে, জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েও সে তার ভবিষ্যত দেখতে পায় না। চারখানা সাদা দেওয়ালের মধ্যে সে বেশ কয়েকদিন আটকে আছে। সাদা দেয়াল কোনো কথার উত্তর দেয় না। এখন জানলার বাইরে তাকিয়েও সে প্রকৃতি দেখতে চায় না, সে বাইরের জগৎ থেকে কোনো ডাকের জন্য অপেক্ষা করে। সে জানে না, এরপর সে কি করবে। এই ক'মাসে তার ধারণা ছিল, একটা কোথাও পেঁীছোতে হবে। এখন আর তার সামনে কোনো রাস্তা নেই। সূর্য স্থির চোখে রোদে-ঝকমক রেল লাইনের দিকে চেয়ে থাকে।

প্রভাসকুমার বড়বাবুকে টেলিগ্রাম করেছিলেন সূর্যকে না জানিয়ে। কোনো উত্তর আসে নি। শ্রীলেখা কিছুদিন আগে তার মায়ের কাছ থেকে চিঠিতে জেনেছিল যে বড়বাবু কয়েকদিনের জন্য কোথায় যেন বেড়াতে গেছেন।

প্রভাসকুমারের ইচ্ছে, সূর্যকে বিদেশে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হোক। বিদেশে কোথাও দু'চার বছর থাকলে পুলিসের কোপ কমে যাবে—ইতিমধ্যে সূর্য পড়াশুনোও চালাতে পারবে। সন্দেহজনক কার্যকলাপে লিপ্ত লোকদের বেঁচে থাকার এইটাই সহজ রাস্তা। যুদ্ধের জন্য প্যাসেঞ্জার লাইনগুলিই বন্ধ হয়ে গেছে, তবু কোনো রকমে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ভারত মহাসাগর এখনো মোটামুটি নিরুপদ্রব আছে।

সূর্য এই প্রস্তাব শুনে হ্যাঁ কিংবা না কিছুই বলে নি। শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে থেকেছে। সে কোনো কিছুতেই উৎসাহ বোধ করে না। যোগানন্দর মৃত্যু তার বুকের মধ্যে খুব জোর নাড়া দিয়ে গেছে।

সূর্যকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল তিনতলার একটা ঘরে। একদিন দেখা গেল একতলার সিঁড়ির কাছে সে দেয়াল ধরে হাঁপাচ্ছে। তখনও সিঁড়িভাঙার সামর্থ্য তার হয় নি। শ্রীলেখা তাকে দেখতে পেয়ে দারুণ অবাক হয়ে বললো, একি, কোথায় যাচ্ছো?

চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়া ফ্যাকাসে মুখ করে সূর্য বললো, একটু বাগানে বেড়াতে যাচ্ছিলাম।

—বাগানে? এই সন্ধ্যেবেলা?

—বাঃ, আমাকে বলোনি কেন? তুমি একলা একলা এতখানি সিঁড়ি ভেঙে নামলে? চলো, ঘরে চলো, এখন আর তোমাকে বাগানে যেতে হবে না, হিম পড়ছে।

সূর্য আর আপত্তি করলো না, শান্ত ছেলের মতন ফিরে গেল শ্রীলেখার সঙ্গে।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা সূর্য একলা একলা বাগানের গেট পর্যন্ত চলে গিয়েছিল, একজন চাকর দেখতে পেয়ে খবর দিল প্রভাসকুমারকে। প্রভাসকুমার নিজেই দৌড়ে এসে তার হাত চেপে ধরে বললো, একি, কোথায় যাচ্ছো সূর্যবাবু?

সূর্য নিষ্প্রাণ গলায় বললো, কোথাও না।

—একলা একলা এতদূর চলে এসেছো? ডাক্তার তোমাকে ঘর থেকেই বেরুতে বারণ করেছেন।

—এমনিই একটু ঘুরে আসছিলাম।

—এই সময়? তোমার কিছু দরকার টরকার আছে? কিছু কিনে আনতে হবে?

আমাকে বলো নি কেন? শোন, যদি সিগারেট টিগারেট খাও তো—

—না কিছু না।

আরও দু'বার সূর্য এ বাড়ি থেকে কারুকে কিছু না বলে চলে যাবার চেষ্টা করেছিল, দুবারই ধরা পড়ে যায়। শ্রীলেখা পাখির মতন তীক্ষ্ণ চোখে তার ওপর নজর রেখেছে। ধরা পড়ার পর সূর্য আর কোনো উচ্চবাচ্য করে না, নিরীহভাবে ফিরে আসে। তার এই ব্যবহারের কোনো মানে বোঝা যায় না।

বাড়িতে আস্তে আস্তে মানুষজন আসতে শুরু করেছে। আর দিন দশেক বাদেই দুর্গা পূজা। এ বাড়িতে খুব ধুমধাম করে দুর্গা পূজা হয়। শ্রীলেখা তাই একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, সব সময় সূর্যর কাছে আসতে পারে না—কিন্তু সেবা শুশ্রূষার কোনো ত্রুটি নেই।

সেদিন রাত সাড়ে ন'টার সময় সূর্যর ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকলো শ্রীলেখা। সূর্য চোখ বুজে শুয়ে আছে। শ্রীলেখা তার শিয়রের পাশে বসে চুলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বললো, তুমি ঘুমিয়েছো?

সূর্য চোখ না মেলেই বললো, না।

এর মধ্যেই বাড়ির অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছে। শহরও এখন প্রায় অর্ধসুপ্ত। ঝমঝমিয়ে একটা মেল ট্রেন চলে গেল এই মাত্র। ট্রেন যাবার সময় মনে হয় যেন এই বাড়িটা কাঁপে। মনে হয় শুধু, আসলে কাঁপে না।

শ্রীলেখা আবার জিজ্ঞেস করলো, তোমার শরীর আজ কেমন?

—ভালো।

—তোমার কি হয়েছে বলো তো?

—কিছু হয়নি।

—তুমি চলে যেতে চাইছো কেন?

—আমার আর ভালো লাগছে না।

—কেন ভালো লাগছে না? তোমার কিছু অসুবিধে হচ্ছে?

—না, সেসব কিছু নয়।

শ্রীলেখার চুলগুলো খোলা, কালো রঙের শাড়ি পরে আছে। মুখখানা অনেকটা ঝুঁকিয়ে বললো, সূর্যদা, লক্ষ্মীটি, আমার দিকে একবার তাকাও। আমার সঙ্গে একটু কথাও বলবে না? তোমার কি হয়েছে সত্যি করে বলো তো?

সূর্য মুখ তুলে শ্রীলেখার দিকে তাকালো। এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর চিবুক উঁচু করে শূন্যে চোখ মেলে বললো, আমি এরকমভাবে তোর এখানে আসতে চাই নি।

শ্রীলেখা ব্যাকুলভাবে বললো, সূর্যদা, সত্যি করে বলো তো, তোমাকে এ বাড়িতে কেউ কিছু বলেছে?

—না। কে কি বলবে? প্রভাসবাবু খুব ভালো লোক। ওঁকে আমার ভালো লাগে। সেসব কিছু নয়। এই অসুখটা আমাকে বড় কাবু করে ফেলেছিল। এই রকম একা একা শুয়ে থাকা আমার পোষায় না।

সূর্য বিছানায় উঠে বসে বললো, এখন আমি অনায়াসে হাঁটা চলা করতে পারি।

শ্রীলেখা সূর্যর দু'কাঁধ চেপে ধরে বললো, সূর্যদা, তুমি কি আমার ওপর এখনো রেগে আছো?

—না তো!

—তুমি আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে চাও না কেন?

—বাঃ রাগ করবো কেন, রাগের কি আছে?

—এটাও রাগের কথা।

—না রে।

—সত্যি করে বলো, আমার চোখের দিকে চেয়ে বলো।

—সত্যি কথাই বলছি। এক সময় ভীষণ একটা রাগ ছিল, ভেবেছিলাম, তোর সংসারের সব কিছু ভেঙেচুরে দেবো। তোকে কিছুতেই শান্তি দেবো না! কিন্তু অনেক রাস্তা ঘুরে ঘুরে এলাম তো। আসতে আসতে রাগ কমে গেছে। এখন বুঝতে পারি, আমি মিথ্যেই রাগ করেছিলাম। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলে মানুষ অনেক কিছুই শেখে। তখন বোঝা যায়। বেঁচে থাকা কাকে বলে। আমার এখন গায়ে জোর নেই, তাই বুঝতে পারছি, গায়ের জোরে কিছুই সত্যিকারের পাওয়া যায় না।

—তোমার শরীর আবার শিগগিরই ভালো হয়ে যাবে।

—তখন আবার আগের মতন ভুল করবো না।

—আমি কিন্তু জানতাম, তুমি একদিন না একদিন আমার কাছে আসবেই।

—এরকম অসহায় অবস্থায় না আসাই উচিত ছিল।

—তোমাকে কেউ অসহায় মনে করে না। তোমাকে দেখলে সবাই একটু একটু ভয় পায়।

—কাল সারারাত আমার ঘুম আসেনি। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, আমার একটা কিছু করা দরকার।

—কাল আমারও বারবার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল, তুমি জেগে আছো। একবার ভেবেছিলাম তোমার কাছে চলে আসি—

—এলি না কেন?

—অন্য কেউ হলে হয়তো আসতাম। তুমি বলেই আসতে পারলাম না। কয়েকমাস ওর এক মামাতো ভাই এখানে এসে খুব অসুখে পড়েছিল—আমি সারা রাত ধরে তার পাশে থেকেছি। আর তুমি আমার দাদা, তোমার কাছে তো আসতেই পারি। কিন্তু কেন যে আমার ভীষণ লজ্জা হলো।

—আজ এখন কত রাত?

—খুব বেশী রাত হয়নি।

সূর্য নিজের কাঁধ থেকে শ্রীলেখার হাত সরিয়ে দিয়ে আস্তে শুয়ে পড়লো আবার। মুখ ফিরিয়ে বললো, আমার ঘুম পাচ্ছে, তুই এখন যা।

শ্রীলেখা গেল না। একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। তারপর সূর্যর গালে আঙুল ছুঁইয়ে খুব নরম, প্রায় অশ্রুত গলায় বললো, সূর্যদা, তুমি আর আমাকে একটুও ভালোবাসো না, না?

—কি জানি!

—আমি জানি, তুমি আমাকে আর ভালোবাসো না। আমারই দোষ।

—কেন?

—আমার বিয়ের পর প্রথম প্রথম আমার খুব কষ্ট হতো। সেই সঙ্গে ভয়ও ছিল। আমি ভয় পেতাম, কোন্‌দিন তুমি এখানে এসে হাজির হবে, চ্যাঁচামেচি করবে, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে। সে রকম একটা কিছু হলে আমি কোথায় যেতাম, কি যে করতাম—কিছুই ভেবে পাইনি। কিন্তু তুমি এলে না। এক সপ্তাহ, দু' সপ্তাহ, এক

মাস, দু'মাস—তুমি এলে না, এলে না। তখন আমার কী হলো জানো, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম, ভীষণভাবে প্রতীক্ষা—সব সময় যেন তোমাকে দেখতে পেতাম। আমি জানতাম তুমি আসবেই, আমার প্রতীক্ষাই তোমাকে টেনে আনবে। একদিন আমাদের বাগানের আতা গাছে একটা পাখি বসে ইস্টকুটুম, ইস্টকুটুম বলে ডাকতে লাগলো। ঐ পাখি ডাকলে নাকি বাড়িতে অতিথি আসে। সেদিন আমি সারাদিন আর অনেক রাত পর্যন্ত গেটের দিকে চেয়ে বসেছিলাম।

শ্রীলেখা সূর্যর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। দু'জনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর শ্রীলেখা জিজ্ঞেস করলো, তোমার বুকে আজ একবারও ব্যথা হয়েছিল?

সূর্য বললো, না। এখন খুব ভালো লাগছে।

—সত্যি ভালো লাগছে?

—ভীষণ, ভীষণ ভালো লাগছে। তোকে বোঝাতে পারবো না।

একথা বলা সত্ত্বেও সূর্য শ্রীলেখার হাত সরিয়ে দিল। নেমে পড়লো বিছানা থেকে। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে তাকালো বাইরের পৃথিবীর দিকে। ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। দূরের গাছগুলোকে ধূসর বর্ণ দেখায়, মনে হয় অন্য কোনো গ্রহ।

সূর্য সেই দিকেই মুখ ফিরিয়ে বললো, আমি অনেক কিছু জানি না, অনেক কিছুই শিখিনি। আগে জানতাম না, পৃথিবীতে কত রকম ভালো লাগা আছে। কিন্তু আমি কি এসব পাবার যোগ্য?

শ্রীলেখা বললো, তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা লাগিও না।

—তুই, এবার শুতে যা।

—যাচ্ছি, তুমি আগে শুয়ে পড়ো। আমি তোমার বুকে হাত বুলিয়ে দি—

সূর্য জানলার কাছ থেকে সরে গেল। অন্ধকারে তার মুখ এখন আর দেখা যায় না। অদৃশ্য মানুষের মতন সে ধমকের সুরে বললো, তোকে চলে যেতে বলছি না! আমার কি মাথার ঠিক আছে? এত সুখ কি আমার সহ্য হয়? আমি আর কিছু ভাঙতে চাই না। আমাকে এখান থেকে চলে যেতেই হবে।

॥ ৪৫ ॥

সেবারের দুর্গা পুজোর কয়েকটি দিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তা ছাড়া, সেবারে আমাদের মামাবাড়ির পুজোর বর্ণনা আমি বিষ্ণুকে চিঠিতে লিখে পাঠিয়েছিলাম, বেশ কয়েক বছর পর সেই চিঠি ঘুরে ফিরে আবার আমার হাতে চলে এসেছিল।

পুজোর প্রায় এক মাস আগে থেকেই বেশ একটা পুজো পুজো ভাব। আকাশের মেঘ হাল্কা-হাল্কা সাদা রঙের হয়ে গেছে, শিউলি গাছে এসেছে অজস্র ফুল। আমাদের ঠাকুর দালানে এর মধ্যেই মূর্তি গড়া শুরু হয়ে গেছে। দুর্গা ঠাকুর যে বাইরে থেকে কিনে আনা যায়—একথা গ্রামের লোক জানেই না। বাড়িতে মূর্তি তৈরী করারই রেওয়াজ ছিল পূর্ববঙ্গে।

আমাদের মামাবাড়ির মূর্তি বানাতো জলধর। হঠাৎ একদিন তার নৌকো এসে ভিড়তো পুকুর ঘাটে। বড় রহস্যময় ছিল তার নৌকোটি। ভেতরে কতরকম তুলি আর রঙের পাত্র আর মুখের ছাঁচ। রুপোলি জরির কল্কা আর রেশমী কাপড়ও থাকতো

প্রচুর। মাঝখানে একটা পর্দা ফেলা—সে পর্দার ওপাশে কি থাকতো কে জানে।

জলধর লোকটি বেশ বেঁটেখাটো এবং গম্ভীর। তাকে আমরা কথা বলতে শুনেছি খুব কম। সে যে একজন শিল্পী ছিল, তার গাম্ভীর্যই তার প্রমাণ। তার মতন অবস্থার একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে আমার মামাবাড়ির অহংকারী ধনীদের সঙ্গে হাত কচলে তোষামোদের সুরে কথা বলাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু জলধর সেসবের ধার ধারতো না, অনেকের কথার সে উত্তরই দিত না—একমাত্র আমার দাদামশাইয়ের সঙ্গেই তাকে দু' চারটে কথা বলতে শুনেছি। তা ছাড়া, কোনো একটা জিনিসের দিকে তার অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকার ক্ষমতা দেখেও তাকে আমার অসাধারণ মনে হয়েছিল।

কিন্তু শিল্পী হলেও জলধর ছিল নীচু জাত। তাকে সেইজন্য বাড়ির সকলেই তুমি তুমি বলে কথা বলতো।

পুজোর এক মাস আগেই প্রতিমার খড়ের কাঠামো তৈরী হয়ে যেত। সে কাজে জলধর নিজে আসতো না, পাঠাতো তার দু'জন সহকারীকে। কিছুদিন পর সেই দু'জন সহকারীই আবার এসে মাটি লাগিয়ে যেত খড়ের কাঠামোতে। এই ভাবে প্রতিমা এক মেটে, দু' মেটে হবে। সব মূর্তিই মুন্ডহীন এবং ন্যাংটো। দু' দিনেই সেই মাটি শুকিয়ে ফেটে ফেটে কিরকম অদ্ভুত চেহারা হয়—সেদিকে তাকাতে আমাদের একটু লজ্জা লজ্জা করে। এর পর সেই মূর্তিগুলোতে আবার মাটি লেপে তারপর লাগানো হলো সাদা খড়ি রং। তখন সবাই সাদা, দুর্গা, সিংহ, কার্তিক-গণেশ এমনকি ময়ূরটা পর্যন্ত। এরপর জলধর নিজে আসবে আসল প্রতিমা গড়তে।

বাড়ির পেছন দিকের পুকুর পাড়ে আমরা ছোটরা খেলা করছিলাম, এমন সময় পুকুরের উত্তর দিকের জান দিয়ে সেই নৌকোটা ঢুকলো। আমার খেলার সাথী অনেকেরই জন্ম থেকে সেই নৌকোটা চেনা। তারা চেঁচিয়ে উঠলো, জলধরকাকা এসেছে, জলধরকাকা এসেছে।

নৌকো ঘাটে এসে ভিড়তেই আমরা সবাই জলধরকাকাকে ঘিরে ধরলাম। কেউ একটা ময়ূরের পালক চায়, কেউ জরির টিপ চায়। জলধর কারুকেই নিরাশ করে না।

জলধর বার-বাড়ির রোয়াকে এসে মাটিতে শুয়ে পড়ে দাদামশাইকে প্রণাম করলো। দাদামশাই বললেন, কি জলধর, এবার এত দেরী করলে যে? কালই না চতুর্থী?

জলধর জানালো যে সে সারারাত জেগে কাজ করবে।

দাদামশাই জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ির সব খবর ভালো?

জলধর সংক্ষিপ্তভাবে জানালো তার বড় ছেলেটার খুব অসুখ। ম্যালেরিয়া।

দাদামশাই বললেন, যাবার সময় আমার কাছ থেকে কয়েকটা কুইনিন নিয়ে যেও। মনে করে চেয়ে নিও।

কুইনিনের এক একটা ট্যাবলেট তখন সোনার টুকরোর সমান। কালোবাজারে বিশেষ প্রতিপত্তি না থাকলে ও ওষুধ জোগাড় করাও যায় না। দাদামশাই যে সেই দুর্লভ জিনিস দিয়ে দিতে চাইলেন, তার মানে জলধরের প্রতি তাঁর সত্যিকারের দুর্বলতা ছিল।

জলধরের মূর্তি তৈরীর কাজ দেখবার মতন। সে সাধারণ একজন গ্রাম্য কুমোর —এবং জলে বিসর্জন দেবার জন্যই সে মূর্তি বানায়। তবু তার নিষ্ঠা অদ্ভুত। সে চব্বিশ ঘন্টা টানা কাজ করে, খায় না, ঘুমোয় না, কারুর সঙ্গে কথা বলে না। প্রতিমার গায়ের রং পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার সজ্জা—সবই নিখুঁত। লক্ষ্মী সরস্বতী আর

কার্তিকের মুখ সে ছাঁচে ঢেলে বানায়। গণেশের মুণ্ড তো হাতে বানাতে হবেই। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে দুর্গার মুখ—তার জন্য সে কোনোদিন ছাঁচ ব্যবহার করেনি। একতাল মাটি সে অনেকক্ষণ হাতে নিয়ে ছানাছানি করে, এদিক ওদিক ঘোরে, নানা কথা ভাবে। তারপর হঠাৎ এক সময় বিদ্যুৎ বেগে সে মুখখানি বানিয়ে ফেলে। দেড় মিনিট—দু' মিনিটের বেশী লাগে না। তখন সেই মুখটা প্রতিমার ওপর বসিয়ে সে অনেক দূরে চলে যায়, চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। এক একবার ছুটে এসে নাকের পাশটা একটু টিপে দিয়ে যায়, চোখটা একটু বড় করে। পরদিন সে রং তুলি নিয়ে বসে।

আমরা স্নান খাওয়া ফেলে হাঁ করে সেই মূর্তি তৈরী করা দেখি। সিংহটা কখন তৈরী হবে, তার জন্য আমি ছটফট করছি। সিংহ আর অসুরের সম্পর্কে যেন ওদের কোনো গরজই নেই।

দুর্গা পুজোর এক মাস আগে থেকেই বাড়ির কর্তা থেকে ছোট ছেলেটি পর্যন্ত সবাই কোনো না কোনো কাজে জড়িয়ে পড়ে। আমার ওপরেও একটা কাজের ভার পড়েছিল। গোপালগঞ্জের হাট থেকে চারটি কালো রঙের পাঁঠা কিনে আনা হয়েছে কয়েকদিন আগে। চারটে পাঁঠাই ঠিক এক রকম দেখতে। বাড়ির চারজন বাচ্চার ওপর ভার পড়েছিল সেই পাঁঠাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করার। অন্য লোক যে ছিল না তা নয়, তবু বাচ্চাদের ব্যস্ত রাখার এই একটা কৌশল। আমাদের অবশ্য উৎসাহের অন্ত ছিল না।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই আমরা কয়েকজন পাঁঠাগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম। টাটকা শিশিরভেজা ঘাস খাওয়ালে ওদের স্বাস্থ্য ভালো হবে। এক মাসের মধ্যে বেশ নাদুস নুদুস করে তুলতে হবে ওদের। ওরা ফুলগাছ খেয়ে ফেললে বকিনি। কখনো খেতে না চাইলে কত আদর করেছি। ওদের জন্য ধান ক্ষেত থেকে নতুন ধানের পাতা ছিঁড়তে গিয়ে কচাৎ করে আমার আঙুলের অনেকখানি কেটে গেল। কচি ধানপাতায় ব্লেডের মতন ধার। রক্তমাখা ধানপাতাগুলো আমি হাত থেকে ফেলে দিলাম, পাঁঠাটা দিব্যি সেগুলো খেয়ে নিল। কয়েকদিন পরে আমি ওর মাংস খাবো তো. তার আগে আমার রক্ত ওর খাওয়া হয়ে গেল'

পাঁঠাবলির সময় যারা দাঁড়িয়ে থাকবে না, তাদেরকে সবাই ভীতু বলে খুব রাগায়। আমার ধারণা ছিল, আমি ভয় পাবো না। তখন মনে মনে কত বাঘ-সিংহ শিকার করি, পাখি দেখলেই গুলতি ছুঁড়ি, আর সামান্য একটা পাঁঠাবলি দেখে ভয় পাবো কেন? কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি থাকতে পারি নি. বলির খাঁড়া যখন উঠছে. আমি এক ছুট্টে পালিয়ে গিয়েছিলাম। মৃত্যুর আগে পাঁঠাটার ম্যা—ম্যা ডাক কতক্ষণ যে আমার কানের কাছে বেজেছে!

ভোরবেলা উঠে পাঁঠা চরাতে চরাতে আমি চলে যেতাম খালধার পর্যন্ত। পরবর্তী জীবনে আমি রাখাল বা মেষ পালকদের সম্পর্কে অনেক কাব্য গাথা পড়েছি. কিন্তু পাঁঠা-চরানোর ব্যাপারটা সে-রকম কবিত্বময় মনে করা যায় না। কিন্তু আমি বেশ আনন্দ পেতাম। তখন আমার আপনমনে কথা বলার স্বভাবটা খুব বেশী ছিল। বাচ্চা পাঁঠাটাকে সঙ্গী পেয়ে আমার কত কথা যে ওকে শুনিয়েছি! শিশির ভেজা মাঠে ওর সঙ্গে সেই যে ছুটোছুটি করেছিলাম—মনে হয় যেন আজও সেই গ্রামের প্রান্তরে আমার পায়ের ছাপ রয়ে গেছে।

খালধারে ছিল আমার ইস্কুলের বন্ধু মুর্তজার বাড়ি। মুর্তজার বাবা ইফতিকার

সাহেব সহর আদালতে ওকালতি করতেন। মুর্তজা আমার সমবয়সী হলেও ছিল শান্ত গম্ভীর প্রকৃতির, পড়াশুনোয় খুব মনোযোগী। খেলাধুলোর বদলে সে বই-পত্রের আলোচনা করতে ভালবাসতো। আমাকে দেখলেই সে বাংলা বানান জিজ্ঞেস করতো। ইস্কুলের মাস্টারমশাইরা কলকাতার ছেলে বলে আমাকে বেশী প্রশংসা করলেও আঁক আর বাংলায় মুর্তজা আমার থেকে অনেক ভালো ছেলে। সকালবেলা ওর বাড়ির কাছাকাছি গেলে মুর্তজা আমাকে দেখেই ওর মাকে ডাক দিয়ে বলতো, আম্মা, বাদল আইছে, আমি একটু ঘুইরা আসি।

সেবারের দুর্গাপুজো যে-দুটি কারণে আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে, তার মধ্যে অন্যতম মুর্তজার কয়েকটি কথা। পুজোর কয়েকটি দিন আমার মামাবাড়িতে গ্রামসুদ্ধ লোকের নিমন্ত্রণ হতো—হিন্দু মুসলমান কেউ বাদ যেত না। সেইজন্যই আমি মুর্তজাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুই অষ্টমীর দিন সারা রাত থাকবি তো? মাঝ রাত্তিরে আরতি হবে, খুব মজা হবে।

মুর্তজা বলেছিল, আমি তো যাবো না। বাবা বলেছেন, হিন্দুদের পুজোয় আমাদের যেতে নেই।

আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলাম, কেন?

—তোরা তো পুতুল পুজো করিস। আমাদের ওসবে যোগ দিতে নেই।

আমি বলেছিলাম, পুতুল নয়। অনেক বড় বড়। মা দুর্গা তো মস্ত বড়। পুতুল তো পুজো করে ছোট মেয়েরা।

মুর্তজা বললো, তোদের ঠাকুরঘরে যে কেষ্টঠাকুরের পুতুল থাকে, সেটা কত বড়?

এই ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখিনি এবং আগেই একটা ভুল যুক্তি দিয়ে ফেলেছি বলে আমি একটু থতমত খেয়ে যাই। কিন্তু মুর্তজার কাছে হার স্বীকার করবো কেন? চোখ গোল গোল করে ওকে ভয় দেখিয়ে বললাম, কেষ্টঠাকুরকে কখনো পুতুল বলতে নেই। তাহলে ঠাকুর তোকে পাপ দেবে।

মুর্তজা বললো, তোদের ঠাকুর আমাকে পাপ দিতে পারবে না। আমাদের খোদাতাল্লা আছেন। খোদাতাল্লা অনেক বড়।

—তোদের খোদাতাল্লাকে দেখতে কি রকম?

মুর্তজা বড়দের মতন গলার আওয়াজ করে বললো, আল্লা সর্বশক্তিমান এবং নিরাকার। আল্লার কোনো বর্ণনা হয় না।

আমি বললাম, যা, যা, কৃষ্ণ সুদর্শনচক্র দিয়ে সবাইকে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে, তা জানিস?

তারপর আমরা দুই খুদে ফ্যানাটিক ঝগড়া শুরু করে দিলুম। ঝগড়া আর একটু হলে মারামারিতেও গড়াতে পারতো। মুর্তজাদের বাড়িতে রীতিমতন ধর্মশিক্ষা আছে, আমাদের বাড়িতে সে সব কোনো পাট নেই। আমি শুধু রামায়ণ-মহাভারতের গল্প জানি এবং কিছুদিন আগেই পৈতে হবার জন্য নিজেকে ব্রাহ্মণ ভেবে বেশ গর্ব অনুভব করি। আমি মুর্তজাদের ধর্ম কিংবা আল্লা সম্পর্কে কিছুই জানি না, কিন্তু মুর্তজা হিন্দুদের ধর্ম সম্পর্কে অনেক খবর রাখে—সুতরাং সে বেশ যুক্তি ও তুলনা দিয়ে কথা বলতে পারে—আমার সে সুযোগ ছিল না বলেই আমি চ্যাঁচাতে লাগলুম। এক ধরনের অভিমানে আমার চোখে জল এসে গেল। আমি চলে আসবার আগে ওকে বললুম, তুই তোদের আল্লার পুজোয় আমাকে কখনো নেমন্তন্ন করেছিস? আমি দুর্গাঠাকুরের পুজোয় তোকে নেমন্তন্ন করলুম, আর তুই আমাকে এরকম বললি?

মুর্তজা তখন ছুটে এসে আমার পিঠে হাত দিয়ে ভাব করতে গেল, আমি তবু কথা না বলে চলে এলাম।

এটা একটা সামান্য ছেলেমানুষী ব্যাপার। কিন্তু খালধারে দুই বালকের সেই অনর্থক ঝগড়ার দৃশ্য যে-কোনো কারণেই হোক আমার মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। পরে ঐ ঘটনা মনে করে অনেক হেসেছি।

দ্বিতীয় স্মরণীয় ঘটনাটি ঘটেছিল আমার সেজ মামার জন্য। আমার এই মামাকে আমি আগে কখনো দেখেছি কিনা মনে পড়ে না, এইবারই ভালো করে চিনলাম। সেজ মামাকে দেখলেই ভালাবাসতে ইচ্ছে করে। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, গায়ের রংটি মাজা-মাজা, সদ্য ঢাকা থেকে ডাক্তারি পাস করেছেন। আমরা তাঁকে অতীন মামা বলে ডাকতাম—মানুষটি খুব আমুদে, সব সময় হাসি ঠাট্টায় মশগুল হয়ে থাকতেন। অতীন মামা যখন যেখানে থাকতেন, সেখানেই একটা আনন্দের হাওয়া বয়ে যেত।

এই অতীন মামা পুজোর ঠিক দু' দিন আগে জলধরকে একটি ছবি দেখিয়ে বললেন, জলধর, তুমি এই ছবি দেখে ঠিক এ রকম মূর্তি বানাতে পারো?

জলধর মাথা নেড়ে বললো, এ আর কঠিন কি!

তারপর অতীন মামার সংগে জলধরের আর কি কি কথা হয়েছিল আমরা জানি না। তখনই ঠাকুর দালানের চার পাশ ঘিরে দেওয়া হলো কাপড় দিয়ে। সেখানে আমাদের প্রবেশ নিষেধ হয়ে গেল।

ষষ্ঠীপুজোর দিন যখন পর্দা উঠলো, ঠাকুরের মূর্তি দেখে আমরা সবাই অবাক। অনেক কিছুই বদলে গেছে।

আর সবই ঠিক আছে, রাংতাজরির ডাকের সাজ রয়েছে, কল্কা বসানো বিশাল চালচিত্র পেছনে, সরস্বতী হংসবাহিনী—তাঁর রং দুধে-আলতা, লক্ষ্মীর রং কাঁচা হলুদ, লাল রঙের পেটমোটা গণেশ, দুর্গার মুখও জলধরের নিজস্ব—কিন্তু কার্তিক নেই—সেখানে সুভাষ বসু দাঁড়িয়ে। সুভাষ বসুর মূর্তির গায়ে পুরোপুরি সামরিক পোশাক—দেবসেনাপতির যোগ্য তাঁর বীরত্ব ব্যঞ্জক ললাট ও চক্ষু, শুধু গোল চশমাটা একটু কেমন কেমন দেখায়। আর নীল রঙা অসুরের বদলে সেখানে রয়েছে একজন ইংরেজ মিলিটারি—সে সিংহের দিকে বেয়ানেট উঁচিয়ে আছে, আর মা দুর্গা সেই মিলিটারির বুকে বর্শা বিঁধিয়ে দিয়েছেন। খবর পেয়ে বিভিন্ন গ্রাম থেকে দলে দলে লোক আসতে লাগলো সেই মূর্তি দেখবার জন্য।

সেই মূর্তি দেখে আমি কী যে অভিভূত হয়েছিলুম, তা বলে বোঝানো যাবে না। যতক্ষণ তাকিয়ে থাকি, আশ মেটে না। আমি যেখানেই দাঁড়াই, মনে হয় মা দুর্গা আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন।

রাত্তিরবেলা অনেকক্ষণ ধরে ঠাকুর সাজানো হলো। আমি মায়ের ডাক উপেক্ষা করে সেখানে বসে রইলাম। আমার একটুও ঘুম আসে নি। শেষে, বড়োরা যখন খেতে গেল, তখন আমাকে শুতে যেতেই হলো।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই মনে হলো, ঠাকুর দালানে এখনো ঠাকুর সাজানো হচ্ছে। টুপ করে বিছানা থেকে নেমে আমি এক ছুটে, চলে গেলাম সেখানে।

গিয়ে দেখি, দু'তিনটে হ্যাজাক আর পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে কিন্তু কোনো লোক নেই। ঠাকুর দালানে আমি একা—বাইরে গভীর রাত ঝিমঝিম করছে। আমার ভয় করলো না, ভীষণ ভালো লাগলো। আমি সব ঠাকুরের পায়ে হাত বুলোতে লাগলাম,

অন্য সময় আমাকে এই সুযোগ কেউ দেবে না।

আমি সরস্বতী ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ আমার মনে হলো, মূর্তির যেন চোখের পলক পড়লো। বুক কেঁপে উঠলো আমার। এ কি সত্যি? শুনেছি এ রকম সত্যিই হয়। অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইলাম সেই মূর্তির দিকে, না, আর পলক পড়ে নি। তবে, সেই সরস্বতীর মুখ আমি ভুলিনি, বুকের মধ্যে ছাপ পড়ে গিয়েছিল, বহুকাল পরে সেই মুখ আমি আবার দেখতে পেয়েছিলাম।

ষষ্ঠী পেরিয়ে সপ্তমী এসেছে। গ্রামের মেয়েরা কেউ তখনও ফ্রক পরে না—সকলেই শাড়ীপরা এক একটি ক্ষুদে গিন্নী। ছোট ছেলেরা পরে ইজেরের ওপর পাঞ্জাবী আর পায়ে পাম্প শু। আমি কলকাতার ছেলে, আমার কথাই আলাদা! আমি তো ঘাটি হয়ে গেছি। আমি 'আইছি' 'খাইছি' 'দেখছি'র বদলে তখন এয়েচি, খেয়েচি, দেখেচি বলি, আমার পোশাকও আলাদা—আমার বেল্ট লাগানো হাফ প্যান্ট, আর চেন বসানো সিল্কের গেঞ্জি আর নটিবয় বুট জুতো। কলকাতা থেকে আনা সাদা লম্বা লম্বা এক রকম লজেন্স তখনও কয়েকটা আমার কাছে ছিল, তার একটা দু' আঙুলে ধরে মুখে দিয়ে আমি সমবয়েসীদের বললাম, এই দ্যাখ, আমি সিগ্রেট খাচ্ছি, মেজ মামার মতন। হু—স্! সবাই অবাক, শুধু আমার মাসতুতো বোন শান্তি বললো, দাঁড়াও না, দাদামশাইকে বলে দেবো। তুমি অঞ্জলি দেবার আগেই খেয়েছো!

আমি ভয় পেয়ে রাগ দেখিয়ে বললাম, ইল্লি! খেয়েছি নাকি! শুধু তো মুখে দিয়েছি।

দালান থেকে ভোগের থালা লাইন করে আসতে লাগলো। পুরুতমশাই এক হাতে আরতির ঘণ্টা অন্য হাতে পঞ্চপ্রদীপ—দু' হাত একসঙ্গে নাড়াতে লাগলেন, শুরু হলো ঢাকের বাজনা। তিনজন ঢাকি, দুজন ঢুলি, দুখানা কাঁসি। ঢাকের আওয়াজ বলছে, ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ? ঠাকুর যাবে বিসর্জন? আর কাঁসি বলছে, তাই দ্যাখ না, তাই দ্যাখ না! অমূল্য ঢাকির নাম সারা তল্লাট জুড়ে, পালকের ফুল বসানো বিচিত্রিত জয়ঢাক নিয়ে সে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে, সেই তালে তালে দুলছে আমাদের শরীর। কাঁসি যে দুজন বাজাচ্ছে, ওদের মধ্যে একজনের নাম দুলাইল্যা, ও নাকের ওপর মস্তবড় আগুন জ্বালা ধুনুচি নিয়ে আরতির সময় দারুণ নাচ নাচতে পারে।

দুই ব্যাচে খাওয়ানো হয়—দাদামশায়ের হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের জন্য আলাদা আলাদা ব্যাচ। মুর্তজা না এলেও অনেক মুসলমানই উৎসবে যোগ দিতে এসেছে।

জন পনেরো লোক পরিবেশন করছে—ঝাঁকা ঝাঁকা লুচি আসছে আর উড়ে যাচ্ছে। ও এনাতালি, তোমাকে আর একখানা অমৃতি দিই? ও আইনদ্দি, তুমি গতবার ছ' গণ্ডা রসগোল্লা খেয়েছিলে, এবার মাত্র সাড়ে চার গণ্ডা খেয়েই কাৎ? ভৈরব কাকা, আপনি নাকি মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন? এবার থেকে তা হলে বাঘেও আর মানুষ খাবে না। হা—হা—হা—হা—। এই রকম সব কোলাহল।

প্রতিবেশী জমিদার ইমানুল্লা দাদামশায়ের পাশে মখমল মোড়া চেয়ারে বসে আছেন, জাঁদরেল ভঙ্গিতে। গড়গড়ায় টান দিয়ে তিনি বললেন, এবার যা পিরতিমা বানাইছেন, সব মাইনষে ধন্য ধন্য করতাছে।

দাদামশাই মৃদু হাস্যে শুধু বললেন, পোলাপানগো খেয়াল!

ইমানুল্লা সাহেব আবার বললেন, এ তো দুর্গাঠাকুর নয়, এতো ভারতমাতা। জলধররে বেশী কইরা ইনাম দিয়া দেবেন।

এমন সময় একটা সোরগোল উঠলো। কিছু লোকের ছুটোছুটি। পুকুর ঘাটে

নৌকো থেকে উঠে এলো আট দশজন লাল পাগড়ি পুলিস আর মহকুমার পুলিস বড়বাবু বিপিন চৌধুরী। গট গট করে তিনি এগিয়ে এসে বললেন, বড়কর্তা, এ সব কি? আপনার মতন একজন মানী লোক এই কান্ড করবেন, এরকম শান্তিপূর্ণ গ্রামে?

কারুকে দেখে বিচলিত হবার লোক নন দাদামশাই। তাঁর মনের ভাব মুখ দেখে কিছুতেই বোঝা যাবে না। তিনি নিরুত্তাপ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে কি?

বিপিন চৌধুরী বললেন, পেছনের নৌকোয় হারবিনজার সাহেব নিজে আসছেন। আজ সকালেই ওঁর কাছে রিপোর্ট গেছে।

দাদামশাই বললেন, তা কি হবে?

—এক্ষুণি এ পুজো বন্ধ করে দিন!

—কি?

দাদামশাই ছোটখাটো মানুষ, কিন্তু তাঁর গলায় তেজ আছে। এমন কঠিনভাবে তিনি 'কি' কথাটা উচ্চারণ করলেন যে, সবাই এক নিমেষের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল।

বিপিন চৌধুরী দমলেন না। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, আপনার ভালোর জন্যই বলছি।

—আমার ভালোর কথা, তোমাকে ভাবতে হবে না। আসল কথাটা কি বলো।

—এ প্রতিমা পুজো বন্ধ রাখতে হবে। গভর্নমেণ্টের হুকুম।

—পুজো আচ্চাও কি এখন থেকে গভর্নমেণ্টের হুকুমে চলবে নাকি?

—এ প্রতিমা এক্ষুনি বিসর্জন দিয়ে দিন। ঘট পুজো করুন।

ইমানুল্লা মাঝখানে এসে বললেন, আপনে ক'ন কি চৌধুরী সাহেব। নিজে হিন্দু হইয়া আপনি হিন্দুর পূজা বন্ধ করতে চান। দোষটা হইছে কি?

—চোখে আঙুল দিয়ে দেখালে দোষ বুঝবেন? অসুরকে করেছেন ব্রিটিশ সৈন্য, এই যুদ্ধের সময়—আর সুভাষ বোস একজন রাজদ্রোহী, এ ট্রেইটার...এ বাড়ির সব কটা পুরুষ মানুষকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবার পরোয়ানা আছে।

দাদামশাই জিজ্ঞেস করলেন, আমাকেও?

—হ্যাঁ।

—ঠিক আছে। তাও না হয় যাবো। আগে পুজো শেষ হোক। বিজয়া দশমীর পর এসো।

—হারবিনজার সাহেব একটু বাদেই এসে পড়বেন।

—আসুক তা হলে সাহেব।

এক ঘণ্টার মধ্যেই হারবিনজার সাহেব এসে পেঁছোলেন। তাঁর চোখ দুটি নীল, মাথার চুলগুলো সম্পূর্ণ সোনালি—দেখলে যেন মানুষ বলে মনে হয় না।

এক ব্যাচের তখন অর্ধেক খাওয়া হয়েছে, সাহেব দেখে অনেকেই উঠে দাঁড়ালো। ছোটরা পালিয়ে গেল ভয় পেয়ে। শুধু আমি, কলকাতা ফেরৎ, অনেক সাহেব দেখেছি কিনা—তাই একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সাহেব ঘুরে ঘুরে দেখলেন সব কিছু। হাতের ছড়িটা ঘোরাতে লাগলেন আলগাভাবে। কতদূরে এই সাহেবটির দেশ, এখানে এই এক অচেনা পাড়াগাঁয়েও কত স্বাভাবিকভাবে ঘুরতে পারেন। তার কারণ কি তাঁর কোমরে গোঁজা পিস্তলটি?

ঢাকি ঢুলিরা বাজনা বন্ধ করে মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে। ধূপধুনোর গন্ধে আচ্ছন্ন থমথমে পুজামন্ডপ। সব দেখে শুনে সাহেব বললেন......

সাহেব কি বললেন, সে বয়সে আমরা ঠিক বুঝিনি। পরে মামাদের মুখে শুনে-

ছিলুম, সাহেব হাসতে হাসতে বিপিন চৌধুরীকে বলেছিলেন, তুমি তো সব সময়েই ঘাসের মধ্যে সাপ দেখো। আমি তো এখানে সীডিশাস কিছু দেখতে পাচ্ছি না। শখ করে মূর্তি বানিয়েছে—কোনো ইনস্টিগেশন নেই। আমি তো রিপোর্ট পেয়েছিলুম ঐখানে গ্যান্ডি আর বোসের স্পীচ রিসাইট করা হচ্ছে! না, না, এরকম সুন্দর আবহাওয়া নষ্ট করা উচিত নয়। সব চলুক। আঃ, কি সুন্দর গন্ধ এখানে।

সাহেব আরও বলেছিলেন, ড্রাম বিটিং শুনতে তাঁর ভালো লাগে। ঢাকের বাজনা থামলো কেন? ইঙ্গিত পেয়ে অমূল্য ঢাকি আর তার দলবল দ্বিগুণ উৎসাহে লাফিয়ে লাফিয়ে বাজনা শুরু করলো, কাঁসির আওয়াজ ক্যান ক্যান সুরে বলতে লাগলো, তাই দ্যাখো না, তাই দ্যাখো না! সবাই ইংরেজ সরকারের মহানুভবতার জন্য ধন্য ধন্য করতে লাগলো।

বড় দিদিমা একটা থালায় সব রকম প্রসাদ সাজিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন, যা সাহেবকে দিয়ে আয়।

সাহেব আমার দিকে মৃদু হাস্য করে আগ্রহের সঙ্গে থালাটি নিলেন। আমি লক্ষ্য করলুম, সাহেবরা একদম খেতে জানে না। শাঁকালু আর কলাও পায়েসে ডুবিয়ে ডুবিয়ে খাচ্ছে।

সেবার বিজয়া দশমীর দু'দিন বাদেই বড়বাবুর কাছ থেকে এক চিঠিতে জানতে পারলাম, সূর্যদা খড়্গপুর রেল স্টেশনে পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে।

॥ ৪৬ ॥

যেকোনো কারণেই হোক বাবা হঠাৎ এই সময় দাদামশাইয়ের আশ্রয় ছেড়ে নিজের পৈতৃক গ্রামে চলে যাবার জন্য জেদাজেদি করতে লাগলেন। বাবা নিরীহ ও লাজুক ধরনের মানুষ, কারুর মুখের ওপর জোর দিয়ে কথা বলতে পারেন না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে বেশ গোঁয়ার। একবার কিছু একটা বলে ফেললে আর অন্যের কথায় মত পরিবর্তন করতেন না।

দাদামশাইয়ের ওখানে আমাদের কোনো অসুবিধেই ছিল না, দিব্যি খেতাম দেতাম, ঘুরে বেড়াতাম। তবু সেই অবস্থা বাবার কেন অসহ্য বোধ হলো, তা সেই বয়েসে আমার বোঝার কথা নয়। তখনও আমি টের পাইনি যে সমস্ত পৃথিবী একটি বিনিময় ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই বিনিময়ের মাধ্যম মানুষ আবিষ্কৃত টাকা নামক একটি বস্তু। এবং বেঁচে থাকার ব্যাপারটাকে বেশ চমকপ্রদ করার জন্য এই টাকার বণ্টন প্রণালীও বেশ ঘোরালো করে রাখা হয়েছে।

আমার মায়ের একেবারে ইচ্ছে ছিল না বাপের বাড়ি ছেড়ে যাবার। শ্বশুরের ভিটে সম্পর্কে তাঁর কোনো মোহ নেই। মা চেয়েছিলেন অন্তত আমার দিদির বিয়েটা ওখান থেকেই দিয়ে যেতে। পর পর ক' রাত্তির আমি মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে শুনতাম বাবা ও মায়ের ঝগড়া। বাবা ও মা দু' জনেই এত ভালো—অথচ সেই সময় চাপা গলায় বিষাক্তভাবে হিসহিস করছেন। দিনের বেলা ওঁরা যাদের সঙ্গে অনেক হেসে কথা বলেন, এখন তাঁদের সম্পর্কেই কত রাগের খারাপ খারাপ কথা বেরিয়ে আসছে। বড়দের মনের মধ্যে কত রকম গোপন কথা থাকে। আমি ঘুমের ভান করে নির্জীব হয়ে শুয়ে থেকে সব শুনতাম।

ঝগড়ার সময় আমার মায়ের যুক্তি বেশী ছিল না, অভিমানী কান্নাই ছিল প্রধান অস্ত্র। কটু অভিমানের সঙ্গে মা বলতেন, তোমার হাতে পড়ে সারা জীবন শুধু কষ্ট পেলাম! এতই যদি কষ্ট দেবে, তা হলে বিয়ে করেছিলে কেন?

বাবা তিক্ত গলায় উত্তর দিয়েছিলেন, আমি তা হলে আত্মহত্যা করি! তারপর তুমি তোমার ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়িতে সুখে থাকো!

শেষ পর্যন্ত বাবার জেদই বজায় রইলো। একদিন আমরা বাক্স প্যাটরা নিয়ে আবার নৌকোয় চড়ে বসলাম। মামাবাড়ির মাঝি নাদের আলি আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসবে।

যে-কোনো নতুন জায়গাতে যাবার ব্যাপারেই একটা উত্তেজনা থাকে সেই বয়েসে। আমি নৌকোর গলুইয়ের কাছে উৎসুক হয়ে বসেছিলাম সামনের দিকে চেয়ে। ছইয়ের ভেতরে মা আর বাবা। অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর মায়ের মুখখানা থমথমে। বাবা উদাসীনভাবে একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে যাচ্ছেন। দিদি গোড়া থেকেই পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে।

খাল-বিল-নদী পেরিয়ে চলেছে নৌকো। মনে হচ্ছে, এ যাত্রার বিরাম নেই। যতদূর দেখা যায়, শুধু জল। মাথার ওপরে শীতকালের পরিষ্কার আকাশ। আমার ঠিক চোখের সামনেই নাদের আলি লগি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে। তার খালি গা, নিকষ কালো রং, তেল চকচকে সবল দীর্ঘ দেহ, মনে হয় যেন মাঝে মাঝে তার মাথাটা আকাশ ছুঁয়ে যাচ্ছে। তাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করলেই সে ঝকঝকে সাদা দাঁতে হাসে। যেন একটা চমৎকার ছবি।

আমি আমার নিজের বাড়িতে যাচ্ছি। নাদের আলি এই কথা বলেছে, বাবাও বলেছেন। এতদিনে এইটুকু বুঝেছি, কলকাতায় বড়বাবুর বাড়ি কিংবা এখানে মামা-বাড়ি—আমাদের নিজের বাড়ি নয়। আরও ছেলেবেলায় মাটি কিংবা বালি দিয়ে যে বাড়ি বানাতাম—তা ছাড়া আমার আর কোনো নিজের বাড়ি দেখিনি। একটা অদম্য কৌতূহলে ছটফট করছিলাম।

সত্যিকারের নিজের বাড়িতে পৌঁছে একটু চুপসে গেলাম। জরাজীর্ণ নৈরাশ্যময় পরিবেশ। এ বাড়ি অনেক দিন পরিত্যক্ত। বাবার এক দূর সম্পর্কের মামার ওপর দেখাশুনোর ভার। তিনি বাড়ির এলাকার গাছের ফলমূল ভোগ করার জন্য যতটা দেখাশুনো করা দরকার, তা করতেন। আমরা খবর না দিয়ে হঠাৎ এসে পড়ায় তিনি বাবাকে বকাবকি করতে লাগলেন। খবর পেলে তিনি ঘরদোর অন্তত পরিষ্কার করে রাখতেন।

অবস্থা দেখে মা খুব মুষড়ে পড়লেন। দিদি আদুরে মেয়ের মতন নাকে কান্না কাঁদতে লাগলো। আমি দৌড়োদৌড়ি করে সব জায়গাটা ঘুরে দেখতে লাগলাম একলা একলা। আমাদের দেখবার জন্য গাঁয়ের বেশ কিছু লোক ভিড় করে এসেছিল।

মায়ের প্রধান চিন্তা নাদের আলিকে নিয়ে। নাদের আলি ফিরে গিয়ে যদি এই রকম অবস্থার কথা বলে দেয়, তা হলে মামাবাড়ির সবাই খুব দুশ্চিন্তা করবে, দাদামশাই হয়তো আবার ফিরিয়ে নেবার জন্য লোক পাঠাবেন। বাবা তখন আবার কী কাণ্ড বাধাবেন কে জানে। মা সেইজন্য নাদের আলিকে খুব খাতির যত্ন করতে লাগলেন, নগদ পাঁচটা রুপোর টাকা তার হাতে দিয়ে বললেন, নাদের, গিয়ে বলো আমরা সবাই ভালো আছি। আমরা এখন আমাদের এক মামাশ্বশুরের বাড়িতে থাকবো—তারপর বাড়িঘর সারিয়ে টারিয়ে—চিন্তার কিছু নেই, তুমি বুঝিয়ে বলো! কেমন?

নাদের আলিকে আমি আবার নৌকোর ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম। নৌকোয় ওঠার আগে নাদের আলি দু' হাতে আমার কোমর ধরে উঠিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নিয়ে আদর করলো। তারপর বললো, 'ঠাকুর ভাই, আবার আইসো। এবার তোমারে আমি ঠিক তিন প্রহরের বিলে নিয়া যাবো।' নাদের আলির সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। সে তার কথা রাখেনি। যে-কোনো চেনা মানুষ চলে গেলে আমার চোখে জল আসে।

ফুলপুরে প্রথম কয়েক দিন আমাদের ভালোই কেটেছিল। আমরা নতুন মানুষ, আমাদের গায়ে তখনও কলকাতার ছোঁয়াচ আছে, সুতরাং আমাদের সম্পর্কে অনেকেই আগ্রহী। প্রায়ই নানান বাড়িতে নেমন্তন্ন পাই। আর সে কি খাওয়া! এক থালা ভর্তি ভাত শেষ না করে কেউ উঠতেই দেয় না। কাঁধ ধরে জোর করে বসিয়ে রাখে। সেই ভাত কোনোক্রমে শেষ করলেও তারপর আবার নতুন গুড়ের পায়েস খেতেই হবে। খাওয়ার পর মনে হয়, না আঁচিয়ে সেখানেই শুয়ে পড়ি।

এক মাস দেড় মাসের মধ্যেই অবশ্য এই সব কৌতূহল স্তিমিত হয়ে যায়। তখন আমরা শুধু নিজেদের নিয়ে একলা। বাবা, মা, দিদি আর আমি। এর আগে আমরা সব সময়ই বেশ বড় বাড়িতে অনেক লোকের সঙ্গে থেকেছি বলে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিলাম। এখন ছোট নিরালা বাড়িতে আমরা সবাই কাছাকাছি, যেন পরস্পরকে নতুন করে চিনে নিচ্ছি। মাকে দেখি সারা দিন রান্না করতে, বাবা গম্ভীরভাবে বসে থাকেন, দিদি জল তোলে, কাপড় কাচে আর এপাড়া ওপাড়া ঘুরে বেড়ায়।

এখানেই আমি নানা জনের কাছ থেকে টুকরো টুকরোভাবে শুনি, আমার পূর্ব-পুরুষদের গল্প। আমার ঠাকুর্দা, তিন ঠাকুমা, আর বিশ্বরঞ্জন কাকার চমকপ্রদ জীবনী, পূর্ণিমা পিসীমার বিয়ের কেলেঙ্কারির কথাও অনেকেই এখনো ভোলেনি। ভারী আশ্চর্য লাগে, সেই সব মানুষ সবাই মরে গেছে কবে, তবু তাদের গল্প এখনো বেঁচে আছে। আমি ওঁদের কারুকেই দেখিনি, তবু যেন দেখতে পাই। ঐ বাতাবী লেবুর গাছটার তলায় বসে আমার ঠাকুর্দা তামাক খেতেন—বাগানের মধ্যে ভাঙা ঘরটায় আমার ছোটকাকা মূর্তি বানাতেন—আমি সেই সব জায়গায় দাঁড়াই—আর আমার গা শিরশির করে, শরীরের মধ্যে যেন টের পাই পূর্বপুরুষের রক্তস্রোত—যদিও প্রত্যেক মানুষের জন্মই এক একটি আকস্মিক ঘটনা মাত্র। মা যখন রাগের মাথায় বাবাকে বলেন, তুমি আমায় বিয়ে করলে কেন, তখন মায়ের মনে থাকে না যে তা হলে আমি বা দিদি জন্মাতাম না। অথচ সব মা-ই নিজের সন্তানকে সমস্ত প্রবৃত্তি দিয়ে ভালোবাসে। মানুষের জীবন এই রকমই অযৌক্তিক।

ঘন ঘন জায়গা বদলাবার ফলে আমি বন্ধুহীন হয়ে পড়ছিলাম। ফুলপুরে আমার তেমন কোনো বন্ধু হলো না। বছর শেষ হয়নি বলে স্কুলেও ভর্তি হইনি। আমি একা একা ঘুরে ঘুরে এক একদিন এক একটা বাগান বা পুকুর বা পাটক্ষেত আবিষ্কার করতাম। যা কিছু আমায় কেউ আগে থেকে চিনিয়ে দেয়নি। সেগুলোই আমার নিজস্ব মনে হতো। আমার সেই অধিকারের জগতে আমি আপন মনে কথা বলতাম আমার পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে। কলকাতার কথা খুব মনে পড়তো, বিষ্ণু, জীমূত, রেণু ওদের যেন ঠিক চোখের সামনে দেখতে পেতাম। এক একদিন সূর্যদার সঙ্গেও আপন মনে কথা বলেছি। কল্পনায় দেখতাম, জেলখানায় গরাদের ওপাশে সূর্যদা একটা হাফ প্যান্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে। ভীষণ রাগী থমথমে মুখ। সূর্যদা নিশ্চয়ই কোনো এক সময় জেলখানা ভেঙে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু তার আগেই যদি সূর্যদার ফাঁসি

হয়ে যায়?

একদিন একটা বাগানে অনেকগুলো লেবু গাছ দেখলাম। বড় বড় গন্ধরাজ লেবু ফলে আছে। লেবু ফুল আমি আগে কখনো দেখিনি। সেই লেবু ফুলের গন্ধ শুঁকতে গিয়ে হঠাৎ আমার হৈমন্তী কাকীমার কথা মনে পড়লো। একরাশ চুলের মধ্যে হৈমন্তী কাকীমার মুখখানা ঠিক গন্ধ লেবুর ফুলেরই মতন। বড় লেবুর গায়ের মতন তাঁর থুতনি। হৈমন্তী কাকীমা আমাকে বললেন, বাদল, আমি জীবনে কিছু পাইনি। আমি কথাটার মানে বুঝতে পারলাম না। হৈমন্তী কাকীমা আবার বললেন, আমি জীবনে কিছুই পাই নি। আমার বুক দুলে উঠলো। আমি লেবু ফুলের দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার জন্য আমি সব কিছু এনে দেবো।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে একটা খুব পুরোনো বড় বাড়ির কাছে চলে গিয়েছিলাম। বাড়িটাতে কোনো মানুষ জন নেই। আমি এক পা দু' পা করে ঢুকতে যাচ্ছি হঠাৎ পাশের বাগান থেকে একটা রোগা চিমসে মতন লোক বেরিয়ে এসে বললো, খোকা, যেও না। ও বাড়িতে ভূত আছে। শুনে আমার মনে হলো, ঐ লোকটাই ভূত। আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালাম।

তা ছাড়া, আর একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করার মতন। মামাবাড়ির গ্রামের তুলনায় এই গ্রামে অবস্থাপন্ন লোকের সংখ্যা কম। নিম্নমধ্যবিত্ত বা গরীবই বেশী—হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য—যে দু'চার ঘর বড়লোক আছেন, তাঁরাও মুসলমান। শিক্ষিত চাকুরিজীবী হিন্দুরা তখন থেকেই কলকাতামুখী। অনেক বনেদী বাড়ি প্রায় খালি পড়ে আছে—কর্তারা দোল দুর্গোৎসবে একবার করে বেড়াতে আসে।

ফুলপুরে এসে আমি খুব তাড়াতাড়ি বয়স্ক হয়ে গেলাম। আমার নানা রকম অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হতে লাগলো।

এখানেই প্রথম ভালোভাবে টের পেলাম, হিন্দু আর মুসলমান দুটো আলাদা জাত—এদের মধ্যে মেলামেশা বারণ। যে-সব মুসলমান আমাদের বাড়িতে আসে, তারা উঠোনে এসে দাঁড়ায়, কক্ষনো বারান্দায় বসে না। অর্থাৎ তাদের বসতে দেওয়া হয় না। কারুর কাছ থেকে কিছু কিনলে পয়সা দেওয়া হয় আলগোছে। তাদের মুখে লেগে থাকে একটা বিগলিত ভাব। সাধারণ কথাবার্তায় আমরা অনেককে চাচা কিংবা সাহেব বলি, মুখে বেশ মিষ্টি কথা থাকলেও ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে সব কিছু। হিন্দুরা আড়ালে মুসলমানদের সম্পর্কে এমনভাবে কথা বলে যেন ওরা মানুষের অধম। ওরা চোর, ওরা হিংস্র, ওরা নোংরা। সাপ আর মুসলমানদের কখনো বিশ্বাস করতে নেই। হিন্দুদের নিজেদের মধ্যেও হাজার রকমের জাত-বিচার, ছোঁয়াছুঁয়ি, ব্যবধান—কিন্তু মুসলমানদের সম্পর্কে সবাই একমত। যত গরীব বাড়ি, তত বেশী উগ্রতা। আমার মামাবাড়িতে এরকম দেখিনি, সম্ভবত সেখানে হিন্দু আধিপত্য এত বেশী ছিল যে মুসলমানদের প্রতি দয়া দেখানো সহজ ছিল।

মুসলমানরা আলাদা পাড়ায় থাকে, তাদের জীবনযাত্রা অন্য রকম। কখনো কখনো রাস্তা সংক্ষেপ করার জন্য মুসলমানদের বাড়ির পাশ দিয়ে গেছি—মাথা নীচু করে নিঃশব্দে রাস্তাটুকু পার হতে হয়েছে—সে বাড়ির লোকেরাও নিঃশব্দে চেয়ে থেকেছে কেউ কোনো কথা বলেনি। আড়চোখে দেখেনিই, তাদের বাড়ির উঠোনে মুর্গীর পাল দৌড়োদৌড়ি করে, বাচ্চারা ছাই গাদায় গড়ায়, ওদের বাড়ির মেয়েরা খড়ম পায় দেয়, সব জায়গায় কেমন যেন একটা রসুন রসুন গন্ধ।

মুসলমানরা বাড়িতে মুর্গী পোষে—এটা বাঙালী হিন্দুর চোখে একটা ঘৃণার

ব্যাপার। হিন্দুর বাড়িতে হাঁস থাকে—সেই হাঁসের ডিমও খাওয়া হয়, কিন্তু মুর্গীর মাংস বা ডিম একেবারে নিষিদ্ধ। হাঁস আর মুর্গীর ডিমের মধ্যে দুটি আলাদা ধর্ম কিভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল—সে প্রশ্ন কারুর মনে জাগেনি। তখনও হিন্দুরা পোলট্রির ব্যবসায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েনি। কলকাতায় এক ভটচাজ বামুন জুতোর দোকান খুলেছিল বলে সবাই অবাক। আমাদের পাড়ায় একবার একটা শজারু মারা হয়েছিল, সেই শজারুর মাংস রান্না করে খাওয়া হয়েছিল খুব আহ্লাদের সঙ্গে। কিন্তু গ্রামে কোনো হিন্দু বাড়িতে মুর্গীর মাংস রান্না ছিল অকল্পনীয়।

সাধারণ মুসলমানরা হিন্দুদের সম্পর্কে আড়ালে কি মন্তব্য করতো, তা আমার জানার কথা নয়। হিন্দুদের সম্পর্কে তাদেরও একই রকম ঘৃণার ভাব থাকার কথা। তবে পথেঘাটে হিন্দুদের সঙ্গে দেখা হলে তারা কথা বলতো একটু বিনীতভাবে। একবার শুধু একজন মুসলমানের বাড়ির পাশ দিয়ে আসবার সময় একজন মাঝ বয়েসী লোক আমাকে চোখ রাঙিয়ে বলেছিল, এই বামনা, ফের এদিক দিয়ে যাবি তো ঠ্যাং খোঁড়া কইর‍্যা দেবো!

আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। আমি তো কোনো দোষ করিনি। এ বাড়ির ছাই গাদায় একটা টোপা কুল গাছে অসংখ্য বড় বড় কুল হয়ে আছে—একবার ভেবেছিলাম সেই কুল কয়েকটা লুকিয়ে পেড়ে নেবো—কিন্তু সরস্বতী পুজোর আগে আমার কুল খাওয়া নিষেধ, তাই লোভ সম্বরণ করেছি। তবু এ লোকটা আমাকে বকলো কেন?

আমি তেরিয়া হয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, কেন?

লোকটি উঠে এসে চেঁচিয়ে বললো, ভালো চাস তো পালা, নয়তো একখানা চোপাড় (থাপ্পড়) দেবো!

আমি লোকটির নিষ্ঠুর মুখের দিকে তাকালাম। কয়েক শতাব্দীর ভুল বোঝা-বুঝির মাঝখানে আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাই আমার মনে হচ্ছিল, লোকটি বিনা কারণে আমাকে অপমান করছে। এবং লোকটি ভাবছিল, আমার ঠাকুর্দার বাবার দোষে আমাকেই শাস্তি দেওয়া উচিত। সেদিন লোকটি আমাকে খুন করে ফেললেও সেটি একটি ইতিহাসসম্মত ব্যাপারই হতো।

হিন্দুদের মুখে মুখে তখন কাশেম আলির নাম খুব ঘুরতো। কাশেম আলি তখন ওই তল্লাটে মুসলীম লীগের পান্ডা—এবং সে পাকিস্তান নামক একটা আজব জিনিস সম্পর্কে আবোল-তাবোল বলে যাচ্ছে। ১৯৪০-এ লাহোর প্রস্তাব পাস হয়ে যাবার পরও অধিকাংশ হিন্দুই পাকিস্তান শব্দটির সঙ্গেও তখন পরিচিত নয়। কিন্তু মুসলমানেরা কাশেম আলির কথা বেশ মন দিয়ে শুনছে। তার ফলে দু'-একটা ছোটখাটো ঘটনা ঘটতে লাগলো। হাটেবাজারে মাঝে মাঝে হিন্দুরা মুসলমানদের হাতে মার খায়। হিন্দুরা প্রথম বুঝতে পারলো, নাক উঁচু ভাব নিয়ে থাকলেও তারা সংখ্যায় কম। জমিদারি আমল টলটলায়মান, নতুন যুগ এসেছে, ভোটাভুটির যুগ। এই ভোটাভুটির যুগে যেদিকে জনসংখ্যা বেশী, সেদিকেরই জোর।

আমাদের বাড়িতে প্রথম যেবার চুরি হলো, আমরা খুব উত্তেজিত বোধ করেছিলাম। সিঁধ কেটে রাত্তিরবেলা চোর ঘরে ঢুকে অনেক কিছু নিয়ে গেছে। পরদিন সকালে কাছের বাগানে আমাদের খালি বাক্সগুলো পেলাম—টিনের বাক্স চোরেরা নেয় না। এর তিন দিন বাদেই দেখলাম, আমার চেন লাগানো সিল্কের গেঞ্জি বাজারে একটি মাছওয়ালার গায়ে। সে আমাদের দেখে একটুও অপ্রতিভ বোধ করলো না। আমি বাবার চোখের দিকে তাকালাম। বাবা বললেন, থাক, কিছু বলতে হবে না। পূর্ববঙ্গের

হিন্দুরা তখন থেকেই হারতে শুরু করেছে।

আর একটা জিনিস বুঝেছিলাম, আমরা গরীব। একথা যে শুধু আমরা জানি তাই-ই নয়, অন্যরাও জেনে গেছে। আমরা প্রথম প্রথম আসবার পর লোকে ভেবেছিল, আমরা বোধ হয় ঐশ্বর্যে সবার চোখ ধাঁধিয়ে দেবো—কারণ আমাদের ঝলমলে জামা কাপড়ের কায়দাই ছিল অন্য রকম, আমার মা ও দিদি স্নো ও পমেটম মাখে, আমার বাবা হুঁকো বা বিড়ির বদলে সিগারেট খান। আমাদের এসব ছিল, শুধু টাকা ছিল না। বাবা পাশের গ্রামের জমিদারি সেরেস্তায় কিংবা ইস্কুলে চাকরির চেষ্টা করেছিলেন, পারেননি। আবার হোমিওপ্যাথি ডাক্তারির চেষ্টা করেছিলেন, পশার জমলো না। গ্রামে তখন একটা ছন্নছাড়া ভাব। দুর্ভিক্ষের একটা বিরাট ছায়া উঁকি মারছে।

ক্রমশ জমানো টাকা সব শেষ হওয়ায় আমাদের খাওয়া থাকারও কষ্ট দেখা দিল। এতদিন আমার ধারণা ছিল, টাকা জিনিসটা বড়দের পকেটে থাকে—কোনো কিছু কেনবার সময় পকেট থেকে বার করতে হয়। কিন্তু পকেট থেকে যে টাকা কখনো কখনো ফুরিয়ে যায় এবং সে-জন্য বড়দের মনে কষ্ট জমে ওঠে, এই উপলব্ধি আমার নতুন। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে আমার পৈতের সময় পাওয়া টাকাতেও হাত পড়তে লাগলো। মা মাঝে মাঝেই দু' পাঁচ টাকা চাইতে লাগলেন। আমি প্রথমে দিতে চাইনি—কিন্তু মার থমথমে মুখ দেখে বেশী কথা বলতে পারিনি। আমার কৃপণের সঞ্চয় দ্রুত ক্ষয় হয়ে এলো। যেদিন থেকে বুঝতে পারলাম আমরা গরীব, সেই দিন থেকেই খানিকটা অসহায় বোধ করতে লাগলুম। মনে হলো, চোখ মেলে চারপাশের এই যে পৃথিবীকে দেখছি, এর ওপরে আমাদের অধিকার অন্যদের চেয়ে কম।

খাওয়ার সময় আর কোনো আনন্দ নেই। হঠাৎ বাবা আবিষ্কার করেছেন যে ভাতের ফ্যানের মধ্যেও প্রচুর খাদ্যপ্রাণ আছে, সুতরাং ফ্যানটুকু নষ্ট করা উচিত নয়। চালু হলো ফ্যানভাত। সকালে, দুপুরে রাত্তিরে আমরা শুধু ফ্যানা ভাত খাই। তারপর রাত্তিরে ভাত খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, রাত্তিরে আমাদের খাদ্য শুধু আলু সেদ্ধ। অনেকগুলো আলু সেদ্ধ করে চটকে নুন দিয়ে মেখে বড় বড় গোল্লা পাকিয়ে থালায় নিয়ে বসি। খেতে খেতে গলায় আটকে যায়, ঢক ঢক করে জল খাই। আমার পছন্দ হয় না, আমি ভাতের জন্য কান্নাকাটি করি।

তখন আমি সবে লম্বা হতে শুরু করেছি, বালক অবস্থা থেকে আমার মানুষ হবার সময়—শরীরে অসম্ভব খিধে। সকাল থেকেই আমি খাই খাই করে মায়ের পেছনে ঘুরি। ক্ষিদের জন্য আমার মন খারাপ থাকে, আমি অবুঝের মতন ঘ্যান ঘ্যান করে বাড়ির সবাইকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারি। তখন বুঝতে পারিনি, কত দিন দুপুরবেলা মা আমাকে পেট ভরে ভাত খেতে দিয়ে নিজে না খেয়ে থেকেছেন। সেই সময় থেকেই আমার মায়ের চেহারায় বয়েসের ছাপ পড়ে।

দারিদ্র শুধু অশান্তি আনেনি, আমাদের নৈতিক অধঃপতনও এনে দিচ্ছিল আস্তে আস্তে। এখন আর বাবা মায়ের ঝগড়া মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে শুনতে হয় না, দিনের বেলাতেও যখন তখন শোনা যায়। প্রকাশ্যে চেঁচিয়ে ঝগড়া, আমি হাঁ করে শুনি। দুজনেই ঝগড়ার সময় এমন বদলে যান যে আমি আমার বাবা ও মাকে ঠিক চিনতে পারি না। ওঁদের কাছ থেকে কয়েকটা গালাগালি আমি শিখে নিচ্ছিলাম—এ ছাড়া বাইরের লোকদের কাছ থেকেও কিছু স্টক বাড়ছিল। একটি বারো বছরের ছেলের পক্ষে সময়টা মোটেই ভালো নয়। শহরের কিছুটা স্বাধীন জগত থেকে যে গ্রামের মধ্যে আমি গিয়ে পড়েছিলাম, সেখানে সামান্য দলাদলি ও সংঘর্ষ, জাতিভেদের নীচতা।

সামান্য খাবার দাবার নিয়েও বাড়িতে ঝগড়া হয়, চতুর্দিকে নৈরাশ্য, ভালোবাসার কেউ নেই। সে বড় দুঃসময় ছিল।

একদিন রাত্তিরে পেটভরা খাবার না পেয়ে আমি অবুঝের মতন ঘ্যানঘ্যান করছিলাম, মা হঠাৎ মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে এ'টো হাতেই আমাকে এক চড় মারলেন খুব জোরে। মার খেয়ে ব্যথা পাবার বদলে আমি অবাক হয়েছিলাম বেশী। মা আমাকে কোনোদিন মারেননি। আমি একটু মায়ের আদুরে ছেলেই ছিলাম বলা যায়। চোখ দুটি বড় বড় করে মায়ের দিকে তাকিয়েছি—মা রাগ সামলাতে না পেরে পর পর আরও দুই থাপ্পড় দিলেন। আমি এমন কান্না শুরু করলাম যে কিছুতে আর আমার হে'চকি থামে না। বাবা আমাকে সামলাতে এসে নিজেই চ্যাঁচাতে লাগলেন, আমি বিষ খাবো! আমি আজই বিষ খাবো!

এই অবস্থায় আর চলে না। এবার আমাদের কলকাতায় না গিয়ে আর উপায় নেই। তা ছাড়া দিদিকে নিয়েও গণ্ডগোল শুরু হয়েছিল। দিদিই তখন হয়ে উঠেছিল বাবা-মার অশান্তির প্রধান কারণ।

॥ ৪৭ ॥

শ্রীলেখার সঙ্গে সান্ত্বনার স্বভাবের কোনো মিল নেই। ওরা দু'জনে এক সঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে, দু'জনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্বও আছে, কিন্তু চরিত্র একেবারে আলাদা। শ্রীলেখা সরল ও নম্র স্বভাবের মেয়ে—তার চোখের চাহনিতে সব সময়ই এই ভাবটা থাকে, কেউ কিছু মনে করছে না তো?

সান্ত্বনার চোখের দিকে তাকালে কিছুই বোঝা যায় না। কোনো অচেনা লোকও তার চোখের দিকে তাকালে সে চোখ ফিরিয়ে নেয় না কখনো। ছেলেবেলা থেকেই সে খুব চাপা ও গম্ভীর স্বভাবের। এক এক সময় মনে হয় তার শরীরে দয়ামায়াও খুব কম। বাদল তার নিজের দিদির চেয়ে শ্রীলেখার কাছেই বেশী আবদার করেছে।

শ্রীলেখার বিয়ের আগে সূর্যর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা আর যারই চোখে পড়ুক বা না পড়ুক, সান্ত্বনা সবই জানতো। কিন্তু কোনোদিন সে এ সম্পর্কে একটাও কথা উচ্চারণ করে নি, শ্রীলেখাকেও কিছু বলে নি। শেষের দিকে বাড়ির বড়োরা যখন এ নিয়ে আলোচনা করতেন, সান্ত্বনা সেখান থেকে উঠে যেত নিঃশব্দে। সূর্যর সঙ্গে সান্ত্বনারও এক সময় বেশ ভাব ছিল, অথচ এক সময় সে সূর্যর সঙ্গে কথা বলাই প্রায় বন্ধ করে দেয়।

সান্ত্বনার কতকগুলো স্বাভাবিক দক্ষতা আছে। শেলাই টেলাই বা বোনার কাজ সে অনেক মেয়ের চেয়েই বেশী ভালো পারে, কিন্তু এদিকে তার কোনো ঝোঁক নেই। শখ করে সে কখনো শেলাই নিয়ে বসে না। রান্নাবান্নার দিকেও তার উৎসাহ নেই, কখনো দরকারে পড়ে বাধ্য হলে সে মোটামুটি ভালোই উৎরে দেয়। পড়াশুনোতেও সে শ্রীলেখার চেয়ে ভালো ছিল, কিন্তু সারা বছর বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে পরীক্ষার কয়েকদিন আগে রাতজেগে পড়ে পাশ করবে। বাড়িতে অনেক লোকজন থাকলে সান্ত্বনার উপস্থিতি টেরই পাওয়া যায় না। সেই জন্যই সে এতদিন শ্রীলেখার আড়ালে চাপা পড়ে ছিল। গ্রামের বাড়িতে নিরিবিলি পরিবেশে তাকে আলাদাভাবে চেনা গেল।

সান্ত্বনা এখন যুবতী। হঠাৎ তাকে দেখলে চমকে যেতে হয়। অল্প বয়সে তার চেহারা ছিল বৈশিষ্ট্যহীন, হঠাৎ সে ধাঁ ধাঁ করে লম্বা হয়ে উঠেছে, স্বাস্থ্যে এসেছে চাকচিক্য, যেন সান্ত্বনার খোলস ভেঙে বেরিয়ে এসেছে অন্য একটি মেয়ে। তার মুখের আকৃতির সঙ্গে তার মা, বাবা বা বাদলের কোনো মিল নেই। বাদলকে দেখে সবাই বলবে ঠিক যেন তার মায়ের মুখখানা বসানো। সেইজন্যই তখনো বাদলের মুখে একটা মেয়েলি ভাব আছে। সে যখন লজ্জা পেয়ে মুখ নীচু করে—তাকে কোনো কিশোরীর মতন মনে হয়। সান্ত্বনার মুখটা অনেকটা অবাঙালী ধরনের। চওড়া কপাল, টিকোলো নাক, লম্বাটে চিবুক, ঠোঁট দুটো খুব পাতলা। তার গায়ের রং অবশ্য খুব ফর্সা নয়, মাথার চুলে কিছুটা কোঁকড়াভাব আছে। তার চাপা স্বভাবের সঙ্গে এখন যেন মিশেছে একটু একটু অহংকার। বয়েসের তুলনায় সান্ত্বনাকে আরও বড় দেখায়।

গ্রামদেশে অসচ্ছল পরিবারের মেয়ের যদি স্বাস্থ্য ভালো হয়, তা হলে সে মেয়ে তো গলার কাঁটা। মেয়ের দিকে তাকালেই হিমানীর আজকাল বুক ঢিপঢিপ করে। সব সময় মেয়েকে চোখে চোখে আগলে রাখার চেষ্টা করেন। হিমানী এমনিতেই একটু নৈতিক শুচিবায়ুগ্রস্ত, একটু কিছু অসমীচীন ব্যাপার ঘটলেই তাঁর মনে হয়, পৃথিবী বুঝি রসাতলে গেল। তা ছাড়া মায়ের প্রাণ, সব সময়েই মেয়ের বিপদের আশঙ্কা করে। মেয়ের বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলেই সবচেয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন হিমানী। কিন্তু এ পোড়ার দেশে সে রকম ভালো পাত্র কোথায়? বাপের বাড়িতে থাকতে থাকতেই যদি বিয়েটা দিতে পারতেন!

সান্ত্বনাকে তার বাবা মা কেউই শাসন করতে পারে না। তার গাম্ভীর্যকে তার বাবা মা-ও সমীহ করে। এক একজন থাকে, যাদের দেখলেই মনে হয় এরা কখনো কোনো অন্যায় করতে পারে না—সান্ত্বনা সেইরকম। সান্ত্বনা যদি একা একা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় এবং বেশ কিছুক্ষণ পরে ফেরে—কেউ তাকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারবে না, এতক্ষণ কোথায় ছিলি? সে রকম জিজ্ঞেস করলে, জানা কথাই যে সান্ত্বনা কোনো উত্তর দেবে না। মিষ্টি গলায় কিংবা কথার কথা হিসেবে প্রশ্ন করলে সে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে পারে।

সান্ত্বনা নিঃশব্দে বাড়ির কাজ করে, জল আনে, বাসন ধোয়, কাপড় কাচে। কোনো কিছুই তাকে বলতে হয় না। লঘু হাতে সে ঝটপট কাজ সেরে নেয়। খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে তার বাছবিচার বড্ড বেশী। সে বেগুন খায় না, ট্যাংরা মাছ খায় না, পুঁই শাক খায় না। ইলিশ মাছের তেল দিয়ে ভাত মেখে খেতে বাঙাল মাত্রেরই জিভে জল আসে—কিন্তু সান্ত্বনা তাতে আঁশটে গন্ধ পায়—সে নাক কুঁচকে দূরে সরিয়ে দেয়। কোনো রান্নায় সামান্য ঝাল হলেই সে মুখে তুলতে পারে না। খেতে বসে যখন তখন সে ভাতসুদ্ধ থালা ঠেলে দিয়ে বলে, ভালো লাগছে না। আর খাবো না! হিমানী হয়তো ঝাঁঝের সঙ্গে বলে ওঠেন, তোর কোনটা ভালো লাগে বল তো? সান্ত্বনা তা বলবে না। তার নিজস্ব কোনো দাবি নেই। ইদানীং খাবার ঘরে অনটন দেখা দিয়েছে, চাল প্রায় পাওয়াই দুষ্কর, ভাতের অভাবে বাদল কান্নাকাটি করে—সান্ত্বনা কোনো অভিযোগ জানায় না। প্রতি দিনের রান্নার পদ পর্যবেক্ষণ করে সে প্রায়ই আগে থেকে বলে দেয়, আজ আমার ক্ষিদে নেই, কিছু খাবো না!

মা জিজ্ঞেস করেন, কি খেয়েছিস যে ক্ষিদে নেই বলছিস?

সান্ত্বনা বলে, বাঃ সন্ধ্যেবেলা যে দুটো পেয়ারা খেলাম!

সত্যিই তাই, সে দুটো পেয়ারা খেয়েছে বলেই রাত্রে আর কিছু খাবে না। প্রায় কিছুই না খেয়েও যে তার স্বাস্থ্য দিন দিন কি করে এত ভালো হচ্ছে, সেটাই এক রহস্য।

সান্ত্বনা বেশীক্ষণ বাড়িতে বসে থাকতে চায় না। একটু ফাঁক পেলেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে, কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়। সকাল দুপুর সন্ধ্যে যে-কোনো সময়েই হোক। সান্ত্বনা যে কোনো গোপন জায়গায় যায় বা অবৈধ কিছু করে তাও না। হিমানী মেয়েকে সরাসরি নিষেধ না করে নিজে থেকে খোঁজ নিয়েছেন। একদিন শুধু মিষ্টিভাবে সান্ত্বনাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, তুই যে যখন তখন বেরিয়ে যাস এতে লোকে নিন্দে করবে। এই সব গ্রাম দেশে মেয়েরা একা একা বেরোয় না!

সান্ত্বনা উত্তর দিয়েছিল, আমি ছেলে হলে তোমার খুব ভালো লাগতো, তাই না মা? আর দু' এক বছর পরেই আমি বেশ চাকরি করতাম।

সান্ত্বনা তবু বাড়ি থেকে বেরোয়। গ্রাম্য রাস্তায় সে রীতিমতন একটি দ্রষ্টব্য ব্যাপার। এরকম পরিচ্ছন্ন সুঠাম স্বাস্থ্যবতী মেয়েকে একা একা গ্রামের রাস্তায় আগে কেউ দেখে নি। তার নবোদিত স্তন দুটি সত্যিই যেন শব্দ করে যৌবনের বার্তা ঘোষণা করে, তার ভরাট উরুতে একটা যেন ছন্দ আছে। সবাই তাকে দেখে, সান্ত্বনা সে কথা বোঝে না। একমাত্র মল্লিকবাড়ির ফর্সা ফর্সা মেয়েরা তার মতন সুন্দরী, কিন্তু তারা বেশীর ভাগ সময়েই শহরে থাকে। আবদুর রহমানের বাড়ির জেনানারা নাকি পটের বিবির মতন—কিন্তু তাদের কক্ষনো বাইরে দেখা যায় না। সান্ত্বনাকে নিয়ে এক এক সময় গ্রামের প্রায় সমস্ত পুরুষই রসালো গল্পে মেতে ওঠে। বুড়োদের আড্ডাতেই কথা ওঠে বেশী। কে না জানে, ছোকরাদের চেয়ে বুড়োরাই অশ্লীল কথা বেশী পছন্দ করে। বাদল নিজেও দু'একবার তার দিদি সম্পর্কে খারাপ কথা শুনে ফেলেছে।

সান্ত্বনা সচরাচর বাদলকে সঙ্গে নিতে চায় না। বাদল কখনো সখনো বাগানে কিংবা পাটক্ষেতের ধারে সান্ত্বনাকে দেখে জিজ্ঞেস করেছে, দিদি, আমি তোর সঙ্গে যাবো?

সান্ত্বনা একটুক্ষণ চিন্তা করে বলেছে, আয়।

তারপর বাদলকে সে নানারকম কঠিন কঠিন কাজ করতে বলেছে। তাকে সে বলেছে কুঁচ গাছ থেকে কুঁচ ফল পেড়ে আনতে, পুকুরের মাঝখান থেকে পদ্মফুলের কুঁড়ি তুলে আনতে কিংবা ফড়িং ধরতে। বাদল কি এসব পারে?

একদিন সে বাদলকে হাসান গাজী দিঘির দক্ষিণ পারের কোনটায় দেখে বললো, এই শোন, এই খেজুর গাছটায় উঠতে পারবি?

খেজুর গাছটা ব্যাঁকা হয়ে উঠে গেছে অনেকখানি, গাছের বেশ খানিকটা অংশ জলের ওপরে। ডগার কাছে একটা হাঁড়ি বাঁধা। গাজীভাই ভোরবেলা একটা হাঁড়ি খুলে নিয়ে আর একটা হাঁড়ি বেঁধে রেখে যায়। দিনের রসের নাম ঝরা রস।

বাদল ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো, গাছে উঠে কি করবো?

সান্ত্বনা বললো, হাঁড়িটা পেড়ে আনবি।

—ঐ রস তো খায় না।

—তুই আনতে পারবি কি না বল্!

খেজুর গাছটা ব্যাঁকা বলে ওপরে ওঠা খুব শক্ত নয়। বাদল তবু ভয় পাচ্ছে। সান্ত্বনা বললো, তুই পারবি না? আমি পারি, দেখবি?

দিদি গাছে উঠবে—এটা বাদলের পছন্দ হয় না। সে নিজেই উঠতে শুরু করে। বেশ অবলীলাক্রমেই তরতর করে উঠে যায়। ওপরে উঠে যেই হাঁড়িটা খুলেছে, তখনই নীচের দিকে চোখ পড়তে তার মাথা ঘুরে গেল। নীচেই জল—আর এই দিঘিতে যা শ্যাওলা, সহজে সাঁতার কাটা যায় না। বাদল হাঁড়িটা গলায় ঝুলিয়ে সন্তর্পণে নামতে লাগলো আস্তে আস্তে। একবার তার পা পিছলে যেতেই এমন বুক কাঁপতে লাগলো যে তার হাতের জোর কমে গেল একেবারে। এখন সে কি করবে? নীচের দিকে তাকালেই মাথা ঘোরে। হাঁড়ি সুদ্ধু যদি জলে পড়ে যায়—

বাদল চেঁচিয়ে বললো, দিদি, আমি নামতে পারছি না!

উৎকণ্ঠিত হবার বদলে সান্ত্বনা হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে বললো, নামতে পারছিস না? তা হলে কি হবে?

—দিদি, আমি সত্যি নামতে পারছি না!

—বেশ হয়েছে! বেশ হয়েছে।

—তুই তো আমাকে উঠতে বললি!

—উঠতে পারিস, আর নামতে পারিস না, বোকা ছেলে!

—সত্যি পারছি না। বাবাকে ডাক্। কিংবা কার্তিকদাকে।

সান্ত্বনা কারুকেই ডাকলো না। শাড়ী গাছকোমর করে বেঁধে নিজেই উঠতে শুরু করলো। তার দিকে তাকিয়ে বাদলের আরও ভয় করতে লাগলো।

উত্তেজনার মাথায় বাদলের হাত থেকে রসের হাঁড়িটা পড়ে গেল জলে। ঝপাং করে শব্দ হলো. পুকুরে তাল পড়লে এই রকম শব্দ হয়, অনেকে সেই শব্দে ছুটে আসে। সান্ত্বনা তাড়াতাড়ি আবার নেমে পড়লো গাছ থেকে। অন্য লোকজন এসে দেখলো, বাদল খেজুর গাছের মাঝখানে কাঁদো কাঁদো মুখে বসে আছে। শুধু শুধু সে বকুনি খেয়ে মরলো। সেই থেকে সে আর দিদির সঙ্গে একেবারেই যেতে চায় না।

অন্য পাড়ার দুটি মেয়ে সান্ত্বনার সঙ্গে দেখা করতে প্রায়ই আসে। একজনের নাম নীলা আর একজনের নাম শঙ্করী। মেয়ে দুটি সান্ত্বনার খুব অনুরাগিনী হয়ে পড়েছে। অবশ্য সান্ত্বনা বিশেষ কোনো কথা বলে না—ওরাই সান্ত্বনাকে রাজ্যের কথা শোনায়। নীলা শঙ্করী কেউ কোনোদিন স্কুলে পড়ে নি, সামান্য বাংলা জানে কিন্তু তাদের বলার অনেক কথা আছে। নীলার এখনো বিয়ে হয়নি, শঙ্করীকে তার স্বামী নেয় না। শঙ্করী অবশ্য বলে তার স্বামী বার্মায় গেছে যুদ্ধ করতে, কিন্তু গ্রাম সুদ্ধু সবাই জানে তার স্বামী ব্রজেশ্বর একটি মেয়েকে বিয়ে করে গয়াতে থাকে। নীলার রাক্ষস গণ এবং সিংহরাশি বলে কোনো পাত্রর সঙ্গেই তার কুষ্ঠি মেলে না, সেইজন্য বিয়েও হতে পারছে না।

নীলা আর শঙ্করীর সঙ্গে সান্ত্বনা মাঝে মাঝে বেরোয়। লিচু বাগানে চড়ুইভাতি করে। কিন্তু এদের সঙ্গেও সান্ত্বনার ঠিক মেলে না। ঐ দুটি মেয়ের মধ্যে নীলা মেয়েটি বিশেষ করে সান্ত্বনার খুবই ভক্ত হয়ে পড়েছিল। সে প্রায়ই বলতো, ইস্, আমি যদি তোর মতন হতাম।

সান্ত্বনা শুধু জিজ্ঞেস করতো, কেন?

নীলা বলতো, তোকে দেখে মনে হয়, তুই যেন এই পৃথিবীর মেয়ে না। অন্য কোনো জগৎ থেকে এখানে বেড়াতে এসেছিস!

একদিন সান্ত্বনা একলা একলা বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর চলে গিয়েছিল। খাল ধারের অন্য দিকটায় অন্য গ্রাম। একটা মস্ত বড় অশত্থ গাছের নীচে কখনো কখনো

কোনো সাধু সন্ন্যাসী এসে বসে—এখন সে জায়গাটা ফাঁকা, কিছু ভাঙা হাঁড়ি কুড়ি ছড়ানো রয়েছে। সান্ত্বনা দেখলো, দু'টি বয়েসে বড় ছেলের সঙ্গে বাদল বসে আছে। একটি ছেলে বাদলের কাঁধ জড়িয়ে ধরে অন্য হাতে একটি জ্বলন্ত সিগারেট আনছে তার মুখের কাছে। বাদল খাবে না, মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, অন্য ছেলেটি জোর করে বাদলের মুখ ঘুরিয়ে দিচ্ছে। বাদল শেষ পর্যন্ত সিগারেটে দু' টান দিয়ে খক্‌খক্‌ করে কাশতে লাগলো।

সান্ত্বনা আড়াল থেকে দেখছিল, অনেকক্ষণ কোনো সাড়া শব্দ করে নি। কাশতে কাশতে যখন বাদলের চোখে প্রায় জল এসে গেছে—তখন সান্ত্বনা ডাকলো, এই বাদলা—

বাদল চমকে উঠলো, অন্য ছেলে দুটি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। সান্ত্বনা এগিয়ে এসে বাদলের হাত ধরে বললো, বাড়ি চল।

বয়স্ক একটি ছেলে হুইশ্‌ল দিয়ে উঠলো। সান্ত্বনা ছেলেটির দিকে তাকালোও না। হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল বাদলকে।

খানিকটা দূরে এসে বাদল ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো, দিদি, তুই মাকে বলে দিবি?

সান্ত্বনা কোনো উত্তর দিল না। বাবা মাকে বললোও না সেদিন। তার দু'দিন বাদে সান্ত্বনা কোথা থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট এনে বাদলকে দিয়ে বললো, এই নে খাবি?

প্যাকেটে দুটো সিগারেট ছিল। বাদল দেখেই চিনতে পারলো সেটা তার বাবার প্যাকেট। বাবা ছাড়া এ গ্রামে সেই সিগারেট কেউ খায় না। কখন রাস্তায় বাবার পকেট থেকে সেটা পড়ে গিয়েছিল, সান্ত্বনা কুড়িয়ে এনে বাবাকে দিল না, বাদলকে দিল। বাদল রেগে মেগে বললো, আমি কি সিগারেট খাই নাকি!

সান্ত্বনা বললো, মিথ্যে কথা বলিস না। কক্ষনো মিথ্যে কথা বলবি না!

সান্ত্বনা কেন একা একা ফাঁকা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, তার কোনো যুক্তিসিদ্ধ কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। একটি মাত্র কারণ মোটামুটি অনুমান করা যেতে পারে। সান্ত্বনা যখন কোনো নিরালা জায়গায় থাকে, তখন তাকে গুণগুণ করে গান গাইতে শোনা যায়। বাড়িতে কিংবা লোকজনের সামনে সে কখনো মুখ খোলে না। অথচ সে গান গাইতে ভালোবাসে। সান্ত্বনার গলা তেমন সুরেলা নয়, কোনো দিন সে গায়িকা হতে পারবে না, তবু সে মোটামুটি নির্ভুল সুরে গান গাইতে পারে।

গান গাওয়ার জন্য সবচেয়ে ভালো জায়গা পাট ক্ষেত। আধ মাইল, এক মাইল ছড়ানো পাট ক্ষেতের মধ্যে একবার ঢুকে গেলে আর খোঁজ পাওয়া যায় না। এক মানুষ, দেড় মানুষ উঁচু পাট গাছ, বহুদূর বিস্তৃত একটা আবছা হরিৎ জগৎ সৃষ্টি করে রেখেছে। সান্ত্বনা এদিক ওদিক তাকিয়ে সেই পাট ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তারপর শোনা যায় তার কান্না কান্না মতন গানের আওয়াজ।

সান্ত্বনা সেই রকম গান গাইতে গাইতে আসছে, হঠাৎ পাট ক্ষেতের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। এইসব ক্ষেতের মধ্যে প্রায়ই শেয়াল লুকিয়ে থাকে, সাপ আর নেউলের যুদ্ধ দেখা যায়। কিন্তু এই আন্দোলন অন্যরকম। সান্ত্বনা সেদিকে এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো।

একটি দাড়িওয়ালা স্থূলকায় লোকের আলিঙ্গন ছাড়িয়ে শঙ্করী উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। শঙ্করীর গায় এক টুকরো সুতো পর্যন্ত নেই। অন্য যে-কোনো মেয়ে সেই দৃশ্য দেখলে ছুটে পালাতো, কিন্তু সান্ত্বনার সব কিছুই অদ্ভুত। সান্ত্বনা গভীর বিস্ময়ে শঙ্করীর দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, এই শঙ্করী, কি

করছিস রে?

শঙ্করী কোনো উত্তর দিল না। দাড়িওয়ালা লোকটি লুব্ধভাবে হেসে বললো, এ কে?

সান্ত্বনা লোকটির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে অপলকভাবে কয়েক মুহূর্ত দেখলো। তারপর বললো, শঙ্করী, চলে আয়! এ লোকটা ভালো নয়?

লোকটি খপ করে সান্ত্বনার হাত চেপে ধরে বললো, তুমিও বসো না!

শঙ্করী হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো। লোকটি বেখাপ্পাভাবে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই সান্ত্বনা নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, শঙ্করী, তুই এত অসভ্য কেন রে? ছিঃ, তোর লজ্জা করে না?

গ্রামে এইসব ঘটনা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু সান্ত্বনার চরিত্রের মধ্যে খানিকটা অস্বাভাবিকত্ব আছে। এই রকম আরও দু'একটা ব্যাপারের পর অনেকেই সান্ত্বনাকে পাগল মনে করতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে সেই সব কথা এসে পেঁৗছোলো হিমানীর কাছে। হিমানী প্রথমে কোনো গুরুত্ব দেননি। কিন্তু একদিন মাঝ রাত্তিরে সান্ত্বনা বিছানায় উঠে বসে বললো, মা, আমায় ডাকছে! আমায় ডাকছে!

হিমানী জিজ্ঞেস করলেন, কে? কে?

সান্ত্বনা বললো, সেই দাড়িওয়ালা লোকটা!

সান্ত্বনার দাঁতে দাঁত লেগে গেছে, চামচ দিয়েও তার মুখ ফাঁক করা যায় না। পাড়া প্রতিবেশীরা এসে মত প্রকাশ করলো, সান্ত্বনাকে ভূতে ভর করেছে।

সেই নিয়ে অনেক কান্ড চললো। চিররঞ্জন ভূত প্রেত বিশ্বাস করেন না। তিনি ঠিক করে ফেললেন, মেয়েকে বাঁচাতে হলে কলকাতায় নিয়ে যেতেই হবে। তাছাড়া, এখানে আর সংসার চলছে না। কলকাতায় তবু একটা আশ্রয় আছে। আবার বাক্স বিছানা বাঁধা ছাঁদা শুরু হয়ে গেল।

॥ ৪৮ ॥

মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের গেট থেকে বড়বাবু আস্তে আস্তে ফিরে যাচ্ছেন। আজও সূর্যর সঙ্গে দেখা হলো না।

বড়বাবুর দৃষ্টি কোনো দিকে নেই, মুখ নীচু করা। হাতের চুরুটটা অনেকক্ষণ নিভে গেছে, ধরাবার কথা মনে নেই। কিছুদূরে সাইকেল রিক্সা স্ট্যাণ্ডের কাছে আসতেই তিন চারটে রিক্সা এগিয়ে এলো তাঁর দিকে। সবাই তাঁকে নিতে চায়। বড়বাবু একটাতে চড়ে বসলেন, কোথায় যাবেন তা বলতে হলো না—রিক্সা ছুটতে লাগলো। এই কয়েক মাসেই বড়বাবু এই শহরে বেশ পরিচিত হয়ে গেছেন। অনেকেই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে উৎসুক।

রিক্সা এসে থামলো একটা সাদা রঙের নতুন একতলা বাড়ির সামনে। এ শহরে ভালো হোটেল নেই বলে বড়বাবু এই বাড়িটা ভাড়া নিয়ে রেখেছেন। বাড়িটার পেছনেই একটা মস্তবড় দিঘি, দিঘিতে এক ঝাঁক হাঁস।

একজন মাঝ বয়েসী লোক বড়বাবুর জন্য রান্নাবান্না করে। সে এসে বললো, বাবু, বেলা তো অনেক হয়ে গেল, খাবেন না।

বড়বাবু শুকনো গলায় বললেন, দাও!

—দাদাবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

বড়বাবু দু' দিকে মাথা নাড়লেন।

—দাদাবাবুর খাবার নিয়ে যেতে দেবে?

—না।

মেঝেতে আসন পেতে জল ছিটিয়ে বড়বাবুর খাবার জায়গা করে দেওয়া হলো। লোকটি রান্নায় একেবারেই পারদর্শী নয়। শুকনো কড়কড়ে ভাত, ছাকরা ছাকরা খেসারীর ডাল, কালো রঙের কি একটা তরকারী আর মাছ।

বড়বাবু খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে একটিও মন্তব্য করলেন না। সামান্য কিছু মুখে দিলেন। লোকটি সর্বক্ষণ কাছাকাছি বসে থেকে নানা রকম মন্তব্য করে গেল, বড়বাবু উত্তর দিচ্ছিলেন একটি বা দুটি শব্দে।

খাওয়া শেষ হতেই লোকটি বড়বাবুর সামনে পান এগিয়ে দিল। বড়বাবু পান মুখে দিয়ে বললেন, তুমি এবার যাও, আমার আর কিছু লাগবে না।

লোকটি বললো, আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি হাওয়া করি। বড্ড গরম আজ।

বড়বাবু বললেন, তার দরকার নেই। আমি শোবো না।

একটা নতুন চৌকির ওপর বিছানা পাতা হয়েছে। ঘরের আসবাবপত্র অতি সামান্য, কিন্তু সব কিছুই নতুন বলে বেশ একটা পরিচ্ছন্নতার ভাব আছে। গত তিন চার মাস ধরে বড়বাবু প্রায়ই এসে এখানে থাকছেন।

এর মধ্যে মাত্র দু'বার সূর্যর সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর। সরকারের কাছ থেকে আর অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না। বড়বাবু তবু প্রতি সপ্তাহে এসে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এখানকার জেলার সুরথ চক্রবর্তীর কাকার এক বন্ধুকে তিনি এলাহাবাদে থাকার সময় চিনতেন। অনেক খুঁজে খুঁজে সেই সূত্র বার করে তিনি জেলারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। লোকটি খুব মুখ মিষ্টি এবং ধুরন্ধর। সাধারণ সময়ে তিনি এই সব লোককে কথা বলার যোগ্য বলেও মনে করেন না। অথচ এখন খাতির করে কথা বলতে হচ্ছে। জেলার সুরথ চক্রবর্তী বড়বাবুকে নিরাশ করছে না কিছুতেই, সব সময়ই জেল-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বেইলির নামে দোষ চাপাচ্ছে। বড়বাবু বেইলি সাহেবের সঙ্গেই দেখা করতে চান কিন্তু জেলার কিছুতেই সে ব্যবস্থা করবে না।

জেলার সুরথ চক্রবর্তী অত্যন্ত অর্থলোলুপ। কয়েদীদের বরাদ্দ থেকে বেশ মোটা অংশ তার নিজের বাড়িতেই আসে। বড়বাবু তার সঙ্গে একটা চেনাশুনো সম্পর্ক ধরে এলেও সে আকারে ইঙ্গিতে টাকা পয়সা খরচের প্রসঙ্গ তুলছে প্রথম দিন থেকেই। বড়বাবু জলের মতন টাকা খরচ করে যাচ্ছেন।

বড়বাবু জেলারের কোয়ার্টারেই দেখা করতে গিয়েছিলেন। লোকটি স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে থাকে, বাগান করার শখ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে সামান্যতম সমবেদনা নেই। বড়বাবুর সামনেই তাঁর ছেলের নামে গালমন্দ করে। এবং মাঝে মাঝে এমন ভাবে তাকায় যেন অধঃপতিত সন্তানের পিতা হিসেবে বড়বাবুও সমান অপরাধী।

এই কয়েকমাসেই বড়বাবু বুঝে গেছেন যে জেলখানায় কী রকম টাকার খেলা চলে। সুরথ চক্রবর্তীকে পুরো বিশ্বাস করতে পারেন না বলে আর একজন ওয়ার্ডারকেও তিনি নিয়মিত টাকা দিয়ে যাচ্ছেন, যাতে সূর্যর জন্য একটু ভালো খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সে সব কিছু সূর্যর কাছে পৌঁছেছে কিনা তা জানার কোনো উপায় নেই। মানুষের মধ্যে এমন চতুর শ্রেণীর মানুষও তো আছে,

যারা ঘুষও নেয় আবার কাজও করে না। চোর ডাকাতের সংস্পর্শে থাকতে থাকতে এদের অনেকেরই হৃদয় বলে কোনো পদার্থ নেই।

বড়বাবু জানলার কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে চুরুট ধরালেন। দিঘির হাঁসগুলো জলের ওপর সরল রেখা টেনে টেনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনো একদিকে তিনটি, আর এক দিকে তিনটি, আবার কখনো একদিকে পাঁচটা আর একটা অন্য দিকে একলা একলা—এই রকম নানা ডিজাইন তৈরি করে তারা দুপুর কাটায়। হাঁসের গলার বেশ জোর আছে, কিন্তু সহজে ডাকে না। চারদিক অসম্ভব নিস্তব্ধ।

যে লোকটি রান্না করে, সে দুটি ডেকচি হাতে নিয়ে দ্রুত বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। বোঝা যায়, ডেকচি দুটি বেশ ভারী। বড়বাবু তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিলেন—লোকটির সঙ্গে চোখাচোখি না হয়ে যায়। লোকটি এমনিতে ভালো, কিন্তু রোজই কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্য চুরি করে। হয়তো ওর সংসারে খুব অভাব, এ ছাড়া আর কী-ই বা করবে। চতুর্দিকে অন্নের জন্য হাহাকার পড়ে গেছে। এই যুদ্ধ দেশটাকে একেবারে ছারখার করে দিয়ে যাবে।

বালিশের তলা থেকে বড়বাবু একটা মোটা খাতা টেনে বার করলেন। ওল্টাতে লাগলেন কয়েকটি পাতা। তাঁর নিজের হাতের লেখা কিছু কিছু রয়েছে। খানিকক্ষণ বাইরের দিকে চুপ করে তাকিয়ে তিনি একটা নতুন পাতায় লিখতে শুরু করলেন।

৭ই জুন, ১৯৪৩

আজও ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। সূর্য আমার সহিত দেখা করিতে চাহে না।

মাসের পর মাস চেষ্টা করিতেছি তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য। জেলখানায় অসংখ্য নিয়মের গ্রন্থি শিথিল করিয়া আনিয়াছিলাম প্রায়। অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটনার পরিবর্তন হইল। এখন জেল কর্তৃপক্ষই সাগ্রহে আমার সহিত আমার পুত্রের সাক্ষাৎকার করাইয়া দিতে চাহে। কিন্তু সূর্য তাহাতে রাজি নয়।

না, এ জন্য সূর্যকে দোষ দিতে পারি না। দোষ দিতে হইলে আমাকেই দিতে হয়। আমার এই দৌর্বল্যে কাহারও গৌরব বৃদ্ধি হইবে না। যুক্তিতর্ক সবই জানি। তবু নিজের অন্তরকে বুঝ মানাইতে পারিতেছি না।

সূর্যর জেদ বড় বেশী। সে কাহারও কথা শুনিবে না। আমার অনুরোধেও সে কর্ণপাত করিবে না—এ কথাও আমি ভালোই জানি। জেলার সুরথ চক্রবর্তীর ধারণা আমি আমার ছেলেকে ফিরাইতে পারিব। আমিই বা কেন তাহাতে নাচিয়া উঠিতেছি?

উপবাসী পুত্রের মুখখানি বারবার আমার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। কতই বা তাহার বয়েস, এই কি উপবাসে থাকিবার সময়?

আজ লইয়া নয়দিন হইল, মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে সাতান্নজন বন্দী অনশন করিয়া আছে। সূর্যও তাহাদের মধ্যে একজন। অপর সকলে অনশন না ভাঙিলে সূর্য একলা ভাঙিতে পারে না—তাহা সঙ্গতও নয়। এ অন্যায় অনুরোধ আমি তাহাকে করিবই বা কিরূপে? আমি এই সুযোগে তাহার সঙ্গে শুধু একবার দেখা করিতে চাহিয়াছিলাম। অনশন ভাঙিবার অনুরোধ করিতাম না, নিজের চক্ষে দেখিয়া তাহার স্বাস্থ্যের অবস্থা বুঝিতাম। নানা লোকে নানা কথা বলিতেছে। অধিকাংশ লোকই বড় নীচ শ্রেণীর। নিজের চোখে না দেখিলে কিছুই বিশ্বাস নাই।

সূর্য নিশ্চয়ই আমাকে ভুল বুঝিয়াছে। সেই কারণেই আমার সহিত দেখা করিতে

কিছুতেই সম্মত হইতেছে না। সে ভাবিতেছে আমি তাহাকে অন্যায় অনুরোধ করিব। সে তাহার দলের লোকদের চোখে হেয় প্রতিপন্ন হইবে।

যে যাহাই বলুক, বাপ হইয়া আমি ছেলের এই অনশনের ব্যাপার কি করিয়া সমর্থন করিতে পারি? নয় দিন সে না খাইয়া আছে। একেই তো জেলখানায় পশুর খাদ্য দেয়। তাহার পর, দিনের পর দিন উপবাসে থাকিলে শরীর যে ভাঙিবে—সে ভাঙা কি আর কোনো দিন জোড়া লাগে? বিপ্লবীরাও মহাত্মা গান্ধীর অনুসৃত পথে অনশনকে একটি অস্ত্র করিতে চায়। লাহোরে যেবার রাজবন্দীরা দীর্ঘকাল ধরিয়া অনশন করিয়াছিল—সেবার সারা দেশে কি বিপুল উত্তেজনা। কার্য উপলক্ষে আমাকেও তখন লাহোরে যাইতে হইয়াছিল। তেষট্টি দিন অনশনের পর যতীন দাস প্রাণত্যাগ করিল, তবু পণত্যাগ করিল না। কলিকাতার যুবক যতীন দাস প্রাণ হারাইল লাহোরে—আমি তাহার মৃতদেহ এক ঝলকের জন্য দেখিয়াছিলাম। মানুষ বলিয়া চেনাই যায় না। বারবার সেই দৃশ্যটি মনে পড়িতেছে আর সূর্যর কথা ভাবিয়া বুক কাঁপিতেছে। যতীন দাসের পিতামাতার মনের অবস্থা কী রূপ হইয়াছিল—তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারিবে কি? মহাত্মা গান্ধীকে একটি টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছি—এই অনশনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য। কাগজে এখনো তাঁহার কোনো বিবৃতি দেখি নাই। গতকল্য ছোটলাটকেও একটি টেলিগ্রাম পাঠাইলাম।

কি করিয়া উহারা দিনের পর দিন না খাইয়া থাকিতে পারে? এত মনের জোর কোথা হইতে আসে? সূর্যর অনশনের সংবাদ পাইয়া আমিও খাওয়া-দাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। দুইদিন পরই আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, সব সময় বমি বমি ভাব, পায়ে জোর পাই না। আর দুই চারিদিন এইভাবে থাকিলে আমি আর বাঁচিতাম না। আমি এখন মরিলে সূর্যর কী হইবে তাহা জানিয়া যাইতে পারিব না।

কংগ্রেসী সত্যাগ্রহী ছাড়া আর কাহাকেও রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দেয় নাই। সূর্য এবং তাহার মতন অনেককে আন্ডার ট্রায়াল সি ক্লাশ প্রিজনার করিয়া রাখিয়াছে। দস্যু, প্রতারক ও নারী নির্যাতনকারীদের সমপর্যায়ভুক্ত। টুকরা টুকরা যাহা খবর শুনিতে পাই—তাহাতেই বুঝিতে পারি যে অকথ্য অত্যাচার হয় উহাদের উপর। খাওয়ার জন্য সরকারের যাহা সামান্য বরাদ্দ আছে, তাহার সিকিভাগও উহাদের ভাগ্যে জোটে না। রাত্রি বারোটার সময় ঘরের বাহিরে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিতে হয়—সেই সময় একবার সংখ্যা গণনা হয়। ইহার মধ্যেই দুইবার জেলের মধ্যে বিশৃঙ্খলার অজুহাতে লাঠি চার্জ করিয়া কয়েদীদের উত্তম মধ্যম দিয়াছে। কয়েকজনের নাকি হাত পা ভাঙিয়াছে। তদন্ত কমিশন বসিবে তো শুনিতেছি। বেয়াল্লিশের দাঙ্গায় সরকারের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে—তাই ইহাদের প্রতি সরকার কোনো দয়ামায়া দেখাইতে রাজি নয়। বাধ্য হইয়াই উহারা অনশনে নামিয়াছে।

কিন্তু কে যে ইহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার করিবে, তাহাও তো বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কংগ্রেস ইহাদের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করিয়াছে এবং প্রকাশ্যে ইহাদের সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে। বাংলায় এখন মুশলীম লীগ সরকার—তাহাদের কোনো মাথা ব্যথা নাই স্বদেশী যুবকদের জন্য। অনশন ভঙ্গ করাইবার জন্য জোর জুলুমের আশ্রয় লইতেছে। মাটিতে শোওয়াইয়া জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া মুখে খাদ্যদ্রব্য ঢুকাইতে চায়। নাকের মধ্যে নল ভরিয়া দেয়। জলের কলসেও জল না রাখিয়া ঘোল কিংবা দুধ রাখিয়া দেয়—নিদারুণ জল তৃষ্ণা পাইলেও অনশনকারীরা জল পান করিতে পারে না। নিজেরাই সব কলস ভাঙিয়া ফেলিতেছে—এ সব ভাবিতে

গেলেও বুক কাঁপে।

বিচার কবে শেষ হইবে, তাহাও জানি না। হাজার হাজার বন্দীতে কারাকক্ষগুলি ভর্তি—ইহাদের বিচার পর্ব নমো নমো করিয়া শেষ করিতেও দীর্ঘদিন লাগিয়া যাইবে। আবার শুনিতেছি, ইহাদের অন্য কোনো জেলে স্থানান্তরিত করিবে। সেই স্থানটি যে কোথায় সে সংবাদ এখনো সংগ্রহ করিতে পারি নাই। সূর্যকে যেদিন আদালতে আনে, সেদিন একটি অদ্ভুত কথা শুনিয়াছিলাম। দলীয় কার্যের সময় ইহাদের প্রত্যেকেরই কয়েকটি ছদ্মনাম থাকে। সূর্যর নাম বলিয়াছিল, সূর্যকুমার ভাদুড়ী অ্যালিয়াস অমর অ্যালিয়াস কুইক সিলভার। যখন ঘোষিত হইল যে উহার বাবার নামও অমর, তখন আদালতে একদল লোক উচ্চহাস্য করিয়াছিল। বাবার নামটিই ছেলে নিজের ছদ্মনাম লইয়াছে। আমিও একটু অবাক হইয়াছিলাম। ছেলের মনের গতি যে কোন্‌দিকে, তাহা বুঝিতে পারি না। অবশ্য বিলাতে অনেক সময় পিতা ও পুত্রের একই নাম হয়—সিনিয়র জুনিয়র হিসাবে পরিচিত থাকে।

জেলার সুরথ চক্রবর্তীর কোন কথাটা সত্য, কোন কথাটা মিথ্যা—তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। সূর্য সম্পর্কে সে আমাকে প্রায়ই অকথা কুকথা শুনায়। সূর্যকে সে ক্রিমিনাল মাইণ্ডেড প্রতিপন্ন না করিয়া ছাড়িবে না। সূর্য নাকি কাহারও সহিত কখনো ভালোভাবে কথা বলে না। ইহার মধ্যেই তাহাকে তিনবার ঠাণ্ডা বেড়ি পরাইয়া সেলে রাখিয়াছে। সেল কাহাকে বলে, জানি না। সুরথ চক্রবর্তীর একটি দশ এগারো বছরের পুত্র আছে, ভারী সুন্দর চেহারা। ছেলেটি মধ্যে মধ্যে তাহার বাবার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। সুরথ চক্রবর্তী তাহার ছেলেকে আদর করিতে করিতেই আমার সম্মুখে সূর্যর নামে গালাগালি করে। সে নিজে পিতা হইয়া অপর একজন পিতার হৃদয়ে আঘাত দিতে দ্বিধা করে না। মানুষ কত প্রকার হয়! সে একবারও ভাবে না যে সূর্য অনেক আরামে বিলাস বহুল জীবন যাপন করিতে পারিত—এত কষ্ট যে সে স্বীকার করিতেছে, প্রাণের মায়াও তুচ্ছ করিয়াছে—তাহা শুধু এই দেশকে শৃঙ্খল মুক্ত করিবার জন্য। যে দেশ আমার এবং সুরথ চক্রবর্তীরও। এক একবার মনে হয়, গত বছরের হাঙ্গামায় আমিও কেন নিজে জড়াইয়া পড়িলাম না! তাহা হইলে হয়তো জেলখানায় সূর্যর সহিত এক সঙ্গে থাকিতে পারিতাম। সে যে কষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহা কি আমারও প্রাপ্য ছিল না?

মধ্যে কিছুদিন এক সি আই ডি'র পাল্লায় পড়িয়াছিলাম। সে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া ছাড়িয়াছিল। সূর্যর সহচরবৃন্দ এবং দলের লোকদের সম্পর্কে খবরাখবর জানাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। আমি তো সত্যই কিছু জানি না। বলিব কি করিয়া। সূর্য সম্পর্কে কোনো প্রকার কলঙ্ক দিতেই সে বাকি রাখে নাই। দেশ সেবার জন্য নয়, দুশ্চরিত্রতা এবং গুণ্ডামির প্রবৃত্তি বশেই নাকি সূর্য এইসব কার্য করিয়াছে। সি আই ডি-টি বলিল, সূর্য নাকি কোন্ গ্রামের এক চাষীর কন্যাকে এবং পরে একজন সহকর্মীর স্ত্রীকে বলাৎকার করিয়াছে এবং ডাকাতির টাকায় ফুর্তি করিয়াছে। এইরূপ জঘন্য মিথ্যাও মানুষের মুখে আসে। এই বৃদ্ধ বয়েসেও শরীর ক্রোধে জ্বলিয়া ওঠে—ইচ্ছা হয় লোকটির মাথা দেয়ালে ঠুকিয়া ভাঙিয়া দিই।

আমি বেশী দুর্বল হইয়া পড়িতেছি। এত দুর্বলতায় কোনো দিকেই লাভ নাই। আমার তো একার ছেলে নয়—আরও কত বাপ মায়ের স্নেহের দুলাল জেল খাটিতেছে, ফাঁসীর দড়ি গলায় দিয়াছে। আমি এতটা উতলা হইব কেন? কিংবা অন্য পিতা-মাতাদের মনের অবস্থাও এরূপ হয়? একটা বয়েস আসিলে সন্তানের সঙ্গে স্নেহের

বন্ধন একটু একটু আলগা করিয়া দিতে হয়। নহিলে দুঃখের বোঝা বাড়ে। সন্তান দূরে চলিয়া যাইবেই। সূর্য সম্পর্কে আমার যে এতখানি মায়ার বন্ধন ছিল—নিজেও কখনো জানিতে পারি নাই। বাল্যকাল হইতেই তাহাকে বোর্ডিং-এ রাখিয়াছি, নিজে আপন খেয়ালে ঘুরিয়াছি। সূর্যর জন্য ব্যারিস্টার নিয়োগ করিয়াই যদি কর্তব্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম! কিন্তু রাত্রিরে ঘুমাইতে পারি না। বারবার মনে পড়ে, সারা পৃথিবীতে সূর্য ছাড়া আমার আর কেহ নাই। আমার কেহ নাই! নিজের পিতাকে দেখি নাই, মাতাকে জন্মের দিনে হারাইয়াছি, পত্নীদ্বয় অকালে আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, বড় মা-ও নাই, একে একে সকলে ছাড়িয়া গিয়াছেন। আর যে কয়দিন বাঁচিব, কাহাকে লইয়া বাঁচিব? আমি ছাড়া এ পৃথিবীতে সূর্যরও আর কেহই প্রকৃত আপনজন নাই। কিন্তু তাহার বয়েস অল্প, যদি জেলখানা হইতে বাহির হইতে পারে সে একা হইয়াও রক্তের তেজে বাঁচিতে পারে। কিন্তু আমি? সি আই ডি-টি আভাস দিয়াছিল, সূর্যর ফাঁসীর দণ্ড হওয়াই অবধারিত—যদি তা নাও হয়, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইবেই। এ জীবনে সে কিছুই পাইল না।

সূর্য এত জেদী হইল কি করিয়া? আমার চরিত্র তো সে পায় নাই। যুবা বয়েসে আমিও কম জেদী ছিলাম না—কিন্তু লোকজনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার ক্ষমতা আমার ছিল। ব্যবসায়ের সূত্রে নানা লোকের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছে—অনেক ক্ষেত্রে আমাকে বাধ্য হইয়া মত পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। না, ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিতে গেলে সূর্যর মায়ের সঙ্গেই তাহার একটা অন্তর্নিহিত মিল আছে। বুলবুল বাহিরে হাসিখুশী ও ছেলেমানুষীতে ভরা থাকিলেও কি অসম্ভব ছিল যে তাহার জেদ—তাহা আমিই শুধু জানি। তাহার ক্রোধ কিংবা অভিমান এত তীব্র ছিল যে বাহিরের কাহাকেও সে বুঝিতে দিত না। আমার উপর কতখানি অভিমান তাহার জন্মাইয়াছিল যে তাহার পরেও সে পূর্ণিমার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলিয়াছে এবং বিষ খাইয়া মরিয়াছে। বুলবুল, বুলবুল, তুমি কি আমাকে ক্ষমা করিতে পারিতে না? নারী চরিত্র আমি বুঝি না, আমি তোমাকেও বুঝিতে পারি নাই। সেই অপরাধে আমাকে এত গুরুতর শাস্তি দান করিলে?

মনে হইতেছে যেন বুলবুল আমার চোখের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এতগুলি বছর কাটিয়া গেল, তবু তাহার মুখচ্ছবি এতটুকু মলিন হয় নাই। স্মৃতিপটে সে চিরযুবতী থাকিবা যাইবে।

বুলবুলের সহিত আমার সম্পর্কের কথা এখন আর বিশেষ কেহ জানে না। জানিলেও কেহ সে প্রসংগ তোলে না। লোক চক্ষে উহা শুধু আমার জীবনের একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়। আমি কখনো সেরূপ মনে করি নাই। বুলবুলকে ভালো বাসিয়াছিলাম বলিয়া আমি কখনো অনুতাপ করিব না। নিজের স্ত্রীকে সাময়িক কষ্ট দিয়াছি বটে কিন্তু বুলবুলকে ভালো না বাসিয়া আমার উপায় ছিল না। এক একজন মানুষের জীবনে ধ্রুবতারার মতন একটি নারী আসে। বুলবুল আমার সেই ধ্রুবতারা। বুলবুলকে বলিয়াছিলাম, তোমার হাতের মুঠোয় আমার ভবিষ্যৎ তুলিয়া লও। শুধু রূপমুগ্ধ হইয়া এই কথা বলি নাই—সে আমার হৃদয়সর্বস্ব ছিল। তবু আমার পথ ভুল হইল। বুলবুল, তুমি আমাকে আর একবার সুযোগ দিলে না কেন? নিজে মরিয়া এ কি নির্মম প্রতিশোধ লইলে? সারা জীবন আমি অপরাধী হইয়া রহিলাম। তোমার সন্তান—আমি তাহার জন্য কিছুই করি নাই। জানি না স্বর্গ কিংবা বেহেস্ত বলিয়া কিছু আছে কিনা—তুমি কি সেথা হইতে সব দেখিতেছ?”

বড়বাবুর হাত থেকে কলম পড়ে গেল। তিনি খাতা বন্ধ করে গুম হয়ে বসে রইলেন।

বড়বাবুর সঙ্গে সূর্যর আর একবার দেখা হলো রেল স্টেশনে। সাতজন কয়েদীকে এই জেল থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। খবর পেয়ে বড়বাবু আগে থেকেই রেল স্টেশনে এসে বসেছিলেন।

মাত্র সাতজন কয়েদীকে নিয়ে যাবার জন্য প্রায় দু' ডজন সেপাই ঘিরে আছে। কয়েদীদের প্রত্যেকের হাতে হাতকড়া এবং কোমড়ে দাঁড় বাঁধা। এদের দেখবার জন্য স্টেশন কয়েক মুহূর্তেই মানুষের ভিড়ে ছয়লাপ হয়ে গেল। সেপাইরা হঠ যাও হঠ যাও বলে চ্যাঁচালেও লোকে কাছাকাছি গিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে, ওদের নানা রকম প্রশ্ন করছে। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করছে, দাদা, আপনাদের নাম কি? জয়প্রকাশ নারায়ণ কি সত্যিই ধরা পড়েছেন? জেলে আপনাদের কি খেতে দেয়? কেউ কেউ আর একটু দুঃসাহসী হয়ে বলছে, দাদা, আপনাদের কারুর বাড়িতে কোনো খবর দেওয়ার থাকিলে চেঁচিয়ে বলে দিন। আমরা খবর পোঁছে দেবো।

অত ভিড় ঠেলে বড়বাবু কাছে যেতে পারবেন না। তিনি অন্য একটি উপায় বার করলেন। কয়েদীদের যখন ওভারব্রীজে তোলা হলো, বড়বাবু দ্রুত লাইনের ওপার দিয়ে অন্যদিকে গিয়ে ওভার ব্রীজের উল্টো দিক থেকে আসতে লাগলেন।

ঐ সাতজনের মধ্যে একজন ছাড়া নাকি সবারই বয়েস আঠারো থেকে পঁচিশের মধ্যে। বাকি লোকটির বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। কেউ কোনো কথা বলছে না। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চুল রুক্ষ, চোখ জ্বলজ্বলে। এদের মধ্যে দুজনের হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা।

সূর্যর ঠিক মুখোমুখি এসে বড়বাবু কোন কথা বলতে পারলেন না। শব্দ আটকে গেল। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন ছেলের দিকে।

সূর্য মুখ তুলে বাবাকে দেখে শান্ত ভাবে বললো, বাবা, আমি ভালো আছি। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।

বড়বাবু ভালো করে নিশ্বাস নিয়ে বললেন, তুই, তোরা কোথায় যাচ্ছিস?

—সে কথা আমাদের বলে নি।

—তোর হাত...ব্যান্ডেজ...কি হয়েছে?

—বিশেষ কিছু না। সামান্য মচকে গেছে—দু' একদিনেই ঠিক হয়ে যাবে।

সেপাইরা পেছন থেকে গুঁতো দিচ্ছে। সূর্য আবার চলতে লাগলো। বড়বাবুও তার পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, তোরা কোনো কিছু স্বীকার করবি না—আমি আরও বড় ব্যারিস্টার লাগাবো—

সূর্য মুখ নীচু করে জানালো, আপনি ওসব কথা নিয়ে বেশী চিন্তা করবেন না.

একজন আই বি'র লোক বড়বাবুর পাশে এসে বললো, এদের সঙ্গে কথা বলা তো বে-আইনী। আপনি কি এদের কারুর আত্মীয় হন।

—আমি এর বাবা।

—তাহলে প্রপার চ্যানেলে অ্যাপ্লাই করুন ইণ্টারভিউর জন্য।

বড়বাবু রেগে গিয়ে বললেন, আমাকে আর প্রপার চ্যানেল দেখাবেন না মশাই। ও আমার ঢের জানা আছে।

—এখন এখান থেকে সরে যান!

—ওভার ব্রীজ দিয়ে হাঁটাও কি বে-আইনী?

কথা না বলে বড়বাবু সূর্যর সঙ্গে এলেন কিছু দূরে। হঠাৎ তাঁর দারুন ইচ্ছে হলো ছেলের শরীরটা একবার ছুঁতে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতেও হাতকড়ি পরিয়েছে—এদের শরীরে কি দয়ামায়া বলে কিছুই নেই।

সূর্য নিজে থেকে কিছুই জিজ্ঞেস করলো না, কারুর খোঁজ খবরও জানতে চাইলো না। মাঝে মাঝে সে শুধু বাবার চোখের দিকে তাকাচ্ছে। বড়বাবু আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না—হাত বাড়িয়ে দিলেন সূর্যকে একবার ছোঁবার জন্য।

আই বি'র লোকটি এক ঝটকায় বড়বাবুর হাত সরিয়ে দিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বললো, কি হচ্ছে কি?

এরকম অপমানজনক পরিস্থিতি বড়বাবুর জীবনে কখনো আসে নি। তিনি অপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সেইখান থেকেই যতক্ষণ দেখা যায়, দেখতে লাগলেন সূর্যকে।

॥ ৪৯ ॥

চিররঞ্জন শিয়ালদা স্টেশনে এসে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়লেন। আসবার আগে তাঁর দাদা প্রিয়রঞ্জন এবং বড়বাবুকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন তাঁর কলকাতায় আসার কথা। তিনি আশা করেছিলেন কলকাতায় কারুকে দেখতে পাবেন। কিন্তু চিররঞ্জন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দুর্বলতায় দু'জনের কারুর কাছেই উল্লেখ করেন নি যে ঠিক কার বাড়িতে উঠবেন। এর আগে বড়বাবুর কাছে থাকলেও প্রিয়রঞ্জন নিজের বাড়িতে চলে আসবার জন্য ভাইকে অনেকবার বলেছিলেন। চিররঞ্জন মনঃস্থির করতে পারেন না। বড়বাবুর সঙ্গেই তাঁর মনের মিল—আবার নিজের দাদার ইচ্ছে-অনিচ্ছেও অগ্রাহ্য করতে পারেন না।

শিয়ালদা স্টেশনে নিজের ছোট্ট পরিবারটি নিয়ে চিররঞ্জন দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি এই পরিবারের অধিপতি, কিন্তু এর ভার বহন করার মতন যোগ্যতা তিনি সারাজীবনে অর্জন করতে পারলেন না। সঙ্গে অসুস্থ মেয়ে, মুখ-ভার করা স্ত্রী এবং ছটফটে কিশোর পুত্র—এদের জন্য এই পৃথিবীতে একটি যোগ্য স্থান সংগ্রহ করার দায়িত্ব চিররঞ্জনেরই। তিনি অনুভূতিহীন মানুষ নন, এই দায়িত্বের কথা বোঝেন বেশ ভালোভাবেই—এবং নিজের অসামর্থ্যের জন্য দুঃখ তাঁরই বেশী।

শিয়ালদা স্টেশনে তিনি নির্দিষ্ট করে কারুকে আসতে লেখেন নি, অথচ কেউ আসে নি বলে তিনি দুঃখিত! এই ধরনের মানুষেরা সারাজীবনই দুঃখ পেয়ে যায়।

যদিও দাদার বাড়িই স্টেশন থেকে বেশী কাছে, তবু চিররঞ্জন একটা থার্ড ক্লাশ ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া নিয়ে চললেন বিবেকানন্দ রোডের দিকে। হিমানীর মুখখানা থমথমে। কলকাতায় আসার একটুও ইচ্ছে ছিল না তাঁর। তিনি বারবার চেয়েছিলেন বাপের বাড়ি চলে যেতে—চিররঞ্জনের যদি সেখানে থাকতে ইচ্ছে না হয়, তাহলে তিনি একা কলকাতায় আসতে পারতেন! চিররঞ্জন এ প্রস্তাবে রাজি হননি, মেয়েকে তিনি তার গ্রামে ফেলে রাখতে চান না—মেয়ের চিকিৎসা কলকাতাতেই হওয়া দরকার।

ঘোড়ার গাড়ির জানলা দিয়ে বাদল উৎসুক ভাবে কলকাতা শহর দেখছে। প্রথম যেবার সে কলকাতায় এসেছিল, তখন সে খুবই ছোট—সে কথা তার স্পষ্ট মনে পড়ে না। এবারের কলকাতাকে সে দু' চোখ দিয়ে যেন গিলছে। কত চেনা আর কত আপন

মনে হয়। এই শহর ছেড়ে সে কত দূরে চলে গিয়েছিল, ভেবেছিল আর বুঝি কোনোদিন ফেরাই হবে না এখানে। রাস্তার পাশে যত দোকানের সাইনবোর্ড সে পড়তে পড়তে যাচ্ছে। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, সাইনবোর্ডগুলোর দিকে তাকালে অক্ষরগুলো পড়তেই হয়। তাকাচ্ছি অথচ পড়ছি না—এ কিছুতেই হবে না। ট্রামের ঠন্ ঠন্ আওয়াজ, রিকশার ঠুং ঠাং, ঘোড়ার গাড়ির কপ্ কপ্, সাইকেলের ক্রিং ক্রিং, বাসের প'ক্ প'ক্, ফেরিওয়ালার লে লে বাবু ছআনা, এই সব মিলিয়েই কলকাতা।

বড়বাবুর বাড়ির সামনে গাড়ি থামবার পর ওরা সবাই হকচকিয়ে গেল। বাড়িটা আর চেনাই যায় না। বসবার ঘরের দেয়াল ভেঙে সেখান থেকে আর একটা দরজা বার করা হয়েছে—সেখানে সিভিল সাপ্লাই অফিসের নানা লোক কাজে ব্যস্ত। ভাঁড়ার ঘর, রান্না ঘরেও অফিস, উঠোনটা টিন দিয়ে ঢাকা, সেখানে অনেক মালপত্র ডাঁই করে রাখা। দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির মুখে আর একটা নতুন লোহার দরজা বসেছে, সেটাতে মস্ত বড় তালা লাগানো।

সিভিল সাপ্লাই অফিসের লোকরা ওদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না। জিজ্ঞেস করলেও কেউ কিছু বলতে পারে না। একটু বাদে একজন পুরোনো চাকরের সন্ধান পাওয়া গেল, সে জানালো যে বড়বাবু কলকাতায় নেই। তিনি প্রায়ই আজকাল থাকেন না। সিঁড়ির দরজার তালার চাবি তার কাছে নেই, তবে পাশের বাড়িটাও খালি পড়ে আছে, সে বাড়িতে সে বাবুদের থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

চিররঞ্জন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বড়বাবু কবে আন্দাজ ফিরতে পারেন?

এ সম্পর্কেও চাকরটি কিছু জানে না। দু' দিন বাদেও ফিরতে পারেন, দশ দিন বাদেও ফিরতে পারেন। আজকাল এই রকমই চলছে।

এ রকম অনির্দিষ্ট অবস্থায় এখানে থাকার কোনো মানে হয় না। মালপত্র দু' চারটে যা নেমেছিল, আবার সেগুলো তুলে ঘোড়ার গাড়ি চললো, তালতলায়। মালপত্র সমেত কোনো বাড়িতে এসে আবার সেখান থেকে ফিরে যাবার মধ্যে একটা দীনতা আছে। ওদের চোখে মুখে এখন সেই দীনতার চিহ্ন—যা ট্রেন জার্নির ধকল ছাপিয়েও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রিয়রঞ্জনের বাড়িতে এসে দেখা গেল, ওদের জন্য সেদিনকার রান্না পর্যন্ত হয়ে আছে। শিয়ালদা থেকে এসে ওরা সোজা এ বাড়িতেই চলে আসবে—এইটাই তো স্বাভাবিক। চিররঞ্জন যে আগে বড়বাবুর বাড়িতে গিয়েছিলেন, সেটা আর উল্লেখ করলেন না।

প্রিয়রঞ্জনের বাড়ি একেবারে জমজমাট। যুদ্ধের বাজারে তাঁর ব্যবসা একেবারে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। কাগজের অনটনের ফলে লোকে এখন বালি কাগজ ব্যবহার করে। ইস্কুল কলেজে ছেলেমেয়েরা এখন পেন্সিলে লেখা কাগজে আবার কলম দিয়ে লেখে। আলপিন পর্যন্ত বাজার থেকে উধাও, তার বদলে বাবলা কাঁটা দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে অফিসে অফিসে। প্রিয়রঞ্জনের ব্যবসায় কর্মচারী বেড়েছে, মৌলালিতে একটা বিরাট গুদাম নিয়েছে, নিজের বাড়িতেই একটা অফিস খুলেছেন। প্রিয়রঞ্জন আর দোকানে যান না, বাড়িতেই বসেন, টেলিফোন এনেছেন কর্মচারীরা অনবরত আসছে যাচ্ছে।

প্রিয়রঞ্জন ভাইকে সস্নেহ ধমক দিয়ে বললেন, এতদিন গ্রামে পড়েছিলি কেন? যুদ্ধের বাজারে কত দিকে কত কাজ—এ সময়ে গ্রামে বসে থেকে কি হাড়ে দুর্বোর চাষ করছিলি? আজ থেকেই আমার অফিসে বসে যা। নিজের লোক থাকতেও আমাকে

মাইনে করা লোকের ওপর ভরসা করতে হয়। বিশ্বাসী লোক পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা?

প্রিয়রঞ্জনের মেয়ে জামাই এসেছে খড়্গপুর থেকে। সেই জন্য বাড়ির ওপর তলায় সব সময় একটা খুশীর আবহাওয়া। কলের গান বাজিয়ে সিরাজদ্দৌল্লা পালা শোনা হচ্ছিল, বাদলদের আসবার খবর শুনে সবাই হই চই করে নেমে এলো।

বিয়ের পর বাদল শ্রীলেখাকে এই প্রথম দেখলো। একটু যেন বদলে গেছে শ্রীলেখা। আগের তুলনায় তাকে রোগা আর লম্বা দেখায়, সিঁথিতে মোটা করে আঁকা সিঁদুর। আরও কিছু একটা পরিবর্তন ছিল তার শরীরে, বাদল লক্ষ্য করে নি। শ্রীলেখা নীচু হয়ে প্রণাম করলো চিররঞ্জন আর হিমানীকে—হিমানী তার থুতনি ধরে বললেন, ওমা, তোর বাচ্চা হবে—একটা খবরও দিস নি? ক' মাস?

শ্রীলেখা সান্ত্বনার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো এই, তোর কি হয়েছে? মুখখানা এত শুকনো কেন?

সান্ত্বনা খুব পরিষ্কার গলায় বললো, আমি পাগল হয়ে গেছি!

তাই শুনে শ্রীলেখার ছোট দুই বোন শান্তি আর পান্তি হেসে গড়িয়ে পড়লো। শ্রীলেখা হাসতে পারলো না। তার মুখে শঙ্কার ছায়া। সে হিমানীকে জিজ্ঞেস করলো, কাকীমা, ওর কি হয়েছে? খুকু ও রকম করছে কেন?

হিমানী ফ্যাকাসে ভাবে হেসে বললেন, কিছু হয়নি। ও মেয়ের ঐ রকম খেয়াল। জানিস তো কি রকম খেয়ালী।

শ্রীলেখা সান্ত্বনাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল নিজের ঘরে। খাটে বসিয়ে নানা রকম প্রশ্ন করতে করতে হঠাৎ তার চোখ পড়লো দরজার কাছে বাদল দাঁড়িয়ে আছে। হাফ প্যাণ্ট, হাফশার্ট আর কেডসের জুতো পরা, হঠাৎ লম্বা হয়ে উঠছে বলে তার দাঁড়াবার ভঙ্গিটা একটু বিচিত্র।

শ্রীলেখা বললো, এই বাদলা, ওখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, ভেতরে আয়!

বাদল বললো, বড়দি, তুমি এতক্ষণ আমার সঙ্গে একটাও কথা বলো নি?

শ্রীলেখা অবাক হয়েও হেসে ফেললো! তারপর বললো, ওমা, সেইজন্য আবার ছেলের রাগ হয়েছে বুঝি! তুই কেন আমার সঙ্গে আগে কথা বলিস নি? আমাকে প্রণাম করেছিস?

বাদল কাছে আসতেই শ্রীলেখা তাকে জড়িয়ে ধরে বললো, ইস্, কতদিন তোদের দেখিনি রে!

প্রভাসকুমার এলেন একটু পরে। এমনিতেই তিনি স্বল্পভাষী, তা ছাড়া এ বাড়ির কারুর সঙ্গে তাঁর কথা বলার মতন বিষয় বেশী নেই, তাই তিনি লাজুক মানুষের মতন চুপ করেই থাকেন আর সব সময় মুচকি মুচকি হাসেন। বাচ্চাদের সঙ্গেও তিনি সহজভাবে মিশতে পারেন না।

জামাইবাবু সম্পর্কে বাদলের একটু একটু ভয়ের ভাব ছিল। দু-তিন দিন কাটবার পর সে বুঝলো, ভয় পাবার মতন কিছু নয়। ডবল এম এ পাশ লোকরাও সাধারণ মানুষের মতন কথা বলে এবং গরম চা ডিসে ঢেলে খায়।

প্রভাসকুমার কৌতূহলী হয়ে উঠলেন সান্ত্বনা সম্পর্কে। তিনি সান্ত্বনার সামনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা করে যান। ভূতে পাওয়ার ব্যাপারটা তাঁকে খুবই আকৃষ্ট করেছে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে খুঁজেছিলেন এমন একজনকে যে নিজের চোখে ভূত দেখেছে কিংবা ভূত সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে।

প্রভাসকুমারের এই বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যটি অবশ্য খুব নিরিবিলিতে হয় না। বাড়িসুদ্ধ লোক সেই সময় ওদের ঘিরে থাকে। বাচ্চারা হাসে, গোলমাল করে। সান্ত্বনা কোনো কথারই প্রায় জবাব দিতে চায় না, চোখ সরু করে তাকিয়ে থাকে প্রভাসকুমারের দিকে। এক এক সময় সে এমন এক একটা কথা বলে যা শুনে সত্যিই হাসি সামলানো যায় না। যেমন সে বললো, দেশের সেই ভূতটা ছাগল সেজে কলকাতায় চলে এসেছে।

প্রভাসকুমার প্রশ্ন করলেন, কেন?

সান্ত্বনা বেশ দৃঢ়ভাবে বললো, আজ যে দেখলাম, একটা ছাগলের দাড়ি আছে!

অন্যরা হাসলেও প্রভাসকুমার হাসেন না। তিনি একটা মোটা খাতা এনেছেন সঙ্গে। সান্ত্বনা কিছু একটা কথা বললেই তিনি শ্রীলেখাকে নির্দেশ দেন, লিখে রাখো। এটাও লিখে রাখো! লিখতে লিখতে শ্রীলেখা এক সময় বিরক্ত হয়ে যায় কিংবা লজ্জা পায়। সে বাদলের হাতে খাতা-কলম তুলে দিয়ে বলে, তুই লেখ তো!

কিন্তু সান্ত্বনার অসুখটা ঠিক হাসি ঠাট্টার ব্যাপার নয়। সে জ্বলজ্বলে চোখে স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকে। তারপর অদ্ভুত ভাবে হাসে এবং মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। তখন তার দাঁতে দাঁত আটকে যায়।

প্রভাসকুমারের এক বন্ধুর দাদা ক্যাম্বেল হাসপাতালের বড় ডাক্তার। তিনি প্রতি-দিন আসছেন, সান্ত্বনার রোগটি মৃগী বলে সন্দেহ করছেন কিন্তু ওষুধে কাজ হচ্ছে না। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা, মনোবিশ্লেষণ সবই চলছে—সেই সঙ্গে একদিন হরি সঙ্কীর্তনের আসরও বসে গেল।

প্রভাসকুমারের সঙ্গে বাদলের আস্তে আস্তে ভাব হলো। বাদলের হাতের লেখা মেয়েলি ধরনের গোটা গোটা এবং বেশ স্পষ্ট। সেই হাতের লেখা প্রভাসকুমারের পছন্দ হলো, তিনি নিজেই ডেকে বাদলকে পড়াশুনো বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। বাদল গল্পের বইটই বেশ পড়েছে, সে 'কথা ও কাহিনী'র একাধিক কবিতা নির্ভুল মুখস্থ বলতে পারে। অতি উৎসাহের সঙ্গে সে "বন্দী বীর" আবৃত্তি করতে লাগলো। প্রভাসকুমার তাকে দেখিয়ে দিলেন, উঁহু, ও ভাবে নয়, ও ভাবে নয়। আরও আস্তে আস্তে, আরও টেনে 'পঞ্চনদীর তীরে'—বলবার সময় ডান হাতের পাঁচটা আঙুল ফাঁক করে দেখাবে, 'বেণী পাকাইয়া শিরে' বলবার সময় মাথায় চুলের ওপর হাত দিয়ে বেণীর মতন দেখিয়ে।

আবৃত্তি শেষ হলে তিনি বাদলকে প্রশ্ন করলেন, তুমি বড় হয়ে কি হবে?

বাদল মাথা চুলকোতে লাগলো। বড় হয়ে সে কি হবে? সে তো অনেক কিছু হবে। সে জাহাজে চেপে পৃথিবী ঘুরবে, সে এভারেস্টের চূড়ায় উঠবে, সে নতুন গ্রহ তারকা আবিষ্কার করবে। আরও কত কি? এর মধ্যে কোন্‌টা বলবে সে?

প্রভাসকুমার আবার বললেন, বড় হয়ে কি হবে, ঠিক করোনি?

বাদল আচমকা বলে ফেললো, ঘুড়ির দোকান করবো!

বাদলের ঘুড়ি ওড়াবার খুব শখ। এবার আসবার পর কেউ তাকে ঘুড়িলাটাই কিনে দেয়নি। তার পুরোনো লাটাই-সুতো বড়বাবুর বাড়িতে রয়ে গেছে। তার ধারণা, বড় হয়ে ঘুড়ির দোকান করলে কোনোদিন আর ঘুড়ির অভাব হবে না।

প্রভাসকুমার তাকে বললেন, বয়েসের তুলনায় তুমি অনেক ছোট আছো। ওসব কথা বলে না। এখন থেকেই ঠিক করে রাখো তুমি মানুষের মতন মানুষ হবে। তোমার দাদার মতন হতে ইচ্ছে করে না? সূর্যদা?

বাদল চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলো, আপনি সূর্যদাকে চেনেন?

—নিশ্চয়ই চিনি। তোমার সূর্যদা একজন বীর পুরুষ। একদিন সারা দেশের লোক ওকে চিনবে।

বাদল ঠিক যুক্তিটা জানে না, তার অবচেতন মনে এরকম একটা আশা গড়ে উঠেছিল যে সূর্যদা আর জামাইবাবুর পক্ষে পরস্পরকে সহ্য করা সম্ভব নয়। সূর্যদা ভীষণ রাগী, বড়দির বিয়ের সময় খুব রেগে গিয়েছিল, জামাইবাবুকে দেখলেই তো আরও রেগে যাবার কথা।

—সূর্যদাকে আপনি কোথায় দেখলেন?

—খড়্গপুরে আমাদের বাড়িতে এসে তো ছিল কয়েকদিন। আমার কথা যদি শুনতো, তা হলে পুলিসে ওকে ধরতেও পারতো না।

—সূর্যদাকে কি জেলখানায় মেরে ফেলেছে?

—যাঃ পাগল, মেরে ফেলবে কেন! ওর এখনো বিচার চলছে।

বাদল ছুটে চলে এলো শ্রীলেখার কাছে। উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করলো, বড়দি, সূর্যদা, তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিল?

শ্রীলেখা ত্রস্তে এদিক ওদিক তাকিয়ে বললো, চুপ, আস্তে কথা বলতে পারিস না? তোকে কে বললো?

—জামাইবাবু।

—হ্যাঁ গিয়েছিল। শোন্, সূর্যদার কথা জোরে জোরে সবাইকে শুনিয়ে বলতে নেই এখন।

—কেন, কি হয়েছে!

—সূর্যদাকে তো পুলিসে ধরেছে। এখন সূর্যদার কথা অন্য কেউ আলোচনা করলে তাদেরও পুলিসে ধরে নিয়ে যাবে। বাবা ওর কথা বলতে বারণ করেছেন।

সূর্যদা তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিল, আর তুমি ওকে আটকে রাখতে পারলে না, কেন ওকে পুলিসে ধরলো?

শ্রীলেখা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো বাদলের দিকে। ক্রমশ ভারী হয়ে এলো দৃষ্টি। খুব আস্তে আস্তে বললো, সূর্যদা কি কারুর কথা শোনে?

—সূর্যদা কি মরে যাবে? ফাঁসী হবে?

না, না, ছিঃ, ওকথা উচ্চারণ করতে নেই।

শ্রীলেখা আর নিজেকে সামলাতে পারলো না, দু' ফোঁটা জল নেমে এলো তার চোখ দিয়ে। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে বললো, বাদল, তুই আর আমি ছাড়া এ বাড়িতে আর কেউ সূর্যদাকে ভালবাসে না! উঃ, আমাদের বাড়িতে যখন এলো, কী চেহারা হয়েছিল, তুই দেখে চিনতেই পারতিস না। আস্তে আস্তে একটু ভালো হয়েছিল, সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল, পুলিসে ধরা পড়ার কোনো কথাই ছিল না, তবু ও একদিন চলে গেল।

—কেন চলে গেল?

—আমার জন্য।

—তুমি সূর্যদাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে?

না রে। আমি ওকে ধরে রাখতে চেয়েছিলুম, সেইজন্যই ও জোর করে চলে গেল। তুই এটা বুঝবি না।

বাদল সেই বয়েসে বারবার অনেকের মুখে শুনেছে, তুই এখন এসব বুঝবি না। এই কথাটা শুনলেই মনটা উতলা হয়ে যায়, জলের মধ্যে প্রবল আলোড়নের মতন

বোধের সীমানাগুলো কেঁপে ওঠে। বাদল এইটুকু অন্তত বুঝেছিল, তার বড়দি আর সূর্যদা কী যেন একটা অদৃশ্য বন্ধনের মধ্যে রয়েছে—ওরা পরস্পরের কাছে ভীষণ ভাবে আসতে চায় কিন্তু অন্যরা আসতে দেবে না। সূর্যদা বড়দিকে কাঁদাবে আবার নিজেও কষ্ট পাবে।

—ওরা সূর্যদাকে নিষ্ঠুরভাবে মেরে মেরেও কোনো কথা বার করতে পারে নি।

—ওরা সূর্যদাকে মারে? ইস্, আমি যদি একটা বন্দুক পেতাম!

—চুপ, এসব কথা কারুকে বলিস নি।

—তুমি কি করে জানলে?

—বড়বাবু বলেছেন। আমি বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। বড়বাবু তো এ বাড়িতে আজকাল আর আসেন না।

—বড়বাবু তো নেই কলকাতায়।

—বড়বাবু সূর্যদাকে দেখতে গেছেন। প্রত্যেক সপ্তাহে যান।

—আমি বড়বাবুর সঙ্গে যাবো!

—পারবি? বড়বাবুকে জোর করে বলতে পারবি? আমি তো মেয়ে, আমি অনেক কিছু পারি না। তুই ইচ্ছে করলে পারিস, বড়বাবুকে যদি খুব করে বলিস—

—পারবো, নিশ্চয়ই পারবো।

॥ ৫০ ॥

কাছাকাছি মানুষের প্রভাব আমার ওপর খুব বেশী পড়ে। যাকে একটু ভালো লাগে, অমনি তাকে অনুকরণ করা শুরু করে দিই। কয়েক দিনের মধ্যেই আমি প্রভাস জামাইবাবুর খুব ভক্ত হয়ে উঠলাম। উনি যেমন একটু সুর করে কথা বলেন, আমার কথার মধ্যেও সেই রকম টান এসে গেল। উনি বলেন, শোনো-ও-ও-ও কিংবা বলো-ও-ও-ও, বেশ মিষ্টি শোনায়।

গ্রাম থেকে আমি কয়েকটি খারাপ অভ্যেস নিয়ে এসেছিলাম। যেমন রাস্তায় গুলি খেলা কিংবা অন্য লোকের বাড়িতে জিজ্ঞেস না করে ঢুকে পড়া। গ্রামে কড়ি খেলার খুব চল ছিল, কলকাতায় দেখলাম আমাদের বাড়ির কাছেই খুব ছিপি খেলা হয়। নিয়ম একই। সোডার বোতলের ছিপি এক-একজনের কাছে কুড়ি-পঁচিশটা করে থাকে—সেগুলো দূরে দাগের মধ্যে রেখে বাটখারা দিয়ে নির্দিষ্টটাকে মারতে হয়। দারুণ উত্তেজনার খেলা, ছিপি ফুরিয়ে গেলে কিনতে হয় সঙ্গীদের কাছ থেকে, চার পয়সায় দশটা। অর্থাৎ এটা জুয়া খেলার কিশোর সংস্করণ। আমার চরিত্রের মধ্যে একটা জুয়াড়ী গুপ্তভাবে ছিল বলেই বোধ হয় আমি ঐ খেলায় খুব মেতে উঠেছিলাম। জেতার আনন্দ এবং হারার দুঃখ, দুটোই ছিল তীব্র। মায়ের কাছে পয়সা চাইবারও দরকার হত না, আমার পৈতের সময় পাওয়া টাকা তখনও কিছু অবশিষ্ট ছিল। সারা সকাল দুপুর বিকেল আমি ছিপি খেলে কাটাতাম—বাড়ি ফেরার সময় আমার দু'পকেট ভর্তি ছিপি ঝমঝম করতো। এছাড়া একটু দূরে বস্তির মুখে ছিল গুলি খেলার আড্ডা।

বাড়ির কারুর শাসন তখন আমি গ্রাহ্য করি না। একমাত্র ভয় পাই জ্যাঠামশাইকে—কিন্তু তিনি আমাদের কারুর ব্যাপারে মন দেবার সময়ই পান না। শেষ পর্যন্ত আমার

ঐসব খেলার নেশা ঘুচিয়ে দিলেন প্রভাস জামাইবাবু। তিনি একদিন আমায় রাস্তায় ঐসব খেলাধুলোর মধ্যে ব্যস্ত দেখে এমন ভাবে মুখ করে থমকে দাঁড়ালেন, যেন নরকের দৃশ্য দেখছেন। কাছে ডেকে বললেন, ছি-ছি, তুমি এইসব করো? তাহলে আর অধঃপাতে যাবার বাকি রইলো কি?

জামাইবাবুরা শ্বশুরবাড়িতে এসে হাসি ঠাট্টা আমোদ আহ্লাদ করবেন, এইটাই নিয়ম। কিন্তু প্রভাসকুমার হাসি ঠাট্টার ধার ধারেন না। বড়দির ছেলেমেয়ে না হওয়া পর্যন্ত তিনি কলকাতাতেই থাকবেন এবং এর মধ্যেই তিনি এখানে পড়াশুনো শুরু করে দিয়েছেন। আমার দিদির অসুখ এখন অনেকটা ভালো হয়ে গেছে, তাই প্রভাসকুমারের হাতে এখন অন্য কোনো কাজ নেই, তিনি আমাকে নিয়ে পড়লেন। বোধ হয় কিশোর মনস্তত্ত্ব সমীক্ষা করার ঝোঁক চাপলো তাঁর, তিনি প্রায় সারাদিন আমাকে তাঁর ঘরে আটকে রেখে নানারকম কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। দিনের পর দিন এই রকম চললো।

প্রথম প্রথম আমি অত্যন্ত চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেও ক্রমশ তাঁর অনুরক্ত হয়ে পড়লাম। আমার মনে হলো, এরকম বিদ্বান কিংবা এরকম সুন্দর চেহারার মানুষ আমি আগে কখনো দেখিনি। আসলে কিন্তু প্রভাসকুমার সুপুরুষ ছিলেন না। তাঁর গায়ের রং খুব ফর্সা ছিল, এছাড়া তাঁর শরীরে কোনো সামঞ্জস্য ছিল না।

প্রভাসকুমারকে অনুকরণ করতে করতেই আমি পদ্য রচনা শুরু করলাম। প্রভাসকুমার যে একজন কবি—এর মধ্যে কোনো গোপনীয়তা ছিল না, বাড়িসুদ্ধ সবাই জানতো। প্রভাসকুমার যখন ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকতেন, তখন ছোটরা কেউ বাইরে চ্যাঁচামেচি করলেই জ্যাঠাইমা তাকে ধমক দিয়ে বলতেন, এই, তোরা গোলমাল করছিস কেন, তোদের জামাইবাবু এখন কবিতা লিখছেন না? একথা শুনে কেউ কখনো হাসেনি। প্রভাসকুমারের দ্বিতীয় কবিতার বই ছাপিয়ে দিয়েছেন তাঁর শ্বশুর। জ্যাঠামশাই তাঁর জামাইয়ের লেখা কবিতা পুস্তক উপহার দিতেন অতিথিদের। অনেকেই সেই পদ্যগুলি পাঠ করে ধন্য ধন্য করেছেন। শুধু দু-একজন এরকম মুখের ভাব করেছেন, কাগজ ব্যবসায়ীর জামাই কবিতা টবিতা লিখে কেন কাগজ নষ্ট করছে এই দুর্মূল্যের বাজারে?

আমার মনে হলো, জামাইবাবুর মতন অসাধারণ মানুষ হতে গেলে কবিতা না লিখে উপায় নেই। শুরু করে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে।

কবিতা লেখার মধ্যে একটা মজার ব্যাপার আছে। যারা কবিতা লেখে না—তারা অনেকেই কখনো কবিতার কথা চিন্তা করে না কিংবা এটাকে একটা আজেবাজে ব্যাপার মনে করে। আবার অনেকের ধারণা, কবিতা লেখা বুঝি খুব একটা শক্ত ব্যাপার। কিন্তু যারা কোনোক্রমে একবার কবিতা লিখতে শুরু করে, তারা প্রথম চোটেই পৃথিবীর যে-কোনো বিষয় নিয়ে হুড়হুড় করে অজস্র কবিতা লিখে ফেলে। শিশুর প্রথম হাঁটতে শেখার মতন কিংবা ছাগলের নতুন শিং গজালে যেমন সে সর্বত্র ঢুঁ মেরে-বেড়ায়—তেমনি নবীন কবিও কোনো কিছুই বাদ দেয় না। কয়েক দিনের মধ্যেই আমি একটি খাতার পাতা ভরিয়ে ফেললুম। একটা কবিতা শেষ করে তক্ষুনি মনে হয়, আর-একটা লিখতে হবে! রাস্তার ছিপি খেলোয়াড় থেকে আমি একেবারে কবি হয়ে উঠলাম এবং চুলে তেল মাখা বন্ধ করে দিলাম।

কবিরা যে কত ঈর্ষাপরায়ণ, সেটাও টের পেলাম সেই সময়। জামাইবাবু এত কাব্যোৎসাহী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার কবিতা রচনার ব্যাপারটা খুব সুনজরে

দেখলেন না। এক বাড়িতে দুজন কবি থাকা ওঁর পছন্দ নয়। উনি আমাকে কবিতা লেখার জন্য কখনো তেমন উৎসাহ দেননি। আমি আমার সদ্য রচিত পদ্য ওঁকে পড়ে শোনালে উনি সামান্য ঠোঁট ফাঁক করে মৃদু হাস্যে শুধু বলতেন, বাঃ, আবার লেখো। যেন আমি ওঁকে, হোম টাস্ক দেখাচ্ছি। তখন আমি অবশ্য ঐ সামান্য মন্তব্যেই পুলকিত হতাম। আবার মা বা জ্যাঠাইমা যখন জামাইবাবুর কবিতার প্রশংসা করতেন, তখন আমি মনে মনে ভাবতুম, ওঁরা শুধু জামাইবাবুর কথা বলছেন কেন, আমিও ওঁর চেয়ে খারাপ লিখি না।

কবিতা লেখার কথা আমি আগে কখনো চিন্তা করিনি। কবিতা জিনিসটা মনে হতো বইতেই শুধু ছাপা থাকে—কোনো জ্যান্ত মানুষ যে এগুলো লেখে—এ কথা মাথাতেই আসেনি এর আগে। চোখের সামনে প্রভাস জামাইবাবুকে টাটকা টাটকা কবিতা লিখতে দেখে ভেবেছিলাম, এটা তাহলে এমন কিছু কঠিন কাজ নয়, আমিও পারি। জামাইবাবুই বলেছিলেন যে উনি নিজে এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি আমার চেয়েও কম বয়েসে কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাহলে তো আর কোনা কথাই নেই।

দিদিদের কিংবা মা-জ্যাঠাইমাকে আমি যখন কবিতা শোনাই, এমন কি, স্বভাব কবির মতন মুখে মুখে কবিতা বানাতেও আমার অসুবিধে হয় না। তাছাড়া জামাইবাবু বলেছিলেন যে, মডার্ন কবিতায় ছন্দ এবং মিল লাগে না। বাড়ির লোকেরা আমাকে দেখেই কানে হাত চাপা দিতে শুরু করলো। কবিতা শুনিয়ে শুনিয়েই আমি আমার দিদির ভূত ছাড়িয়ে দিলাম বলতে গেলে, বহুদিন পর দিদির মুখে হাসি দেখা গেল।

প্রথম কবিতাটি লেখার সময়ই আমাকে বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করতে হয়েছিল, তারপর তো এসে গেল গড়গড় করে। প্রথম কবিতাটি কষ্টকল্পিতই বলা যায়। কী নিয়ে যে লিখবো, সেটাই ছিল সমস্যা। বহু চিন্তা ভাবনার পর আমার প্রথম কবিতাটি রচিত হয়েছিল কারাগার বিষয়ে। তাতে মোটামুটি এই ভাব প্রকাশ পেয়েছিল যে, কারাকক্ষের অন্ধকারে এক দিব্যজ্যোতি পুরুষ বসে আছেন তাঁর গা থেকে আলো বেরুচ্ছে, তিনি উঠে দাঁড়াতেই ঝনঝন করে শিকল ভেঙে পড়লো। একমাত্র বড়দিই আমার এই প্রথম কবিতাটি খুব পছন্দ করেছিল—আমি পরে অন্য কবিতা শোনাতে গেলে বড়দি বলেছে, তার থেকে বরং তোর সেই জেলখানার কবিতাটা আর একবার পড়ে শোনা।

কবিতা রচনা ছিল তখন আমার কাছে ছেলেখেলা ও আমোদের ব্যাপার। যে-কোনো একটা কিছু নিয়ে আমার মেতে থাকা স্বভাব। ছিপি খেলা কিংবা ঘুড়ি ওড়ানোর বদলে আমি কবিতা নিয়ে মেতেছিলুম। কবিতা লেখার মুহূর্তগুলিতে যে তীব্র বিষাদ আছে, তা টের পেতে আমার অনেক দিন সময় লেগেছিল।

রেণুদের বাড়িতে যখন আমি এবার এসে প্রথমবার গেলাম, তখন আমি পরিবর্তিত মানুষ। এখন তো আমি আর আগের সেই সাধারণ ছেলেটি নই—এখন আমি রীতিমত একজন কবি। জামায় বোতাম লাগাই না, সিঁথি কেটে চুল আঁচড়াই না, কথা বলতে বলতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যাই এবং খাবারের প্লেট সামনে দিলে সংগে সংগে হাত বাড়াই না সেদিকে।

রেণুদের ওখানে গিয়ে দেখলাম, ওদের বাড়িটা বদলে গেছে আরও অনেক বেশী। আমি মাত্র দেড় বছর কলকাতা ছেড়ে ছিলাম, এর মধ্যে অনেক কিছুই বদলে গেছে। রেণুর বাবা মারা গেছেন, এটা আমি ঘুণাক্ষরেও জানতাম না। শেষের কয়েক মাস

ওরা কোনো চিঠি লেখেনি আমাকে। বিধবা হওয়ার জন্য রেণুর মাকে হঠাৎ বুড়ির মতন দেখায়। সাদা থান পরা ওঁর চেহারা দেখে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। রেণুও যেন হঠাৎ বড় হয়ে গেছে, ওর এখন দশ বছর মোটে বয়েস, এর মধ্যেই চশমা নিয়েছে। চশমা-পরা রেণুকে আমি প্রথমটায় চিনতেই পারিনি।

বিষ্ণু কিছুদিন টাইফয়েডে খুব ভোগার ফলে এখনো রোগা আর দুর্বল। বিষ্ণুর মা তাকে ঘর থেকে বেরুতেই দেন না। আমি ওর বিছানায় বসতে গেছি, ওর মা বললেন, একটু দূরে বসো, তোমার তো রাস্তার জামা কাপড়!

দীপ্তির বিয়ে ঠিক হয়ে ছিল অনেক আগেই, কি কারণে যেন সেই বিয়ে ভেঙে গেছে। দীপ্তিদের সঙ্গে বিষ্ণুদের কথা বন্ধ। এ বাড়ির ছেলেমেয়েরা এখন আর সকলে সকলের ঘরে যায় না। বড়দের মধ্যে ঝগড়া ও মন-কষাকষি অনেক পরিব্যপ্ত। বাড়িটির অবস্থাও আরও জরাজীর্ণ, কেননা সারাবার দায়িত্ব কোনো শরিকই নেবে না—এবং গেটের সামনেই ব্যাফ্‌ল ওয়াল তোলা হয়েছে বলে আরও কদাকার দেখায়। প্রথম যখন এ বাড়িতে আসি, তখন অদ্ভুত আনন্দময় পরিবেশ মনে হয়েছিল। কিংবা তখনও বোধ হয় এই রকমই ছিল—আমার বয়েস আরও কম থাকার জন্য চোখ পড়ে নি।

এই সব বনেদী একান্নবর্তী পরিবার গুলির শেষ ঘণ্টা তখন বেজে উঠেছে, প্রাসাদগুলির গায়েও সেই নিয়তির লেখা।

বিষ্ণুর সঙ্গে আমার গল্প আর ফুরোয় না। বিষ্ণু সব কথাই ভারী সুন্দর করে বলতে পারে। ও আমাকে রেণুর বাবার মৃত্যুর কথা শোনালো। রেণুর বাবাকে আমি দেখেছি অনেকবার কিন্তু কোনো দিন কথা বলিনি। খুব গম্ভীর ধরনের মানুষ ছিলেন —এবং দিনের বেশীর ভাগ সময়েই বাড়ির বাইরে থাকতেন। তিনি মারা যান হঠাৎ হার্ট ফেল করে। মাঝ রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে বুকে ব্যথার কথা বলেন, ডাক্তার ডেকে আনার আগেই ওঁর শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে যায়। মৃত্যুর ঠিক আগে ওঁর কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, শুধু জল পড়ছিল চোখ দিয়ে। সেই চোখের জল বিষ্ণুকে খুব আশ্চর্য করেছে। ও বারবার বলছিল, জ্যাঠামশাইকে কাঁদতে দেখবো, কখনো ভাবিনি। জ্যাঠামশাই কি ভয় পাচ্ছিলেন। মরতে কি মানুষ ভয় পায়?

বিষ্ণু আরও বললো, ওর যখন টাইফয়েড হয়েছিল, তখন ওর খুব ভালো লাগতো। অসুখ হওয়া খুব আনন্দের ব্যাপার। বিষ্ণু বললো, জানিস বাদল, যখন ভীষণ জ্বর হতো—জ্বরের ঘোরে খানিকটা অজ্ঞান অবস্থা, তখন কত রকম স্বপ্ন দেখতাম। দেখতাম, আমি যেন কোথায় চলে গেছি, অচেনা সব সুন্দর সুন্দর জায়গা, একটা সাদা রঙের পাহাড়, তার ওপরে একটা মন্দির। সেখানে নীল শাড়ি পরে একজন দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমে মনে হলো আমার মা, তারপর আবার দেখি মা তো নয়, অন্য কেউ। বোধ হয় কোনো দেবতা—অথচ ঠিক মানুষের মতন—মুখখানা একটু দুঃখী-দুঃখী, কিন্তু যেই হাসলেন, এত সুন্দর হাসি আমি কখনো দেখিনি। ইস, আবার যে কবে তাকে দেখতে পাবো! আর একবার দেখলাম অসংখ্য জিরাফের পাল, একটা মাঠ ধু ধু করছে, তার মধ্যে জানিস তো, জিরাফরা গলা দিয়ে শব্দ করতে পারে না, তাই সেখানে কোনো শব্দ নেই—পাশ দিয়ে একটা নদী।...এখন আর সেই সব স্বপ্ন একটাও দেখি না। বেশী জ্বর না হলে এসব দেখা যায় না।

আমি গোপন খবর দেবার মতন বিষ্ণুকে বললাম, এই জানিস, আমি এখন কবিতা লিখি।

বিষ্ণু জিজ্ঞেস করলো, কেন?

আমি বললাম, লিখি, মানে এমনিই। আমি লিখতে পারি।

বিষ্ণু রেগে গিয়ে বললো, ট্রেইটার?

—বাঃ, আমি কি করেছি?

—কথা ছিল না আমরা দুজনে এক্সপ্লোরার হবো? নতুন নতুন জায়গা আবিষ্কার করবো?

—কবিতা লিখলে বুঝি এক্সপ্লোরার হওয়া যায় না?

—না। কোনো এক্সপ্লোরার কবিতা লেখে না।

—তুই জানিস?

—নিশ্চয়ই জানি। স্কট, এমান্ডসেন, ডঃ লিভিংস্টোন এরা কখনো কবিতা লিখেছে?

বিষ্ণুর তুলনায় এ সব বই আমি কম পড়েছি, তাই কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলাম, এক্সপ্লোরাররা কবিতা না লিখতে পারে, কিন্তু কবিরা কি এক্সপ্লোরার হতে পারে না?

বিষ্ণু বললো, না। কবিটবিদের দিয়ে এ সব শক্ত কাজ হয় না।

জামাইবাবুর অনুকরণ করতে গিয়ে বিষ্ণুর কথা আমার মনে ছিল না। কিন্তু বিষ্ণু আমার প্রাণের বন্ধু, তার মনে আমি আঘাত দিতে পারি না। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, তা হলে কবিতা লেখা ছেড়ে দেবো?

বিষ্ণু গম্ভীরভাবে অনুমতি দেবার সুরে জানালো, ঠিক আছে, যতদিন না আমরা বড়ো হচ্ছি, ততদিন লিখতে পারিস। বাড়ি থেকে একবার বেরিয়ে পড়লে আর ওসব চলবে না।

রেণুর বাবা মারা গেছে বলে রেণুকে আমার এখন অন্য রকম লাগে। আমার যা যা আছে, অন্য কারুর তা নেই—এ যেন কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। সূর্যদার মা নেই, এ কথা আমরা ছেলেবেলা থেকেই জানতাম, সেই জন্যই সূর্যদা অন্য রকম। কিন্তু রেণু তো আমাদেরই মতন অথচ তার বাবা থাকবে না কেন? রেণুর ভাই অংশুর সঙ্গে আমার বরাবরই ঝগড়া হয়, এখন সেই অংশুকে দেখেও মায়া হতে লাগলো। আমি অংশুর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে চাইছিলাম। অংশু কিন্তু প্রথমেই আমাকে বললো, কি রে বাঙাল, কবে এলি?

আমাকে কেউ বাঙাল বললে এখন আমার রাগ হয়। পূর্ব বাংলায় আমাকে সবাই ঘটি কিংবা ক্যালকেশিয়ান বলতো, কারণ আমার কথার উচ্চারণ অন্য রকম হয়ে গেছে। আর এখানে এখন আমাকে বাঙাল বলার কোনো মানে হয়? অংশু আমার জামার ফাঁক দিয়ে পৈতেটা উঁকি মারছিল দেখে বললো, এটা কি? তুই বামুন হয়েছিস নাকি? আমাদের বাড়িতে রান্না করবি? আমাদের ঠাকুর পালিয়ে গেছে!

না। চেষ্টা করলেও অংশুর সঙ্গে আমার ভাব হবে না। অংশুর মা ছেলেকে বকলেন। রেণু আমাকে বললো, তুই আমাদের বাড়িতে আর আসিস না কেন রে?

আমি বললাম, বাঃ, আমরা তো এখানে ছিলাম না।

—কতদিন আগে ফিরেছিস?

—চোদ্দ পনেরো দিন।

—তা হলে এর মধ্যে আসিস নি কেন?

—এখন তো অনেক দূরে থাকি।

ওর মা বললেন, এই রেণু, তুই বাদলকে তুই তুই বলিস কেন? এখন বড়ো হয়েছিস

না? এখন থেকে ওকে বাদলদাদা বলবি।

রেণু বললো, ইস্, মোটে তো তিন বছরের বড়। দাদা বলবো না ছাই বলবো। এই বাদল, তোদের নতুন বাড়িতে আমাকে নিয়ে যাবি না?

—নতুন বাড়ি নয়, জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি।

—আমি সেখানে যাবো।

মা বললেন, কার সঙ্গে যাবি?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আমি নিয়ে যেতে পারি। বাসে করে সোজা ওয়েলিংটন, কোথাও বদলাতে হয় না।

রেণু আমার সঙ্গে যাবার জন্য খুব বায়না ধরে বসলো। কিন্তু দরোয়ান না থাকায় ওর মা কিছুতেই ওকে ছাড়বেন না। আমি নিয়ে গেলেও ফিরিয়ে আনবে কে! তা ছাড়া আমার সঙ্গে ছেড়ে দেবার প্রশ্নই ওঠে না।

আমার মনে হলো, রেণু, অংশু কিংবা বিষ্ণুর চেয়ে আমি অনেক স্বাধীন! আজকাল আমি বাড়ি থেকে একলা একলা বেরুতে পারি, কেউ নিষেধ করে না। এখন আমি বাসের নম্বরও জেনে গেছি। রেণুকে আমার সঙ্গে নিয়ে গেলে বেশ হতো—সারা দিন ওর সঙ্গে গল্প করতাম। ওর মা দৃঢ়ভাবে মানা করায় আমি চুপ করে গেলাম। আমি যদি ম্যাজিক জানতাম, এক্ষুনি অদৃশ্য হয়ে রেণুকে নিয়ে উড়ে চলে যেতাম। কোথায়? সারাজীবন ধরে আমি সেই উত্তর খুঁজেছি। কোথায় নিয়ে যাবো?

রেণুকে বললাম, বিষ্ণু সেরে উঠুক, তারপর তোরা সবাই মিলে একদিন আমাদের বাড়িতে আসবি।

রেণু বললো, না, আজই যাবো।

ওর মা এবার ওকে বেশ কড়া করে ধমক দিলেন।

রেণু বড় জেদি মেয়ে, শেষ পর্যন্ত কান্নাকাটি শুরু করে দিল। রেণুকে সেই অবস্থায় রেখেই চলে আসতে হলো আমাকে।

সিঁড়ির কাছে দীপ্তির সঙ্গে দেখা। আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে গেল সিঁড়ির পাশে একটা ছোট ঘরে। এই ঘরটা আগে খালি পড়ে থাকতো—এখন এখানে অনেক জিনিসপত্তর, একটা খাট বিছানাও রয়েছে। শুনলাম, বিষ্ণুর জন্য নিযুক্ত মাস্টারমশাই ওখানে থাকেন, দিনের বেলা বাইরে চাকরি করেন, সকালে-সন্ধ্যেবেলা পড়ান।

দীপ্তি বললো, কি রকম বেড়িয়ে এলি বল্? আমার সঙ্গে কথা বললি না কেন রে?

—তখন তো তোকে দেখলাম, তুই এলি না কেন বিষ্ণুদের ঘরে?

—ঐ হিংসুটের ঘরে আমি যাই না।

—বিষ্ণুকে হিংসুটে বলবি না।

—ও নয়, ওর মা-টা!

দীপ্তির কথা বলার ধরণ বরাবরই খারাপ। আমার মনে পড়লো, পাড়ার ছেলেরা আমার হাত দিয়ে দীপ্তিকে চিঠি পাঠাতো। দীপ্তি কখনো কখনো আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেত—আমার খুব বিশ্রী লাগতো তখন। এখন কিন্তু দীপ্তিকে দেখে আমার একটুও খারাপ লাগছে না। আমি এক দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম দীপ্তিকে। আমি এখন কবি হয়েছি তো, তাই এরকম ভাবে দেখতে হয়। মনে হলো, দীপ্তিকে নিয়েও অনায়াসে কবিতা লেখা যায়। দীপ্তি যদি আজ আমায় আদর করে, তা হলে ওকে

নিয়ে আজই কবিতা লিখবো। দীপ্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা কিংবা ওর শরীরের একটু ছোঁয়া পাবার জন্য আমার মনের মধ্যে আকুলি বিকুলি করছিল। এটা আমার নতুন অভিজ্ঞতা। আমি নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। দীপ্তিকে আমার পছন্দ হয় না অথচ ওর সামনে বসে থাকতে আমার ভালো লাগছে, বার বার তাকাতে ইচ্ছে করছে ওর শরীরের দিকে। এর মানে কি?

হঠাৎ সুপ্রকাশদা এসে পড়ায় দীপ্তিকে নিয়ে সেদিন আমার কবিতা লেখা হয়নি।

॥ ৫৯ ॥

বেয়াল্লিশ সালের গোড়ায় কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছিল হাজার হাজার মানুষ। তেতাল্লিশের শেষের দিকে তার থেকে আরও অনেক বেশী মানুষ এসে ঢুকলো কলকাতা শহরে। এরা অন্য ধরনের মানুষ। এরা মরতে এসেছিল।

পটুয়াখালি, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, বাগেরহাট, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগনা, বর্ধমান প্রভৃতি জায়গা থেকে বৃদ্ধ, শিশু, নারী ছুটে আসতে লাগলো কলকাতায়। কলকাতায় শান বাঁধানো রাস্তায়, তারা আছড়ে পড়লো। রাস্তায় রাস্তায় কিলবিল করছে মানুষ।

কলকাতার নাগরিকরা প্রথম প্রথম ব্যাপারটা দেখে ভুরু কুঁচকেছে। এত গ্রামের মানুষ শহরে কেন? শহরের কি আর মান ইজ্জৎ রইলো না। এর আগে বন্যা কিংবা অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে কোনো এলাকায় বিপর্যয় ঘটলে কলকাতার লোকেরা চাঁদা তুলেছে। একদল উৎসাহী লোক হারমোনিয়াম ও খোল করতাল সঙ্গে নিয়ে মিছিল বার করে গান ধরেছে, মেদিনীপুরেতে বন্যা হয়েছে, শোনো শোনো ভাই নগরবাসী। মুষ্টি ভিক্ষা দিয়ে যাও সবে, ক্ষুধিতের পাশে দাঁড়াও আসি...। কোনো বছর যদি আসামে বন্যা কিংবা চট্টগ্রামে ঘূর্ণিঝড় হয়—তাহলে ঐ একই গানে মেদিনীপুরের বদলে সেই জায়গার নাম বসিয়ে গাওয়া হয়। কিন্তু এবার এসব কি? দুর্ভিক্ষের বর্ণনা বঙ্কিমবাবু লিখে গেছেন আনন্দমঠে, সেই সূত্রে লোকে জানে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা। এবারে কি আবার সেই রকম দুর্ভিক্ষ শুরু হলো? খবরের কাগজে কি বলে?

খবরের কাগজ অনেক দিন কিছুই বলেনি। যুদ্ধের বড় বড় খবরে সবাই ব্যস্ত —দেশের মধ্যেও কংগ্রেস-লীগ কোন্দল খুব মজাদার জায়গায় পৌঁছেছে। গ্রামগুলোতে কি ঘটছে কে খবর রাখবে? তবে আশ্চর্যের বিষয়, তখনকার দিনে বক্সওয়ালা এবং পাট কোম্পানির সাহেব মালিকদের মুখপত্র একটি ইংরেজি দৈনিকেই প্রথম ফলাও করে দুর্ভিক্ষের ছবি ও খবর ছাপা হতে শুরু করেছিল।

গ্রামের মানুষ যখন শহরে এসে মরতে লাগলো, তখন সকলের টনক নড়লো। ব্যাপারটা বড় নোংরা। মরতে যদি হয়, চোখের আড়ালে মরাই তো উচিত ছিল। ভিখিরিরা রাস্তায় আর পয়সা ভিক্ষে চায় না, তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে চ্যাঁচায়, মা, একটু ভাত দাও! কিছুদিন পর তারা ভাতও চায় না। তারা বলে, মা, একটু ফ্যান দাও! ডাস্টবিনে খাবার খোঁজার জন্য কুকুরের ও মানুষের লড়াই, সেই প্রথম দেখা গেল এ শহরে। তারই মধ্যে একটা রসিকতাও চালু হয়ে গেল, অনশনে একজনও মরে নি, সবাই মরেছে হার্টফেল করে। সরকারী হিসেব মতনই বাংলাদেশে মৃতের সংখ্যা

পনেরো লক্ষ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে একটি সমীক্ষায় এই সংখ্যা হয়েছিল পঁয়ত্রিশ লাখ। বামপন্থীদের কাগজপত্রে বলা হয়েছে, এক কোটি কুড়ি লক্ষ। ইংলন্ডের জনসংখ্যা তখন এর দ্বিগুণ মাত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের সৃষ্ট কারণে এই বিপুল মৃত্যুর জন্য কোথাও কোনো উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সময় এর অপরাধীদের কোনো খোঁজ পড়েনি। প্রাণহানির সংখ্যার হিসেবে হিরোসিমা-নাগাসাকির ধ্বংসলীলা বাংলাদেশের তুলনায় কিছুই না। তবু সারা পৃথিবীর কাছে এ খবর পৌঁছোয় নি।

তখন শহরের মাঝে মাঝে বিরাট বিরাট গুদামে হাজার হাজার বস্তা খাদ্য জমানো রয়েছে, যুদ্ধের জরুরি প্রয়োজনে। এর অনেক চালই শেষ পর্যন্ত পচে নষ্ট হয়েছে। অনেকের পকেটে তখন কাঁচা পয়সা ঝনঝন করছে, হোটেল-শুঁড়িখানাগুলো জমজমাট, দোকানের শো-কেসে ভালো ভালো খাবার সাজানো। একটাও গুদাম লুঠ বা কেড়ে খাওয়ার ঘটনা ঘটেনি। মানুষ শুধু ধুঁকতে ধুঁকতে মরেছে।

কংগ্রেসের একগুঁয়েমি এবং এবং ভ্রান্ত নীতির ফলে ফজলুল হক তখন বাধ্য হয়ে লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গঠন করেছেন। বাঙালী মুসলমানরা বড় আবেগ-প্রবণ তারা অনেকেই হিন্দুদের সঙ্গে মিলে মিশেই থাকতে চায়, ভাষার সূত্রে হিন্দুদের আত্মীয় মনে করে। অবাঙালী মুসলমানরা তখন রাজনীতিতে ভাগ বাঁটোয়ারার আস্বাদ পেয়ে এখানকার মুসলমানদের মধ্য থেকে বাঙালীত্ব মুছে দেবার জন্য বদ্ধ-পরিকর। কতিপয় নবাবপুত্র এবং ব্যারিস্টাররাই তখন জননেতা। ধর্মের প্রশ্নটি আস্তে-আস্তে জিগির-এ পরিণত হচ্ছে। হিন্দু এবং মুসলমানের উভয় সংস্কৃতিতে লালিত পালিত, মনে প্রাণে বাঙালী ফজলুল হক তখন দেখছেন ঘটনা প্রবাহ তাঁর অধিকারের বাইরে চলে যাচ্ছে।

কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে মুসলমানদের মন্ত্রিসভা নিজের শক্তিতে টিঁকে থাকতে পারে কিনা—সেটাই তখন সরকারের কাছে বড় প্রশ্ন। কোনো রকম দুর্বলতাই সরকার স্বীকার করতে রাজি নয়। খাদ্যমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দি তেতাল্লিশের ৯ই মে ঘোষণা করলেন, দেশে খাদ্যের কোনো ঘাটতি নেই। মজুতদার আর মুনাফাবাজরাই দেশে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করছে। এবং বেশী খাদ্য গ্রহণ করা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে কত খারাপ সে কথাও জানালেন।

এদিকে এপ্রিল মাসে বোট অর্ডিনানস-এর ফলে পঁচিশ হাজার নৌকো অকেজো হয়ে পড়ে আছে। গ্রামে গ্রামে মালপত্র চলাচল বন্ধ। আমন ধান সেবার ভালো ওঠেনি। বন্যা হয়েছে নানা জায়গায়। জাপানীরা বার্মা দখল করে নিয়েছে বলে সেখান থেকে আর চাল আসে না।

পরের মাসে অ্যাসেম্বলিতে একজন সদস্য প্রশ্ন তুললেন,—বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের কথা কি ঘোষণা করা হবে না? সোহরাওয়ার্দি বললেন, দুর্ভিক্ষ কোথায়?

ভারতের স্বরাষ্ট্রসচিব স্মিথ বললেন, একদল লোকের সব কিছুই বড্ড বাড়িয়ে বলা স্বভাব।

ভারতসচিব আমেরি বললেন, খাদ্যের স্টক যথেষ্ট আছে আমাদের। তাছাড়া গমের ফলন খুব ভালো হয়েছে।

আর তখন শুধু সাতক্ষীরার রাস্তাঘাটেই দু' হাজার মানুষের মড়া পড়ে আছে। বিভিন্ন জেলায় স্বামীরা স্ত্রী পুত্র কন্যা ফেলে পালাচ্ছে। মায়েরা ছেলেমেয়ে বিক্রী করে দিচ্ছে জলের দামে। এবং সন্তান বিক্রী করা টাকায় শেষবারের মতন খেয়ে নিয়ে

বমি করতে করতে মরছে। মাঠে ঘাটে পড়ে থাকা মানুষদের রাতের অন্ধকারে শেয়ালে এসে খেয়ে যাচ্ছে, তারা অনেকে তখনও বেঁচে। মরা মায়ের বুক থেকে দুধ খাবার চেষ্টা করছে শিশু—এই ছবি তুলে তুলে সাহেবরাও ক্লান্ত।

১০ই অকটোবর সোহরাওয়ার্দি ঘোষণা করলেন, বাংলাদেশ এক অভূতপূর্ব দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছে।

তখন মৃতদেহগুলি দাহ করার পালা। খাদ্যদ্রব্যের দাম তখন ৬০০ গুণ বেড়েছে।

বাদলের জ্যাঠামশাই অতি বৈষয়িক লোক। দুর্ভিক্ষের আঁচ পেয়েই তিনি মস্ত বড় বড় মাটির জালা কিনে তাতে চাল ভরে রাখলেন। নিজে মফঃস্বলে ঘুরে চাল কিনলেন। এবং অচিরেই চালের কারবার সম্পর্কে এমন ওয়াকিবহাল হয়ে গেলেন যে এদিকেও আর একটা ব্যবসা খোলার লোভ হয়েছিল তাঁর। কিন্তু ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা করার ব্যাপারে তাঁর বিবেক শেষ পর্যন্ত সায় দিল না। তবে পুলিস লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চালের স্টক খোঁজ করছে—এই রকম একটা গুজব ওঠায় তিনি চালের জালাগুলো সব ঠাকুর ঘরে লুকিয়ে রাখলেন। এবং পরে র‍্যাশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় তিনি অনেকগুলো ভুয়ো র‍্যাশান কার্ড করিয়ে রেখেছিলেন।

শেষের দিকে পাড়ায় পাড়ায় যখন লঙ্গরখানা খোলার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল, তিনি তাতে উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়েছেন এবং অনেক টাকা দান ধ্যান করে সুনাম কিনেছেন। কিন্তু নিজের বাড়ির লোকের গায়ে আঁচড়টিও লাগতে দেননি। বাদলরা গ্রামে থাকতে কষ্ট পেয়েছিল, কিন্তু কলকাতায় তারা ভালো ছিল।

প্রত্যেকদিন অসংখ্য মৃত্যুর গল্প। রাস্তায় ঘাটে হাঁটা চলা করা যায় না। কিশোরের নিষ্পাপ সরল চক্ষু বাড়ির বাইরে তাকালেই বীভৎস দৃশ্য দেখে। এক একদিন খেতে বসে সে বমি করে ফেলে!

একজন মাঝবয়েসী স্ত্রীলোক বাড়ির ঠিক গেটের সামনে সকাল থেকে শুয়ে আছে। কিছুতেই সে যাবে না। অনেক চোখ রাঙানো, অনেক তর্জন গর্জন হলো, সে কোনোই উত্তর দেয় না—ড্যাবডেবে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। দারোয়ান তাকে লাঠি উঁচিয়ে মারবার ভয় দেখালেও সে ভয় পায় না। কোনো কথারই উত্তর দেয় না সে।

আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল তাকে নিয়ে। একজন স্ত্রীলোককে তো সত্যি সত্যি মেরে তাড়ানো যায় না। তা ছাড়া, ওকে বোধহয় মারলেও যাবে না। প্রিয়রঞ্জন বারবার দারোয়ানকে হুকুম দিতে লাগলেন ওকে সরিয়ে দেবার জন্য। দারোয়ান নাচার। সে আর সব কিছু করতে পারে, কিন্তু মেয়েছেলের গায়ে হাত দিতে পারে না। অথচ বাড়ির দরজার কাছে একজন একটু একটু করে মরবে—এও কি সম্ভব?

স্ত্রীলোকটির বয়েস চল্লিশ পঁয়তাল্লিশের বেশী নয়। তার চেহারাও খুব একটা জীর্ণ শীর্ণ বলা যায় না। বরং শরীরের কোনো কোনো অংশ বেটপভাবে ফুলো ফুলো ও থসথসে। চুলগুলো নোংরা পাটের মতন। তার মুখ ও চোখ দেখলে মনে হয়, পৃথিবীর আর কোনো ডাক্তার তাকে বাঁচাতে পারবে না, মৃত্যু তার দেহ-ভূমিতে পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এত জায়গা থাকতে এ বাড়ির দরজার সামনেই তাকে মরতে হবে কেন? এ তো বড় জ্বালাতনের কথা। অনেক মৃত্যু দেখতে দেখতে মানুষের মন অসাড় হয়ে যায়। দয়ামায়া তখন মনে হয় বিলাসিতা, নিজের এবং প্রিয়জনের বেঁচে থাকাই তখন সবচেয়ে বড় কথা। যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মরছে—সেখানে একজন আধজনকে নিয়ে মাথা ঘামাবার আর কি মানে হয়। কিন্তু ব্যাপারটা চোখের সামনে

ঘটছে বলেই এত অস্বস্তিকর।

প্রিয়রঞ্জন আর চিররঞ্জন এই দুই ভাই মিলেও অনেক চেষ্টা করলেন স্ত্রীলোকটিকে সরিয়ে দেবার। পারলেন না কিছুতেই। চিররঞ্জনের বাস্তব বুদ্ধি কম, তাই তিনি বললেন, দাদা, অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করলে হয় না?

প্রিয়রঞ্জন ভাইয়ের দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন এরকম একটা নির্বোধ তিনি জীবনে দেখেন নি। বললেন, তোর কি মাথা টাথা খারাপ হয়ে গেছে? রাস্তায় রাস্তায় লোক মরে পড়ে থাকছে—আর অ্যাম্বুলেন্স আসবে তাদের নিতে?

—তা হলে এদের হবে কি?

—কি আবার হবে? মরে গেলে কর্পোরেশানের গাড়ি এসে তুলে নিয়ে যাবে। তারা জ্যান্ত থাকতে থাকতে নেয় না, নিয়ম নেই। হাসপাতালগুলোতে জায়গা আছে? সুস্থ সমর্থ লোকগুলোকে ধরে ধরে জেলখানাগুলোও ভরে ফেলেছে আগেই—সেখানেও জায়গা নেই। যেমন হয়েছে শালার গভর্নমেণ্ট।

—তা বলে এরকম আমাদের চোখের সামনে মরবে?

—এই দারোয়ান হারামজাদা কোনো কম্মের না। রাত্তিরে এসে যখন বসেছিল তখনই যদি সরিয়ে দিত।

প্রিয়রঞ্জন পাড়ার ছোকরাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করলেন, বেশ কিছু টাকা দিতে চাইলেন। সুবিধে হলো না। এই সব ছেলেরা মদ খাবার পয়সা পেলে অনেক সময় বে-ওয়ারিশ মড়া পোড়াতে নিয়ে যায়। কিন্তু তারাও জ্যান্ত মানুষ নিয়ে কারবার করে না।

প্রিয়রঞ্জনের জরুরি কাজ ছিল, তিনি আর থাকতে পারছিলেন না। যে কোনো উপায়ে ওকে সরিয়ে দেবার হুকুম দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন, মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি রয়ে গেল।

সারা সকাল স্ত্রীলোকটি গেটের সামনে উবু হয়ে বসে ধুঁকতে লাগলো। বাড়ির বাচ্চারা দূর থেকে তাকে দেখে। চাকরবাকর দারোয়ান গেট দিয়ে যাওয়া-আসার সময় প্রত্যেকবার তাকে একবার করে ধমকে যায়। এক সময় তার বুক দিয়ে ঘড় ঘড় ঘড় ঘড় শব্দ শোনা যেতে লাগলো।

শ্রীলেখার একটি পুত্র সন্তান হয়েছে, প্রভাসকুমার তাদের নিয়ে ফিরে গেছেন খঙ্গপুরে। দুপুরবেলা বাড়িতে চিররঞ্জনই একমাত্র পুরুষ মানুষ। গৃহকর্ত্রী তাঁকে বললেন, ঠাকুরপো, গেরস্ত বাড়ির সামনে একজন মেয়েমানুষ এরকমভাবে মরছে, এতে বাড়ির অকল্যাণ হবে না?

চিররঞ্জন ব্যস্ত হয়ে বললেন, তা তো ঠিকই। কিন্তু কি করা বলুন তো বউদি?

—তুমি একটা যা হোক কিছু করো।

—আমি তো অনেক করে বললুম, ও তো কোনো কথাই শোনে না।

—ওর কি কোনো কথা শোনার ক্ষমতা আছে? এক কাজ করি। আমার খাবারটা বাপু ওকে দিয়ে এসো, খেয়েদেয়ে যদি যায়—

—বউদি আপনার খাবার দেবেন কেন? বরং আমারই আজ খিদে নেই—

তখন দেখা গেল, বাড়ির সকলেই নিজের নিজের খাবারটা দিয়ে দিতে রাজি আছে। কারুরই আজ খিদে নেই। সারা বাড়িতে আজ কেউ একবারও হাসেনি, জোরে কথা বলেনি—মৃত্যুর এমনই গাম্ভীর্য।

খাবার দিতে গিয়ে আর এক বিপত্তি হলো। বাড়ির ঝি খাবার নিয়ে যেই গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে—অমনি কোথা থেকে কাক চিলের মতন একদল অর্ধোলঙ্গ কালো কালো মানুষ ধেয়ে এলো। তারা সবাই খাবার চায়। গেটের সামনে চ্যাঁচামেচি হই হল্লা। তারা ভেবেছে, এ বাড়িতে আজ অন্নসত্র বসেছে। তখন দারোয়ানকে লাঠি ঘুরিয়ে সেই ভিড় সামলাতে হলো।

চ্যাঁচামেচিতে স্ত্রীলোকটি চোখ মেলে তাকিয়েছিল, একটু নড়ে চড়ে বসেছিল। ভিড় ফাঁকা হবার পর ঝি তার সামনে খাবারের থালাটা ধরে বললে, এই খাবি?

অদ্ভুত ম্যাজিকের মতন একটা ব্যাপার ঘটলো। স্ত্রীলোকটির চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল, দেহটা স্প্রিংয়ের মতন সোজা হয়ে উঠলো, ফ্যাসফেসে গলায় বললো, ভাত? দাও, দাও!

হেলাফেলা করে খাবার দেননি সুপ্রভা, অতিথি নারায়ণকে সেবা করার জন্য যত্ন করে থালা সাজিয়ে দিয়েছেন। গরম গরম ভাত, ডাল, বেগুন ভাজা, বাঁধা কপির তরকারি আর এক টুকরো মাছ। খাবার দেখলে মুমূর্ষুও জীবন ফিরে পায়। স্ত্রীলোকটি কেঁদে ফেললো। কাঁদতে কাঁদতে বললো, দাও, দাও!

গেটের সামনে খেতে দিলে আবার কাঙালীর দল ছুটে আসবে, তাই গেট বন্ধ করে সামনের চাতালেই খাওয়ানো সাব্যস্ত হলো। কুকুরের নাকের সামনে খাবার ধরে যেমন তাকে ডাকা হয়, সেই রকমভাবে বাড়ির ঝি ঐ স্ত্রীলোকটির মুখের কাছে খাবারের থালাটা ধরে এক পা এক পা করে পিছিয়ে বলতে লাগলো, এদিকে আয়, এদিকে আয়।

স্ত্রীলোকটির দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। পা দুটিতে পক্ষাঘাত ধরে গেছে। অদ্ভুত কোনো জন্তুর মতন সে মাটিতে ঘষটে ঘষটে এগিয়ে গেল। তারপর ভাতের থালার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। ডাল দিয়ে যে ভাত মাখতে হয়, তরকারি যে আলাদা খেতে হয়—এসব নিয়ম সে ভুলে গেছে। সে খাবলা খাবলা করে সব মুখে পুরেছে। বাড়ির সব লোক দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে তাকে—কেউ একটিও কথা বলছে না।

স্ত্রীলোকটি সারা সকাল মুখ খোলেনি, কিন্তু এখন সে খেতে খেতে আপন মনে অনেক কথা বলছে। তার কিছুই বোঝা যায় না। যেন সে অন্নের সঙ্গেই কথা বলছে—অভিমানী সন্তানের মতন যে অনেকদিন দূরে ছিল।

সবটুকু সে খেতে পারলো না খানিকটা পরে সে থালার পাশেই শুয়ে পড়লো।

ঝি বললো, ও ভালো মানুষের মেয়ে; তুমি বাপু খাবার টাবার খেয়ে এবার অন্য কোথাও যাও।

স্ত্রীলোকটি ফিক করে হেসে রীতিমতন পরিষ্কার গলায় বললো, যাবো গো মা, যাবো। একটুখানি শুয়ে নি!

সুপ্রভা বললেন, আহা থাক। আগে সবটা খেয়ে নিক। একটু জিরিয়ে নিক না হয়।

স্ত্রীলোকটি বললো, বড় ভালো রান্না হয়েছে। আহা ভাতের কি সুন্দর সোয়াদ।

সুপ্রভা বললেন, তোমার কোথায় বাড়ি? তোমার আর কেউ নেই?

—সবই ছিল মা। এখন কে আছে কে নেই, জানি না। আমাদের বাড়ি হেতমপুর।

—এতদূরে কার সঙ্গে এসেছো?

—আমার ছেলে।

—সে কোথায়?

স্ত্রীলোকটির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এলো। আরও কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলো না। যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

সুপ্রভা বললেন, আহা, ওর ঘর সংসার সব কিছুই ছিল।

ও তখন একটা হাত কপালে ছোঁয়ালো। যেন সে কিছু একটা বোঝাতে চায়।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে পেটের সব কিছু বমি করে বার করে দিল। এবং কাটা পাঁঠার মতন ছটফট করতে লাগলো। তখন তাকে সেখান থেকে সরানো আরও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যে পেট ভরে খায় নি, তার পেটে এক সঙ্গে এত খাবার বিষের মতন।

প্রিয়রঞ্জন বাড়ি ফিরে এসে সেই দৃশ্য দেখে রাগে একেবারে জ্বলে উঠলেন। কাছেই ছোট ভাইকে দেখে বললেন, তুই শেষে এই কান্ড করলি? আমার বাড়িতে অলক্ষ্মী ডেকে আনলি? তোকে আমি এত করে বলে গেলাম—

চিররঞ্জন বাধা দিয়ে বলার চেষ্টা করলেন যে তিনি ঠিক নিজের ইচ্ছেয় ওকে ভেতরে আনেননি—বৌদিই খাবার দিতে চেয়েছিলেন। প্রিয়রঞ্জন তা শুনলেন না। অনবরত বকতে লাগলেন। ছোট ভাইয়ের অকর্মণ্যতা দোষ বিষয়েও খোঁটা দিতেও ছাড়লেন না। রাগলে তাঁর জ্ঞান থাকে না। বারবার বলতে লাগলেন, আমার বাড়িতে এই উৎপাত! দয়াধর্ম যদি করতেই হয় বাইরে গিয়ে করলেই পারিস!

অনেক লোকজন সেখানে জমে গেছে। চিররঞ্জন আর দাঁড়াতে পারলেন না, মুখ নীচু করে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। নিজের ঘরে বসে রইলেন গুম হয়ে।

একটু বাদে হিমানী ব্যস্ত সমস্ত হয়ে সে ঘরে ঢুকে বললেন, ওগো ওর মুখখানা যেন নীল হয়ে যাচ্ছে, আর বোধহয় বেশীক্ষণ নেই—

চিররঞ্জন বিরক্তভাবে বললেন, যা খুশী হোক। আমি কিছু জানি না।

—তুমি যাবে না একবার?

—না। আমি গিয়ে কি করবো?

—কী হলো তোমার?

—দাদা আজকাল প্রতি পদে পদে বুঝিয়ে দেন, এটা ওঁর নিজের বাড়ি এখানে আমি কেউ নয়।

—কখন আবার একথা বললেন?

—রোজই তো বলেন। একটু আগেই তো সবার সামনে—

হিমানীর মুখে একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠলো। ঝংকার দিয়ে বললেন, তা বলেন যদি, মিছে কথা তো কিছু বলেন না! তোমাকে থাকতে দিচ্ছেন, খেতে পরতে দিচ্ছেন—এই তো যথেষ্ট।

—আমিও তো দাদার অফিসের কাজটাজ দেখছি।

—ছাই দেখছো! ও তো একটা ভুজুং ভাজুং দিয়ে বসিয়ে রেখেছেন শুধু তোমাকে। তোমার ওপর কোন্ দায়িত্বটা থাকে? কত করে তখন বললাম, আমার বাপের বাড়িতেই থাকতে। বাবা কোনোদিন যত্ন আত্যির ত্রুটি করেছেন?

চিররঞ্জন রেগে উঠলেন। তীব্র গলায় বললেন, তোমার বাপের বাড়িতে চিরকাল ঘর জামাই হয়ে থাকবো নাকি? তোমার জন্য কি আমার মান সম্মানও রাখতে পারবো না?

হিমানীও ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, আর আমিই বুঝি তোমার দাদার বাড়িতে দাসী-বাঁদী হয়ে থাকবো সারা জীবন?

—মোটেই তোমাকে দাসী-বাঁদী করে রাখা হয়নি।

—তুমি কতটুকু জানো? আমার ছেলেকে আমি ইচ্ছে মতন কোনোদিন কিছু খেতে দিতে পারি না পর্যন্ত!

একটি অর্থহীন মৃত্যুর পটভূমিকায় এদের মনের তিক্ততাগুলো বেরিয়ে আসছে। চিররঞ্জন আরও কিছু কঠোর কথা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। আর কোনো উত্তর দিলেন না। তাঁর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। তাঁকে তো আরও বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকতে হবে—কিন্তু কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বাঁচবেন? হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল ছাত্র বয়েসের দিনগুলোর কথা। আমহার্স্ট স্ট্রীটে একটি বাড়িতে থাকতেন, কলকাতায় তখনো কোনো সহায় সম্বল না থাকলেও দিনগুলো অনেক লঘু ছিল। মনে কত আশা ছিল। কখনো কোনো কারণে মন খারাপ হলেও ছাত্রীর পিসীমা মলিনার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেই মন আবার ভালো হয়ে যেত। মলিনা প্রায় তাঁরই সমান বয়েসী ছিলেন—কি শান্ত, স্নিগ্ধ দুটি চোখ। মন খারাপ হলেই মলিনা ঠিক বুঝতে পারতো, কাছে এসে বলতো, আপনার কী হয়েছে আমাকে বলুন তো! চিররঞ্জনের তখন বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠতো।

চিররঞ্জন অনুতপ্ত হয়ে ভাবলেন, এবার কলকাতায় এসে একদিনও আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে দেখা করতে যাওয়া হয়নি। আঃ, এখন যদি মলিনার কাছে গিয়ে বসে থাকা যেত!

হিমানী তখনও বকাবকি করছিলেন বলে চিররঞ্জন বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। নীচে তখন মুমূর্ষ স্ত্রীলোকটিকে ঘিরে ছোট খাটো একটা ভিড়। চিররঞ্জন কি ভেবে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। কাছাকাছি একটা ডাক্তারখানায় গিয়ে বললেন, একবার আসবেন আমাদের বাড়িতে? এক্ষুনি?

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার হয়েছে বলুন তো!

চিররঞ্জন সব ঘটনা বললেন।

ডাক্তার গম্ভীরভাবে সব শুনে বললেন, দেখুন, এটা একজন গৃহস্বামীর সমস্যা হতে পারে—কিন্তু ডাক্তারদের তো করার কিছু নেই?

—আপনি চিকিৎসা করতে পারবেন না?

—ডাক্তাররা তো ধন্বন্তরি নয় যে একজন মুমূর্ষু রুগীকে গিয়ে এক পুরিয়া ওষুধ দেবো কিংবা একটা ইঞ্জেকশান দেবো—আর অমনি সে হেঁটে চলে আপনার বাড়ির থেকে চলে যাবে? আর একটু অপেক্ষা করুন—তারপর মুর্দফরাসদের খবর দেবেন।

—আমি বলছিলাম, ওকে বাঁচানো যায় কিনা। আমি চিকিৎসার খরচ দেবো।

ডাক্তার এবার রীতিমতন ব্যঙ্গ করে বললেন, একি ছেলেখেলা পেয়েছেন? চিকিৎসা নিশ্চয়ই করা যেতে পারে—তাহলে ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে খাট বিছানা পেতে শোওয়ান—দেখাশুনো করার জন্য একজন লোক রাখুন। নাকি রাস্তায় ফেলে রেখেই চিকিৎসা?

চিররঞ্জন তবু ডাক্তারটিকে নিয়ে এলেন। ভিড় সরিয়ে ডাক্তার স্ত্রীলোকটিকে এক পলক দেখেই বললেন, আর কিছু করার নেই। আর কয়েক মিনিট, বড় জোর ঘণ্টা খানেক।

সুপ্রভা চোখের জল ফেলতে শুরু করেছেন। বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের তিনি সরিয়ে দিয়েছেন সেখান থেকে। ছেলেমেয়েদের অকল্যাণের আশঙ্কাতেই তাঁর বুক

কাঁপছে। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার কাছে ওর অন্ন পাওয়া ছিল, তাই মরার আগে এখানে না এসে পারেনি। হিমানীরও চোখে জল।

মৃত্যুর ঠিক আগে স্ত্রীলোকটির চৈতন্য ফিরে এলো। সে জড়ানো গলায় বললো, ওগো, আমাকে বাড়িতে দিয়ে এসো। তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে বাড়িতে রেখে এসো।

চিররঞ্জন মুখ ঝুঁকিয়ে বললেন, ও মেয়ে, এখন ভগবানের নাম করো। বলো, কালী-তারা-ব্রহ্মময়ী—

স্ত্রীলোকটি বললেন, বাবু, আমরা মোছলমান। ওসব তো জানি না।

মোছলমান শুনে প্রিয়রঞ্জন একেবারে আঁতকে উঠলেন। লীগ মিনিস্ট্রির আমলে হিন্দুর বাড়িতে মুসলমান মড়া—এতে আবার কোন্ বিপদ হবে কে জানে। তিনি বললেন, কী সর্বনাশ, কী সর্বনাশ! মোছলমান তো আমার বাড়িতে কেন? নাজিমুদ্দি-সুরাবর্দি'র বাড়িতে যেতে পারলে না? তারা কত বড়লোক—

চিররঞ্জন বললেন, দাদা, ওকে একটু শান্তিতে মরতে দাও!

তারপর স্ত্রীলোকটির কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, এই সময় তোমাদের মুখে গঙ্গাজল দেবার নিয়ম আছে কিনা জানি না। তুমি তোমাদের ভগবানের নাম করো। বলো, হে আল্লা, হে খোদা, আমাকে তোমার পায়ে স্থান দাও।

স্ত্রীলোকটি বললো, নিয়ামৎ, নিয়ামৎ রে—

ঠিক সেই সময় রাস্তা দিয়ে বিরাট শব্দে কয়েকটি মিলিটারি গাড়ি যাওয়ায় সবাই চমকে সেই দিকে চোখ ফেরায়। তাই মৃত্যুর মুহূর্তটি কারুকে দেখতে হয়নি।

॥ ৫২ ॥

আমরা অনেক মৃত্যু দেখেছি। যে-যুগে আমরা জন্মেছি, সে যুগ মৃত্যুতে আকীর্ণ। অবশ্য মানুষের ইতিহাসই তো মানুষ মারার ইতিহাস। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এসব তো এ দেশের নিত্যসঙ্গী। তবু এ-সবের পরেও মানুষের সৃষ্টি করা কারণে হাজার হাজার মানুষ মরে। সুদূর পোল্যান্ড দেশ সম্পর্কে হিটলারের মনে একটা শখের উদয় হলো, সেই কারণে মুর্শিদাবাদের একটা পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। যাক না, কি আসে যায় তাতে! পৃথিবীতে এত জন্তু জানোয়ার মারছে মানুষ, স্বার্থের কারণে কিছু মানুষকেও যে মারবে—এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? কোনো রকম প্রাকৃতিক বাধা তো নেই। তবু যে মৃত্যুর এত প্রতিবাদ, যুদ্ধ থেমে যাবার পরই শান্তির জন্য চ্যাঁচামেচি—তার একমাত্র অর্থ বোধহয় এই, আমাকে মেরো না, আমাকে বাঁচতে দাও।

মৃত্যু দিয়ে পরিবেষ্টিত এই জীবন এত মোহময়। যে কোনো মুহূর্তে খেলা শেষ হয়ে যেতে পারে, তবু এই খেলা থেকে বাদ পড়তে ইচ্ছে করে না। সেই কবে থেকে শুরু হয়েছে এই খেলা। ছিলাম মাতৃগর্ভে, এক তরল সমুদ্রে নারায়ণের মতন ভাসমান। নিরবিচ্ছিন্ন অন্ধকার, তন্দ্রাময় দিন রাত্রি, শুধু অবিরাম শুনতে পাই একটা দুপ দুপ শব্দ। কোথা থেকে সেই শব্দ আসে জানি না, কোথায় আদি জানি না, বোধ নেই, দৃষ্টি নেই, শুধু সেই শব্দ।

তারপর একদিন সেই তরল সমুদ্রে আলোড়ন ওঠে। যে রক্ষণশীল দেয়াল

আমাকে ঘিরে রেখেছিল, হঠাৎ সেই দেয়াল প্রবল শক্তিতে আমাকে চেপে ধরে। কেন এই শাস্তি, কেন ওই সুখশয্যা থেকে আমাকে ঠেলে ফেলে দেবার উদ্যোগ। মাথা চু দিয়ে বেরিয়ে আসি, মুখে অসহ্য কষ্টের চিহ্ন নিয়ে। সেই কষ্ট সামলাবার জন্য আমাকে নিশ্বাস নিতে হয়—এই রোগ ভোগ জীবাণু ও শত্রুতে ভরা পৃথিবীর হাওয়ায়। দম ছেড়ে কান্না বার করতে আমার পাঁচ ছ' সেকেন্ড সময় লাগে। কেউ আমার কষ্ট বোঝে না, আমার কান্না দেখে কাঁদে না, তারা হাসে। আমি হাত পা ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানাই, কেন আমাকে এখানে নিয়ে এলে? কেউ ফিরিয়ে দেবার কথা ভাবে না। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে এরকম প্রতিবাদ জানিয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আমার নাভির কাছে ফুল ফুটে ওঠার অনুভূতি হয়। এখন আমি একটা আলাদা অস্তিত্ব—এখন আমিও সৃষ্টিকর্তা। আমিও একদিন নতুন প্রাণের সৃষ্টি করতে পারবো। কিংবা, সামান্য অঙ্গুলি হেলনে অন্যের প্রাণ বিনষ্ট করে দেবো। আমি এসেছি। সেই মুহূর্তে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ব্রহ্মার নিদ্রার মতন আমারও ঘুমের এক একটি মুহূর্তে কল্পান্ত পার হয়ে যায়। আবার জেগে উঠে দেখি, এ পৃথিবী অনেক বদলে গেছে। আমার খিদে পায়।

আমি সেই ঘুম থেকে জেগে না উঠতেও পারতাম। আমি মাতৃগর্ভ থেকে মৃত্যুতে নীলবর্ণ হয়েও বেরুতে পারতাম। কিংবা রক্তমাখা একটা মাংসপিণ্ড হয়ে আমার স্থান হতে পারতো ডাস্টবিনে। সে রকম কিছু হয়নি। আমি এসেছি। তা হলেও মৃত্যু আমার সব সময়ের সঙ্গী। আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় প্রকৃতি—আবার এই প্রকৃতিই সামান্য সুযোগে আমাকে মেরে ফেলবে। এসব জেনে-শুনেও বেঁচে থাকার কি অদ্ভুত নেশা মানুষের।

সব মানুষই তার জীবনের অনিশ্চয়তার কথা জানে, তবু ভুলে থাকে। এটাও প্রকৃতির খেয়াল যে মানুষকে মৃত্যুর কথা ভুলিয়ে রাখবে। শুধু এক এক সময় মনে হয়, না জন্মালেই বা কি হতো।

আমার কৈশোরে আমি দেখেছি দেশজোড়া অনাচার ও মৃত্যুর তাণ্ডব। তবু সেই সব দৃশ্যও তো আমাকে সর্বাঙ্গীনভাবে বিমর্ষ করে তোলেনি। সময় পার হয়ে যায়, আমরা সব ভুলে যাই। দু-একটা আকাঙ্ক্ষিতকর ঘটনার স্মৃতিই জ্বলজ্বল করে।

জীবনে তিনবার আমি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছি। মানুষ কেন আত্মহত্যা করতে চায়, তা আমি জানি না। আমি শুধু নিজের কথাই জানি। তবে, এটুকু সাধারণভাবে বলা যায় যে, বয়স্ক ব্যক্তিরা সচরাচর আত্মহত্যা করে না, এই ঝোঁকটা দেখা যায় কৈশোর-যৌবনেই বেশী। আমি প্রথমবার চেষ্টা করি আমার পনেরো বছর বয়েসে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। হিরোসিমা-নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমা পড়েছে। হিটলার এবং নেতাজীর বেঁচে থাকা বা মৃত্যু সম্পর্কে গুজবের অন্ত নেই। আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের বিচার হবে লাল কেল্লায়। বিজয় উৎসবের জন্য প্রত্যেক স্কুলে স্কুলে মিষ্টি বিতরণ করে লম্বা ছুটি দেওয়া হয়েছে। সেবার আমি বন্ধুদের সঙ্গে দেওঘর বেড়াতে গেলাম। বন্ধুদের সঙ্গে আমাকে বেড়াতে যেতে দেওয়ার ব্যাপারে বাবার গোড়াতেই একটা আপত্তি ছিল। কিন্তু বাবা এখন আর জোর দিয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করেন না। তা ছাড়া বন্ধুদের সঙ্গে আমার এতই ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে যে আপত্তি করার তেমন প্রশ্নই ওঠে না। বাবা আমাকে কুড়িটা টাকা দিয়ে দিলেন আসবার সময়ে।

দেওঘরের কম্পাস টাউনে বিষ্ণুদের কোন আত্মীয়ের বাড়ি। বাড়িখানা বিরাট। বাগানে অজস্র ডালিয়া, গোলাপ, ইউক্যালিপটাস ও আরো গাছ। এসেছেও বিরাট একটি দল। বিষ্ণুর মা বাবা, রেণুর মা, ছোট কাকা, অংশু আর রেণু, তিনজন ঠাকুর চাকর। আমার আর বিষ্ণুর ম্যাট্রিক পরীক্ষা সামনেই। আমাদের একটা আলাদা ঘর দেওয়া হয়েছে—সকালে সন্ধ্যায় আমাদের নিয়মিত পড়াশুনো করতে হবে।

জীবনে মানুষকে অনেক পরীক্ষা দিতে হয়, কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষার চেয়ে শক্ত কিছু নেই। আমি পড়াশুনোয় খুব একটা খারাপ ছিলাম না—ক্লাসে ওঠার পরীক্ষায় কোনোবারই তো আটকে যাইনি, তবু ম্যাট্রিক পরীক্ষার কথা ভাবলেই মনে হতো ফেল করবো। এ যেন লটারি। কেননা, আমাদের আগের বছরে জীমূত ফেল করেছিল। জীমূত আমার থেকে অনেক বেশী ঝকঝকে ছেলে, কত সুন্দরভাবে সাজিয়ে কথা বলতে পারে, ইংরেজি গল্পের বই পড়ে ডিকশনারি না দেখে, তবু সে অংকে ফেল করেছিল।

বিষ্ণুর অবশ্য আত্মবিশ্বাস বেশী। ও শুধু ফার্স্ট ডিভিশন পাওয়ার কথাই চিন্তা করে না—ও স্ট্যান্ড করার কথা ভাবে। পড়াশুনোয় বিষ্ণুর মনোযোগও অনেক বেশী। আমার মা আমাকে পড়াশুনোর জন্য ইদানীং প্রায়ই বকাবকি করতেন। কখনো কখনো বলতেন, বিষ্ণুকে দেখে শিখতে পারিস না? ওর পা ধোওয়া জল খা। অথচ বিষ্ণুর চেয়ে যে আমি অঙ্ক ভালো জানি, সে কথা কেউ জানে না।

চমৎকার হালকা সব দিন। বাতাসে ধুলোবালি নেই, আকাশ নম্র নীল। রাস্তা দিয়ে হাঁটবার সময় নাকে আসে শুকনো পাতার সুগন্ধ।

ভোরবেলা উঠে বাড়িসুদ্ধু সবাই বেড়াতে যায়। এটা বিষ্ণুর বাবা একেবারে নিয়ম করে দিয়েছিলেন স্বাস্থ্যের কারণে। স্বাস্থ্যকর জায়গায় বেড়াতে এসে রোজ না হাঁটলে শরীর ভালো থাকে না। বেশির ভাগ দিনই আমরা নন্দন পাহাড়ের দিকে যেতাম। কম্পিটিশান দিতাম কে আগে উঠতে পারে। প্রচণ্ড দৌড়োদৌড়ি করে ওপরে উঠে হাঁপাতাম। আমাদের আরাম দেবার জন্য আকাশ তখন ঠাণ্ডা সুবাতাস পাঠিয়ে দিত। দূরের ধান ক্ষেত হলুদ-সবুজ সতরঞ্চির মতন।

নন্দন পাহাড়ের ওপরটায় দাঁড়ালে দূরে একদিকে দেখা যায় ডিগরিয়া পাহাড় আর একদিকে ত্রিকূট। এই দুই পাহাড় সম্পর্কে আমরা কত রকম গল্প শুনতাম। ডিগরিয়া পাহাড়ে নাকি কেউ কখনো উঠতেই পারে না। ভারতীয়দের তৈরী প্রথম বোমা পরীক্ষার জন্য ফাটানো হয়েছিল ওই পাহাড়ে। যে বাঙালীর ছেলেটি বোমাটি নিয়ে গিয়েছিল, সে সেই বিস্ফোরণে মারা যায়, কিন্তু তার দেহটাও অদৃশ্য হয়ে যায়। এই গল্প বললেন বিষ্ণুর বাবা। ডিগরিয়ার তুলনায় ত্রিকূট পাহাড় বেশী উঁচু হলেও মানুষ উঠতে পারে।

একদিন বিষ্ণু আর আমি দুখানা সাইকেল নিয়ে ঘুরে এলাম ত্রিকূট পাহাড়। অংশু সাইকেল চালাতে জানে না—আমরা ওকে পেছনে ক্যারি করবার চেষ্টা করেছিলাম —কিন্তু পাহাড়ী রাস্তায় একজনকে পেছনে বসিয়ে সাইকেল চালানো অসম্ভব—তাই ওকে নামিয়ে দিয়ে গেলাম। অংশু কথা বন্ধ করে দিল আমাদের সঙ্গে।

কোনো গাইড সংগে না নিয়েই ত্রিকূট পাহাড়ের একটা চূড়ায় উঠেছিলাম বিষ্ণু আর আমি। আমাদের অভিযাত্রী হবার সেই প্রথম পদক্ষেপ। বিষ্ণু দারুণ উৎসাহ পেয়েছিল। কিন্তু পাহাড়ের অনেক উঁচুতে এক পাল মোষ দেখে আমি একটু হতাশ হয়েছিলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম বুনো মোষ, পরে দেখলাম সংগে রাখাল রয়েছে।

যে-পাহাড়ে মোষরাও উঠতে পারে- সেই পাহাড়ে অভিযান করার কৃতিত্ব কোথায়!

প্রাতর্ভ্রমণের পর বাড়িতে এসে জলখাবারের পর্ব। তারপর আমি আর বিক্নু পড়তে বসি। আমাদের দেখাদেখি রেণু আর অংশুও বই-খাতা নিয়ে আসে। কিন্তু ওরা নিচের ক্লাসে পড়ে বলে ওদের আমরা পাত্তা দিই না। তম্বা দিয়ে বলি, যা, যা, এখানে বিরক্ত করিস না।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আমি আর বিক্নু বাড়ির মধ্যে থাকি না। বাগানে একটা ইউক্যালিপটাস গাছের নীচে আমরা আস্তানা বানিয়ে নিয়েছি। সেখানে শুয়ে থাকি। শুকনো ইউক্যালিপটাস পাতা গুঁড়ো করে নাকের কাছে গন্ধ শুঁকি। আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে এত ভালো লাগে যে মন খারাপ হয়ে যায়।

এ কথাও ঠিক যে, তখন মাঝে মাঝেই আমার খুব মন খারাপ হয়ে যেত। সেই মন খারাপের আমি কোনো কারণই খুঁজে পাইনি। মা-বাবাকে ছেড়ে থাকবার জন্য আমার মন খারাপ হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তখন আমার পনেরো বছর বয়েস—তখনই মা-বাবার সঙ্গে আমার একটু একটু করে দূরত্ব তৈরী হয়ে যাচ্ছে—বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতেই আমার বেশী ভালো লাগে। দেওঘরে বন্ধুদের সঙ্গে এত হইচই-এর মধ্যেও আমার হঠাৎ হঠাৎ মন খারাপ লাগতো। ঘরের মধ্যে সবাই মিলে খুব গল্প হচ্ছে হয়তো—আমি এক ফাঁকে সেখান থেকে চলে যেতাম। বাগানে ঘুরতে ঘুরতে একটা বড় সাদা গোলাপ ছিঁড়ে নিয়ে ভাবতাম, আমাদের দুঃখ দেবার জন্যই এই ফুলটা ফুটেছে।

বিক্নুর ছোটকাকা সেই অবস্থায় আমাকে দু-একবার দেখে ঠাট্টা করে বলতেন, আমাদের কবি মশাইয়ের কান্ড দেখো! কি হে বাদলকুমার, কবিত্ব একেবারে উথলে উঠলো নাকি?

আমি ওঁকে অনেকবার বলেছি যে আমার নাম বাদলকুমার নয় বাদলরঞ্জন—। কিন্তু সে কথা ওঁর মনেই থাকে না।

সন্ধ্যের সময় বড়রা আলাদাভাবে বেড়াতে যেতেন। ছোটরা বাড়িতেই থাকবে। কিংবা ছোটরা দল বেঁধে বাইরে গেলেও সাতটার মধ্যে ফিরতে হবে। সন্ধ্যের সময় আমাদের পড়াশুনো বিশেষ হতো না—তখন আমরা নানারকম খেলাধুলোর উদ্ভাবন করতাম। ভূত সাজার খেলাটা ছিল আমাদের খুব প্রিয়। রেণুর সাংঘাতিক ভূতের ভয়—আর ওকে ভয় দেখিয়েই আমাদের বেশী মজা।

খাওয়া দাওয়ার পর অনেক রাত জেগে গল্পের বই পড়তাম বিক্নু আর আমি। তখন আমরা বড়দের বইয়ের জগতে উত্তীর্ণ হয়েছি। বিক্নু শরৎ চাটুজ্যে শেষ করছে। আমি ছিলাম ডিটেকটিভ গল্পের পোকা—দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রহস্য লহরী সিরিজ, শশধর দত্তের মোহন সিরিজ একটার পর একটা গিলছি। মোহন রমাকে প্রায়ই বলতো, 'ভয়াতুরা কপোতী আমার'—কি ভালো যে লাগতো এই উৎপ্রেক্ষটা! চুপি চুপি আমি এটা একটা কবিতাতেও ব্যবহার করে ফেলেছিলাম পর্যন্ত।

বেশ তো কাটছিল দিন। এর মধ্যে আমার একটু জ্বর হলো। সামান্য জ্বর, আর কোনো অসুবিধে হয় না, শুধু শরীর ম্যাজ-ম্যাজ করে। কিন্তু এতেই বাড়িসুদ্ধ সবাই এমন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন যে আমার খুব লজ্জা করতে লাগলো। এই সময় জ্বর হবার কোনো মানে হয়! কোনোক্রমে জ্বরটা গা থেকে ঝেড়ে ফেলা যায় না! কিন্তু জ্বরটা চলতেই লাগলো তিন-চার দিন, সেই সঙ্গে পেটে ব্যথা! জ্বরের কথা লুকোনো যায় না—কিন্তু পেটব্যথার কথাটা আমি কারুকে বলিনি। এক এক সময় আমার

মনে হতো এর থেকে মরে যাওয়াই ভালো। সেই আমার প্রথম মৃত্যুচিন্তা।

একদিন দুপুরবেলা আমি একা একা শুয়ে বই পড়ছি। চাদর দিয়ে আমার শরীর ঢাকা. বাইরে রোদ ফটফট করছে, তবু আমার একটু একটু শীত বোধ হয়। বিষ্ণু আর অংশু কোথায় জানি না—হয়তো বাগানে গাছতলায় শুয়ে আছে কিংবা জসিডিতেও যেতে পারে। রেণু ওর মা আর কাকা-কাকীমার সঙ্গে এইমাত্র গেল বৈদ্যনাথ মন্দিরে পুজো দিতে। ছোটকাকা তাঁর নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছেন, এইখান থেকেও শুনতে পাওয়া যায় তাঁর নাক ডাকার শব্দ।

বইটা পড়তে পড়তে আমার চোখ টনটন করছিল। এক সময় বাগানের গেট খোলার শব্দে জানলার দিকে তাকিয়ে দেখলাম রেণু ছুটতে ছুটতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। দড়াম করে একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ হলো। একটু বাদেই রেণু যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, আমি ডাকলাম, এই রেণু, শোন্—

রেণু জানলা দিয়ে উঁকি মেরে বললো, কি রে?

আমি বললাম, আমাকে এক গেলাস জল দিয়ে যা না।

রেণু ফিরে এলো বাড়ির মধ্যে। জলের গেলাস হাতে আমার ঘরে ঢুকে বললো, তুই একলা একলা শুয়ে আছিস? ছোড়দারা কোথায়?

—কি জানি। বাগানে নেই?

—না তো।

—তা হলে বোধ হয় জসিডি গেছে। আজ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এখান দিয়ে ট্রেনে করে যাবেন, ছোটকাকা বলছিলেন—

—বাড়িতে আর কেউ নেই?

—ছোটকাকাই তো রয়েছেন! নাক ডাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছিস না?

—আমি বসবো তোর কাছে?

রেণুর এই কথাটায় আমি একেবারে অভিভূত হয়ে গেলুম। একলা একলা খুব মন খারাপ লাগছিল। অথচ অন্য কেউ যদি আমার জ্বরের জন্য সহানুভূতি দেখিয়ে আমার সঙ্গে থাকতে চাইতো—আমি তাতেও লজ্জা পেতুম, আমার জন্যে কারুকে আটকে রাখা পছন্দ করতুম না। কিন্তু রেণু সম্পর্কে সে কথা মনে হলো না।

তবুও আমি ক্ষীণ গলায় বললুম, তুই পুজো দিতে গেলি না? ফিরে এলি যে?

রেণু বললো, আগে একদিন তো গেছি। মন্দিরে বড্ড ভিড় হয়, আমার ভালো লাগে না।

কয়েক বছর আগে রেণুর যখন ঘন ঘন অসুখ করতো, তখন আমি ওর বিছানার পাশে বসে ওকে গল্পের বই পড়ে শোনাতাম। জানি না, সে কথা রেণুর মনে আছে কি না। এই কয়েক বছরে রেণু অনেকটা বদলে গেছে। চোখে চশমা নেওয়ায় মুখখানা অন্য রকম দেখায়—মাথার কোঁকড়া চুল এখন কোমরের কাছ পর্যন্ত নেমেছে। এখনো ফ্রক পরে রেণু, কিন্তু দু-একদিন শাড়ি পরতেও দেখেছি। আজ পরে আছে একটা গোলাপী রঙের ফ্রক। রেণু পড়াশুনোয় খুব ভালো, প্রত্যেক পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়।

আমি উঠে বসে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিলুম। রেণুকে বললুম, তোর চশমাটা খুলে ফ্যাল তো! চশমা ছাড়া তুই দেখতে পাস না?

—দূরের জিনিস ভালো দেখতে পাই না। কাছের জিনিস দেখতে পাই।

—আমি তো কাছেই বসে আছি।

রেণু আমার চোখের দিকে তাকালো। আমিও ওর চোখে স্থির দৃষ্টি মেলে রইলাম। এই রকমভাবে দুজনে তাকিয়ে আছি তো তাকিয়েই আছি। যেন আমরা স্ট্যাচুর খেলা খেলছি।

একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, রেণুর সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি কথা খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ অন্য সময় অনর্গল কথা বলি। এখন কিছু বলতে গেলেই মনে হচ্ছে, এটা বলা ঠিক হবে না। রেণুও তো কোনো কথা বলছে না।

একটু বাদে বললাম, তুই শুধু শুধু আমার জন্য এখানে বসে রইলি। কাকীমাদের সঙ্গে গেলে কত কিছু জিনিসপত্তর কেনাকাটি হতো।

রেণু বললো, মোটেই আমি শুধু শুধু বসে থাকছি না। আমার ইচ্ছে হচ্ছে, তাই বসে আছি।

—তোকে দেখে আমার মনটা ভালো হয়ে গেল।

—মন খারাপ ছিল বুঝি?

—হুঁ। তোকে দেখলেই আমার মন ভালো হয়ে যায়।

—সত্যি?

ঠিক ঠাট্টার সুরে নয়, কথাটা বলতে গিয়ে রেণু একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল। তারপর বললো, আমারও মাঝে মাঝে খুব মন খারাপ হয়ে যায়।

—কেন?

—কি জানি!

আমি একটু চুপ করে থেকে বলেছিলাম, রেণু, তুই আর আমি সারা জীবন বন্ধু থাকবো। তুই রাজি আছিস?

রেণু অনামনস্কভাবে বললো, হুঁ।

—আমাদের কখনো ঝগড়া হবে না। তুই যা বলবি, আমি শুনবো। আমি যা বলবো, তোকেও শুনতে হবে। রাজি?

—হুঁ।

—আমরা কেউ কারুর ওপর রাগ করতে পারবো না। রাগ করলেও ক্ষমা করে দেবো আবার। তাই না!

—হুঁ।

—তুই শুধু হুঁ হুঁ বলছিস কেন? আর কিছু বলছিস না যে?

—তুই আমাকে কখনো ভুলে যাবি না?

—ভুলবো কেন? ভুলে যাওয়া কি সম্ভব নাকি!

—না, সত্যি করে বল্, ভুলে যাবি কি না!

—বলছি তো—

—নিজের বুকে হাত দিয়ে বল্।

রেণু মাঝে মাঝে এই রকম পাগলামি করে। কখন যে কোন কথাটা কি ভেবে বলে, তা বোঝার উপায় নেই। আমরা দুজনে কাছাকাছি বসে আছি, সারাজীবন আমাদের দেখা হবে—এর মধ্যে আবার ভুলে যাবার কথা আসে কি করে? তবু রেণুর এই ধরনের পাগলামিই আমার অসম্ভব ভালো লাগে।

আমি ওর একটা হাত তুলে নিয়ে আমার মুখে বুলোতে লাগলাম। আমার জ্বরতপ্ত মুখে ওর হাতের স্পর্শ অসম্ভব ঠাণ্ডা লাগলো। আমি বললাম, রেণু, তোর হাতে কি সুন্দর গন্ধ!

রেণু লজ্জা পেয়ে বললো, যাঃ! আমি তোর গায়ে হাত বুলিয়ে দেবো?

—না। আমার অসুখ সেরে গেছে।

—এখনও তো জ্বর রয়েছে।

—থাকুক।

আমার মনে হলো, রেণুর সমস্ত শরীরটা একটা অয়স্কান্ত মণি। কত ছেলে বেলা থেকে ওকে চিনি, অথচ আজ সব কিছুই অন্য রকম। আমি ঝুঁকে এসে রেণুর ঘাড়ে, গলায়, কপালে, গালে চুমু খেতে লাগলুম।

রেণু বিস্মিতভাবে বললো, এ কি?

তারপর একটু সরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এগুলো কি খারাপ কাজ?

আমি তীব্র গলায় বললুম, না।

—তুই কি করে জানলি?

—আমি ঠিক জানি।

রেণু আবার কাছে এগিয়ে এসে বসলো। আমি রেণুর গলা জড়িয়ে ধরলাম। আমার মনের মধ্যে একটা উথাল পাথাল চলছিল। আমি কি করছি, নিজেই জানি না। আমি ব্যগ্রভাবে রেণুর বুকের দিকে তাকিয়ে আছি। আমি রেণুর বুকের মাঝখানে হাত রেখে বললাম আমি তোর বুক ছুঁয়ে বলছি, তোকে কখনো ভুলবো না।

রেণু আমার হাত সরিয়ে দিতে গেল। আমি ওর বুকে আমার মুখটা ঘষতে লাগলাম।

রেণু বললো, এটা কি খারাপ কাজ?

—না।

—তোকে কে বলেছে?

—আমি বইতে পড়েছি—

—যদি বইতে মিথ্যে কথা লেখে!

—বইতে কখনো মিথ্যে কথা লেখে না। তোর ভালো লাগছে না?

—কি জানি?

—তুই নিজে জানিস না? আমার অসম্ভব ভালো লাগছে। দ্যাখ, আর একবার করছি।

—কিন্তু এটা যদি খারাপ কাজ হয়?

—কক্ষনো নয়।

ইচ্ছে হলো রেণুকে আমার বুকে জড়িয়ে একেবারে পিষে ফেলি। ওর ছোট্ট শরীরটা আমাব বুকের মধ্যে চলে যাক। রেণুকে শুইয়ে ফেলে আমি ওর ফ্রকের নীচে মাংসল বুক দেখার জন্য অধীর হয়ে উঠলাম।

রেণু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। একটু বাদে আমার কাছ থেকে পিছলে সরে গিয়ে গম্ভীরভাবে বললো, এটা নিশ্চয়ই খারাপ কাজ। আমি ঠিক জানি।

—না, রেণু শোন্—

—কিচ্ছু শুনবো না। এটা খারাপ কাজ, এটা অসভ্য, আমি ঠিক জানি—

রেণুর মুখে খানিকটা ভয় এবং খানিকটা ছেলেমানুষী অহঙ্কার মেশানো। সেই মুহূর্তে ওকে "ভয়াতুরা কপোতী আমার" বলার খুব ইচ্ছে করছিল, কিন্তু লজ্জা পেলাম।

রেণু চুল ঠিক করতে করতে বললো, খারাপ ছেলেমেয়েরা এই সব অসভ্য জিনিস করে। তুই যদি এরকম আর কখনো করিস, তা হলে তোর সঙ্গে আমি মোটেই বন্ধুত্ব করতে চাই না।

—রেণু, প্লিজ, চলে যাস না।

—তোর সঙ্গে আজ আমি কথা বলবো না!

তারপর কয়েক ঘণ্টা আমার যে কিভাবে কাটলো, তা আর কেউ জানবে না। সন্ধ্যের পর আমি ঠিক করলাম, রেণুর চোখে যখন আমি ছোট হয়ে গেছি, তখন আর আমার বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। শুধু এই কারণটুকু নয়, রেণুকে ছাড়িয়ে আমার বিষাদ আরও পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। আমার যাবতীয় মন খারাপ এক হয়ে মিললো। আমার বদ্ধমূল ধারণা হলো, আমার বেঁচে থাকার কোনো মূল্য নেই, এই পৃথিবীতে আমি অবান্তর। সেই রাত্তিরেই আমি আত্মহত্যার চেষ্টা করি।

মরিনি যে তা বলাই বাহুল্য। না হলে, পরে আরও দু'বার আমি আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কি করে?

॥ ৫৩ ॥

সকালবেলা ঘণ্টাখানেকের জন্য ঘরের বাইরে আসা যায়। প্রাতঃকৃত্যের জন্য গোসলখানার বাইরে লাইন দিয়ে দাঁড়ায় আণ্ডার ট্রায়াল বাবুরা। নানারকম রস রসিকতা গুঞ্জরিত হয়। জেলের জীবন অনেকটা সহ্য হয়ে গেছে।

কয়েকজনকে দেখা যায় চাতালে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম করতে। প্রিয়লালবাবু একটি স্কুলের ড্রিল মাস্টার ছিলেন, তিনি এখানেও মাস্টারী ভঙ্গিতে অন্যদের সঠিক ব্যায়ামের নির্দেশ দেন।

অবশ্য সোস্যালিস্ট দলের ছেলেরা তখন আলাদা দাঁড়িয়ে থাকে। জাতিভেদের মতনই জেলখানার মধ্যে পার্টিভেদ খুব প্রবল। এক পার্টির লোক অন্য-পার্টির কারুর সঙ্গে বেশী মেলামেশা করলে সেই নিয়ে রীতিমতন কানাকানি শুরু হয়ে যায়। যেমন, প্রৌঢ় ধনঞ্জয়বাবুর সঙ্গে ইন্দ্রজিতের অন্তরঙ্গতা অনেকেই রীতিমতন খারাপ চোখে দেখছে। ধনঞ্জয়বাবু একটি দিনও ইন্দ্রজিৎকে না দেখে থাকতে পারেন না। ইন্দ্রজিৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গেলে তিনিও অসুখের ছুতো করে কিংবা ইচ্ছে করে অসুখ বাঁধিয়ে হাসপাতালে গিয়ে তবে ছাড়লেন।

তবে দু'জন মানুষকে সবাই খাতির করে। বৃদ্ধ শর্মাজী ভোর হতে না হতেই ভজন-গান শুরু করে দেন। তাঁর গলা ভারী সুন্দর। একটার পর একটা গান গেয়ে চলেন তিনি, ওয়ার্ডার, মেটরাও চুপ করে শোনে। দূরের ব্যারাক থেকে অনুরোধ আসে, শর্মাজী, আর একখানা, আর একখানা! শর্মাজীর কোনো ক্লান্তি নেই।

শর্মাজী মুঙ্গের জেলার লোক। বাংলাও খুব ভালো জানেন। বেদ স্তোত্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের বহু গান তাঁর জানা—এমন সংগীত-পাগল লোক কেন রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন কে জানে। প্রায় প্রত্যেকদিন ভোরবেলাই তিনি শুরু করতেন এই গানটি দিয়ে :

> ...যুগ যুগান্তর তব তপোবন পর কতহি ধরম বাখন।
> বিমান কম্পই উঠত নিতিহং গম্ভীর ঝঙ্কার তান॥

যমুনাকি-তটপর কৈসন মনোহর শ্যামকী বন্শী বয়ান।
যোঁহি দরস কিয়া যমুনাকি পানিয়া চঞ্চল চলত উজান॥
অব্ ওহি ভারত পর-পদ লাঞ্ছিত বিহীন যশ বীর্য মান।
সোঁহি দরশ কিয়া দিন হু রাতিয়া ঝরত মেরা নয়ান॥

এই গানটা বহুবার শুনতে শুনতে অনেকেরই মুখস্ত হয়ে গেছে। রাজবন্দীদের মধ্যে যারা দেশকে মাতৃকা রূপে ধ্যান করে না, তাদেরও অনেককে গুণ গুণ করতে শোনা যায় এই গান। গানটি কার লেখা জিজ্ঞেস করলে শর্মাজী হাত উল্টে বলেন, জানি না। তাতেই অনেকের ধারণা হয়, ওটি ওঁরই রচনা।

রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে তাঁর প্রিয় গান:

"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক,
জগত জনের শ্রবণ জুড়াক
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক
মুখ তুলে আজি চাহ রে।"

আর একজন মানুষ অতুলপ্রসাদ রায়। কোনোদিন কেউ তাঁর মুখে একটাও অভিযোগের কথা শোনে নি। কোনোদিন কারুকে উপদেশ কিংবা ভর্ৎসনা করেন না। দীর্ঘদেহী পুরুষ, মাথার চুল কাঁচা পাকা। তিনি নিজের রসে নিজে মজে আছেন সব সময়। তাঁর চেহারা ও ব্যক্তিত্বে একটা সর্বাত্মক সততার পরিচয় স্পষ্ট। সততার প্রতি মানুষের এখনো বাধ্যতামূলক শ্রদ্ধা আছে—তাই অতুলপ্রসাদের কাছে সকলেই একটু অবনত হয়ে যায়।

রাজনৈতিক কর্মী মাত্রেই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি নয়, বিশেষত জেলখানায় এলে তাদের অনেক ক্ষুদ্রতা, লোভ ও স্বার্থপরতা প্রকট হয়ে পড়ে। প্রাণ তুচ্ছ করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যে লোক, কারাগারে এসে সে সামান্য খাবার-দাবার প্রভৃতি নিয়ে এমন রেষারেষি করে যে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। অনেকের যৌন অতৃপ্তিও এখানে এসে হঠাৎ প্রকাশ পেয়ে যায়। অতুলপ্রসাদ এখানে আছেন বলেই তাঁর তুলনায় বেশ কয়েকজনকে মানুষ হিসেবে অতি তুচ্ছ মনে হয়।

অতুলপ্রসাদ রায় জেলের বাইরে রীতিমতন বড় দরের নেতা ছিলেন, বি পি সি সি'র সদস্য ছিলেন অনেক দিন। কিন্তু জেলে এসে যেন রাজনীতি একেবারেই ভুলে গেছেন। এখানে কয়েকটি দলের নিয়মিত স্টাডি সার্কল বসে, অতুলপ্রসাদ তাতে যোগ দেন না। কেউ এসে ডাকলেও উদাসীন ভাবে হেসে বলেন, বুড়ো হয়ে গেছি, আমাদের দিন শেষ হয়ে গেছে—এখন নতুন নতুন ছেলেরা কাজের ভার নেবে।

প্রত্যেকদিন ভোরবেলা দেখা যায়, তিনি চাতালের এক প্রান্তে যে কয়েকটি ছোট ছোট গাছ রয়েছে, সেগুলোতে জল দিচ্ছেন, গোড়া নিড়িয়ে দিচ্ছেন। সেগুলো ফুল গাছও না, দামী কোনো গাছও না—নেহাৎই আগাছা—তবু সেগুলির প্রতিই তাঁর অসীম ভালোবাসা।

জেলখানার নিয়ম কানুনের কড়াকড়ি এখন অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে। দেশে আর কোনো আন্দোলন নেই, অনেকদিন নতুন বন্দী আসে না। জেলখানার মধ্যে বন্দীদের গতিবিধি এখন আর তেমন নিয়ন্ত্রিত নয়। ছোট ছোট সেলের বদলে ব্যারাকের মতন বড় ঘরে এক সঙ্গে অনেকে মিলে থাকে—নিঃসঙ্গতার শাস্তিটুকু অন্তত পেতে হয় না। লোহার থালা হাতে নিয়ে আর দাঁড়াতে হয় না খাবারের লাইনে, সরকার এখন মাথা পিছু টাকা বরাদ্দ করে দিয়েছে—বন্দীরা নিজেরাই ছোট

ছোট দল করে নিয়ে নিজেদের খাবার রান্না করে খায়। কবে কি রান্না হবে, কিংবা কে কত ভালো রাঁধে—সেই আলোচনায় অনেকটা সময় কাটে। একদল আরেক দলকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়। আবার মাছের টুকরো কে ছোট পেয়েছে, কে বড় নিয়েছে—এই নিয়ে ঝগড়া লাগার ঘটনাও বিরল নয়।

বিকেলে কিছুক্ষণ খেলাধুলোর সুযোগ মিলেছে, অনুমতি পাওয়া গেছে বাইরে থেকে বই আনানোর। একটি দেয়াল পত্রিকাও একদিন আত্মপ্রকাশ করলো।

সূর্য এবং আরও সাতজনের বিচার শেষ হয়ে গেছে—এখন ওরা দণ্ডাজ্ঞার প্রতীক্ষায়। ডেঞ্জারাস ক্রিমিন্যাল হিসেবে ওদের সেলেই রাখা হয়েছে। তাতে অবশ্য ওদের তেমন অভিযোগ নেই। এ জেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট প্রকৃতই সজ্জন—প্রায়ই এসে ওদের সুযোগ সুবিধের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে যান। মাঝে মাঝে তিনি ঠাট্টা করে বলেন, কি মশাই, আপনারা পালা করে এক-একজন অসুখ বাধাতে পারেন না? তাহলে বেশী করে দুধ-মাখন আর ডিম খাওয়াতে পারতাম।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা মোটামুটি ভালোই। সূর্যর স্বাস্থ্য ফিরে গেছে। তবে, দাড়ি কামায় না বলে তার মুখখানা অন্যরকম দেখায়।

মাসের পর মাস জেলের জীবন নিস্তরঙ্গ। শান্তিপ্রসাদ নামে একটি ছেলের হঠাৎ পাগল হয়ে যাওয়া ছাড়া বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটে নি।

শান্তিপ্রসাদের মা মারা যাওয়ার খবর আসার পর থেকেই সে খুব মনমরা হয়ে পড়েছিল। সবাই তাকে নানা কথায় ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে, অতুলপ্রসাদ তাকে গীতা পড়ে শুনিয়েছেন। তবু শান্তিপ্রসাদ একদিন বাথরুমে যাবার সময় সূর্যকে ফিসফিস করে বলেছিল, রেডি থাকবেন, আমাদের জেল ভেঙে বাইরে নিয়ে যাবার সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক হয়ে গেছে।

কথাটা শুনেই সূর্যর খটকা লেগেছিল। বাইরে তাদের কোনো দল নেই, কারুর সঙ্গে যোগাযোগও হয় নি—কারা হঠাৎ তাদের জেল ভেঙে বার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে?

কিন্তু শান্তিপ্রসাদ দিনের পর দিন সেই অবাস্তব স্বপ্ন নিয়ে মেতে রইলো। ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে এলো তার চোখের দৃষ্টি। একদিন রাত্তিরবেলা সে লোহার গরাদে প্রচণ্ড জোরে মাথা ঠুকতে ঠুকতে চিৎকার করতে লাগলো, এসে গেছে! এসে গেছে!

ওয়ার্ডবর আর সেন্ট্রিরা ছুটে এলো। অন্যান্য সেলের বন্দীরা উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলো খবর জানবার জন্য। শান্তিপ্রসাদের চিৎকারের বিরাম নেই। তার কপাল থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে। জেলার সাহেব এলেন একটু বাদেই। দরজা খুলে তার চিৎকার থামাবার জন্য তাকে মারধোরও করা হলো—কিন্তু শান্তিপ্রসাদ তখন সবাইকে কামড়ে দিতে আসছে। তারপর ডাক্তার এসে জোর করে মরফিন ইঞ্জেকশান দিয়ে অজ্ঞান করে দিলেন ওকে। একদিন বাদে শান্তিপ্রসাদকে সরিয়ে নেওয়া হলো এই জেল থেকে—কোথায় গেল কেউ জানে না।

সূর্য কিছুদিন ছিল ব্যারাকে অন্যদের সঙ্গে। তখনও সে বিশেষ সুখে থাকে নি। সে কোন্ দলের ছেলে, কী তার রাজনৈতিক বিশ্বাস—তা কেউ জানে না। তার সঙ্গে কথা বলেও কিছু বার করা যায় না। অন্য বন্দীদের মধ্যে সূর্যর পূর্ব পরিচিত শুধু শংকরবাবু। তিনি এখন অন্য মতে বিশ্বাসী সূর্যকে তিনি আগেও বিশেষ পছন্দ করতেন না—এখানেও তাকে বেশী পাত্তা দিলেন না।

তবু, পূর্ব পরিচিত বলেই সূর্য প্রথম প্রথম শংকরবাবুর কাছাকাছি থাকতে

চেয়েছিল। হাজারীবাগে যে গুপ্ত দলটির সঙ্গে সূর্য একদিন পাকেচক্রে জড়িয়ে পড়েছিল, সেই দলের লোকজন ছাড়া সূর্যর আর কোনো বন্ধু নেই, আর কারুকে সে চেনে না। শংকরবাবুর সঙ্গে সে হরকুমার, ব্রজগোপাল কিংবা যোগানন্দ সম্পর্কে কথা বলতে চায়। শংকরবাবু তাকে পাত্তা দেন না। বিদ্রূপ করে বলেন, আমি তখনই বলেছিলাম না, শুধু গুন্ডামি আর ডাকাতি করে দেশ স্বাধীন করা যায় না! সূর্য আহত হয়ে সরে আসে।

অন্য অনেকে গায়ে পড়ে তার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে। বিশেষত তার সুন্দর চেহারা দেখে কেউ কেউ আকৃষ্ট হয়, কেউ কেউ আবার ঐ চেহারার জন্যই তার সঙ্গে একটু বিদ্রূপের সুরে কথা বলে। সূর্য তাদের উত্তর দেয় কঠিন অবজ্ঞায়। একদিন কি এক অজ্ঞাত কারণে একজন নেতৃস্থানীয় দাদার সঙ্গে সূর্যর মারামারি শুরু হয়ে গেল। দু'একটা কথার পরই সূর্য কষিয়ে দিল তাঁর মুখে এক ঘুঁষি। তাঁর মুখ থেকে রক্ত পড়তে লাগলো। এই ঘটনায় সবাই ছি ছি করতে লাগলো সূর্যকে। রাজনৈতিক বন্দীদের এরকম মারামারি বড়ই কেলেংকারীর কথা—সাধারণ চোর-ডাকাত কয়েদীরা যে এ কথা শুনে হাসবে। সবাই একঘরে করলো সূর্যকে।

তারপরই সূর্যকে আবার সেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। সেই অবস্থাতেই কেটে গেল টানা দেড় বছর। একাকিত্বে সূর্যর কোনো কষ্ট নেই। সে আশা করে আছে, তাকে আন্দামানে পাঠানো হবে। মৃত্যুদণ্ডের কথা সে চিন্তা করে না। মৃত্যুর আবার কোনো মানে হয় নাকি? সে কিছুতেই মরবে না। তা ছাড়া, কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, বেয়াল্লিশের আন্দোলনে ধৃত কারুকেই সরকার এখনো ফাঁসী দেয় নি। যাদের মেরে ফেলার আগেই মেরে ফেলেছে। হাজারীবাগ জেলে কয়েকজন বন্দীর রহস্যজনক মৃত্যুর কথা শোনা গেছে। এখনও ঢালাও ভাবে দেওয়া হচ্ছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। সূর্য আন্দামানেই যেতে চায়—এখানকার কারা-জীবন তার পছন্দ হয় নি—দেখাই যাক না আন্দামানটা কী রকম। সুপারিনটেণ্ডেন্টকে সে এই মর্মে অনেকবার অনুরোধ জানিয়েছে।

সূর্য অবশ্য জানতো না, আন্দামানে বন্দী পাঠানো অনেক দিন বন্ধ হয়ে গেছে। কিছুদিনের জন্য সুভাষ বোস আন্দামান স্বাধীন করে সেখানে জাতীয় পতাকাও উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ধরা পড়ার পর প্রথম প্রথম সূর্যকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। তার মুখ দিয়ে কথা বার করার জন্য কোনো বীভৎস পন্থাই তারা বাকি রাখে নি। সে সব দিনগুলো এখন দুঃস্বপ্নের মতন মনে হয়। সেই অত্যাচারের সময় সূর্যর জেদ আরও বেড়ে গিয়েছিল। সে ভাবতো, আবার সে জেল থেকে বেরিয়ে লড়াইতে নেমে পড়বে। কতদিন জেলে আটকে রাখবে তাকে—পালাবার পথ একটা বেরুবেই।

এখন সে বুঝে গেছে, আগামী দশ-পনেরো বছরের মধ্যে অন্তত তার বেরুবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আন্দামান গেলেই বা কি হবে! আন্দামান থেকে কি কেউ কোনোদিন পালাতে পেরেছে? তাকে একলা একলাই কাটাতে হবে অনেকগুলি বছর। সে আর লড়াইয়ের কথা ভাবে না।

সূর্যর সেলে একটা জানলা আছে। এটা একটা অতিরিক্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার, কারণ অধিকাংশ সেলই অন্ধকূপের মতন। জানলাটা এত উঁচুতে যে সূর্য লাফিয়েও সেটা ছুঁতে পারে না। অনেকবার চেষ্টা করে দেখেছে—এর ফলে তার হাই জাম্পে দক্ষতা বাড়লেও জানলা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে নি। জানলাটার বাইরে আকাশ দেখা

যায় না। একটু দূরেই একটা উঁচু দেয়ালের চৌকো অংশ শুধু চোখে পড়ে। ঘরের বিভিন্ন জায়গায় শুয়ে থাকলে সেই চৌকো অংশটা ছোট কিংবা বড় হয়। দেয়ালটাতে শ্যাওলা ধরা—বর্ষার সময় আর রোদ্দুরে শ্যাওলার রং পাল্টায়।

জানলাটা থাকার একটা সুবিধে, বাইরের শব্দ বেশী আসে। বাইরের নানারকম কথা সে শুনতে পায়, এমন কি জেলারের কোয়ার্টারের বাচ্চাদের কিংবা মেয়েদের গলার আওয়াজ কখনো কখনো ভেসে আসে। একদিন একটা শালিক এসে জানলার শিকে বসে সূর্যর দিকে খুব মনোযোগ সহকারে তাকিয়েছিল। সূর্য তার সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করলো, রুটির টুকরো ছুঁড়ে দিল—তবু উড়ে গেল শালিকটা, সাত-দিনের মধ্যে আর এলো না। তারপর আবার পর পর দুদিন এসে আবার কয়েকদিন একটানা ডুব। অদ্ভুত খেয়ালী পাখি।

সকালবেলা শর্মাজীর গান শুনে সূর্যর ঘুম ভাঙে। কয়েকটা গান সে এতবার শুনেছে যে গানগুলোর সময় সেও ঠোঁট নাড়তে পারে। যদিও এত দূর থেকে শোনার জন্য সবকটা শব্দ সে ঠিক জানে না। মুখ-টুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে সে বই নিয়ে পড়তে বসে। এখন সে ইচ্ছে মতন বই পায়। তার মধ্যে একটি অধ্যবসায়ী ছাত্র সুপ্ত ছিল—বই পড়তে সে ক্লান্ত বোধ করে না। পড়তে পড়তে সে জানলার দিকে তাকায় বারবার, শালিকটার প্রতীক্ষা করে। লক্ষ্মীছাড়া শালিকটা যে রোজ আসে না—আবার যে-কোনো সময়েই আসতে পারে, এইটাই ওর একমাত্র আকর্ষণ।

বাবার কাছ থেকে প্রায়ই চিঠি আসে। বাবার চিঠিগুলো সংক্ষিপ্ত এবং শুধু নানারকম খবরে ভরা। ছেলের কাছে লেখা চিঠিতে বড়বাবু আবেগের আতিশয্য দেখাতে চান না। এবং নিজের বিষয়েও কিছুই লেখেন না। তাঁর চিঠির অনেক খবরই জেল কর্তৃপক্ষ কালো কালি দিয়ে কেটে দেয়। বাদলও মাঝে মাঝে চিঠি লেখে। মাস দু'এক আগে বড়বাবুর সঙ্গে ও একবার দেখাও করতে এসেছিল এখানে। বাদল বেশ বড় হয়ে গেছে।

একদিন সূর্য একটা চিঠি পেয়েছিল, সে চিঠিতে কোনো সম্বোধন নেই, শেষে নাম সই নেই। তবু সূর্যর বুঝতে অসুবিধে হয়নি, চিঠিটা কার লেখা। এরকম চিঠি তাকে ইহ সংসারে শুধু একজনই লিখতে পারে। চিঠিটাতে লেখা ছিল:

"জেলখানার ভেতরটা কী রকম দেখতে হয় আমি জানি না। কিন্তু সব সময় আমি তোমার পাশাপাশি আছি। তুমি টের পাও না? আমি তোমাকে দেখতে পাই। আমি সব সময় তোমাকে খুব কাছে পাই। যদি জিজ্ঞেস করো কেন এবং কী ভাবে, বলতে পারবো না। সবার মধ্যে বসে থেকেও মনে হচ্ছিল, কোনো এক জায়গায় ঐ মানুষটি একান্তই আমার। আমার মতন করে একে আর কেউ জানে না। এই অনু-ভূতিটা সত্যি হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে, কিন্তু এমন ভাবনা আমাকে গভীর তৃপ্তি দেয়, বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।

তুমি আমায় স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছো।

চিঠিখানা সূর্য অন্তত একশো বার পড়ে ফেললো একদিনে। শ্রীলেখার মুখখানা তার মনে পড়ছে, আর সে চিঠিখানা মেলে ধরছে চোখের কাছে।

দুদিন এরকম চলার পর সে ভাবলো, এরকম করলে সে পাগল হয়ে যেতে পারে। এত বেশী আবেগ তার এই অবস্থায় অস্বাস্থ্যকর। তখন সে চিঠিখানা ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে ছড়িয়ে দিল ঘরের মধ্যে। তারপর এক একটা টুকরো তুলে নিয়ে বাকি অংশটা মুখস্ত বলে যেতে লাগলো। কিন্তু শ্রীলেখাকে কোনো উত্তর লিখলো না।

সূর্য শুয়ে শুয়ে বুখারিনের লেখা 'হিস্টরিকাল মেটেরিয়ালিজম্' বইখানা পড়ছিল—এই সময় অতুলপ্রসাদ তার সেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে একটা ছোট্ট সাদা ফুল।

তিনি এক দৃষ্টিতে সূর্যকে দেখতে লাগলেন। দরজার দিকে পা রেখে সূর্য উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, অতুলপ্রসাদের উপস্থিতি লক্ষ করে নি। লোহার শিকের বাইরে থেকে এই যুবকটিকে দেখতে দেখতে অতুলপ্রসাদ এক ধরনের মায়া অনুভব করলেন। তাঁর মনে হলো, বহু বইতে তিনি এইরকম দৃশ্যের বর্ণনা পড়েছেন—কিন্তু সেই সব দৃশ্যের সঙ্গে বাস্তব চিত্রটি একেবারেই মেলে না। কারাগারে বন্দী তেজস্বী যুবকের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহের তুলনা দিয়েছেন অনেক লেখক—। কিন্তু এই দৃশ্যের মধ্যে কোনো মহৎ ট্র্যাজেডি নেই, আছে দারুণ অপচয়। এই সুকুমারকান্তি যুবকটির জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় এই চার দেয়ালের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাবে। অতুলপ্রসাদ অকৃতদার, পুত্রস্নেহের কোনো অভিজ্ঞতা তাঁর নেই—কিন্তু সূর্যকে দেখে বার বার তাঁর নিজের যৌবনের কথা মনে পড়তে লাগলো।

তিনি মৃদু গলায় বললেন, সূর্যকুমার, কেমন আছো?

সূর্য তাড়াতাড়ি উঠে বসলো। বই মুড়ে রেখে এগিয়ে এসে বললো, আমি ভালো আছি। আপনি হঠাৎ এদিকে যে!

অতুলপ্রসাদ বললেন, আমাকে তো সব দিকেই যেতে দেয়। কেউ কিছু নিষেধ করে না। তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

—আপনি—

—আমি কাল ছাড়া পেয়ে যাচ্ছি!

সূর্য একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো, খুব ভালো লাগলো শুনে। আপনাকে শুধু শুধু আটকে রেখেছিল।

অতুলপ্রসাদ বললেন, না হে, ঠিক তার উল্টো। আমাকেই বরং অনেকদিন আটকে রাখার কথা ছিল। এখনো আমাদের কেসই উঠলো না ভালো করে, হঠাৎ যে ছেড়ে দেবে কে ভাবতে পেরেছিল!

অতুলপ্রসাদকে মোটেই উৎফুল্ল দেখা গেল না। কিংবা আর একজন বন্দীর কাছে নিজের মুক্তির কথা জানাতে তাঁর সহজাত ভদ্রতায় আটকাচ্ছিল। শুকনো হেসে বললেন, সরকার আর আমাদের বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে চায় না। সরকারের চোখে তো আমরা ডেঞ্জারাস ক্রিমিন্যাল নই। আমরা তো অকর্মার ঢেঁকি।

অতুলপ্রসাদের মুখে কেউ কোনোদিন আফশোস বা অভিযোগের কথা শোনে নি—শুধু আজই মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারে তাঁকে একটু ক্ষুণ্ণ মনে হলো।

সূর্য জিজ্ঞেস করলো, শুধু আপনি একা?

—না। আমাদের ওদিককার সতেরোজনের রিলিফ অর্ডার এসেছে।

—শর্মাজী?

—হ্যাঁ, শর্মাজীও ছাড়া পাচ্ছেন। শুনে তোমার মন খারাপ লাগছে না?

—না, না—

—আমার কথা বাদ দাও। আমি তো কারুর কোনো উপকারে লাগতাম না—কিন্তু শর্মাজী তোমাদের গান শোনাতেন—সকালবেলা ঐ চারণ কবির গান আর তোমরা শুনতে পাবে না।

—তা বলে উনি কি আমাদের গান শোনাবার জন্য সারাজন্ম জেলে কাটাবেন?

—তুমিই কি সারাজীবন জেলে কাটাবে ঠিক করেছো নাকি?

—আমি কিছু ঠিক করি নি।

—শুনছি তো আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে একটা দলকে এখানে পাঠাবে। তাদের মধ্যে কেউ গায়ক থাকতে পারে। তবে শর্মাজীর জায়গা কেউ নিতে পারবে না। অসাধারণ মানুষ!

সূর্য অনুভব করলো, অতুলদা তাকে কিছু একটা বলতে চান। শুধু বিদায় নেবার হলে—এতক্ষণে তো তা হয়ে গেছে।

অতুলপ্রসাদ নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন সূর্যর দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে। অস্বস্তি কাটাবার জন্য সূর্য একটু হালকাভাবে বললো, আপনি ছাড়া পাচ্ছেন। কিন্তু আপনাকে খুশী মনে হচ্ছে না কেন?

—ছাড়া পেয়ে কি করবো?

—বাঃ, আপনার কি জেলখানাই ভালো লাগে!

—জেলখানায় আমার জীবনের অনেকগুলো বছর কেটেছে। সেই দেশবন্ধুর আমল থেকে। এখন আর ভালো লাগা খারাপ লাগার প্রশ্ন নেই। তবে তোমাদের মতন তো আর কম বয়েস নেই—আমাদের বয়েসী লোকেরা জীবনের সব কিছুই ভেবে চিন্তে ছক বেঁধে করতে চায়। মনে মনে ঠিক করেই রেখেছিলাম, আরও অন্তত দু'তিন বছর এখানে থাকতে হবে—সেই অনুযায়ী সাজিয়ে নিয়েছিলাম জীবন—হঠাৎ সব কিছু ওলট পালট হয়ে গেল।

জেলখানার এই একঘেয়ে জীবনে আবার সাজাবার কি আছে, সূর্য তা ভেবে পায় না। তবু এই প্রৌঢ়ের সঙ্গে কিছু একটা কথা বলার জন্যই সে বলে, আপনার বাড়ির লোকরা আপনাকে পেয়ে খুশী হবে।

—ত্রি সংসারে আমার কেউ নেই রে ভাই!

—আপনার পার্টি?

—প্রকৃতি শূন্যতা সহ্য করে না। আমার পার্টির লোকেরা কি আমার জন্য বসে আছে? উপেনদা জেল থেকে বেরিয়ে নিজের পার্টিতে ভোটে হেরে গিয়েছিলেন।

—তা হলে আপনি বেরিয়ে আবার একটা কিছু করে জেলে ফিরে আসুন।

অতুলপ্রসাদ হাসলেন। তারপর বললেন, যাই হোক, কালই চলে যাচ্ছি, তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। যদি কিছু অপরাধ করে থাকি, ক্ষমা কোরো আমাকে।

অতুলপ্রসাদ সত্যি হাত জোড় করলেন। সূর্য একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লো। এই নিঃশত্রু প্রৌঢ়ের পক্ষে তার কাছে কোনো অপরাধ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবু এই বিনয়ের সৌম্যতা, এই প্রাচীন আদর্শবোধ—যা তার চরিত্রের একেবারে বিপরীত, তাকে হঠাৎ খুব নাড়া দেয়।

সূর্য গরাদের বাইরে হাত বাড়িয়ে অতুলপ্রসাদের বাহু চেপে ধরে বলে, দাদা, এ কি বলছেন! আমিই হয়তো কখনো রাগের মাথায় কিছু বলে ফেলেছি—

—না, না, তুমি কিছু বলো নি—

—আমি ছাড়া পেলে আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করবো—

—যদি ততদিন আমি বেঁচে থাকি! শোনো, বাইরে গিয়ে তোমার কোনো খবর কারুকে পৌঁছে দিতে হবে?

সূর্য একটুক্ষণ ভেবে বললো, না। সে রকম কিছু নেই।

—তোমার বাড়ি কোথায়?

—বলকাতার।

—তোমার বাড়িতে গিয়ে আমি বলে দেবো এখন তোমার স্বাস্থ্য টাস্থ্য ভালো আছে। ঠিকানা কি।

—বাড়িতে আমার বাবা ছাড়া আর কেউ নেই। তিনিও কখন বাড়িতে থাকেন তার ঠিক নেই। আমি তো চিঠি লিখে তাঁকে খবর দিচ্ছিই। আপনি কষ্ট করে যাবেন কেন?

—তোমার আর কোনো প্রিয়জন নেই? কোনো বন্ধুবান্ধব?

—না।

—আশ্চর্য! ভারী আশ্চর্য। তোমার বয়েসে এ রকমটি ভাবা যায় না। তোমার কোনো কাজই কি আমি বাইরে গিয়ে করে দিতে পারবো না?

—সে রকম তো কিছু মনে পড়ছে না।

—তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো—তোমার কোনো চিঠি যদি কোনো জায়গায় পেঁৗছে দিতে হয়—

—আমি আপনাকে অবিশ্বাস করবো কেন? আপনিই বিশ্বাস করুন, আমার আর কোনো দল নেই। কারুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই।

—তা হলে, সূর্য, তুমি আমার একটা উপকার করবে?

—বলুন।

অতুলপ্রসাদ হাতের সাদা ফুলটা সূর্যর হাতে দিয়ে বললেন, এটার গন্ধ শুঁকে দেখো! এটা কি ফুল বলতে পারো?

সূর্য একটু বিস্মিতভাবে ফুলটা নিল, নাকের কাছে নিয়ে শ্বাস টানলো। মৃদু মৃদু মিষ্টি গন্ধ। কিন্তু সূর্য তার কৈশোর থেকেই যে-ধরনের জীবন কাটিয়েছে, তাতে তার ফুল চেনার অবকাশ হয় নি।

সে বললো, বেশ সুন্দর গন্ধ। কি ফুল?

অতুলপ্রসাদ গর্বের সঙ্গে বললেন, লেবু ফুল। বিশ্বাস করতে পারো, সত্যি সত্যি একটা লেবু ফুল।

—কোথায় পেলেন?

—আমি তৈরী করেছি।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মতন সরল হাস্যে তাঁর মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে গেল। একটি লেবু ফুলের বার্তা তাঁর কাছে মুক্তির চেয়েও অনেক বড়।

তিনি বললেন, সবাই ভেবেছিল আগাছা, আমিও তাই ভেবেছিলাম—জমাদার কতদিন সাফ করতে চেয়েছে—আমি তবু দিই নি, তবু তো একটুখানি সবুজ। তারপর একদিন টের পেলাম, সেই আগাছার জঙ্গলে একটা লেবু গাছও রয়েছে। টের পাবার পর কারুকে বলি নি। যদি সত্যি না হয়! আজ প্রথম ফুল ফুটেছে, এবার কেউ অবিশ্বাস করতে পারবে? কত যত্নে গাছটাকে তৈরী করেছি—দিনের পর দিন—এক-একটা লেবু গাছ বন্ধ্যা হয়, ফুল ফোটে না, ফল হয় না—যদি সেরকম কিছু হয়—এই ভয়ও ছিল। আজই ফুল ফুটলো, আর কাল আমাকে চলে যেতে হবে! একি পরিহাস নয়!

—ফুলটা আপনি সঙ্গে নিয়ে যান। একটা স্মৃতি।

—আমি এ স্মৃতি নিয়ে কি করবো! আমি আশা করেছিলাম, গাছটা একদিন বড় হবে, ফল ফলবে—আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবো। আমার গ্যাসট্রিক আছে, আমি

লেবু খাই না—অন্যরাই খেত—কিন্তু আমি দেখে যেতে পারলাম না। তুমি আমার অবর্তমানে এই গাছটার ভার নেবে? এটাকে বাঁচিয়ে রাখবে?

—আমি? কিন্তু আমি তো গাছের বিষয়ে কিছু জানি না।

অতুলপ্রসাদ মহা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, তার জন্য কোনো চিন্তা নেই। কাল সকালটাতে তো সময় আছে—সেই সময় আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবো। আসল কথা হচ্ছে ভালবাসা। তুমি যদি কোনো কাজকে ভালোবাসতে শেখো—তবে তার সম্পর্কে তোমার কিছুই জানতে বাকি থাকবে না। এমন কি গাছও ভালোবাসা বোঝে।

—আপনি এত লোক থাকতে আমার ওপরই এ ভার দিয়ে যাচ্ছেন কেন?

যেন সম্পত্তির উত্তরাধিকার দিয়ে যাচ্ছেন এই সুরে তিনি বললেন, সকলকে তো বিশ্বাস করা যায় না। একটু অযত্ন করলেই ধাঙগড়-জমাদাররা উপড়ে ফেলে দেবে। তোমার সঙ্গে আমার যেন কোথায় একটা মিল খুঁজে পাই। তোমাকে আমার বরাবরই বড় ভালো লাগে। এমন ঠাণ্ডা স্বভাব, মুখের মধ্যে একটা লক্ষ্মীশ্রী আছে—তুমি ঠিক পারবে। তাছাড়া তোমারই বয়েস সবচেয়ে কম—

সূর্য স্নেহ-ভালোবাসার প্রতিদান দিতে জানে না। যে-ই তাকে স্নেহ-ভালোবাসা দেখাতে আসবে—তাকেই নিষ্ঠুর প্রতিআঘাত দেবার একটা অদ্ভুত প্রবণতা আছে তার মধ্যে। এখানেও সে নিজেকে সামলাতে পারলো না।

নিষ্ঠুরের মতন বললো, আমার বয়েস কম—তার মানে আমি সবচেয়ে বেশীদিন জেলে থাকবো—বেশীদিন আপনার গাছটা দেখাশুনো করতে পারবো—সেই জন্যই আমাকে বেছে নিয়েছেন, তাই না?

তারপর সূর্য হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে দরজা ধরে ধাক্কা দিতে দিতে বললো, আমি থাকতে চাই না, আমি এখানে থাকতে চাই না। আমি বাইরে যেতে চাই। চুলোয় যাক আপনার লেবু গাছ!

অতুলপ্রসাদ বিস্ফারিত চোখে তাকালেন। প্রথমটা কোনো কথাই বলতে পারলেন না। তার পর দুদিকে মাথা নাড়িয়ে আস্তে আস্তে বললেন, না, আমি সে কথা ভাবি নি। সে কথা ভাবি নি। আমি ভেবেছিলাম, তুমি একটা কিছু নিয়ে ভুলে থাকতে পারবে। তোমার শুকনো দিনগুলো একটা কিছুর প্রতীক্ষায় কাটবে। আমি মনে প্রাণে চাই তুমি তাড়াতাড়ি ছাড়া পাও। যদি আমার বদলে তোমাকে—

অতুলপ্রসাদের চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগলো। গরাদের ফাঁক দিয়ে তিনি সূর্যর হাতটা শক্ত করে চেপে ধরলেন।

॥ ৫৪ ॥

স্কুল ছাড়ার আগে বিষ্ণু ছাড়া আমার আর যে-দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়, তাদের নাম ভাস্কর আর পঙ্কজ। এদের মধ্যে পঙ্কজ একটি কীর্তি করে সারা স্কুলে বিখ্যাত হয়েছিল। সরস্বতী পুজোর ভাসানের সময় নৌকো থেকে ধরাধরি করে প্রতিমা যখন গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হচ্ছিল, তখন ঝোঁক সামলাতে না পেরে পঙ্কজও জলে পড়ে যায়।

গঙ্গায় সেদিন পূর্ণ জোয়ার, জল থৈ থৈ করছে। নৌকোয় মাস্টার মশাইরা কেউ ছিলেন না, শুধু আমরা কয়েকজন উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা। পঙ্কজ জলে পড়ে যাওয়ায়

আমরা শুধু হাসাহাসি ও চ্যাঁচামেচি করেছি। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারিনি। তারপর যা করেছি, সেটা আরও মূর্খের মতন। সেই ভরা গঙ্গায়, মাঝিদের কথায় কর্ণপাত না করে, আমরা আরও তিনজন জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। প্রভাত নামের একটি বার বার ফেল করা ছেলে ছিল সাঁতারে চ্যাম্পিয়ান, সে-ই প্রথম জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দেয়—আমি বাঙালদেশের ছেলে—সুতরাং আমারও পিছিয়ে পড়া উচিত নয় এবং আমার দেখাদেখি ভাস্কর।

আমাদের তিনজনের খুব বেশী বিপদ হয়নি—কাছাকাছি তিনটে নৌকোর মাঝি আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, কিন্তু পঙ্কজকে আমরা খুঁজে পাইনি। প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে বাবুঘাটের কাছে জলপুলিসের একটি লঞ্চ পঙ্কজকে উদ্ধার করে। আশ্চর্যের ব্যাপার, সে তখনও বেঁচে ছিল।

সরস্বতী মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে জলে ডুবে যাওয়া এবং পরে রোমহর্ষক ভাবে তার উদ্ধার পাওয়ায় পঙ্কজ এমনই বিখ্যাত হয়ে যায় যে পরে স্কুলের ছেলেরা তাকে ভিড় করে দেখতে আসতো। এই উপলক্ষে খবরের কাগজে তার নামও ছাপা হয়েছিল। পঙ্কজ অবশ্য এই ব্যাপারে কখনো লজ্জা প্রকাশ করেনি। সে গম্ভীর ভাবে বলতো, আমাকে তোলা হলো কেন? সরস্বতী ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে ডুবে মরলে আমি পরের জন্মে নিশ্চয়ই ঈশান স্কলার হতাম।

পঙ্কজ লেখাপড়ায় সাধারণ ছাত্র ছিল, কিন্তু মাট্রিক পরীক্ষায় তার আশাতীত ভালো রেজাল্ট হওয়ায়—অনেকেই বলেছিল, মা সরস্বতীর কৃপা। কিন্তু এই ঘটনা পঙ্কজের জীবনকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পারে নি—উত্তর কালে পঙ্কজ ঘোরতর নাস্তিক হয়ে যায়।

মামার বাড়ির গ্রামে আমার পৈতে হবার পর থেকেই আমার বেশ দেব-দ্বিজে ভক্তি হয়। আচার অনুষ্ঠানগুলো নিয়মিত মেনে চলতাম, কখনো গলা থেকে পৈতে খুলে ফেলার কথা চিন্তাও করতে পারতাম না। কি করে এই সব সংস্কার আস্তে আস্তে দূর হলো, তা ঠিক মনে নেই। তবে, আমার বন্ধুদের সংসর্গ নিশ্চিত খুব কাজ করেছিল। ছাত্র মহলে তখন নাস্তিকতার একটা ঢেউ উঠেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইয়ং বেঙ্গল যে নাস্তিকতার জোয়ার এনেছিলেন, হিন্দু ধর্মকে সংস্কার মুক্ত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন—সেই উদ্দীপনা এই শতাব্দীর প্রথম ভাগের পরই স্তিমিত হয়ে যায়। রক্ষণশীলতা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক আন্দোলনে হিন্দু মুসলমানকে একত্র করার আপ্রাণ চেষ্টা কিছুতেই সার্থক হয়নি। এজন্য আমরা ব্রিটিশের ভেদ নীতিকে সর্বাংশে দায়ী করলেও উভয় সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী মনোভাবও কম দায়ী নয়। বক্তৃতা মঞ্চে কিংবা মিছিলে হিন্দু মুসলমানকে পাশাপাশি আমরা ডাক দিলেও, সামাজিক জীবনে মেলামেশা ছিল না। নজরুল ইসলাম শ্যামা সঙ্গীত গাইলে হিন্দুরা খুশী হয়, মুসলমানরা চটে যায়। এই খুশী ও অখুশী—দুটোই এক রকমের গোঁড়ামির ফল।

শ্লোগান হিসেবে 'বন্দেমাতরম্'—মুসলমানরা গোড়া থেকেই মেনে নিতে চায় নি। এই আপত্তির কারণ কতটা সংস্কৃত ভাষার জন্য, কতটা দেশকে মাতৃরূপে কল্পনার জন্য, আর কতটা বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য—তা আজও স্পষ্টরূপে নির্ধারিত হয়নি। কিন্তু যেহেতু এই শ্লোগান স্বতঃস্ফূর্ত, তাই হিন্দুরা এটি ছাড়ে নি। সশস্ত্র বিপ্লবীরা পরজন্মে বিশ্বাসী এবং গীতায় নিষ্কাম ধর্মকে অবলম্বন করেছিল বলে মুসলমানরা তাদের থেকেও দূরে থেকেছে।

এদিকে, বাংলায় মুসলীম লীগ শাসনের দাপটের ফলে হিন্দুরা ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ে। মধ্যবিত্ত হিন্দুদের যেটা একমাত্র আরাধ্য বস্তু, সেই চাকরিও যখন তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়—তখন তারা ঘোরতর মুসলমান বিদ্বেষী হয়ে পড়ে। আত্মরক্ষার তাগিদে রক্ষণশীলতা বেড়ে যায়। এবং এই অবস্থায়, বোমা-বানানো বাঙালীদের মধ্যে আরও বিভেদের ফাটল সৃষ্টি করায় ইংরেজ সরকারের যেমন স্বার্থ ছিল, তেমনি অবাঙালী ব্যবসায়ীদেরও কম স্বার্থ ছিল না। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ছিল এর প্রস্তুতি পর্ব।

মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজের প্রবীণরা ও অভিভাবকরা যখন বেশী বেশী রকমের ধর্ম গোঁড়া হয়ে উঠলেন, তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ছাত্র সমাজের মধ্যে নাস্তিকতা এসেছিল নতুন করে। অভিভাবকদের বিপরীত মত পোষণ করা আধুনিকতার একটি অঙ্গ। মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে অবশ্য এই প্রতিক্রিয়া আসতে আরও কয়েক বছর সময় লেগেছিল—তাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরী হয়ে ওঠার জন্য। তার আগে পর্যন্ত, তাদের মধ্যে ছিল শুধু সর্বাত্মক ভাবে অধিকার আদায়ের প্রশ্ন—একে একে সবাই গিয়ে ভিড়ে পড়ছিল মুসলীম লীগে।

তা ছাড়া, হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে তখন মার্কসবাদ এক নতুন প্রেরণা এনেছে। স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট রাশিয়ার সমর বিজয় এক যুগান্তকারী ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। সমাজতন্ত্রের পীঠস্থান রক্ষা পেয়েছে, এবার বাকি পৃথিবী ঐ সমাজতন্ত্রের আওতায় আসবে। কেননা, উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ লড়াই করে শুধু নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য—সুতরাং তারা একদিন পরস্পর লড়াই করে মরবেই—সমাজতন্ত্রবাদ নিয়ে আসবে প্রত্যেক মানুষের জন্য সমান অধিকার। ছাত্রদের মধ্যে কম্যুনিস্ট হবার দারুণ ফ্যাসান চালু হয়েছে তখন। একটু ভালো ছাত্র বা চৌকোশ ছেলেরা যদি কম্যুনিস্ট না হয়—অন্যরা তাদের বিদ্রূপ করে।

এবং নতুন কম্যুনিস্টরা সব দিক থেকেই উগ্র হয়। রাজা রামমোহন যেমন ভাবে দুর্গা পুজার নেমন্তন্ন অস্বীকার করেছিলেন, ঠিক সেই একই কায়দায় ভাস্করের দাদা অরুণদা তাঁর বাড়ির সিঁড়িতে বসে বাঁকা হাস্যে একদল ছেলেকে বলেছিলেন, সরস্বতী পুজোর চাঁদা? তোমরা কি ভাই মেয়েছেলে যে আমার কাছে পুতুল খেলার কথা বলতে এসেছো?

মাথার উস্কখুস্ক চুলে তেল নেই, গেরুয়া পাঞ্জাবি ও পা-জামা পরা অরুণদা ছিলেন আমাদের কাছে দারুণ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। এই রকম পোশাক পরা নতুন দাদারা আমাদের কাছে মৃদু গলায় শোনাতেন অসম্ভব সব জ্ঞানের কথা।

বিষ্ণু, আমি, পংকজ আর ভাস্কর—আমাদের এই কজনকে দাদারা বলতেন থ্রি মাস্কেটিয়ার্স। কেউ কেউ যখন বলতো, চারজন আবার থ্রি মাস্কেটিয়ার্স হয় কি করে, তাদের দিকে আমরা অবজ্ঞার চোখে তাকাতাম। তারা বইটা পড়ে নি। আমাদের মধ্যে কে দার্তাগনান্ সে সম্পর্কে তর্কের কোনো অবকাশই ছিল না—সে পদমর্যাদা প্রথম থেকেই ভাস্করকে দিতে হয়েছিল।

বন্ধুদের মধ্যে ভাস্কর যেমন অহংকারী, তেমনই দুর্মুখ। অতি অল্প বয়েস থেকেই তার মধ্যে একটা ব্যক্তিত্ব জন্মে গিয়েছিল, যে-জন্য তার চেয়ে বয়েসে বড় লোকেরাও তার সঙ্গে সমীহ করে কথা বলতো। ভাস্করের ছিপছিপে লম্বা চেহারা, মাথা ভর্তি কোঁকড়া কোঁকড়া চুল এবং চোখের মণি দুটো কটা। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কোনো গণতন্ত্র ছিল না, ভাস্করের ইচ্ছে মতনই আমাদের চলতে হতো। তবে,

ভাস্কর মনে মনে সমীহ করতো বিষ্ণুকে। বিষ্ণু কম কথা বললেও তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করতে সাহস পেত না ভাস্কর। আমার আর পংকজের ভূমিকা ছিল ধর্কান খাওয়ার—আমরা কিছু বললেই ভাস্কর ধুৎ বলে অত্যন্ত অবজ্ঞার সঙ্গে তা উড়িয়ে দিত।

আমাদের বয়েসী ছেলেরা তখন অনেকেই বিড়ি সিগারেট খেতে শিখেছে—ভাস্কর একদিন মাত্র সিগারেট বিষয়ে উল্লেখ করায় বিষ্ণু এমন ভাবে ছিঃ বলেছিল যে আমরা সবাই একবাক্যে সিগারেটের নিন্দে করা শুরু করে দিলাম। কেউ আর লুকিয়ে চুরিয়ে একটান দেবার কথাও ভাবি নি। ইস্কুলের বাথরুমের দেয়ালে অসভ্য কথা এবং ছবি আমাদের সবারই চোখে পড়তো যদিও, কিন্তু কেউ সে বিষয়ে আলোচনা করিনি। এটাও বিষ্ণুর প্রভাব। তবে, অন্য সব বিষয়ে আমরা ভাস্করের নির্দেশই মানতাম।

ভাস্করের প্রধান শখ ছিল পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানো। বিকেল বেলা আমরা জমায়েত হতাম হেদোর মোড়ে। সেখান থেকে শুরু হতো পদযাত্রা। জোড়াসাঁকো, পোস্তা, ক্যানিং স্ট্রীট হয়ে আমরা চলে যেতাম হাওড়া ব্রিজের কাছে। তখনও নতুন হাওড়া ব্রিজের দু'দিকে দুটো বিরাট ধাতব বেলুন ওড়ে। আমরা শুনেছিলাম, এই ব্রিজের কাছাকাছি শত্রু পক্ষের বিমান এলেই বেলুন দুটো ফেটে গিয়ে একটা ধুন্ধুমার কান্ড হবে। গঙ্গাতেও আমরা একটা নতুন জিনিস দেখি—জলে ভাসে এরোপ্লেন। এই সী প্লেনগুলি নাকি জল থেকেই উড়ে যেতে পারে। সেই প্লেনের ডানার ওপর শুয়ে খালি গায়ে রোদ পোহায় আমেরিকানরা, যাদের আমরা বলতাম লালমুখো।

সন্ধ্যে হয়ে এলেই পংকজের বাড়ি ফেরার তাড়া থাকে। ভাস্কর তাকে ধমকে ঠান্ডা করে দেয়। ভাস্করের নির্দেশে আমরা ব্রিজ পেরিয়ে চলে যাই হাওড়া স্টেশনে। ভাস্কর প্ল্যাটফর্ম টিকিট কাটে, আমরা যে-কোনো একটা খালি ট্রেনের কামরায় উঠে বসে থাকি। আমরা কোথাও যাবো না, তবু ট্রেনের কামরায় আমাদের দারুণ গল্প জমে। ব্যাপারটাতে আমরা একটা নিষিদ্ধ আনন্দ পাই। আমাদের চেনা কেউ দেখতে পেলে কী ভীষণ চমকে উঠবে, মনে করবে বুঝি আমরা বাড়ি থেকে পালাচ্ছি। সে রকম কারুর চোখে পড়ার জন্য আমরা জানলা দিয়ে মুখ বার করে থাকি পর্যন্ত।

যে ট্রেন ছাড়তে অনেক দেরী আছে কিংবা সেদিন ছাড়বেই না—সেই সব ট্রেনই আমরা পছন্দ করে বসি। তাতে আমরা ছাড়া আর কেউ থাকে না—আমরা বেঞ্চে বসে পা দোলাতে দোলাতে মনে করি, ট্রেন সত্যি বহু দূর চলে যাচ্ছে, আমরা চার বন্ধু কোনো নাম-না-জানা দেশের মধ্য দিয়ে চলেছি।

কোনো কোনো সন্ধ্যেবেলা আমরা যেতাম বেলেঘাটা, তিলজলা কিংবা খিদিরপুর। এই সব জায়গাই আমাদের কাছে নতুন—আমরা একটু একটু করে কলকাতা শহরটাকে আবিস্কার করতাম। আমরা চারজনে এক সঙ্গে থাকতাম বলেই রাস্তা হারিয়ে ফেলার জন্য ভয় ছিল না। রাস্তা হারাতাম, ঘুরে ঘুরে আবার খুঁজেও পেতাম। এই শহরের শিরা উপশিরার মতন অসংখ্য গলি ঘুঁজি, কত নানান রকমের বাড়ি—সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য জগত। পাথুরেঘাটার গলিতে ঢুকে পুরোনো কালের কতগুলো বিরাট বিরাট বাড়ি দেখে আমরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। শ্বেত পাথরের সিঁড়ি, বিশাল স্তম্ভ, কোনো বাড়ির ছাদ আবার দুর্গের মতন। কোনো বাড়ির গেটের সামনে সিংহ মূর্তি। রাজেন মল্লিকের বাড়িতে এসে আমরা আবিস্কার করেছিলাম আস্ত একটি চিড়িয়াখানা। কে কে হাজারির বাড়িতে দেখেছি শিকল দিয়ে বাঁধা সত্যিকারের জ্যান্ত বাঘ।

প্রতিদিন আমরা অন্তত ছ' সাত মাইল হাঁটতাম। ভাস্করের কড়া নির্দেশে আমাদের ক্লান্ত ভাব দেখাবার কোনো উপায় ছিল না। ফেরার পথটা একটু একঘেয়ে লাগতো—খুব বেশী রাত না হলে আমরা ট্রামে বাসে ফিরতাম না। আমরা কখনো কখনো ফুটবল বা ক্রিকেট খেলেছি বটে, কিন্তু হেঁটে বেড়ানোই ছিল আমাদের বেশীর ভাগ দিনের প্রোগ্রাম। শেষ পর্যন্ত এটা আমাদের নেশার মতন হয়ে গিয়েছিল। কলেজে এসেও দু'এক বছর এটা বজায় রেখেছিলাম।

এইভাবে কলকাতা শহরটা আমাদের হাতের পাতার মতন চেনা হয়ে যায়। আমরা ক্ষুদ্র পারিবারিক গণ্ডি থেকে শুধু যে বেরিয়ে আসি, তাই-ই নয়, এই শহরটাকে খুব আপন মনে হয়। আমরা মনে মনে বেশ জোর করে বলতে পারি, এই শহরটা আমাদের।

আর একটা কথাও আমি আলাদা ভাবে বুঝতে পারি, গ্রামের মাঠে কিংবা নির্জন বাগানে বা নদীর ধারে একা একা ঘুরে বেড়িয়ে আমি যে আনন্দ পেয়েছি, শহরের অচেনা রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার আনন্দ ও উত্তেজনাও তার চেয়ে মোটেই কম নয়। একটা গলি পার হলে কোথায় পড়বো আমরা জানি না, আচমকা পেয়ে গেছি পার্ক কিংবা পুকুর। আলুপোস্তার কাছে একদিন পথ হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছোলাম, যেখানে সকলেই চীনেম্যান, বস্তির মধ্যে সরু সরু গলিতে গরীব চীনেরা থাকে—দোকানের সাইনবোর্ডও চীনে ভাষায়। কয়েকজন লোক আমাদের পেছনে ঘুর ঘুর করে বিড়বিড় করে কি সব বলতে লাগলো। একটু একটু গা ছমছম করছিল আমাদের, কিন্তু ভাস্কর তার স্বভাবসুলভ অহংকারের সঙ্গে বললো, চল্, এখানে একটা হোটেলে ঢুকে চা খাই।

বিষ্ণু আর পংকজ একসঙ্গে বললো, না। আমি চুপ করে রইলাম। আমার আপত্তি ছিল না।

ভাস্কর চারদিকে তাকিয়ে বললো, এই জায়গাটা চায়না টাউন, আমার কাকার কাছে শুনেছি।

একটা দোকানের সামনের সাইনবোর্ডে দুটো সাপের ছবি আঁকা, ভাস্কর বললো, চ'না, ভেতরে ঢুকে দেখি!

বিষ্ণু দৃঢ় ভাবে না বলায় সেদিন আর বেশী দূর এগোনো যায়নি। বিষ্ণু তার বাবা মায়ের খুব আদরের ছেলে—তার গতিবিধি সম্পর্কে অনেক বিধিনিষেধ ছিল—তবু সে জোর করেই বিকেল বেলা আসতো আমাদের সঙ্গে। তাকে নিরাপদে ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে আমরা একটা দায়িত্ব বোধ করতাম।

বেড়াবার সময় আমরা কখনো যে কোনো বিপদে পড়িনি তা নয়। কখনো কোনো পাড়ায় হঠাৎ গোলমাল শুরু হওয়ায় ও পুলিসের আবির্ভাবে আমরা অন্ধের মতন ছুটেছি। কিন্তু এসব ছোটখাটো ব্যাপার ছাড়াও একবার বেশ একটা গুরুতর ব্যাপারই ঘটেছিল।

তখন কলকাতায় অনেক বাড়িই খালি পড়ে থাকতো। 'টু লেট' ঝোলানো বাড়ি যাকছার। তা ছাড়াও, দমদম, বরাগনর, বেলগাছিয়ার দিকে অনেক বড় বড় জমিদারদের বাগানবাড়ি—যা যুদ্ধের সময় মিলিটারিরা নিয়ে নিয়েছিল—সেগুলো এখন জানলা দরজা ভাঙা অবস্থায় হা—হা করছে। সেই সব বাড়িতে ঢুকে এ ঘর ও ঘর দেখার ব্যাপারে আমার খুব কৌতূহল ছিল, আমার এই ইচ্ছেটা ভাস্করকে প্রকাশ করায় সে বেশ উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। সুতরাং ফাঁকা বাড়ি পরিদর্শন করাও ছিল

আমাদের একটা কাজ। সেখানে আমাদের কেউ হঠাৎ দেখলে চোর বলেও ভাবতে পারতো, কিন্তু আমাদের চুরি করার মতন কিছুই ছিল না। আমরা সেই বিশাল বিশাল বাড়ির এক একটা ঘরে এক একজন ঢুকে হা—হো ইত্যাদি চিৎকার করতাম প্রতিধ্বনি শোনার আশায়।

একদিন কি কারণে স্কুলে হাফ হলিডে হয়ে গেছে, বাড়ি ফেরার বদলে ভাস্কর আমাদের নতুন জায়গায় বেড়াতে যাবার প্রস্তাব দিল। সেদিন বিজু ছিল না সঙ্গে, বিজু জ্বরের জন্য স্কুলে আসে নি। কিন্তু প্রভাত বলে আর একটি ছেলে আমাদের দলে জুটে গেল। প্রভাত একটু বখাটে ধরনের ছেলে—হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষায় 'ভারতী' কথাটার মানে 'সিনেমার ভারতী' লিখেছিল বলে সে বাংলার স্যারের কাছে প্রচণ্ড মার খেয়েছিল। এ ছাড়াও সে একবার হেডমাস্টার মশাইকে পেছন থেকে হেডু হেডু বলায় খুব লাঞ্ছিত হয়েছিল। তবু প্রভাতকে দলে নেওয়া হলো, কারণ সে খুব মজার মজার কথা বলে।

শ্যামবাজারের খালপাড়ের স্টেশন থেকে টিকিট কিনে আমরা চড়ে বসলাম ট্রেনে। প্রায় খেলনার গাড়ির মতন ছোট ট্রেন, লোকের বাড়ির গা ঘেঁষে যায়—চলন্ত ট্রেন থেকে নেমে পড়ে আবার দৌড়ে ওঠা যায় সহজেই। এই রকম ট্রেন পরে আমরা আবার দেখেছিলাম দার্জিলিং-এর রাস্তায়।

শ্যামবাজার ছাড়িয়ে পশু হাসপাতালের পাশ দিয়ে, বেলগাছিয়া ভিলার গা ঘেঁষে ট্রেন চললো দুলতে দুলতে। এর পর থেকে আর সব কিছু আমাদের অচেনা। হাতিয়াড়া নামে কোন্ এক সুদূর রাজ্যে গিয়ে এই ট্রেনের যাত্রা শেষ হবে।

কিছুদূর যাবার পর আমাদের মনে হলো আমরা একটা অপূর্ব সুন্দর জায়গায় এসে পৌঁছেছি। সবুজ মখমলের মতন ঘাসে ভর্তি মাঠ, তার ওপাশে বিস্তৃত জলাভূমি, মাঠের আর এক প্রান্তে একটা মস্ত প্রাসাদ। সেই প্রাসাদের দেয়ালে নানারকম রঙীন কাঁচ বসানো, বিরাট সিংহ-দরজার পাশে দু'জন পুতুল দরোয়ান। কিন্তু দূর থেকে দেখেই বোঝা যায় বাড়িটা পরিত্যক্ত। এমন সুন্দর স্থান শুধু স্বপ্নে দেখা যায়।

এক পাল গরু পার হচ্ছে বলে ট্রেনটা সেখানে থেমে আছে। আমরা ক'জন ঝুপ-ঝুপ করে নেমে পড়লাম।

একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, ঘাস ভিজে। তার ওপর দিয়ে আমরা দৌড়োতে লাগলাম বাড়িটার দিকে। ধারে কাছে কোনো লোকজন নেই। এই জায়গাটা যেন আমাদের জন্যই অপেক্ষা করে ছিল। পঙ্কজ তো উৎসাহের আতিশয্যে সেই মাঠে ডিগবাজি খেয়ে জামা-প্যাণ্টে কাদা লাগিয়ে ফেললো।

বাড়িটার সিংহ-দরজা পেরিয়ে গেলে ভেতরে একটা ছোট বাগান। দেখলেই বোঝা যায়, এ বাড়িও মিলিটারিদের দখলে ছিল—যেসব মাছ মাংসর টিন তারা ব্যবহার করতো—সারা বাগানে সেই টিন ছড়িয়ে আছে। কয়েকটা তাল গাছের গুঁড়িও কাটা অবস্থায় এখানে সেখানে ছড়ানো। আমরা আগেই শুনেছিলাম, জাপানীদের ভয় দেখাবার জন্য তাল গাছের গুঁড়ি কামানের মত সাজিয়ে রাখা হতো যুদ্ধের সময়—আসল কামানের অভাব দেখা গিয়েছিল। সেই বস্তু চোখের সামনে দেখলে উত্তেজনা লাগে।

বাগানটাতে গাছপালা কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই বলতে গেলে, তবে একটা আম গাছে কচি কচি আম ফলে আছে। ধারে কাছে অনুমতি নেবার মতন কেউ নেই, আমরা হুড়োহুড়ি করে আম পাড়তে লাগলাম। নিজের হাতে পাড়া সেই কাঁচা

আমের এমন অপূর্ব স্বাদ—যেন জীবনে আমরা সে রকম আম কখনো খাইনি!

প্রভাত বললো, ইস, মাইরী, একটু যদি নুন পাওয়া যেত তাহলে একেবারে আলুর দম হয়ে যেত!

সে কথা শুনে আমরা একেবারে হেসে লুটোপুটি। বিষ্ণু সঙ্গে নেই বলে প্রভাতের মাইরী বলায় আমরা কেউ আপত্তি জানালাম না। প্রভাত সব কিছুকেই আলুর দম বলে। আমাদের ইতিহাসের নতুন স্যারকে খুব ভালো লাগতো। প্রভাত বলেছিল, এই স্যারটা খুব ভালো। একেবারে আলুর দম!

বাড়িটার সদর দরজা ভাঙা। কেউ যেন কুড়ুল দিয়ে দরজাটা ভেঙে খান খান করেছে। জানলার ভাঙা কাচ এখনো ছড়িয়ে আছে।

আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকলাম। সুদৃশ্য ডিসটেমপার করা এক একটি ঘর—কিন্তু সেই সব দেয়ালে ধোঁয়ার দাগ। দেয়ালের মাঝে মাঝে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার চৌকো চৌকো দাগ দেখে মনে হয়, আগে সে সব জায়গায় ছবি ছিল। ছাদ থেকে ঝুলন্ত ঝাড় লণ্ঠনের সামান্য ভগ্নাংশই অবশিষ্ট আছে।

চওড়া কাঠের সিঁড়িতে আংটা লাগানো। দেখে বোঝা যায়, আগে সেই সিঁড়িতে কার্পেট পাতা থাকতো—এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। সেই সিঁড়ি দিয়ে আমরা আস্তে আস্তে ওপরে উঠলাম।

ওপরে চৌকো চৌকো রঙীন পাথর বসানো বিরাট বারান্দা। এক পাশে লোহার রেলিং দেওয়া বারান্দা, আর এক পাশে সারি সারি ঘর। এত বড় বড় ঘর আমি কখনো দেখি নি। এত বড় বাড়িতে একজনও লোক নেই বলে গা ছম্ ছম্ করে।

একটা ঘরে ঢুকে দেখি অসংখ্য ছেঁড়া কাপড় ছড়ানো। এবং কাগজের টুকরো। কাপড়গুলো ছুঁতে আমাদের ঘেন্না হয়—কিন্তু কাগজের টুকরো দু' একটা তুলে দেখি। হাতের লেখা, মনে হয় যেন চিঠি। কিন্তু টুকরোগুলো এতই ছোট যে কিছু বোঝা যায় না। এরকম ভাবে কেন এগুলো ছিঁড়েছে, কে ছিঁড়েছে? মিলিটারিরা বাংলা চিঠি পেল কোথায়!

বিভিন্ন কাগজের টুকরো মিলিয়ে দেখার জন্য আমার একটা ঝোঁক চেপে যায়। অতি কষ্টে দুটি লাইন উদ্ধার করতে পারলুম। তোমার চোখে রাজ্যের ঘুম......আমার চোখে ঘুম নেই।......তুমি ঘুমোও, আমি বরং তোমায় দেখি......। এটুকু পড়েই আমার বুকের মধ্যে শিরশির করে—যদিও মনে হয়, এ বোধহয় চিঠি নয়, কোনো কবিতার লাইন।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, ঘরে আর কেউ নেই; আমি একা। সেই ফাঁকা ঘরে রেণুর জন্য আমার মন কেমন করে ওঠে।

ভাস্কররা ঘুরতে ঘুরতে একটা ঘরে গিয়ে দেখে দুজন গুন্ডা চেহারার লোক সেখানে কি যেন করছে। ওদের দেখেই লোক দুটো হুংকার দিয়ে ওঠে, কি চাই?

ভাস্কর সহজে দমবার পাত্র নয়। সে তেজের সঙ্গে বলে, আপনারা জিজ্ঞেস করার কে? এটা কি আপনাদের বাড়ি?

তখন তাদের একজন ভাস্করের ঘাড় চেপে ধরলো, আর একজন একটা মস্ত ছোরা বার করলো, যাকে লোকে বলে ড্যাগার।

রীতিমতন সংকটজনক অবস্থা। প্রভাত কাঁদো কাঁদো মুখে বললো, আমাদের ছেড়ে দিন। আর করবো না, ছেড়ে দিন।

ওদের মধ্যে একজন ভাস্করের ওপর খুবই রেগে গেছে। সে বললো, ভাস্কর

যদি নাকে খৎ দেয়, তা হলে ছাড়তে পারে। ছুরির বিরুদ্ধে আমাদের করার কিছু ছিল না। ভাস্করকে নাকে খৎ দিতেই হলো। ভাস্করের সেই অপমানিত মুখ কোনোদিন ভুলবো না।

॥ ৫৫ ॥

যদিও সূর্যর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল, কিন্তু ছেচল্লিশ সালের মাঝামাঝি সে হঠাৎ মুক্তি পেয়ে গেল। বাংলার অ্যাসেমব্লীতে 'জেল ডেলিভারি'র জন্য হট্টগোল চলছিল অনেক দিন ধরেই। বেয়াল্লিশের আন্দোলনের পর বাংলার জেলগুলিতে রাজ-বন্দীদের সংখ্যা সাড়ে তিন হাজার। সোহরাওয়ার্দি মুখ্যমন্ত্রী হবার পর অনেককেই ছেড়ে দিলেন—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলার অনেক বন্দীও এই সময় ছাড়া পান।

সূর্য বাড়িতে কোনো খবর পাঠায়নি, তার ধারণা ছিল সে একা বাড়ি ফিরে সবাইকে চমকে দেবে। তবু কি করে রটে যায়। সংবাদপত্রেও এই প্রসঙ্গের উল্লেখ ছিল। সূর্য যে-ট্রেনে ফিরলো, সেই ট্রেনেই আরও পঁচিশ তিরিশজন রয়েছেন। হাওড়া স্টেশনে বিপুল ভিড়, বহু লোক ফুলের মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে থামতেই মুহু-র্মুহু 'বন্দে মাতরম' ও 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি উঠলো—দৌড়োদৌড়ি, হুড়োহুড়ি পড়ে গেল চারদিকে। অনেক মা তাঁদের সন্তানকে বহু বছর বাদে দেখলেন, অনেক পিতা তাঁদের সন্তানদের ইহজীবনে আর দেখার আশা পরিত্যাগ করেছিলেন। অতিরিক্ত আবেগ ও আনন্দের সঙ্গে তাই চোখের জল মেশে।

সূর্যকে নিয়ে যাবার জন্য ছোটখাটো একটি দল এসেছে। বড়বাবু, চিররঞ্জন, হিমানী, সান্ত্বনা, বাদল এবং বাদলের তিন-চারজন বন্ধু। বাদলের জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি থেকে কেউ আসেনি। শ্রীলেখা কলকাতায় থাকলে বোধ হয় যেমন করেই হোক আসতো।

ট্রেনের দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল সূর্য। সে এখন বাইশ বছরের যুবক, মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, দাড়ি গোঁফ একবারও কামায়নি এ পর্যন্ত, লম্বায় সে বড়বাবুকেও ছাড়িয়ে গেছে। তার কাঁধে ঝোলানো একটা কাপড়ের ব্যাগ, হাতে একটা নতুন সুটকেস। ধুতি আর একটা টুইলের শার্ট পরে আছে।

গাড়ি থামতেই চিররঞ্জন এগিয়ে গিয়ে সূর্যকে জড়িয়ে ধরলেন। সূর্যর মুখে বিষণ্ণতা বা ক্লান্তির ছাপ নেই। তাকে বেশ উৎফুল্লই দেখাচ্ছে। সে নেমে এসে প্রথমে বাদলের মাকে বললো, কি মেজোমামীমা, কেমন আছেন? কি রে বাদল, সান্ত্বনা—

হিমানী পা দুটিকে এমনভাবে জোড়া করে আছেন যে দেখলেই বোঝা যায় তিনি প্রণামের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। কিন্তু প্রণাম করার কথা সূর্যর মনেই পড়লো না। সে বাবার দিকে তাকিয়ে বললো, আপনার শরীর ভালো আছে তো?

বড়বাবু স্মিতমুখে ঘাড় নাড়লেন।

বিষ্ণু আর রেণুকে সূর্য চিনতেই পারেনি। রেণুর হাতে একটা সাদা ফুলের মালা। সে লাজুকভাবে এগিয়ে এসে মালাটা সূর্যকে পরিয়ে দিতে গেল। সূর্য প্রথমে দেখতে পায়নি, চমকে গিয়ে বললো, এ কি এ কি!

সূর্যর গলা পর্যন্ত রেণুর হাত পৌঁছোলে কেন? সে লাজুক মুখে হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। চিররঞ্জন বললেন, দাও, দাও, মালাটা পরিয়ে দাও—

কয়েকজন প্রায় জোর করেই সূর্যর মুখটা নীচু করে দিল, রেণু মালাটা পরিয়ে দিতেই বাদলের বন্ধু ভাস্কর চেঁচিয়ে উঠলো, ইনকিলাব—

বহু অচেনা লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে চেঁচিয়ে উঠলো—জিন্দাবাদ!

সেই রকম ভাবেই চললো, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কী জয়!

সূর্যকে ঘিরে রীতিমতন একটি ভিড়। অস্বস্তি ও লজ্জায় সূর্য মুখ তুলতে পারছে না, মালাটা খুলে নিয়ে সান্ত্বনার হাতে দিয়েছে। নানা জনের নানা প্রশ্ন। চিররঞ্জন বললো, আরে বাড়িতে চল্‌, ছেলেটাকে আগে একটু বিশ্রাম নিতে দে—।

রণক্ষেত্র থেকে বীর সৈনিকের প্রত্যাবর্তনের মতন একটা দৃশ্য।

বড়বাবু ভাবছেন, মেদিনীপুর স্টেশনে কয়েক বছর আগেকার সেই দৃশ্যের সঙ্গে আজকে হাওড়া স্টেশনের এই দৃশ্যের কত তফাৎ। সূর্য আজ সুস্থ সবল শরীরে ফিরে এসেছে। সেদিন তিনি ভেবেছিলেন, সূর্যর সঙ্গে আর দেখাই হবে না। তিনি সূর্যর পিঠে হাত রেখে বললেন, আসবার পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো?

সূর্য বললো, না। শোওয়ার জায়গা পেয়েছিলাম।

স্টেশনের বাইরেও কিছু লোক ওদের ঘিরে থাকে। সূর্য আজ অনেকেরই দ্রষ্টব্য। কেউ কেউ এমনি ভিড় দেখে হঠাৎ তার মধ্যে ঢুকে পড়ে জিজ্ঞেস করে, দাদা কি হয়েছে! কি করেছে? ইনি কে?

বাদল সগর্বে উত্তর দেয়, আমার দাদা। একজন বিপ্লবী।

বড়বাবু দুখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করলেন। হই হল্লা করতে করতে আসা হলো বিবেকানন্দ রোডের বাড়িতে। অনেক পাড়াপ্রতিবেশী উঁকি ঝুঁকি দিতে এলো।

এবং বিকেলের মধ্যেই সকলের সব কৌতূহলের নিবৃত্তি হয়ে গেল। তারপর থেকে সূর্য এই শহরের যে-কোনো একজন সাধারণ মানুষেরই মতন।

জমিয়ে গল্প বলার দক্ষতাও নেই সূর্যর। তার পলাতক জীবন ও কারাবাস সম্পর্কে ছেলের দল অসংখ্য প্রশ্ন করে—সূর্য মাত্র দু-একটা বাক্যে তার উত্তর সেরে দেয়। সকলেই তাকে ভাবছে এক রোমাঞ্চকর ঘটনার নায়ক, অথচ নায়কটির আত্মগরিমা প্রচারের কোনো আগ্রহ নেই। সূর্যর সুটকেস খোলার পর তার থেকে যখন দুটো কাঁচা পাতি লেবু বেরুলো—তখন সবাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, এ দুটো এনেছো কেন? সূর্য শুধু উত্তর দিল, জেলখানার স্মৃতি। তারপর লেবু দুটো নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকতে লাগল।

দুপুরবেলা বড়বাবুর বাড়িতেই সকলের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা। চিররঞ্জন আর হিমানী অনেকদিন বাদে এ বাড়িতে এলেন। এত বড় বাড়িটা ফাঁকা পড়ে আছে। বড়বাবু একবার চিররঞ্জনকে বললেন, চিরু, তোমরা এসে আবার এ বাড়িতে থাকো। ছেলেটার একটু যত্ন আত্যি করার দরকার, তোমরা যদি একটু দেখাশুনো না করো—

চিররঞ্জন বললেন, দাদাকে বলে দেখি—

সূর্যর ঘরখানা বড়বাবু পরিষ্কার করিয়ে রেখেছেন। সূর্যর জিনিসপত্র সব আগেকার জায়গায় ঠিকঠাক সাজানো রয়েছে। শুধু আলনায় তার যে পুরনো শার্টগুলো ঝুলছে—সেগুলো এখন আর তার গায়ে লাগবে না।

সূর্য ঘরে প্রথম পা দিয়ে থমকে দাঁড়ালো। হঠাৎ তার মনে হলো টেবিলটার পাশে শ্রীলেখা দাঁড়িয়ে আছে—নীল শাড়ি পরা, হাতে একটা চিরুনি। সূর্য শ্রীলেখার চিঠির উত্তর দেয়নি—সেই কথা মনে পড়লো। মুখ ফিরিয়ে বাদলকে জিজ্ঞেস করলো, শ্রীলেখা কেমন আছে রে?

সে দিনটা ছিল বাইশে শ্রাবণ। বাদলরা সব বন্ধু মিলে ভাস্করদের পাড়ায় রবীন্দ্র স্মরণসভার আয়োজন করেছে। দুপুর থেকেই তারা ছটফট করছে সেখানে যাবার জন্য। এবং সূর্যকেও নিয়ে যেতে হবে। সূর্যকে কোনো কিছু না বলেই ওরা তাকে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি করে ফেলেছে। দেয়ালে দেয়ালে এর মধ্যেই পোস্টার লাগানো হয়ে গেছে, প্রধান অতিথি: নির্যাতিত রাজবন্দী সূর্যকুমার ভাদুড়ী।

সূর্য সেই অনুষ্ঠানের কথা শুনে আকাশ থেকে পড়লো। এক কথায় উড়িয়ে দিয়ে বললো, যা যাঃ, আমি ওসব মিটিং ফিটিং-এ যাই না।

তখন চললো ঝুলোঝুলির পালা। সূর্যকে না নিয়ে যেতে পারলে বাদলের সম্মান থাকে না বন্ধুদের কাছে। সূর্য কিছুতেই যাবে না। চিররঞ্জনও বললেন, ছেলেটাকে তোরা একটু বিশ্রাম নিতে দে। আজই কেন বাইরে নিয়ে যেতে চাইছিস।

শেষ পর্যন্ত বাদল তার মাকে আর দিদিকে ধরলো সূর্যকে রাজি করাবার জন্য। সূর্যর চরিত্র সম্পর্কে বাদল এইটুকু অন্তত বুঝেছে সে মেয়েদের মুখের ওপর কোনো কঠিন কথা সাধারণত বলে না। মেয়েদের সে সম্মান দেয়।

শেষ পর্যন্ত সূর্যকে যেতেই হলো। পরিচিত রাস্তাগুলি দিয়ে সূর্য অনেক দিন পরে হাঁটছে। এই রাস্তা দিয়েই বাদল একদিন সূর্যকে বিষ্ণুদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিল।

হাতিবাগান বাজারের কাছে এসে সূর্য জিজ্ঞেস করলো, বাদল, তোর মনে আছে?

বাদলের মনে নেই। সে বললো, কি সূর্যদা?

—এই যে, ঠিক এইখানে একদিন একটা মিছিল আসবার সময় পুলিস তোকে আর আমাকে মেরেছিল?

বাদল বললো, ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। একটা লালমুখো সার্জেন্ট!

—কি রকম ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল?

এই কথা বলার সময় সূর্য হাসছে। তিক্ততা বা ক্রোধের চিহ্নমাত্র নেই। এটাও যেন একটা মধুর স্মৃতি।

সেই জায়গাটা দিয়ে এখন অনবরত লোকজন যাচ্ছে আসছে, কাছেই ফুটপাথে সামগ্রী বিছিয়ে বসে আছে একজন ফেরিওয়ালা। সেদিনের সেই দুটি অপমানিত বালকের মুখচ্ছবি এখন কোথাও নেই। জীবন থেমে থাকে না কোথাও।

ভাস্করদের বাড়ির কাছেই রাস্তার ওপর প্যান্ডেল বাঁধা হয়েছে। অনুষ্ঠান শুরু হবার কথা সাড়ে পাঁচটায়—কিন্তু উদ্বোধন সঙ্গীত যিনি গাইবেন, তিনি এখনো এসে পৌঁছোন নি বলে আরম্ভ করতে একটু দেরি হচ্ছে। সভাপতি এসে গেছেন এরই মধ্যে—সভাপতি উদীয়মান কথা-সাহিত্যিক তাপস সিংহ রায়। তিনি এখন ভাস্করদের বৈঠকখানায় বসে সিগারেট টানছেন।

সূর্যকে সেখানে এনে বসানো হলো। বাদল অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, তাপসদা, ইনি আমার দাদা, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আজই এসেছেন।

তাপস সিংহ রায়ের হাতে একটা বই ধরা ছিল। তিনি শুকনোভাবে বললেন, নমস্কার। তারপর আবার বইয়ের পাতায় মনোনিবেশ করলেন।

তাপস সিংহ রায়ের এই নিরুত্তাপ ব্যবহার দেখে বাদল একটু দমে গেল। সে আশা করেছিল, তার কীর্তিমান দাদার কথা শুনে যে-কেউ লাফিয়ে উঠবে, বিস্ফারিত চোখে বলবে, ও আপনিই সেই!

তাপস সিংহ রায়ের মতন লেখকরা তখনো বাদলের চোখে দেবতার সমান। যে-কোনো ম্যাগাজিন খুললেই যার লেখা দেখতে পাওয়া যায়—তাঁর মতন কীর্তিমান

আর কে আছে। অবশ্য সূর্যও কম কিছু নয়।

বাদল আবার বললো, আমার দাদা সেই ফরটি টু থেকে জেলে ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত ও'দের ছাড়াবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন।

তাপস সিংহ রায়ের মতন লোকেরা নিজেরাই অপরের দ্বারা অভিনন্দিত হতে চায়। কোনো জায়গাতেই নিজের থেকে অপরকে বেশী উল্লেখযোগ্য হিসেবে মনে করা পছন্দ করে না। তিনি একটু বিরক্তভাবেই বললেন, তোমাদের আরম্ভ হতে আর কত দেরি?

বাদল কোনোক্রমে একটা উত্তর দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর তাপস সিংহ রায় সূর্যর দিকে নিজের সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, চলবে?

সূর্য বললো, আমি খাই না।

তাপস সিংহ রায় আগের সিগারেট থেকেই নতুন একটা ধরালেন। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, এই সব মিটিং কিছুতেই টাইমলি আরম্ভ করতে পারে না। আমাকে আবার আর এক জায়গায় যেতে হবে। আপনি নজরুলের কিছু খবর জানেন?

সূর্য বললো, নজরুল ইসলামের কথা বলছেন? কি হয়েছে তাঁর?

—শুনেছি তো শরীর অসুস্থ। কাল প্রেমেনদার বাড়িতে গিয়েছিলাম। প্রেমেনদা বললেন—

—প্রেমেনদা কে?

তাপস সিংহ রায় একটু অবাক হয়ে বললেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র। এই নাম কি দ্বিতীয় কারুর আছে?

সূর্যর মুখ দেখেই বোঝা গেল সে এই নামের সঙ্গে পরিচিত নয়। সে চুপ করে গেল।

তাপস সিংহ রায় কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি পাঁক পড়েননি? কিংবা পুতুল ও প্রতিমা?

সূর্য নম্রভাবে বললো, আমি বাংলা বই বিশেষ পড়িনি।

তাপস সিংহ রায় হঠাৎ উৎকটভাবে গম্ভীর হয়ে গিয়ে নিজের হাতের বইখানাতে আবার মনোনিবেশ করলেন। এই হামবাগটা প্রেমেন্দ্র মিত্রেরই লেখা যদি না পড়ে থাকে, তা হলে তাপস সিংহ রায়ের লেখাও নিশ্চয়ই পড়েনি। একে তা হলে এই সভায় এনেছে কেন? তাপস সিংহ রায় সেই জাতীয় লেখক যাঁরা মনে করেন, যে-লোক তাঁর লেখা পড়েনি—সে মানুষ হিসেবে গণ্য করার মতন কিছু নয়।

লোকটির ভাবভঙ্গি দেখে সূর্যর একটু মজা লাগলো। তার কারাবাস বিষয়ে তার মনে কোনো ভুল ধারণা নেই—কিন্তু সে কথা এই লোকটির মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করলো না—এটা একটু আশ্চর্য হবারই মতন। এই কথা শুনে সকলেই কিছু না কিছু প্রশ্ন করে।

তাপস সিংহ রায় সূর্যর চেয়ে বছর দশেকের বড়। রোগা পাতলা চেহারা, ঠোঁট দুটো কালচে, চোখের নিচেও ঘন কালো দাগ। এক মাথা চুল, চুলগুলো মাঝে মাঝে কপালে এসে পড়ছে, উনি এক হাত দিয়ে সরাচ্ছেন। এটা প্রায় ওঁর মুদ্রাদোষের মতন। এ ছাড়া, একটু নার্ভাস ধরনের মানুষ—শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারেন না, অনবরত হাঁটু দোলাচ্ছেন, সিগারেটের প্যাকেটটা ক্ষণে ক্ষণে হারাচ্ছেন আর খুঁজে পাচ্ছেন এবং একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন। একবার যখন তিনি চোখ থেকে চশমা খুলে তাকালেন, তখন মনে হলো, তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না।

সূর্য ঠিক মিশুকে প্রকৃতির নয়—তবু এই লোকটির সম্পর্কে তার আরও কিছু জানতে ইচ্ছে করছিল—কিন্তু কিভাবে কথা শুরু করবে, ভেবে পেল না।

একটু বাদেই সভা শুরু হলো। 'সম্মুখে শান্তি পারাবার' দিয়ে উদ্বোধন। এর পর গানের পর গান, আবৃত্তি, বক্তৃতা, একটি ছেলে আর মেয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পুরো 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' শোনালো। সূর্যর বেশ ভালোই লাগছে। সব কিছুই যেন তার কাছে নতুন। জেলে থাকতেও আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনাররা মাঝে মাঝে গান-বাজনার আসর বসিয়েছে—কিন্তু তার সঙ্গে এর কোনোই মিল নেই। অধিকাংশই কম বয়েসী ছেলে-মেয়ে, তাদের ভয়, লজ্জা ও অহংকার মিশ্রিত মুখ। রেণু আবৃত্তি করলো, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। পরিষ্কার উচ্চারণ, রিণরিণে কণ্ঠস্বর। বাদল শোনালো রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার প্যারোডি, 'ভগবান তুমি যুগে যুগে ভূত পাঠায়েছ বারে বারে' ইত্যাদি। লোকেরা খুব হাসলো।

সভাপতির জরুরী কাজ আছে বলে তিনি প্রধান অতিথির আগেই ভাষণ দিয়ে ফেললেন। খুব জোরালো বক্তৃতা দিলেন তিনি। তিনি বললেন, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-দিনে এ ধরনের অনুষ্ঠান করার কোনো সার্থকতা নেই, জন্মদিনটাই পালন করা উচিত। মৃত্যুদিনে শোকের ভাবগাম্ভীর্য মোটেই বজায় থাকে না—লোকে আনন্দ করে, ভালো লাগলে হাততালি দেয়। এবং রবীন্দ্রনাথকে ভালভাবে শ্রদ্ধা জানাতে গেলে—রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যকেও জানতে হবে—কেননা একই নদীর প্রবাহ ইত্যাদি। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যকে যারা রবীন্দ্র-ধুত্তোর সাহিত্য বলে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে তারা যে আসলে কত মূর্খ ইত্যাদি। এবং অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে তিনি 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকাটিকে গালাগালি করতে লাগলেন।

সভাপতির বক্তৃতার সময়েই সূর্য চুপি চুপি সরে পড়বার চেষ্টা করেছিল—কিন্তু বাদলের বন্ধুরা স্টেজের বাইরে সতর্ক পাহারায় রয়েছে। সূর্য এখানে আসবার আগে বাদলকে দিয়ে কড়ার করিয়ে নিয়েছিল যে, সে কোনো বক্তৃতা দিতে পারবে না। স্টেজেও বসবে না। কিন্তু এখন তার কোনো কথাই খাটছে না। তাকে জোর করে স্টেজে বসানো হয়েছে—এবং নানা অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে তার গুণপনার বর্ণনা দিয়ে তার বক্তৃতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সূর্য কি করে পালাবে বুঝতে পারছে না।

এক সময় তাকে মাইকের সামনে দাঁড়াতেই হলো। সে অনুভব করলো, তার পা কাঁপছে। সে হাজার হাজার জনতার সঙ্গে একসঙ্গে দৌড়েছে, পুলিসের সঙ্গে লড়াই করতেও ভয় পায়নি—অথচ এখানে এই শ' দু-এক নারী-পুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে তার গলা শুকিয়ে আসছে।

সে হাত জোড় করে বললো, আমার বলার কোনো ক্ষমতা নেই। আমাকে ক্ষমা করুন।

শ্রোতারা চেঁচিয়ে বললো, যা হয় একটু কিছু বলুন।

সূর্য বললো, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু জানি না।

একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আপনি জেলখানার অভিজ্ঞতার কথা বলুন। বাদলের বন্ধুরাও চিৎকার করে উঠলো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, জেলখানার অভিজ্ঞতা শুনতে চাই।

সূর্য মাইকের সামনে একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, আমার কিছু মনে পড়ছে না। আমার জেলখানার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলার মতন কিছু নেই—হাজার হাজার লোক জেল খাটছে—এর মধ্যে নতুনত্ব কি আছে?

—বলুন, তবু কিছু বলুন—

সূর্য লোকজনের মুখের দিকে না তাকিয়ে দূরের দিকে চোখ রাখলো। তারপর বললো, আমার শুধু মনে পড়ছে কয়েকজন মানুষের কথা। আমার গুরু যিনি ছিলেন— তাঁর নাম হরকুমার ভট্টাচার্য—তিনি বেশ কয়েক বছর পুলিসের নজর এড়িয়ে পালিয়ে পালিয়ে ছিলেন। শেষকালে তাঁর টি বি হয়। বেলেঘাটায় একটা বস্তির মধ্যে লুকিয়ে থেকে তিনি বিনা চিকিৎসায় মারা যান। দেশের কাজের জন্য তিনি প্রাণ দিয়েছেন—কিন্তু তাঁর নামও এখন কেউ জানে না।...আর একজন, ব্রজগোপাল মিত্র—বেয়াল্লিশের আন্দোলনে তিনিই আমাদের টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন—ঝাড়গ্রামের কাছে পুলিস তাঁকে লাঠিপেটা করে মারে, মুখের ওপর বুট জুতো দিয়ে...আরও একজন, তাঁর কথাই আমার বেশী মনে পড়ছে—যোগানন্দদা, আমরা অনেকদিন একসঙ্গে ছিলাম—মজঃফরপুরে যখন আমরা দুজনে একসঙ্গে পালাচ্ছিলাম, যোগানন্দদা আমার থেকে মাত্র তিন চার হাত দূরে—

একটু থেমে ঢোক গিলে সূর্য আবার বললো, উনি রাস্তার ওপরেই গুলি খেয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। আমি ওঁকে কোনো সাহায্যও করতে পারিনি, এদের জন্য কি কোনোদিন কোনো সভা-টভা হবে? জানি না, এদের নামও কেউ মনে রাখবে কি না—

॥ ৫৬ ॥

দু'একদিনের মধ্যেই সূর্য বুঝতে পারলো যে কলকাতায় নিজের বাড়িতেও সে নিজেকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারছে না। তার ব্যাপারটা তো ঠিক ঘরের ছেলের ঘরে ফিরে আসা নয়। কোনো দিনই সে পুরোপুরি পারিবারিক জীবনের মধ্যে থাকার সুযোগ পায়নি—মাঝখানে কয়েকটা বছর শুধু এক যৌথ পরিবারের মধ্যে নিজেকে মেলাবার চেষ্টা করে বিড়ম্বিত হয়েছে। এখন ফিরে আসার পর এখানে এমন কেউ নেই—যার প্রতি সে কোনো টান অনুভব করতে পারে।

এত বড় বাড়িতে শুধু বাবা আর ছেলে। বড়বাবু তাঁর সেই তিনতলার ঘরটিতেই আছেন—এত বয়েস হয়েছে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে বেশ হাঁফ ধরে—তবু ঘর বদলান নি। সূর্য থাকে দোতালায়। বাকি ঘরগুলো সব তালাবন্ধ।

বড়বাবু এত দিন পরে ছেলেকে ফিরে পেয়ে তাকে আদর যত্ন করার জন্য খুব উন্মুখ। কিন্তু তিনি জানেন না ছেলে কি খেতে ভালোবাসে, কিসে ছেলের মনে স্ফূর্তি হয়। এ সব কথা তিনি মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতেও পারেন না। ঠাকুর চাকরদের শুধু বারবার সতর্ক করে দেন, দেখবি, দাদাবাবু কি চায়—।

বড়বাবুর ঘুম ভাঙে খুব ভোরে। তাঁকে চা দেওয়া হয় প্রত্যেক দিন ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময়। চা খেয়ে কিছুক্ষণ ছাদে পায়চারি করে তিনি নীচে নেমে আসেন। নামবার সময় সিঁড়ির পাশেই ছেলের ঘরে একবার উঁকি মারেন, ছেলেকে তিনি সকাল সকাল ডাকতে চান না। ওর শরীরের ওপর দিয়ে বহু অনিয়ম অত্যাচার গেছে—এখন একটু ভালো করে ঘুমিয়ে নিক।

কিন্তু প্রত্যেক দিনই দেখেন সূর্য আগেই ঘুম থেকে উঠে একখানা বই নিয়ে পড়তে বসে গেছে। দিনের অধিকাংশ সময়ই সূর্য বই নিয়ে কাটায়। জেলখানা থেকে এই অভ্যেসটি নিয়ে এসেছে।

বড়বাবু তখন সূর্যর ঘরে ঢুকে বলেন, জানলাটানলাগুলো সব খুলিস নি কেন? এত কম আলোয় পড়লে চোখ খারাপ হয়ে যাবে।

জেলখানার সেলে যে কয়েক বছর কাটিয়ে এসেছে, বেশী আলোই তার বোধ হয় এখনো সহ্য হয় না।

বড়বাবু নিজেই জানলাগুলো খুলে দেন। বাইরের রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকাল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। সূর্যর ঘরের নতুন রং-করা দেয়ালগুলো ঝকমক করে। সূর্যর ঘরের দেয়ালগুলোতে একটাও ছবি বা ক্যালেন্ডার নেই। হঠাৎ বড়বাবুর মনে হয়, সূর্যর মায়ের একখানা ছবি বাঁধিয়ে রাখা উচিত ছিল। বুলবুলের একটা মাত্র ছোট ছবি আছে তাঁর কাছে—বিবর্ণ হয়ে এসেছে এতদিনে, যদি বড় করা যায়—।

বড়বাবু বললেন, মুখটুখ ধুয়ে নে। আমি নীচে যাচ্ছি, ঠাকুরকে বলছি জলখাবার দিতে—

বড়বাবু নীচ থেকে খবরের কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ির তদারকি করে আবার ফিরে আসেন দোতলায় খাবার ঘরে। সূর্য না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন।

সূর্য এসে নীরবে টোস্টে মাখন লাগাতে শুরু করে দেয়। তার এক হাতে তখনও বই।

বড়বাবু একদৃষ্টে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কোনো কথা খুঁজে পান না। অথচ অনেক কথাই বলার আছে। প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে পুত্র মিত্রবদাচরেৎ। কিন্তু ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার কোনো সুযোগই তো হলো না।

—ডিম খেলি না?

সূর্য বই থেকে চোখ না তুলে বললো, না। খেতে ইচ্ছে করছে না।

—তোর শরীর ভালো আছে তো?

—হুঁ।

—তুই বাইরের কোনো জায়গা থেকে ঘুরে আসবি?

এবার বই মুড়ে রেখে সূর্য মুখ তুলে তাকালো। পিতাপুত্রে চোখাচোখি হলো, দুজনেই চোখ সরিয়ে নিল প্রায় এক সঙ্গে।

সূর্য বললো, কোথায় যাবো?

—তোর শরীর সারাবার জন্য যেখানে যেতে ইচ্ছে হয়। যদি কোনো পাহাড়ী জায়গায় যেতে চাস্—

—আমার শরীর তো বেশ ভালোই আছে।

এ কথা ঠিক, সূর্যর স্বাস্থ্য এখন বেশ চমৎকার। সুগঠিত দীর্ঘ শরীর, চোখ দুটি উজ্জ্বল। তবে অন্যান্য বাইশ বছরের যুবকদের মতন তার মুখে সেই সরল লাবণ্যের ভাবটা আর নেই। চার বছরের কারাবাসই তাকে অনেক অভিজ্ঞ করে তুলেছে। সে কদাচিৎ হাসে, তবু সেই হাসির সময়েও তার মুখে এই পৃথিবীকে চিনে নেওয়ার একটা ভাব ফুটে ওঠে।

—তোর মার কথা তোর একটুও মনে আছে?

এই আকস্মিক প্রসঙ্গ পরিবর্তনে সূর্য সামান্য একটু চমকে উঠলো। বড়বাবু এ বিষয়ে কোনো দিন সূর্যর সঙ্গে কথা বলেন নি। সূর্য মুখ নীচু করে টেবিলের ওপর ডান করতল মেলে সেইদিকে তাকালো। নীচু গলায় বললো, হ্যাঁ, একটু একটু—

—তোর মনে থাকার কথা নয়। তখন তোর বয়েস খুবই কম। অবশ্য তোর দুজন মা ছিল। দ্বিতীয় মায়ের কথা হয়তো—

—দুজনের কথাই আমার মনে আছে।

—তোর নিজের মা আত্মহত্যা করেছিলেন।

এই কথাটা বলে বড়বাবু তীব্র চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে চান। তাঁর এই দুর্বোধ্য স্বভাবের ছেলের কোনো দিকে কোনো দুর্বলতা আছে কিনা—এটা জানা যেন তাঁর বিশেষ দরকার।

সূর্য স্বাভাবিক গলায় বললো, কেন?

—তা আমি জানি না। কেউ জানে না।

দুজনেই একটুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বড়বাবু বললেন, তোর মা খুব বড় শিল্পী ছিলেন। যারা তাঁকে দেখেছে—কোনো দিন ভুলতে পারবে না।

সূর্যর মুখ দেখে মনে হয়, সে তার মায়ের প্রসঙ্গ নিয়ে কারুর সঙ্গে আলোচনা করতে চায় না। এমন কি, নিজের বাবার সঙ্গেও না। সে যেন খাবার টেবিল থেকে উঠে পড়ার জন্যই ছটফট করছে।

—তোর মায়ের অনেকগুলো মোহর আছে আমার কাছে। সেগুলো আমি তোর কাছেই দিয়ে যেতে চাই।

—আমি নিয়ে কি করবো?

—আমার যা কিছু আছে, তোকে এবার বুঝে নিতে হবে। আমি আর কতদিন থাকবো। এবার তো একদিন যেতেই হবে।

সূর্য খুব বুদ্ধিমানের মতন মৃত্যুর প্রসংগটা বুঝতে পেরেও ভাবাবেগের প্রশ্রয় দিল না। সেটা এড়িয়ে গিয়ে বললো, আপনি কি শিগগিরই কোথাও যাচ্ছেন?

বড়বাবুও বুঝতে পারলেন ছেলের মনোভাব। তিনিও একটু ইতস্তত করে বললেন, ভাবছি একবার এলাহাবাদ, গোয়ালিয়র—ঐ সব দিকে ঘুরে আসবো। তোর মায়ের অনেক স্মৃতি আছে ঐ সব জায়গায়। তুই যাবি আমার সঙ্গে?

—আপনি একাই ঘুরে আসুন।

—তুই তা হলে এখানে একলা একলা কি করবি?

—আমার কোনো অসুবিধে হবে না।

সূর্য উঠে পড়লো টেবিল থেকে। বড়বাবু একটু আহতভাবে তাকিয়ে রইলেন। নিজের মায়ের সম্পর্কেও ছেলেটার আগ্রহ এত কম? অথচ তিনি তাঁর মায়ের কথা শুনবার জন্য বারবার ছুটে যেতেন ভবানীপুরে। বড়বাবু চুপ করে ভাবতে লাগলেন নিজের মায়ের কথা। প্রায় সত্তর বছর আগে মৃতা এক কিশোরী বালিকা ছিল তাঁর মা—এ কথা ভাবতে কি রকম অবাক লাগে। যারা মরে যায়, তাদের বয়েস বাড়ে না। স্মৃতিতে তাঁর মায়ের চেহারা—অন্যদের মুখে শুনে শুনে তিনি নিজে সেটা সৃষ্টি করেছেন—চিরকাল কিশোরীই থেকে যাবে, আর তার ছেলে আজ বার্ধক্যের মধ্য সীমায়—

ঘোর ভেঙে বড়বাবু উঠে পড়লেন। মনে মনে ঠিক করলেন, যে-কোনো উপায়েই হোক চিররঞ্জনকে সপরিবারে এ বাড়িতে আবার ফিরিয়ে আনতেই হবে। আর কেউ উপস্থিত না থাকলে—ছেলের সঙ্গে একা একা তিনি কিছুতেই কথাবার্তা জমাতে পারছেন না। তাঁর নিজেরও তো কথা বলার কোনো সঙ্গী নেই। অথচ তিনি ভেবে রেখেছিলেন, ছেলেটা ফিরে এলে তাঁর মনের গুমোট কেটে যাবে, সারা বাড়িটাও আবার জমজমাট হয়ে উঠবে।

সূর্য সারা দিনই প্রায় নিজের ঘরেই বই নিয়ে কাটায়। কোথায় যাবে বুঝতে পারে না। তার কোনো বন্ধু নেই। পলাতক জীবন শুরু হবার পর থেকে সে যাদের

সংগে কাটিয়েছে, তাদের কথাই বারবার মনে পড়ে। তারা তো অনেকেই বেঁচে নেই, কিংবা কোথায় থাকে সে জানে না। তার জীবনদর্শন এখন অনেকটা বদলে গেছে। এখন তার প্রায়ই মনে হয়, যোগানন্দর মৃত্যুর জন্য সেই অনেকটা দায়ী। যোগানন্দ দল ছেড়ে সংসারের আশ্রয়ে গিয়ে নাকিরেছিল। সূর্য অতখানি হিংস্রতার সঙ্গে তাকে টেনে না বার করলেই তো পারতো। তাতে কি ক্ষতি হতো দেশের? মহাসমুদ্রের মতন এই দেশে সব কিছুই তলিয়ে যায়, কোনো কিছুতেই আঁচড় পড়ে না।

মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎচমকের মতন মনে পড়ে যায় শ্রীলেখার কথা। সূর্যর মাঝে মাঝেই দৃষ্টি বিভ্রম হয়—সে হঠাৎ হঠাৎ শ্রীলেখাকে দেখতে পায়। তার নাকে ভেসে আসে শ্রীলেখার চুল কিংবা শরীরের গন্ধ। যেন এইমাত্র শ্রীলেখা কাঁদলো। বই থেকে মুখ তুলে সূর্য দরজার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। শ্রীলেখার অপূর্ব সুন্দর থুতনি সে কাল্পনিক হাতে স্পর্শ করে। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ভাবে, জেলে থাকতে থাকতে তার মনটা দুর্বল হয়ে গেছে। এরকম দিবাস্বপ্ন দেখার অভ্যেস তো তার ছিল না আগে।

দু'একদিন বাড়িতে বন্ধ থাকার পর সূর্য ঠিক করলো সে তার জেলখানার সংগীদের সঙ্গেই গিয়ে দেখা করবে। অতুলপ্রসাদের বাড়ি বসিরহাটের দিকে। সেখানে গিয়ে তাঁকে সে শুনিয়ে আসবে লেবু গাছটার কথা?

তার আগে সে গেল শান্তিপ্রসাদের বাড়িতে। রাজবল্লভ পাড়ায় ওদের বাড়ি। সেখানে গিয়ে সূর্য একটা আঘাত পেল। জেলখানাতেই শান্তিপ্রসাদের মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছিল, সে রোগ আর সারে নি—এখন সে বদ্ধ উন্মাদ। অন্যরা সবাই ছাড়া পেলেও শান্তিপ্রসাদের আর মুক্তি নেই। শান্তির বাবা সূর্যর পরিচয় পেয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

সূর্যর মুখ দিয়ে কোনো কথা সরে না। সে জানে না কোনো সান্ত্বনা বাক্য। তার মনে পড়ে, শান্তিপ্রসাদের বড় বড় জুলপির চুল ধরে টেনে টেনে উপড়ে দিয়েছিল এক সি আই ডি অফিসার। শান্তিপ্রসাদ তখন একটুও চ্যাঁচায়নি। তার পায়ের ওপর জুতোসুদ্ধু দাঁড়িয়ে নাচানাচি করেছে দুজন পুলিস—তখনও মনের জোর অটুট ছিল শান্তিপ্রসাদের—তবু কেন মোটামুটি নিরুপদ্রব কারাবাসের সময়ে শান্তিপ্রসাদ পাগল হয়ে গেল কে জানে। মায়ের মৃত্যু সংবাদ কি শারীরিক অত্যাচারের চেয়েও বেশী প্রভাব ফেলতে পারে?

হঠাৎ সূর্যর অসম্ভব রাগ হয়। ইচ্ছে করে যে-কোনো একটা জিনিস হাতে নিয়ে মট করে ভেঙে ফেলে। দেয়ালে শান্তিপ্রসাদ আর তার মায়ের যে ছবিটা ঝুলছে—সেটাই আছড়ে ভেঙে ফেললে কেমন হয়!

শান্তিপ্রসাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সূর্য কিছুক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। সে ভাবে যে তার একটা কিছু করা দরকার। জেল থেকে ছাড়া পাবার আগে সে প্রায়ই ভাবতো, কোনোক্রমে বাইরে বেরুতে পারলে আবার এই সংগ্রামেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। কোনো কাজ অসমাপ্ত রাখাই তার স্বভাব নয়—স্বাধীনতার লড়াইও তার নিজের জীবনে অন্তত অসমাপ্ত রাখবে না।

কিন্ত কিভাবে কাজ শুরু করবে, কোন্ দল, কিছুই সে জানে না। তার নিজের দল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। প্রথম যখন সে হরকুমারের সংস্পর্শে আসে—তখন তার কোনো রাজনৈতিক শিক্ষা ছিল না—সে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল নিছক জেদের বশে। জেলখানায় কিছু কিছু বই পড়ে সে খানিকটা তত্ত্ব শিখেছে—কিন্তু প্রত্যক্ষ

রাজনীতি সম্পর্কে তার এখনো কোনো অভিজ্ঞতা হয়নি। গুপ্ত সমিতিতে যারা কাজ করেছে—প্রকাশ্য জীবনে, যেখানে বহু মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতে হয়—সেখানে তারা দিশেহারা হয়ে যায়। নতুন জোয়ার এসেছে গণ-আন্দোলনের—এখানে পুরোনো কায়দার বিপ্লবীরা অপাঙক্তেয়।

তা ছাড়া, সূর্য লক্ষ করছে, কলকাতার রাজনৈতিক তৎপরতা হঠাৎ যেন কমে গেছে। আগেকার মতন মিছিল কিংবা সভাসমিতিও তার চোখে পড়ে না। যুদ্ধ শেষের পর মারাত্মক ইনফ্লেশানে যে যার সংসার সামলাতে ব্যস্ত। রাম শ্যাম যদু মধু যারা সকলেই যুদ্ধের সময় কিছু না কিছু চাকরি পেয়েছিল—এখন পটাপট চাকরি চলে যাচ্ছে তাদের। চালের দোকান, কাপড়ের দোকান শুধু নয়—কয়লার দোকানের সামনেও লম্বা লাইন। বাড়ির ঝি চাকররাও কণ্ট্রোল আর লাইন—এই ইংরেজি শব্দ দুটি সব সময় ব্যবহার করে।

একদিন ক্ষিতীশদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কলেজ স্ট্রীটে। কাঁধে একটা বিরাট থলেতে ভর্তি স্কুলপাঠ্য বই। ব্রজগোপালের সঙ্গে শিয়ালদার এক মেসে এই ক্ষিতীশদার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সূর্যর। পুরোনো আমলের দেশকর্মী ছুটকো ছাটকাভাবে বেশ কয়েকবার জেল খেটেছেন। এঁকে দেখে সূর্য খুব খুশী হয়ে উঠলো—তবু নিজেদের পুরোনো দিন সম্পর্কে কথা বলা যাবে।

ক্ষিতীশদা প্রথমে চিনতে পারলেন না সূর্যকে। ভুরু কুঁচকে বললেন, কে বলো তো তুমি, ভাইটি? কোথায় দেখেছিলে আমায়, রাজসাহীতে? তুমি কি রাজসাহীর মনোরঞ্জনদার ছেলে?

সূর্য পূর্ব পরিচয় দিতেই ক্ষিতীশদা বললেন, ওহো, তুমি সেই যুবরাজ? তোমাকে ভুলে যাওয়া তো আমার উচিত হয়নি। চেহারা অনেক বদলে ফেলেছো। ব্রজগোপাল যেদিন প্রথম তোমাকে নিয়ে এলো, আমি বলেছিলাম, এই যুবরাজটিকে কোথায় পেলে!

সূর্য জিজ্ঞেস করলো, আপনি এত বইপত্তর নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন?

ক্ষিতীশদা সূর্যর হাত ধরে বললেন, বলছি, সব বলছি। এসো, একটু গোলদীঘিতে বসি—দুটো সুখ দুঃখের কথা বলা যাক।

ক্ষিতীশদার বয়েস এখন প্রায় পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। এর মধ্যেই চোখের নীচে কালো ছোপ। কিন্তু মুখে হাসি লেগে আছে।

বইভর্তি থলেটা পাশে নামিয়ে রেখে তিনি হাতছানি দিয়ে একটা আলুকাবলিওয়ালাকে ডাকলেন। পচা আলু যাতে না দেয় এবং কাবলি ছোলা যাতে বেশী পরিমাণ দেয়—শ্যেনচক্ষু সেদিকে নজর রেখে দাম দেবার সময় আবার দরাদরি করতে লাগলেন। সূর্য কিছু একটা বলতে যেতেই তিনি বললেন, উঁহু, তুমি কোনো কথা বলবে না, আমি আজ তোমাকে খাওয়াচ্ছি। চারটি ফুটো পয়সা লোকটিকে গুণে দিয়ে তিনি সূর্যর হাতে এক পাতা আলুকাবলি তুলে দিলেন এবং নিজে একটা নিয়ে বেশ তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগলেন। বললেন, প্রায় দু' মাস বাদে শখ করে চারটি পয়সা খরচ করলাম, বুঝলে ভাইটি? দিনকাল বড় খারাপ।

সূর্য অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। ক্ষিতীশদা বললেন, তোমার কি খবর বলো? রোজগারপাতির কিছু ব্যবস্থা আছে? না হলে আমি সুরেশদাকে ধরতে পারি—

সূর্য জিজ্ঞেস করলো, দাদা, আপনি কি করছেন?

ক্ষিতীশদা এক গাল হেসে বললেন, আমি? আমি এখন জোয়াল বইছি এত

দিন তো বেশ জেলের ভাত জুটে যাচ্ছিল—এখন আর কে খেতে দেবে বলো? বিয়ে করে ফেলেছিলাম অনেক আগে—সব দায় দিয়ে রেখেছিলাম আমার বাপের ঘাড়ে—বাবা হঠাৎ মারা গিয়ে আমাকে বিপদে ফেলে দিলেন। এখন গোটা সংসারের জোয়াল আমার ঘাড়ে। রোজগারপাতি করা কি সোজা? আমরা নাম কাটা সেপাই—আমাদের তো আর কোথাও চাকরি জুটবে না। গিয়ে ধরলাম সুরেশদাকে। সুরেশদা বললেন, চাকরি তো দিতে পারছি না—কিছু লেখো টেখো, যা পারি দেবো। লিখে মাসে কুড়ি পঁচিশ টাকা পাই—তাতে তো আর সংসার চলে না। তাই এই বইয়ের ব্যবসা ধরেছি। ইস্কুলে ইস্কুলে গিয়ে টেকসট বই সাপ্লাই করি। হেডমাস্টারদের কাছে গিয়ে প্রাক্তন রাজবন্দী—এই বলে কাঁদুনি গাই! হে—হে—হে—হে

যেন এটা একটা দারুণ হাসির ব্যাপার। ক্ষিতীশদা অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললেন, আমি গুজব শুনেছিলাম, তুই মারা গেছিস।

সূর্য হেসে বললো, না, মরিনি।

—ভালো, ভালো। বড় খুশী হয়েছি। অনেকেই তো মরেহেজে গেছে। যে কটা বেঁচে আছে আমার মতন—এখন পেটের জ্বালায় ধুঁকছে। তোর কম বয়েস, বড় খুশী হয়েছি, আর এক পাতা আলুকাবলি খাবি?

—না।

—তুই তা হলে এখন কি করবি?

—সেই কথাই তো আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাইছি। আমাদের এখন কি করা উচিত? এই সময়ে আমাদের কি কিছুই করার নেই?

ক্ষিতীশদা মুখে একটা তিক্ত ভঙ্গি করে বললেন, কিছু না, কিছু না। এ পোড়ার দেশের জন্য আর কিছু করা উচিত না। এখন যে-যার নিজের ধান্দা দেখ।

—কিন্তু ক্ষিতীশদা, আমরা এতদিন যা করলাম, তা সবই কি ব্যর্থ হয়ে যাবে?

—হয়ে যাবে কি, হয়ে গেছে। সব নষ্ট। কি চলছে এখন এ দেশে? একে কি রাজনীতি বলে? না কুকুরের কামড়া-কামড়ি?

সূর্য একটু দুঃখিত ভাবে বললো, ক্ষিতীশদা, আমরা কি তবে সব চুপ করে দেখব?

ক্ষিতীশদা ধমক দিয়ে বললেন, তা ছাড়া কি করবি? গোল্লায় যাক এ দেশ! এ দেশের কিছু হবে না। এখন দরকার কাদের জানিস, যারা এদের সবাইকে শেষ করে ফেলবে! আমরা কিজন্য স্বাধীনতার লড়াই করলাম? কতকগুলো ব্যবসায়ী আর ব্যারিস্টারের হাতে ক্ষমতা যাবে বলে? এখন সব শালা হিন্দু মুসলমান নিয়ে লাফাচ্ছে?

আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর ক্ষিতীশদা উঠে চলে গেলেন। বইয়ের থলিটার ভারে তাঁকে একটু কুঁজো হয়ে হাঁটতে হয়। সেই অবস্থায়ই বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে দৌড়ে একটা চলন্ত ট্রামে উঠে পড়লেন।

সূর্য আরও কিছুক্ষণ বসে রইলো সেই বেঞ্চে। বর্তমানের রাজনীতি সে সত্যিই বুঝতে পারে না।

দেশে একটা হাওয়া উঠে গেছে যে, ইংরেজ এবার সত্যিই এ দেশ ছেড়ে চলে যাবে। ১৯৪৮ সালেই তারা ক্ষমতা হস্তান্তরিত করছে। এখন স্বাধীনতার প্রশ্ন আর বড় নয়—এখন শুধু ভাগাভাগির প্রশ্ন। আবার এসেছে ক্যাবিনেট মিশন, লর্ড ওয়াভেল গান্ধীর সঙ্গে ঘন ঘন বৈঠকে বসছেন—আর সব বানচাল করে দিচ্ছেন জিন্না। গান্ধীজী যতই ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম করুন, জিন্নাসাহাবের চোখে তিনি হিন্দুই

রয়ে গেলেন—এবং কংগ্রেস নিছক হিন্দুর পার্টি। এই কংগ্রেসের হাতে দেশের ভার দিয়ে গেলে মুসলমানদের জীবন বিপন্ন হবে। জিন্না ততদিনে এ দেশের মুসলমানদের প্রায় বুঝিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন যে হিন্দু ও মুসলমানদের পক্ষে পাশাপাশি শান্তিতে থাকা সম্ভব নয়। হিন্দু আর মুসলমানরা এতকাল পরে ঘুম ভেঙে উঠে জানতে পারলো যে তারা দুটো আলাদা জাত, তাদের দেশও আলাদা।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা—এবং তিনি পাকিস্তান চিন্তার বিরোধী বলে কলকাতার মুসলমানরা ঈদের নামাজের সময় তাঁকে ইমামের কাজ করতে দিতে অস্বীকার করে। ইসলামী শাস্ত্রে এত বড় পণ্ডিতকেও হিন্দু-ঘেঁষা অপবাদ নিতে হয়। জিন্না তাঁকে অত্যন্ত কটু ভাষায় জানান, I refuse to discuss with you by correspondence or otherwise, as you have completely forfeited the confidence of Muslim India.

মুসলিম ইণ্ডিয়া বা পাকিস্তানের চেহারা যে কি রকম হবে, সে সম্পর্কেও সাধারণ মানুষের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। অনেকেই ভাবছে—মুসলমান প্রধান রাজ্য-গুলিতে আলাদা আলাদা পাকিস্তান হবে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলমানরা ভাবছে তারা সকলেই পাকিস্তান হলে তার সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোভী গোষ্ঠীর চক্রান্ত যাদের চোখে ধরা পড়েছে—তারাও এখন কিংকর্তব্য-বিমূঢ়।

সূর্য এর আগের সময়টাই জেলে কাটিয়েছে বলে—রাজনীতির এই নতুন অবস্থাটার সঙ্গে সে পরিচিত ছিল না। এখন সে বাইরে এসে দেখছে—সাম্প্রদায়িক প্রশ্নটাই দেশ জুড়ে আলোড়ন তুলেছে—অথচ এ সম্পর্কে তার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। এখন যদি তাকে আবার নতুন করে লড়াই শুরু করতে হয়—তা হলে কার বিরুদ্ধে লড়াই হবে?

নিজে সে এ সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় না বলেই ক্ষিতীশদার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাইলো। প্রায়ই সে কলেজ স্ট্রীটে চলে এসে ক্ষিতীশদার সঙ্গে দেখা করে।

একদিন ক্ষিতীশদা বললেন, চল, তোকে সুকল্যাণের বাড়িতে নিয়ে যাই। সুকল্যাণকে মনে আছে তোর?

সূর্য বললো, এই নামের কারুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি।

ক্ষিতীশদা অবাক হয়ে বললেন, সুকল্যাণকে চিনিস না? দীপ্তি? দীপ্তিকেও চিনিস না?

সূর্য এবারও দু দিকে মাথা নাড়লো।

ক্ষিতীশদা বললেন, চল্, তোর আলাপ করলে ভালো লাগবে। আমাদের পুরোনো লোক। আমি প্রায়ই দীপ্তির হাতে চা খেয়ে আসি।

সূর্য সত্যিই এর আগে সুকল্যাণ কিংবা দীপ্তি এই নামের কারুকে দেখে নি। তবু সে কৌতূহলী হয়ে ক্ষিতীশদার সঙ্গে চললো।

হাজরার মোড়ের কাছেই মোটামুটি একটা নতুন বাড়ির দোতলায় উঠে গেলেন ক্ষিতীশদা। সিঁড়ির কাছটা একটু অন্ধকার ছিল। তাই যে মহিলা দরজা খুললেন, সূর্য তাঁর মুখটা ভালো দেখতে পায় নি।

মহিলাটি সূর্যর দিকে তাকিয়ে বললেন, এ কি, তুমি? কেমন আছো?

সূর্য বিস্মিতভাবে তাকিয়ে রইলো।

মহিলাটি মুখ টিপে হেসে বললেন, এর মধ্যেই ভুলে গেলে? চিনতে পারছো না?

মহিলাটির মাথার কোঁকড়া চুল পাতা কেটে আঁচড়ানো। ধারালো মুখ, সোনালী ফ্রেমের চশমা। ঠোঁটে চাপা হাসি। সূর্য ঘরের মধ্যে পা দেবার পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি অমর, এখনো চিনতে পারছো না?

সূর্য অস্ফুট গলায় বললো, বনলতা মাসি!

মহিলাটি ক্ষিতিশদার দিকে তাকিয়ে বললেন, ক্ষিতিশদা, একে কোথা থেকে পেলেন?

ক্ষিতীশদা কাঁধের ঝোলাটি এক পাশে নামিয়ে রেখে বললেন, রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেলাম। কলকাতার রাস্তায় এখনো এরকম দু একটা মণি মানিক্য মেলে। নে দীপ্তি, একটু চায়ের জল বসা। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে!

মহিলা আবার সূর্যর দিকে চেয়ে বললেন, আমার নাম বনলতা নয়। আমার নাম দীপ্তি।

সূর্য বললো, আমার নামও অমর নয়। আপনি আমাকে অমর বলেই জানেন। আমার নাম সূর্য।

মহিলা অবাক হয়ে বললেন, তুমিই সূর্য?

ক্ষিতীশদা বললেন, আমার নাম কিন্তু সত্যিই ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য। আমার আর অন্য নামটাম নেই!

ক্ষিতীশদার বলার ধরনে ওরা হেসে উঠলো।

সূর্য জিজ্ঞেস করলো, ননী মেসোমশাই কোথায়?

দীপ্তি বললেন, উনি এখনো জেল থেকে ছাড়া পান নি।

ক্ষিতীশদা জিজ্ঞেস করলেন, ননী আবার কে?

দীপ্তি হাসতে হাসতে বললেন, দীনেনদার ভাই রণেন। সে আমার বর সেজেছিল এক সময়, আপনি জানেন না? এই ছেলেটা আবার তার সংগে মেসোমশাই সম্পর্ক পাতিয়ে ছিল।

ক্ষিতীশদা বললেন, উঃ, তোদের এই নামের গোলমাল নিয়ে আর পারা যায় না। যত সব নাটুকে কারবার। ওসব চুকে বুকে গেছে, এখন ছাড়তো।

দীপ্তি বললেন, এর নামটাও তো আমি জানতাম না। সূর্যর কীর্তিকাহিনী আমি এর তার মুখে কিছু কিছু শুনেছি—কিন্তু সে যে আমাদের এই অমর, তা আমি বুঝবো কি করে?

বছর সাতেক আগেকার ঘটনা হলেও সূর্যর এখনও সব মনে আছে। চন্দননগরের একটা নির্জন ভাঙা বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য তারা সংসার পেতে ছিল—বনলতা আর ননীমাধব এসেছিল স্বামী-স্ত্রী সেজে—ডাকাতির অ্যাকশানের পর সূর্যর হাঁটুতে চোট লাগায় বনলতা কত যত্ন করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছিলেন। সেই বনলতা আজকের দীপ্তি।

দীপ্তি বললেন, আমাকে আর মাসি-টাসি বলতে হবে না। দিদি বলবে এখন থেকে। তোমার তো নিজের দিদি নেই—

সূর্য বললো, আপনার মনে আছে?

—আমার সব মনে আছে। তুমিই আমাকে দেখে চিনতে পারো নি।

—চিনতে ঠিকই পেরেছিলাম। ক্ষিতীশদা অন্য নাম বলে নিয়ে এসেছিলেন তো—

—যোগানন্দকে তুমিই মেরেছো?

—না, না, আমি মারিনি।

—দলের সবাই জানে—যোগানন্দকে তুমিই শাস্তি দিয়েছো—তার ডেড বডি পড়ে ছিল রাস্তায়—

সূর্য উত্তেজিত ভাবে বললো, এটা একদম ভুল। আমি পারলে যোগানন্দদাকে সর্বশক্তি দিয়ে বাঁচাতাম সেই সময়। কিন্তু বাঁচাতে পারিনি। যোগানন্দদার পুরোনো কথা ভুলে যান—ফোর্ট টু তে উনি যা করেছেন—ওঁর নামে স্মৃতি-স্তম্ভ হওয়া উচিত।

ক্ষিতীশদা বললেন, যোগানন্দ বড় আনস্ক্রুপুলাস ছিল হে। ওকে কেউ কোনোদিন সম্মান করবে না।

সূর্য যোগানন্দকে সমর্থন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। একমাত্র সে-ই যোগানন্দের সঙ্গে দিনের পর দিন কাটিয়েছে—তার অনেক দুঃখ-পথের সঙ্গী। কিন্তু দীপ্তি বা ক্ষিতীশদা সে কথা শুনতে চাইলেন না।

এর পর একে একে আরও পুরোনো বন্ধুদের কথা উঠলো। কেউ মারা গেছে, কেউ এখনো জেলে, কেউ এখন দেখা হলেও ওদের সঙ্গে কথা বলে না। দল ভেঙে গেছে, যুদ্ধ করার স্পৃহা আর কারুর নেই। তবু পুরোনো গল্প বলতে ভালো লাগে। ক্ষিতীশদা চন্দননগরের সেই বাড়ির বৃত্তান্ত ভালো জানেন না—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। দীপ্তি এক একটা বলেন আর হাসিতে ফেটে পড়েন।

—জানেন ক্ষিতীশদা, এই ছেলেটা তখন সাঁতার জানতো না। সাঁতারও জানে না আবার বিপ্লবী হবার শখ। আমাকে ধরেছিল সাঁতার শিখিয়ে দেবার জন্য—এত বড় বুড়ো ধাড়ী ছেলেকে কি কোনো মেয়ে সাঁতার শেখাতে পারে! তারপর, ঐ বাড়িটার সিঁড়িতে আবার একটা ভিমরুলের চাক ছিল—এর যা ভয়, কিছুতেই সিঁড়ির ঐ জায়গাটা দিয়ে একলা যেতে পারে না—আমি ভেবেছিলাম, এ একটা বড়লোকের আদুরে ছেলে, ভীতুর ডিম—এর দ্বারা কোনো কাজ হবে না! কিন্তু ব্রজগোপালদা যেদিন এর সাহসের কথা বললেন—

ক্ষিতীশদা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, ব্রজ মানুষ চিনতে কখনো ভুল করতো না।

ব্রজগোপালের কথা এসে পড়ায় তিনজনেই এক সঙ্গে হঠাৎ চুপ করে যায়। ব্রজ-গোপালের বীভৎস মৃত্যুর কথা ওদের মনে পড়ে। কেউ আর সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করে না।

দীপ্তি একটি মেয়েদের স্কুলে পড়ান। মাঝখানে কিছুদিন সিকিউরিটি প্রিজনার হিসেবে হিজলি জেলে ছিলেন—ফিরে এসে চাকরিটা ফেরৎ পেয়েছেন। এই ফ্ল্যাটে তিনি আর একজন শিক্ষিকা এক সঙ্গে থাকেন। অন্যজন কয়েকদিনের জন্য দেশের বাড়িতে গেছেন। এ বাড়িরই ওপরের একটা ফ্ল্যাটে সুকল্যাণ নামে ওদের প্রাক্তন দলের একজন পুরোনো কর্মী সস্ত্রীক থাকেন—তাঁরা দরকার হলে সাহায্য করেন এঁদের।

দু'খানি ঘরের ছোট ফ্ল্যাট। দীপ্তির ঘরখানি সুন্দর ঝকঝকে তকতকে ভাবে সাজানো। একটি খাট, একটি টেবিল ও দুটি চেয়ার। দেয়ালে শুধু স্বামী বিবেকানন্দর একটি ছবি। বইয়ের র‍্যাকে সমস্ত বই খাকি কাগজ দিয়ে একভাবে মলাট দেওয়া—কোনো বইয়ের নাম পড়া যায় না।

ঘরের মধ্যে স্টোভ জেলে দীপ্তি চা তৈরী করলেন গল্প করতে করতে। পেয়ালা-পিরীচগুলো নতুনের মতন পরিস্কার। দীপ্তির শরীরেও কোথাও এক ছিটে ময়লা নেই।

কথায় কথায় অনেক সময় চলে গেল। ক্ষিতীশদাকে এবার উঠতে হবে। তিনি

বললেন, চল সূর্য, যাবি নাকি?

সূর্য উঠে দাঁড়ালো। ক্ষিতীশদা দীপ্তিকে বললো, শোন। ভালো কথা, তোর ইস্কুলে আমার কিছু বইপত্তর বিক্রীর ব্যবস্থা করে দিতে পারবি? ইস্কুলের লাইব্রেরি নেই?

দীপ্তি বললেন, হ্যাঁ আছে। আপনি এমনি আসুন না, একদিন আমাদের স্কুলে। কিন্তু আপনি নিজে বইগুলো ঘাড়ে করে নিয়ে ঘুরে বেড়ান কেন—

ক্ষিতীশদা বললেন, কি করবো? আমার আর কে আছে বল?

—কিন্তু এটা মোটেই ভালো দেখায় না। আমরা কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি না? আমি এখানকার কংগ্রেস কমিটিকে বলে আপনার একটা কাজের ব্যবস্থা—

—কংগ্রেসের কাছ থেকে দয়া নেবো? দূর দূর দূর! না খেয়ে থাকবো সেও ভালো। তুই কি আজকাল কংগ্রেসে ভিড়েছিস নাকি?

—না, ঠিক যাইনি। তবে লাবণ্যদি প্রায়ই বলেন, কংগ্রেস কমিটির মহিলা বিভাগে যোগ দিতে। একটা কিছু তো করতে হবে।

—পলিটিক্সের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে। দ্যাখ দীপ্তি, আমরা ছিলাম পেট্রিয়ট, আমরা যুদ্ধ করতে পারতাম—কিন্তু পলিটিক্স করা আমাদের দ্বারা পোষাবে না। ওসব বেনে কিংবা ব্যারিস্টারদের কাজ। বেনে ইংরেজের সঙ্গে টক্কর লড়ছে আমাদের বেনের বাচ্চা গান্ধী।

দীপ্তি একটু আহতভাবে বললেন, ক্ষিতীশদা মহাত্মাজী সম্পর্কে এরকমভাবে বলবেন না।

তারপর সূর্যর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখন কি করবে ঠিক করেছো?

সূর্য বললো, কিছু না।

দরজার কাছে এসে দীপ্তি সূর্যকে বললেন, আবার এসো।

সূর্য এই কথাটারই প্রতীক্ষা করে ছিল। দীপ্তির মুখ থেকে এই নিমন্ত্রণটুকু না পেলে আজ রাত্তিরটা সে খুব দুঃখিত হয়ে থাকতো। অনেকদিন বাদে আজ সন্ধ্যেবেলা তার সময়টা সত্যিই খুব ভালো কাটলো।

পরদিন সকালবেলাতেই সূর্য এসে দাঁড়ালো দীপ্তির ফ্ল্যাটের দরজার সামনে। দরজা খুলে দীপ্তি একটু অবাক হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার?

সূর্য বললো, এমনিই এলাম।

সূর্যর মুখখানা ভাবলেশহীন, সে স্থির চোখে দীপ্তির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন তার কিছু একটা গোপন কথা আছে, যা বাইরে দাঁড়িয়ে বলা যায় না।

দীপ্তি সরে দাঁড়িয়ে সূর্যকে ভেতরে আসতে দিলেন। আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমাকে কিছু বলবে?

—না।

—এদিকে কোথাও এসেছিলে?

—আপনার কাছেই এসেছি।

দীপ্তি এবার হেসে বললেন, আমাকে যে একটু বাদেই চান করে খেয়ে ইস্কুলে যেতে হবে? এখনো রান্না বাকি আছে।

সূর্য বললো, আপনি রান্না করুন না, আমি বসছি।

দীপ্তি সূর্যর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুই বুঝতে পারলেন না। চায়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য চা খাবে না। গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে আছে। ছেলেটা কি

বাড়ি থেকে রাগ করে চলে এসেছে?

দীপ্তি টুকিটাকি সংসারের কাজ সারাতে লাগলেন, আর মাঝে মাঝে দেখে যেতে লাগলেন সূর্যকে। সে স্থির হয়ে বসে আছে ঠিক একই রকম ভাবে। ছেলেটা সত্যিই অদ্ভুত। কারুকে এ রকম ভাবে বসে থাকতে দেখলে অস্বস্তি লাগে। দীপ্তি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বইটই পড়বে কিছু?

সূর্য বললো, আপনি আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না।

স্নানটান সেরে দীপ্তি এবার খেতে বসবেন। কিন্তু ঘরে অন্য পুরুষ থাকলে কোনো মেয়ে কি একা খেতে পারে? তিনি বললেন, ওরে বাবা, পৌনে দশটা, আর পনেরো মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হবে আমাকে!

সূর্য ইঙ্গিত বুঝলো না। বললো, আমিও আপনার সঙ্গে বেরুবো।

—আমি খেতে বসবো এখন। তুমিও আমার সঙ্গে খেয়ে নেবে?

—না।

—এসো না, একটু কিছু খাও।

—না, আমার কিছু দরকার নেই—

দীপ্তি প্লেটে করে খানিকটা তরকারি সূর্যর সামনে এনে বললেন, একটু টেস্ট করে দেখো, আমি কি রকম রান্না করলাম—

—আপনার রান্না তো আমি খেয়েছি চন্দননগরে।

—এখন একটু খেয়ে দেখো—

একটু বাদে দীপ্তি ঘরে তালা দিয়ে বেরুলেন। সূর্যও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এলো রাস্তায় তারপর জিজ্ঞেস করলো, আপনার স্কুল কোন্ দিকে?

—কেন, তুমি আমার স্কুলে যাবে নাকি?

—না। আপনি স্কুল থেকে কখন ফেরেন?

—ছুটি হয় সাড়ে চারটেয়। আমার ফিরতে ফিরতে সাড়ে পাঁচটা ছটা হয়।

আর কোন কথা না বলে সূর্য উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করলো।

সেদিন দীপ্তি স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার দু'এক মিনিটের মধ্যেই সূর্য এসে হাজির হলো। খানিকটা অভিযোগের সুরে বললো, আপনি বলেছিলেন ছটার মধ্যে বাড়ি ফেরেন। এখন সাড়ে ছটা বাজে।

দীপ্তি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলে নাকি?

সূর্য নির্লজ্জের মতন বললো, হ্যাঁ।

—আমার সঙ্গে কি তোমার জরুরি কোনো কথা আছে?

—না। আপনি কি সন্ধ্যেবেলা কোথাও বেরুবেন?

—উঁহুঃ! কেন বলো তো?

—তা হলে আমি আপনার এখানে কিছুক্ষণ থাকবো।

—তোমার কি ব্যাপার বলো তো?

—আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই। আমি কি এখানে একটু বসতে পারি?

—হ্যাঁ, বসো। বাঃ আমি কি বারণ করেছি নাকি?

তবু দীপ্তির মনের মধ্যে একটু অস্বস্তি রয়েই যায়। স্কুল থেকে ফিরে এখন কাপড় ছাড়া, গা-ধোওয়ার সময়। পাশের ঘরটা ব্যবহার করলেও—একজন যদি এখানে একা-একা বসে থাকে—। পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যেস আছে দীপ্তির—পুরোনো সহকর্মীরা মাঝে মাঝে দেখা করতে আসে—অন্য কেউ এলে এরকম অস্বস্তি

হয় না—কিন্তু এই ছেলেটি বিশেষ কিছু কথা বলে না বলেই এর কাছে স্বাভাবিক হওয়া যায় না কিছুতেই।

খানিকটা বাদে দীপ্তি স্নান সেরে শাড়ি বদলে আবার এ ঘরে এলেন। হাতে এক বাটি মুড়ি। বাটিটা টেবিলের ওপর রেখে বললেন, এই নাও সূর্য। তুমি ঝাল খাও? কাঁচা লঙ্কা লাগবে?

সূর্য মাথা নোওয়ালো। দুটি কাঁচা লঙ্কা নিয়ে এসে দীপ্তি সূর্যর মুখোমুখি বসলেন। এক বাটি থেকেই দুজনে মুড়ি তুলে তুলে খাচ্ছে। সূর্য নির্নিমেষে চেয়ে আছে দীপ্তির মুখের দিকে।

দীপ্তি বললেন, তোমার তো মা নেই, তুমি বলেছিলে। বাবা ছাড়া আর কে আছেন?

সূর্য বললো, কেউ নেই।

—তাই তো, সারাদিন কি আর বাড়িতে একা একা থাকা যায়? তুমি এখন কি করবে ভাবছো? আবার কলেজে ভর্তি হবে?

—না।

—বাঃ। পড়াশুনো করবে না আর?

—অন্য কারুর কাছ থেকে আমার আর কিছু শেখার নেই।

—তোমার বাড়ির অবস্থা বোধহয় ভালো, চাকরি বাকরি করার দরকার হবে না।

—তাই মনে হয়।

—তোমার বাবা কিছু বলেন না?

—কি বলবেন?

—তোমার বাবা কি বলবেন, তা আমি কি করে জানবো? আমি জিজ্ঞেস করছি, তিনি কিছু বলেন কিনা।

—না।

—তুমি ভারী অদ্ভুত ছেলে। আমি তোমাকে বুঝতে পারি না।

—আমার কোনো বন্ধু নেই।

—সেই জন্যই তুমি অদ্ভুত। তোমার বয়েসের ছেলেরা এই সময় রাস্তায় রাস্তায় হই হই করে ঘুরে বেড়ায়। সিনেমা থিয়েটার দেখে, খেলার মাঠে যায়—আর তুমি আমার এখানে চুপচাপ বসে আছো।

—যে-বয়েসটায় আমার ঐ সব শুরু করার কথা, সেই বয়েসটা আমি কি রকমভাবে কাটিয়েছি আপনি তো জানেন?

——আহা, হা, তোমার এখনো এমন কিছু বয়েস হয়নি। বাচ্চা ছেলে! আমিও তো বাবা জেল খেটেছি, কিন্তু এখন আমার আবার সব কিছু মানিয়ে নিতে তো কোনো অসুবিধা হয় না।

—দীপ্তিদি, আপনি বুঝবেন না। আমি নিজের হাতে দুজন লোককে খুন করেছি—মরার ঠিক আগে আর মরার ঠিক পরে তাদের মুখ যেভাবে বদলে গেছে, আমি তা দেখেছি। আমার থেকে মাত্র তিন হাত দূরে যোগানন্দদা গুলি খেয়ে ঘুরে পড়ে যায়—আমি তাকে কোনো সাহায্য করতে পারিনি—নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য আমি দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম—এইসব কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে—আমি কি কখনো স্বাভাবিক হতে পারি?

সূর্য এই কথাগুলো এমন ঠাণ্ডা অনুত্তেজিত গলায় বললো যে, দীপ্তি শিউরে

উঠলেন। হত্যাকারী এই শব্দটা শুনলেই গা ছমছম করে—হোক না তা শত্রু হত্যা। এই আনন্দকান্তি যুবকটি একজন খুনী—তাঁরাই একে খুনের দীক্ষা দিয়েছিলেন।

দীপ্তি টেবিলের ওপর পড়ে থাকা সূর্যর হাতের ওপর নিজের হাত রেখে খুব নরমভাবে বললেন, ওসব কথা ভুলে যাও। ওসব আর মনে রেখে কোনো লাভ নেই—আমি তোমার দিদির মতন—আমি তোমাকে যতটা পারি সাহায্য করবো।

সূর্য হাত সরিয়ে নিয়ে বললো, হরদা আমাকে বলেছিলেন গীতা পড়তে। বলেছিলেন, দেশের জন্য যা করা যায়, যা আমাদের কর্তব্য—সেখানে হত্যার গ্লানিও আমাদের স্পর্শ করবে না। আমি জেলে বসে গীতা পড়ে দেখেছি। ওসব গীতা-ফিতা আমাকে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারে না। ইচ্ছে করলেই তো কোনো জিনিস ভোলা যায় না।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার হয়ে এসেছে। এখনো আলো জ্বালা হয়নি। দুজনে একটু ক্ষণ চুপ করে রইলো। সূর্য অনামনস্কভাবে বাটির তলা থেকে মুড়ির দু-একটা ভাঙা টুকরো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

দীপ্তি উঠে আলো জ্বাললেন। তারপর বললেন, তুমি বই পড়তে ভালোবাসো? আমার যখন মন খারাপ হয়, আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ি। তোমাকে একটা পড়ে শোনাবো?

সূর্য ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

দীপ্তি বললেন, তোমার একদম পেট ভরলো না, না? তুমি এগ পাউডারের ওমলেট খাও? যুদ্ধের পর কত কি যে বেরিয়েছে—গুঁড়ো দুধ, গুঁড়ো ডিম—। দাঁড়াও, দুটো ওমলেট ভেজে আনি। তারপর কবিতা পড়বো।

অনেক রাত পর্যন্ত কবিতা পড়ে কাটালো ওরা দুজন। দীপ্তির খুব মমতা হচ্ছিল ছেলেটার জন্য—তিনি আর ওকে অন্য কোনো কথা ভাবার সময় দিলেন না, একটার পর একটা কবিতা পড়ে গেলেন চয়নিকা থেকে। তারপর সূর্যকে যখন একটা কিছু পড়তে বললেন, সূর্য চোখ বুজে একটু ভেবে নিয়ে শুরু করলো: ইট ইজ দা উইন্টার অব ডিসকন্টেন্ট— তারপর রিচার্ড দা থার্ড-এর প্রায় অর্ধেকটা মুখস্থ বলে গেল।

সূর্য বিদায় নেবার সময় দীপ্তি তাকে বললেন, ওসব কথা নিয়ে আর একদম চিন্তা করবে না, কেমন? কথা দাও আমাকে?

সূর্য হাসি মুখে বললো, আচ্ছা।

পরদিন সকালেই সূর্য আবার এসে হাজির হতে দীপ্তি রীতিমতন শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। ছেলেটা কি প্রতিদিন দুবেলাই এরকম আসবে?

সূর্যকে দেখলে মনে হয় তার সারা রাত ঘুম হয়নি, চোখ দুটো লালচে। চিরুনি পড়েনি মাথার চুলে। কিন্তু তার মুখে বিমর্ষ ভাবটা নেই—বরং একটা উত্তেজনার ছাপ। দীপ্তি জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার এত সকালেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছো?

সূর্য জিজ্ঞেস করলো, কটা বাজে?

—সাড়ে সাতটা।

—আমার অনেকক্ষণ আগে ঘুম ভেঙে গেছে—কি করবো বুঝতে পারছিলাম না।

—বসো। চা খেয়ে যাও। চা করছি।

—আমি আজ এখানে অনেকক্ষণ থাকবো। আপনার সঙ্গে গল্প করবো।

দীপ্তি হেসে বললেন, অনেকক্ষণ থাকবে কি করে? আমাকে ইস্কুলে যেতে

হবে না?

—আজ ইস্কুলে না গেলে হয় না?

—বাঃ, ইস্কুলে যাবো না কেন? আমার ইস্কুলে যেতে ভালোই লাগে।

—ঠিক আছে। আপনি ইস্কুল থেকে ঘুরে আসবেন, আমি আপনার এখানেই শুয়ে থাকবো। আমার আর কোথাও যেতে ভালো লাগছে না।

সূর্য একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দীপ্তির দিকে, প্রখর তার দৃষ্টি। দীপ্তির কোমল মন, তাঁর মায়া হলো ছেলেটির জন্য। এ ছেলে যদি মনে মনে কোনো কষ্ট পায়ও—মুখ ফুটে কিছুতেই তা বলবে না। একে কিভাবে সাহায্য করা যায়!

দীপ্তি বললেন, তোমার কি হয়েছে বলো তো? বাড়িতে কোনো গোলমাল হচ্ছে?

চা বানিয়ে এনে দীপ্তি সূর্যকে এক পেয়ালা দিয়ে নিজের পেয়ালাটা নিয়ে বসলেন বিছানার ওপর। সূর্য নিঃশব্দে চা খেয়ে যাচ্ছে।

দীপ্তি ওকে বোঝবার চেষ্টা করছেন। যখন তখন একটি ছেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে পাড়ার লোকের চোখে একটু দৃষ্টিকটু দেখাবে এটা তিনি বোঝেন, কিন্তু সূর্যকে সে কথা মুখ ফুটে বলবেন কি করে?

পেয়ালা নামিয়ে রেখে তিনি বললেন, তুমি তো কোনো কথাই বলো না—তুমি কি চাও বুঝবো কি করে।

সূর্য মুখ তুলে দীপ্তির দিকে তাকালো—কোনো কথা বললো না। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সোজা চলে এলো দীপ্তির সামনে। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে দীপ্তির পা দুখানা জড়িয়ে ধরলো!

দীপ্তি বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, এ কি করছো সূর্য।

সূর্য বললো, কিছু না। আপনার পা একটু ছুঁতে ইচ্ছে করলো।

তারপর পোষা কুকুরের মতন দীপ্তির পায়ে মুখ ঘষতে লাগলো।

দীপ্তি দ্রুত পা সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ রক্তাভ। কয়েক পা সরে গিয়ে বললেন, এ কি?

সূর্যও উঠে দাঁড়িয়ে দীপ্তির কাঁধে হাত রেখে বললো, আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না। আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই।

—ঠিক আছে, আগে ঐ চেয়ারে গিয়ে বসো, তারপর কথা বলবো।

সূর্য দীপ্তিকে ছাড়ল না। তার মুখে এখন একটা খুশীর ঔজ্জ্বল্য ফুটে উঠেছে তার এরকম মুখ সচরাচর দেখা যায় না। শক্ত করে দীপ্তিকে চেপে ধরে সে বললো, আপনাকে আমি ছাড়বো না।

দীপ্তি টের পেলেন সূর্যর গায়ে বাঘের মতন শক্তি। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার ক্ষমতা তাঁর নেই। এদিকে দরজা খোলা রয়েছে।

তিনি মিনতি করে বললেন, ছেড়ে দাও, লক্ষ্মীটি, আমাকে একটু কথা বলতে দাও।

সূর্য দীপ্তিকে ছেড়ে দিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। তারপর বললো, আপনি আমার ওপর রাগ করছেন?

—তুমি এসব কি ছেলেমানুষী করছো বলো তো? আমি তোমার থেকে বয়েসে কত বড়—

—কত বড়?

—অন্তত সাত আট বছর তো হবেই।

—তাতে কিছু যায় আসে না।

—তুমি কি চাও আমার কাছে?

—আমি আপনার কাছাকাছি থাকতে চাই। খুব কাছে।

—তা হয় না। অনেক দেরি হয়ে গেছে!

—কিসের দেরি হয়েছে?

—সূর্য, তুমি বড্ড ছেলেমানুষ, তুমি বুঝবে না। আমি তোমার দিদির মতন, সেই ভাবে যদি তুমি আমার কাছে আসতে চাও—

—দীপ্তিদি, আপনি বড় সুন্দর।

সূর্য আবার এগিয়ে আসতেই দীপ্তি ভয় পেয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। সূর্য তাঁকে দরজার পাশেই দেয়ালে চেপে ধরলো। গভীর এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে বললো, আপনাকে শ্রীলেখার মতন দেখতে।

—কে শ্রীলেখা?

—আছে একজন। আপনার সঙ্গে তার চেহারার কোনই মিল নেই যদিও—তবু আপনাকে দেখে তার কথাই মনে পড়ছে।

—তা হলে তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছো না কেন!

—সেখানে যাওয়া যায় না।

—সূর্য, ছেড়ে দাও। এসব পাগলামি করো না।

সূর্য চোখ বুজে ফেললো। দু' দিকে মাথা নেড়ে বললো, আমি পারবো না, কিছুতেই পারবো না।

তারপর মুখ নীচু করে দীপ্তির মসৃণ ঘাড়ে ঠোঁট বোলাতে লাগলো। আস্তে আস্তে মুখটা নিয়ে এলো দীপ্তির বুকে। ভারী নরম বুক। সূর্য যেন অতলে ডুবে যাচ্ছে—দীপ্তির বুকের ভেতরকার সীমাহীন শূন্যতায়। বড় নিশ্বাসে গন্ধ শুকছে।

দীপ্তি ছটফটিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করলেন না। শান্তভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। দারুণ কাতরভাবে বললেন, কি করছো তুমি, জানো না, এ হয় না। এ হয় না। অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমার জীবন কিভাবে চলবে, আমি ঠিক করে ফেলেছি।

—আমি সব উল্টো পাল্টা করে দেবো। আপনাকে আমি এখান থেকে নিয়ে চলে যাবো। আমার আর কেউ নেই, আমি কোথায় যাবো?

সূর্য, তোমার কম বয়েস—কতজনের সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় হবে।

—আপনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমি কি মিথ্যে কথা বলছি?

—তুমি আমার কাছে রোজ এসো, গল্প করো—কিন্তু এসব না।

—এসব মানে কি? আপনি এত সুন্দর—

—সূর্য প্রচণ্ড জোরে দীপ্তিকে চেপে ধরলো নিজের শরীরে। যেন সে ওঁর হাড় পাঁজরা ভেঙে দেবে। তারপরই মাটিতে বসে পড়ে দীপ্তির কোমর জড়িয়ে ধরে বললো, আমাকে দয়া করুন। আমাকে দয়া করুন।

দীপ্তির চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। সূর্য সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে বললো, আমি চিরকাল আপনার কাছাকাছি থাকবো। আমাকে দূরে ঠেলে দেবেন না।

দু'হাতে দীপ্তির মুখটা তুলে লোভীর মতন সেই অশ্রু পান করতে লাগলো সূর্য। দীপ্তি আর বাধা দিলেন না।

॥ ৫৭ ॥

সেই সময় একটা কথা খুব শোনা যাচ্ছিল, ইনডিপেন্ডেন্স ইজ নকিং অ্যাট দ্য ডোর। স্বাধীনতা এসে কড়া নাড়ানাড়ি করছে, দরজাটা খুললেই হলো। কিন্তু দরজা খুলে সেই স্বাধীনতাকে কে বরণ করে নেবে, সেই অধিকারের জন্য ঘরের মধ্যে তখন শুরু নিশব্দতর দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে।

কংগ্রেসের দীর্ঘকালের সংগ্রামের শেষ পরিণতি হঠাৎ বিভ্রান্তিকর হয়ে দেখা দিল। এত উচ্চ আদর্শ, এত মহৎ স্বার্থত্যাগ সব কিছুকেই প্রায় বানচাল করে দিল এক কঠিন বাস্তবতা। মহাত্মা গান্ধী অনেক তোষামোদ, অনেক আপোস করেও জিন্না সাহেবকে বাগ মানাতে পারলেন না।

কংগ্রেস আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসে যে-কটি ভুলভ্রান্তি হয়েছে, শেষ পর্যায়ে তার সারমর্ম একটি মাত্র বাক্যে প্রকাশ করা যায়। কংগ্রেস কোনোদিনই এ দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে চায়নি, ইংরেজের হাত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে চেয়েছিল। ইংরেজই যদি স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা দেওয়ার মালিক হয়, তা হলে, সেই চল্লিশের দশকে, শুধু কংগ্রেসের হাতে তুলে দেবে কেন? অপর শরিক, মুসলিম লীগ কি দোষ করলো?

আপাত দৃষ্টিতে, ইংরেজের এই ব্যবস্থাকে তো খুব দোষারোপ করা যায় না। মিঃ জিন্না ততদিনে একথা প্রমাণ করে ছেড়েছেন যে তাঁর মুসলিম লীগই ভারতের সাড়ে আট কোটি মুসলমানের মুখপাত্র। কংগ্রেস যতই আদর্শবাদের কথা বলুক মুসলমানের কাছে সে একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান মাত্র—ইংরেজ চলে যাবার পর ভারতীয় মুসলমানরা হিন্দুদের অধীনে নির্যাতিত হতে চায় না। হিন্দু-মুসলমান কোনোদিন মিলেমিশে থাকেনি, কোনোদিন থাকতে পারবে না।

সিপাহী যুদ্ধের সময় কিংবা নীল আন্দোলনের সময়, এমন কি ওয়াহাবী আন্দোলনের সময়ও যে হিন্দু-মুসলমান কিছুটা মিলেমিশে লড়তে পেরেছিল—সুভাষ বোসের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ ছিল পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক—সে সব অস্বীকার করা হলো। মিলনের জন্য নতুন কোনো প্রচেষ্টার বদলে বিচ্ছেদের কারণগুলোকেই বাড়িয়ে দেখা হতে লাগলো। এই কথাই বলা হতে লাগলো যে, দীর্ঘকালের বাদশাহী শাসনের পর ইংরেজ আমলে হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ হবার সুযোগ পেয়েছে—ব্রিটিশ-রাজ চলে গেলে তারা আবার 'হিন্দু-রাজ' স্থাপনের জন্য উঠে পড়ে লাগবে। তার উদ্যোগও যে একেবারে ছিল না তাও তো নয়। এককালের বিপ্লবী বীর সাভারকর দীর্ঘদিন বাদে আন্দামান থেকে ফিরে এসে হঠাৎ হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য জিগির তুলে দিয়েছেন। খাকসার বাহিনীর দেখাদেখি হিন্দুরাও তৈরী করেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, প্রদেশে প্রদেশে গজিয়ে উঠেছে হিন্দু মহাসভা।

কিন্তু হিন্দুত্ব যে আসলে কি তা কেউ জানে না। মুসলীম লীগের দাবির মধ্যে গোঁড়ামি থাকলেও বক্তব্য অতি পরিষ্কার। একজন মুসলমান জানে, সে কেন মুসলমান। একজন হিন্দু তো তা জানে না। হিন্দুদের বারো জাতের তের হাঁড়ি। সারা ভারতবর্ষে যাদের হিন্দু নামে কোনো একটি বিশেষ জাত নেই, হিন্দুত্ব নামে সর্বজনগ্রাহ্য একটি ধর্ম নেই। এ দেশের রাজনীতিতে ভারতীয় মুসলমানদের কতখানি অভিযোগ নেই—সেটা জিন্না সাহেব বাস্তবায় স্বচ্ছ ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। সেই তুলনায় হিন্দুরা অনেক ভণ্ড। তারা অনেকে উদারতার ভান দেখায়, কিন্তু সামাজিক

জীবনে ঘোর সাম্প্রদায়িক। অনেকে নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পায়—কিন্তু ভেতরটা সংস্কারাচ্ছন্ন। একজন খাঁটি ধর্মপ্রাণ হিন্দু এবং একজন খাঁটি ধর্মপ্রাণ মুসলমান কখনই পরস্পরের আত্মীয় হবে না—কারণ ধর্মের সঙ্গে অনেক অনুশাসন ও সংস্কার জড়িত. শুধু ব্যক্তিগত চর্যা হিসেবে গ্রহণ করতে পেরেছে অতি বিরল সংখ্যক মানুষ। একমাত্র ধর্মহীন ছাড়া কেউ প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। দুই ধর্ম মেলাবার উদ্ভট অবাস্তব চেষ্টা করেছিলেন গান্ধীজী, কিন্তু নাস্তিকতা প্রচারের সাহস, তিনি দূরে থাকুন, ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টিও কখনো দেখাতে পারেনি।

ক্যাবিনেট মিশন এসে ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা নির্দিষ্ট তারিখ ঠিক করতে চাইছে। জওহরলাল নেহরু চাইছেন, কেন্দ্রে একটি জাতীয় সরকার গঠন করে সেই সরকারের হাতেই ক্ষমতা দেওয়া হোক। জিন্না সাহেব পাকিস্তানের দাবি নিয়ে বেঁকে বসে আছেন। মুসলমানদের হাতে আলাদাভাবে ক্ষমতা না দিলে মুসলমানরা তা কিছুতেই মানবে না। এবং মুসলিম লীগ কোনোদিনই কংগ্রেসের মতন অহিংসায় বিশ্বাসের কথা বলেনি। বাংলায় তখন লীগ মিনিস্ট্রি।

এই অবস্থায় লীগ থেকে ১৬ই আগস্ট ডাইরেকট অ্যাকশানের দিন হিসেবে হরতাল ঘোষণা করে দেওয়া হলো। হরতালের দিন দাংগাহাংগামার আশঙ্কা করে একদল সাংবাদিক জিন্না সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, এই 'ডাইরেক্ট অ্যাকশান' কার বিরুদ্ধে?

জিন্না সাহেব চট করে উত্তর দিলেন, কেন, ইংরেজের বিরুদ্ধে!

কিন্তু ইংরেজ তো পাকিস্তান দাবি অস্বীকার করছে না। হ্যাঁও বলেনি, নাও বলেনি। হিন্দুরাই তো পাকিস্তান বিরোধিতা করছে।

রণক্লান্ত বিধ্বস্ত ইংরেজ জানে ভারত এবার ছাড়তেই হবে। যুদ্ধের পরেই বিলেতে চার্চিলকে সরিয়ে দিয়ে লেবার পার্টি সরকার গঠন করে এ সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করছে। লালকেল্লার আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার উপলক্ষে সারা দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। বোম্বাইতে নৌ-বিদ্রোহ হয়ে গেল। সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর মধ্যেও বিদ্রোহের পরিচয় পেয়েই ইংরেজ বুঝতে পেরে গেছে—দেশী সৈন্যদের সহায়তায় আর বেশীদিন এ দেশ শাসন করার চিন্তা বিপজ্জনক। আর বেশীদিন দেরি করলে, যদি ১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধের মতন আর একটা কিছু হঠাৎ ঘটে যায়—তা হলে ভারতে বসবাসকারী ইংরেজদের জীবন ও ধনসম্পদ রক্ষা করা যাবে না। সুতরাং ভালোয় ভালোয় সরে পড়াই ভালো। হিন্দু-মুসলমান এবং শিখদের পারস্পরিক মনোভাব এখন যে-অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে—তাতে নিজেদের মধ্যে একটা মারামারি বাধলে ওরা এখন আর সাহেবদের দিকে মনোযোগ দেবার সময় পাবে না। তাতে সাহেবদের লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই।

তা ছাড়া এ দেশের শাসন ক্ষমতা ছাড়লেও ব্যবসায়ের অধিকার ছাড়বে কেন ইংরেজ? চেম্বার অফ কমার্স বহুদিন থেকেই রাজনীতিতে অংশ নিয়ে আসছে। এ দেশ যদি টুকরো টুকরো হয় পরস্পরের সংগে শত্রুতা করেই সব শক্তি নষ্ট করে, তা হলে ভারতীয় উপমহাদেশে অর্থনীতির বনিয়াদ কখনো শক্ত হবে না, ব্রিটিশের বাণিজ্য-স্বার্থ বহুকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে।

১৬ই আগস্টের প্রায় এক মাস আগেই কলকাতার একটি ইংরেজি সংবাদপত্র একটি গোপন খবর ফাঁস করে দিয়েছিল। পাটকল ও ব্যবসায়ী বাড়ির সাহেব মালিকরা নিজেদের মধ্যে একটা গোপন সার্কুলার পাঠিয়েছে—শীগগিরই দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধবে—তোমরা তৈরী থাকো—নিজেদের সম্পত্তি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করো।

১৪ই আগস্ট হিন্দুরা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক মিটিং করে প্রস্তাব পাস করলো, এই হরতালের বিরোধিতা না করলে পাকিস্তানের দাবিই মেনে নেওয়া হচ্ছে। এই হরতাল সফল হতে দেওয়া চলে না।

এর পাল্টা মিছিল বেরুলো কলকাতায়। শ্লোগান উঠলো, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। লেগে গেল লড়াই।

বহুদিন ভারতের মাটিতে যুদ্ধ হয়নি। তবু, জাতিগতভাবে মানুষ নামক এই প্রাণীটির মধ্যে সব সময়ই রক্তের তৃষ্ণা থাকে। তাই কখনো ধর্মের নামে, কখনো ভাষার নামে, কখনো নতুন রাজনৈতিক স্বপ্নে, কখনো আরও অনেক ছোটখাটো স্বার্থে পরস্পরকে হত্যা করে এই রক্তের তৃষ্ণা মিটিয়ে নেয়। বহুযুগ ধরে শোষিত ও নিষ্পেশিত হয়ে কাপুরুষতার বীজ ঢুকে গেছে এ জাতির মজ্জায়। রণক্ষেত্রে প্রবল শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার সাহস হারিয়ে ফেলেছে—এখন শুধু লাঠিসোটা বা ছুরিছোরা নিয়ে পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে বেছে বেছে নিরীহ মানুষকে মারার ব্যাপারে ওস্তাদ। যারা এই উন্মত্ততার বাইরে থাকতে চায়, এই সব দুঃসময়ে তারাই সবচেয়ে অসহায়।

সকালবেলা উঠেই সূর্যর একমাত্র কাজ দীপ্তির বাড়িতে যাওয়া। গত তিন চার দিন ধরে সে প্রত্যেক দিন সকালে ও বিকেলবেলায় দীপ্তির বাড়িতে গিয়ে বসে থাকে। এক একদিন দুপুরেও ফেরে না।

আজও সকালবেলা চা খেয়েই সূর্য বেরিয়ে পড়লো। রাস্তায় এসে দেখলো, যানবাহন কিছু নেই, চার দিকে একটা থমথমে ভাব। দীপ্তির বাড়ি হাজরার মোড়ের কাছে—এতদূরের রাস্তা, কিন্তু সূর্য একটুও দ্বিধা করলো না। সে হেঁটেই যাবে।

বিবেকানন্দ রোড থেকে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে এসে দেখলো মোড়ের মাথায় বহু লোক জমায়েত হয়েছে, কয়েকজন উত্তেজিতভাবে বলাবলি করছে কি সব। একদল আবার উৎসুক হয়ে মানিকতলার দিকে চেয়ে কি যেন দেখার চেষ্টা করছে। সেদিক থেকে গোলমাল ভেসে আসছে।

সূর্য হাঁটতে লাগলো হ্যারিসন রোডের দিকে। অন্য কোনো দিকে তার মন নেই। হঠাৎ উল্টো দিক থেকে একদল লোক হই হই করে ছুটে এলো। সঙ্গে সঙ্গে গোটা রাস্তায় হুড়োহুড়ি পড়ে গেল একেবারে। রাস্তার বাকি লোকেরা কি হচ্ছে না হচ্ছে, না দেখেই ছুটতে শুরু করছে। সূর্যর গায়ে ধাক্কা দিয়ে ছুটে গেল কয়েকজন। সূর্য দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালো। রাস্তা একটু ফাঁকা হতেই আবার হাঁটতে লাগলো সামনের দিকে।

একটা গলি থেকে দশ বারোজন লোক লাঠি ও লোহার রড হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে উঠল, জয় হিন্দ!

ইদানীং এই আওয়াজটা নতুন শোনা যাচ্ছে। জার্মানিতে সুভাষ বোস এটা প্রথম চালু করেছিলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের সময় সাধারণ লোকের মধ্যেও চালু হয়ে যায়।

লোকগুলো সূর্যর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করতে লাগলো, সূর্য ভ্রূক্ষেপ করলো না। সুকিয়া স্ট্রীটের কাছাকাছি এসে দেখলো, ইষ্টক বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। এ পাশে একদল লোক, ওদিকের একটা দলের দিকে যত না ইঁট, তার চেয়ে বেশী গালাগালি ছুঁড়ে দিচ্ছে।

সূর্য বিরক্তি বোধ করলো। এ যেন শুধু তার যাওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করা। এর মধ্য দিয়ে সে হেঁটে যাবে কি করে। ভুরু কুঁচকে তাকে একটু দাঁড়াতেই হলো।

কিন্তু দু চার মিনিটের মধ্যেই ঘটনা গুরুত্বের আকার ধারণ করলো। একটা বন্ধ দোকানের পাল্লায় কয়েকজন লোক দমাদ্দম লাথি মারছিল—এক সময় পাল্লাটা ভেঙে পড়তেই শুরু হয়ে গেল লুটপাট। সেটা একটা ঘুড়ির দোকান। মুহূর্তে ঘুড়ির কাগজ আর কাঁপ আর সুতো ভর্তি লাটাই গড়াতে লাগলো রাস্তায়। উন্মত্ত মানুষের চিৎকারে আর কান পাতা যায় না। চিৎকার আরও তুমুল হলো, যখন সেই দোকানের ভেতর থেকে তাড়া খাওয়া ইঁদুরের মতন দুজন লোক বেরিয়ে এলো। রোগা চেহারার দুজন প্রায়বৃদ্ধ মুসলমান। বিকট উল্লাসে লোকজন তাদের ঘিরে ধরে কিল চড় মারতে লাগলো, তারপর দু' একটা লাঠিও উঠতে দেখা গেল।

এতক্ষণে সূর্যর মনের মধ্যে একটা নাড়া জাগলো। সে তার পাশের লোকটির দিকে তাকিয়ে বললো, এ কি হচ্ছে কি? ওদের মারছে কেন?

পাশের লোকটি বললো, রাজাবাজারে পাঁচখানা লাস পড়ে গেছে, জানেন? ওরাই তো শুরু করেছে।

—কিন্তু এই লোক দুটো কি দোষ করেছে?

—ও শালাদের বিশ্বাস নেই।

সহজাত প্রবৃত্তিতেই সূর্য লোক দুটিকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু ঐ পর্যন্ত পৌঁছতে পারলো না। মেছোবাজারের দিক থেকে একদল লোক সেই সময় তেড়ে এলো, ফটাফট সোডার বোতল ফাটছে, সামনের কয়েকজনের হাতে তলোয়ার। এদিকে জনতা আবার পেছন দিকে ছুটলো—সূর্যকেও সেই স্রোতে ভেসে যেতে হলো। খানিকটা দৌড়ে এসে সূর্য দাঁড়ালো একটা গলির মুখে।

ওপাশের দলটা খুব বেশীদূর এলো না। খানিকটা এসেই থমকে দাঁড়িয়ে আবার পেছন ফিরে আরও জোরে ছুটলো। অকস্মাৎ দেখা গেল, রাস্তা ফাঁকা—অনেক দূর থেকে একটা পুলিসের গাড়ি আসছে। লুণ্ঠিত দোকানের সামনে সেই লোক দুটির মধ্যে একজন নিস্পন্দ, আর একজন তখনও ছটফট করছে—একজন দীর্ঘদেহী কালোয়ার অতি দুঃসাহসে দৌড়ে গিয়ে মুমূর্ষু লোকটার পিঠে এক ঘা রডের বাড়ি মেরে সট করে ঢুকে গেল একটা বাড়ির মধ্যে।

সূর্যর পাশেই একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন বাজারের শূন্য থলি হাতে নিয়ে। তিনি সূর্যর কানের পাশে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, এই যে ভাই, শোনো, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন? ওদিকে চলে যাও!

সূর্য অবাক হয়ে বললো, কেন?

লোকটি প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, যা বলছি তাই শোনো। ভালোর জন্যই বলছি। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি করছো?

—কেন বলুন তো?

—তুমি কি কলেজের ছাত্র? যাও, যাও, তোমাদের মহল্লার দিকে যাও। কে কখন ধরে বসবে!

লোকটি সূর্যর আপাদমস্তক দেখে মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে চেয়ে রইলেন। সূর্যর জাগতিক জ্ঞান কম, তাই সে লোকটির ধরনের কথার অর্থ তক্ষুনি বুঝতে পারেনি। কিন্তু আত্মরক্ষার টানে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন তার চেতনা হলো, তার মুখে দাড়ি আছে, তাকে এরা মুসলমান বলে সন্দেহ করছে।

এটা হাস্যকর ব্যাপার। কিন্তু সূর্য হাসতে পারলো না। কোথাও কারুর মুখেই এখন হাসি নেই। মাত্র একশো কি দেড়শো গজ দূরে দুটি লোক এই মাত্র প্রাণ

হয়েছিলো। টাটকা রক্ত ছড়িয়ে পড়ে আছে রাস্তায়।

পুলিসের গাড়িটা যাওয়ার জন্য রাস্তাটা এখন ফাঁকা। সূর্য আর দেরি করলো না, সে দৌড়ে গেল সামনের দিকে। সদ্যমৃত লোক দুটির পাশ দিয়েই যেতে হলো তাকে, তাকাবার সময় পেল না। অনেক দিন পর সে এত জোরে ছুটছে! পেছন থেকে একটা আওয়াজ জেগে উঠলো, কয়েকটা ইঁটের টুকরো উড়ে এলো তার দিকে।

একদমে কলেজ স্ট্রীট বাজার পার হয়ে এসে সূর্য থামলো। হাঁপাতে লাগলো একটা দেয়ালে ভর দিয়ে। তার শরীরের সমস্ত লোমকূপ, হাত পায়ের নোখ পর্যন্ত সতর্ক হয়ে গেছে। কিন্তু শরীরে কোনো উত্তেজনা নেই, মুখের মধ্যে একটা তেতো স্বাদ। এর চেয়ে ঢের বেশী জনতার মধ্যে মিশে থেকে সে লড়াই করেছে—কিন্তু এ কি রকম জঘন্য লড়াই! এখন তাকে শুধু নিজের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে যেতে হবে।

এখানে রাস্তাটা ফাঁকাই ছিল, এক মিনিটের মধ্যেই কলাবাগানের দিক থেকে পিলপিল করে ছুটে এলো আবার একটি দল। এদের অনেকেরই হাতে গাঁইতি আর শাবল। অবিলম্বেই এরা বাছা বাছা কয়েকটি দোকানের দরজা ভাঙার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল। সূর্যকে নিয়ে ওরা বিশেষ মাথা ঘামালো না। ওদেরও অনেকের গালে দাড়ি আছে।

এদিক ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে সূর্য নিজের কর্তব্য স্থির করতে চাইলো। এইভাবে সে কতদূর যাবে? মেডিকেল কলেজের সামনেটা ফাঁকা হলেও দূরে বউবাজারের দিকটায় গোলমাল চলছে মনে হয়। এখনও সে তার নিজের বাড়ি থেকে খুব বেশী দূরে আসেনি। অন্য রাস্তার গলিঘুঁজি দিয়ে বাড়ি পৌঁছানো যায়।

কিন্তু সূর্য বাড়ি ফেরার চিন্তাটা এক কথায় উড়িয়ে দিল। সে দীপ্তির কাছে যাবেই।

হ্যারিসন রোড ধরে সূর্য এগুলো সেন্ট্রাল এভিনিউ-র দিকে। এখানে ঠিক মারামারি শুরু হয়নি এখনো—একদল লোক আর একদলকে তাড়া করছে, তারা গরু ভেড়ার মতন ছুটছে। এক জায়গায় একটা বড় বাড়ি লক্ষ্য করে প্রচুর ইঁট ছোঁড়া হচ্ছে। সূর্য এ সব পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে এগোতে লাগলো। তাকে এখনো অনেক দূরে যেতে হবে।

সেন্ট্রাল এভিনিউতে আবার অন্য দৃশ্য। কোথাও একটাও লোক নেই। পথঘাট একেবারে শুনশান। গাড়িবারান্দার তলায় ভিখিরিরাও উধাও। একটুও শব্দ নেই—কয়েকটা ছেঁড়া খবরের কাগজ উড়ছে। কলকাতার রাজপথে দিনের আলোয় এই দৃশ্য কি রকম অপ্রাকৃত মনে হয়। রাস্তার দু পাশে বাড়িগুলোরই সব জানলা বন্ধ।

সূর্য একটু থমকে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকায়। বিপদের কোনো চিহ্ন চোখে পড়ে না। খুব সতর্কভাবে সে এগোতে থাকে ধর্মতলার দিকে। প্রত্যেক গলির মোড়ে এসে থমকে দাঁড়ায়—সেখান থেকে হঠাৎ কেউ বেরিয়ে আসে কি না দেখবার জন্য। কেউ নেই।

বৌবাজার স্ট্রীটের কাছে এসে সূর্যর বুকের মধ্যে ধক্‌ করে ওঠে। এতক্ষণে সে বুঝতে পারে এই রাস্তা কেন এত নির্জন। সকালেই এখানে একটা খণ্ড প্রলয় হয়ে গেছে। কয়েকটি দোকানে আগুন লাগার চিহ্ন। রাস্তার মাঝখানে পড়ে আছে পাঁচটা মৃতদেহ। চারজন পুরুষ ও একটা দশ-এগারো বছরের ছেলে। এ ওর গায়ের ওপর এলোমেলো। কনুই থেকে কাটা একটা হাত আলাদাভাবে একটু দূরে রাস্তায় ওল্টানো। আঙুলগুলো যেন মাটি খিমচে ধরতে চেয়েছিল। এই হাতটা ঐ লোকগুলোর মধ্যে

ঠিক ভার—এটা জানা যেন সূর্যর বিশেষ দরকার। সে দু-এক পা এগিয়ে গেল ওদিকে। নিহতদের চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে কার হাত নেই খুঁজতে লাগলো। মনে হয় যেন এখনো ওদের নিশ্বাস সেখানকার বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

সেই দৃশ্য সূর্যর চোখ চুম্বকের মতন টেনে ধরে। কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারে না। সে এখন কি করবে? আবার কয়েক পা পিছিয়ে এসে সে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে দ্রুত দেখে নেয়। তারপর চোখ বোজে।

চোখ বুজতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে দীপ্তির মুখ। আঃ, কি ঠান্ডা লাগে তখন। সারা পৃথিবীতে সূর্যর আর কোথাও যাবার জায়গা নেই, দীপ্তির কাছেই যেতে হবে তাকে।

দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে সূর্য এগোতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ আর কোনো বাধা পায় না। ধর্মতলার দিকে কয়েকটা গাড়ির যাতায়াত ও মানুষজনও চোখে পড়ে। আর কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে হনহন করে হাঁটতে আরম্ভ করলো সূর্য। মাঝে মাঝে চোখ বুজে দীপ্তির মুখখানা দেখে নেয়।

পার্ক স্ট্রীট ছাড়াবার পর সূর্য আবার বিপদে পড়ে গেল। কয়েকখানা লরি ভর্তি মানুষজন হৈ হৈ করে যাচ্ছিল। সূর্য সেগুলোকে দেখে আবার দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। একখানা লরি তার সামনেই এসে থামলো। কয়েকজন ছোকরা নেমে এসে উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করলো, উধার কা কেয়া হাল হ্যায়?

সূর্য কি আর উত্তর দেবে? কোনোক্রমে আড়ষ্টভাবে বললো, উধার আগ লাগ গিয়া!

একটি ছোকরা গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, নারায়ে তকদির!

লরি থেকে প্রত্যুত্তর গর্জে উঠলো।

এ লোকগুলি অবাঙালী। এরা সূর্যকে নিজেদের দলেরু ভেবেছে। সূর্যকে লরিতে উঠতে বললো ওদের সঙ্গে।

সূর্য বললো, সে বিশেষ দরকারে সামনের দিকে যাবে। ওরা তাতে কর্ণপাত করলো না। একজন জানালো যে, ওদিকে ভবানীপুরের দিকে শিখ সর্দারজীরা দারুণ কান্ড করছে। হাঁ, ওরাও ওদিকে যাবে বটে, আরও দলে ভারি হয়ে বিকেলে যাবে—সর্দারজীদের পাড়াকে পাড়া জ্বালিয়ে দেবে।

সূর্যকে লরিতে তোলার জন্য টানাটানি করতে লাগলো। প্রতিবাদ জানিয়ে লাভ নেই। এতগুলো উন্মত্ত মানুষের কাছে কোনো সুস্থ কথারই কোনো মূল্য নেই।

লরিতে চেপে সূর্য যে-দিক থেকে এসেছিল, সেই দিকেই ফিরে যেতে হলো। উর্দু-ঘেঁষা হিন্দি ভাষায় সূর্য বাল্যকালে রপ্ত ছিল—এখন তাতেই কাজ চালিয়ে যেতে লাগলো এদের সঙ্গে।

লরিটা সেন্ট্রাল এভিনিউতে গেল না। তার বদলে বাঁক নিল ওয়েলিংটনের দিকে। ওয়েলিংটনের কাছে একেবারে তুলকালাম কাণ্ড চলছে। ক্রিক রো, তালতলার দিকে প্রচন্ড গোলমাল আর আগুনের শিখা।

লরি থেকে সূর্য ঝুপ করে নেমে পড়লো, অন্যদের সঙ্গে। হঠাৎ তার মনে পড়লো, এইদিকেই শ্রীলেখার বাবার বাড়ি। বাদলরাও এইখানে থাকে। ওদের কোনো বিপদ হয় নি তো? কিন্তু ওদিকে এগুনো এখন অসম্ভব।

ঐ বাড়ি থেকেই শ্রীলেখার বিয়ের সময় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সূর্য শ্রীলেখার মুখখানা মনে করতে গিয়েও ঠিক মনে করতে পারছে না। দীপ্তির মুখের সঙ্গে শ্রীলেখার মুখটা মিশে যাচ্ছে। শ্রীলেখা আর দীপ্তি যেন একই।

গোলমালের সুযোগ নিয়ে সূর্য ঐ দলটা থেকে আবার পালালো। এখানেও দোকানপাট লুঠ শুরু হয়েছে। লুঠের সময় মারামারিটা একটু কম হয়। ওয়েলেসলির দিকে সর্বত্র হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়েছে—তবে এদিকে অনেকটা একতরফা চলছে—সূর্যকে কেউ বাধা দিল না।

এলিয়ট রোড পেরিয়ে সাহেবপাড়া আবার একেবারে শান্ত। পার্ক স্ট্রীটে বেশ কিছু দোকানপাট খোলা। সূর্য একটু জিরোবার জন্য একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে এক কাপ কফি নিয়ে বসে রইলো। অবস্থা যে অত্যন্ত সাংঘাতিক দিকে যাচ্ছে সেটা বুঝতে তার দেরি হলো না। শহরে এত ব্যাপক আকারে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে, সেই তুলনায় পুলিস প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথম সে একটিমাত্র পুলিসের গাড়ি দেখেছিল। শিখদের এলাকা কি সে পার হতে পারবে? তার গালে দাড়ি থাকলেও সে লুঙ্গি কিংবা পা-জামা পরে নেই, আজ পরেছে ট্রাউজার্স। শিখদেরও তো দাড়ি থাকে। তার মাথায় পাগড়ি নেই।

আর না এগিয়ে সে যদি এই সাহেব-পাড়ায় আশ্রয় নিয়ে থাকে—তা হলে তার আর কোনো বিপদ নেই। এখানে বসে থাকলে একটা না একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবেই। তবু সূর্য কফির দাম টেবিলে রেখেই উঠে পড়লো। তার জীবনের কি মূল্য আছে? তাকে দীপ্তির কাছে যেতেই হবে। দীপ্তি একা থাকে—তার কোনো বিপদ হয়েছে কিনা সেটা দেখতে হবে না? পার্ক স্ট্রীট ধরে খানিকটা নিশ্চিন্তভাবে হাঁটতে হাঁটতে সূর্য ভাবলো, এর পর পার্ক সার্কাস, হাজরার ওদিকে শিখদের পাড়া। দু' জায়গাতেই তার বিপদের সম্ভাবনা আছে। কেউ তাকে চেপে ধরলে—সে নিজেকে হিন্দু বা মুসলমান—এর কোনোটাই প্রমাণ করতে পারবে কি? কি ভাবে প্রমাণ দেবে? একটু আগেই ওয়েলেসলিতে সে দেখে এসেছে একটা ধুতি পরা বুড়ো মতন লোকের মাথায় একদল লোক লাঠির বাড়ি মারছে, আর লোকটা হাউ হাউ করে বলছে, আল্লার কিরে, মুই মোছলমান, মুই মোছলমান—। আর লোকগুলো বলছে, খোল শালা, কাপড় খোল—।

হিন্দুদের হাতে ধরা পড়লেই বা সে কি বলবে? তার মুখে দাড়ি—কোনো হিন্দুই কি দাড়ি রাখে না? সে নিজেকে বামুনও বলতে পারবে না, তার পৈতে নেই—অথচ তার সত্যিকারের পদবী শুনলে—

সূর্য মনে মনে বললো, দীপ্তি, তুমি কি বুঝতে পারবে, আমি তোমার কাছেই যেতে চাইছি। আমি যদি মরেও যাই, তবু আমি সব সময় তোমার কাছেই যেতে চাই।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোলমাল বেড়ে যাচ্ছে। সূর্যর মত একা আর কেউ রাস্তা দিয়ে হাঁটছে না, সব জায়গাতেই আলাদা আলাদা দল। সূর্যর ভেতরকার প্রচণ্ড রাগী এবং জেদি ব্যক্তিত্বটি ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে—কিন্তু এই ধর্মোন্মাদ রক্তপাগল জনতার কাছে প্রকৃতপক্ষে সে অসহায়।

বেকবাগানের কাছে এসে সে বুঝতে পারলো, সে অত্যন্ত ভুল জায়গায় পৌঁছেছে। এদিককার রাস্তাঘাটও সে ভালোভাবে চেনে না। এদিকে প্রচণ্ড গোলমাল। হুড়োহুড়ি, মারামারি ও স্ট্যাবিং চলছে, কয়েকখানা বাড়ি জ্বলছে দাউ দাউ আগুনে।

তার মুখে দাড়ি থাকার জন্য সে হিন্দুদের দল এড়িয়ে চলে গেল মুসলমানদের দলে। নিজের দাড়ি তো সে উপড়ে ছিঁড়ে ফেলতে পারে না। স্রোতের শ্যাওলার মতন তার নিজের বিরুদ্ধে তাকে দৌড়োদৌড়ি করতে হলো ওদের সঙ্গে। তার চোখের

সামনেই একটা ঘড়ির দোকান লুঠ হলো। যে যা পারলো নিয়ে পালালো, কয়েকজন বিনা কারণে আছড়ে আছড়ে ভাঙতে লাগলো বড় বড় দেয়াল ঘড়িগুলো। বিভিন্ন ঘড়িতে অসময় লেখা আছে।

একটা লোকের পিঠে ছুরি মারা হয়েছে, সে শিরদাঁড়া ভাঙা কুকুরের মতন রাস্তায় পড়ে ছটফট করছে। তার আততায়ী পাশে দাঁড়িয়ে রক্তাক্ত ছুরি তুলে হাসছে হা-হা করে আর চেঁচিয়ে বলছে, তিন শালাকো খতম কিয়া।

কি অদ্ভুত উল্লাস! অথচ যে আক্রান্ত এবং যে আততায়ী—এরা কেউ কারুর আসলে শত্রু নয়—দুজনেই নিপীড়িত সমাজের মানুষ। যে লোকটি আততায়ী, তারও নিশ্চয়ই বাড়িতে মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী পুত্র কন্যা—কেউ না কেউ আছে—সে জানে, তার অভাবে তার সংসারের কি অবস্থা হবে। কিন্তু অন্যের ক্ষেত্রে সেটা মনে পড়ে না।

সূর্য ঐ মুমূর্ষু লোকটাকে কোনো সাহায্য করতে পারছে না। একবার তার ইচ্ছে হলো, ঐ আততায়ীর ঘাড় ধরে ঐ মুমূর্ষু লোকটার সেবা করতে বাধ্য করায়।

কিন্তু তা সম্ভব নয়। মনের মধ্যে রাগ চেপে সে ছটফট করে। এই উন্মাদ জনতাকে সে কিছু বোঝাতেও পারবে না—এদের সঙ্গে লড়াই করতেও পারবে না—এই চিন্তা তাকে অসম্ভব কষ্ট দেয়। তার রাজনৈতিক জীবনে সে এই রকম অবস্থার কথা একবারও চিন্তা করে নি। এখন শুধু তার নিজের প্রাণ বাঁচাতে হবে।

বেপরোয়াভাবে সে আবার ছুটতে শুরু করে এবং অচিরেই রাস্তা গুলিয়ে ফেলে। হাজরা মোড় কোনদিকে? সে কি উল্টো দিকে চলে যাচ্ছে? কলকাতার শিরা-উপশিরার মতন গলিঘুঁজি দিয়ে সে অনবরত তার লক্ষ্যে পৌঁছোতে চাইছে।

আর একটা হিন্দু দলের হাতে পড়ে নাজেহাল হয়ে সূর্য কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে গেল, কিন্তু তার আগেই তার পিঠে কয়েক ঘা লাঠি পড়েছে। খালি পা ছেঁড়া জামা নিয়ে সূর্য যখন হাজরার মোড়ে পৌঁছোলো, তখন দেখলো দীপ্তিদের বাড়ির ঠিক নীচেই কড় রকমের হাঙ্গামা চলছে। ও বাড়ির দরজা জানলা সব বন্ধ। বাড়ির সামনের ফুটপাতে দারুন ভিড়, লাঠি সোঁটা নিয়ে একদল লোক রণহুংকার দিচ্ছে। এই দুর্ভেদ্য দেয়াল পেরিয়ে যাওয়া শক্ত—কিন্তু সূর্যকে যেতেই হবে।

যদি ও বাড়ির দরজা খোলা থাকতো—তা হলে সূর্য গন্ডারের মতন একরোখা-ভাবে দৌড়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করতে পারতো। কিন্তু বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তো সে ডাকাডাকি করার সময় পাবে না। কাছাকাছি একটা পাঞ্জাবী-দের দোকান তখনও খোলা—সে দোকানের পাশটিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

কিছুক্ষণ বাদে আর একজন লোক দীপ্তিদের বাড়ির সামনে এসে কড়া নাড়তে লাগলো। ভিড়টা তখন একটু দূরে সরে গেছে। দরজা কিন্তু তবু খুলছে না—লোকটি খুব জোরে জোরে দরজায় ধাক্কাচ্ছে আর কার যেন নাম ধরে ডাকছে। সূর্য এই সুযোগে দ্রুত লোকটির পাশে এসে দাঁড়ালো।

সূর্যর বিপর্যস্ত চেহারা, মুখে দাড়ি দেখে ভয় পেয়ে গেল লোকটি। সূর্যর দিকে চোখ তুলে তাকাতেই সে তাড়াতাড়ি বললো, আমি দীপ্তিদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

—কে আপনি?

—আমার নাম সূর্য। দীপ্তিদি আমাকে চেনেন।

—দীপ্তিদি কে?

সূর্য এবার পাল্টা প্রশ্ন করলো: আপনি কে? আপনি কি এ বাড়িতে থাকেন?

এই সময় দরজা খুলে গেল। যে দরজা খুললো, সে অন্য লোকটিকে চেনে, সূর্যকে চেনে না। সূর্যকে সে ঢুকতে দিতে চায় না। সূর্য জোর করে ভেতরে ঢুকে বললো, আমাকে দীপ্তিদির কাছে নিয়ে চলুন—

দোতলায় দীপ্তির ফ্ল্যাটের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ।

সূর্য নিরাশ হয়ে গেল। এত দূর এসেও দীপ্তির দেখা পাওয়া গেল না: অথচ কালও সে এসেছে, দীপ্তির তো যাবার কথা ছিল না কোথাও!

এদিকে অন্য লোক দুটি তাকে নানা প্রশ্ন করে জ্বালাতন করছে। এই রকম সময় কেউ অযথা বিরক্ত করলে বড় মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললো, চলুন, তিনতলায়! সুকল্যাণদা আমাকে চিনতে পারবেন।

সুকল্যাণের ফ্ল্যাটে এসে দেখা গেল বাড়ির সব লোক সেখানেই জড়ো হয়েছে, দীপ্তিও সেখানে রয়েছে। সূর্যর সঙ্গে আসা অন্য লোকটি সুকল্যাণের পিশতুতো ভাই।

সুকল্যাণ সূর্যকে দেখে চিনতে পারলেও সূর্যই সুকল্যাণকে দেখে প্রথমটায় চিনতে পারে নি। কালকেও সে দেখে গিয়েছিল সুকল্যাণের একমুখ দাঁড়ি গোঁফ, মাথার চুল বাবরি করা। আজ তার সব নির্মূল। দাড়ি গোঁফ বাদ দেবার জন্য হঠাৎ তাকে আজ খুব রোগা দেখাচ্ছে।

সুকল্যাণ চমকে বললেন, আরে, এ কি? তুমি আজ এলে কি করে?

সূর্য দীপ্তিকে এক পলক দেখে নিয়ে শান্তভাবে বললো, আমার কোনো অসুবিধে হয়নি। রাস্তা মোটামুটি ফাঁকাই ছিল।

—অত দূর থেকে কিসে এলে? ট্রাম বাস তো কিছুই চলছে না।

—হেঁটেই চলে এলাম।

—সেই বিবেকানন্দ রোড থেকে? এ যে অসম্ভব কথা? শুনলাম যে কলাবাগানে দারুন খুনোখুনি শুরু হয়ে গেছে?

—না। ওসব গুজব।

দীপ্তি কাছে এগিয়ে এসে বললেন, তোমার এরকম চেহারা হলো কি করে?

ঘরের সবাই সূর্যকে ঘিরে ধরলো। সুকল্যাণের ভাই উত্তেজিতভাবে বললো, উত্তর কলকাতায় ডজন ডজন লাশ পড়ে গেছে, আর আপনি বলছেন কিনা সব গুজব?

সূর্য বললো, আমি তো কিছু দেখিনি।

এই সময় বাইরে আবার একটু গোলমাল হতেই সবাই ছুটে গেল জানলার কাছে। সামান্য খড়খড়ি ফাঁক করে উদ্‌গ্রীব হয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো।

কি যে হচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে একদল লোক শুধুই চিৎকার করছে। অনেকেরই হাতে অস্ত্র-শস্ত্র।

সুকল্যাণদা সূর্যকে বললেন, তুমি শুধু শুধু এত দূর এলে। এখন ফিরবে কি করে?

সূর্য উত্তর দিল না।

সুকল্যাণদা আবার বললেন, ভীষণ ডেঞ্জারাস অবস্থা। এ পাড়া অ্যাটাক হবে। সকাল থেকেই শোনা যাচ্ছে, চেতলার দিক থেকে এসে এ পাড়া অ্যাটাক করবে। খানিকটা আগে বাজারের মধ্যে আমরা ওদের দুজনকে মেরেছি।

—আমরা মানে?

—এ পাড়ায় আমাদের আর ওদের স্ট্রেংথ সমান সমান। ওরা অ্যাটাক করলে

আমরাও ফাইট দেবো।

—তার আগে, পুলিসে খবর দিলে হয় না?

—সেই আশায় আছো বুঝি এখনো? পুলিস তো সব ওদের হাতে। বড়তলা থানার ওসি খোন্দকার কি করেছে শুনেছো?

—না।

—তোমাদের তো পাড়ায়। সে পুলিসকে হুকুম দিয়েছে...

সুকল্যাণ সূর্যদের পার্টির সমর্থক ছিলেন। নিজে জেল না খাটলেও অনেকভাবে সাহায্য করেছেন পার্টিকে। সূর্য লক্ষ্য করলো, রাতারাতি সেই সুকল্যাণদা পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছেন। আজকের দিনের ঘটনার নিন্দেও তিনি করতে পারছেন না—তিনি চাইছেন পুরোপুরি লড়াই। কিছুতেই পাকিস্তান কায়েম হতে দেওয়া চলবে না।

সুকল্যাণ সূর্যকে একবার নিয়ে গেলেন ছাদে। বাড়ির বাচ্চারা সেখানে একরাশ ইঁটের টুকরো জড়ো করেছে। কয়েকখানা বড় বড় ইঁট দিয়ে নেমন্তন্ন বাড়ির উনুনের মতন একটা বড় উনুন তৈরি করা হয়েছে। একটা ড্রামে জল ফোটানো হচ্ছে সেখানে। এ বাড়ি আক্রান্ত হলে ওপর থেকে গরম জল ঢেলে আর ইঁটপাটকেল ছুঁড়ে প্রতি-আক্রমণ চালানো হবে।

সুকল্যাণ বললেন, তুমি যখন এসে পড়েছো, আজ আর ফিরতে তো পারছো না। তোমার মতন এক লম্বা-চওড়া জোয়ান পেয়ে আমাদের ভালোই হলো। দাড়িটা এক ফাঁকে কামিয়ে নিও, বুঝলে?

সূর্য কি উত্তর দেবে ভেবে পাচ্ছে না। সকাল থেকেই তার মুখটা তেতো হয়ে আছে। সত্যিই যদি এ বাড়ি আক্রমণ করে, সে তা হলে কি করবে?

ছাদ থেকে তাকিয়ে দেখলো, সব দিকের রাস্তাতেই মাঝে মাঝে লোকজন জড়ো হয়ে আছে। চেতলার দিকে দেখা যাচ্ছে ধোঁয়ার কুণ্ডলি। চিৎকার শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। সিভিল ওয়ারের দৃশ্য বোধ হয় এই রকমই হয়।

অসম্ভব রোদের তেজের জন্য ছাদে বেশীক্ষণ দাঁড়ানো যায় না। আবার নেমে এলো নীচে সুকল্যাণের ঘরে। সেখানে এত বেশী মানুষজন যে সূর্য দীপ্তির সঙ্গে নিরালায় কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে না। একতলার লোকেরা এত ভয় পেয়েছে যে, কিছুতেই তারা একতলায় থাকবে না—এখানেই এসে পাকাপাকি আশ্রয় নিয়েছে। দীপ্তিও কি দোতালায় যেতে ভয় পাচ্ছে?

তিন চারবার রাস্তায় শোনা গেল চ্যাঁচামেচি, এই আসছে, এই আসছে! অনেক বাড়িতে বেজে উঠলো শাঁখ। কিন্তু কিছুই হলো না। সুকল্যাণদা সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত দিলেন যে দিনের বেলায় না এলেও ওরা রাত্তিরে ঠিকই আসবে। আজ সারারাত সবাইকে পালা করে জেগে থাকতে হবে।

দুপুর দেড়টা বাজে। খিদে পেলেও এতক্ষণ কেউ খাবার দাবারের কথা উচ্চারণ করে নি, এবার সেই প্রসঙ্গ এলো।

সূর্য দীপ্তিকে বললো, আমি আজ আপনার সঙ্গে খাবো।

দীপ্তি বললেন, এসো—।

নিজের ঘরে ফিরে এসে দীপ্তি সূর্যকে বললেন, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? এরকম ভাবে কেউ আসে?

সূর্য বিমর্ষ মুখ করে বললো, আমার আসা উচিত হয় নি?

—উচিত অনুচিতের কথা হচ্ছে না। আজ এত সব সাংঘাতিক কাণ্ড হচ্ছে—এর মধ্যে কেউ রাস্তায় বেরোয়? আজকের দিনটা অন্তত তুমি বাড়িতে থাকতে পারতে না।

—কি করতাম বাড়িতে থেকে।

—আচ্ছা মুশকিল তো তোমাকে নিয়ে। তুমি কি করবে, তা কি আমি তোমায় বলে দিতে পারি?

——আমার শুধু এখানেই আসতে ইচ্ছে করে।

—যা শুরু হয়েছে, সহজে থামবে বলে মনে হয় না। তুমি বাড়ি ফিরবে কি করে?

—আমি ফিরবো না। আমি আজ রাত্তিরে এখানেই থাকবো।

—তুমি কি এতই ছেলেমানুষ—তুমি জানো না, তা হয় না?

—আমি আপনার ঘরের বাইরে, সিঁড়িতে শুয়ে থাকবো!

—সূর্য, তুমি কি বলো তো? তোমাকে নিয়ে আমি কি যে করি! তোমার বাবা তোমার জন্য চিন্তা করবেন না? তোমার বাবাকে বলে এসেছো?

—না।

দীপ্তি এবার অত্যন্ত রাগত মুখ করে বললেন, এসব আমার মোটেই ভালো লাগে না। তুমি এবার মার খাবে আমার কাছে।

সূর্যর মুখে হাসি ফুটেছে। বললো, মারুন।

দীপ্তি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সূর্যর দিকে। সূর্য চোখ থেকে চোখ সরালো না।

দীপ্তি ধমকের সুরে বললেন, যাও চান করে এসো। আমি ভাত চাপিয়ে দিচ্ছি।

সূর্য হাত বাড়িয়ে বললো, তোয়ালে?

—বাথরুমেই আছে। তোমার জামাটা ছিঁড়লো কি করে? প্যাণ্টেও তো কাদা লেগেছে!

দীপ্তি এগিয়ে এসে সূর্যর পিঠে হাত রেখে বললেন, পিঠের এখানটা কেটে গেছে। কি হয়েছিল কি?

সূর্য তার পিঠ থেকে দীপ্তির হাতটা সরিয়ে এনে বললো, রাস্তায় একটা দল আমাকে ধরেছিল। তারা আমাকে বিষ্ণুর দশ অবতারের নাম জিজ্ঞেস করলো। আমি বলতে পারিনি। তারপর তারা আমাকে আমাদের সাত পুরুষের নাম বলতে বললো। কিন্তু আমি আমার ঠাকুর্দার নামই জানি না।

—ঠাকুর্দার নাম জানো না?

—সত্যিই জানি না। আমার বাবার কাছে তাঁর বাবার কথা কক্ষনো শুনি নি। একটা দুটো নাম বানিয়ে বলছিলাম—ওরা শেষ পর্যন্ত আমাকে অবিশ্বাস করে নি—কিন্তু একজন খারাপ হিন্দু হিসেবে কয়েক ঘা মেরেছে। তারপর আমি পড়লাম আর একটা দলের হাতে। সেখানে আমি বললাম, আমি মুসলমান। তারা কি একটা বয়েৎ বলে তার পরের লাইনটা বলতে বললো। সেটা আমি কখনো শুনিই নি—তবু আমার মুখে দাড়ি আছে বলে কয়েক ঘা দিয়ে—

—এটা কি ছেলেখেলা? কি শুরু হয়েছে চারদিকে, তুমি খবর রাখো না?

—মানুষ মানুষকে মারছে। আমি যদি মরেও যেতাম, তবু আপনি কি বুঝতে পারতেন আমি আপনার কাছেই আসছিলাম?

—তুমি আমার জন্য এরকম কেন করছো বলো তো?

—আপনি আমাকে নিয়ে নিন। আমার সব কিছু আপনি নিয়ে নিন।

—সূর্য, তুমি বুঝতে পারো না আমার জীবন অন্যরকম।

—এত শক্ত ব্যাপার আমি বুঝবো কি করে?

দীপ্তিকে অত্যন্ত অস্থির দেখাচ্ছে আজ। একবার ধপ করে খাটের ওপর বসে পড়েই সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠে পড়ে বললেন, যাও চান করে এসো। তোমার কি খিদেও পায় না?

স্নান করে বেরিয়ে এসে সার্টটা খুলে রেখে, শুধু প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে সূর্য খেতে বসলো। খাবারগুলো সব টেবিলে এনে রেখে দীপ্তিও বসে পড়লেন। চিন্তিত-ভাবে বললেন, আমার দাদা বৌদিরা থাকে ব্যারাকপুরে, ওদের কি হয়েছে জানি না। ওরাও নিশ্চয়ই আমার জন্য চিন্তা করছে। দাদার কোয়ার্টারে টেলিফোন আছে—স্কুলে যেতে পারলে টেলিফোনে খোঁজ নিতে পারতাম।

সূর্য বললো, আমি টেলিফোন করে আসবো?

—না, তোমাকে এখন বেরুতে হবে না।

—শহরের মানুষ কি সারাক্ষণ বাড়িতে বসে থাকবে? এরকম ভাবে চলবে না, একটা কিছু মিটমাট হয়ে যাবেই।

—সুকল্যাণদা বলছেন, এই দাঙ্গা সহজে থামবে না। বিরাট এক চক্রান্ত আছে নাকি এর পেছনে। তুমি মীনা পেশোয়ারির নাম শুনেছো? সে নাকি অনেক অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে তৈরী আছে। টালার ট্যাঙ্কে নাকি বিষ মেশানো হবে? কি হয়ে গেল বলো তো দেশটা?

সূর্য উত্তর না দিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগলো। দেশ সম্পর্কে তার আর কোনো চিন্তা নেই।

দীপ্তি বললো, আমিই বা এভাবে এখানে কতদিন থাকতে পারবো? আমাকে দাদার কাছেই চলে যেতে হবে।

—এই সময়ে আমাদের কি কিছু করার আছে?

—তোমরা একটা কিছু করতে পারো। আমি মেয়ে হয়ে আর কি করবো?

—আমি আপনাকে আপনার দাদার কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করতে পারি।

—কি করে?

—রাস্তায় পুলিসের গাড়ি দেখলেই থামাবো।

—তোমাকে নিয়েই আমার আরও বেশী ভয়। তোমার তো কোনো কান্ডজ্ঞান নেই।

—দীপ্তিদি, এ পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল, আমি সহজে মরবো না। কিন্তু আজই প্রথম আমি দেখলাম, কত সহজে মানুষ মানুষকে মারতে পারে। আমাকেও ওরা মেরে ফেলতে পারতো। এই সব কথা ভাবতে এখন আমার ঘেন্না হচ্ছে।

খাওয়া শেষ হবার পর দীপ্তি বললেন, চলো, সুকল্যাণদার ফ্ল্যাটে যাই।

—ওখানে গিয়ে কি হবে?

—ওখানে অনেকে রয়েছে।

—অনেকের সঙ্গে আমার ভালো লাগে না। সুকল্যাণদাকেও আমার ভালো লাগে না।

—এরকম ভাবে তুমি ক'দিন থাকবে? পৃথিবীতে সবার সঙ্গে মিলেমিশেই তোমাকে কাটাতে হবে।

বাইরে আবার একটা গোলমাল হতেই দীপ্তি ধড়ফড় করে চলে গেলেন জানলার কাছে।

সূর্য চেয়ারেই বসে রইলো। দীপ্তি খুব সামান্য জানলা ফাঁক করে বাইরের দিকে তাকিয়ে শিহরণের শব্দ করে বললেন, ইস, কাকে যেন ধরে এনেছে!

সূর্য বললো, ওখান থেকে চলে আসুন!

দীপ্তি বললেন, উঃ মা! এরা কি মানুষ।

—শিগগির ওখান থেকে চলে আসুন।

—একজন বুড়ো লোক। দেখবে এসো, একজন বুড়ো লোক।

—আমি কিছু দেখতে চাই না।

—কান ধরে ওঠ-বোস করাচ্ছে।

—আপনি এদিকে চলে আসুন—আমাদের ওসব কিছু দেখবার দরকার নেই।

—আমাদের বাড়ির একেবারে সামনেই। কেউ কি এসব বন্ধ করতে পারে না?

সূর্য উঠে দীপ্তির বাহু ধরে কড়া গলায় বললো, আপনাকে বলছি না জানলা থেকে সরে আসতে?

দীপ্তি বললেন, সূর্য আমার গা কাঁপছে। আমার বুকের মধ্যে কী রকম যেন হচ্ছে। আমার জানলার কাছেই এরকম হই হল্লা হলে আমি বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারবো না।

সূর্য দীপ্তির দু' কাঁধে হাত রেখে একেবারে তাঁর মুখের সামনে মুখ এনে চোখের পলক না ফেলে বললো, আমরা ওসব কিছু দেখবো না, আমরা ওসব কিছু শুনবো না। পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

—কি রকম চ্যাঁচাচ্ছে, আমার কানে তালা লেগে যাচ্ছে!

—কান বন্ধ করে থাকুন।

—চলো, ওপরে চলো। সেখানে অনেকে আছে।

—আর কোথাও কেউ নেই। পৃথিবীতে আর কারও জন্য আমার মাথাব্যথা নেই।

সূর্য দীপ্তির গালে ঠোঁট বোলাতে লাগলো। তারপর এমন অসম্ভব জোরে দীপ্তির ঠোঁটে নিজের ঠোঁট চেপে ধরলো যে প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। দীপ্তি ছটফট করে কিছু একটা বলতে চাইছেন, সূর্য কিছুতেই তাঁকে কথা বলতে দেবে না। সূর্যর হাত ছাড়িয়ে যাবার জন্য দীপ্তি এদিক ওদিক সরে যাচ্ছেন কিন্তু সূর্য তাঁর সর্বাঙ্গ ধরে আছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর সূর্য যখন তাঁকে ছাড়লো তখন দীপ্তির মুখখানা টকটকে লাল। উত্তেজিত ভাবে বললেন, তুমি আমাকে এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?

—আপনি আমাকে নিয়ে নিন্।

—আমি জানি না, আমি কিছু জানি না।

সূর্য দীপ্তির হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলো পাশের ঘরে। সেখানে তার সামনে হাঁটুগেড়ে বসে বললো, এই জঘন্য কুৎসিত পৃথিবীর আর কিছু আমি দেখতে চাই না। হয়তো আজকেই আমরা দুজনে মারা যেতে পারি—

এবার খুব নরম ভাবে দীপ্তির নাভির কাছে সূর্য তার মুখটা চেপে ধরলো। দীপ্তির শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। সূর্যর মাথার চুল তিনি শক্ত করে চেপে ধরলেন। সূর্য দীপ্তির কোমর ধরে তাঁকে টেনে নামিয়ে আনলো মাটিতে। প্রচণ্ড চুম্বনে দীপ্তির বুকে লাল দাগ করে দিল। তারপর একটা করে খুলতে লাগলো বোতাম।

দীপ্তি বড় বড় নিশ্বাস ফেলে কাতর ভাবে বলতে লাগলেন, সূর্য আমি নিজের কাছে হেরে যাচ্ছি! বাইরে মানুষ মরছে, আর আমি—আমি আর পারছি না, চিন্তাও

করতে পারছি না।

সূর্য এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো দীপ্তির সুন্দর শরীরের দিকে। আস্তে আস্তে বললো, পৃথিবীতে এখন আর কেউ নেই। হয়তো আমরাও কাল আর বেঁচে থাকবো না।

দীপ্তি চোখ বুজে বললেন, আমাকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরো। আরও জোরে, আরও জোরে—।

সেদিন সন্ধেবেলা একদল লোক এসে বললো, এ-বাড়িতে একজন মুসলমানকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তাকে বার করে দিতে হবে।

সুকল্যাণ সূর্যকে টানতে টানতে নিয়ে এলেন তিনতলায়। আয়নার সামনে বসিয়ে দিয়ে বললেন, দাড়ি কামাও! এক্ষুনি।

॥ ৫৮ ॥

আমাদের বাড়ির বাজার করার ভার ছিল বাবার ওপর। বাবা এ কাজে খুব দক্ষ নন, কলকাতার বাজারের ধুরন্ধর দোকানদারদের সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। কিন্তু যৌথ পরিবারের নিষ্কর্মা ব্যক্তিটির ওপরেই সচরাচর বাজার করার ভার পড়ে। জ্যাঠামশাই ইদানীং অত্যন্ত ব্যস্ত, এক মুহূর্ত তাঁর সময় নেই। পয়সা রোজগারের উম্মাদনায় তাঁর আর কোনদিকে তাকাবার অবসর নেই। যুদ্ধের বাজারে লোহ ও খাদ্য ব্যবসায়ীদের মতনই কাগজ ব্যবসায়ীদেরও প্রচন্ড লাভ হয়েছে। কালো বাজার একেবারে ফলাও হয়ে উঠেছে।

বাবা ইদানীং প্রতিদিন সকালের বাজার করার ভারটা আমার ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছিলেন। সরাসরি দেননি, কিছুদিন অ্যাপ্রেন্টিসগিরি করতে হয়েছে আমাকে। আমার তখন যা বয়েস, তাতে বাবার সঙ্গে সঙ্গে বাজারের থলি নিয়ে ঘোরার ব্যাপারটা মোটেই পছন্দসই বা সম্মানজনক নয়। কোনো বন্ধু বা সহপাঠী দেখে ফেললে অত্যন্ত লজ্জায় পড়ি। আমার বন্ধু বিকু বা ভাস্কর কোনদিন বাজারে ঢোকেই নি। হঠাৎ কোনোদিন একলা বাজার করতে গেলে অবশ্য মন্দ লাগে না আমার, দু'চার আনা পয়সা পকেট খরচ জুটে যায়।

সেদিন সকালবেলা বাবার সঙ্গে আমাকে বাজারে যেতে হয়েছে। বাজারের কাছটায় খুব ভিড় ছিল, আমরা তা লক্ষ্য করিনি। গেট দিয়ে ঢুকতে যেতেই দেখি একজন বুড়ো লোক মাথায় ডিমের ঝাঁকা নিয়ে দৌড়ে আসছে আর বাঁশ হাতে নিয়ে কিছু লোক তাকে তাড়া করেছে। অচিরেই বুড়ো লোকটি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, প্রায় দুশো আড়াই শো ডিম ছিটকে পড়লো মাটিতে। অসম্ভব ঠ্যালাঠেলি, হুড়োহুড়ির পরই লেগে গেল বড় রকমের মারামারি।

সেই গোলমালের মধ্যে আমি বাবাকে হারিয়ে ফেললাম। প্রথমে চমকে গিয়ে আমাকেও দৌড়ে রাস্তার ওপারে চলে যেতে হয়েছিল—কিন্তু বাবাকে খুঁজে না পেয়ে আমার বুক ধড়ফড় করতে লাগলো, বিকট চিৎকার, লাঠি ও লোহার রডের প্রবল তান্ডবে ধপাধপ মানুষের দেহ পড়ে যাচ্ছে রাস্তায়। এখন আর এখানে এক মুহূর্ত দাঁড়ানো চলে না—কিন্তু বাবাকে ফেলে আমি চলে যাবো কি করে! বাবাও নিশ্চয়ই আমাকে না পেয়ে দারুণ চিন্তা করছেন।

স্নেহ নিম্নগামী। পিতার পুত্রস্নেহের তুলনায় পুত্রের পিতৃভক্তি সচরাচর অনেক

কম হয়। সেদিন মারামারি ব্যাপক হয়ে ওঠায় আমি বেশ কয়েকবার অনেক দূর পর্যন্ত পালিয়ে গেছি—আবার বাবাকে খোঁজবার জন্য ফিরে এসেছি একটু একটু করে। কিন্তু বাবা সেই লুঠেরা ও হত্যাকারীদের মধ্যেই পাগলের মতন খুঁজছেন আমাকে। আহত বা নিহত মুখগুলোর কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছেন—একবারও নিজের জীবনের কথা ভাবেন নি।

শেষ পর্যন্ত অক্ষত শরীরেই আমরা দুজনকে ফিরে পেলাম। আমাকে দেখে বাবা ছুটে এসে আমার কাঁধ আঁকড়ে ধরলেন। তাঁর চোখ দুটি বিস্ফারিত, সারা দেহটা থরথর করে কাঁপছে। কিছু একটা বলতে গিয়ে শুধু উচ্চারণ করলেন, বাদল, বাদল। আর একটু দেরী হলেই বোধহয় উনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতেন। বাবা যেন তাঁর মৃত পুত্রকে ফিরে পেলেন।

বাবার তুলনায় আমি অনেক কম বিচলিত ছিলাম। অরাজকতা ও মৃত্যুর মাঝখান দিয়ে আমি ছুটলাম বাবার হাত ধরে। কোনোরকমে এসে পৌঁছে গেলাম তালতলার বাড়িতে। এ পাড়াতেও ততক্ষণে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে, বাড়ির সবাই দারুণ উৎকণ্ঠিত হয়েছিল।

একটা ছোটখাটো আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, বাড়ি ফিরে এই জঘন্য ও নিষ্ঠুর সব হত্যাকান্ডের জন্য বিমর্ষ হয়ে পড়ার বদলে আমি আমাদের পালিয়ে আসার কাহিনী যতদূর রোমাঞ্চকরভাবে বলা যায়, সেই ব্যাপারেই বেশী উৎসাহিত বোধ করছিলুম। দু'একটা ছোট খাটো মিথ্যে বলতেও দ্বিধা করিনি। একটা লোক আমাদের ছুরি নিয়ে তাড়া করেছিল—আমিই যে আমার বৃদ্ধ বাবাকে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে এনেছি, আমার কথার মধ্যে এই সুর ছিল এবং মা-জ্যাঠাইমারা বিশ্বাসও করেছিলেন।

এদিকে মৌলালি, ওদিকে ওয়েলিংটনে দাঙ্গা এতদূর ছড়িয়ে পড়লো যে আমরা মাঝখানে আটকা পড়ে গেলাম। দিনের পর দিন এই রকম চললো। সব সময় একটা আতঙ্ক। বাড়ির ছাদে উঠলেই আমরা দূরে ধোঁয়া দেখতে পাই—কোথাও না কোথাও বাড়ি পুড়ছে। সারা রাত ধরে চিৎকার ভেসে আসে।

আমাদের বাড়ির ঠিক সামনেই বড় রাস্তার ওপর এগারোটা মড়া পড়েছিল। এখানে ওখানে খুন করে খুনীরা ঐ মৃতদেহ বড় রাস্তায় এনে জড়ো করে রেখেছে। কদাচিৎ পুলিসের গাড়ি পাশ দিয়ে চলে যায়—মড়াগুলোর দিকে তাকায় না পর্যন্ত। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষেও রাস্তায় লোক মরেছিল, কিন্তু মৃতদেহ বেশীক্ষণ ফেলে রাখা হয়নি। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় মৃতদেহের প্রতিও কোনো সম্মান নেই।

বাবা-জ্যাঠামশাই প্রথম দিকে আশা করেছিলেন, এখনো তো দেশে ব্রিটিশ রাজত্ব আছে। ব্রিটিশ সরকার এরকম বর্বর ব্যাপার কিছুতেই চলতে দেবে না। লীগ মিনিস্ট্রি না হয় পুলিস বিভাগকে হাত করে রেখেছে, কিন্তু সরকারের হাতে তো মিলিটারি আছে। ফোর্ট উইলিয়াম থেকে মিলিটারি বেরিয়ে একদিনেই সব ঠাণ্ডা করে দেবে। আমার জ্যাঠামশাইয়ের মিলিটারির ওপর অগাধ ভক্তি ছিল।

কিন্তু, দিনের পর দিন কেটে গেল, মিলিটারি আর বেরুলো না।

এদিকে মড়াগুলো পড়ে রইলো রাস্তায়। বিন্দুমাত্র ইচ্ছে না থাকলেও বারবার চোখ চলে যায় ওদের দিকে। দু'তিন দিন পরই আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, রোগা রোগা লোকগুলো মৃত্যুর পর বেশ মোটাসোটা হয়ে গেছে। পঞ্চমদিনে তাদের কারুর কারুর হাত উঁচু হয়ে উঠতে লাগলো। যেন শুয়ে শুয়ে কোনো একটা নাচের ভঙ্গিমায় তাদের হাতের মোটা মোটা আঙুলে বিভিন্ন মুদ্রা। একজনের উঁচু করা হাত দেখলে

মনে হয়, সে আকাশের ঈশ্বরের দিকে কাঁচকলা দেখাচ্ছে।

মৃত্যু আমি কম দেখিনি। তাই লঘু, হাস্যময় জীবনের প্রতি আমার এত অদ্ভুত লোভ।

মানুষ-পচা বিকট গন্ধ জানলা দরজা বন্ধ করেও আটকানো যায় না। সব সময় আমাদের বাড়িতে ধূপ-ধুনো জ্বলে। আমরা রাত্তিরে ঘুমোতে পারি না। প্রায়ই দুঃস্বপ্ন দেখি রাস্তার মড়াগুলো এবার উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের বাড়ির দিকে হেঁটে হেঁটে আসছে। আমার দিদি সান্ত্বনার পাগলামির লক্ষণটা আবার বেড়ে গেল।

একদিন পুলিস এসে পাড়ায় মাইকে ঘোষণা করতে লাগলো যে যদি কেউ এ পাড়া থেকে পছন্দমতন নিরাপদ পাড়ায় চলে যেতে চায়—তাহলে পুলিসের পাহারায় তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

এই ঘোষণা শুনেই বাবা-জ্যাঠামশাইয়ের হৃৎকম্প শুরু হলো। তার মানেই নিশ্চয়ই এ পাড়ায় শিগগির একটা বড় রকমের হামলা হবে। এবার আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো।

সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলো না। ইতিমধ্যেই একদিন টেলিফোনে বড়বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল—ঐ পাড়া তখন শান্ত। আমরা কোনো রকমে বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে পুলিসের গাড়ি চেপে চলে এলাম বড়বাবুর বাড়িতে।

এখানে এসে শুনলাম, সূর্যদা মাঝখানে একদিন খবর পাঠিয়েছিল। এখন সে রিলিফের কাজে ব্যস্ত। বাড়িতে আসার সময় পায় না।

জিন্নার পাকিস্তানের স্বপ্ন সফল হবার আগেই কলকাতার ছোট ছোট পাকিস্তান আর হিন্দুস্থান হয়ে গেল। ভাগ হয়ে গেল বিভিন্ন পাড়া—এক পাড়ার মানুষ অন্য পাড়ায় যায় না—দৈবাৎ গিয়ে পড়লে প্রাণ নিয়ে ফেরে না। মাঝখানে দু' একদিনের জন্য থামে। আবার নতুন উদ্যমে শুরু হয়। নেতারা পরস্পরবিরোধী চ্যাঁচামেচি করে।

কলকাতার পর শুরু হলো নোয়াখালিতে। হত্যা, নারী ধর্ষণ আর অগ্নিকাণ্ডের খবর ছাড়া আর কোনো খবর নেই। বাংলাদেশের বদলা নেওয়া হলো বিহার, আমেদাবাদ ও বোম্বাইতে।

অক্টোবরের শেষ দিকে গান্ধীজী এলেন কলকাতায়। গান্ধীজী তখন মুসলমানদের চোখে পাকিস্তানের এক নম্বর শত্রু। আবার তাঁর জিন্নাতোষণ নীতির জন্য বহু সংখ্যক হিন্দুও তাঁর ওপর খড়্গহস্ত। এই অবস্থাতেও তাঁর শান্তির আহ্বানে কিছুটা ফল হলো। গান্ধীজী এসে আশ্রয় নিলেন বেলেঘাটায় মুসলমান পাড়ায়। বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দিও এসে আশ্রয় নিলেন তাঁর কাছে। স্কুল কলেজের ছাত্ররা আবার শান্তি মিছিল বার করে কলকাতা পরিভ্রমণ করলো, তারপর এলো বেলেঘাটায়। সেই মিছিলে আমিও ছিলাম।

গান্ধীজী ও সোহরাওয়ার্দি আমাদের কাছে যুগ্মভাবে আহ্বান জানালেন হিন্দু মুসলমান সমমর্মিতার জন্য। কিন্তু আমরা দেখলাম অতিশয় রূপবান, সুপুরুষ সোহরাওয়ার্দির মুখমণ্ডল অত্যন্ত বিমর্ষ। ঘটনার বল্গাহীন গতি দেখে তিনি যেন হতাশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। গান্ধীজীর মুখে দারুণ ক্লান্তির ছাপ। তিনি নির্বাক।

একজন গান্ধীজীর বাণী চাইতে গেলে, তিনি বাংলাতেই লিখে দিলেন 'আমার জীবনই আমার বাণী'। কিন্তু কাঁপা কাঁপা অক্ষর, তাতে যেন আত্মবিশ্বাসের ছাপ

নেই।

একটা ছেলে হঠাৎ সামনের দিকে ছুটে গিয়ে হাউ-মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো, আমার বোন...আমার বোনকে ওরা...আমারই চোখের সামনে...মেরে ফেলেছে ...আপনি এর কি উত্তর দেবেন?

ছেলেটিকে জোর কোরে থামানো হলো। তখন এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় নয়। সমমর্মিতার সময়। আমাদের জল তেষ্টা পেয়েছিল বলে বেলেঘাটার বস্তির বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে আমরা জল চাইলাম। কেউ কেউ বললেন, আমাদের একটু পানি দিন। মুসলমানের হাত থেকে জল নিয়ে সেদিন আমাদের মনে হয়েছিল, আমরা যেন অমৃত পান করছি!

কলকাতা থেকে গান্ধীজী গেলেন নোয়াখালিতে। গান্ধীজীকে একজন প্রশ্ন করে-ছিল, আপনি বোম্বাই, আমেদাবাদ বা ছাপরায় না গিয়ে নোয়াখালিতে কেন যাচ্ছেন? সেখানে হিন্দুরা উৎপীড়িত হয়েছে বলেই কি যাচ্ছেন?

মর্মাহত হয়ে গান্ধীজী বললেন, নোয়াখালির মতন ঘটনা যদি অন্য কোনো জায়গায় ঘটে এবং তিনি অনুভব করেন যে সেখানে না গিয়ে তাঁর উপায় নেই, তবে তিনি নিশ্চয়ই সেখানে যাবেন। নোয়াখালির ধর্ষিতা নারীদের আকুল ক্রন্দনই তাঁকে সেখানে যাবার জন্য অস্থির করে তুলেছে।

নোয়াখালিতে গান্ধীজী নিহত হবেন এইরকম একটা আশঙ্কায় বিদেশী সাংবা-দিকরা খুব তৎপর হয়ে উঠেছিল। সেরকম কিছু ঘটলো না, কিন্তু সাময়িক বিরতি ছাড়া গভীর কোনো প্রতিক্রিয়াও দেখা গেল না। ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তখন গান্ধীজীরও নেই।

কলকাতায় গান্ধীজীর অনুপ্রেরণায় আর একটি শান্তি মিছিল বেরিয়ে ওয়েলিংটনের কাছে আক্রান্ত হলো। কয়েকজন শান্তিবাদীর ছিন্ন ভিন্ন দেহ লুটিয়ে পড়লো রাস্তায়।

তার কয়েকদিনের মধ্যেই আমার জ্যাঠামশাই খুন হলেন।

বড়বাবুর বাড়িতে আমরা নিরুপদ্রবেই ছিলাম। কিন্তু জ্যাঠামশাইয়ের মন টিকছিল না সেখানে। ইতিমধ্যেই বড়বাবুর সঙ্গে মনোমালিন্য হয়ে যাওয়ায় আবার তাঁর বাড়িতেই আশ্রয়প্রার্থী হয়ে ফিরে আসতে জ্যাঠামশাইয়ের আত্মসম্মানে লেগেছিল। তাছাড়া, তাঁর তালতলার বাড়িতে বহু টাকার সম্পত্তি পড়ে ছিল। সেসব ছেড়ে থাকার জন্য তিনি এক মুহূর্তও শান্তি পাচ্ছিলেন না। একবার কলকাতার অবস্থা একটু ঠান্ডা হতেই তিনি স্ত্রী ও মেয়েদের এ বাড়িতে রেখে জোর করে ফিরে গেলেন তালতলায়। বাড়ির মেয়েদের কান্নাকাটি এবং বড়বাবুর অনুরোধ কিছুই শুনলেন না। বাড়ির চাকর ও দারোয়ানদের ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস।

দু-দিন বাদেই তালতলার বাড়ি আক্রান্ত হলো, আগুন লাগানো হলো বাড়িতে। জ্যাঠামশাই পালাতে পারলেন না—অত্যন্ত নৃশংসভাবে নিহত হলেন। এই ঘটনার দেড় ঘণ্টা পরেই সেই রাস্তায় জ্যাঠামশাইয়ের বহু আকাঙ্ক্ষিত মিলিটারির গাড়ির সার এসে পড়লো, কিন্তু জ্যাঠামশাইকে বাঁচাতে পারলো না। জ্যাঠামশাইয়ের বিষয়সম্পত্তি ও প্রাণ একই সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেল।

আমরা জ্যাঠামশাইয়ের মৃতদেহ দেখিনি। খবর পাওয়া গিয়েছিল বারো ঘণ্টা পরে। এবং ঘটনাটি সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করতে সময় লেগেছিল আরও একদিন। তারপর মর্গ থেকে একটা কাটা ছেঁড়া মৃতদেহ নিয়ে এসে দাহ করা হয় নিমতলায়।

খবর পেয়ে এই দুর্দিনের মধ্যেও বড়দি চলে এলো খড়্গপুর থেকে। সূর্যদাও ফিরে

এলো বাড়িতে। জ্যাঠাইমাকে সামলাতেই সবাই হিমসিম খেয়ে গেল। জ্যাঠাইমা কিছুতেই তাঁর স্বামীর মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস করবেন না—তিনি সবার হাত ছাড়িয়ে ছুটে যেতে চান তালতলার বাড়িতে। সেখানে সেবাড়ির একটা কংকাল দাঁড়িয়ে আছে শুধু, জানলা-দরজাগুলোরও অস্তিত্ব নেই। শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে যাবার পর জামাইবাবু জ্যাঠাইমাকে খড়্গপুরে নিয়ে যেতে চাইলেন।

দেশব্যাপী অবিশ্রান্ত মারামারি কাটাকাটির ফলে দেশের সাধারণ লোক এক সময় তিতিবিরক্ত হয়ে বলতে লাগলো, এর থেকে দেশ ভাগ হয়েও স্বাধীনতা আসে তো আসুক। তখনও বাংলা বা পাঞ্জাব ব্যবচ্ছেদের কথা বিশেষ কেউ চিন্তা করেনি। যেদিন সত্যিই সে কথা ঘোষিত হলো, সেদিন বাংলার চেয়েও বেশী আগুন জ্বলে উঠলো পাঞ্জাবে। রণদুর্মদ শিখ এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ পাঞ্জাবীরা রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে লাগলো।

সাতচল্লিশের মাঝামাঝি এসে কলকাতা অনেকটা শান্ত হয়ে পড়লো। মানুষজন আবার পথে ঘাটে বেরোয়, দোকানপাট করে। যে-সব পাড়ার লোকেরা এক-কাট্টা হয়ে অন্য পাড়ার আক্রমণ রুখেছে এখন তারাই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লাগায় রেশনের দোকানের লাইনে। রক্তাক্ত দিনের বিভীষিকাও জনতার মন থেকে কত তাড়াতাড়ি মুছে যায়! মাঝে মাঝেই এখানে সেখানে খালি বাড়ি পড়ে আছে—অধিবাসীরা পলাতক। বিষ্ণুদের পাড়াতেও দাঙ্গা বেশ প্রবলভাবেই হয়েছিল, অনেক দিন ওদের খোঁজ নিতে পারিনি। একদিন গিয়ে শুনলাম, ওরা আসামে বেড়াতে চলে গেছে। সিঁড়ির মুখটাতেই রেণুর সঙ্গে দেখা।

রেণুকে দেখলেই আজকাল আমি একটু একটু ভয় পাই। রেণু আজকাল কথায় কথায় আমার বড্ড সমালোচনা করে। জামার বোতাম ছেঁড়া থাকলে কিংবা জুতোর পালিশ না থাকলে রেণু ভুরু কুঁচকে তাকায়। রেণু একটা কথা বোঝে না। এক-দল ছেলে সব সময় ফিটফাট সেজেগুজে থাকতে ভালোবাসে, আর একদল ছেলে সেজেগুজে ফিটফাট থাকার সরঞ্জামই পায় না। তাদের জুতোয় তাপ্পি থাকে, ছেঁড়া প্যান্ট সেলাই করে পরেও সেটা আবার লুকোতে চায়—ধোপাবাড়িতে পাঠাবার সামর্থ্য নেই বলেই বাড়িতে সোডা দিয়ে কাচা জামা পরে। এ ছাড়াও আর একদল ছেলে থাকে, যারা পরিচ্ছন্ন শার্টেও বোতাম দেয় না, দামী প্যান্টের সঙ্গে ছেঁড়া শার্ট পরে ইচ্ছে করে এবং চুলে তেল দেওয়া পছন্দ করে না। আমি ওই তৃতীয় দলের ছেলেদের অন্তর্গত হয়ে গেছি কারণ এরাই ছাত্র সমাজের শিরোমণি।

রেণুকে জিজ্ঞেস করলাম, তোদের বাড়িটা এত ফাঁকা-ফাঁকা কেন রে?

সাদা রঙের স্কার্ট পরে রেণু দাঁড়িয়ে আছে, আমার দিকে স্থির দৃষ্টি, মুখে একটাও কথা নেই। কপালে এসে পড়েছে কয়েক গোছা চুল, বাঁ হাতে একটা বই, ডান হাত রেলিং-এ। তকতকে ঝকঝকে শরীর, নির্মল চোখ, সদ্যফোটা ফুলের মতন শরীরে নতুন যৌবনের আভা! রেণুকে মনে হলো একটা ছবির মতন—এবং সত্যিই যেন এরকম একটি ছবি আমি আগে কোথাও দেখেছি!

রেণু আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না, সিঁড়ির ঠিক সেই ধাপেই দাঁড়িয়ে রইলো। রেণুকে দেখে আমি সব ভুলে গেলাম। এই কমাসের ভয়াবহ সময়, রক্ত-পাত, দুঃস্বপ্ন, শোক। সেই ছবিটির মধ্যে যে সৌন্দর্য ছিল, তা আর সব কিছুকেই আচ্ছন্ন করে দেয়।

আমি দু-এক পা এগিয়ে এসে বললাম, এই রেণু?

ছবিটা ভেঙে গেল। রেণু সিঁড়ি থেকে নেমে এসে বললো, ছোড়দা, ন'দা কেউ বাড়ি নেই।

—তুই কোথায় যাচ্ছিস?

—আমি মল্লিকাদের বাড়ি থেকে বই আনতে যাচ্ছি। ওদের বাড়িতে অনেক বই।

—এক্ষুনি আসবি তো? আমি এখানে বসি?

রেণু গম্ভীর মুখ করে বললো, তুই আজকাল সিগারেট খাস?

আমি দারুণ অবাক হয়ে বললাম, না তো!

—একজন তোকে দেখেছে!

—মোটেই না। কক্ষনো হতে পারে না।

—একজন যে আমাকে বললো!

—কে?

—সে যেই হোক না—

—তবু আমি নাম শুনতে চাই।

—মল্লিকার দাদা।

সেই মুহূর্তে মল্লিকার দাদাকে হাতের কাছে পেলে আমি দেয়ালে মাথা ঠুকে দিতাম। খুন করে ফেলাও বিচিত্র ছিল না।

কঠিন মুখ করে বললাম, হি ইজ এ লায়ার! ড্যাম লায়ার!

—তুই সত্যি খাসনি?

—না।

—আমার হাত ছুঁয়ে বল।

রেণুর হাত ছুঁয়ে আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, এই তো বলছি!

আসলে আমি মিথ্যে কথা বললাম। রেণুকে ভয় পাই বলেই ওর সামনে মিথ্যে কথা বলতে আমার আটকালো না। রেণু এখনও স্কুলের মেয়ে—ও কি করে বুঝবে যে কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়ে যে ছেলে সিগারেট না খায় এবং রেস্টুরেন্টের চায়ের কাপে ছাই না ফেলে—বন্ধুদের কাছে তার কোনো সম্মানই নেই।

এত কম বয়েসেই রেণুর মধ্যে নীতিবোধ ও সততা অত্যন্ত বেশী। ওকে যখন প্রথম দেখি, তখন ও ছিল দারুণ দুরন্ত ও দুষ্টু মেয়ে—হঠাৎ কি রকম বদলে গেছে। যাবতীয় মানবিক ব্যবহারকে ও ভালো ও মন্দ, এই দুই ভাগে ভাগ করে ফেলেছে—এবং মন্দের সঙ্গে ও কোনো সংস্রব রাখতেই রাজি নয়। ওর নিজের দাদা অংশু এরকম নয়—কিন্তু বিষ্ণুর সঙ্গে রেণুর খুব মিল আছে এ ব্যাপারে।

বিষ্ণু আর আমি আলাদা আলাদা কলেজে ভর্তি হয়েছি বলে বিষ্ণুর প্রভাব আমার ওপর থেকে কমে গেছে। বিষ্ণু ভর্তি হয়েছে স্কটিশ চার্চ কলেজে—কিন্তু ওই কলেজে মেয়েরা পড়ে বলে আমাকে কিছুতেই সেখানে ভর্তি করা হলো না। আমার বাড়ির লোকেরা এ ব্যাপারে দারুণ গোঁড়া—অধিকাংশ বাঙাল পরিবারই এ রকম। আমাকে ভর্তি হতে হয়েছিল সেন্ট পলস কলেজে। সেখানে একটি ছেলে একদিন আমাকে বলেছিল তুই ট্রাম রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে পারবি? সে চ্যালেঞ্জ অস্বীকার করবো কি করে?

তবু রেণুর কাছে মিথ্যে কথা বলে আমার গ্লানি হয় না। বরং বেশ মজা লাগে।

আমি তখনও রেণুর হাত ধরে আছি। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রেণু বললো, আমি তোকে একটা চিঠি লিখেছিলাম।

—কই পাইনি তো!

—পাঠাই নি।

—কই দে। এখন আমাকে দে।

—এখন আর দিয়ে কি হবে। এমনি লিখেছিলাম।

—আমার চিঠি আমাকে দিতেই হবে। আমি এক্ষুনি চাই।

রেণু বড় একরোখা মেয়ে। একবার কোনো ব্যাপারে না বললে আর সহজে হ্যাঁ বলানো যায় না। চিঠিটা ও কিছুতেই দেবে না। শেষ পর্যন্ত বললো, চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলেছে।

আমি বললাম, মিথ্যে কথা!

রেণু বললো, আমি মোটেই তোর মতন যখন-তখন মিথ্যে কথা বলি না।

আমি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, আমাকে ছুঁয়ে বল।

রেণু ছুঁয়ে দিয়ে বললো, এই তো বলছি!

রেণুকে দেখলেই বোঝা যায়, ও মিথ্যে কথা বলার মেয়ে নয়। তবু আমার সন্দেহ যায় না। মনে হয়, আমারই মতন রেণুও এ ক্ষেত্রে মিথ্যে কথা বলেছে। কিন্তু সে কথা আর ওকে বলা যায় না।

যে চিঠি পাওয়া যায় না, সেই চিঠির জন্য মনের মধ্যে একটা দারুণ ঔৎসুক্য থাকে। আমার বার বার মনে হতে থাকে যে সেই না-পাওয়া চিঠির মধ্যেই আমার জীবনের অনেক রহস্যের সমাধান ছিল।

নিস্তব্ধ ঠাকুর দালানে রোদ পড়েছে, তিনটি শালিক সেখানে প্রচণ্ড কলহে মত্ত। বড় থামের পাশে শুয়ে আছে একটা বিড়াল। ওপরে কার হাত থেকে একটা থালা পড়ে গেল ঝনঝন শব্দে। সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো, রেণুর সঙ্গে আমার সারা-জীবনে কখনো বিচ্ছেদ হবে না। রেণু যেন একটা মেয়ে নয় শুধু, একটি শিল্প। যে শিল্পের সন্ধান আমাকে সারাজীবন ধরে করে যেতে হবে।

সেই সময় ভাস্কর আর পঙ্কজ এসে পড়লো। আমাকে দেখেই বললো, কি রে বাদল, তোর যে পাত্তাই নেই অনেকদিন!

ওরা দুজনে ধপ করে ঠাকুর দালানের সিঁড়িতে বসে পড়ে বললো, এই রেণু, বিরুকে ডাক তো!

আমি বললুম, বিরু তো নেই এখানে!

সে কথা শুনে ভাস্কর ও পঙ্কজ বেশ দুঃখিত হয়ে পড়লো। ওদের মনে হলো, বিরু ওদের সঙ্গে যেন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বাইরে বেড়াতে যাবার আগে বিরু তার বন্ধুদের একবার খবরও দিয়ে গেল না! যদিও মাঝখানে কয়েক মাসের ডামাডোলে খবর দেবার অসুবিধে ছিল, তবু বন্ধুদের অভিমান হবেই।

বিরু আমারই সবচেয়ে পুরোনো বন্ধু—সুতরাং আমারও অভিমান হবার কথা ছিল। কিন্তু এসেই সিঁড়ির ওপরে রেণুর ছবির মতন দাঁড়িয়ে থাকা দেখে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। এখনও, রেণুর সঙ্গে কথা বলার সময় হঠাৎ পঙ্কজ আর ভাস্কর এসে পড়ায় আমি বেশ অপরাধী বোধ করছিলাম। আমার মুখখানা তেলতেলে হয়ে এসে-ছিল, ওরা অবশ্য সেটা লক্ষ্য করেনি।

ভাস্কর বললো, উফ যা গরম! এই রেণু খাবার জল নিয়ে আয়। অনেকখানি খাবার জল নিয়ে আয়।

পঙ্কজ মুখ নীচু করে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ রে, শুনলুম নাকি তোর

কোন আত্মীয়—

সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখখানা কালো হয়ে গেল। চোখের দৃষ্টি কান্নার ঠিক আগের মুহূর্তের মতন। ভাঙা ভাঙা গলায় বললাম, আমার জ্যাঠামশাই, আমার নিজের জ্যাঠামশাইকে, উঃ!

আমার জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুতে আমি আঘাত পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু তেমন-ভাবে খুব বেশী শোক পাইনি! জ্যাঠামশাই আমাকে খুব একটা পছন্দ করতেন, না—ইদানীং তাঁর সঙ্গে একটা দূরত্বও তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

তবু, অন্যদের কাছে বলতে গেলে একটু অভিনয়ের ব্যাপার এসেই যায়। আমি এত বেশী শোকের ভান করতে লাগলুম যে ওরা আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

॥ ৫৯ ॥

জুন মাসের তিন তারিখে ঘোষণা করা হলো ভারত বিভক্ত করে দুটি আলাদা রাষ্ট্রকে স্বাধীন করে দেওয়া হবে পনেরোই অগাষ্ট। মাঝখানে মাত্র বাহাত্তর দিনের মধ্যে সীমানা, সম্পত্তি, সেনাবাহিনী, চাকরি-বাকরি প্রভৃতি ভাগ বাটোয়ারার সব রকম জটিল প্রশ্ন সেরে নিতে হবে।

সাধারণ মানুষ জানে না, এই স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ কি, ডোমিনিয়ান স্টেটাস বলতেই বা কি বোঝায়! শুধু স্বাধীনতা কথাটার মধ্যেই একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ আছে। দীর্ঘকাল ধরে অত্যাচার, উৎপীড়ন, আত্মক্ষয়ী দাঙ্গা-হাঙ্গামা, জাতীয় নেতাদের নিজেদের মধ্যে মন কষাকষি ও দলাদলিতে মানুষ একেবারে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিল—হঠাৎ স্বাধীনতা আসছে শুনে সকলেরই মনে হলো, এইটাই পরম প্রাপ্তি।

১৪ই আগষ্ট সন্ধ্যে থেকেই সারা দেশে অভূতপূর্ব উত্তেজনা। আগামীকাল একটা বিরাট উৎসবের দিন, কিন্তু সেই উৎসবের চেহারা কি রকম হবে কেউ জানে না। ভারতবর্ষের আবহমান কালের ইতিহাসে কোনোদিন স্বাধীনতার উৎসব তো হয়নি। রামায়ণ মহাভারতেও স্বাধীনতা উৎসবের বর্ণনা নেই। ইতিহাস দিয়েছে শুধু নতুন রাজ্যাভিষেকের খবর। এই দিনটিতে সব মানুষ তাই ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো; দাঙ্গা-হাঙ্গামাও অকস্মাৎ থেমে গেছে।

বড়বাবু একটা নতুন রেডিও কিনে ফেললেন। ক'দিন থেকেই তাঁর শরীরটা খারাপ যাচ্ছিল, কোমরে ব্যথার জন্য হাঁটাচলা করতে পারছিলেন না—তবু তিনি এ দিনটিতে বেশ উত্তেজনা বোধ করছিলেন—শিয়রের কাছে সারাক্ষণ রেডিওটা খুলে রাখলেন। মাঝে মাঝে চিররঞ্জন এসে পাশে বসেন। খবর শুনতে শুনতে হঠাৎ এক সময় চিররঞ্জনের চোখে জল আসে। অস্ফুট গলায় বলেন, সবই শেষ পর্যন্ত মিটে গেল, মাঝখান থেকে দাদা......

বৃদ্ধ বয়েসে শোক বেশী হয়। চিররঞ্জন তাঁর দাদার অপঘাত মৃত্যুর কথা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না।

বড়বাবু তাঁকে কোনো সান্ত্বনা দেন না। অন্যমনস্কভাবে চেয়ে থাকেন কড়িকাঠের দিকে। তারপর হঠাৎ এক সময় ব্যাকুলভাবে বলেন, এই দেশভাগের পরিণতি কি হবে, আমি তো ভাবতেই পারছি না।

চিররঞ্জন চোখের জল মুছে বলেন, আমার শ্বশুরমশাই চিঠি লিখেছেন—ওখানকার বিষয়-সম্পত্তি বেচে দিয়ে এদিকে চলে আসবার চেষ্টা করবেন।

—অতটা বোধ হয় দরকার হবে না। একটা কিছু প্রটেকশন থাকবেই। দু'দিকেই তো মাইনরিটি রয়ে গেল।

একটু থেমে বড়বাবু আবার বললেন, শরীরটা যদি সুস্থ থাকতো আমি এই সময় দিল্লি চলে যেতাম। এই দৃশ্য তো আর জীবনে কখনো দেখতে পাবো না—কাল লাল-কেল্লায় যখন তেরঙ্গা ঝান্ডা ওড়াবে জওহরলাল।

—গান্ধীজীর কোনো কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি না কেন?

—ওঁর দিন শেষ হয়ে গেছে। উনি এখন সবরমতী নিয়েই থাকুন! পার্টিজ-এই ওঁর রিটায়ার করা উচিত ছিল।

—আপনার কি মনে হয় ওঁর কথা মতন কংগ্রেস পার্টিটা এখন ভেঙে দেওয়া হবে?

রেডিওর দিকে উৎকর্ণ হয়ে বড়বাবু বললেন, চুপ, কি বলছে শোনো। ঠিক রাত বারোটায় জওহরলাল রেডিওতে ভাষণ দেবে। আমাদের এখানকার চীফ মিনিস্টার হলো প্রফুল্ল ঘোষ। বাঙালদের আর দুঃখ করার কিছু রইলো না।

সূর্য কিংবা বাদল কেউই বাড়ি নেই।

বাদল সারা সন্ধ্যেটা কাটালো ভাস্কর আর পঙ্কজদের সঙ্গে। কাল খুব ভোরে প্রভাতফেরী বার করবে। তার প্রস্তুতি চলছে। ভাস্করদের বৈঠকখানায় ওরা গানের রিহার্সাল দিল, কদম কদম বাঢ়ায়ে যা, খুশী কে গীত গায়ে যা এবং কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফ্যাল কর রে লোপাট।

রাত ন'টার সময় ওরা দল মিলে এলো বিকুদের বাড়িতে। বিকুদের বাড়িতে রীতিমত হইচই চলছে। ওদের অতবড় বাড়ি আগামীকাল উৎসব সজ্জায় সাজানো হবে। ইলেকট্রিকের মিস্তিরি এসেছে—ছাদের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত আলো লাগাবার জন্য তার টানা হচ্ছে। প্রায় শ' খানেক পতাকা কেনা হয়েছে। বাড়ির ছেলে-মেয়েরা বসে গেছে কাগজের শিকলি তৈরি করতে। সুপ্রকাশ তদারক করছে এ-সবের।

বাদলরাও শিকলি বানাতে বসে গেল। বাদল অন্যদের দেখাদেখি বেশ চটপট বানিয়ে ফেললো অনেকখানি। ভাস্কর এসব কাজে মন বসাতে পারে না। সে একটু বাদে বাদেই বলে, উঃ টায়ার্ড হয়ে গেলুম। এই বিকু চা পাঠাতে বল না।

বিকুর মা ছেলেদের বেশী চা খাওয়া পছন্দ করেন না। একতলা থেকে চাকর চায়ের ফরমাশ নিয়ে গেলেই তিনি প্লেট ভর্তি সন্দেশ আর সরবৎ পাঠিয়ে দেন।

একটু বাদে সবাইকেই ওপরে ডেকে পাঠানো হলো। সকলেরই খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

এ বাড়ির দোতলার হলঘরটা বহুদিন ব্যবহার করা হয় না। আজ ঝেড়ে পুঁছে সাফ করা হয়েছে। বার করা হয়েছে পুরোনো কালের রুপোর থালা বাসন। পড়ন্ত অবস্থা হলেও এখনো যেতে যেতে কিছু আছে। বিকুর মা নিজে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা-পনা করেছেন। তিন রকম মাছ মাংস এবং চার রকমের মিষ্টি না হলে তিনি লোককে খাওরানোর কথা ভাবতেই পারেন না। অনেক কিছুই কিনে আনিয়েছেন একটু আগে। সব দোকানপাট এখনো খোলা, বোধ হয় সারা রাতই খোলা থাকবে।

বাদল অনেকদিন বাদে এ বাড়ির ওপরে এলো। আজই সে প্রথম রেণুর আর এক কাকাকে দেখলো, যার স্ত্রী ছিলেন হৈমন্তী কাকিমা। হৈমন্তী কাকিমার নাম এ

বাড়িতে অনেকদিন শোনা যায় না। তাঁর বরের চোখ ফুলো ফুলো। গালে চাকা চাকা দাগ তবে খুব শৌখিন মানুষ, কোঁচার প্রান্তটি ফুলের মতন ছড়ানো, হাতে সবুজ রঙের সিগারেটের টিন।

খাওয়া শেষ করে ওরা সবাই ছাদে এলো। পতাকাগুলো লাগাতে হবে—আলোর ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এত রাত পর্যন্ত বাদলরা এর আগে কখনো বাড়ির বাইরে থাকে নি—কিন্তু আজ সে সম্পর্কে কোনো চিন্তাই নেই।

আকাশে কয়েক টুকরো পাতলা মেঘের দিকে তাকিয়ে সুপ্রকাশ বললো, এই সেরেছে। কাল যদি বৃষ্টি নামে! বাদলরা হই-চই করে উঠলো, না সুপ্রকাশদা আপনি ওরকম অপয়া কথা বলবেন, না। বৃষ্টি হলে সব মার্ডার হয়ে যাবে!

বিষ্ণু বললো, আয়, একটা জিনিস ঠিক করবি? এখন থেকে কাল সারা দিন আমরা একটাও ইংরেজি কথা বলবো না। যে একটা ইংরিজি শব্দ বলে ফেলবে, তার তক্ষুণি এক পয়সা করে ফাইন হবে।

সুপ্রকাশ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এই তোমরা বিষ্ণুর কাছ থেকেই প্রথমে এক পয়সা নিয়ে নাও। ও ফাইন বলেছে। ওকেই প্রথমে জরিমানা দিতে হবে!

সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো। বিষ্ণু ক্ষীণ প্রতিবাদ করে বলতে গেল যে এখনো খেলা শুরুই হয় নি—সে শুধু প্রস্তাব তুলেছে। কিন্তু বিষ্ণুর কথা গ্রাহ্য করা হলো না। তাকে পয়সা দিতেই হবে।

সুপ্রকাশ বললো, দেখো, কাল অনেক পয়সা পাওয়া যাবে। পয়সাগুলো একজন কেউ জমা রাখুক—তোমরা ভাস্করকে ক্যাশিয়ার করে দাও।

ভাস্কর হাত বাড়িয়ে বললো, সুপ্রকাশদা আপনিও দিন এক পয়সা। আপনি ক্যাশিয়ার বলেছেন।

সুপ্রকাশ থতমত খেয়ে বললো, আরে ওটা তো বাংলাই। ক্যাশিয়ার কথাটার আবার বাংলা আছে নাকি?

পংকজ বললো, তাহলে, ইংরেজরা আসবার আগে আমাদের দেশে কি টাকাপয়সা ছিল না? কিংবা কারুর কাছে জমা রাখা হতো না।

ভাস্কর বললো, একটু বাদে ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে আর ইংরেজি ছাড়া আমরা একটাও সেন্‌—থুড়ি, বাক্য বলতে পারি না? আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত!

—তুমি বলো, ক্যাশিয়ারের বাংলা কি? তোমাদের মধ্যে কে বলতে পারে?

অন্য কেউ উত্তর দেবার আগেই ভাস্কর বললো, আপনি রামপ্রসাদের গানটাও শোনেন নি?

ভাস্কর দু' হাত ছড়িয়ে চেঁচিয়ে গান জুড়ে দিল, 'আমায় দে মা তবিলদারি, আমি নিমকহারাম নই শংকরী—'

সবাই হাততালি দিয়ে উঠলো। আনন্দ করার জন্য সমস্ত মন-প্রাণ উদগ্রীব, যে কোনো একটা উপকরণ পেলেই হলো।

ঠিক বারোটার সময় মুহুর্মুহু শোনা গেল কামান গর্জন। সমস্ত ট্রেন হুইসল্‌ দিয়ে উঠলো। সেই শব্দও ছাপিয়ে গেল শংখ ধ্বনিতে। পাড়ার প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই শাঁখ বাজছে। অনেক বাড়িতে উলু দিয়ে উঠেছে মেয়েরা।

ওরা দুদ্দাড় করে নেমে এলো ছাদ থেকে। বিষ্ণুদের ঘরে বিশাল রেডিওটি খুব জোরে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটু ধরা ধরা গলায় জওহরলাল নেহরু বলে চলেছেন, সারা পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে আছে, তখন একটি পরাধীন জাতি স্বাধীনতা পেয়ে জেগে

উঠলো......

ইংরেজি মতে শুরু হয়ে গেছে নতুন দিন, এসে গেছে স্বাধীনতা। সেই মুহূর্তে সারা দেশের অনেকেই জেগে আছে, এমন কি হাসপাতালের রুগীরাও ঘুমোয় নি। অন্ধকার নদীতে মাছ-ধরা জেলে ডিঙিগুলো থেকে ভেসে আসছে 'জয় হিন্দ'। সেই মুহূর্তে অনেকে অনেক রকম মানত ও শপথ নিয়ে ফেলেছিল, অনেক ক্লান্ত অকৃতদার দেশকর্মী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিয়ে করার। আচার্য কৃপালনী সত্যিই বিয়ে করেছিলেন সেই রাত্রে।

বাড়ি ফেরার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বাদল রেণুকে বলেছিল, এখন আমার সঙ্গে একটা প্রতিজ্ঞা করবি!

রেণু শুধু চোখ তুলে চেয়ে রইলো।

বাদল আবেগপ্লুত গলায় বললো, আমি তোকে যখন যা বলবো তুই শুনবি। তুইও আমাকে যা বলবি আমি শুনবো।

রেণু বললো, যদি কিছু অন্যায় কথা হয়?

বাদল জোর দিয়ে বললো, তা হলেও। অন্যায় হোক আর নাই হোক।

রেণু চুপ করে রইলো। বাদল আবার বললো, আমি কি কখনো তোকে কোনো অন্যায় কথা বলতে পারি? কিংবা তুই—

রেণু তখনও কোনো উত্তর দিচ্ছে না। দরজার কাছ থেকে ভাস্কররা বাদলকে ডাকলো, আর সময় নেই। অভিমান নিয়ে বাদল শেষবারের মতন জিজ্ঞেস করলো, তুই তা হলে প্রতিজ্ঞা করবি না?

রেণু বললো, আচ্ছা করলাম। কিন্তু তোর মনে থাকবে তো?

—দেখিস!

বাদল তরতর করে নীচে নেমে এসে বললো, কাল কিন্তু খুব ভোরে ডাকতে আসবো—

রাত্তিরে কতটুকুই বা ঘুম হলো। ভোরের আলো ফোটার আগেই বাদল আবার বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে। পঙ্কজের বাবা একটা লরি দিয়েছেন, সেই লরি নিয়ে ঘুরে ঘুরে তোলা হলো সকলকে। আজ এই শুক্রবার সকালে কলকাতা শহরটা একেবারে নতুন। এরকম কলকাতা ওরা কখনো দেখেনি।

যেদিকে তাকাও শুধু তিন রঙের পতাকা। প্রত্যেক বাড়ির ছাদে, প্রত্যেক মানুষের পোশাকে, সব লাইট পোস্টে, সব গাড়িতে। রাস্তায় রাস্তায় পতাকা কিংবা ব্যাজ বিক্রি হচ্ছে—সেগুলো কেনার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। সমস্ত শহর আজ রঙে ঝলমল। মোড়ে মোড়ে বিরাট বিরাট তোরণ—তার ওপর জাতীয় নেতাদের ছবি। অসংখ্য প্রভাতফেরির দল বেরিয়েছে—এক দল আর এক দলের মুখোমুখি এলেই গান থামিয়ে ধ্বনি দিয়ে ওঠে, জয় হিন্দ! বন্দে মাতরম্! ভারত মাতা কি জয়!

আজ আর কলকাতায় কোনো নিষিধ এলাকা নেই। প্রায় এক বছর বাদে বাদলরা রাজাবাজার, কলাবাগান, কলুটোলা মীর্জাপুরে ঢুকলো—সেখানে উৎসাহ-উদ্দীপনা একটুও কম নয়। সেখানেও বাড়িতে বাড়িতে উড়ছে ভারতের জাতীয় পতাকা, মুসলমানরাও সমানভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় মানুষে মানুষে কোলাকুলি, এক-একটা লরি দেখে অন্যরা হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে একটু করস্পর্শ করার জন্য—অনেকেই লরি থেকে লাফিয়ে নেমে অচেনা কোনো মানুষকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে লাফাচ্ছে। আজ একবারও মনে হয় না—গত কয়েকটা মাস ধরে এই কলকাতায়

কি নারকীয় কাণ্ড চলেছে! হিন্দু মুসলমানের অভূতপূর্ব মিলনের দৃশ্যই সকলকে আরও বেশী আনন্দে মাতোয়ারা করে দেয়। পরস্পর পরস্পরের জামায় পতাকা আটকে দিচ্ছে, বিনিময়ে পরস্পরকে দিচ্ছে ম্লানিহীন হাসি।

বাদলরা সকাল থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত ঘুরলো লরিতে। তারপর ফিরে এলো ভাস্করদের বাড়ি। ভাস্করদের বাড়ি থেকে সেদিন পাড়ার গরীব দুঃখীদের খাওয়ানো হচ্ছে। কাছাকাছি দুটো বস্তির সকলের নেমন্তন্ন। সামনের রাস্তায় লম্বা লাইন করে পাতা পড়েছে। তাদের পরিবেশন শেষ করে নিজেদের খেতে-খেতে বাদলদের দুটো আড়াইটে বেজে গেল।

খেয়ে উঠেই কিন্তু ওরা আবার বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। এক মুহূর্ত বাড়িতে বসে থাকতে ইচ্ছে করে না। আজ ট্রাম বাসে টিকিট নেই। ওরা চললো সাহেব পাড়া আর গভর্নরস হাউসের দিকে।

সূর্য দীপ্তিকে নিয়ে হোয়াইটওয়ে লেড ল'র সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দীপ্তি মাঝে মাঝে হাতঘড়ি দেখছেন।

সূর্য আজ পরেছে সাদা খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি। দীপ্তিও পরেছেন সরু লাল পাড় খদ্দরের শাড়ি। জায়গাটায় এত অসম্ভব ভিড় যে এক জায়গায় সুস্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব—জনতার স্রোত প্রায় ঠেলে নিয়ে যেতে চায়। সূর্য দীপ্তির একটা হাত শক্ত করে ধরে আছে।

একটু বাদেই ক্ষিতীশদা এসে হাজির হলেন এক ঠোঙা বাদাম হাতে নিয়ে। হাসতে হাসতে বললেন, দ্যাখ, এইটুকু বাদাম চার আনা। ঝোঁকের মাথায় আজ একটা সিকি খরচ করে ফেললাম!

ওদের দু'জনের হাতে কিছু কিছু বাদাম তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আর কেউ আসেনি?

পেছন থেকে দু'জন বললো, এই তো আমরা এসেছি।

রণেন আর সুশোভন। রণেন মাত্র কয়েক দিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে, এখনো জেলের দাড়ি কামায়নি। তার সেই হাসিখুশী মেসোমশাই মার্কা চেহারা এখন আর চেনাই যায় না। সুশোভন অনেকদিন পলাতক ছিল যুক্তপ্রদেশে। সে বললো, আমি কাল শান্তিদি আর ক্ষেমেনদাকে খবর দিয়ে এসেছি।

ক্ষিতীশদা বললেন, আমার সঙ্গে শঙ্করের দেখা হয়েছিল খুঁজলে, কিন্তু তাকে খবর দেবো কিনা ঠিক করতে পারলাম না। সে তো আমাদের দল ছেড়ে দিয়েছিল।

রণেন বললো, তাকে না ডেকে ভালোই করেছেন।

দীপ্তি বললেন, শঙ্করবাবু কিন্তু দাঙ্গার সময় রিলিফের কাজ করেছেন খুব।

সূর্য বললো, আমরা ডাকলেও উনি আসতেন না। আমাদের পছন্দ করেন না এখন।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই এগারোজন এলে সমবেত হলো সেখানে। ক্ষিতীশদা বললেন, আর তো কেউ নেই। এবার চল।

সূর্য ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। কাছেই রিপন স্ট্রীটে তারিখ সাহেবের বাড়ি। দাঙ্গার সময় সূর্য এ বাড়িতে কিছুদিন আশ্রয় নিয়েছিল।

তারিখ সাহেবের বাড়ির তিন তলায় মস্ত একটি ঘর। টেবিল চেয়ার নেই, মেঝেতে ফরাস পাতা। মাঝখানে একটি নিরাবরণ জলচৌকি।

কোনো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নেই। অনুষ্ঠান আগে থেকেই ঠিক করা আছে। তারিখ সাহেব বললেন, আমি মোমবাতি এনে রেখেছি। ক'টা জ্বালাতে হবে বলুন?

ক্ষিতীশদা দীপ্তিকে বললেন, ক'টা জ্বালবে?

দীপ্তি বললো, আপনিই ঠিক করুন। আমাদের মধ্যে--যারা যারা--

রণেন বললো, শুধু আমাদের কেন, সারা ভারতে যারা প্রাণ দিয়েছে। এক কাজ করুন, সকলের জন্য তো আলাদাভাবে কিছু করা যাবে না। নব্বই বছর ধরে স্বাধীনতার লড়াই চলেছে, সেই হিসেবে নব্বইটা—

তারিখ সাহেব বললেন, আমার কাছে অনেক আছে।

এই প্রস্তাবটা সকলের পছন্দ হলো। দীপ্তি এক এক করে মোমবাতি জ্বেলে বসাতে লাগলেন জলচৌকির ওপর। জানলা দিয়ে ফাঁকা হাওয়া এসে মাঝে মাঝে দু' একটা নিবিয়ে দিচ্ছে। দরজা জানলা সব বন্ধ করে দেওয়া হলো—অন্ধকার ঘরে জ্বলে উঠতে লাগলো একটার পর একটা বাতি। নব্বইটা মোমের আলোয় ওদের মুখগুলো জ্বলজ্বল করতে লাগলো।

দীপ্তি তাঁর হাত ব্যাগ থেকে রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকা বইটি বার করে বললেন, এই বইটা ব্রজদার—আমার কাছে ছিল। ক্ষিতীশদা পকেট থেকে একটা নোট-বই বার করে বললেন, এটা ছিল অশোকের। এই রকম ভাবে কয়েকটি রুমাল, কিছু চিঠি, একটা চিরুনি, তিনটি ছোরা বেরুলো অন্যদের পকেট থেকে। এগুলো যাদের জিনিস, তারা আজ আর কেউ বেঁচে নেই।

রণেন আপন মনে বলতে লাগলো, চাফেকার, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন, ধিংড়া, কানহেরে—

সুশোভন বললো, কত আর নাম বলবি। সারা ভারতে এরকম তো হাজার হাজার—বরং সকলের জন্য একসঙ্গে দু'মিনিট—

তারিখ সাহেব বললেন, কিছু ফুল আনলে হতো। আনবো?

সূর্য বললো, না ফুল দরকার নেই।

ওরা সবাই হঠাৎ চুপ করে গেল। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো মোমবাতিগুলোর দিকে। এলোমেলোভাবে সাজানো হলেও মোমবাতির আলোয় একটা আল্পনার রূপ এসেছে। দপ দপ করে কাঁপছে শিখাগুলো। ফোঁটা ফোঁটা মোম গলে পড়ছে অশ্রু বিন্দুর মতন। একটা ঘড়ির শব্দ হচ্ছে টিক টিক টিক। দু' মিনিট সময়কেই কত দীর্ঘ মনে হয়। যেন এই দু' মিনিটেই স্মৃতির রাজ্যে পেরিয়ে গেল নব্বই বছর।

ক্ষিতীশদা বড় নিশ্বাস ফেলে বললেন, সময় হয়ে গেছে। এবার ওঠা যাক। দীপ্তি রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছলেন।

ক্ষিতীশদা তারিখ সাহেবকে বললেন, সিরাজুল, সবার পক্ষ থেকে তুমি কিছু বলো।

তারিখ সাহেব বললেন, আপনি দাদা সবার মধ্যে এখন বয়ঃজ্যেষ্ঠ, আপনি থাকতে আমি কি বলবো, আপনিই বলুন।

ক্ষেমেনদা বললেন, হ্যাঁ, ক্ষিতীশদাই কিছু বলুন।

ক্ষিতীশদা মুখ নীচু করে বললেন, বিশেষ কিছু বলার নেই। আজ এই জাতির ইতিহাসে একটা পরম ক্ষণ। আজ আর প্রশ্ন কিংবা সমালোচনা করার দিন নয়। আজ আনন্দেরই দিন। তবু আমাদের যে-সব সহকর্মী এবং বন্ধু এই স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন—আমরা আজকের দিনে তাঁদের স্মরণ না করে পারি না। আমি শুধু এই-টুকুই বলতে চাই, তাদের প্রাণ দান ব্যর্থ হয়নি। ১৯২৩ সালে অনুশীলন পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে হরদা এই দল গড়েছিলেন। সমুদ্রবন্ধনের সময় কাঠবিড়ালী

যতটুকু সাহায্য করেছিল, হয়তো আমরাও ততটুকু সাহায্য করতে পেরেছি স্বাধীনতাকে নিয়ে আসার জন্য। আজ আর পুরোনোদের মধ্যে কেউই বেঁচে নেই। দলের অস্তিত্বও কিছু নেই বলতে গেলে। তবু যেহেতু আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল, সেই জন্য আনুষ্ঠানিকভাবেই এটা ভেঙে দেওয়া উচিত। স্বাধীনতার পরবর্তীকালের জন্য আমাদের কোনো প্রোগ্রাম ছিল না। তা ছাড়া, ক্ষমতাশীল সরকার আমাদের কি চোখে দেখবে, তাও আমরা জানি না। সুতরাং দলের কাছে আমাদের যার যা শপথ ছিল—তার দায়িত্ব থেকে সকলকেই নিষ্কৃতি দেওয়া হলো। এখন যে-কেউ ইচ্ছে করলে অন্য যে-কোনো দলে যোগ দিতে পারে। এ সম্পর্কে কারও কোনো আপত্তি আছে?

কেউ কোনো কথা বললো না। নৈঃশব্দেই সম্মতি বোঝা গেল। ক্ষিতীশদা উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। হাওয়া এসে নিবিয়ে দিতে লাগলো মোমবাতিগুলো।

একটু পরেই ওরা বেরিয়ে পড়লো তারিখ সাহেবের বাড়ি থেকে। সবাই খুব কাছাকাছি হাঁটতে লাগলো। রাস্তার প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে বোঝাই যায় না, ওদের একটা ছোটখাটো মিছিল চলছে।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা চলে এলো গঙ্গার ধারে। এখানেও ভিড় কম নয়। হাওড়া থেকে বহু লোক নৌকোয় বা স্টিমারে আসছে কলকাতার আলোকসজ্জা দেখতে।

ওদের মৃত সহকর্মীদের ব্যবহৃত জিনিসপত্রগুলো একটা ব্যাগে ভরে নিয়ে আসা হয়েছিল। তার থেকে ক্ষণিকা বইটা তুলে নিয়ে দীপ্তি বললেন, এটা আমার কাছেই রেখে দিতে চাই।

কেউ কোনো আপত্তি জানালো না।

বাকি জিনিসপত্র ভরা থলেটা নিয়ে সূর্য জলের ধারে এসে জোরে ছুঁড়ে দিল। জলে পড়তে না পড়তেই ঢেউয়ের ঝাপটায় মিলিয়ে গেল।

সূর্য যখন পারে উঠে এলো, তখন পর পর কয়েকখানা লরিতে অনেক লোক বন্দে মাতরম্ ধ্বনি দিচ্ছে। সূর্য হঠাৎ তাদের দিকে ফিরে ভরাট গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, বন্দে মাতরম্!

এই শেষ বার। এর পর সূর্য আর কখনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোনো ধ্বনি দেয়নি।

বাদল ভাস্কর, বিষ্ণু আর পঙ্কজ ঘুরতে লাগলো সাহেব পাড়ায়। সন্ধ্যের দিকে এত মানুষ রাস্তায় বেরিয়েছে যে, শহরে আর গাড়ি ঘোড়া চলার উপায় নেই। এত লোক বোধ হয় এক সঙ্গে কখনো ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেনি। মুক্ত হাওয়ায় এসে দাঁড়ানোই যেন স্বাধীনতার প্রতীক। গোলমালের আশঙ্কায় বহু সংখ্যক পুলিসের গাড়ি ছাড়া হয়েছিল—কিন্তু সারাদিনে একটা পকেটমারির ঘটনা পর্যন্ত ঘটেনি। শুধু উল্লাস আর উত্তেজনা। মুসলমান পাড়ায় আতর ছেটানো হচ্ছে সবার গায়ে। কোথাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে গোলাপ ফুলের পাপড়ি।

রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস ও ক্লাইভ স্ট্রীটের মোড়ে বিরাট এক তোরণের গায়ে বাল গঙ্গাধর তিলকের প্রতিচ্ছবি। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের বাড়িতে ভারতের একটি বিরাট মানচিত্র। এই সব বাড়ি থেকে এক সময় কতরকম ভারত-বিরোধী রাজনীতি চালানো হয়েছে। লোকেরা সাহেবদেরও ধরে ধরে বুকে পতাকা আঁকা ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছে, তারাও আপত্তি করছে না।

সন্ধ্যের পর আলোর ফোয়ারা ছড়িয়ে পড়লো সারা শহরে। তারপরই নানা রকম বাজির খেলা দেখা গেল আকাশে।

অনেক রাত পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলো বাদল আর তার বন্ধুরা। সারাদিন

চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাদলের গলা ভেঙে গেল।

এর কয়েক মাস পরেই অবশ্য বাদলরা রাস্তায় আবার ছাত্র মিছিল নিয়ে এসে ধর্না দিয়েছে, ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়, ভুলো মাৎ, ভুলো মাৎ।

কলেজে আমাদের ক্লাস থেকে দশজনকে পাঠানো হয়েছে আর ডব্লু এ সি-তে। আমিও সেই দলে ছিলাম। আমরা প্রত্যেকদিন যেতাম শিয়ালদা স্টেশনে। বিরাট বিরাট ড্রামে দুধ গুলে বিতরণ করা ছিল আমাদের কাজ। প্ল্যাটফর্মগুলোতে মানুষ থিকথিক করছে। নোংরা মানুষের শরীরের গন্ধ ও ব্লিচিং পাউডারের কড়া গন্ধ মিলে মিশে প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসে।

প্রত্যেকদিন দলে দলে ওরা আসছে। কোথাও আর তিলধারনের জায়গা নেই। প্ল্যাটফর্ম থেকে উপচে পড়ছে রাস্তায়। কলকাতা শহরের ছিমছাম চেহারাটা চিরকালের মতন নষ্ট হয়ে গেল।

খাটতে খাটতে আমাদের দম বেরিয়ে যায়। দয়া, মায়া ইত্যাদি অনুভূতির আর জায়গা থাকে না। বহু দূরের সব গন্ডগ্রাম থেকে এসেছে ছেলে মেয়ে বুড়ো শিশুর দল—কলকাতার মতন অজানা অচেনা পুরীতে এসে তাদের চোখের বিহ্বলতা এখনো কাটেনি। অনেকে এসেছে মৃত্যুর খুব কাছ ঘেঁষে। এখানকার নিয়মকানুন ওরা জানে না।

কিছুতেই লাইনে দাঁড় করানো যায় না ওদের। সবাই একসঙ্গে হুড়োহুড়ি করে আসে। আমরা ওদের বকুনি দিই, ঠেলে দিই, এমনকি অনেক সময় মেজাজ হারিয়ে মারতেও উঠি।

পঙ্কজ এক এক সময় বলে ওঠে, এই বাঙালগুলোকে নিয়ে আর পারা যায় না!

আমি মুখ লুকোই। জন্মসূত্রে আমিও যে বাঙাল সে কথাটা এখন প্রকাশ করতে লজ্জা পাই। অনেকদিন আমাকে কেউ বাঙাল বলেনি। আমার কথায় আর টান নেই, অচেনা লোক কিছুই বুঝতে পারবে না।

পঙ্কজ কিন্তু জানে। সে আমাকে একসময় জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ রে, তোদের বাড়ির কি হয়েছে রে?

আমি সংক্ষেপে উত্তর দিই, কি জানি!

—তোদের আত্মীয় স্বজন কেউ আসেনি?

—না।

—ও, তোরা তো বোধহয় জমিদার ছিলি, তাই না? যত বাঙাল আসছে, সবাই নাকি ওখানে জমিদার ছিল?

পঙ্কজ জানে না, দু' চার বছরের মধ্যেই এদিকে এত বেশী বাঙাল এসে পড়বে যে তখন আর বাঙালকে প্রকাশ্যে বাঙাল বলে মনের সুখও করা যাবে না।

রেডক্রসের কাছে যুদ্ধের উদ্‌বৃত্ত বহু টুথ পেস্টের টিউব ছিল, একদিন দু' হাজার সেই টিউব আমাদের কাছে এলো বিলি করার জন্য।

আমাদের ইনচার্জ ফণীদা বললেন, দ্যাখো কান্ড! যারা কোনোদিন টুথ ব্রাস চোখেই দেখেনি, তাদের এগুলো দিয়ে কি হবে বল্‌দিনি? নে, এগুলো তোরা যে যটা পারিস নিয়ে যা।

বলা মাত্রই আমরা মুঠোর করে তুলে পকেটে ভরলুম। প্যান্টের দু' পকেট ফুলে গেল। যে কোনো জিনিসই বিনা মূল্যে পেলে বেশ একটু আনন্দ হয়। এগুলো নেওয়ার

জন্য আমাদের কোনো অপরাধ বোধ হয় না—এত লোকের মধ্যে সামান্য দু' হাজার টুথ পেস্ট টিউব বিলি করা সত্যিই অর্থহীন। বরং আমাদের কাজে লাগবে।

রাস্তায় বেরিয়ে পঙ্কজ পকেট থেকে একটা টিউব বার করে দেখে। খাঁটি বিলিতি জিনিস দেখে তার একটু আনন্দ করার কথা, তবু বিনা পয়সায় পেয়েছে বলেই অবহেলার সঙ্গে ছিপি খুলে একটু টিপে দেখতে চায়। ফুস্ করে শব্দ হয়, তারপর কালচে কালচে ময়লা রঙের কিছু বেরুতে থাকে।

পঙ্কজ বললো, দূর শালা! যত সব রদ্দি মাল বলেই ঐ সব হাড় হাভাতেদের মধ্যে চালিয়ে দেবার চেষ্টা!

পঙ্কজ চিনেম্যানদের কায়দায় চার পাঁচটা টিউব এক সঙ্গে লোফালুফি করার চেষ্টা করে—আমি পকেট থেকে সব কটা বার করে ছুঁড়ে ফেলে দিই ট্রাম লাইনে। তার ওপর দিয়ে ট্রাম চলে গেলে সেই দৃশ্য দেখে মজা লাগে।

গান্ধীজী গুলি খেয়ে মারা গেছেন। কাশ্মীরে পাকিস্তানের সঙ্গে প্রথমবারের যুদ্ধ হয়ে গেছে। জিনিস পত্তরের সাংঘাতিক দাম। যুদ্ধ-ছাঁটাই হাজার হাজার বেকার, তার ওপরে এই রিফিউজি। সে বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় বাইরে থেকে মাইক বাজিয়ে উত্তর বলে দেওয়া হয়েছিল এবং চেয়ার টেবিল পর্যন্ত পাস করে গিয়েছিল। খাদ্যদ্রব্য তো দুষ্প্রাপ্য বটেই, জামা কাপড়ও সহজে কিনতে পাওয়া যায় না। কন্ট্রোলে শাড়ি-ধুতি দেয়, গামছার মতন আকৃতি।

তবু এরই মধ্যে ফুটবল মাঠে ভিড় হয়, রাত্তিরবেলা আলো জেবলে টেনিস খেলা জমে। রাস্তা দিয়ে ব্যান্ড বাজিয়ে বরযাত্রীসহ বর বিয়ে করতে যায়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও বাদ পড়ে না। সন্ধ্যের পর শিয়ালদহ স্টেশন থেকে মেয়ে কেনার জন্য কারা নাকি আড়কাঠি পাঠায়—তা নিয়ে আবার খবরের কাগজে লেখা হয় গরম গরম সম্পাদকীয়।

সকালবেলা আমরা এই দুঃসহ দৃশ্য এবং নির্যাতিত মানবতার মধ্যে কাটিয়ে এসেও সারাদিন সেই চিন্তা মাথায় ধরে রাখি না। প্রকৃতির কোনো এক অদ্ভুত নিয়মে আমাদের চেতনার মধ্যে সব সময় অসামঞ্জস্য থেকে যায়। আমরা বন্ধুরা এখনো হাস্য পরিহাস করি এবং প্রণয়লিপ্সায় অনেকটা সময় কেটে যায়।

প্রথম প্রথম আমি শিয়ালদা স্টেশনের দৃশ্য দেখে খুব অবসন্ন বোধ করতাম। এক এক সময় মনে হতো, যেন আমার দম বন্ধ হয়ে আসবে। চতুর্দিকে কিলবিল করছে মানুষ, এরই মধ্যে তারা মরছে, অসুখে ধুঁকছে, খিদের জ্বালায় ছটফট করছে। তবুও প্রতিদিন গেছি, ইচ্ছে করলেই না যেতেও পারতাম যদিও। দিনের পর দিন দেখতে দেখতে মনের মধ্যে একটা আস্তরণ পড়ে যায়। তখন দুধ বিলি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলে—বিশ্রাম নেবার জন্য সিগারেট ধরাই। ক্ষুধার্ত লোকগুলো সেই সময়ে চ্যাঁচামেচি করলে ধমক দিই। হঠাৎ কোনো স্বাস্থ্যবতী যুবতীকে দেখলে দু' এক পলক বেশী তাকাই। আমাদের ইনচার্জ ফণীদা ভিড় সামলাবার জন্য এক এক সময় বড়ই কর্কশ ভাষায় বকাবকি করেন। অথচ, সবাই জানে, ব্যক্তিগত জীবনে ফণীদা খুব দয়ালু মানুষ।

পঙ্কজ আর আমি শিয়ালদা থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করি কলেজের দিকে। সেদিন আকাশ বেশ মেঘলা।

পঙ্কজ বললো, আজ আর কলেজে যেতে ইচ্ছে করছে না। চল্, আজ কাট মারি!

আমার কোনো আপত্তি নেই। বললাম, চল্, বিষ্ণুকে ডেকে নিয়ে ওদের বাড়িতে

গিয়ে আড্ডা মারি।

পংকজ চোখের কোণে ঝিলিক দিয়ে বললো, তোর খুব ঘন ঘন বিকুদের বাড়িতে যাওয়ার শখ কেন রে?

আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম।

পঙ্কজ বললো, তার চেয়ে চল্ একটা সিনেমা দেখি!

তখন ইংরেজি বই মানেই যুদ্ধের ছবি। অধিকাংশ ছবিতেই আমেরিকান-জাপানী বন্ধুত্বের গল্প, শেষ দৃশ্যে রাইফেলের ডগায় প্রজাপতি। বললাম, নাঃ, সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করছে না।

—তা হলে চল্ নানকিং-এ গিয়ে ডাক রোস্ট খাই!

—না, থাক।

পঙ্কজ অবাক হয়ে বললো, কেন?

কয়েকদিন আগেই ওখানে ডাক রোস্ট খেয়ে আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু পংকজ প্রত্যেকদিন দাম দেয়, আমি পয়সা দিতে পারি না। এরকম ভাবে চলে না।

পংকজ আমার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলো, আমি কিছুতেই রাজি হলাম না। শেষ পর্যন্ত পংকজ রাগ করে চলে গেল।

আমি রেণুর সংগে দেখা করার জন্য ওদের বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলাম। খানিকটা দূর গিয়ে আর সেখানেও যেতে ইচ্ছে করলো না। খুব মন খারাপ লাগছে হঠাৎ।

জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর ফলে তাঁর কারবার হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। আমার বাবা আবার বেকার। এই বয়েসে তাঁর পক্ষে নতুন কোনো চাকরি পাওয়া সম্ভব নয়। বড়বাবুর বাড়িতে আমরা তখন পুরোপুরি আশ্রিত হয়ে গেছি, কিন্তু তাঁর কাছে তো টাকা পয়সা চাওয়া যায় না! আমার হাতে একটাও পয়সা থাকে না। হাত খরচ জোগাড় করার জন্য আমি একটা টিউশানি নিলাম।

দুটি ছেলেকে পড়াতে যেতে হয় মদনমোহন তলায়। পুরোনো আমলের বাড়ি, কলকাতার এরা আদি বাসিন্দা হলেও এই পরিবারটির মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার তেমন চল নেই। ছাত্রদের বাবার সংগে একবারই মাত্র দেখা হয়েছে, তিনি রিক্সাকে বলেন, রিস্কা, বাক্সকে বলেন বাস্ক, ক্লাসকে বলেন কেলাস। আমি বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়ালেই ছাত্রদের এক বর্ষীয়সী আত্মীয়া চেঁচিয়ে বলেন, ওরে উপু-নেপু, তোদের ম্যাস্টার এয়েচে!

মাইনে পাই পনেরো টাকা।

প্রথম কিছুদিন এক কাপ চা একখানা করে থিন এরারুট বিস্কুট দেওয়া হয়েছিল। সপ্তাহ দুয়েক পরে হঠাৎ সেটা বন্ধ হয়ে গেল। তারপরেও বেশ কিছুদিন আমি আশায় আশায় থাকতাম। সন্ধ্যে হলেই বড় খিদে পায়। কলেজ থেকে আর বাড়ি না ফিরেই পড়াতে আসি বলে আর খাওয়া হয়ে ওঠে না। চা খেলে খিদেটা মরে।

একদিন ছাত্রের এক কাকা এসে বললো, মাস্টারমশাই, আপনি আর এক জায়গায় পড়াবেন? আমার এক বন্ধু বলছিল—একটি বেশ ভদ্দরলোকের ছেলে চায়—

আমি রাজি হয়ে গেলাম। তখন আমার বই কেনার দারুণ নেশা—অথচ পয়সায় কুলোয় না। দু' জায়গায় টিউশানি করলে আমার রোজগারটা ভদ্রগোছের হতে পারে।

এই বাড়িটা আহিরীটোলায় এবং পরিবারটি একটু আলোকপ্রাপ্ত। বাড়িটাও দেখতে সুন্দর, পড়বার ঘরটি দোতলায়, একটি মাত্র ছাত্র, বয়েস এগারো বছর, ছাত্রের

মা প্রথম দিন আমাকে শোনপাপড়ি আর সরবৎ খেতে দিলেন। মাইনে এখানে কুড়ি টাকা।

কয়েকদিন বাদেই বুঝলাম, দুটি টিউশানি করলে আমার নিজের পড়াশুনোর সময় পাবো না—তাই প্রথম টিউশানিটা ছেড়ে দিলাম।

এই বাড়ির পরিবেশটি অত্যন্ত ঘরোয়া ধরণের। ছাত্রের দাদা আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে গল্প করতে আসে। ছাত্রের মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার বাড়ির খবর জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু একটা মুশকিল, ছাত্রের বাবা এক-একদিন এ ঘরে বসে হঠাৎ এমন বাঙালদের নিন্দে করতে শুরু করেন যে আমি কাচুমাচু হয়ে যাই। ওঁর অফিসে একটি বাঙাল কর্মচারী রেখেছিলেন, কিন্তু সে লোকটা এমন গোঁয়ার আর নিমকহারাম—সামান্য কথা কাটাকাটিতে একদিন মালিককেই মারতে এসেছিল। এ জাতকে কখনো বিশ্বাস করতে আছে। এত বেশী রেফিউজি আসতে শুরু করায় কলকাতার মানুষ নতুন করে বাঙালদের ওপরে বিরক্ত।

আমি নিঃসাড় হয়ে বসে থাকি। আমিও যে বাঙাল সে কথা উনি জানেন না। এবং বাঙালের বাঙালত্ব, কয়লার রঙেরই মতন, কখনো ঘোচে না। হঠাৎ একদিন জেনে ফেললে উনি নিশ্চয়ই খুব লজ্জা পাবেন, আমার সামনেই এই সব কথা বলেছেন বলে। কিংবা রেগেও উঠতে পারেন, যদি ভাবেন আমি আত্মগোপন করে ওঁকে ঠকিয়েছি। কিন্তু আত্মগোপন করার প্রশ্ন ওঠে না। প্রথম দিন কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেনি, আমিও কিছু বলিনি। লোককে কি ডেকে ডেকে বলতে হবে যে আমি বাঙাল, আমি বাঙাল!

ঐ বাড়িটির সূত্রেই আমি আর এক জায়গায় টিউশানি পেয়ে গেলাম। প্রাইভেট টিউশানির জগতে এরকম একটা শৃংখলাবদ্ধ ব্যাপার আছে।

এই বাড়িটি নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রীটে, আমার বাড়ির কাছে হয় বলে, আমার পক্ষে সুবিধাজনক। আগেরটা ছেড়ে আমি এইটাই নিলাম। মাইনেও অনেক বেশী, তিরিশ টাকা। আমার প্রায় বড়লোক হয়ে যাবার মতন অবস্থা।

কিন্তু এ বাড়িতেও কণ্টক আছে। গৃহকর্তা খুব লম্বা চওড়া চেহারার বিশাল পুরুষ, নাকের তলায় শেয়ালের ল্যাজের মতন পুরুষ্টু গোঁফ। গলার আওয়াজ জলদ গম্ভীর।

তিনি প্রথম দিন আমার রীতিমতন একটা ইন্টারভিউ নিলেন। ইস্কুলে কোন্ পরীক্ষায় কত নম্বর পেয়েছি, ম্যাট্রিকে কোন ডিভিশান, আমার বাবার লেখাপড়া কদ্দুর ইত্যাদি প্রশ্ন থেকে শুরু করে—ভবিষ্যতে আমি কি হতে চাই, তা পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে পছন্দ করলেন। তারপর দিলেন তাঁর শর্ত।

তিনি বললেন, তিনি এক কথার মানুষ, মাসের ঠিক এক তারিখে মাইনে দেবেন। গ্রীষ্ম এবং পুজোর সময় সাতদিন করে ছুটি। কিন্তু মাঝখানে কোনোদিনই হঠাৎ ছুটি নেওয়া যাবে না। এবং প্রতিদিন ঠিক তিন ঘণ্টা পড়াতে হবে। সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে ন'টা! এর এদিক ওদিক হওয়া চলবে না।

আমি রাজি হয়ে গেলাম। একটি আট বছরের ছেলে, একটি তের বছরের মেয়েকে পড়াতে হবে এক সঙ্গে। দু' একদিন পড়িয়েই বুঝতে পারলাম, মেয়েটি কোনোদিনই পাস করবে না, আর ছেলেটি এতই বুদ্ধিমান যে ঠিক মতন পড়াশুনো করলে ম্যাট্রিকে স্ট্যান্ড করবে। ছেলেটির নাম সুবোধ, মেয়েটির নাম ছন্দা।

এই দুজনকে এক সঙ্গে পড়ানো খুবই অসুবিধেজনক। কিন্তু একজনকে পড়িয়ে ছুটি দিয়ে আর একজনকে পড়ানোও চলবে না। অভিভাবকের হুকুম, দু'জনকেই

সাড়ে তিন ঘণ্টা পড়াতে হবে। পড়ানো কিংবা আটকে রাখা।

ছেলেটি দারুণ ছটফটে। তব্ ওকে আমার খ্ব ভালো লাগে। অঙ্ক দিলে চোখের নিমেষে করে ফেলে। ডিক্টেশন দিলে বানান ভুল করে না। কিন্তু আমি একট্ অন্যমনস্ক হলেই সে ঘর থেকে পালিয়ে যেতে চায়। আর মেয়েটি পড়াশুনো না করে আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

ছেলেটিকে আটকে রাখার জন্য আমি একটা করে গল্পের বই নিয়ে যাই। সে তাতে বেশ আটকে থাকে। আর মেয়েটিকে আমি বলি, পড়ার বই থেকে পাতার পর পাতা টুকতে। তার তো এমনিতেই কিছু হবে না—হাতের লেখাটা অন্তত ভালো করুক।

প্রথম টিউশানিটা নিয়ে আমি বন্ধ্বান্ধব বা বাড়ির কারুকে কিছুই বলিনি। বাড়িতে বলিনি, কারণ টাকাটা আমি সম্পূর্ণ নিজে খরচ করতে চাই। মায়ের কাছ থেকে যে দু-একটা টাকা হাত খরচ মাঝে মাঝে পাই, সেটাও যাতে বন্ধ না হয়। আড্ডা দিয়ে সাড়ে ন'টা দশটার সময়ই বাড়ি ফিরি তখন—কেউ কিছু বুঝতে পারে না।

বন্ধুদের বলিনি লজ্জায়। কারণ, বন্ধুরা আর কেউ তো টিউশানি করে না। নিয়মিত আড্ডায় যাই না কিংবা আড্ডা থেকে হঠাৎ উঠে যাই দেখে ওরা অবাক হয়ে অনেক প্রশ্ন করে। আমি মিথ্যে কথার ফুলঝুরি ছড়াই।

শুধু রেণুর কাছেই একদিন কথায় কথায় বলে ফেললাম। ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে এত সব গল্প মনের মধ্যে টগবগ করে যে কারুকে না বলে কতদিন আর থাকবো।

রেণু বললো, তুই প্রত্যেক দিন সন্ধ্যেবেলা ওখানে যাস্?

—হ্যাঁ।

—আর যেতে হবে না—

—কেন?

—আমি বলছি।

রেণু গম্ভীরভাবে হুকুমের সুরে এই কথা বলে। আমিও গম্ভীরভাবে উত্তর দিই, এটা মানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

রেণু বললো, তুই কিন্তু আমার একটা কথাও মানিস না। অথচ কি যেন একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলি?

আমি বললাম, সেটা এই সব সাধারণ ব্যাপারে নয়। সেটা জীবনের অনেক গভীর ব্যাপার সম্পর্কে।

—এই সব কারণেই আজকাল তোর কবিতা লেখা হচ্ছে না!

—লিখবো লিখবো, অনেক লিখবো।

রেণু রাগ করে কয়েক দিন আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেয়।

এর মধ্যেই আমি টিউশানিতে ফাঁকি দিতে শুরু করেছি। ছাত্রছাত্রীকে অন্য কাজে ব্যস্ত রেখে আমি অনেক সময় নিজের কাজ করি।

পকেট থেকে ছোট্ট একটা নোট বই বার করে আমি কবিতা লেখার চেষ্টা করি। কবিতা মাথায় আসে না। রেণুকে চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে শুধু। একটা লাইনই বারবার লিখে যাই, রেণু, আমাদের কখনো ভুল বোঝাবুঝি হবে না।

এ বাড়িটি কিন্তু বেশ রহস্যময়। প্রায়ই ওপাশে দুপদাপ আওয়াজ শুনতে পাই। এক এক সময় মনে হয় কে যেন কাকে চাবুক দিয়ে খুব মারছে। একজন মহিলার গলার আর্ত চিৎকার ভেসে আসে। আমি সচকিতভাবে তাকিয়ে দেখি, আমার ছাত্রীটি

মুখ নীচু করে আছে। টপ টপ করে জল পড়ছে তার চোখ দিয়ে।

তখন আমার কোনো প্রশ্নেরই সে উত্তর দেয় না।

॥ ৬০ ॥

ও-বাড়িতে আমার টিউশানি বেশীদিন টিঁকলো না। কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, আমার ছাত্র-ছাত্রীর বাবা সন্ধ্যেবেলার দিকে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য পাগল হয়ে যান। তখন সারা বাড়ি জুড়ে তান্ডব শুরু করেন। এমনিতে ভদ্রলোককে দেখলে তো কিছু বোঝা যায় না বটেই, তাছাড়া, তিনি কোন এক সাহেব কোম্পানীতে ক্যাশিয়ারের কাজ করেন। রীতিমতন দায়িত্বপূর্ণ কাজ এবং বাড়িতেও তাঁর প্রচন্ড দাপট। তাঁর সেই দাপটই তাঁকে পাগলামির সীমায় ঠেলে দেয়। এক একটি পরিবারের কর্তা বাড়িতে যে-রকম একনায়কত্ব দেখান, পৃথিবীর বড় বড় ডিকটেটাররাও তাঁদের কাছে লজ্জা পাবেন। আমার ছাত্র-ছাত্রীর পিতাটিও সেই রকম।

তাঁর সেবা-যত্নের ব্যাপারে পান থেকে চুন খসলেই সাংঘাতিক কান্ড হয়ে যায়। প্রত্যেকদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরেই তিনি কোনো-না-কোনো ব্যাপারে খুঁত ধরতে শুরু করেন। তখন থেকেই তাঁর মেজাজ চড়তে থাকে। চাকর-বাকররা তটস্থ। সারা বাড়িতে একটা ছোটাছুটি পড়ে যায়। চায়ের মধ্যে দুধের সর থাকলে তিনি কাপসুদ্ধ ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং গর্জন করতে থাকেন। এবং এই তর্জন-গর্জনই শেষ পর্যন্ত পেঁছে যায় পাগলামিতে। ক্রুদ্ধ দাপাদাপি, জিনিস-পত্র ভাঙা চলতে চলতে এক সময় চাবুক নিয়ে স্ত্রীকে প্রহার।

এই সময়টা পড়ানো অসম্ভব। আমি চুপচাপ বসে থাকি, আমার ছাত্রী কাঁদে, ছোট ছেলেটা এত বোঝে না—এই ফাঁকে সে বাইরে খেলতে চলে যায়।

প্রথম প্রথম আমার অসম্ভব রাগ হতো। আমার মনে হতো, এই অত্যাচারী লোকটিকে পুলিসে ধরিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু, কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীকে মারে—কোনো তৃতীয় ব্যক্তি তাকে পুলিসে ধরিয়ে দিতে পারে কিনা আমি জানি না। এই লোকটির পাগলামির চিকিৎসা করবারও কোনো উপায় নেই। কারণ, ইনিই বাড়ির কর্তা, ইনি নিজে তো আর পাগলামির কথা স্বীকার করবেন না—তাহলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে কে?

অথচ, দিনের পর দিন এ ব্যাপার সহ্য করা যায় না। আমার মাথার ওপর চাপ পড়তে লাগলো। ছাত্র-ছাত্রীর মা সাধারণত নীচে নামেন না। একদিন মাত্র তাঁকে দেখেছিলাম, দেখেই আমার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠেছিল। মুখখানি দুর্গা প্রতিমার মতন, অথচ অদ্ভুত, উদাসীন—যেন পৃথিবীর কোনো কিছুতেই তাঁর কিছু যায় আসে না। সেই মুখখানা আমার সারা জীবন মনে থাকবে।

প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই টিউশানিটা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ঐ বাড়িটার কথা তারপরেও অনেকদিন ভেবেছি। ছাত্র-ছাত্রীর বাবাকে কিছু একটা শাস্তি দেবার জন্য আমার হাত নিশপিশ করতো। এমন কি একথাও ভাবতাম, একদিন ফাঁকা রাস্তায় লোকটিকে পেলে খুব মারবো। যেসব লোক কখনো মার খায় না—তারাই অপরকে অকারণে মারতে যায়। কিন্তু জীবনে অনেক শুভ ইচ্ছের মতন, এই ইচ্ছেটাও আমার অপূর্ণই থেকে গেল।

অন্য টিউশানি যোগাড় না করেই এটা ছেড়ে দিয়ে বেশ মুশকিলে পড়ে গেলাম। একবার অভ্যেস হয়ে গেলে ছাড়া খুব শক্ত। নিয়মিত কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে টিউশানির খোঁজ করি, যে-কোনো জায়গায় গিয়েই দেখি, আমার আগেই দশ-পনেরো জন সেখানে লাইন দিয়ে আছে। আমার হাত খরচের খুব টানাটানি, এই সময় আবার জুটলো বিনে মাইনের একটা পড়ানোর কাজ।

পাড়ার কয়েকটি ছেলে একদিন এসে বললো, কমরেড, আপনার ওপর একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এর আগে কিশোর বাহিনী বিক্রি করেছি। ধর্মতলা স্ট্রিটের পার্টি অফিসেও কয়েকবার গেছি, সুতরাং কোনো দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারি না। পার্টির কয়েকটি ক্যাডার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে—তাদের জন্য নাইট কোচিং-এর ব্যবস্থা হয়েছে, এক-একজন এক-একটা সাবজেক্ট পড়াবে। আমাকে পড়াতে হবে অংক।

ব্যবস্থা খুব সুন্দর, তখন কম্যুনিস্ট পার্টির সংগঠনমূলক কাজে বেশ মন ছিল। পাঁচ জন ছাত্র, তারা আমার চেয়েও বয়েসে বড়—বেশ কিছুদিন লেখাপড়া ছেড়ে দেবার পর এখন আবার ম্যাট্রিকটা পাশ করে নিতে চায়। এ-রকম বিনীত, ভদ্র ছাত্র পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। তারা মনোযোগ দিয়ে শোনে, যা করতে বলি করে। যদিও তাদের অংকে একেবারেই মাথা নেই, এক চান্সে পাশ করার আশা খুবই কম, তবু তাদের পড়াতে খুবই উৎসাহ বোধ করি।

ইংরেজি পড়াবার জন্য ভালো লোক পাওয়া যাচ্ছিল না। ওরা আমাকে বললো, একজন লোক খুঁজে দিতে। আমার মনে পড়লো সূর্যদার কথা। সূর্যদা যদিও কলেজের লেখা-পড়া সম্পূর্ণ করে নি, কিন্তু ইংরেজি খুব ভালো জানে। সূর্যদা কিন্তু আমার প্রস্তাব শুনে একটুও পাত্তা দিল না। বললো, যা যা, আমার অত সময় নেই! তাছাড়া পার্টির কাজ করতে চায় তো ম্যাট্রিক পাশ করে কি হাতি-ঘোড়া লাভ হবে? ওদের গ্রামে যেতে বল!

সূর্যদার তো কাজের মধ্যে শুধু সারাদিন বসে বই পড়া আর সন্ধ্যে হলেই বেরিয়ে পড়ে অনেক রাত্রে বাড়ি ফেরা। সূর্যদার চেহারাটা এখন যা দারুণ সুন্দর হয়েছে না, মনে হয়, রাজপুত্রের মতন। মেয়েরা সূর্যদাকে দেখলেই নিজেদের মধ্যে কানাকানি শুরু করে। রাজনীতিতে সূর্যদার এখন আর কোনো আগ্রহই নেই—আমি কখনো কিছু বলতে গেলেও হাত নেড়ে উড়িয়ে দেয়। দীপ্তিদির প্রেমে পড়েই সূর্যদার বারোটা বেজে গেল। কোনো রকম পলিটিক্যাল ট্রেনিং ছিল না তো, শুধু কিছু ইমোশন আর অ্যাডভেঞ্চারের মোহে...

আমাদের নাইট কোচিং-এর একটি মাত্র ছাত্র শেষ পর্যন্ত পাশ করেছিল। তাতেই আমরা দারুণ খুশী হয়েছিলাম। আদিনাথদা আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিলেন, গুড ওয়ার্ক। ভবিষ্যতে আরও কাজ করতে হবে।

স্থানীয় পার্টি সেলের প্রধান আদিনাথদা স্বভাব-গম্ভীর। তাঁর মুখ থেকে একটা প্রশংসা বাক্য পাওয়া কম কথা নয়।

ইতিমধ্যে আমি আরও দু-তিনটে টিউশানি জোগাড় করে ও ছেড়ে শেষ পর্যন্ত একটা খুব ভালো জায়গা পেয়ে গেছি। বস্তুত, প্রাইভেট টিউশানির জগৎ সম্পর্কে আমার যা অভিজ্ঞতা আছে, তা নিয়ে আমি একটা মহাভারত লিখে ফেলতে পারি। যাই হোক, তার মধ্যে এই বাড়িটির অভিজ্ঞতা অনন্য।

বাড়িটি ব্রিটিশ কাস্‌ল ধরনের। বিরাট বাগানের মধ্যে গম্বুজের মতন চুড়ো-

ওয়ালা তিন মহলা অট্টালিকা। বাগানে গেটের পাশে একটি লাল রঙের ঘর—সেখানে একজন লোক প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টাধ্বনি করে, পাড়ার লোকের ঘড়ি দেখার দরকার হয় না। যত্নে রক্ষিত বাগানটির এখানে-সেখানে পূর্ণাবয়ব নগ্ননারী মূর্তি—সাদা পুতুল, মাঝখানে একটি বিরাট ফোয়ারা। সেই বাগানে অপ্সরার মতন রমণীরা দেব শিশুদের সঙ্গে খেলা করে বিকেলবেলা।

দারোয়ান গেট খুলে দিলে আমি নতমুখে বাগানের পাশের মোরাম বিছানো রাস্তা দিয়ে গিয়ে দাঁড়াই একটা দরজার সামনে। বাগানে যেদিন বাড়ির মেয়েরা থাকে, সেদিন কোনোদিকে তাকাই না—যেদিন কেউ থাকে না, সেদিন আমি সাদা পাথরের নগ্ন পুতুলগুলোকে বার বার দেখি। কে বলেছে, নগ্নতা যদি শিল্পের অংশ হয়ে যায়, তবে তা যৌন উত্তেজনা আনে না? মিথ্যে কথা! আমি তো কৈশোর থেকেই, ইওরোপীয় শিল্পীদের আঁকা ছবির বইতে কিংবা বাগানের নগ্ন পুতুলের দিকে তাকালেই উত্তেজনা বোধ করেছি। শরীরে অতিরিক্ত উত্তাপ এসেছে। অবশ্য একা একা যৌন উত্তেজনা বোধ করা কোনো অপরাধ কিনা আমি জানি না। আমার তো তাতে কোনো ক্ষতি হয় নি!

সদর দরজার সামনে দাঁড়ালে একটি বৃদ্ধ চাকর এসে আমাকে ভেতরে নিয়ে যায়। বিশাল বিশাল হলঘরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে, একটা সরু বারান্দা পেরিয়ে তারপর একটি সুসজ্জিত ছোট ঘরের সামনে এসে পৌঁছোই। চাকরটি দরজা খুলে, চেয়ার টেবিল থেকে কাল্পনিক ধুলো ঝেড়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে বলে, মাস্টারবাবু বসুন।

সারা বাড়িটা একেবারে নিস্তব্ধ মনে হয়। মাঝে মাঝে শুধু একটা কাকাতুয়ার গলা শোনা যায়, কৃষ্ণ কোথায়? কৃষ্ণ কোথায়? পরিষ্কার উচ্চারণ।

একটু বাদে ঘোমটায় মুখ ঢাকা একজন দাসী কিছু খাবার ও জল রেখে যায়। তারপর চা। খালি পেয়ালা পিরীচ তুলে নিয়ে যাবার পর আমার ছাত্রটি আসে। টুকটুকে গায়ের রং—দশ বছর বয়েস, সে এসেই বলে, মাসমশাই, কাল অর্জুনের সঙ্গে মহাদেবের যুদ্ধ হয়েছিল। তারপর?

প্রথমে কিছুক্ষণ গল্প না বললে ছেলেটির পড়াশুনোয় মন বসে না। এইটুকু ছেলের নাম রূপেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, আমি রূপ বলে ডাকি।

এ বাড়ির নারী-পুরুষ সকলেরই রং ফর্সা, নাক টিকোলো, চোখের মণিতে সামান্য নীলচে আভা আছে। মনে হয়, বিশুদ্ধ আর্য রক্তের ধারাটি এই পরিবারে এখনো অক্ষুণ্ণ। সকলের ব্যবহার অত্যন্ত মার্জিত এবং নম্র। বাড়ির কারুর সঙ্গে যাতায়াতের পথে দেখা হলেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত জোড় করে ঘাড় হেলিয়ে বলবেন, মাস্টারমশাই ভালো আছেন? এরা কলকাতার খাঁটি আরিস্টোক্রাট বা অভিজাত বলতে যা বোঝায়, তারই অংশ। বেশ কয়েক পুরুষ ধরেই ধনী। বাড়িতে শিক্ষা-দীক্ষার চল আছে, বিরাট গ্রন্থাগার এবং অনেক রকম শিল্প সংগ্রহ এবং মাঝে মাঝেই উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর বসে। মানব সভ্যতার যা কিছু শ্রেষ্ঠ ফসল, শিল্প-সঙ্গীত-সাহিত্য এরা তার সমঝদার। এখানে সব কিছুই সুন্দর।

সন্ধেবেলা এদের বাড়িতে এসে আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। সারাদিন আমি যে জীবন কাটাই তার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে বেশ কিছুটা জড়িয়ে পড়েছি, স্টুডেন্টস ফেডারেশনের উৎসাহী কর্মী। ভুয়া স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আমরা সভায় মিছিলে সোচ্চার। নেহরু বলেছিলেন, কালোবাজারীদের ধরে ধরে ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাবেন। কিন্তু সব ল্যাম্পপোস্ট খালি পড়ে আছে, চতুর্দিকে

ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার্সদেরই রাজত্ব। ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল, পুলিস কোনোদিন আর জনসাধারণের ওপর লাঠি-গুলি চালাবে না। সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। অনেক সাধারণ লোক পথে-ঘাটে বলে ফেলে, এর চেয়ে যে বাবা ব্রিটিশ রাজত্বও ভালো ছিল। বুদ্ধ-বৃদ্ধারা ব্রিটিশ রাজত্বের বদলে বলে, কোম্পানির আমল। আমরা তখন আই পি টি এ-র এই গানটা গেয়ে বেড়াই:

মাউণ্ট ব্যাটেন সাহেব গো
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে
থুইয়া গেলা হায়।

আর একটি গান:

শোনো শিশুর পরিচয়
যেমন তেমন নয়কো শিশু
মস্ত মহাশয়
হিটলার তাহার জ্যাঠা ছিল
মুসোলিনী মেসো—ও—ও
(আর) মার্কিন দেশের মার্সাল মাসী
পাঠায় খেলনা ডলার ঝুমঝুম
নাকের বদলে নরুণ পেলাম
টাক ডুমাডুম ডুম—
জান দিয়ে জানোয়ার পেলাম
লাগলো দেশে ধুম!

এই সময় সন্ধ্যেবেলার ঐ মিত্তির বাড়ি তো খাঁটি একটি বুর্জোয়া দুর্গ। ওরা পরস্বাপহারী। ওদের সাতখানা কলিয়ারি, কলকাতায় একুশখানা ভাড়া বাড়ি, দু-ডজন যাত্রী বাস ইত্যাদি। অর্থাৎ নিজেরা কিছু পরিশ্রম করে না—অপরের পরিশ্রম করা টাকা দিয়েই এদের বিলাসিতা। কলেজ ক্যাণ্টিনে বসে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায় এদের বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ করতে পারি বটে, কিন্তু কাছাকাছি এসে কিছুতেই ঘৃণা প্রকাশ করতে পারি না। (তার কারণ অবশ্য এই নয় যে, আমি এদের বেতনভোগী।) এখানে আমি মাইনে পাই চল্লিশ টাকা, সেটা না পেলে আমি এমন কিছু অভাবে পড়বো না। কিন্তু একটা কথা বারবার মনে হয়, এদের হাতে প্রচুর টাকা ও প্রচুর সময় আছে বলেই কতকগুলি এমন জিনিসের চর্চা করতে পেরেছে, যা অত্যন্ত মোহময়। ব্যক্তিগত ব্যবহারে সভ্যতা, ভদ্রতার উচ্চ আদর্শ, সূক্ষ্ম রুচি এবং শিল্পকলার প্রতি আগ্রহ—এসব তো সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। এগুলো কি খুবই নগণ্য ব্যাপার? বলাই বাহুল্য, এই সমাজের মধ্যে অনেক লম্পট, জোচ্চোর, ক্রূর এবং রুচিহীন গর্দভও রয়েছে—তবু সভ্য সমাজে ব্যক্তিগত জীবনের যে সার্থকতা, তা এই অ্যারিস্টোক্র্যাটদের মধ্যেই দেখা যায়। যার উদাহরণ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি।

সেই সময় আমাদের 'মার্কসবাদী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি আখ্যা দিয়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখা হচ্ছিল। যুক্তি দিয়ে মানতে হলে তো রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি বলতেই হবে, কিন্তু মনে মনে বুঝি, এটা হাস্যকর।

একদিন আমার ছাত্র রূপ আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, মাস্টার্সাই, আপনি কি কবি?

আমি একটু চমকে গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলে বললাম,

কেন, এ কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?

—বলুন না।

কবিতা লেখা যেন একটা লজ্জার ব্যাপার। মানুষের চরম অযোগ্যতার পরিচয়। তাই নিজের মুখে স্বীকার করতে জিভ সরে না। আবার কেউ কবিতার কথা জিজ্ঞেস করলেই বুকের মধ্যে অস্পষ্ট সুগন্ধের মতন কিছু একটা ছড়িয়ে যায়, আগ্রহ বেড়ে যায় শত গুণ।

—তোমাকে কে বলেছে এ কথা?

—ছোটমা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছেন, আপনি কি কবি?

—ছোটমা কি করে জানলেন?

—ছোটমা জিজ্ঞেস করেছেন 'দেশ' কাগজে বাদলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় নামে যার লেখা বেরিয়েছে—সেটা কি আপনার?

আমি লজ্জারুণ মুখে কোনোক্রমে বললাম, হ্যাঁ। তার পরই কথা ঘুরিয়ে বললাম, এবার এই অঙ্কটা করে ফেলো তো!

রূপ তার কাকীমাকে ছোটমা বলে, এটা আমি জানি।

তবে, ওর কাকীমাকে আমি কখনো দেখি নি। এ বাড়ির মেয়েরা বাইরের লোকের সামনে বেরোন না। তবু সেই মহিলা আমার কবিতা সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছেন, তাই তাঁর চিন্তা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারি না। কি রকম দেখতে তাঁকে? বাগানে কয়েকজন মহিলাকে মাঝে মাঝে দূর থেকে দেখেছি, তার মধ্যে কেউ কি? কোন জন?

একটু বাদে কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে আমি আবার রূপকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার ছোটমা বুঝি অনেক বই পড়েন!

—অনেক অনেক! ছোটমা ফরাসী পড়তে পারেন, তা জানেন? ছোটমা সাহেবদের সঙ্গেও ফরাসীতে কথা বলতে পারেন—বাবার কাছে একজন এসেছিলেন...

শুনে আমি আরও চমৎকৃত হয়ে যাই! এত বড় ধনী পরিবারের ফরাসী জানা বিদুষী বধূ আমার কবিতার পাঠিকা? এর থেকে নোবেল প্রাইজ পাওয়া আর কি বড় কথা? আমার কবিতা মাঝে মাঝেই বিভিন্ন কাগজে ছাপা হয়, কেউ পড়ে বলে তো টের পাই না। বন্ধুরা মাঝে মাঝে তা নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি করে, আর অনেকে কোনো রকম উচ্চবাচ্চই করে না। রেণুই আমার একমাত্র প্রত্যক্ষ পাঠিকা।

রূপের কাকীমার চেহারাটা এখন আমার তরু দত্তর মতন মনে হয়। অবশ্য তরু দত্তর চেয়ে এঁর বয়েস নিশ্চয়ই বেশী হবে। আমার কবিতাটি কি ওঁর ভালো লেগেছে? মনে মনে তক্ষুণি ঠিক করে ফেলি, আমার এই অদৃশ্য পাঠিকাকে খুশি করার জন্য এর পরে আর একটা সাংঘাতিক কবিতা লিখতে হবে।

সেই সন্ধেবেলা আমার মনটা এত খুশী হয়ে থাকে যে, ছাত্র পড়ানো শেষ করে তক্ষুণি বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না। বরং ইচ্ছে করে, আমার কবিতার এই অভূতপূর্ব সৌভাগ্যের কথা এক্ষুনি ছুটে গিয়ে কারুকে বলি। কাকে আর বলবো, রেণুকে ছাড়া?

রেণুদের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, সেখানে চলছে তুমুল আড্ডা। বিকুর মাস্টারমশাই, যিনি এম-এ ক্লাসের ছাত্র, সেই রজতদা রয়েছেন, সুপ্রকাশদা এবং তাঁর দু'জন বন্ধু এবং রেণুও রয়েছে। সুপ্রকাশদার এক বন্ধু দারুণ মজার মজার গল্প বলতে পারেন, সবাই তা শুনে দারুণ হাসছে।

আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে চুপচাপ এক পাশে বসলাম, আমার দিকে কেউ মনোযোগ

দিল না বিশেষ। হাসির গল্পের মাঝখান থেকে শুনলে মজা পাওয়া যায় না বিশেষ। আমি তাই বসে রইলাম বোকার মতন মুখ করে।

রেণু এত হাসছে যেন এক্ষুণি ভেঙে পড়বে। আমার চোখের দিকে ওর তাকাবারও সময় নেই। আমার যে রেণুর সঙ্গে একটু আলাদা কথা বলার দরকার, ভীষণ দরকার!

সুপ্রকাশদার বন্ধু বললেন, তার পর সেই খরগোসটা যার গোঁফ আশু মুখুজ্যের মতন—

আবার এক দমক হাসি। হাসির পরিবেশ একবার জমে গেলে যে-কোনো রসিকতাতেই হাসি পায়—সবাই যেন হাসিতে মাতাল। আমি অন্য আবহাওয়া থেকে এসেছি বলেই মাঝে মাঝে শুধু কাষ্ঠ হাসি দিতে হচ্ছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি দশটা বাজে। মনে মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল। এরা নিশ্চয়ই একটুবাদে চলে যাবে—তারপর আমি রেণুর সঙ্গে দুটো কথা বলার সুযোগ পাবো। কিন্তু, হঠাৎ বুঝলাম, সুপ্রকাশদার দুই বন্ধুই সে রাত্রে ঐ বাড়িতেই থাকবেন। রেণু বললো, খেয়ে উঠে বাকি গল্পটা বলতে হবে কিন্তু। তাড়াতাড়ি ঘুমোলে চলবে না।

হঠাৎ ঈর্ষায় আমার বুকটা জ্বলে গেল। আমার জীবনে সেই প্রথম ঈর্ষা। মনে হলো, মেয়েরা কি অসম্ভব নিষ্ঠুর হয়। এক-এক সময় কত ভাব, আর এক-এক সময় নিদারুণ অবহেলা। রেণু কি আমার মুখ দেখে বুঝতে পারছে না, আমি শুধু ওর সঙ্গে কথা বলার জন্যই এসেছি! আমার দিকে তাকাবার মতন সময়ই তো ওর নেই।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চলি।

বিকু বললো, আর একটু বোস না!

—না, অনেক রাত হয়ে গেছে।

এখানকার আড্ডা ভেঙে গেল, ওরা এখন ওপরে খেতে যাবে। সবাই এসে দাঁড়ালো ঠাকুরদালানের সামনের বারান্দায়। রেণু আমাকে বললো, শঙ্কুদা কি দারুণ গল্প বলেন, না? হাসতে হাসতে একেবারে খিল ধরে যাচ্ছিল। শঙ্কুদার মতন এত বুদ্ধি আমি আর কারুর দেখিনি।

আমি রেণুর দিকে দু'এক পলক মাত্র তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিলাম।

রামায়ণের সীতাও জানতো না যে, ঋদ্ধিমান পুরুষ কখনো নিজের নারীর মুখে অপর কোনো পুরুষের প্রশংসা সহ্য করতে পারে না। রেণু তা কি করে জানবে!

আমি শুকনো গলায় বললাম, সত্যি, শঙ্কুদা দারুণ গল্প বলতে পারেন।

শঙ্কুদা রেণুর পিঠে হাত দিয়ে বললেন, এই, চল্ চল্, খুব খিদে পেয়েছে।

আমি তৎক্ষণাৎ ঠিক করে ফেললাম, রেণুর সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা করতে আসবো না।

যুক্তিহীন ঈর্ষা আমাকে এমনভাবে দগ্ধ করতে লাগলো যে, আমি আর অন্য কোনো কিছু চিন্তাই করতে পারলাম না। বারবার মনে হতে লাগলো, রেণু আমাকে ভালোবাসে না। আমার কবিতাও ভালোবাসে না, সব শুধু মুখেই। মেয়েদের কখনো বিশ্বাস করতে আছে?

বাড়ি গিয়ে খাওয়া-দাওয়ার পরও অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইলাম। সামনে খাতা আর কলম। বারবার মনে হতে লাগলো, রেণুকে একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দিই, ওর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। দু'চার লাইন করে লিখেও ছিঁড়ে

ফেলছি। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে, কপালের দু'পাশে শিরা দপদপ করছে। আজ সন্ধ্যেবেলাটা কত সুন্দর ছিল। সব নষ্ট হয়ে গেল।

তারপর ঠিক করলাম, চিঠি লেখারও আর দরকার নেই। রেণু চিন্তা করুক, কেন আমি ওর কাছে যাই না! ওকে কোনোদিন জানতেও দেবো না। রেণুকে আমি একেবারে ভুলে যাবো। আমি এর পর অনেক লিখবো, এত ভালো লিখবো যে, আমার নাম ওয়ার্ল্ড ফেমাস হয়ে যাবে। তখন রেণু বুঝবে, কাকে ও অবহেলা করেছে। ও কি ভাবে, ও ছাড়া আমার কবিতা কেউ পড়ে না?

অনেক কাটাকুটি করে আমি একটা কবিতা লিখতে আরম্ভ করলামঃ

আর্টেমিস, আমি সেই ক্রীতদাস......

তিন-চার লাইন লেখবার পরই বুঝতে পারলাম, কবিতাটা আমি রেণুকে ভেবেই লিখছি। আমার চোখের সামনে ফুলের মতন ফুটে আছে রেণুর মুখ।

॥ ৬১ ॥

কলেজের সোস্যাল ফাংশান হবে আগামী শনিবার, আমরা ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক শাখা থেকে একটা গীতি-আলেখ্য করবো, তার রিহার্সাল চলছিল। কয়েক দিন আগে ইউনিয়নের ইলেকশানে আমি ম্যাগাজিন এডিটর হবার জন্য দাঁড়িয়েও ভোটে হেরে গিয়ে একটু অপমানিত ও দুঃখিত হয়েছিলুম—তারপর আবার এই গীতি-আলেখ্যটা পরিচালনার ভার আমাকে দেওয়ায় আবার জীবনের স্বাদ ফিরে আসে।

গদ্য অংশটা মাইকে আমাকেই পড়তে হবে, তাই রিহার্সালের সময় আমি যতদূর সম্ভব গলাটা মোটা করার চেষ্টা করছি, এই সময় একজন এসে খবর দিল, আদিনাথদা আমাকে ডাকছে।

খবরটা দিয়ে ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বললো, এক্ষুনি!

রিহার্সাল বন্ধ রেখে আমাকে উঠে যেতে হলো। আদিনাথদা আমাদের কলেজের ছাত্র নন, কিন্তু কলেজের উল্টো দিকের রতন কেবিনে তিনি প্রায়ই এসে বসেন। শুধু আমাদের কলেজ নয়, কলকাতার অনেক কলেজের কাছাকাছি চায়ের দোকানেই আদিনাথদাকে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি এলেই কলেজ ইউনিয়নের সদস্যরা তাঁকে ঘিরে গোল হয়ে বসে।

আদিনাথদা পাজামা ও গেরুয়া পাঞ্জাবি পরে থাকেন, কাঁধে একটি ঝোলা। এই পোশাক ছাড়া আদিনাথদাকে আমি কখনো দেখিনি—মনে হয় এগুলো [illegible] থেকে খোলেন না। মাথা ভর্তি ঘন চুল, গায়ের রং কালো, নাকটি খড়্গের মতন উদ্যত—তাঁর চেহারায় একটা আলাদা বৈশিষ্ট আছে—দেখলেই মনে হয় এ আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতন নয়। আদিনাথদা সব সময়েই গম্ভীর, হাস্য পরিহাস পছন্দ করেন না, সব সময়েই কথাবার্তা এমন গুরুত্ব দিয়ে বলেন, যাতে মনে হয় এই পৃথিবীর ভালো মন্দ দেখার গুরু দায়িত্ব তাঁর ওপরেই ন্যস্ত।

আদিনাথদার হাতে একটা চুরুট, তার ডগায় এতখানি ছাই জমে আছে যে দেখলে অস্বস্তি হয়। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই জিজ্ঞেস করলেন, এর পর তোর ক্লাস আছে?

আমি বললাম, ক্লাস শুরু হয়ে গেছে—আমি আজ আর যাচ্ছি না।

—ভালো। কি করছিলি?

—সোস্যাল ফাংশানে আমরা একটা...রিহার্সাল দিচ্ছিলাম।

—গীতি-আলেখ্য? কথাটা শুনলেই কি রকম ন্যাকা ন্যাকা মনে হয়। আজকাল খুব চলছে। যাই হোক, ওই গীতি-আলেখ্যের থীমটা কি?

—গ্রামের একটি চাষী পরিবারের জীবন, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত।

—কে লিখেছে?

—কেউ ঠিক লেখেনি, মানে, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্তর গান—আর গদ্যটা আমিই—

—রবীন্দ্রনাথের গান? রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন গ্রামে গেছেন? চাষীদের জীবন যাত্রা দেখেছেন?

আদিনাথদার কথার উত্তরে আমি ঠিক যুক্তি খুঁজে পাই না—তবে, এমনিতে গান খুঁজতে গেলে ঠিক মতন গান পাওয়া এতই মুশকিল যে, রবীন্দ্র সঙ্গীতের কথাই মনে পড়ে যায়। বৃষ্টির দৃশ্যে আমি 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে' গানটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।

আদিনাথদা বললেন, যাক গে, রিহার্সাল দেবার আর দরকার নেই—সোস্যাল ফাংশান এবার হবে কিনা বলা যায় না।

আমি এবং আরও তিন চারজন আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, সোস্যাল হবে না? কেন?

আদিনাথদা গম্ভীরভাবে বললেন, দেশের যা অবস্থা, তাতে, এখন কি নাচ গান হই হল্লা করার সময়? চালের দাম কত?

সেই মুহূর্তে চালের দামের জন্য চিন্তা করার বদলে সোস্যাল বন্ধ হবার আশঙ্কাতেই মনটা বেশ দমে গেল। আর একটি ছেলে জিজ্ঞেস করলো, আদিদা, সোস্যালের জন্য ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে হল বুক করা হয়ে গেছে যে!

—হোক। ওসব নিয়ে এখন চিন্তা করার দরকার নেই। পরশুদিন স্ট্রাইক কল্ করা হচ্ছে। সিনেট হলের সামনে থেকে র‍্যালি হবে। পুলিস যদি সেকশন হাণ্ড্রেড ফরটি ফোর না তোলে তা হলে গোলমাল হতে পারে। তা হলে স্ট্রাইক কনটিনিউ করবে। এই অবস্থায় তোমরা সোস্যাল ফাংশানের কথা চিন্তা করছো কি করে সেটাই আশ্চর্য ব্যাপার। শোনো, আমাদের পার্টি লাইন এখন থেকেই ঠিক করা দরকার। স্ট্রাইক মানে শুধু মিছিল করে যাওয়াই নয়। এই প্রতিক্রিয়াশীল সরকার...

আদিনাথদা আমার দিকে ফিরে বললেন, বাদল, এখানে বোস। কালকের মিছিলের জন্য কয়েকটা নতুন শ্লোগান তৈরী কর। আমি সাবজেক্ট বলে দিচ্ছি।

যে-কোনো কারণেই হোক, তখন পর্যন্ত সরকার বিরোধী শ্লোগান অধিকাংশই ছিল হিন্দীতে—বাংলা শ্লোগান শাখাটি তখনও তেমন উন্নতি করেনি।

স্ট্রাইকের আগের দিন রাত্তিরে বাড়িই ফিরলাম না। মা কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না, অনেক বুঝিয়ে, অনেক মিথ্যে কথা বলে অনুমতি আদায় করলাম। পঙ্কজ এক রাত্তিরে আমাদের বাড়িতে ছিল, সুতরাং আমি পঙ্কজের বাড়িতে কি এক রাত্রি থাকতে পারি না? যদিও পঙ্কজরা তখন কলকাতায় নেই।

সারা রাত জেগে চললো আমাদের পোস্টার লেখা এবং দেয়ালে সাঁটা। শীতের রাতে নিস্তব্ধ কলকাতা। রাস্তা ঘাট খাঁ খাঁ করছে। এত রাতে কখনো এই শহরের দৃশ্য দেখিনি। যে-সব রাস্তা সারা দিন মানুষভর্তি দেখি, এখন সেখানে একটাও লোক নেই—এটা কেমন অদ্ভুত লাগে। মনে হয় যেন একটা শুকনো নদী—এক সময় উত্তাল জল ছিল। না, এ উপমাটা ঠিক নয়—কারণ রাত্রির রাজপথ বড় সুন্দর—দু'

পাশের আলোগুলো জ্বলছে, চকচক করছে কালো পিচ বাঁধানো রাস্তা—বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়। অনেক রাস্তাতেই এখনো গ্যাসের আলো আছে।

ভোর হবার পর আমরা আঠার-বালতি ও কাগজপত্র এক জায়গায় জমা করে রেখে নিমতলার দিকে চলে এলাম। এখানে অনেক দোকানেই এর মধ্যে কচুরি ও জিলিপি ভাজা হয়ে গেছে। গঙ্গাস্নান-যাত্রীদের জন্য এ পাড়ার দোকান সবচেয়ে আগে খোলে, সুজিত আমাদের এ খবর দিয়েছিল। মাত্র ছ' মাস আগে সুজিতের বাবা মারা গেছে—সেই সময় শ্মশানে এসে সে এদিকে ভোররাতের দৃশ্য দেখেছিল। হরিধ্বনি দিয়ে একদল লোক একটা মড়া নিয়ে যাবার সময় আমাদের মধ্যে একমাত্র সুজিতই সেদিকে তাকিয়ে প্রণাম করে।

মা বলেছিলেন, সকাল হতেই বাড়ি ফিরে যেতে। তবু ফেরা হলো না। বন্ধুরা সবাই মিলে আড্ডা দেওয়া শুরু করলে সেই আড্ডা প্রথম ভেঙে দেবার দায়িত্ব কেউ নিতে চায় না। একজন বাড়ি ফেরার নাম করলেই, আর সকলে তখন বাড়ি ফিরবে সেই জন্য কেউই বাড়ি ফেরার কথা উচ্চারণ করলো না। কচুরির দোকানের ঠিক উনুনের পাশটাতেই বেঞ্চি টেনে গুটিশুটি মেরে বসে গল্প করতে করতে আর সময় জ্ঞান থাকে না। মাঝে মাঝে চা আসে।

এক সময় হঠাৎ দেখি ন'টা বাজে। তা হলে তো আর বাড়ি ফেরার প্রশ্নই আসে না। দশটা থেকেই কলেজের গেটে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। ফরোয়ার্ড ব্লকের ছাত্র সংগঠন ছাত্র ব্লক তখন আমাদের স্টুডেন্টস ফেডারেশনের সঙ্গে খুব প্রতিযোগিতা করার চেষ্টা করছে। ওদের ছেলেদের কিছুতেই লীড নিতে দেওয়া হবে না।

সুতরাং মিছিল-টিছিল সেরে বিকেল বা সন্ধ্যেবেলার সময় বাড়ি ফেরা যেতে পারে। মা ভীষণ চিন্তা করবেন। দুপুরে না খেতে গেলে মা নিজেও দুপুরে খাবেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু বন্ধুদের কি এই কথা বলা যায়? ওরা নিশ্চয়ই আমাকে মায়ের আদুরে ছেলে বলে ঠাট্টা করবে। বিষ্ণুকে যেমন অনেকেই বলে। এক ছেলে হবার এই ঝামেলা! দিদির বিয়ে হয়ে গেছে—মা সেই জনাই সব সময় আমার ব্যাপারে পুতুপুতু করেন। যাই হোক, কি আর করা যাবে! পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি, মাকে মাঝে মাঝে এ রকম কষ্ট দেওয়া যায়। যতই আমার ওপর রাগ করুন, আমি এক সময় বাড়ি ফিরে গেলেই মা খুশী। সারাদিন দুশ্চিন্তার পরও তখন আর বকুনিতে জোর থাকে না।

যদি আর না ফিরি? কেন হঠাৎ এই কথাটা আমার মনে এলো, জানি না। তবু বার বার মনে হতে লাগলো, যদি আমি আর কোনো দিনই বাড়ি না ফিরি, তা হলে আজ আমার বাড়ির অবস্থা, আমার মায়ের অবস্থা কি হবে?

যদি আর না ফিরি, তা হলে রেণুর সঙ্গেও আর দেখা হবে না। আমার পকেটেই রয়েছে রেণুর একটা চিঠি। রেণু বেশীর ভাগ চিঠি লেখে রাত্তিরবেলায়। এ চিঠিতে ও লিখেছে, 'তুমি এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে? একবার চোখ চাইলেই দেখতে পাবে আমি তোমার পাশেই আছি।'...আমি মরে গেলেও কি রেণু আমার কথা ভাববে?

সেই সময় কিন্তু আমরা ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করিনি যে সেদিনকার স্টুডেন্টস র‍্যালিতে কোনো গোলমাল হবে। আদিনাথদা বোধ হয় জানতেন একথা, কিন্তু আমরা জানতাম না।

বিভিন্ন কলেজ থেকে ছাত্ররা এসে জমায়েত হয়েছে সিনেট হলের সামনে—একদল পুলিস গোলদীঘির এক কোণে ব্যারিকেড করে দাঁড়িয়ে আছে। একশো চুয়াল্লিশ ধারা

জারি করা হয়েছে, আমাদের আর এগুতে দেওয়া হবে না। কয়েকজন ছাত্র নেতা কথা বলছে পুলিস অফিসারদের সঙ্গে। আমরা মুহুর্মুহু শ্লোগান দিচ্ছি, ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়, ভুলো মাৎ, ভুলো মাৎ! ছাত্র সমাজ দিচ্ছে ডাক, কায়েমী স্বার্থ নিপাত যাক্!

কে প্রথম ইঁট ছুঁড়লো, আমি লক্ষ্যই করিনি। হঠাৎ দেখলাম, দারুণ ইঁট ছোঁড়া শুরু হয়ে গেছে। ইঁটের সঙ্গে অনেকের চটি জুতোও। পুলিস লাঠি চার্জ করলো। আমরা একটু পেছনে ছিলাম, হুড়োহুড়ি শুরু হতে দেখে মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল—প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে রাস্তা সারাই হচ্ছিল—সেখানকার খোয়া তুলে নিয়ে মারতে লাগলাম পুলিসের দিকে। ফট ফট করে আওয়াজ হতে লাগলো টিয়ার গ্যাস সেলের—আমি তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, কে একজন আমার হাত ধরে বললো, এই, ইডিয়েট, দৌড়ো—

তাকিয়ে দেখি জীমূত। জীমূতের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি, এর মধ্যে ও এক মুখ দাড়ি রেখেছে। ততক্ষণে আমার সাঙ্ঘাতিক চোখ জ্বালা করতে শুরু হয়েছে—চোখ খুলে তাকাতেই পারছি না—জীমূত আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলো বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটে। রাস্তার চাপা কল থেকে রুমাল ভিজিয়ে এনে আমার চোখে চেপে ধরলো।

সারা রাত রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তি, তারপর চোখে টিয়ার গ্যাসের ঝাপটা একটু বেশী লেগেছে, মনে হলো, আমি অন্ধ হয়ে গেছি। জীমূতের হাত জড়িয়ে ধরে ব্যাকুলভাবে বললাম, আমার চোখ, আমার চোখ!

জীমূত ফের রুমাল ভিজিয়ে এনে বললো, ভালো করে চেপে ধরে থাক্, একটু জ্বালা করবে, আর কিছু ভয় নেই—

তখন ছাত্র পুলিসে খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে গেছে। গোলদিঘির এপাশে আর পুলিস এগুতে পারছে না। পুলিসকে এক জায়গায় আটকাতে পারাটাই ছাত্রদের কাছে বিরাট জয়ের ব্যাপার মনে হচ্ছে—দলে দলে ছেলে ছুটে যাচ্ছে সেদিকে।

আমার চোখটা একটু ভালো হবার পর জীমূত বললো, বাড়ি যাবি? আমহার্স্ট স্ট্রীটের দিকে রাস্তা ফাঁকা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর তুই?

—আমার কিছু ঠিক নেই।

—তুই এখানে থাকবি?

—আরও গোলমাল বাড়বে মনে হচ্ছে। এখন বাড়ি চলে গেলে সেফ সাইডে থাকা যাবে।

—তুইও বাড়ি চল্ তা হলে।

—তুই যদি থাকিস, আমিও তা হলে থাকতে পারি।

সিদ্ধান্ত নিতে আমার এক মুহূর্তও দেরী হলো না। তখন সেখানে যুদ্ধক্ষেত্রের মতন উত্তেজনা। এ ছেড়ে জীমূত যদি না যেতে চায়, আমি একা যাবো?

বললাম, চল্, সামনে এগিয়ে দেখি।

একদল ছেলে ইঁট ছুঁড়তে ছুঁড়তে পুলিস বাহিনীকে তাড়িয়ে প্রায় মেডিক্যাল কলেজের গেটের কাছে নিয়ে গেছে। জীমূত আর আমি রণ-উন্মাদনায় তাদের সঙ্গে যোগ দিতে গেলাম।

বেশী দূর এগুনো গেল না। কয়েকটা ট্রাম অনেকক্ষণ থেকেই থেমে ছিল, ইঁট

ছোঁড়ার সময় আমরা ট্রামের আড়ালে আশ্রয় নিচ্ছিলাম—হঠাৎ একটা ট্রাম থেকে ধোঁয়া বেরুতে লাগলো। তারপরই জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে আগুন। স্বাধীনতার পর কলকাতার রাস্তায় সেই প্রথম ট্রাম পুড়লো।

বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই দেখলাম, আমাদের চতুর্দিকেই পুলিস। উল্টোদিক থেকেও যে পুলিসের গাড়ি আসতে পারে, এটা আমরা কেন ভাবিনি, কে জানে!

জীমূত বললো, ক্যান্টিনের দিকে চল্—

সঙ্গে সঙ্গে দু' জনে দৌড়োলাম। কলুটোলার কাছে একদল ছাত্র দু'দিকের পুলিসের মাঝখানে একেবারে ফাঁদে পড়ে গেছে—আমরা সিনেট হলের সিঁড়ির নীচে ডান পাশ দিয়ে ক্যান্টিনের দিকে যাবার চেষ্টা করলাম—কারণ, এইটুকু জানি, পুলিস ইউনিভার্সিটির ভেতরে ঢুকবে না।

ক্যান্টিনের দিকে যাবার জন্য লোহার লাল গেটটা কে যেন বন্ধ করে দিয়েছে। এ সময় কোনোদিন তো এই গেট বন্ধ থাকে না। আমরা দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে চিৎকার করতে লাগলাম, এই খুলে দাও, শিগগির খুলে দাও—

এমন সময় দড়াম করে একটা শব্দ হলো। আমি ভেবেছিলাম, লোহার গেটটা উল্টোদিক থেকে কেউ খুলছে বুঝি, সেই শব্দ। তারপরই দেখি, লোহার গেটে একটা গোল গর্ত—আমার থেকে বিঘৎ খানেক দূরে।

জীমূত আছড়ে মাটিতে পড়ে আমার পা ধরে টেনে বললো, শুয়ে পড়! শুয়ে পড়! ফায়ার করছে!

আমিও নীচে শুয়ে পড়লাম সঙ্গে সঙ্গে। আরও কয়েকটা গুলির শব্দ।

জীমূত দাঁতে দাঁত চেপে বললো, শালারা এলোমেলো ফায়ার করছে!

আমি আস্তে আস্তে ওপর দিকে তাকালাম। কোনো সন্দেহ নেই, একটা গুলি ওই লোহার দরজা ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। আমার এত কাছ দিয়ে! মৃত্যু এত কাছে এসেছিল? মনে পড়লো, সকালবেলার চিন্তাটা। যদি আর বাড়ি না ফিরি? গুলিটা আর মাত্র এক বিঘৎ ডান দিক দিয়ে এলে আমার আর কোনোদিন বাড়ি ফেরা হতো না।

জীমূত ফিসফিস করে বললো, পড়ে যাবার সময় আমার হাঁটুতে দারুণ জোর লেগেছে, দৌড়োতে পারবো কিনা সন্দেহ।

আমি বিবর্ণ মুখে বললাম, সত্যি গুলি ছুঁড়ছে?

—তুই কি ভেবেছিলি, স্বদেশী পুলিস বলে বন্দুকে গুলির বদলে লজেঞ্চুস ভরে ছুঁড়বে?

আমি আর কোনো কথা বলতে পারলাম না। আমার শরীরটা ভীষণ দুর্বল লাগছে। এত ভয় আমি জীবনে কখনো পাইনি। মৃত্যুর এত কাছাকাছি এসে আমি সাহসের সঙ্গে দাঁড়াতে পারি না। এ ভাবে কেন মরবো? আমি কি শুধু একটা সংখ্যা?

মাটিতে পড়ার সময় আমার বুক পকেট থেকে অনেক কাগজপত্রও পড়ে গেছে। তার মধ্যে রয়েছে রেণুর চিঠিটা। খানিকটা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আমি কাগজপত্রগুলো তুলে নিই।

আমি কোনক্রমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও জীমূত ধরা পড়ে যায়। সব সুদ্ধু একশো চুয়ান্নজন ছাত্রকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছিল, এছাড়া দু'জন নিহত ও এগারোজন আহত। পরের দিন আবার ধর্মঘট ডাকা হলো, আবার গোলমাল। এইরকমভাবে চললো পাঁচদিন। ততদিনে আমরা জেনে গেছি, আদিনাথদা প্রমুখ ছাত্র নেতাদের এরকমই পরিকল্পনা ছিল। ধর্মঘট ডেকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে জনজীবনকে স্তব্ধ

করে দিতে হবে। পুলিস যদি অত্যাচার চালায়—সেটাও এক হিসেবে লাভ—তাহলে জনসাধারণের মন এই প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের বিরুদ্ধে বিষিয়ে উঠবে, এই সরকারের পতন ঘটাতে তাহলে আর দেরি হবে না—ওদিকে গ্রামে গ্রামেও মুক্তাঞ্চল তৈরি করার প্রস্তুতি চলছে। আমরাও এই নীতিকে সঙ্গত মনে করেছিলুম।

পাঁচদিন পর যখন মনে হলো সাময়িকভাবে আমাদেরই জয় হয়েছে, সংবাদপত্রগুলি সরকারের সমালোচনায় মুখর, রাস্তার লোকেরাও বিরক্তি প্রকাশ করছে, তখন আপাতত আমরা বিরতি ঘোষণা করলাম। চাপে পড়ে সরকার ছাত্র-বন্দীদের মুক্তি দিল, আমাদের পক্ষ থেকে তুলে নেওয়া হলো ধর্মঘট। নিহতের সংখ্যা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো তিনজন।

যারা মারা গেছে, তাদের কারুকেই আমি চিনি না। কিন্তু যখনই মনে পড়ে যে আমিও ওদের একজন হতে পারতাম, তখনই আমার শরীরে একটা শিহরণ খেলে যায়। রোমকূপ খাড়া হয়ে ওঠে। মাথায় গুলি লাগা অবস্থায় আমি পড়ে থাকতাম ক্যান্টিনের গেটের সামনে—পুলিসের গাড়ি আমার শরীরটা ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে যেত, তারপর কাটাকুটি করে পাঠিয়ে দিত মর্গের বরফ ঘরে। একসময় মুখ থেকে চাদরের ঢাকা সরিয়ে দেখে মা কিংবা বাবা বলতেন, হ্যাঁ, এরই নাম ছিল বাদল।

মৃত্যু সম্পর্কে আমার মধ্যে একটা রোমান্টিক মোহ আছে, কিন্তু এর সঙ্গে তার কিছুই মেলে না। কেন এই মৃত্যু? কবে দেশের অবস্থা বদলাবে কি বদলাবে না, তার জন্য আমি গুলি খেয়ে রাস্তায় মরে পড়ে থাকবো? জন্মেছি যখন, তখন এত সহজে এ পৃথিবী ছাড়বো না। লেনিন যদি উনিশশো পাঁচ সালের প্রথম বিপ্লবে গুলি খেয়ে মরে যেতেন, তাহলে তাঁর নামও কি আমরা কেউ মনে রাখতাম এখন!

মাঝে মাঝে আত্মহত্যার চিন্তা এখনো আমার মাথায় ঘোরে। কিন্তু সেই মৃত্যু যেন একটা শিল্পের মতন। মৃত্যু যেন একটি নারী, যেমন রেণু, তার কাছে আমি চিরকালের মতন আশ্রয় পেতে চাই, যাতে আমাকে আর কেউ বিরক্ত না করে। রেণুকেও যা বলতে পারি না, মৃত্যুকে তাই বলবো, তুমি আমাকে নাও। 'সুখে আমায় রাখবে কেন, রাখো তোমার কোলে'।

আসলে এসব কল্পনাবিলাস। আমি একটি কাপুরুষ ছাড়া কিছুই নয়। যখনই মৃত্যুর খুব কাছাকাছি যাই, অমনি দারুণ ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসি। তবু মনে মনে ঠিক করে ফেললুম আমি এরকম কাপুরুষই থাকবো—অকারণে পুলিসের গুলি খেয়ে মরা ঠিক কাজের কথা নয়। আরও ঠিক করে ফেললুম, রাজনীতি করতে গেলে আমাকে খুব শিগগির শিগগির নেতা হয়ে উঠতে হবে। নেতারা চট্ করে মরে না। জেল-টেল খাটা যেতে পারে, কিন্তু গোলমালের সময় সাধারণ ছেলেদের ক্ষেপিয়ে পাঠাতে হবে সামনের দিকে। চিরকালই এরকম কিছু সাধারণ ছেলে মরে—কিন্তু আমি এদের থেকে আলাদা। সূর্যদাকে দেখলুম তো—কত কষ্ট সহ্য করেছে, কতবার লাইফ রিস্ক করেছে—অথচ এখন তাকে কেউ চেনেই না। নেতা হতে পারেনি কিনা। ওদিকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের এক বিখ্যাত নেতা এখন র‍্যাশনিং ডিপার্টমেন্টের ইন-চার্জ হয়ে ঘুষের টাকায় লাল হচ্ছেন—তবু কেউ তাঁকে কিছু বলছে না, কারণ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি যে!

কলেজের সোস্যাল ফাংশান বন্ধ হয়ে গেল, তার বদলে এই আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে এবং বন্দী মুক্তি উপলক্ষে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একটা সভা হলো। সেই সভায় আদিনাথদার অনুরোধে আমি একটা ছোট্ট বক্তৃতা দিলাম। আমার পা ঠক্‌ঠক্

করে কাঁপছিল এবং সামনের সারির কমরেডদের চোখের দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছিল না—তবু কোনোরকমে উতরে গেলাম প্রথম পরীক্ষায়।

আমাদের কলেজের পাঁচজন ছাত্র ধরা পড়েছিল, তারা কলেজে এসে এমন রোমহর্ষক গল্প বলতে লাগলো যে রীতিমতন হিংসেই হতে লাগলো আমাদের। পুলিসের মারটার না খেয়ে শুধু একবার জেলটা ঘুরে আসতে পারলে দারুণ একটা অভিজ্ঞতা হতে পারতো।

কয়েকদিন ধরেই এই সব গল্প এবং আলোচনা চলছিল, ক্লাস করার দিকে একটুও মন নেই, বই খাতা নিয়ে সোজা নরেন কেবিনে এসে উপস্থিত হই। ক্লাসে প্রক্সি দেবার ব্যবস্থা ঠিকঠাক আছে। এর মধ্যে নির্মল একদিন এসে আড্ডার সুর কেটে দিল। নির্মলের ডান হাতখানা প্লাস্টার করা, মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি।

আমরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিরে, তোর হাত ভাঙলো কি করে?

নির্মল গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, আমি সাতদিন হাসপাতালে পড়ে ছিলুম, তোরা কেউ একবার দেখতেও গেলি না।

আদিনাথদা সেদিন হাজির ছিলেন নরেন কেবিনে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় হাত ভাঙলো? পাড়ায়?

নির্মল হঠাৎ খিঁচিয়ে উঠলো আদিনাথদার মুখের ওপর। আদিনাথদার সঙ্গে এইভাবে কথা বলার কথা আমরা কেউ কল্পনাই করতে পারি না। তাছাড়া নির্মল বলতে গেলে আদিনাথদার ঘনিষ্ঠতম শিষ্য।

নির্মল বললো, কোথায় ভেঙেছে আপনি জানেন না? ধর্মঘটের প্রথমদিন আমি আপনার পাশে ছিলাম না?

আদিনাথদা মৃদু গলায় বললেন, তা ছিলে। কিন্তু শেষের দিকে তোমাকে দেখতে পাইনি।

—দেখবেন কি করে? আমি তো দেখলাম, পুলিস ঘিরে লাঠি তুলতে না তুলতেই আপনি খেঁচে রড দিলেন। পেছন ফিরে আর একবারও তাকিয়েছিলেন?

সবাই অপ্রস্তুত অবস্থায় চুপ করে গেল। আদিনাথদার নামে এরকম অভিযোগ দেওয়ায় কে কি বলবে ভেবে পেল না। আমি নিজেও সেদিন পালিয়েছিলাম বলে মনে মনে আদিনাথদাকেই সমর্থন করলাম। খামোকা পুলিসের লাঠির নীচে পড়ে পড়ে মার খাবার দরকারটা কি? যারা বোকা, তারাই মার খায়।

আদিনাথদা ঠাণ্ডা চোখে নির্মলের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমার হাতে কি ফ্র্যাকচার হয়েছে?

নির্মল সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ফের চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, আমাদের তাতিয়ে সামনে ঠেলে দিয়ে আপনারা সবাই কেটে পড়লেন, অ্যাঁ? গৌতমদাদের [illegible] তবু অ্যারেস্টেড হতে দেখলুম—আপনাকে তো কোনোদিন পুলিসের ধারে কাছেও যেতে দেখিনি।

আদিনাথদা বললেন, নির্মল চুপ করো। এসব কথা এখানে আলোচনা করা চলে না। শুধু এইটুকু বলে রাখছি, আমাকে শিগগিরই আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যেতে হবে, তাই আমি ধরা দিইনি।

নির্মল তবু চিৎকার করে বললো, ও তো গত এক বছর ধরে শুনছি! কিন্তু আমার যে হাত ভাঙলো, আবার পুলিসের খাতায় নামও উঠে গেল, তার কি হবে?

নির্মল সকলের দিকে ফিরে বললো, জানিস মাইরি, আমার বাবা হাউ হাউ করে

কাঁদছেন! বাবার অফিসে আমার চাকরি পাবার কথা ছিল—আর আমাকে কেউ চাকরি দেবে?

কম্যুনিস্ট হিসেবে একবার কেউ মার্কামারা হয়ে গেলে পুলিস রিপোর্টে তখন কারুর চাকরি হয় না। চাকরি পেলেও চলে যায়। কিন্তু নির্মল কলেজ থেকে বেরুবার আগেই চাকরি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে বলে ওর সম্পর্কে আমাদের একটু করুণা হলো। যদিও শুনেছি, নির্মলের বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ, ওর বাবা শিগগিরই রিটায়ার করবেন, তবু চাকরির মতন একটা সামান্য ব্যাপারের জন্য ভয় পেয়ে নির্মল আজ এখানে এসে এরকম চ্যাঁচামেচি করছে—এটা আমাদের মোটেই পছন্দ হয় না।

যত সময় যাচ্ছে, ততই নির্মল বেশী মাথা গরম করছে। রাগলে ও যে এত মুখ খারাপ করে, আমরা জানতাম না। নির্মল কিছু না বললে ওর নির্যাতনের জন্য আমরা ওকে সহানুভূতি জানাতাম—তার বদলে ও সকলের বিরক্তি আকর্ষণ করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত নির্মল যখন শালা, হারামীর বাচ্চা ইত্যাদি শুরু করলো, তখন আদিনাথদা উঠে পড়লেন। আমাদের কয়েকজনকে বলে গেলেন, ওর মাথা ঠাণ্ডা হলে আমার সঙ্গে পার্টি অফিসে দেখা করতে বলো।

আদিনাথদা চলে যাবার পর বীরেশ্বর ও আর কয়েকটি ছেলে নির্মলের কাঁধে হাত দিয়ে বললো, এই একটু বাইরে চল্, কথা আছে। এখানে চ্যাঁচামেচি করে লাভ কি?

আমহার্স্ট স্ট্রীটের একটা গলির মধ্যে ডেকে নির্মলকে একটা দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে দাঁড় করিয়ে বীরেশ্বর জিজ্ঞেস করলো, তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? তুই আদিনাথদাকে চ্যালেঞ্জ করছিস?

নির্মল বললো, কেন, আদিনাথদা কোন্ লাটের বাঁট যে তাকে কিছু বলা যাবে না? আমি মাটিতে পড়ে গেলুম, তা দেখেও পালালো—

বীরেশ্বর প্রচণ্ড এক ঘুঁষি মারলো নির্মলের মুখে। ভাঙা হাতখানা উঁচু করেই নির্মল আটকাতে গেল, পারলো না, রক্ত গড়িয়ে এলো ওর কষ বেয়ে। আর একখানা ঘুঁষি খেয়ে নির্মল মুখ নীচু করলো। তারপরই আবার লাল টকটকে চোখ তুলে বললো, তোদের আমি দেখে নেবো!

—ঠিক আছে, দেখে নিস্!

এর পরের মাস থেকেই নির্মল একটা আলাদা পার্টি খুলে ফেললো। তারপর আস্তে আস্তে কংগ্রেসের দালাল হয়ে পড়াশুনোই ছেড়ে দিল নির্মল, আমরা ওকে দেখলেই এড়িয়ে যাই।

আমার ছাত্র রূপ একদিন আমাকে বললো, মাস্'সাই, আজ কিন্তু পড়ানো হয়ে গেলেই চলে যাবেন না। ছোটমা আপনাকে বসতে বলেছেন।

—কেন?

—ছোটমা আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

সেই কথা শুনে প্রথম থেকেই এমন উত্তেজনা বোধ করতে লাগলুম যে পড়ানোতে আর মন বসাতেই পারি না। ঘন ঘন ঘড়ি দেখি। আজ কি একটু তাড়াতাড়ি পড়ানো শেষ করলে খারাপ দেখাবে? এ বাড়িতে সময়ের কড়াকড়ি কিছুই নেই। অনেকদিন আমার ব্যস্ততা থাকলে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট পড়িয়েও চলে যাই। তবু আজ আমি কিছুতেই নিজের মুখে বলতে পারলাম না, এবার পড়া শেষ।

একসময় দরজার পাশ থেকে এক মহিলা বললেন, আসতে পারি?

আমি এমন শশব্যস্ত হয়ে উঠলাম যে টেবিল থেকে একটা বই ও কলম পড়ে গেল, তক্ষুনি সে দুটো তুলবো না উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করবো—বুঝতে না পেরে একটা হাস্যকর ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় রইলাম।

রূপের ছোটমা বললেন, আপনি বসুন।

তিনি নিজেও বসলেন একটি চেয়ারে, হাত দিয়ে কোলের কাছের শাড়ি প্লেন করলেন, তারপর হাসিমুখে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

এ বাড়ির কোনো মহিলাকে আমি এত কাছাকাছি থেকে আগে দেখিনি। শুনেছি, এখানে এখনো পর্দা-প্রথা মান্য হয়, মেয়েরা বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলেন না। সেইজন্যই আমি অত্যন্ত বেশী সঙ্কুচিত হয়ে রইলাম। মহিলা কিন্তু অত্যন্ত সাবলীল, এমন কি কলেজের মেয়েরাও নতুন কারুর সঙ্গে আলাপের সময় যেটুকু জড়তা প্রকাশ করে—এঁর মধ্যে তার চিহ্নমাত্র নেই। ধনী পরিবারের বধূদের সাজ-গোজের আতিশয্য সম্বন্ধেও আমার মনে মনে একটা ধারণা ছিল—কিন্তু এঁর সঙ্গে তার কিছুই মেলে না। ইনি পরে আছেন একটি লাল পাড় সাদা শাড়ি, হাতে দু'গাছা চুড়ি, বাঁ হাতের অনামিকায় একটি আংটি, গলা ও কান খালি। মাথার চুল ছড়িয়ে আছে পিঠের ওপরে। সব মিলিয়ে কি সুন্দর রে বাবা! দম আটকিয়ে আসে যেন। গায়ের চামড়া মোমের মতন নরম ও মসৃণ, টলটলে চোখদুটির দৃষ্টি কি আশ্চর্য কোমল।

মনে মনে আমি ওঁর দিকে তাকিয়ে আছি অপলক, আসলে আমি সৌজন্যবশত ঈষৎ মুখ নীচু করে রয়েছি। একবার মাত্র দেখলেই এরকম মুখ আমার মনের চিত্র-শালায় সংগৃহীত হয়ে যায়—তখন আমি না তাকিয়েও দেখতে পারি। আমার ভেতরটা বড় বেশী রূপের জন্য কাঙাল। হঠাৎ আমার মনে পড়ে যায়, আমার জামায় একটা বোতাম নেই। সারাদিন চটি পরে ঘোরার জন্য আমার পা দুটো ধুলোময়, আমি এত সৌন্দর্যের কাছাকাছি বসে থাকার অযোগ্য। কেন মুখের ঘামটুকু অন্তত একটু আগে মুছে নিইনি? এখন কি মোছা যায়?

আমি নিজে থেকে কোনো কথা বলতে পারলাম না। উনি নিজেই বললেন, আপনাদের ব্যাঘাত সৃষ্টি করলাম না তো?

আমি বললাম, না, না—

আমার ছাত্র বললো, আমাদের পড়া হয়ে গেছে। ছোটমা, আমি যাই?

উনি বললেন, যাও। চন্দনের মাকে বলে দিও, ঠিক সাড়ে আটটায় দাদাবাবুর ওষুধ দিতে হবে।

তারপর উনি আমার দিকে হাসিমুখে আবার চেয়ে রইলেন। পূর্ণ চোখ মেলে বললেন, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

কিন্তু আলাপ তো এক তরফা হয় না। রাজ্যের লজ্জা এসে আমার জিভের ডগায় ভর করেছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মিটিং-এর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বলতেও আমি এত নার্ভাস হইনি। তাছাড়া কি কথা বলবো, আমি তো ওঁর সম্পর্কে কিছুই জানি না।

উনি বললেন, আমি কখনো কোনো কবিকে দেখিনি। খুব ছেলেবেলায় একবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম, তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথাও বলেছিলাম—কিন্তু আমার ভালো করে সে সব কথা মনে পড়ে না। বিয়ের পর অনেকদিন লখনৌতে ছিলাম তো। তারপর এই সেদিন যখন শুনলাম, খোকার মাস্টারমশাই একজন কবি—

আমি মরমে মরে গিয়ে বললাম, না, না, আমি বিশেষ কিছুই লিখিনি, এই সামান্য

দু' একটা—

আমি কবিতা লিখি বটে, কিন্তু আমি কি কবি! কবি বলতে যাদের বোঝায়—যেসব উচ্চ আদর্শের মানুষ ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ—তাঁরা কোথায় আর আমি কোথায়?

—আমি আপনার দুটো কবিতা পড়েছি। আপনার কোনো বই আছে?

—না।

—আচ্ছা, আপনি যে লিখেছেন, 'মুক্তিপিপাসু এক অরণ্য' এর ঠিক মানেটা কি?

অতিরিক্ত লজ্জা হঠাৎ আমার সব লজ্জা কাটিয়ে দেয়। অসহায়তার শেষ সীমায় এসে মানুষ যেমন আচমকা সাহসী হয়ে ওঠে। আমি মুখ তুলে সোজাসুজি তাকিয়ে বললাম, দেখুন, নিজের কবিতা বিষয়ে কোনো কথা বলতে আমার খুব লজ্জা করে। তাছাড়া আমি জানি, আমি এখনো কিছুই লিখতে পারিনি।

—খোকার মতন আপনি আমাকেও পড়াবেন? আমি শুধু কবিতা পড়বো।

—আমি?

—হ্যাঁ। ধরুন, সপ্তাহে তিনদিন। আমি বাংলা ভালো করে কখনো পড়িনি।

—আমি কি আপনাকে পড়াতে পারবো?

—কেন, আপনার সময় নেই? আপনি আমাকে কবিতা পড়ে পড়ে শোনাবেন, তাই নিয়ে আলোচনা করবেন—সারাদিন আমার তো কোনো কাজ নেই। দেখুন না, এত বড় বাড়ি, সব সময় নিঝুম হয়ে থাকে—আমি কি যে করবো এত সময় নিয়ে—আমি কবিতা পড়তে খুব ভালোবাসি, কিন্তু নিজে নিজে সব তো বুঝি না।

—আপনি তো ফরাসী ভাষা জানেন?

—সেও খুব সামান্য। চর্চা নেই তো—

—আপনি যদি চান, আমি আপনাকে পড়াবার জন্য একজন খুব ভালো লোক ঠিক করে দিতে পারি। আমাদেরই কলেজের একজন প্রফেসার—

উনি মুচকি হেসে বললেন, কেন আপনার বুঝি আমাকে পছন্দ হচ্ছে না? ছাত্রী হিসেবে আমি বুঝি—

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, না, না, সে কথা নয়। আমি আমার অযোগ্যতার কথা ভেবে বলছিলাম!

—আমি তো পরীক্ষা পাস করার মাস্টারমশাই চাইনি। এ বাড়ির মেয়েরা বা বউরা অনেকে ওস্তাদজীর কাছে গান বা বাজনা শেখে। মাস্টারমশাই রেখে পড়াশুনো করার রেওয়াজ নেই। কিন্তু আমার তো গানের গলা নেই—

আমি বললাম, আপনার গলার আওয়াজ ভারী সুন্দর।

সুন্দর কথাটা উচ্চারণ করতে পেরে আমার বুকটা অনেক হালকা হয়ে গেল। অনেকক্ষণ থেকেই আমার বুকের মধ্যে এই শব্দটা বেরিয়ে আসার জন্য আকুলি বিকুলি করছিল। আসলে আমি বলতে চাইছিলাম, আপনার সব কিছুই সুন্দর।

সহজাত আভিজাত্যে উনি এই প্রশংসাবাক্যের কোনো প্রতিবাদ করলেন না। একটুক্ষণ সময় নিয়ে তারপর বললেন, আপনি আমার নাম জিজ্ঞেস করেন নি, আমার নাম সুদেষ্ণা। আমি বোধহয় আপনার সমবয়েসীই হবো। সারাদিন কথা বলার মতনও কারুকে পাই না। আপনি আমাকে পড়াতে চান না?

—আপনি যদি বলেন—

—আজ নিশ্চয়ই আপনার অনেক দেরী করিয়ে দিলাম। কাল আবার আপনার

সঙ্গে কথা বলবো? আপনি বিরক্ত হন নি তো?

—না, না, কি আশ্চর্য!

এই ঘটনাটা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করলাম, তার একমাত্র কারণ, এটা একটা মরীচিকার মতন। সব মানুষের জীবনেই নিশ্চয়ই এরকম দু'একটা দুর্বোধ্য মরীচিকা আসে। এতে জীবনের পরিচিত নিয়মগুলো উল্টে পাল্টে যায়।

তার পরের দিন তো দূরের কথা, ঐ বাড়িতে আমি আরও ছ'সাত মাস পড়িয়েছিলাম, কিন্তু আমার ছাত্রের ছোটমা, ঐ সুদেষ্ণা দেবীর সঙ্গে আমার আর কোনোদিন কথা হয়নি। উনি আর নেমে আসেন নি নীচে, একটা খবরও পাঠান নি। এমন হতেই তো পারে যে অল্পবয়স্ক মাস্টারের কাছে ওঁর পড়াশুনো করার প্রস্তাবটা বাড়ির কারুর মনঃপূত হয়নি। কিন্তু আমাকে একটা খবর দেওয়া কি উচিত ছিল না? তাতে অসুবিধে ছিল? অবশ্য, এর পরে বাড়ির কারুর ব্যবহার আমার প্রতি একটুও পাল্টায়নি। মাঝে মাঝে আমি আমার ছাত্রের দিকে উৎসুকভাবে তাকিয়ে থাকতাম, যদি সে কিছু বলে। বলেনি, আমিও জিজ্ঞেস করিনি।

সুদেষ্ণা দেবীকে আর একদিন মাত্র দূর থেকে দেখেছিলাম বাগানে। আরও কয়েকজন মহিলা ছিলেন সেখানে। স্পষ্ট মনে হলো, আমাকে দেখেই যেন উনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন—চলে গেলেন মর্মর মূর্তির আড়ালে।

আমি সেদিন অত্যন্ত আহত ও অপমানিত বোধ করেছিলাম। এরকম ব্যবহারের মানে কি! একবার আমাকে স্বর্গে তুলে আবার ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া। আমার মনে হলো, পৃথিবীর যেখানে যা সৌন্দর্য, সব কিছুরই সৃষ্টি হয়েছে শুধু আমাকে কষ্ট দেবার জন্য।

॥ ৬২ ॥

পরপর অনেকগুলো ট্রাম থেমে আছে সারবন্দী হয়ে। প্রথমে মনে হয়েছিল ট্রাফিকের গোলযোগ, তারপর এক সময় শোনা গেল, ইউনিয়নের একজন নেতাকে গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে ট্রাম-কর্মীরা অকস্মাৎ ধর্মঘট ডেকেছে। ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রিসভা চালাতে পারেননি, ডাক্তার বিধান রায়কেও গোড়া থেকেই বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা হচ্ছে নানারকম। তবু বছর তিনেকের মধ্যেই তিনি অনেকটা সামলে নিলেন। শক্ত মানুষ হিসেবে তাঁর নাম রটে গেছে। খবরের কাগজগুলিতে প্রায়ই সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর খবর বেরোয়, দেশের এক বিরাট সংখ্যক লোকের ধারণা সুভাষচন্দ্র ফিরে এলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।—প্রায় প্রত্যেক [illegible]সাতেই সমবেত সংগীত শোনা যায়, "আজি তুমি কোথা নেতাজী—"।

সূর্য আর দীপ্তি একটা ট্রামে পাশাপাশি বসে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় বিভোর হয়েছিল। অনেকক্ষণ বাইরের দিকে লক্ষ্য করেনি। এক সময় খেয়াল করলো, সমস্ত ট্রামে তারা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই।

দীপ্তি বললো, কিছু একটা হয়েছে বোধহয়, চলো নেমে পড়ি।

সূর্য জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলো। কিছুই বুঝতে পারলো না। অবাকও হলো না। হঠাৎ যানবাহন বন্ধ হয়ে যাওয়া এখন আর তেমন বিস্ময়কর কোনো ব্যাপার নয়। সে নির্লিপ্তভাবে বললো, গুলিগোলার শব্দ তো কিছু শুনতে

পাচ্ছি না।

দীপ্তি হাতের ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চলো—

সূর্য বললো, নেমে কি হবে? এরকম ফাঁকা জায়গা আর কোথাও পাওয়া যাবে না। একসময় না একসময় তো চলবেই!

—তা বলে কতক্ষণ এখানে বসে থাকবো?

—যতক্ষণ কেউ এসে আমাদের নামিয়ে না দেয়? দু'জনে নিরালায় গল্প করার মতন ফাঁকা জায়গা তো কোথাও নেই কলকাতা শহরে!

দীপ্তি হেসে বললেন, সব জায়গাতেই মানুষের চোখ!

—আমার তো বেশ ভালো লাগছে। বসুন না।

দীপ্তি আবার বসে পড়লেন। কিন্তু কথাবার্তায় আর মন বসাতে পারলেন না। ট্রাম থেমে থাকার কারণটা জানতে না পারলে অস্বস্তি হয়।

একটু বাদেই ড্রাইভার ও কন্ডাকটররা ফিরে এলো। সূর্য আর দীপ্তিকে দেখে প্রায় ধমকের সুরে বললো, আপনারা এখনো বসে আছেন? যান, নেমে যান।

সূর্য লঘুভাবে বললো, আমাদের টিকিটের পয়সা ফেরৎ দেবেন না? সেইজন্যই তো বসে আছি।

—টিকিট ফেরৎ হয় না।

—একদিন একটা বাস খারাপ হয়ে গিয়েছিল, সেই বাসের কন্ডাকটর কিন্তু আমার টিকিটের পয়সা ফেরৎ দিয়েছিল।

—সে ঐসব সর্দারজীরা যা খুশী করুক, আমাদের কম্পানি নিয়ম কানুনে চলে।

—নিয়ম কানুনে চললে কি হঠাৎ ট্রাম থামে?

—আপনি নামবেন?

সূর্য দু'দিকে মাথা নেড়ে বললো, না।

দীপ্তি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, কি হচ্ছে কি? চলো!

সূর্য যেন বেশ একটা মজা পেয়ে গেছে। বললো, দাঁড়ান না। এক্ষুনি নেমে কি হবে? ট্রাম তো আবার চলবে মনে হচ্ছে।

—সব ট্রাম এখন ডিপোয় যাবে। প্যাসেঞ্জার নেওয়া হবে না।

—আমরাও যদি ডিপোতে যাই?

সূর্য সাধারণত খুব কম কথা বলে। কিন্তু আজ তার মেজাজ বেশ হাল্কা আছে বলেই এই সব অবান্তর কথাবার্তায় সে বেশ আনন্দ পাচ্ছে মনে হয়। ট্রামকর্মীরা অবশ্য তার ঠাট্টা খুব একটা উপভোগ করছিল না—একজন তাদের কোম্পানির কয়েকটা নিয়ম পড়ে শোনাতে আরম্ভ করলো পর্যন্ত। দীপ্তি আর সূর্য নেমে পড়লো।

সূর্য বললো, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন? এরা এদের কম্পানি সম্পর্কে খুব গর্বিত, বাসওয়ালাদের ঘৃণা করে।

দীপ্তি বললেন, তাতো হবেই। চারদিকে দ্যাখো না, কেউ এখন বিলিতি কম্পানিতে চাকরি পাওয়াটাকে বিরাট একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার মনে করে! ইংরেজি বলার ঝোঁকও এখন অনেক বেড়ে গেছে।

—পরাধীন আমলে জানতাম দেশ কাকে বলে। এখন দেশ কথাটার মানে আর বুঝতে পারি না। আপনি পারেন?

—আমার মনের মধ্যে কিন্তু একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে। তবে সেটা স্বপ্নের দেশ বলে মনে হয়। কোনোদিনই বোধহয় সেখানে পৌঁছুতে পারবো না।

—পণ্ডিত নেহর্ জেনারাল ইলেকশানের কথা ঘোষণা করেছেন। তখন আবার খুব একচোট দেশ দেশ শোনা যাবে। কম্যুনিস্ট পার্টিও পার্লামেন্টারি ডেমক্রেসি আপাতত মেনে নেবে মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ। আমাদের স্কুলের এক টিচারের মুখে শুনলাম হীরেনবাবু দাঁড়াচ্ছেন—তোমাদের পাড়া থেকেই। আচ্ছা সূর্য, তোমার আর এসবে অংশ নিতে ইচ্ছে করে না?

—নাঃ!

—তাহলে তুমি কি করবে?

—কেন, বেশ ভালোই তো আছি।

দীপ্তি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার প্রশ্ন করলেন, সূর্য, তোমার শংকরদাকে মনে আছে?

—কোন শংকরদা?

—এক সময় আমাদের পার্টিতে ছিলেন। মনে নেই? তোমরা যে ডাকাতিতে গিয়েছিলে, উনিও তো সেই দলে—

—ও হ্যাঁ। উনি আমাকে কখনো ঠিক পছন্দ করেন নি। জেলেও দেখা হয়েছিল।

—উনি এখন কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। খুব ভালো করছেন শুনেছি। আমাকে বলছিলেন ওদের সঙ্গে যোগ দিতে।

—না। আপনার যাওয়া হবে না। এখন অন্য কারুর কথা থাক্।

দীপ্তি মুখ তুলে তাকালেন সূর্যর দিকে। সূর্য অপলকভাবে চেয়ে আছে।

দীপ্তি সেদিকে বেশীক্ষণ চোখ রাখতে পারলেন না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে লাজুক গলায় বললেন, এ ভাবে আর কতদিন চলবে?

সূর্য বললো, যতদিন না আপনি আমাকে তাড়িয়ে দেবেন!

মেঘলা মেঘলা বিকেল, বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, একটি চমৎকার দিন। সূর্য আর দীপ্তি হাঁটছে চৌরঙ্গি দিয়ে। আজ আর গাড়ি ঘোড়া পাবার আশা নেই। সূর্য দীপ্তির তুলনায় অনেকখানি লম্বা। দীপ্তি কখনো রঙীন শাড়ী পরা কিংবা সাজগোজ পছন্দ করেন না—তবু তাঁকে তাঁর বয়েসের তুলনায় কমবয়েসী মনে হয়। অবশ্য সূর্যর সঙ্গে তাঁর বয়েসের পার্থক্য বোঝা যাবেই।

সূর্য বললো, চলুন, ময়দানে গিয়ে একটু বসবেন?

—তুমি যে বলছিলে, তোমার ক্ষিদে পেয়েছে? বাড়ি চলো বরং, তোমাকে খাওয়াচ্ছি।

—এখন আর ক্ষিদে নেই।

দীপ্তি ময়দানের দিকে তাকালেন। এখানে সেখানে ঝোপ ঝাড়। অসময়েই অন্ধকার হয়ে এসেছে। অশ্বারোহী আউটরামের মূর্তিটা ঝাপসা দেখা যায়।

একটু চিন্তিতভাবে দীপ্তি বললেন, জায়গাটা ভালো নয় শুনেছি। সাহেব মেমরা আসা বন্ধ করায় গুণ্ডাদের খুব উপদ্রব বেড়েছে। সেদিনই কার কাছে শুনলাম, সন্ধ্যে-বেলাতেই এই মাঠের মধ্যে একটি মেয়েকে কারা খুন করেছে।

সূর্য বললো, তাই নাকি?

দীপ্তি হঠাৎ হেসে বললেন, অবশ্য তুমি পাশে থাকলে আমার কোনো ভয় নেই।

সূর্যও হেসে আলতোভাবে দীপ্তির পিঠে হাত ছুঁইয়ে বললো, তা হলে চলুন।

—তুমি কি আমাকে আপনি বলা কিছুতেই ছাড়বে না?

—এমন অভ্যেস হয়ে গেছে।

—আজ থেকেই শুরু করো।

—চেষ্টা করবো।

হঠাৎ দীপ্তি সূর্যর পাশ থেকে সরে গিয়ে দ্রুত ট্রাম লাইন পার হয়ে যেতে লাগলেন একা। সূর্য ঠিক বুঝতে পারলো না ব্যাপারটা। দ্রুত পা চালিয়ে এসে বললো, কি হলো?

দীপ্তি চকিতে একবার পেছনে তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন, তুমি এখন আমার সঙ্গে এসো না। আমি পুকুরটার পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।

—কেন?

—যা বলছি শোনো না—

সূর্য মন্থরভাবে হাঁটতে হাঁটতে বিস্মিতভাবে কয়েকবার পেছন ফিরে তাকালো। অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পেল না। শুধু একজন প্রৌঢ় লোক অপস্রিয়মান দীপ্তির দিকে কৌতূহলী সরু চোখে তাকিয়ে আছেন বলে মনে হয়। প্রৌঢ়টির কাঁধে মুগার চাদর, একটি সাত আট বছরের মেয়ের হাত ধরে আছেন। তিনি বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন এদিকে।

পুকুরের পাশে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দীপ্তি রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন। সূর্য সেখানে এসে জিজ্ঞেস করলো, কি হলো?

—কিছু না।

—তবে হঠাৎ ওরকম ভাবে চলে এলেন যে? কি হলো, আমাকে বলবেন না?

—কিছুই হয়নি। চলো, এখান থেকে অন্য কোথাও যাই।

—আপনি কারুকে দেখে যেন পালিয়ে এলেন মনে হলো! কে?

দীপ্তির মুখখানা আরক্ত, হঠাৎ কোনো কথা বলতে পারছেন না। তারপর মৃদু গলায় বললেন, ওখানে আমার বড় জামাইবাবু দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে ভীষণ ভালোবাসতেন।

—আপনার জামাইবাবু? আপনি কথা বললেন না?

—আমার লজ্জা করলো!

—কেন? আমি সঙ্গে রয়েছি বলে?

দীপ্তি সূর্যর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন। এ কথা অবধারিতভাবে সূর্যর মনে এলো যে মাত্র দু'এক মিনিট আগেই দীপ্তি বলেছিলেন যে সূর্য পাশে থাকলে তাঁর কোনো ভয় নেই। তার ঠিক পরেই সূর্য পাশে থাকার জন্যই তিনি নিজের জামাইবাবুর সঙ্গেও কথা বলতে পারলেন না।

সূর্য একটু থমকে গেল। ভুরু কুঁচকে বললো, আমি পাশে থাকলে কথা বলায় দোষ কি?

—তুমি বুঝতে পারো না?

—কি বুঝবো?

দীপ্তি নিজেকে চাপতে পারলেন না। বেশ অভিমান আর ঝাঁঝ মিশিয়ে জোরে জোরে বললেন, তুমি কিছুই বুঝতে পারো না? গত দু'বছর ধরে আমি কোনো আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করি না, কারুর সঙ্গে মিশি না, আমি যে কি করেছি, তা আমি নিজেই জানি না। সূর্য, তুমি আমার এ কি করলে?

সূর্যর মনে হলো, আকাশটাতে নোংরা কালি ঢালা। বাতাসে বিষ।

দীপ্তি আবার বললেন, আমার দিদিরা আমাকে চিঠি লেখেন—আমি কারুকে উত্তর দিই না। জামাইবাবু আমাকে এত ভালোবাসতেন, ওঁর সঙ্গে চোখাচোখি হতেও

কথা বলতে পারলাম না। দিদির মেয়ে রুনু সঙ্গে ছিল, ও যদি আমাকে দেখে থাকে—কি ভাবলো বলো তো?

সূর্য কর্কশভাবে বললো, আমরা কি কোনো অপরাধ করেছি? কি অপরাধ?

—আমরা বনে জঙ্গলে বাস করি না। আমরা বাস করি সভ্য সমাজে। সেখানে থেকে আমরা অদ্ভুত একটা অসামাজিক কাজ করছি না? তুমি আমার ছোট ভাইয়ের বয়েসী, আমরা দু'জনে যে-ভাবে আছি—

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে সূর্য বললো, এসব সমাজ টমাজ আমি গ্রাহ্য করি না।

—তুমি গ্রাহ্য না করলেও আমি কি সব কিছু এড়াতে পারি? আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাইকে কি বাদ দিয়ে বাঁচা যায়? সূর্য, আমি তোমাকে কোনো দোষ দিচ্ছি না। আমি নিজেই তো কিরকম হয়ে গেছি। তোমাকে বাধা দেবার শক্তিও আমার নেই। আমি এখন কি করবো বলো তো?

—দীপ্তিদি, আপনি একটা কথার শুধু জবাব দিন। আমরা কি আত্মীয়স্বজনের ইচ্ছেমতন বাঁচবো, না নিজেদের ইচ্ছেমতন বাঁচবো? আমি আপনাকে ভালোবাসি। আমি আপনাকে চাই। এতে অন্য কার কি বলার আছে? আমার চেয়ে আপনার বেশী আত্মীয় কে? বেশী বন্ধু কে?

—কিন্তু ঐ যে বললাম, এটা তো জঙ্গল নয়। এখানে অনেক মানুষকে এক সঙ্গে নিয়ে বাঁচতে হয়—সেইজন্যই এর নাম সমাজ।

—চুলোয় যাক সমাজ। এ পৃথিবীতে এক লক্ষ মানুষ মিলে আপনাকে যতখানি ভালোবাসতে পারে, আমি তার চেয়েও বেশী ভালোবাসি আপনাকে। আমি কারুর বাধা মানবো না।

—রাগ করো না। লক্ষ্মীটি, রাগ করো না। তোমার রাগ কি সাংঘাতিক আমি জানি। তোমার রক্ত গরম, তুমি রাগের মাথায় ভাবো যে গোটা পৃথিবীটাই তুমি উল্টে পাল্টে তছনছ করে দিতে পারো! কিন্তু তা তো হয় না!

—ঠিক আছে, আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই। তাতে তো কারুর আপত্তি থাকতে পারে না।

—তা হয় না।

—কেন হয় না? পৃথিবীতে কি বয়সের তফাৎ থাকা সত্ত্বেও কারুর বিয়ে হয় না? দেয়ার আর প্লেণ্টি অব ইনস্‌টানসেস্‌—

—তুমি একটু মাথা ঠাণ্ডা করবে?

—আমি অন্যায় কিছু বলছি? আমি যদি আপনাকে বিয়ে করতে চাই, তাতে কারুর কোনো আপত্তি থাকতে পারে কি?

—যদি আমার থাকে?

—আপনার?

হঠাৎ সূর্যর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। এ কথাটা সে চিন্তাই করেনি। সে একরোখা ধরনের ছেলে, একই সঙ্গে বিভিন্ন দিকের কথা চিন্তা করতে পারে না। সে ভেবেছিল লোকলজ্জাই যখন বাধা, তখন তার উপযুক্ত ব্যবস্থার নাম বিয়ে। কিন্তু দীপ্তির দিক থেকেও যদি বাধা থাকে—

আহতভাবে সে বললো, আপনি আমাকে চান না?

দীপ্তি সূর্যর হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি তোমার মনে দুঃখ দিয়েছি! শোনো, আমি সে কথা বলিনি। তোমাকে ছাড়া আমি এখন বেঁচে থাকার কথা ভাবতেই

পারি না। ছি ছি ছি, আজ আমি কি বোকার মতন ব্যবহার করেছি তোমার সঙ্গে। জামাইবাবুকে দেখে আজ আমার মনের মধ্যে এমন একটা গোলমাল হয়ে গেল—আমি যখন বাচ্চা মেয়ে তখন থেকে জামাইবাবু আমাদের...উনি ঠিক আমাদের বড় ভাইয়ের মতন...দিদির মেয়ে ঝুনুকে আমি এত ভালবাসি—আজ ওকে দেখেও একটু আদর করলাম না, পালিয়ে এলাম—ঠিক যেন কলঙ্কিনীর মতন মুখ ঢেকে পালিয়ে এলাম—হঠাৎ মনে হলো, আমি কি হয়ে গেছি!

—পালিয়ে এলেন কেন?

—এটা তো যুক্তিতর্কের ব্যাপার নয়। মনের মধ্যে যা হয়, তা কি আগে থেকে ঠিক করা থাকে? গুরুজনদের সামনে আজকাল আমি চোখ তুলে চাইতেই পারি না। জামাইবাবু যদি বলতেন, ছি ছি, তুমি এ কি করলে? তখন আমি কি উত্তর দিতাম? উনি যদি তোমাকেও অপমান করে কিছু বলতেন? উনি সেরকম মানুষই নন, হয়তো কিছু বলতেন না—

—আপনি লোকের কাছে আমার পরিচয় দিতে লজ্জা পান কেন?

—এ পরিচয় দেওয়া যায় না।

—তাহলে একটা সোজা কথা বলুন। আমাকে বিয়ে করতে আপনার আপত্তি আছে?

—এ সব কথা কি এইরকমভাবে আলোচনা করা যায়? তুমি যে বসবে বলেছিলে? চলো কোথাও বসি।

—না, আগে এটা ঠিক হয়ে যাক।

—এখনো তোমার রাগ কমেনি? আমি তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবো?

—আমার বাবা আমার কোনো বিষয়ে আপত্তি করেন না। বাবাকে আমি আজই জানাবো। আমার দিক থেকে কোনো অসুবিধে নেই। আপনি আপনার দিকটা ভালো করে ভেবে দেখুন। তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব—

দীপ্তি ব্যাকুলভাবে বললেন, আমি কিছু ভাবতে পারছি না। আমাকে এক্ষুনি কিছু ভাবতে বোলো না। তুমি অত রাগ রাগ চোখে তাকিয়ো না আমার দিকে।

সূর্য মুখ নীচু করে বড় নিশ্বাস ফেলে বললো, দীপ্তিদি, আমার আর কেউ নেই। আমি অন্য কিছুই জানি না, অন্য কিছুই আমার এখন ভালো লাগে না। আপনি আমাকে দূরে সরিয়ে দেবেন না।

॥ ৬৩ ॥

বাদল বাইরের ঘরে তার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল। আজ সারা দুপুর বৃষ্টি হয়েছে, এখন একটু থামলেও আকাশ মেঘলা অন্ধকার। আজ আর বিকেল হলো না, দুপুরের পরই সন্ধ্যে। এই বৃষ্টির মধ্যেই এসে হাজির হয়েছে পঙ্কজ, ভাস্কর আর বিষ্ণু।

বিষ্ণু শিগগিরই বিলেত যাচ্ছে, অক্সফোর্ডে ভর্তি হবার সুযোগ পেয়েছে। তারপর ব্যারিস্টারিও পাস করে আসবে। বিষ্ণু পড়াশুনোতে বরাবরই ভালো, কলেজে ঢোকার পর একেবারে বইয়ের পোকা হয়ে গেছে। ছেলেবেলায় তার যে শখ ছিল আবিষ্কারক হওয়ার—সে সব ঘুচে গেছে কবেই, এখন সে ছাপার অক্ষরের মধ্যে বিশ্ব পরিভ্রমণ করে। ভাস্কর চেষ্টা করছে খড়গপুরের আই আই টি-তে ভর্তি হওয়ার—

পঙ্কজই শুধু বাদলের সঙ্গে এম এ পড়বে। বি এ-র রেজাল্ট এখনো বেরোয়নি।

বন্ধুরা এখন অনেকটা বিচ্ছিন্ন—এই রকম ছুটিছাটার দিনেই আড্ডার টানে এসে এক জায়গায় জড়ো হয়। বাদল আর ভাস্করের হাতে সিগারেট জ্বলছিল, এই সময় বড়বাবু বাইরে থেকে ফিরলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওরা জ্বলন্ত সিগারেট দুটো ছুঁড়ে দিল সোফার নীচে।

বড়বাবুর মুখখানা পরিশ্রান্ত ও বিষণ্ণ। কিছুদিন ধরেই তাঁর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। তবু এই ঝড় বাদলার দিনেও তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। প্রত্যেক দিন বিকেলবেলা বাগবাজারের অনাথ আশ্রমটিতে তাঁর যাওয়া চাই। অনাথ আশ্রমের একটি ছেলে এ বছর স্কলারশিপ পেয়ে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছে, এ নিয়ে বড়বাবুর কী গর্ব! কত লোককে যে শুনিয়েছেন এ কথাটা—তার ঠিক নেই। যেন ছেলেটি তাঁর নিজের হাতের সৃষ্টি।

বড়বাবু বললেন, বাদল, তোর কাছে খুচরো পয়সা আছে? রিক্সাওয়ালাকে পাঁচ আনা পয়সা দিতে হবে—

চার বন্ধুই পকেটে হাত দিল। এদিকে সোফার তলা থেকে জ্বলন্ত সিগারেটের ধোঁয়া উঠে আসছে কুণ্ডলি পাকিয়ে, ওরা দারুণ সন্ত্রস্ত। বাদল পয়সা দিতে বেরিয়ে গেল। বড়বাবু প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী? রেজাল্ট বেরুচ্ছে কবে?

ভাস্কর বললো, এই তো, জুনের সেকেন্ড উইকেই—

বড়বাবু একটু দাঁড়িয়ে ওদের সঙ্গে টুকিটাকি দু-একটা কথা বলে ভেতরে চলে গেলেন। সূর্যর কোনো বন্ধু কোনোদিন এ বাড়িতে আসে না। বাদলের বন্ধুদের তিনি চেনেন।

বাদল ফিরে আসার পর ভাস্কর বললো, উঃ, তোর পিসেমশাইকে দেখলেই কি রকম ভয় ভয় করে রে!

বাদল বললো, কেন? বড়বাবু তো কোনোদিন বকুনি টকুনি দেন না!

পঙ্কজ বললো, তা দেন না বটে! কিন্তু এমন একটা ব্যক্তিত্ব আছে যে সামনে দাঁড়ালেই কি রকম যেন কুঁকড়ে যেতে হয়।

ভাস্কর বললো, ওঁর চেহারা কিংবা ব্যবহার দেখলেই বোঝা যায় বনেদী লোক।

বাদল বললো, বড়বাবু কিন্তু মোটেই বনেদী বাড়ির ছেলে নন। ওঁর লাইফ হিস্ট্রিটা যদি শুনিস, দারুণ ইণ্টারেস্টিং! উনি নিজের বাবা মা-কে কখনো চোখেও দেখেননি, অনাথ ছেলে যাকে বলে—সারা জীবন স্ট্রাগল্ করে—

ভাস্কর বললো, তুই বড়বাবুর লাইফ হিস্ট্রিটা লিখে ফ্যাল না!

—আমি কি করে লিখবো! আমি নিজেও তো সব ঘটনা জানি না—মা-র মুখে যে-টুকু শুনেছি—বড়বাবুকে তো সব কথা জিজ্ঞেস করতে পারি না—সবচেয়ে ভালো হতো, উনি নিজে যদি একটা অটোবায়োগ্রাফি লিখতেন—

—ওঁর কি লেখা টেখার হ্যাবিট আছে?

—মাঝে মাঝে ডায়েরি লেখেন। ইচ্ছে আছে একদিন লুকিয়ে পড়ে ফেলবো—এখনো চান্স পাইনি।

বিষ্ণুর পছন্দ হলো না এই কথাটা। সে একটু দুঃখিতভাবে তাকালো বাদলের দিকে। বিষ্ণুকে আরও দুঃখিত করে ভাস্কর জিজ্ঞেস করলো—হ্যাঁ রে, সূর্যদার মা নাকি বাঈজী ছিল?

এই প্রশ্নে বাদল হঠাৎ একটু রেগে উঠে বললো, তোকে কে বলেছে?

—এসব কথা বেশীদিন চাপা থাকে না।

—যদি তা সত্যিও হয়, তাতে কি আসে যায়?

—সে কথা কি আমি বলেছি? আমি জিজ্ঞেস করছি, সত্যি কি না!

—সূর্যদার মা একজন আর্টিস্ট ছিলেন।

—বড়বাবু তাকে বিয়ে করেছিলেন? না এমনিই—

বিষ্ণু বললো, ছিঃ,-এসব কি হচ্ছে কি? এই ভাস্কর, চুপ করবি?

বাদলের মুখখানা লালচে হয়ে গেছে। তার সূর্যদা সম্পর্কে সে অত্যন্ত স্পর্শ-কাতর। সূর্য সম্পর্কে কেউ সামান্য অপমানজনক ইঙ্গিত করলেই সে দারুণ রেগে যায়। চড়া গলায় বললো, আমি লক্ষ্য করছি, ভাস্করটা আজকাল সব সময় খারাপ কথা বলতে ভালোবাসে।

ভাস্কর রীতিমতন অবাক হবার ভঙ্গি করে বললো, যা বাবা! আমি কি করলাম? যা শুনেছি, সেটাই সত্যি কিনা জিজ্ঞেস করছি।

—তোর অত সত্যি মিথ্যে নিয়ে মাথা ঘামাবার কি দরকার?

ভাস্কর কারুর বকুনি সহ্য করার পাত্র নয়। যখন সে দেখলো, অন্য তিন বন্ধু তাকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে, তখন সে রুখে দাঁড়ালো। বিদ্রুপের ভঙ্গি করে বললো, যা, যা, ন্যাকামী করিস না! যা ট্রুথ, তা গোপন করে লাভ কি? এ কথা আজ সবাই জানে যে সূর্যদার জন্মের ঠিক নেই বলেই এই রকম সব যা-তা কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে।

—কি যা-তা কাণ্ড করছে?

—দীপ্তি সরকারের সঙ্গে কী স্ক্যান্ডাল করছে তোরা শুনিস নি? আমার ছোড়দা বলছিল, সূর্যদাকে আগে যারা চিনতো—তারা কেউ ওর সঙ্গে দেখা হলেও আজকাল কথা বলে না।

বাদল দৃপ্ত গলায় বললো, তার কারণ পৃথিবীতে বেশির ভাগই বোকা লোক। তারা কথা না বললেও সূর্যদার কিছু যায় আসে না! কারুকে ভালোবাসা কোনো পাপ নয়।

—এর নাম ভালোবাসা?

—নিশ্চয়ই! তুই ভালোবাসার কি বুঝিস?

ভাস্কর বাঁকাভাবে বাদলকে বললো, তুই এর মধ্যেই ভালোবাসার অনেক কিছুই বুঝে গেছিস দেখছি! তাই আজকাল সব সময় তোর উড়ু উড়ু ভাব।

—দ্যাখ ভাস্কর, আমি সূর্যদা সম্পর্কে কোনো খারাপ কথা শুনতে চাই না। তুইও তো এক সময় সূর্যদার দারুণ ভক্ত ছিলি—

—সেই সূর্যদা আর এখনকার সূর্যদা এক নয়। আই ফিল সরি ফর হিম। কত সম্ভাবনা ছিল—শুধু শুধু একটা মেয়ের জন্য—

বিষ্ণু বললো, সূর্যদাকে দেখলে আমার কেন জানি না ওয়েদারিং হাইটস-এর হীথক্লিফ-এর কথা খুব মনে পড়ে। সূর্যদা যেন একটা প্রতিশোধ নিতে চাইছে—

—কিসের প্রতিশোধ?

—তা আমি জানি না।

পঙ্কজ বললো, ভাস্কর, তুই কি বলতে চাস, ঠিক খুলে বল তো!

ভাস্কর আর একটা সিগারেট ধরিয়ে শান্ত মেজাজে বললো, আসলে ব্যাপার কি

জানিস, আমরা সবাই সূর্যদাকে হিংসে করি। যে লোক সমাজের কোনো নিয়ম মানে না, যা খুশী তাই করে—আমরা তাকে নিন্দে করি। আমরাও কিন্তু মনে মনে ওই রকমই হতে চাই—আমাদের সাহস নেই।

বাদল বললো, সাহসের প্রশ্ন নয়। একলা একলা নিয়ম ভাঙাই বড় কথা নয়। এই সমাজের নিয়মগুলোই পাল্টানো দরকার।

পঙ্কজ বললো, অষ্টম এডোয়ার্ড একটা মেয়ের জন্য ইংলণ্ডের সিংহাসন ছেড়েই চলে গেল।

ভাস্কর হাসতে হাসতে বললো, আমার সিংহাসন নেই, তাই ছাড়ার কোশ্চেনই ওঠে না। তা ছাড়া শালা, এ পর্যন্ত সে রকম কোনো মেয়েরই দেখা পেলাম না।

বাদল একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বাকি তিনজন কথা বলতে বলতে চলে গেল প্রসঙ্গান্তরে।

একটু বাদেই আড্ডা ভাঙলো। বিষ্ণুকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। বাদলও ওদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো একটুখানি এগিয়ে দিয়ে আসতে।

মোড়ের মাথায় এসে আবার আড্ডা। এক একটা বাস এসে চলে যাচ্ছে, তবু ওরা বিষ্ণুকে উঠতে দিচ্ছে না। আর একটু দাঁড়া, আর একটু দাঁড়া! গাড়ি বারান্দাটার নীচে একটা লোক খুব চমৎকার আলুর বড়া আর বেগুনি ভাজে—তাই কিনে খাওয়া হলো। এবার একটু চা খেলে কেমন হয়?

বিষ্ণু হাসতে হাসতে বললো, এলগিন রোড থেকে আমার মাসীমারা আসবেন। মা-কে বলে এসেছি ছ'টার সময় বাড়ি ফিরবো! এখন সাড়ে সাতটা বাজে যে রে!

ভাস্কর বললো, ধুৎ! তুই ক'দিন বাদেই লণ্ডন চলে যাবি—তারপর তোর সঙ্গে কবে আবার দেখা হয় কি না হয়!

—কেন দেখা হবে না? আমি কি সারাজীবন থাকবো নাকি?

—কি জানি ভাই! দেখছি তো, যে যায়, সে আর ফেরার নামটি করে না!

—আমি ফিরবোই!

—তা হলে যাচ্ছিস কেন? এ দেশে কি পড়াশুনো হয় না?

—চার পাঁচ বছরের বেশী থাকবো না, দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

পঙ্কজ বললো, চল্, আমরা সবাই মিলে বিলেত যাই! একটা নৌকো ভাড়া করে—

বাদল বললো, সেরকমভাবে যদি যেতেই হয়, তাহলে বিলেত কেন, তাহিতি দ্বীপে যাবো—

বন্ধুদের বাসে তুলে দিয়ে বাদল বাড়ির দিকে ফিরে আসছে—এমন সময় তাদের বাড়ির চাকর হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললো, ছোড়দাবাবু, শিগগির আসুন! আপনাকে সবাই খুঁজছেন।

—কেন রে, কি হয়েছে?

—বড়বাবু সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছেন। অজ্ঞান হয়ে আছেন।

বাদল তৎক্ষণাৎ পেছন ফিরে তাকলো। বাসটা অনেক দূর চলে গেছে, বন্ধুদের আর ফেরাবার উপায় নেই। যে কোনো উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতেই বন্ধুদের কথা মনে পড়ে। বাড়িতে এই বিপদ—বন্ধুরা থাকলে অনেক সাহায্য করতে পারতো—বিশেষত ভাস্কর সব ব্যাপারে এত এক্সপার্ট—

তার পরেই বাদল দৌড়োলো বাড়ির দিকে।

বড়বাবুকে শোওয়ানো হয়েছে সূর্যর ঘরে খাটের ওপর। দু' চোখ বোজা। কপালে ঘাম। চিররঞ্জন তাঁর নাকের সামনে ধরে আছেন স্মেলিং সল্টের শিশি, হিমানী হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করছেন।

বাদল ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে?

চিররঞ্জনের মুখখানা ফ্যাকাসে রক্তশূন্য। তিনি দুর্বল স্নায়ুর মানুষ, কোনো রকম বিপদের সম্মুখীন হলে তাঁর মাথা আরও গুলিয়ে যায়। কম্পিত গলায় বললেন, ডাক্তার ডাক। শিগগির—

বাদল খুব একটা বিচলিত বোধ করলো না। বড়বাবুর হাত পা কিছুই কাটেনি, শরীরের কোনো জায়গা থেকে রক্তপাত হয়নি, তা হলে বিশেষ কিছু না—আচমকা পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

সে বললো, কি হয়েছে? সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছেন? মাথায় জল দাও—

চিররঞ্জন বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে বললেন, না, না, এমনি এমনি পড়ে যাননি। আমি নিজের চোখে দেখলাম—বড়বাবু তিনতলা থেকে নেমে আসছিলেন...আমি তখন বারান্দায়—উনি হঠাৎ থেমে পড়লেন, হাত তুলে আমায় ডাকলেন, চিরু চিরু—আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছি—এই সময় পড়ে গেলেন ঝুপ করে, তারপর গড়াতে গড়াতে—

হিমানী বললেন, এখনো জ্ঞান ফিরছে না—তুই শিগগির যা, অপূর্ব ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়—

—বড়বাবু যদি রাগ করেন পরে?

—তুই যা তো! শুধু শুধু দেরি করছিস্—

বড়বাবু সাধারণত ডাক্তারদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলেন। তিনি সারাজীবনে খুব কম ওষুধ খেয়েছেন। ছোটখাটো অসুখ হলে তিনি নিজেই নিজের চিকিৎসা করেন। তাঁর ধারণা, যখন তখন ওষুধ খাওয়া মানেই শরীরের একটু ক্ষতি করা। বাদল সেই কথাই ভাবছিল—হঠাৎ বড়বাবুর বুক থেকে একটা অস্বাভাবিক ঘরঘর শব্দ হতেই সে ভয় পেয়ে গেল। বড়বাবুকে এরকম অসহায় অবস্থায় তো সে কখনো দেখেনি। সে ছুটে বেরিয়ে গেল ডাক্তার ডাকতে।

সন্ধ্যের সময় অপূর্ব ডাক্তারের চেম্বারে বেশ ভিড় থাকে। বাদল সরাসরি ভিড় ঠেলে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে বললো, এক্ষুনি আসুন!

ডাক্তারবাবু মুখ তুলে বললেন, কি হয়েছে কি?

বাদলের অত কথা বুঝিয়ে বলার সময় নেই। সে ততক্ষণে ডাক্তারের ব্যাগ নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। বললো, অন্যদের একটু বসতে বলুন, আপনাকে এক্ষুনি যেতে হবে।

—আরে কি হয়েছে বলো না! অত ব্যস্ত হলে কি হয়?

—আপনি শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন! আপনাকে এবার জোর করে টেনে নিয়ে যাবো কিন্তু। বড়বাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন।

—বড়বাবু!

অপূর্ব ডাক্তার আর দ্বিরুক্তি করলেন না, উঠে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে। বড়বাবুকে এ পাড়ার অনেকেই চেনে এবং মান্য করে। বাদল অপূর্ব ডাক্তারকেও প্রায় দৌড় করিয়েই নিয়ে এলো বাড়িতে।

হিমানী ততক্ষণে বুদ্ধি করে বড়বাবুর পায়ের তলায় গরম জলের সেঁক দিচ্ছেন। ডাক্তারবাবু খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে গম্ভীরভাবে বললেন, হাসপাতালে পাঠাতে হবে,

এখানে চিকিৎসা করা যাবে না।

—কি হয়েছে কি?

—এখন বলা শক্ত। হার্ট কিংবা ব্রেনে—অনেক কিছু পরীক্ষা করে দেখতে হবে। অ্যাম্বুলেন্সে খবর পাঠান—আমি সঙ্গে যাবো—

—হাসপাতালে পাঠাতেই হবে? এখানে কিছু হবে না?

চিররঞ্জন তাকালেন স্ত্রীর দিকে। তিনি নিজে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। হাসপাতালের নাম শুনলেই মনে হয়, সেখান থেকে আর কেউ ফেরে না। হাসপাতালে যাওয়ার ব্যাপারটা বড়বাবু নিজে কি পছন্দ করবেন? নিজের জীবনের ব্যাপারে বড়বাবু কখনো কারুর পরামর্শ নেননি, নিজেই সব ঠিক করেছেন—হাসপাতালে জ্ঞান ফেরার পর তিনি যদি চিররঞ্জনকে ভর্ৎসনা করে বসেন, তুমি শেষকালে আমায় হাসপাতালে ঠেলে দিলে?

চিররঞ্জন বিভ্রান্তের মতন এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, সূর্য্যি কোথায়? এই বাদল, দ্যাখ না, সূর্য্যিকে পাস কি না কোথাও!

সূর্য বাড়ি নেই। সুতরাং তাকে এখন কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে! চিররঞ্জন ভাবছিলেন, সূর্য যদি নিজের বাবার চিকিৎসার উপায় ঠিক করে, তা হলে তাঁর আর কোনো দায়িত্ব থাকে না।

হিমানী বললেন, হাসপাতালে কেন! বাড়িতে যন্ত্রপাতি আনা যায় না?

অপূর্ব ডাক্তার বললেন, আমি সে দায়িত্ব নিতে পারি না। অবস্থা খুব ভালো মনে হচ্ছে না।

চিররঞ্জন ডাক্তারের হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, এখনকার মতন একটা কিছু ব্যবস্থা করুন। কোনো মতে যদি একবার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা যায়—বুঝলেন না, ওঁর মত না নিয়ে হাসপাতালে পাঠাতে...

অপূর্ব ডাক্তার ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ বার করতে করতে বললেন, তা তো বুঝলাম, কিন্তু...

ইঞ্জেকশান শেষ করে তিনি আবার বললেন, আধ ঘণ্টার মধ্যে জ্ঞান ফেরার কথা। আমি এখন একটু যাচ্ছি, জ্ঞান ফিরলেই আমাকে আবার খবর দেবেন।

আধ ঘণ্টার আগেই বড়বাবুর জ্ঞান ফিরলো। খুব ক্লান্তভাবে চোখ খুললেন। চিররঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঝুঁকিয়ে বললেন, বড়বাবু, বড়বাবু—

বড়বাবু শুধু তাকিয়ে রইলেন, কোনো কথা বললেন না।

—এখন কেমন আছেন?

বড়বাবু শুধু বললেন, চিরু—

—কষ্ট হচ্ছে? কোথায়?

বড়বাবু আর কোনো উত্তর দিলেন না। একটা হাত উঁচু করার চেষ্টা করলেন, সেটা আবার ধপাস করে পড়ে গেল।

চিররঞ্জন আবার ব্যগ্রভাবে বললেন, ডাক্তার এসেছিল, বলছিল, হাসপাতালে গেলে চিকিৎসার সুবিধে হবে—

বড়বাবু যেন এ কথাটা বুঝতেই পারলেন না। ক্লিষ্ট ভঙ্গি করে পাশ ফিরে আবার চোখ বুঝলেন।

ডাক্তারবাবু আবার এলেন একটু পরেই। তিনিও বড়বাবুকে অনেকবার জিজ্ঞেস করলেন হাসপাতালের কথাটা। কোনো উত্তর পেলেন না। তখন আবার ইঞ্জেকশান ও

ওষুধ দিয়ে বললেন, আজকের রাতটা অন্তত দেখা যাক। কাল সকালে যা হয় ঠিক করা যাবে। ভয়ের কিছু নেই।

তবু যাবার সময় তিনি চিররঞ্জনকে আলাদা করে ডেকে বলেন, রাত্তিরে যদি খারাপ কিছু হয়, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খবর দেবেন, যত রাত্তিরই হোক—

ডাক্তারের মুখে চিন্তার ছাপ দেখলে বাড়ির লোকের বুক কাঁপে।

রাত সাড়ে ন'টা বাজে, সূর্য তখনও ফেরেনি। কোনো কোনো রাত্রে সূর্য বাড়ি ফেরে না, আজও যদি সেরকম হয়? এই কথা ভেবে বাদল অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করছে। এক সময় সে বললো, বাবা, আমি সূর্যদাকে একটু খুঁজে আসবো?

দীপ্তিদির বাড়ি বাদল একবার দেখেছিল দূর থেকে, সেখানে যেতে তার একটু একটু লজ্জা করছে। কিন্তু ওখানে ছাড়া সূর্যর খোঁজ করবে আর কোথায়?

একতলার অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে বাদল উঠে এলো দোতলায়। ঘরের দরজা ভেজানো, ভেতরে আলো জ্বলছে। দরজায় কলিং বেল নেই। আঙুলের গাঁট দিয়ে ঠুকে ঠুকে আওয়াজ করলো বাদল।

দীপ্তি দরজার এক পাল্লা খুলে বললেন, কে?

দরজার ফাঁক দিয়ে বাদল দেখলো একটা চেয়ারে সূর্য বসে আছে মুখ গোঁজ করে। ঠিক অভিমানী শিশুর মতন তার বসে থাকার ভঙ্গি। দরজা খোলার পরেও সে মুখ তোলেনি।

দীপ্তি আগে কয়েকবার দেখেছেন বাদলকে। সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পেরে বললেন, বাদল না? কি ব্যাপার!

সূর্য এবার মুখ তুললো। বাদল ঘরের মধ্যে ঢুকে বললো, সূর্যদা, তোমাকে এক্ষুনি বাড়ি যেতে হবে।

সূর্যর মধ্যে একটুও চঞ্চলতা দেখা গেল না। সে বললো, এত রাত্তিরে এসেছিস কেন? কি হয়েছে?

—বড়বাবুর খুব অসুখ।

দীপ্তি উৎকণ্ঠিতভাবে বললেন, কি হয়েছে কি? বাদল, তোমার মুখ এত শুকনো কেন?

বাদল বললো, সূর্যদা, তাড়াতাড়ি চলো। বড়বাবু সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছেন, অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলেন—

—আমাকে ডাকতে বললেন?

—কোনো কথা বলতে পারছেন না।

দীপ্তি তাড়া দিয়ে বললেন, সূর্য, তুমি এক্ষুনি চলে যাও।

সূর্য মন্থরভাবে উঠে দাঁড়ালো। তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ার কোনো লক্ষণ না দেখিয়ে বাদলকে জিজ্ঞেস করলো, ডাক্তার এসেছিল?

—ডাক্তারবাবু বললেন, ওঁকে হাসপাতালে পাঠানো দরকার—

দীপ্তি বললেন, সূর্য, আর দেরি করো না তা হলে—

সূর্য বললো, যাচ্ছি। বাদল, তুই নীচে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ডাক তো—আমি যাচ্ছি এক্ষুনি।

বাদল বেরিয়ে যাবার পর সূর্য গম্ভীরভাবে বললো, দীপ্তিদি, চট করে তোমার দু' একটা জামা কাপড় গুছিয়ে নাও—তুমিও যাবে আমাদের সঙ্গে।

—আমি?

—হ্যাঁ। বাবার অসুখ যদি গুরুতর হয়, তা হলে আমি ক'দিন আসতে পারবো না। তুমি ওখানেই আমাদের সঙ্গে থাকবে।

—তা হয় নাকি? পাগল হয়েছো?

—নিশ্চয়ই হয়!

দীপ্তি এগিয়ে এসে সূর্যর বাহু ছুঁয়ে মিনতি করে বললো, এখন এরকম পাগলামি করো না। তাড়াতাড়ি চলে যাও—আমি কাল সকালেই একবার খবর নেবো—

সূর্য বললো, আমি অন্য কিছুর জন্য বলছি না। আমি এখানে না এলেই অন্য লোকেরা তোমাকে আজে বাজে কথা শোনাতে আসবে।

—তাতে আমার কিছু হবে না। একটা কথা মনে রেখো, আমি তোমার সঙ্গে না গেলেও, আমি সব সময় তোমার সঙ্গে আছি। তুমি যেখানেই যাও, আমি তোমার সঙ্গে থাকবো। তুমি চোখ বুজলেই দেখতে পাবে, আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছি।

সূর্যর মনে হলো, এই কথাটা সে যেন আগে কোথাও শুনেছে। জেলে থাকার সময় শ্রীলেখা চিঠিতে এইরকমই কিছু লিখেছিল।

সে বললো, চোখ বুজে নয়, চোখ খুলেই আমি তোমাকে সব সময় দেখতে চাই আমার কাছাকাছি। কাল সকালে তুমি ঠিক আসবে তো?

—আসবো।

সূর্য আর কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লো। বাদল ততক্ষণে ট্যাক্সি ডেকে ফেলেছে।

সূর্যকে এত সহজে খুঁজে পাওয়ার জন্যই বাদল আরও বেশী উত্তেজিত বোধ করছে। খোঁজাখুঁজির জন্য সময় নষ্ট হলে সে কথা মনে পড়তো না, এখন মনে পড়ছে সেই কথা—খুব বেশী দেরি হয়ে যায়নি তো। যদি এর মধ্যেই—

মাড়োয়ারীদের বিয়ের একটা আলো-বাজনার বিরাট জুলুস বেরিয়েছে বলে ট্যাক্সিটা আটকে পড়েছে। বাদল চেঁচিয়ে বললো, আঃ, এদের জ্বালায় আর পারা গেল না। সর্দারজী, আপ ডাইনে ঘুমাকে জলদি চালাইয়ে, বহুৎ জলদি!

সূর্য বাদলের পিঠে হাত দিয়ে বললো, তুই এত চঞ্চল হচ্ছিস কেন?

একটানা আট দিন বড়বাবু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। ঘুম ও জাগরণের মাঝখানের একটা অবস্থা। কখনো তিনি তাকিয়ে থাকেন লোকজনের মুখের দিকে, কেউ কথা বললে শুনতে পানও মনে হয়, কিন্তু কোনো উত্তর দিতে পারেন না। আবার এক এক সময় নিজে থেকেই একটা দুটো কথা বলে ওঠেন—সে সব কথার মর্মোদ্ধার করাও সহজ নয়।

ধন্বন্তরি হিসেবে বিখ্যাত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সদ্য প্র্যাকটিস করা বন্ধ করেছেন, বাড়িতে শুধু সকালে এক ঘণ্টা বিনা পয়সায় রোগী দেখেন। মন্দাকিনীর ছেলে সুরেশ্বরের সঙ্গে ডাঃ বিধান রায়ের পরিচয় আছে। সুরেশ্বর বিশেষ চেষ্টা করলেন তাঁকে আনবার জন্য। কিন্তু ডাঃ রায় অত্যন্ত ব্যস্ততার জন্য বাড়িতে আসতে পারলেন না, চেম্বারে আনতে বললেন। সেখানে বড়বাবুকে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই এখন ওঠে না, তাই ডাক্তার নলিনীরঞ্জন সেনকে কল দেওয়া হলো।

বাড়িতে সব সময় লোকজনের ভিড়। নানা সূত্রে বড়বাবুকে অনেকেই চেনে। খবর পেয়ে সবাই ভিড় করে আসছে। সকলেই একবার অন্তত রোগীর কাছে গিয়ে [illegible]নাতে চায়, আমি এসেছি, আমাকে চিনতে পারছেন তো? ভিড় সামলানোই মুশকিল। সূর্য এ ক'দিন একবারও বাড়ি থেকে বেরোয়নি। বাদলও সব সময় তার সঙ্গেই থাকে। বাড়িতে একটা থমথমে ভাব। সকলেই বড়বাবুর ঘরের মধ্যে বা কাছাকাছি থাকে সব

সময়। দু'জন নার্স রাখা হয়েছে দিনে ও রাত্রে পালা করে থাকার জন্য, পাড়ার ডাক্তার প্রত্যেকদিন তিন চারবার করে আসেন।

নবম দিন দুপুরের দিকে বড়বাবু চোখ খুলে দু'বার বললেন, মা, মা—

চিররঞ্জন বারান্দায় ছিলেন, ছুটে এলেন। বড়বাবু অনেকটা পরিষ্কারভাবেই বললেন, চিরু, আমি ভালো আছি।

চিররঞ্জনের শুকনো মুখে বিদ্যুতের মতন আলো ফুটে উঠলো। কয়েক দিনেই চিন্তা ভাবনায় চিররঞ্জন অনেক রোগা হয়ে গেছেন।

কাছে এগিয়ে এসে বললেন, আপনাকে অনেক ভালো দেখাচ্ছে। যন্ত্রণা-টন্ত্রণা আছে?

বড়বাবু বললেন, না। এবার বোধ হয় ধাক্কাটা সামলে উঠবো। আমাকে একটু তুলে ধরো তো!

পাশ থেকে নার্স বললো, না, না, এখন উঠবেন না।

বড়বাবু বললেন, এ মেয়েটি কে?

বাড়ির সকলেই অবিলম্বে উপস্থিত হলো সেখানে। বড়বাবুকে কয়েকটা বালিশ উঁচু করে ঠেস দিয়ে বসানো হয়েছে। এতদিন পর তাঁর চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ প্রকট। চামড়া ঝুলে গেছে, চোখ দুটি কোটরগত। গলার আওয়াজে সেই দৃঢ়তা আর নেই। দেখে যত না অসুস্থ মনে হয়, তার চেয়েও বেশী মনে হয়, মানুষটা খুবই ক্লান্ত।

ভালো মতন জ্ঞান ফেরা মাত্রই ডাক্তারকে খবর দেবার কথা ছিল, তাই সূর্য চলে গেছে ডাক্তারকে ডাকতে।

চিররঞ্জন বললেন, আমি এমন বিপদে পড়েছিলাম...ডাক্তাররা বলছিলেন হাসপাতালে পাঠাতে—কিন্তু আপনার মতামত না নিয়ে...

—হাসপাতালে কেন?

—হার্টের চিকিৎসা বাড়িতে ভালো মতন—

—হার্টটাই গেছে বুঝি?

—গুরুতর কিছু নয়, সামান্য অ্যাটাক—

—হুঁ। হাসপাতালে না পাঠিয়ে ভালো করেছো—

হিমানী বললেন, এ ক'দিন তো আপনি কিছুই খাননি। শুধু গ্লুকোজ ইঞ্জেকশান দিয়ে...আজ কিছু খাবেন?

—ক'টা দিন কেটেছে বলো তো?

সবাই তখন দিনের হিসেব মেলাতে বসলো। তারপর সেই সিঁড়ি থেকে পড়ে যাওয়ার বর্ণনা।

বড়বাবু চুপ করে শুনলেন সব। তারপর হঠাৎ ছেলে মানুষের মতন বললেন, আমাকে একটু মুগের ডাল খাওয়াতে পারো? আমার মায়ের হাতের রান্না খেয়েছিলাম—

সকলে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। এত কঠিন অসুখের রোগীকে কি মুগের ডালের মতন গুরুপাক কিছু খাওয়ানো উচিত? তা ছাড়া, বড়বাবু আবার নিজের মায়ের রান্না খেলেন কবে? কোনোদিন তো ওঁর মায়ের কথা শোনা যায়নি।

হিমানী একটা স্তোকবাক্য দিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। রান্নাঘরে গিয়ে মুগের ডাল বার করে রাখলেন—তবে, ডাক্তারকে জিজ্ঞেস না করে রান্না চাপাবেন না।

ডাক্তার এসে বড়বাবুর অবস্থা দেখে খুব খুশী হলেন, কিন্তু মুগের ডাল খাবার

অনুমতি দিলেন না। অসুখ হলে—এত বড় একজন বয়স্ক লোকের সঙ্গেও সবাই শিশুর মতন ব্যবহার করে। ডাক্তারও বললেন, আর কয়েকটা দিন বাদেই তো পুরো ভালো হয়ে যাবেন—তারপর যা খুশী হয় খাবেন, কেমন?

সন্ধ্যেবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর বড়বাবুর অবস্থা আরও অনেক ভালো মনে হলো। নিজে দুধের বাটি হাতে নিয়ে চুমুক দিলেন। বললেন, রেডিওটা খোলো তো, একটু খবর শুনবো—

কিন্তু সকলেরই মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি রয়ে গেল। আর সব দিক ভালো হলেও বড়বাবুর কথাবার্তা একটু যেন অসংলগ্ন। মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলছেন, যার মানে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মনে হয়, তাঁর চৈতন্যের জগতে একটা কিছু উলোট-পালোট চলছে। মায়ের কথা বলছেন বারবার। এককালে তিনি গান শিখতেন ওস্তাদ সৈফুদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে, হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, খাঁ সাহেব কি এসেছিলেন কাল?

সবাই জানে, সৈফুদ্দিন খাঁ সাহেব মারা গেছেন সাত আট বছর আগে।

কেউ কিছু উত্তর না দিলে বড়বাবু সবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, এখন কলকাতায় গান বাজনার জলসা হচ্ছে না কোথাও? আমাকে একটু নিয়ে যেতে পারো?

চিররঞ্জন বিষণ্নভাবে বললেন, শরীরের এই অবস্থা। আপনি এখন কি করে যাবেন?

—শরীরটা কি আমার একেবারেই গেছে?

—আজ তো বেশ ভালো আছেন!

বড়বাবু বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। চিররঞ্জন ও নার্স এসে দু' পাশ থেকে ধরলো তাঁকে। দু'তিন পা হেঁটেই বড়বাবু বললেন, আমার মাথা ঘুরছে!

—আপনি বিছানায় এসে বসুন।

—না, আমি আর একটু হাঁটবো। শরীরকে বেশী প্রশ্রয় দিলেই পেয়ে বসবে।

চিররঞ্জন ও নার্সের কথা অগ্রাহ্য করেই বড়বাবু ঘর থেকে বেরুবার চেষ্টা করছিলেন। তখন সূর্য এসে বললো, বিছানা থেকে নামা আপনার একদম বারণ।

বড়বাবু বললেন, ডাক্তার বৈদ্যর কথা শুনে আমি কখনো চলিনি। সূর্য, চল সমুদ্রের ধারে কোথাও বেড়াতে যাবি?

—যাবো। আপনি আগে একটু সেরে উঠুন।

সূর্য তার বাবাকে ধরে ধরে আবার বিছানার কাছে নিয়ে এলো।

বড়বাবু বললেন, আমার এ জায়গাটা আর ভালো লাগছে না। আমি অন্য কোথাও যাবো।

পরদিন বড়বাবু চিররঞ্জনকে একটা চেক সই করে দিলেন পর্যন্ত। এর আগে তিনি হাতও নাড়াতে পারতেন না। হাসতে হাসতে বললেন, আমি ঠিক সেরে উঠবো। এত সহজে মরতে রাজি নই হে!

তারপর হঠাৎ আবার অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, বেঁচে থেকে কি হবে, তাও তো জানি না!

একটু বাদেই বৃষ্টি হবে, আকাশ অন্ধকার। ঘরের মধ্যে একটা থমথমে ছায়া। চিররঞ্জন উঠে গিয়ে জানলা বন্ধ করতে যেতেই বড়বাবু বললেন, থাক, খোলাই থাক।

বাদল সূর্যকে বললো, সূর্যদা, আমরা তো আছি, তুমি আজ একটু বাইরে থেকে ঘুরে এসো না!

এর আগে সূর্য বেশীর ভাগ সময়ই বাড়ির বাইরে কাটাতো। এই ক'দিন সে

একটানা বাড়িতে থেকে যেভাবে কাজকর্ম করেছে—তা দেখলে অন্যদের মায়া লাগে। বাড়ির কাজ করা যে-সব ছেলের স্বভাবে নেই—তারা কিছুতেই নিজেদের এসব ব্যাপারে ঠিক মানিয়ে নিতে পারে না।

সূর্য বললো, আজকের দিনটা থাক্। কাল বেরুবো।

বাদল উৎসাহের সঙ্গে বললো, লরেন্স অলিভিয়ার-এর হ্যামলেট এসেছে, তুমি দেখবে না?

সূর্য অন্যমনস্কভাবে বললো, হ্যাঁ রে আমি যখন ডাক্তার টাক্তার ডাকতে গেছি, তার মধ্যে কি কখনো দীপ্তিদি এসেছিলেন?

—না তো। এলে ঠিক বসিয়ে রাখতাম।

—এলো না কেন? আশ্চর্য। ওর একটা খবর নেওয়া দরকার।

—আমি যাবো?

—দেখি আজকের দিনটা।

সূর্য জানলার কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়ালো। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে ঝুপ ঝুপ করে, সমস্ত শহরটা নিস্তব্ধ মনে হয়। এই ক'দিন বাবার অসুখের চিন্তার মধ্যেও সে দীপ্তির কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভোলে নি। দীপ্তি একবারও খবর নিতে এলো না কেন? দীপ্তি এ বাড়িতে তো আগে একদিন এসেছিল। দীপ্তির কোনো বিপদ হয়নি তো?

সূর্যর মনে হলো, বৃষ্টির মধ্যেও সে যেন দীপ্তির শরীরের সুগন্ধ পাচ্ছে। দীপ্তি যেন কোনো একজন নারী নয়—সূর্যর মুখ লুকোনোর জায়গা।

দীপ্তি আসেনি, দীপ্তির সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি—কেন সে এরকম কষ্ট দিচ্ছে? সূর্য এর শোধ নেবে। সে তার ভালোবাসা দিয়ে দীপ্তিকে পাগল করে দেবে।

রাত্তিরবেলা ঘুমোতে যাবার আগে সূর্য এসেছে বাবাকে দেখতে। বড়বাবু তখন চোখ বুজে আছেন।

অসুখ অনেক রকম হয়, তবু অসুস্থ মানুষ দেখলেই প্রথমে জ্বর দেখার কথাই মনে পড়ে। সূর্য তার একটা হাত রাখলো বড়বাবুর কপালে। বড়বাবুকে ঘুমন্ত মনে হয়েছিল, কিন্তু তিনি চোখ খুলে তাকালেন। বললেন, বোস একটু—

রাত্রির নার্স একটা বই খুলে বসেছিল শিয়রের কাছে। বড়বাবু বললেন, তুমি একটু বাইরে যাও তো মা।

নার্সের টুলে সূর্য বসে পড়ে বললো, আপনার বেশী কথা বলা নিষেধ।

বড়বাবু সে কথা গ্রাহ্য না করে বললেন, আমার যদি হঠাৎ কিছু হয়ে টয়ে যায়—তোকে কয়েকটা কথা বলে রাখা দরকার। বাড়ির দলিল, কোম্পানির কাগজ...

সূর্য বললো, এসব কথা এখন থাক না। পরে হবে।

—পরে যদি আর সময় না পাই?

—ডাক্তার তো বলছেন।

—আমি ডাক্তারি ওষুধে বিশ্বাস করি না। আজ সকাল থেকে তোর কথাই ভাবছি। তোর মায়ের কথা। তুই গোয়ালিয়ার চলে যা।

—গোয়ালিয়ার? কেন?

—এটা তোর জায়গা নয়।

—ওখানে গিয়ে আমি কি করবো? কারুকেই চিনি না।

—ও। আচ্ছা যাসনি। তুই এখানে কি করবি?

—ঠিক ভেবে দেখিনি।

—তুই বিয়ে করবি না?

সূর্য কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। নিজের বিয়ের কথাটা সে বাবাকে জানাবে বলেই মনঃস্থির করে রেখেছিল। কিন্তু এখন একথা বলার প্রকৃষ্ট সময় নয়।

সে বললো, আপনি আগে পুরোপুরি সেরে উঠুন।

বড়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কিছুতেই কিছু আসে যায় না।

সূর্য এ কথার ঠিক তাৎপর্য বুঝতে না পেরে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো বাবার দিকে। তার মনে হলো, বাবার বুকটা যেন একটু বেশী জোরে ওঠা নামা করছে। নিশ্বাসের কষ্ট হবার লক্ষণ কি!

সে বললো, আপনার কি কোনো কষ্ট হচ্ছে?

বড়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, না।

তারপর খুব টেনে টেনে বললেন, আমি চলে গেলেও এ পৃথিবী এরকমই থাকবে।

ব্যাপারটা খুব ভালো না মনে হওয়ায় সূর্য উঠে গিয়ে চিররঞ্জনকে ডেকে আনলো। চিররঞ্জন হন্তদন্ত হয়ে এলেন। বড়বাবু বললেন, চিরু, বসো, তোমার সঙ্গেও কথা আছে।

চিররঞ্জন প্রায় ধমক দিয়েই বললেন, আপনি এখন ঘুমোন তো। সব কথা কাল শুনবো।

বড়বাবু বললেন, না।

নিজেই উঠে বসার চেষ্টা করলেন। নার্স তাড়াতাড়ি এসে তাঁর গা ধরে বললো, কি করছেন কি? শুয়ে পড়ুন।

বড়বাবু বললেন, আমার শয্যাকণ্টকী হয়েছে। পিঠ জ্বলে যাচ্ছে। আমি শুয়ে থাকতে পারছি না।

সূর্য চিররঞ্জনকে জিজ্ঞেস করলো, ডাক্তার ডাকবো?

বড়বাবু ততক্ষণে উঠে বসেছেন। খানিকটা ঘোর লাগা গলায় বললেন, আমি সারাজীবন ধরে খোঁজার চেষ্টা করেছি, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি? আমার মা বলেছিলেন...এই কথাটা আমাকে জেনে যেতে হবে। আমি পারিনি। তোমরা কেউ জানো?

চিররঞ্জন কাঁদো কাঁদো ভাবে বললেন, বড়বাবু, কথা বললে আপনার কষ্ট বাড়বে। ডাক্তারকে ডেকে আনছি এক্ষুনি।

বড়বাবু নার্সের দিকে মুখ ফিরিয়ে ইশারায় বললেন, এক গ্লাস জল। নার্স জল গড়িয়ে এনে খাইয়ে দিতে গেল, বড়বাবু সেটা নিজের হাতে নিলেন। ঠোঁটে ঠেকাবার আগেই গেলাসটা হাত থেকে পড়ে বিছানা জলে ভেসে গেল। বড়বাবু যেন সেই জল শুষে নিতে চান—এই ভঙ্গিতে নিজেও ঠাস করে উপুড় হয়ে পড়লেন বিছানায়—তাঁর বুক দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ হতে লাগলো।

সূর্য তক্ষুনি ছুটে যাচ্ছিল ডাক্তার ডাকতে। চিররঞ্জন সূর্যর হাত চেপে ধরে বললেন, তুমি না। তুমি সামনে থাকো—।

বাদলকে পাঠানো হলো ডাক্তারের জন্য। চিররঞ্জন আর সূর্য ধরাধরি করে বড়বাবুকে সোজা করে শুইয়ে দিল। বড়বাবু স্থির চোখ মেলে চেয়ে আছেন, আর তাঁর বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে। চিররঞ্জন আকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে লাগলেন, নার্স ঘষতে

লাগলো পায়ের পাতা।

ডাক্তার এসে মুখ কালো করলেন। নীচু গলায় বললেন, একটা ইঞ্জেকশান দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আর কোনো আশা নেই। শুধু শুধু আর কষ্ট দিয়ে কি হবে! কোমার পরের স্টেজে একটু ভালো হয়ে তারপর হঠাৎই এই রকম—

সূর্য বললো, আপনি তবু ইঞ্জেকশান দিন।

ইঞ্জেকশান দেবার পর মাত্র এক মিনিট বাদেই বড়বাবু আস্তে আস্তে এদিক-ওদিক চোখ ঘোরালেন। তারপর ঠোঁট নড়ে উঠলো। কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কেউ কিছু শুনতে পেল না। শেষ নিশ্বাস বেরুবার আগে সেইটাই বড়বাবুর শেষ বার কথা বলার চেষ্টা। তাঁর শেষ কথা কেউ বুঝতে না পারলেও বাদল দাবি করে, সে ঠোঁট নাড়া দেখেই কথাটা ধরতে পেরেছে। বড়বাবু বলতে চেয়েছিলেন, দেখে গেলাম। এবং এই দেখে গেলাম কথা দুটিরই অনেক রকম ব্যাখ্যা দিয়েছে বাদল। তার মতে, বড়বাবুর সারা জীবনের চরিত্রের সঙ্গে এই কথা দুটি মিলে যায়।

॥ ৬৪ ॥

দু দিনের মধ্যে সান্ত্বনা আর শ্রীলেখা তাদের স্বামী পুত্রদের নিয়ে চলে এলো এ বাড়িতে এবং ঈষৎ দমিত কান্নার রোল আবার জাগিয়ে তুললো। ওরা শেষ সময়ে বড়বাবুকে দেখতে পেল না, এইটাই ওদের সবচেয়ে বড় দুঃখ। চিররঞ্জন কাঁদতে লাগলেন একেবারে শিশুর মতন অযৌক্তিকভাবে।

সমস্ত বাড়িতে শোকের গন্ধ। মাঝে মাঝে কান্না থামলে হঠাৎ সারা বাড়িটা নিস্তব্ধ হয়ে যায়। ঘরগুলোর দিকে তাকালে মনে হয়, কোনো ঘরেই কোনো মানুষ নেই। কোনো ঘরের জানলা অর্ধেক খোলা, মনে হয়—এরও যেন কোনো তাৎপর্য আছে। এক টুকরো কাগজ হাওয়ার ধাক্কায় বারান্দার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে খেলে বেড়াচ্ছে—মনে হয় এই দৃশ্যটাও আগে কোনো দিন দেখা যায় নি। শোকের বাড়ি এই রকম।

এ বাড়িতে বড়বাবুর অস্তিত্ব এত বেশী ভাবে সব সময় অনুভব করা যেত যে এখন তাঁর স্থায়ী অনুপস্থিতি কিছুতেই যেন বিশ্বাস করা যায় না। কিংবা একজন কেউ সম্পূর্ণভাবে মুছে গেলেই তার পূর্বেকার উপস্থিতি আরও বেশী ভাবে মনে পড়ে। যে কোনো প্রসঙ্গ উঠলেই মনে হচ্ছে, এই সময় বড়বাবু থাকলে কি বলতেন?

একজন মানুষ সাতষট্টি বছর এ পৃথিবীতে কাটিয়ে চলে গেল। তার সব কিছুর শেষ এখানেই। কয়েকজন তাকে আরও কিছু দিন স্মৃতিতে রাখবে, কিন্তু তার মূল্য কিছু নেই। অনেক গল্প উপন্যাসের চরিত্রও তো মানুষ মনে রাখে। ঐ লোকটির জীবনের বাস্তবতা শুধু ঐ সাতষট্টি বছর। এ কথা জেনেও সহজে মেনে নেওয়া যায় না। মৃত্যুকে মনে হয় অবিশ্বাস্য!

হিমানীই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি সামলে নিলেন নিজেকে। বাড়ির আর সকলের স্নান খাওয়াদাওয়ার নিয়ম চলে গেছে—তিনি সেই নিয়ম ফিরিয়ে আনলেন আস্তে আস্তে। কালাশৌচের আচার-আচরণ তিনিই ঠিক করে দিতে লাগলেন। এ বিষয়ে তিনি সাহায্য পেলেন সান্ত্বনার বর মিহিরের কাছ থেকে। মিহির কম কথা বলে, কিন্তু সাংসারিক কাজকর্মে খুব কুশলী। সে চাকরি করে পাটনায়।

সূর্য বরাবর একা ঘরে শোয়। কিন্তু এখন তাকে একলা থাকতে দেওয়া হয় না। বাদলের বিছানা সূর্যর ঘরে পাতা হয়েছে এবং তাকে বলা হয়েছে সব সময় সূর্যর সঙ্গে সঙ্গে থাকতে—অন্তত শ্রাদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত। সূর্য এর মধ্যে কখনো কেঁদেছে কিনা কেউ জানে না, কেউ দেখেনি তাকে চোখের জল ফেলতে—কিন্তু সে অসম্ভব বিমর্ষ হয়ে গেছে। তার সেই নীরবতা ও ম্লান মুখ দেখলে অন্যদেরও মন খারাপ হয়ে যায়। হিমানীর ধারণা সূর্য নিশ্চয়ই আড়ালে কাঁদে, কিন্তু লোকের সামনে দেখায় না। তাকে অন্যমনস্ক করবার জন্যই সব সময় কারুর সঙ্গে থাকা দরকার।

সূর্যকে যা যা করতে বলা হচ্ছে, সে বিনা প্রতিবাদে সবই মেনে চলছে। শ্মশানে গিয়ে সে বাবার মুখাগ্নি করেছে, এখন সে হিমানীর নির্দেশে মাটির মালশায় নিজের হাতে হবিষ্যান্ন রান্না করে, কোরা কাপড় পরে খালি গায়ে থাকে। তবে অন্যরা প্রশ্ন না করলে নিজে থেকে সে কক্ষনো একটাও কথা বলে না।

সূর্যর কখনো পৈতে হয়নি। শ্রাদ্ধের সময় তার উপনয়নের দরকার আছে কিনা সে বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য হিমানী পুরুত ডাকালেন।

এদিকে বড়বাবুর কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে চিররঞ্জন পেয়ে গেলেন একটা নির্দেশ-পত্র। লেখাটা অনেক পুরোনো। মহাযুদ্ধের সময় বড়বাবু যখন এ বাড়িতে সম্পূর্ণ একলা ছিলেন কিছুদিন, সেই সময়কার।

বড়বাবু লিখেছিলেন, 'আমার অকস্মাৎ মৃত্যু হইলে আমার পুত্রকে সে সংবাদ তৎক্ষণাৎ জানাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। সে যখন জানিবার হয়, জানিবে। আমার বিষয়সম্পত্তি দেখাশুনা করিবার জন্য অ্যাটর্নি নিযুক্ত আছে। বারিদবরণ চৌধুরী অ্যান্ড কোম্পানি। তাহাদের প্রতি আমার নির্দেশ, আমার কোনো শ্রাদ্ধশান্তি করিবার দরকার নাই। আমি এ পর্যন্ত কখনো ঈশ্বরের আশ্রয় যাচ্ঞা করি নাই। মৃত্যুর আগে যদি ভয় পাইয়া ঈশ্বরের নাম লই এবং তাহার যদি কেহ সাক্ষী থাকে—তবেই ধর্মীয় আচরণের প্রশ্ন উঠিতে পারে। নচেৎ শুধু দাহ করিলেই চলিবে। আমি আমার পিতাকে কখনো চক্ষে দেখি নাই, জীবনে মাতৃস্নেহ পাই নাই—সুতরাং পূর্বপুরুষের কাছে আমার কোনো দায়ভাগ নাই। শ্রাদ্ধের যজ্ঞ অনুষ্ঠান প্রভৃতি আমি অপ্রয়োজনীয় মনে করি।'

চিঠিখানা পেয়ে চিররঞ্জন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। বড়বাবু শ্রাদ্ধ না করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এবং এ কথাও তো ঠিক, মরার আগে তিনি ভগবানকে ডাকেন নি। শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা অনেকখানি এগিয়ে গেছে—এখন কি সব বন্ধ করে দিতে হবে?

চিররঞ্জন পরামর্শ করতে গেলেন হিমানীর সঙ্গে। হিমানী এক কথায় সব উড়িয়ে দিলেন। ওসব অনেক লোকের বাতিক থাকে, তা বলে সবই মানতে হবে নাকি, হিন্দুর বাড়িতে শ্রাদ্ধ হবে না—এ কি হয় কখনো?

চিররঞ্জন বললেন, কিন্তু বড়বাবু লিখে গেছেন।

—ঐ পুরোনো কাগজের কি দাম আছে? ছিঁড়ে ফেলে দাও!

চিররঞ্জন ইতস্তত করতে লাগলেন তবু। বড়বাবুর সংস্পর্শে থেকে তিনিও অনেক বিশ্বাস ও সংস্কারকে নির্লিপ্ত চোখে দেখতে শিখেছিলেন। কিন্তু, এখন তাঁর মনে হলো, বড়বাবুর আত্মা যেন কাছাকাছি থেকে তাঁকে লক্ষ্য করছে। এত তাড়াতাড়ি বড়বাবুর অনিচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করার সাহস চিররঞ্জনের নেই।

তিনি বললেন, সূর্যকে একবার জিজ্ঞেস করলে হয় না?

—ও ছেলেমানুষ, ও কি বুঝবে? তা ছাড়া, ওকি এসব কোনোদিন দে[illegible]ছে?

ছেলেমানুষ হলেও সূর্য এখন বড়বাবুর সব কিছুর উত্তরাধিকারী। তা ছাড়া খুব ছেলেমানুষও তো নয়! তিনি গেলেন সূর্যর কাছে।

বড়বাবুর চিঠিটা পড়ার পর সূর্য সেটা ফিরিয়ে দিয়ে বললো, আপনি যা বলবেন, তাই-ই হবে।

—তবু, তুমি কি মনে করো। কি করা উচিত?

সূর্য বললো, আমার মত জিজ্ঞেস করলে আমি বলবো, এসবের কোনো দরকার নেই। তবে, আপনি যা ভালো মনে করবেন, সেটাই হোক।

প্রভাসকুমার উপস্থিত ছিলেন সে ঘরে। তিনি খুব উৎসাহিত হয়ে বললেন, কাকাবাবু, শ্রাদ্ধট্রাদ্ধ বাদই দিয়ে দিন বরং।

—একেবারে সব বাদ দেওয়া কি ঠিক হবে?

—সেদিন একটা সঙ্গীতের আসর বসানো হোক। উনি গান বাজনা ভালোবাসতেন।

বাড়ির মেয়েরা তখন দরজার কাছে এসে ভিড় করেছে। হিমানীর নেতৃত্বে তারা এতে ঘোর আপত্তি তুললো। অনেক রকম যুক্তিতর্ক ওঠে। আচার-অনুষ্ঠানের আলোচনা প্রাধান্য পাওয়ায় শোক ব্যাপারটা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়, একদিকে নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান, অন্যদিকে একটা কীর্তনের আসরও বসানো হবে। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা রাখতেই হয়, মেয়েদের আগ্রহ আতিশয্যে।

শ্রীলেখার ছেলেটির বয়েস চার পাঁচ বছর। শোকের আবহাওয়া কাটিয়ে দিতে সে-ও অনেকখানি সাহায্য করে। ফুটফুটে চেহারার অতি দুরন্ত ছেলে—সর্বক্ষণ হুটোপাটি করে গোটা বাড়ি মাতিয়ে তুললো ক'দিনেই। তার কান্ডকারখানা দেখে এক এক সময় না হেসেও পারা যায় না। সে মৃত্যুর কিছু বোঝে না বলেই তার মধ্যে এত চঞ্চলতা—সে যখন এর ওর পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন সব মনোযোগ ওর দিকেই চলে যায়।

প্রভাসকুমার রামায়ণ-মহাভারত ঘেঁটে বারো চোদ্দটা নাম বেছে রেখেছেন ছেলের জন্য, কিন্তু কোনোটাই পাকা হয় নি। সবাই এখন ওকে বুড়ো নামে ডাকে। ছেলেকে নিয়েই শ্রীলেখার বেশী সময় ব্যস্ত থাকতে হয়—দুরন্ত ছেলে কখন যে কোথায় পড়ে যায় কিংবা কি ভাঙে না ভাঙে, সেদিকে চোখ না রাখলে চলে না। কিন্তু এরই মধ্যে শ্রীলেখা সময় করে সূর্যর সুখসুবিধের খোঁজ নেয়। দুপুরবেলা ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে সে সূর্যর ঘরে এসে বসে। বাড়ির অনেকেই এখন সূর্যর ঘরেই বেশীর ভাগ সময় কাটায়।

ঠিক আড্ডা হয় না, পুরোনো গল্প হয়। চিররঞ্জন যখন এলাহাবাদে বড়বাবুর বাড়িতে গিয়েছিলেন, সেই সময়কার কত স্মৃতি। তখন বড়বাবু এরকম উদাসীন ধরনের ছিলেন না। তাঁর বাড়িতে সব সময় লোকের ভিড়। ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে তো লোকজন আসেই—তা ছাড়া বড়বাবুর এক সময় এক একটা হুজুগ চাপতো। এক সময় যত রাজ্যের সাধু সন্ন্যাসীদের ডেকে আনতেন বাড়িতে। প্রয়াগ সঙ্গমে তো সাধুর অভাব নেই—তাদের বাড়িতে এনে যত্ন করে খাওয়াতেন, কেউ যজ্ঞ বা পুজো আচ্চার বায়না ধরলে সব বন্দোবস্ত করে দিতেন—আর সর্বক্ষণ নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন তুলে জেরা করতেন তাঁদের। এ ছাড়া গান বাজনার শখ তো ছিলই। বড় বড় ওস্তাদরা সব আসতেন—নিজেও গলা সাধতেন রোজ। তারপর হঠাৎ একদিন গান বাজনা বন্ধ করে দিলেন। মানুষটা অনেক ব্যাপারে কৌতূহলী ছিলেন বরাবরই।

শ্রীলেখা জিজ্ঞেস করলো, সূর্যদা, তোমার গোয়ালিয়ারের কথা মনে আছে?

সূর্য বললো, খুব সামান্য।

অন্য কেউ হলে সেই সামান্য কি কি মনে আছে, সেটুকুও অন্তত বলতো—কিন্তু জমিয়ে গল্প বলা ওর স্বভাবে নেই।

চিত্তরঞ্জন বললেন, বড়বাবু শেষের কয়েক দিন বারবার বলছিলেন গোয়ালিয়ারের কথা। সূর্যকেও বলছিলেন ওখানে যেতে।

বাদল বললো, চলো সূর্যদা, তুমি আর আমি এর পর একবার গোয়ালিয়ার থেকে ঘুরে আসি। জায়গাটা দেখলে তোমার নিশ্চয়ই অনেক কথা মনে পড়ে যাবে।

প্রভাসকুমার বললেন, আমরা সবাই মিলে গেলে কেমন হয়? এসো না একটা প্ল্যান করা যাক।

শ্রীলেখা বললো, তা হলে কিন্তু আমাদের বাদ দিতে পারবে না। আমরাও যাবো—

—বেশ তো যাবে। ট্রেনের একটা কম্পার্টমেন্ট রিজার্ভ করে—সূর্যর জন্ম স্থানও দেখা হবে, আমরাও ওদিকটা বেড়িয়ে আসবো। কি হে সূর্যকুমার, প্ল্যানটা কি রকম? তা হলে সামনের মাসে—

সূর্য বললো, আমি সামনের মাসে যেতে পারবো না। আপনারা যান, আমার কতগুলো কাজ আছে এখানে—

—ঠিক আছে, তোমার কাজ সেরে নাও! তা হলে পুজোর সময় যাওয়া যেতে পারে। তখন গরমটাও কম থাকবে!

শ্রীলেখা আর আগের মতন ভীতু ভীতু ছেলেমানুষ নেই। এখন সে সোজাসুজি সূর্যর চোখের দিকে তাকাতে পারে, অন্যদের সামনেও সূর্যর সঙ্গে কথা বলতে পারে সাবলীলভাবে। সূর্যই বরং তার চোখে চোখ রাখে না। যখন তাকায়, তখন মনে হয় যেন সে শ্রীলেখাকে দেখছে অনেক দূর থেকে। কিংবা শ্রীলেখাকে সে ভালোভাবে চেনে না।

তিনতলায় বড়বাবুর ঘরে সূর্য আর বাদল বই আর কাগজপত্র গুছিয়ে রাখছিল। শ্রীলেখা সূর্যর জন্য এক গেলাস দুধ নিয়ে উঠে এলো তিনতলায়। মেঝেতে সব কিছু ছড়ানো। বাদল তড়াক করে উঠে পড়ে বললো, বড়দি, তুমি এখানে একটু কাজ করো তো। এই বইগুলো গুছিয়ে রাখো—আমি একটু নীচ থেকে আসছি।

বাদলের নীচে কোনো কাজ ছিল না। কিন্তু সে বড় হয়েছে, এখন অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে। বড়দি আর সূর্যদাকে এখন একটু একলা কথা বলার সুযোগ দেওয়া দরকার।

শ্রীলেখা বসে পড়ে বই গুছোতে শুরু করলো। বড়বাবুর ভ্রমণ কাহিনী পড়ার বাতিক ছিল। বহু দুর্লভ সব ভ্রমণ কাহিনী রয়েছে তাঁর সংগ্রহে। সূর্য বইগুলো সাজিয়ে রাখার বদলে এক একটা বইয়ের পাতা খুলে বিষয়বস্তু সম্পর্কে মনোযোগী হয়ে উঠছে।

শ্রীলেখা খুব সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করলো, দীপ্তিদি এলেন না একদিনও?

সূর্য শ্রীলেখার দিকে তাকালো। শ্রীলেখার মুখ দেখলে বোঝা যায়, সে দীপ্তিদির সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে। মেয়েরা মেয়েদের কথা ঠিক জেনে যায়।

সূর্য সংক্ষিপ্তভাবে বললো, আসবার কথা তো ছিল।

—ওঁকে একদিন নিয়ে এলে তো হয়। বাদলকে পাঠাবে?

—নিজেই আসবে?

—খবর পেয়েছেন নিশ্চয়ই। তার পরেও যখন আসেন নি, তখন নিশ্চয়ই কোনো

অসুবিধে আছে। একটা খবর নেওয়া দরকার না?

—হুঁ।

—পরশুর জন্য দীপ্তিদিকে নেমন্তন্ন করেছো? তুমি নিজেই যাও না।

—যাবো।

—আমার খুব ইচ্ছে করে দীপ্তিদিকে দেখতে।

—অনেকটা তোর মতনই চেহারা।

শ্রীলেখা লজ্জা পেয়ে বললো, যাঃ, কি যে বলো! আমার থেকে অনেক বেশী সুন্দর।

—কে বলেছে তোকে?

আমি জানি। আমাকে বাদল বলেছে—। তা ছাড়া দীপ্তিদির কত গুণ। আমি না দেখেই দীপ্তিদিকে ভালোবেসে ফেলেছি। বড়বাবু দেখেছিলেন দীপ্তিদিকে?

—না।

—ইস্! এর কোনো মানে হয়? উনি তো একদিন এসেছিলেন এ বাড়িতে?

সূর্য একটু হাসলো। বাদলের কোনো গল্প করতেই বাকি নেই। দীপ্তিদি কিছুতেই আসতে চায় নি—সূর্য জোর করে একদিন তাকে নিয়ে এসেছিল এ বাড়িতে।

সূর্য বললো, বাবা তখন বাড়ি ছিলেন না।

—অসুখের সময়েও যদি একদিন নিয়ে আসতে!

কথা ঘোরাবার জন্য সূর্য বললো, তোর ডান পাশের ওই বইটা দে। তুই এখন কেমন আছিস?

বইটা এগিয়ে দিয়ে শ্রীলেখা বললো, এই এক রকম। এক এক সময় আমার কি মনে হয় জানো সূর্যদাঃ সেই যে আমাদের তালতলার বাড়ির সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তুমি আমাকে বলেছিলে—তোমার সঙ্গে চলে যেতে—মাঠে ঘাটে নদীর ধারে থাকতাম তোমার সঙ্গে—কেন যে সে কথাটা শুনি নি! দারুণ বোকা ছিলাম তখন।

—না গিয়ে ভালোই করেছিলি!

—কেন? এখন এই একঘেয়ে জীবন।

—তা হোক। ঐ রকম জীবনও সবার জন্য নয়। আমার জন্যও নয়।

—দীপ্তিদিও তো কত সাহস করে কত কিছু করেছেন। আমরা কিছুই করিনি।

—ওসব কথা এখন থাক।

শ্রীলেখা হাঁটুর ওপর থুতনি দিয়ে সূর্যর দিকে তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে। এক সময় ছিল যখন নির্জন ঘরে সে সূর্যর এত কাছাকাছি বসতে সাহস পেত না। সূর্য চোখের নিমেষে দস্যু হয়ে উঠতো। এখন সে অন্যমনস্কভাবে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে।

শ্রীলেখা একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বললো, আমি দীপ্তিদির সঙ্গে দেখা করে বলে দেবো, উনি যেন তোমার ঠিক মতন যত্ন নেন। তুমি সব সময় কি এত ভাবো?

—যাঃ, যত্ন নেবার আবার কি আছে?

—দীপ্তিদি তোমাকে যতই ভালোবাসুক, আমার চেয়ে বেশী কেউ কখনো তোমাকে চিনতে পারবে না।

—শ্রীলেখা তুই কিছুই জানিস না। দীপ্তিদি আমাকে মোটেই ভালোবাসে না। আমিই শুধু জোর করি। না হলে, এতদিন কি আমার সঙ্গে দেখা না করে থাকতে পারতো?

—তুমি ভালোবাসার বোঝো তো ছাই! অনেকদিন দেখা না হলেই বুঝি ভালোবাসা মরে যায়?

সূর্য এবার উঠে দাঁড়ালো। শ্রীলেখার দিকে আর তাকালো না। কয়েকদিন মাথায় তেল মাখেনি বলে চুলের রং লালচে হয়ে এসেছে। গালেও সেই রঙের দাড়ি। মন্থর পায়ে গিয়ে দাঁড়ালো জানলার কাছে। নীচের উঠোনে শ্রীলেখার ছেলে খুব খেলায় মেতে উঠেছে সান্ত্বনা আর মিহিরের সঙ্গে। সূর্য সেখানে দাঁড়িয়ে শিশুর খেলা দেখতে লাগলো।

॥ ৬৫ ॥

সূর্য আর বাদল নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছে। ভবানীপুরে বড়বাবুর বড় মা'র বাড়িতে সূর্য আগে কখনো আসে নি। বাদলের মনে পড়লো অনেকদিন আগে এ বাড়িতে সে বড়বাবুর হাত ধরে একদিন এসেছিল। তখন মন্দাকিনী বেঁচে ছিলেন। বড়বাবুর সঙ্গে মন্দাকিনীর কি সব বিচিত্র কথাবার্তা হয়েছিল—বাদলের অস্পষ্ট মনে আছে এখনো। মন্দাকিনী ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে মানুষের দিকে তাকাতেন, তাঁর ঠোঁটে রক্ত মাখানো থাকতো, তাঁর সামনে এসে বড়বাবু একেবারে শিশুর মতন হয়ে পড়তেন।

মন্দাকিনীর মৃত্যুর পর বাড়িটা অনেক বদলে গেছে। সেই গেট কিংবা বাগানে ফোয়ারা আর নেই। একতলায় সেই পুরোনো কায়দায় সাজানো বৈঠকখানাটিও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না—গোটা একতলা জুড়ে এখন একটা পাখা কোম্পানির অফিস।

জীমূত বাড়িতে নেই। জেল থেকে ছেড়ে দেবার পর তাকে দিল্লি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওখানেই বাকি পড়াশুনো শেষ করবে। রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য তার বাড়ির লোকের এই প্রয়াস।

সুরেশ্বর বড়বাবুর অসুখের সময় প্রায় প্রত্যেকদিন গিয়ে খোঁজ খবর নিয়েছেন, শ্মশানেও গিয়েছিলেন। সূর্যকে জড়িয়ে ধরে তিনি আবার কিছুক্ষণ কাঁদলেন। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললেন, অমরদার একটা ছবি আমাকে দিও। উনি আমার বড়-ভাইয়ের চেয়েও বেশী ছিলেন।

ওপর তলায় এসে একটা ব্যাপার দেখে বাদলের খুব অবাক লাগলো। মন্দাকিনীর ঘরটা অবিকল ঠিক সেই আগের মতনই সাজানো রয়েছে। শুধু বিছানার ওপর মন্দাকিনীর ছোট্ট কোঁকড়ানো শরীরটা নেই। প্রায় বারো-তের বছর আগে বাদল এই ঘরখানা একই রকম দেখেছিল, ওইখানে খাটের বাজুর পাশে বড়বাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘরটাকে এ রকম ভাবে সাজিয়ে রাখার মানে কি? এক একটা বাড়িতে কি সব অদ্ভুত নিয়ম থাকে। অনেক মহাপুরুষের ঘর আর ব্যবহৃত জিনিসপত্র এ রকম ভাবে সাজিয়ে রাখতে দেখেছে বাদল। হয়তো সুরেশ্বরের চোখে তাঁর মা-ও সেই রকম।

চিররঞ্জন নিমন্ত্রিতদের লিস্ট বানিয়ে দিয়েছিলেন। এ পাড়ার সব কটি বাড়ি সারা হয়ে যাবার পর ওরা গেল দীপ্তির বাড়িতে। বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। এই সময় দীপ্তি স্কুলে যান—বাড়িতে থাকার কথা নয়। কিন্তু তাঁর ঘরের বাইরে দুটো তালা ঝুলতে দেখায় অস্বাভাবিক মনে হলো। ওঁর ফ্ল্যাটে আর একটি যে মেয়ে থাকতো—তার ইতিমধ্যে বিয়ে হয়ে গেছে—কয়েক মাস ধরে দীপ্তিদি এখানে একাই ছিলেন।

তিন তলায় গিয়ে খবর নিয়ে জানা গেল, দীপ্তিদি দিন পনেরো আগে তাঁর বাবা-মায়ের কাছে চলে গেছেন কাটিহারে। না, কোনো চিঠিপত্র আসে নি। স্কুল থেকে ছুটি

নিয়েছেন বোধ হয়।

সূর্য আর কোনো উচ্চবাচ্য না করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো। বাদল একটু ভয়ে ভয়ে আড়চোখে তাকালো তার দাদার মুখের দিকে। তার দাদাটির কি রকম মেজাজ তা তো সে জানে। কিন্তু সূর্যর মুখে কোনো ভাব বৈলক্ষণ নেই। খুব শান্তভাবে বললো, এবার কোন দিকে যাবি?

নিমন্ত্রিতদের তালিকায় সূর্যর নিজস্ব বন্ধু বা চেনাশুনো বিশেষ কেউ নেই। চিররঞ্জন অনেকবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, সূর্য বলেছিল, না, সে রকম কারুকে তো মনে পড়ে না। জেলখানায় সূর্যর সঙ্গে যাঁরা একসঙ্গে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রৌঢ় সত্য-সুন্দর মুখোপাধ্যায় এখন পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী—চিররঞ্জনের বিশেষ ইচ্ছে ছিল তাঁকে আনার—সূর্য কোনোরকম উৎসাহ দেখায় নি।

ঘুরতে ঘুরতে ওরা চলে এলো বিষ্ণুদের বাড়িতে। ওরা গেট দিয়ে ঢুকে ঠাকুর দালানের সামনের বারান্দাটায় দাঁড়িয়েছে, ঠিক তখনই সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল রেণু। তরতর করে নামতে নামতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ানো রেণুর স্বভাব।

বাদলের মনে হলো, এটা একটা আশ্চর্য যোগাযোগ হলেও এ বাড়িতে সে যত-বার এসেছে, প্রায় প্রত্যেকবারই সে রেণুকে সিঁড়ির ওপর দাঁড়ানো অবস্থাতেই দেখেছে। মনে মনে যখনই সে রেণুর কথা ভাবতে চেষ্টা করে, রেণুকে একটা সিঁড়ির ওপরে দাঁড়ানো অবস্থাতেই দেখতে পায়। যেন রেণু নিজেই নেমে আসবে, না বাদলকেই ওপরে উঠে রেণুর কাছাকাছি পেঁৗছোতে হবে, তা এখনো ঠিক হয় নি। মোট কথা, সিঁড়িতে দাঁড়ানো অবস্থাতেই রেণুকে সবচেয়ে বেশী সুন্দর লাগে বাদলের চোখে।

রেণু ওদের দেখে বললো, দাঁড়াও ছোড়দাকে ডাকছি। আবার ওপরে উঠে গেল সে। একটু বাদেই বিষ্ণু নেমে এলো, কিন্তু রেণু ফিরলো না। এটা পছন্দ হলো না বাদলের। এ বাড়িতে এসে রেণুকে এক মুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল করতে ইচ্ছে করে না, সব সময় অস্বস্তি হয়, অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলার সময় মন বসে না। বিষ্ণু কয়েকদিন বাদেই বিদেশ চলে যাচ্ছে, তখন বাদলের এ বাড়িতে আসার উপলক্ষ কমে যাবে।

সেইদিনই ভোরে গঙ্গায় গিয়ে সূর্য ঘাট-কামাই করে এসেছে। মসৃণ মাথায় সূর্যকে একেবারে অন্য রকম দেখাচ্ছে। বিষ্ণু এসে বললো, একি?

অনেকেই মনে মনে ভেবেছিল, সূর্য মাথা ন্যাড়া করবে না। এ ব্যাপারে তাকে কেউ খুব একটা জোর করারও সাহস পেত না। জোর করেও নি কেউ, হিমানী একবার মাত্র কথাটা উচ্চারণ করায় সূর্য রাজি হয়ে গিয়েছিল। এ কদিন কোনো কিছুতেই সে আপত্তি জানাচ্ছে না। বোধহয় সংসারের সব রকম বন্ধন ছিঁড়ে ফেলার আগে সে শেষবারের মতন সকলকে খুশী করে যাচ্ছে। মুণ্ডিত মস্তক, পরনে নতুন কোরা কাপড়, বিষন্ন গম্ভীর মুখ—সূর্যকে সবার মাঝখানে বেখাপ্পা মনে হয়।

প্রথাসিদ্ধভাবে নেমন্তন্ন করে সূর্য বললো, বিষ্ণু, তোমাদের সবাইকেই যেতে হবে কিন্তু। তোমাকে যেতে হবে দু' দিন। শ্মশানবন্ধুদের জলপানের সময়েও তোমাকে থাকতে হবে।

বিষ্ণু বললো, আমাকে এ ভাবে বলছেন কেন? আমি তো যাবোই।

—তোমার মা, বাবা, জ্যাঠাইমাদের আলাদা করে বলা উচিত নিশ্চয়ই।

—চলুন না ওপরে।

এই সময় রেণু একটা ট্রেতে করে দু' গেলাস সরবৎ নিয়ে এলো। উচ্ছলভাবে বললো, সূর্যদাকে দেখে আমি প্রথমটায় একদম চিনতে পারি নি। আপনাকে কি রকম দেখাচ্ছে বলবো?

বাদল রেণুর মুখের দিকে তাকালো। সে দৃষ্টির ইঙ্গিত দিয়ে বোঝাতে চায় যে সূর্যদার আজ মন ভালো নেই, তার সঙ্গে হালকা ভাবে কথা না বলা ভালো।

রেণু সেই ইঙ্গিত লক্ষ্য করলো না। বললো, আপনাকে ঠিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মতন দেখাচ্ছে।

কাকে কখন কি রকম দেখায়, কোন্ পোশাকে কাকে কি রকম মানায়—তা মেয়েরাই বেশী লক্ষ্য করে। বাদল এতক্ষণ তার সূর্যদাকে কি রকম দেখাচ্ছে—সে বিষয়ে মাথা ঘামায় নি। রেণুর কথা শুনে মনে হলো, রেণুর বর্ণনাটা যেন ঠিক। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সে কোনোদিন দেখেনি—কিন্তু এই রকমই হওয়ার কথা।

সূর্য এ কথা শুনে চুপ করে রইলো। রেণু আবার বললো, আপনাকে অন্য সময় দেখলেও কেন যেন সন্ন্যাসীর মতন মনে হয়।

সূর্য এবার মুখ তুলে বললো, আমাকে? আগে তো কেউ কখনো বলে নি—

—বলে নি? আমি একবার একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর ছবি দেখেছিলাম, হুবহু আপনার মতন।

সূর্য বললো, রেণু, তুমি হঠাৎ বড় হয়ে গেছো। লক্ষ্যই করিনি!

—আপনার মনে আছে, আপনি সেই যে বাদলের সঙ্গে একদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন, আপনার মাথা ফেটে গিয়েছিল—

—তোমার সে কথাও মনে আছে?

—আমার সব মনে থাকে।

বাদল বললো, তোর কি মনে আছে, বড়বাবু কবে এ বাড়িতে এসেছিলেন?

রেণু বললো, উনি এসেছিলেন কখনো? জানি না তো!

—উনি এসেছিলেন, তোকে কোলে করে নিয়ে এসেছিলেন। তুই সেই যে গঙ্গার ঘাটে হারিয়ে গিয়েছিলি?

রেণু লজ্জা পেয়ে বললো, ধ্যাৎ!

বিষ্ণু বললো, তুই তখন এইটুকুনি পুঁচকে মেয়ে—

রেণু বললো, আমি মোটেই হারিয়ে যাইনি—

বাদল বললো, আ-হা-হা। আমি না দেখলে তোকে আর কোনোদিন খুঁজেই পাওয়া যেত না। এখনও তো তোর মধ্যে কি রকম যেন একটা হারাই হারাই ভাব!

রেণু বললো, বাদল, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি!

বিষ্ণু বললো, এই রেণু তোকে কতদিন বলেছি, তুই বাদলের নাম ধরে ডাকবি না। বাদলদা বলতে পারিস না?

রেণু বললো, এতদিন পরে আবার নতুন করে বলা যায় বুঝি?

বাদল বললো মোটেই নতুন করে না। আগে তুই তো আমাকে বাদলদাই বলতি। মাঝখানে হঠাৎ খুব বড় বড় ভাব দেখাতে লাগলি তো—

রেণু বললো, কেন, নাম ধরে ডাকলে আপত্তি কি আছে?

সূর্য বললো, রেণু, তোমার চোখে চশমা ছিল দেখেছিলাম না—

—এখন আর পরতে হয় না। আমার চোখ ভালো হয়ে গেছে।

বিষ্ণু বললো, দেখুন না—রেণুর চোখ ভালো হয়ে গেল—কিন্তু আমাকে এবার

চশমা নিতে হবে।

বাদল বললো, তুই খুব মোটা কালো ফ্রেমের চশমা নিবি। তোকে মানাবে। আমারও খুব চশমা পরার শখ।

রেণু বললো, থাক্, অত শখে কাজ নেই।

কত সহজে কথার প্রসঙ্গ বদলে যায়। যৌবনের চাঞ্চল্য কখনো এক বিষয়ে থেমে থাকতে পারে না। দশ মিনিটের মধ্যে দেখা গেল ওরা সম্প্রতি কলকাতার আকাশে দেখতে পাওয়া ধূমকেতু বিষয়ে কথা বলছে। বিষ্ণু বলতে লাগলো হ্যালির ধূমকেতু সম্পর্কে তথ্য। তার একটু পরে সূর্যকে নিয়ে ওরা ওপরে গেল বাড়ির অন্যদের নেমন্তন্ন করতে। ফিরে আসার সময় রেণু খুব গোপনে একটা চিঠি দিয়ে দিল বাদলের হাতে। বাদল সঙ্গে সঙ্গে পকেটে পুরে দিল হাতটা।

ওরা বাড়ি ফেরার পর থেকেই শ্রীলেখা সুযোগ খুঁজতে লাগলো বাদলের সঙ্গে আড়ালে কথা বলার। বাদল বিকেলের দিকে তাড়াহুড়ো করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, শ্রীলেখা একতলায় দরজার কাছে তাকে ধরে বললো, এই শোন্! দীপ্তিদি কি বললো রে? আসবে তো?

বাদল বললো, দীপ্তিদির সঙ্গে তো দেখাই হলো না। দীপ্তিদি নেই এখানে, মা-বাবার কাছে চলে গেছেন।

এটা যেন শ্রীলেখার কাছে একটা ব্যক্তিগত দুঃসংবাদ—শ্রীলেখার মুখখানা সেই রকম ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অস্ফুট ভাবে বললো, দেখা হলো না? কোথায় গেছেন?

বাদল বললো, কাটিহার না কালনা কি যেন একটা জায়গা।

—কোনো খবরও দিয়ে যায় নি?

—না।

—ব্যাপারটা কি বলতো? কি হয়েছে?

বাদল বড়দিকে রীতিমতন একটা ধমক দিয়ে বললো, তুমি এ নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছো কেন? বলে দেবো প্রভাসদাকে সব কথা।

—কি বলবি? এই বাঁদর ছেলে, কি বলবি রে!

—সে যা বলার আমি বলবো।

—বড্ড পাকা হয়েছিস। শোন, তুই একটা কাজ করতে পারবি? আমি আরও সাত-আট দিন থাকবো এখানে। দীপ্তির বাড়ি কোথায় খোঁজ নিয়ে তুই সেখান থেকে একবার ঘুরে আয় না। আমি তোকে ভাড়ার টাকা দেবো।

বাদল হাসতে হাসতে বললো, তুমি ভাড়া দিলে আমার বেড়িয়ে আসতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার এত আগ্রহ কেন বলো তো?

—আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে দীপ্তিদিকে। তাছাড়া সূর্যদা মন খারাপ করে থাকবে সব সময়—এটা আমার ভালো লাগে না।

—ঠিক আছে। সূর্যদাকে জিজ্ঞেস করতে হবে তো?

—ওকে জিজ্ঞেস করার দরকার কি?

—ওরে বাবা, সূর্যদাকে জিজ্ঞেস না করলে কি রকম মেজাজ করবে কে জানে! তুমি ওর কাছ থেকে পারমিশন করিয়ে নাও, আমার যেতে কোনো আপত্তি নেই।

বাদল বেরিয়ে যাবার পর শ্রীলেখা গেল সূর্যর কাছে। চিররঞ্জন তখন নেমন্তন্নর এসটিমেট করছিলেন প্রভাস, মিহির আর সূর্যর সঙ্গে। এই আলোচনা সহজে শেষ হয় না। শ্রীলেখা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো, সূর্যর সঙ্গে একবার চোখাচোখি

হতেই হাতছানি দিয়ে ডাকলো তাকে।

সূর্য উঠে এসে বললো, কি?

বারান্দার প্রান্তে সরে এসে শ্রীলেখা বললো, সূর্যদা, তোমার খুব মন খারাপ না?

সূর্য একটু অবাক হয়ে বললো, কেন?

—দীপ্তিদি তোমাকে খবর না দিয়ে চলে গেছেন—

—তাতে কি হয়েছে। নিশ্চয়ই কিছু জরুরি কাজ ছিল। কিংবা বাড়ি থেকে বোধ হয় কোনো চিঠি এসেছে—

—আগে কখনো গিয়েছেন এই রকম?

—তা না হলেই বা। কি হয়েছে তাতে?

—যত জরুরি কাজই থাক—এ রকম কোনো খবর না দিয়ে কেউ যায় না।

সূর্য ভুরু কুঁচকে তাকালো শ্রীলেখার দিকে। শ্রীলেখার চোখে মুখে একটু উত্তেজনার চিহ্ন। তার ব্যবহারের মানে বোঝা যাচ্ছে না।

সূর্য বললো, বাড়িতে এত কাজকর্ম—এখন আমার এ সব কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ই নেই।

শ্রীলেখা তবু কিছু বলতে যাচ্ছিল, বলা হলো না। কারণ এই সময় সান্ত্বনা ছাদ থেকে নেমে এলো কাঁপতে কাঁপতে। সে ছাদের ঘরে বড়বাবুকে দেখেছে!

সান্ত্বনা এই নিয়ে তিনবার ভূত দেখলো। ছেলেবেলায় একবার তার যে মাথার গোলমালের মতন দেখা গিয়েছিল, সেটা সেরে গেলেও মাঝে মাঝে হঠাৎ দু' একটা উদ্ভট ব্যাপার বেরিয়ে পড়ে। এর আগের দিন সে ভূত দেখার কথাটা শুধু তার মাকে বলেছিল। হিমানী সঙ্গে সঙ্গে সেটা চাপা দিয়ে দিয়েছেন।

এবার সান্ত্বনা সবার সামনে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, তোমরা দেখবে এসো—ছাদের ঘরে বড়বাবু ইজিচেয়ারে বসে আছেন, আমাকে দেখে হাসলেন—তোমরা তো আমার কথা বিশ্বাস করো না—

সবাই দুদ্দাড় করে উঠে এলো ছাদে।

সান্ত্বনার উৎসাহই সবচেয়ে বেশী, চিররঞ্জন শক্ত করে তার হাত ধরে রাখলেন। সান্ত্বনা বড়বাবুর ঘরে শূন্য ইজি চেয়ারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, ঐ দ্যাখো, ঐ যে—।

সবাই সেদিকে তাকিয়ে বললো, কই?

সান্ত্বনা চেঁচিয়ে বললো, তোমরা দেখতে পাচ্ছো না? উনি হাসছেন।

সান্ত্বনার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম, চোখ দুটি বিস্ফারিত—কৌতুক করার ইচ্ছে কিংবা মিথ্যে বলার কোনো লক্ষণই সেখানে নেই। সে সত্যি দেখতে পাচ্ছে।

হিমানী তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এসে সান্ত্বনাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুই নীচে চল্। শিগগির নীচে চল্।

সান্ত্বনা কাঁদতে কাঁদতে বললো, বড়বাবু বসে আছেন, তোমরা কেউ দেখতে পাচ্ছো না? তোমরা কি? এর মধ্যেই বড়বাবুকে ভুলে গেলে।

হিমানী জোর করে সান্ত্বনাকে নীচে নিয়ে গেলেন। সে এখন সন্তানসম্ভবা, এই সময় ভয়টয় পেলে কত বড় বিপদ হয়ে যাবে। তা ছাড়া, জামাই যদি কিছু মনে করে—

পরের কয়েক দিন হিমানী সর্বক্ষণ সান্ত্বনাকে আগলে রাখলেন। অন্য কোনো কাজে মন দিতে পারলেন না। সুতরাং বড়বাবুর শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন কোনোক্রমে সারা হলো।

সব কিছু মিটে যাবার পর চিররঞ্জন সূর্যকে নিভৃতে বললেন, এবার বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারটা একটু দেখাশুনো করা দরকার। তোমাকেই তো সব বুঝে নিতে হবে।

সূর্য বললো, আপাতত আপনিই সব দেখুন। আমি এখন কিছুদিন কলকাতায় থাকবো না।

দু' দিন পরেই সূর্য কলকাতা ছেড়ে চলে গেল। কোথায় গেল, বলে গেল না কারুকে।

॥ ৬৬ ॥

হিরোসিমায় যেদিন অ্যাটম বোমা পড়ে, সেদিনও পৃথিবীতে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার শিশুর জন্ম হয়েছিল, প্রায় এক লক্ষ নারী পুরুষ বিয়ে করেছিল এবং অন্তত একশো কোটি লোক নিছক আহার্য সন্ধান ছাড়া আর কোনো কিছু চিন্তাই করেনি। অন্যান্য দিনের মতন সেদিনও যথারীতি সারা পৃথিবী জুড়ে বেশ কিছু নারী পুরুষ আত্মহত্যা করেছে। সেই দিন সেই সময়ে ভাটপাড়ায় এক ভদ্রলোক সনাতন হিন্দু ধর্মকে বাঁচাবার জন্য দারুন উত্তেজিত, নারায়ণগঞ্জে তখন ইসলাম বিপন্ন বলে ছোট একটি সভা হচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই আসামের হাফলং-এ প্রত্যন্ত পাহাড় থেকে আসা এক কাছাড়ী আদিবাসী সদ্য খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে জীবনে প্রথম এক টুকরো পাঁউরুটি খেতে পেল এবং ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে কেঁদে ফেললো। সেই দিনই দুপুরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালাবামা রাজ্যে এক তুলো ক্ষেতে দু-দল খৃষ্টান নিছক দুরকম গায়ের রঙের জন্য দাঙ্গা করেছিল।

পৃথিবীতে মানুষের কোনো চরিত্র নেই। প্রত্যেক জন্তু জানোয়ারের চরিত্র থাকে, মানুষ জাতিই শুধু চরিত্রহীন। স্পেনে গত তিনশো বছর ধরে যে ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই খেলা হচ্ছে, তাতে এত দিনের মধ্যে একটি ষাঁড়ও সোজা ছুটে আসতে আসতে হঠাৎ ডান দিকে বা বাঁ দিকে বেঁকেনি। মানুষ এরকম নয়। মানুষ কখন কোনদিকে বেঁকবে তা সে নিজেও জানে না। সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে একদল লোক বাঘের পেটে প্রাণ দেয়। আবার একদল লোক সারা পৃথিবীর ব্যাঘ্র সম্পদ বাঁচিয়ে রাখার জন্য সমিতি গড়ে। একজন সন্ন্যাসীর হঠাৎ পদস্খলন হয়ে যায়। একজন ডাকাত হঠাৎ কবি হয়ে ওঠে।

মানুষের সুখেরও কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই। একদল লোক সারা দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে চিন্তিত। ভবিষ্যতের এক সুস্থ সমৃদ্ধ মানবসমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছে। অবশ্য সেই সমাজের নিয়ন্ত্রণভার তাদেরই হাতে থাকা চাই। আবার একদল লোক খাদ্যশস্য গোপন গুদামে মজুত রেখে হাজার হাজার লোককে না খাইয়ে মারে। দু' দলই সুখের সন্ধানী। মন্দিরের দেওয়ালে সূক্ষ্ম কারুকার্য সৃষ্টি করায় কারুর আনন্দ, কারুর আনন্দ সেই মন্দির ভাঙায়। কেউ একটি নারীর সামান্য সম্মতি পাবার জন্য পাগল হয়, কেউ টাকা দিয়ে নারীকে কিনে আনে।

সকাল বেলা শুয়ে শুয়ে আমি এই সব কথা ভাবছিলাম। নিতান্তই অলস চিন্তা। এসব চিন্তারও কোনো মূল্য নেই। পৃথিবী আপন খেয়ালে চলবে। আমার এখন কোনো কাজ নেই বলে আমি যা খুশী আবোল তাবোল ভাবতে পারি। দিবাস্বপ্ন দেখতেও

কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু একটু বাদে আমার খিদে পেলে আমাকে বিছানা ছেড়ে উঠতেই হবে। মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ আমার খুব পেট ব্যথা করে। তখন আমি যন্ত্রণায় চারদিক অন্ধকার দেখি। সেই সময় পৃথিবীর আর কোনো সমস্যাই আমার কাছে সমস্যা নয়। তখন পৃথিবীটা উচ্ছন্নে যায় যাক্।

মেঘলা মেঘলা দিন, বিছানা ছেড়ে আর উঠতেই ইচ্ছে করছে না। খবরের কাগজে চোখ বুলোনো হয়ে গেছে। খানিকটা আগে এক কাপ চা খেয়েছি বটে, কিন্তু জলখাবার খেতে হলে আমাকে উদ্যোগী হতে হবে। এখনো খিদে পায়নি। আর এক কাপ চা খেতে পারলে বেশ হতো। কিন্তু মায়ের কাছে চা চাইলেই মা বিছানা ছেড়ে ওঠবার জন্য তাড়া দেবে। মার চোখে আমি কুঁড়েদের বাদশা। তার থেকে চুপচাপ থাকাই ভালো। এখনো আমার বিছানা ছেড়ে না-ওঠা কেউ লক্ষ্যই করেনি।

আজ সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকলে কেমন হয়? কিছুই তো করার নেই। কোথাও যাবার নেই। এম এ ক্লাস এখনো শুরু হয়নি। তাছাড়া এম এ পড়া হবে কিনা তারও ঠিক নেই। ওসব আর এখন ভাবতে ইচ্ছে করে না। তার চেয়ে শুয়ে থাকা কত ভালো। অসুখ না হলেও কি কেউ সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে না!

কিন্তু একবারে চুপচাপ শুয়ে থাকাও সম্ভব নয়। কিছু না কিছু চিন্তা করতেই হয়। জাগ্রত অবস্থায়, কোনো কিছু চিন্তা না করে একটা নিরবচ্ছিন্ন শান্তভাব কি কেউ পেতে পারে? আসলে আমি লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে আছি বলেই বিছানায় মুখ গুঁজে আছি। চিন্তার হাত থেকেও মুক্তি চাইছি।

শিয়রের কাছে লাল রঙের মলাট বাঁধানো আমার কবিতার খাতা। হঠাৎ সেটার দিকে তাকিয়ে আমার রাগ হয়ে গেল। ঠেলা দিয়ে ফেলে দিলাম মাটিতে। পরে ওটাকেই ছাই গাদায় ফেলে দিতে হবে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে। কবিতা টবিতা আর লিখবো না। কিছুই লিখবো না।

এতক্ষণে পার্টি অফিসে অনেকে এসে গেছে। মুড়ি আর তেলেভাজা খেতে খেতে নিশ্চয়ই দারুণ আড্ডা জমেছে। কেউ কি একবারও বলবে, বাদল ক'দিন ধরে আসছে না কেন? কেউ বলবে না। পার্টির ডিসিপ্লিন দারুণ কড়া। মণ্টুর সঙ্গে আমার এত বন্ধুত্ব ছিল, মণ্টুও কাল সন্ধ্যেবেলা আমার সঙ্গে গম্ভীরভাবে কথা বললো। আমি কি এমন দোষটা করেছি? আদিনাথদার সঙ্গে তর্ক করেছি। তর্ক করাটাও দোষের? যেটা আমি বুঝতে পারছি না, সেটা আমাকে বুঝে নিতে হবে না? বিনা প্রশ্নে চুপচাপ সব মেনে নিলেই কি সত্যিকারের মেনে নেওয়া হয়?

আমার এখন ছুটি, এই সময় আমি পার্টির অনেক কাজ করতে পারতাম। কয়েক-জনকে হায়দ্রাবাদ—তেলেঙ্গানায় পাঠানো হচ্ছে, আমিও তাদের দলে যেতে রাজি ছিলাম। কিন্তু আদিনাথদার মতে আমি এখনো যথেষ্ট তৈরী হইনি। আমার মধ্যে এখনো অনেক পেটি বুর্জোয়া সেন্টিমেন্ট রয়ে গেছে। আমাকে পার্টি মেম্বারশিপ দেবার এখনো সময় আসেনি। আমি আদিনাথদাকে খুশী করার অনেক চেষ্টা করেছি। তবু আদিনাথদার মন পেলাম না।

ব্যাপারটা হয়েছিল দু' সপ্তাহ আগে। রাজবল্লভপাড়ার একটা বাড়িতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা গল্প পড়ার কথা ছিল। ওঁর শরীর অসুস্থ বলে উনি আসতে পারলেন না। তখন আমাদেরই কয়েকজন নিজেদের লেখা পড়লো। আমাকেও একটা কবিতা পড়তে বলা হয়েছিল। আমি কিছুতেই রাজি হইনি। লোকজনের সামনে

কবিতা পড়তে আমার জিভ আটকে যায়। তা ছাড়া আমি কোনো লেখাটেখা নিয়েও যাইনি। সব সময়েই তো পকেটে কবিতা থাকে না।

তবু কয়েকজন পেড়াপিড়ি করতে লাগলো। বিশ্বদেব বললো, তোমার একটাও মুখস্থ নেই?

আমি বললাম, আমার অন্যদের কবিতা মুখস্থ থাকে। নিজের কবিতা মুখস্থ থাকে না।

বিশ্বদেব তখন ওর টেবিল ঘেঁটে ফস করে একটা পত্রিকা বার করলো। সেই পত্রিকাটায় আমার একটা কবিতা ছাপা হয়েছে। পত্রিকাটি নতুন, বিশেষ কোনো মতবাদ নেই।

বিশ্বদেব বললো, এতে যে কবিতাটা আছে, সেটাই পড়ে শোনাও।

তখন আর এড়ানো গেল না। কিন্তু ঐ কবিতাটা আমার ঐ আসরে একেবারেই পড়ার ইচ্ছে ছিল না—নিতান্তই একটা ব্যক্তিগত অনুভূতির লেখা।

যাই হোক, আমার কবিতাটা পড়ার পর কেউ কোনো মন্তব্য করলো না। সাধারণত সবার রচনা নিয়েই পরে কিছু আলোচনা হয়। আমার লেখাটার পর সবাই অন্য কথা বলতে লাগলো। আমি দুরুদুরু বুকে সকলের মুখের দিকে চাইলাম। মনে হলো কেউই পছন্দ করেনি। বন্দনা সেনগুপ্ত সব আলোচনাতেই অংশ নেন, এখন তিনি মুখখানা বাংলার পাঁচ করে আছেন।

ওখান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেনট্রাল এভিনিউয়ে আসবার পর আদিনাথদা বললেন, বাদল, তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

পানের দোকান থেকে আদিনাথদা চুরুট কিনলেন, আমিও সিগারেট ধরালাম। আজকাল সবার সামনেই সিগারেট খাই। রেণু ছাড়া।

আদিনাথদা বললেন, কি পড়লি আজকে? ওটা কি কবিতা?

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললাম, না, ভালো হয়নি ঠিক।

—ভালো-মন্দর কথা হচ্ছে না। ঐ সব বস্তাপচা জিনিস নিয়েও এখন কবিতা লেখা হয়?

আমি চুপ করে রইলাম। আদিনাথদা কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ঠিক করে বল্ তো, তুই কি বরুণ ঘোষদের সঙ্গে ভিড়ছিস?

আমি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বললাম, মোটেই না। আমি ওদের কাগজে লেখা দিইনি।

বরুণ ঘোষকে নিয়ে কিছুদিন আগে একটা কাণ্ড হয়ে গেছে। বরুণ ঘোষ তরুণদের মধ্যে রীতিমতন নামকরা কবি, ইউনিভার্সিটিতে ইউনিয়নের কর্মী। তার লেখা গান আই পি টি-এ থেকে গাওয়াও হয়েছিল। কিন্তু ইদানীং বরুণ ঘোষ প্রেমে পড়ে গিয়ে বেশ কিছু প্রেমের কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। স্বীকার করতেই হবে, কবিতা হিসেবে সেগুলো চমৎকার। কিন্তু সেই নিয়ে পার্টির মধ্যে আপত্তি ওঠে। শেষ পর্যন্ত কথাবার্তা অনেক দূর গড়ায়। বরুণ ঘোষ বরাবরই চটাং চটাং কথা বলে। শেষ পর্যন্ত বরুণকে পার্টি থেকে এক্সপেল করা হলো। বরুণ ঘোষও তেজের সঙ্গে বলে গেছে, আমি আলাদা কাগজ বার করবো। আমি দেখিয়ে দেবো, বাংলা কবিতা কোন দিকে মোড় নেয়। বরুণ ঘোষের পত্রিকা সত্যিই এর মধ্যেই বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

স্বাধীনতার ঠিক পরপরই অধিকাংশ লেখকই বামপন্থার দিকে ঝুঁকেছিল।

অনেকেই তখন মার্কসবাদী। কিন্তু কয়েক বছর পরে সবার লেখা নিয়ে যখন চুলচেরা বিচার করে দেখানো হতে লাগলো, কে কতখানি মার্কসবাদী, কোনটা লেখা উচিত আর কোনটা লেখা উচিত নয়—এই নিয়ে পার্টি থেকে যখন বেশ জবরদস্তি হতে লাগলো—অনেক লেখকই তখন সরে গেলেন বীতশ্রদ্ধ হয়ে। তাদেরই শেষ উদাহরণ বরুণ ঘোষ।

কিন্তু বরুণ ঘোষদের দিকে যাবার কোনো কারণই নেই আমার। বরুণ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত লেখক, সাহিত্যটা তার জীবন মরণের সমস্যা। আমার তো তা নয়। বাদল মুখার্জির দুটো চারটে কবিতা শুধু এদিক সেদিকে বেরিয়েছে। না লিখলেও আমার কিছু আসে যায় না। আমি কাজ করতে চাই। আমি একটা আদর্শকে বিশ্বাস করেছি, আমি সেটা নিয়েই থাকতে চাই।

বরুণ ঘোষ সংক্রান্ত আলোচনার সময় আমি কোনো মন্তব্য করিনি। পার্টির নির্দেশ মেনে নিয়েছি, বরুণ ঘোষের কাগজে লেখা দিইনি—কিন্তু তাকে আমি এখনো ভালো কবি মনে করি। এখন যে সবাই মিলে তাকে রি-অ্যাকশনারি বলতে শুরু করেছে, তা আমি মানতে পারি না। আদর্শের মিল না হলেই একজনকে শ্রেণী স্বার্থের দালাল বলতে হবে? বরুণ ঘোষ মানুষটা যে খাঁটি, তা জোর করে অস্বীকার করা হচ্ছে।

কিছু কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপারেও এখন পার্টির নির্দেশ আসছে। রেণুর সঙ্গে আমি এখানে সেখানে বেড়াই সেটা কয়েকজন দেখে ফেলেছে। প্রথম প্রথম এই নিয়ে হাসি ঠাট্টা করেছে কেউ কেউ। তারপর আমাকে আস্তে আস্তে বুঝিয়ে দেওয়া হলো, রেণুর সঙ্গে যদি আমাকে মিশতেও হয়—তাহলে আমার উচিত রেণুকে দিয়ে পার্টির কিছু কাজ করানো। আমি তাও চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু রেণু অন্য ধরনের মেয়ে। পড়াশুনো করতেই ভালোবাসে, বেশী লোকজনের সঙ্গে মিশতে পারে না। এখন আমি রেণুর সঙ্গে যথাসম্ভব গোপনে দেখা করি।

আদিনাথদা বললেন, আজ যে কবিতাটা পড়লি, তাতে কি যেন একটা লাইন ছিল? আঁচল দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দিলে, বারবার ঘামে ভেজা মুখ নিয়ে তোমার কাছে ছুটে আসবো?

কবিতার লাইন কেউ ভুল বললে আমার বিশ্রী লাগে। অনেক মনোবেদনা, অনেক আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব নিয়ে একটা কবিতা লেখা হয়। সেটা ভালো হোক বা খারাপ হোক—তবু তার সঙ্গে সেই দুঃখ জড়িয়ে থাকে। কেউ তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করলে মনে বড় লাগে। কিন্তু প্রতিবাদ তো করা যাবে না। ছাপা হয়ে গেলে সে সম্পর্কে যা খুশী মন্তব্য করার অধিকার সকলেরই আছে।

ঐ কবিতাটা লেখার আগের দিন দুপুরবেলা রেণুর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল কফি হাউসে। আমি তার আগে মায়ের জন্য জর্দা কিনতে গিয়েছিলাম বড়বাজারে। বড়বাজারের একটা বিশেষ দোকানের জর্দা ছাড়া মার অন্য জর্দা পছন্দ হয় না। ফেরার সময় হঠাৎ ট্রাফিক জ্যাম, বিশ্রী বিশৃঙ্খলা, রিক্সা, ঠ্যালা গাড়ি, লরি—এই সবের মধ্যে আবার দু তিনটে ষাঁড়। একটা ট্রামে আমি বন্দী হয়ে বসেছিলাম, অসহ্য গুমটের দিন, এদিকে আড়াইটে বেজে গিয়েছে। রেণু অপেক্ষা করে থাকবে।

ট্রাম থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করলাম। একটু বাদেই একটা ঘড়িতে দেখি, তিনটে পাঁচ। আগের ঘড়িটা কি ভুল দেখেছিলাম? আমার নিজের ঘড়ি নেই। আরও দু তিনটে দোকানের ঘড়ি মিলিয়ে দেখলাম। সত্যিই তিনটে বেজে গেছে। রেণু কি এতক্ষণ বসে থাকবে? ও নিশ্চয়ই ভাববে আমি ভুলে গেছি কিংবা অন্য কিছু। রেণু একলা

একলা রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, এই দৃশ্যটা আমাকে মুচড়ে দিল। আমি দৌড়োতে শুরু করলাম। আমাকে গিয়ে বলতেই হবে, আমি ভুলে যাইনি, সময় আমাকে ঠকিয়েছে।

কোনোক্রমে মিনিট দশেকের মধ্যেই কফি হাউসে পৌঁছে দেখলাম, একটা টেবিলে রেণু একলা চুপ করে বসে আছে। রেণু কফি হাউসে এর আগে একবার দুবার মাত্র এসেছে—এখানে বিশেষ কারুকে চেনে না। একলা এতক্ষণ বসে থাকা, একটি মেয়ের পক্ষে, মোটেই সুখকর নয়।

আমি ঝপাং করে রেণুর উল্টোদিকের চেয়ারে বসে পড়েই বলতে শুরু করলাম, জানিস বড়বাজারে...উঃ কি অবস্থা...

রেণু সবটা শুনলো। তারপর হাসতে হাসতে বললো, তুমি না এলেও আমি বসেই থাকতাম। রাত্তির পর্যন্ত বসে থাকতাম।

সেই টেবিল থেকে পাখা অনেক দূরে। হাওয়া এসে পৌঁছোচ্ছে না। আমি তখনও হাঁপাচ্ছি। রাস্তা দিয়ে দৌড়ে আসার জন্য আমার সারা শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। বসন্ত রোগীর মতন আমার মুখখানা ঘামের ফোঁটায় ভর্তি। এদিকে আবার রুমাল আনতে ভুলে গেছি। হাত দিয়ে বারবার ঘাম মুছেও কুল পাচ্ছি না।

এরকম ঘর্মাক্ত তেলতেলে মুখে রেণুর সামনে বসে থাকতে আমার খুব লজ্জা করছিল। রুমাল আনতে ভুলে যাবার জন্য ইচ্ছে হচ্ছিল নিজের মুখে একটা ঘুঁষি মারি। রেণুর সঙ্গে কথা বলবো কি, আমি শুধু ঘাম নিয়েই চিন্তা করছিলুম।

রেণু কফির কাপে একটু একটু চুমুক দিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। একটা হাল্কা নীল রঙের শাড়ী পরে আছে। গলায় একটা সরু হার। ডান পাশে সিঁথি কাটা।

রেণু জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে?

আমি বললুম, রুমাল আনতে ভুলে গেছি।

রেণু অবলীলাক্রমে ওর আঁচলটা এগিয়ে দিয়ে বললো, মুছে ফেল!

রেণু আজকাল বাইরে অন্য লোকজনের সামনে তুমি বলে। আগে ওকে বলে বলেও তুই ছাড়ানো যায়নি। হঠাৎ নিজেই একদিন বদলে ফেলেছে।

কফি হাউসে সেদিন আমার বন্ধুবান্ধব কেউ না থাকলেও, অনেকেই মুখচেনা। সকলের মাঝখানে বসে একটি মেয়ের আঁচল দিয়ে কি মুখ মোছা যায়? আশেপাশের টেবিল থেকে আওয়াজ দিতে পারে।

তবু দ্বিধা কাটিয়ে আমি কোনোক্রমে ওর আঁচলটা দিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ মুছে ফিরিয়ে দিলাম।

রেণু বললো, ভালো করে মুছলে না? ভালো করে মুছে নাও।

আমি লাজুকভাবে বললাম, অনেক লোক রয়েছে যে।

রেণু খুব স্বাভাবিকভাবে বললো, সেইজন্যই তো। লোকজন না থাকলে আমি নিজেই তো তোমার মুখটা মুছিয়ে দিতাম।

এক একটা কথা শুনলে হঠাৎ মনের মধ্যে শিহরণ বয়ে যায়। হঠাৎ আমার মনে হলো, রেণুর আঁচলটা সুগন্ধে ভরা। হয়তো অন্যদের কাছে এই ব্যাপারটা বা এই কথাটা অতি সাধারণই মনে হবে। আমি কি একটু বেশী বেশী রোমান্টিক?

সেদিন রেণুকে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে আমি বাসে ফিরছিলুম। অসহ্য ভিড়, তেমনি গরম। সারাদিন বৃষ্টি আসবে আসবে করেও আসেনি। আমার আবার শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরতে শুরু করেছে। তখন রেণুর আঁচলটা আর

একবার পাওয়ার জন্য আমার ভেতরটা ছটফট করতে লাগলো।

পরের দিন, এই বিষয় নিয়েই একটা কবিতা লিখে ফেলি। লেখার পরই মনে হলো কেন লিখলাম? এই ব্যাপারটা আমার এতই ব্যক্তিগত যে অন্য কারুকে কি বোঝানো যাবে? কিন্তু এক এক সময় নিজেকে প্রতিরোধ করারও ক্ষমতা থাকে না। কবিতা লিখতে বসে, সেই মুহূর্তে আমার আর কিছুই মনে পড়ছিল না, শুধু রেণুর আঁচলটা ছন্দোময় হয়ে ফিরে ফিরে আসছিল। এ ব্যাপারটা আদিনাথদাকে কি করে বোঝাবো!

আদিনাথদাকে বললাম, আমি চেষ্টা করেও ভালো লিখতে পারি না!

আদিনাথদা বললেন, সুকান্তর মতন লিখতে পারিস না?

—কোনো কবিই অন্য কারুর মতন লেখে না।

—সাহিত্য সম্পর্কে তোর ধারণা কি? সাহিত্য কিসের জন্য?

আমি শান্তভাবে কথা বললেও আমার ভেতরে ভেতরে দারুণ একটা রাগ জমছিল। কিন্তু সেই রাগের পরিমাণ যে এত বেশী, আমি নিজেও বুঝতে পারিনি।

হঠাৎ চেঁচিয়ে বললাম, আপনার সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করে কি হবে? আপনি সাহিত্যের কি বোঝেন?

আদিনাথদা একটু অবাক হলেও গলা চড়ালেন না। আমাকে উপদেশ দেবার ভঙ্গিতে বললেন, আমি অন্তত এইটুকু বুঝি, সাহিত্যকে একটা হাতিয়ার করে তুলতে হবে।

আমি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললাম, আপনার সঙ্গে এতদিন মিশে আমি বুঝতে পেরেছি, আপনার কোনো সাহিত্যবোধই নেই। যে নিজে সাহিত্য সম্পর্কে কিছুই বোঝে না, সাহিত্য সম্পর্কে তার ফতোয়া দেবার কোনো অধিকার নেই।

আদিনাথদা'র সঙ্গে এরকম সুরে কথা বলার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিল না। কোনোদিন এরকম করিনি। কিন্তু আমার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। নিজেকে সামলাতে পারলাম না কিছুতেই।

শেষ পর্যন্ত এমন হলো, আদিনাথদা অন্যদের নিয়ে উল্টোদিকে চলে গেলেন, আমি হাঁটতে লাগলাম একা একা। ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। সাহিত্য ফাহিত্য নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কোনো মানে হয় না। আমি লেখা ছেড়ে দিতে পারি যে-কোনো মুহূর্তে। কিন্তু আদিনাথদা আমার মনের কথাটা বুঝতে না পেরে কেন খোঁচা মেরে কথা বলছিলেন! একা একা হাঁটতে এত খারাপ লাগছিল যে আমি একটা পার্কে চুপ করে বসে রইলাম।

॥ ৬৭ ॥

কাটিহারে গিয়ে দীপ্তিদির বাড়ি খুঁজে বার করতে সূর্যর বিশেষ অসুবিধে হলো না। দীপ্তিদির বাবা ওখানকার স্টেশন মাস্টার, সূর্য জানতো।

কিন্তু সেখানে গিয়েও দীপ্তিদির দেখা পাওয়া গেল না। মাত্র ছ'দিন আগে দীপ্তিদি কাটিহার ছেড়ে চলে এসেছেন।

ছোট মফঃস্বল শহরে কোনো বাড়িতে একটি অনাত্মীয় যুবক কোনো মহিলার খোঁজ করে না এভাবে। কিন্তু সূর্যর ব্যবহারে কোনো জড়তা নেই। সূর্য সরাসরি এসে বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়েছে, যিনি বেরিয়ে এসেছেন, তাঁকে প্রথমেই বলেছে,

দীপ্তিদিকে একটু ডেকে দিন।

বেরিয়ে এসেছিলেন দীপ্তিদির বাবা। তিনি সূর্যর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনার নাম?

—সূর্যকুমার ভাদুড়ী।

—ভেতরে আসুন।

দীপ্তিদির বাবা খুব বেশী চমকিত হলেন না। মনে হয়, এ নাম তাঁর চেনা। তাঁর মেয়ে গোপনে রাজনীতিতে ঢোকার পর মাঝে মাঝেই অচেনা লোকজন এসে তার খোঁজ করেছে। তারা কেউ দীপ্তির নিজের দলের লোক, কেউ বা পুলিসের। কিন্তু দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে, এখন তো ওসব চুকেবুকে গেছে। এখন আবার সব কিছুই স্বাভাবিক হয়ে যাবার কথা।

তিনি সূর্যকে বললেন, তুমি চা খাবে? আমি তোমার কথা অনেকের মুখেই শুনেছি।

—দীপ্তিদি কোথায়?

—সে তো এখানে নেই।

সূর্য সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, কোথায় গেছেন?

দীপ্তিদির বাবা চোখের ইঙ্গিত করে বললেন, বসো। এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? এখানে এসে তুমি কোথায় উঠেছো?

সূর্য বললো, কোথাও না। আমি আজই ফিরে যাবো।

—আজ সারা দিনে আর কোনো ট্রেন নেই। ফিরবে কি করে?

—সেটা বড় সমস্যা নয়। দীপ্তিদির সঙ্গে আমার একবার দেখা করা দরকার।

—আমার বাড়িতে জায়গা আছে। তুমি আজ রাত্তিরটা এখানে থেকে যেতে পারো।

—দীপ্তিদি কোথায় গেছেন, আমি শুধু সেই কথাটা জানতে চাইছি।

—শোনো, তোমাকে আগে একটা কথা বলি। আমার ছেলেমেয়েদের ওপর আমি কখনো জোর করি না। তারা বড় হয়েছে, ইচ্ছে মতন চলবে। বিশেষত আমার ঐ মেয়ে বরাবরই স্বাধীন। সে যাকে ইচ্ছে বিয়ে করুক, আমি কখনো আপত্তি করবো না। কিন্তু সে বিয়ে করতে চায় না। আমার বড় শ্যালক সত্যেনের প্রভাবে পড়েই সে স্বদেশী দলে যোগ দিয়েছিল। সত্যেনও চিরকুমার থেকে দেশের সেবা করতে চায়।

সূর্য ধীর স্থিরভাবে সব কথা শুনলো। তারপর বললো, দীপ্তিদি কোথায় গেছেন, সেটা আমাকে বলতে কি কোনো বাধা আছে?

—ঠিক ধরেছো। সে জানতো তুমি এখানে আসবে। তোমাকে কোনো কথা বলতে সে বারণ করে গেছে।

—আমি কয়েক দিন আগে এলে দেখা হতো?

—সে দেখা করতে চাইতো কিনা তা অবশ্য বলতে পারি না।

—আচ্ছা, আমি তা হলে যাই।

—শোনো, শোনো, বসো। আর একটু কথা আছে। তোমার জন্য দুটি চাল নিতে বলি? বাইরে থেকে এসেছো, অতিথি মানুষ, কিছু না খেয়ে চলে যাবে, তা কি হয়?

—আমি খেয়েই এসেছি।

—স্টেশনের ধারে ঐ দোকানটা থেকে অখাদ্য খাবারগুলো গিলেছো তো? বড় ভুল কাজ করেছো। এখান থেকে দুটি ভাতে ভাত খেয়ে যাও।

—আমার এখানে আর দেরী করার কোনো মানে হয় না। দীপ্তিদি কি স্কুলের

চাকরিটা ছেড়ে দিচ্ছেন?

—সেই রকমই তো শুনছি। তোমাকে সে ভয় পায় কেন? দেখে তো বেশ ভালো ছেলেই মনে হয়।

—দীপ্তিদির সঙ্গে একবার অন্তত দেখা করার খুবই দরকার ছিল আমার।

দীপ্তিদির বাবা হঠাৎ মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, সত্যেন থাকে জলপাইগুড়িতে। তার সঙ্গে একবার দেখা করে পরামর্শ নিতে পারো।

সূর্য কলকাতায় ফিরে স্টেশন থেকেই সোজা চলে গেল দীপ্তিদির বাড়িতে। সেখানে গিয়ে শুনলো: দীপ্তিদি কলকাতায় ফেরেন নি। স্কুলে খোঁজ নিতে গেল। সেখানে দীপ্তিদি চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন, আর পড়াবেন না।

বাড়িতে এসে সূর্য নিজেও একটা চিঠি পেল দীপ্তিদির। চিঠিখানা তার অপেক্ষায় ডাক বাক্সে পড়ে ছিল। খুবই সংক্ষিপ্ত চিঠি।

সূর্য,

তোমার বাবার মৃত্যুর সময়েও তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাইনি, কারণ, শোকে সান্ত্বনা জানাবার ভাষা আমি জানি না। আমি জানি, তুমি নিজেই সব কিছু সামলে উঠতে পারবে। তোমার ওপর যে আমার অনেক ভরসা।

কলকাতা আমার আর ভালো লাগছে না। তাই অনেক দূরে চলে গেলাম। আমি যত দূরেই থাকি, আমি সব সময় তোমার সঙ্গে আছি। তুমি ভালো থেকো।

—দীপ্তিদি

এ রকম নিরলঙ্কার সাদাসিধে চিঠি তবু সূর্যর মনে হতে লাগলো, এটা যেন হেঁয়ালির ভাষায় লেখা। প্রতিটি অক্ষর সে থেমে থেমে পড়তে লাগলো বারবার, যেন ওদের কোনো আলাদা মানে আছে। এবং সে কল্পনা করার চেষ্টা করলো, কোন অবস্থায় দীপ্তিদি চিঠিখানা লিখেছেন। চেয়ার টেবিলে বসে, না বিছানায় শুয়ে শুয়ে? মাথার চুল খোলা ছিল, না খোঁপা বাঁধা? একবারেই চিঠিটা শেষ করেছেন, না আগে আরো কয়েকটা লিখে ছিঁড়ে ফেলেছেন? এ সব কথা জানা যেন সূর্যর বিশেষ দরকার।

সূর্য বাড়ির প্রধান দরজার কাছে চিঠিখানা হাতে দাঁড়িয়েছিল, এই সময় বাদল ফিরলো। সে জিজ্ঞেস করলো, সূর্যদা, কখন ফিরলে?

সূর্যর সুটকেসটা তার পায়ের কাছে রাখা। সে বললো, এখনো ফিরিনি তো?

—ওটা কার চিঠি?

—দীপ্তিদির।

—তুমি তো দীপ্তিদির সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিলে? দেখা হলো না?

—না রে।

সূর্যর মুখখানা খুব শান্ত। তার ব্যবহারেও কোনো চাঞ্চল্য নেই। চিঠিখানা ভাঁজ করে পকেটে রাখলো। তারপর সুটকেসটা তুলে নিয়ে বললো, যাই, একটু ঘুরে আসি।

—আবার কোথায় যাচ্ছো?

—জলপাইগুড়ির দিকে যাবো।

—এক্ষুনি? বাড়িতে ঢুকবে না? কিছু খেয়ে টেয়ে যাবে না?

—নাঃ।

—কখন ট্রেন?

—সেইটাই তো জানি না। সেই জন্য দেরি করতে পারছি না।

বাদল সূর্যর সঙ্গে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত এলো। সেখান থেকে ট্যাক্সিতে তুলে দিল।

বাদল ফিরে আসার পর চিররঞ্জন বললেন, সূর্য কোথায় গেল? তোর সঙ্গেই কথা বলছিল না?

—আবার তো চলে গেল!

—আবার চলে গেল? কোথায়?

—জলপাইগুড়ি।

চিররঞ্জন একেবারে আঁতকে উঠলেন। বললেন, একবার বাড়ির ভেতরে পা-ও দিল না? অনেকগুলো দরকারি কাগজপত্রে সই করাতে হবে। এখন এ সব সামলাবে কে? সব উড়েপুড়ে গোল্লায় যাবে! যাক, আমার কি!

জলপাইগুড়ি শহর থেকে ছ' মাইল দূরে একটা গ্রামের মধ্যে সত্যেন গুহর বাড়ি। বাড়িটাকে তিনি এখন আশ্রম বানিয়ে ফেলেছেন।

সত্যেন গুহ বরাবরই গান্ধীবাদী। ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে নোয়াখালি সফরে গিয়েছিলেন। গান্ধীজী নিহত হবার পর তিনি রাজনীতির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে সর্বোদয়ের আদর্শ গ্রহণ করেছেন।

তাঁর ভাগ্নী দীপ্তিকে তিনি এক সময়ে অহিংস সত্যাগ্রহে যোগ দেবার জন্যই টেনে এনেছিলেন। আস্তে আস্তে সে অবশ্য গুপ্ত বিপ্লবীদের দলে চলে যায়। সে কথাও অনেক দিন টের পাওয়া যায় নি। টের পেয়ে তিনি খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। এখন দীপ্তি আবার তাঁর আদর্শ গ্রহণ করার জন্য ফিরে এসেছে বলে তিনি খুব প্রসন্ন।

নিজের বাড়িতেই তিনি একটি আবাসিক প্রাথমিক স্কুল খুলেছেন। ছাত্ররা অধিকাংশই নিম্নবর্ণের বা অন্ত্যজ শ্রেণী থেকে এসেছে। কারুর কোনো মাইনে লাগে না। কিন্তু কাজ করতে হয়। সংলগ্ন ক্ষেতে শাক-সবজী চাষ, হাঁস, মুর্গী, গরু পালন এবং তাঁতের কাজ—এর থেকেই সব কিছুর খরচ তুলতে হয়। সরকার থেকে কিছু সাহায্যের প্রস্তাব এসেছিল, সত্যেন গুহ তা নিতে চান নি। দেশের মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলাই তাঁর ব্রত।

সারা দিন ধরে মিহিন বাতাসের সঙ্গে উড়ছে বৃষ্টির গুঁড়ো। দূরের পাহাড়গুলোর চূড়া থেকে নেমে আসছে হাল্‌কা হাল্‌কা মেঘ। রাস্তার দু পাশের গাছগুলি স্নানসিক্ত রূপসী। ঝরে পড়া ফুল থেঁতলে থেঁতলে চলে যাচ্ছে গরুর গাড়ি।

একটা গরুর গাড়ি থেকে সূর্য নামলো। গাড়োয়ানকে পয়সা মিটিয়ে দিয়ে তার নির্দেশিত সরু পথটা ধরে হাঁটতে লাগলো দ্রুত পায়ে। হাতের সুটকেসটা খেলাচ্ছলে দোলাচ্ছে।

টিনের বড় ঘরটার সামনের দরজা বন্ধ। সূর্য ডাকাডাকি করলো না। ঘুরে এলো অন্য দিকে। উঠোনের চার পাশে কঞ্চির বেড়ার ওপর লকলক করছে মালতী লতা। সূর্য সুটকেসটা বেড়ার ওপর রেখে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো।

দুটি ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে দীপ্তিদি উঠোনে বসে কাপড় কাচছিলেন। একটা লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে আছেন, সাদা ব্লাউজ, অযত্নে রাখা চুল এসে পড়েছে কপালের ওপরে। এমন সামান্য সাধারণ পোশাক হলেও দীপ্তিদিকে এখানে মনে হয় বিদেশিনী।

এই অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী রমণী অন্য কোনো দেশ থেকে যেন এখানে বেড়াতে এসেছেন। গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসে এত উৎসাহে কাপড় কাচলেও এখনো এই পরিবেশের সঙ্গে মিলেমিশে যান নি।

সঙ্গে একটি ছেলের চোখ অনুসরণ করে দীপ্তিদি পেছন ফিরে তাকালেন। সূর্যকে দেখে একটুও চমকে উঠলেন না। ঠাণ্ডাভাবে বললেন, এসো, ঐ দিক দিয়ে ঘুরে এসো, ভেতরে ঢোকার জায়গা আছে।

সূর্য ভেতরে এসে দীপ্তিদির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলো। দীপ্তিদি একটি ছেলেকে বললেন, এই, ভেতর থেকে একটা মোড়া নিয়ে আয় তো!

ছেলেটি দৌড়ে গিয়ে একটা মোড়া নিয়ে এসে পেতে দিল। দীপ্তিদি সেটা দেখিয়ে সূর্যকে বললেন, এখানে বৃষ্টির মধ্যে বসবে, না ভেতরে গিয়ে বসবে?

সূর্য বললো, এখানেই বসি।

দীপ্তিদি কাপড় কাচা বন্ধ না করে বললেন, খেয়ে এসেছো?

সূর্য হাসিমুখে বললো, না।

—এখন এই ভর দুপুরে তোমাকে কি খেতে দেবো? এখানে একটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত উনুন জ্বলে না।

—তা বলে কি মুড়ি চিঁড়েও কিছু থাকতে নেই?

দীপ্তিদিও এবার হাসিমুখ তুলে ওর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, খুব খিদে পেয়েছে? একটু বসো তা হলে। হাতের কাজটা সেরে নিই।

—এই বৃষ্টির মধ্যে কাপড় কেচে কি লাভ?

—এইটাই নিয়ম। রোজ এখানে এরকম হয়।

—তার মানে, কাজ হোক বা না হোক, নিয়মটা মানতে হবেই।

—নিয়ম মানাটাই তো একটা কাজ।

—একটা কাজ না একমাত্র কাজ?

—কোনো কোনো সময় এইটাই একমাত্র কাজ হওয়া ভালো। নইলে জীবনটা বড় ছন্নছাড়া হয়ে যায়।

—বাচ্চা দুটোকেও বৃষ্টিতে ভেজাচ্ছো কেন? ওদের যদি অসুখ করে?

—ওরা এত বেশী বৃষ্টিতে ভিজেছে যে, এ জন্য ওদের আর অসুখ হয় না।

—এটাও প্রকৃতির নিয়ম? যারা জীবনে খুব বেশী দুঃখ পায়, তাদের কি দুঃখের অনুভূতি থাকে না?

—দুঃখ তো প্রকৃতি দেয় না। মানুষ নিজে তৈরি করে বেশীর ভাগ সময়।

বালতির জল ফুরিয়ে গিয়েছিল, বাচ্চা ছেলে দুটি অদূরের পাতকুয়ো থেকে জল আনতে গেল। মস্ত বড় বালতি, জল ভরার পর দুটি ছেলে দু'দিক ধরে আনছে। সূর্য উঠে গিয়ে নিজেই বালতি নিয়ে এলো। তারপর বললো, ছেলে দুটিকে এখন ছুটি দিই? আরও জল আনার দরকার হলে আমিই এনে দিতে পারবো।

দীপ্তিদি ছেলে দুটিকে বললেন, আচ্ছা, তোমরা এখন যাও।

কাপড়গুলো নিংড়ে তারে মেলে দিতে দিতে দীপ্তিদি বললেন, মাথা ন্যাড়া করে তোমাকে অন্য রকম দেখাচ্ছে।

—বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মতন? একটি মেয়ে আমাকে বলেছিল কয়েক দিন আগে।

—প্যান্ট শার্ট পরা সন্ন্যাসী? তোমাকে কক্ষনো সন্ন্যাসী মনে হয় না।

—তা ঠিক।

—তুমি এখানে কেন এসেছো?
—দীপ্তিদি, তুমি জানতে না আমি আসবোই?
—জানতাম। তবু জিজ্ঞেস করছি, কেন এসেছো?
—তোমাকে নিয়ে যেতে।
—তুমি কি জানো যে আমাকে আর নিয়ে যেতে পারবে না?
—না।
—যদি চলেই যাবো, তা হলে কলকাতা ছেড়ে চলে এলাম কেন?
—কেন চলে এলে, সে কথা তো বলোনি এখনো?
—আমি তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে চাই।
—অথচ তুমি বলেছিলে, চিঠিতেও লিখেছো, তুমি সব সময় আমার সঙ্গে থাকবে।
—তা তো আছিই। কিন্তু তার জন্য কাছাকাছি থাকা দরকার নেই।
—আছে।
—না।
—তুমি বুঝতে পারো না, তোমাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়? আমি-এক মুহূর্তের জন্য অন্য কোনো কিছু চিন্তা করতে পারি না।
—আস্তে আস্তে অভ্যেস করতে হবে।
—আমি পারবো না।
—তোমাকে পারতেই হবে, সূর্য। কারণ সেইটাই স্বাভাবিক। তুমি এখন যা চাইছো, সেটা স্বাভাবিক নয়।
—মোটেই না!
—সূর্য, এখানে কেউ চেঁচিয়ে কথা বলে না। তুমি যদি বাড়াবাড়ি করো, তা হলে আমাকে এ জায়গা ছেড়ে আরও অনেক দূরে চলে যেতে হবে।
—দীপ্তিদি, তুমি কত দূরে যাবে? তুমি জানো না, তুমি হিমালয়ের শেষে কিংবা কন্যাকুমারিকায় চলে গেলেও আমি তোমাকে সেখানে তাড়া করে যাবো?
দীপ্তিদি হঠাৎ মুখটা ফিরিয়ে নিলেন। মনে হলো, তাঁর চোখে জল এসে গেছে। ধরা গলায় বললেন, তুমি কেন আমাকে এরকম উতলা করে দিচ্ছ? আমি এখানে খুব শান্তিতে আছি।
সূর্য বললো, আমিও এখানে থাকবো। তারপর সে নীচু হয়ে জুতোর ফিতে খুলতে লাগলো।

সত্যেন গুহ শহরে গিয়েছিলেন, ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। সূর্য ততক্ষণে গেঞ্জি ও ফুলপ্যান্ট পরে মাঠে ছেলেদের সঙ্গে খেলতে নেমে গেছে। অনেক দিন পর তাকে খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। কাদা ছড়ানো মাঠে সে দারুণ উৎসাহে দৌড়োদৌড়ি করছে। ছেলেদের সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনার সময় হয়ে গেছে, আশ্রমের বড়মা, অর্থাৎ সত্যেন গুহর দিদি নিরুপমা ডেকে ডেকেও ছেলেদের ফেরাতে পারেন নি মাঠ থেকে।
সত্যেন গুহ গরুর গাড়ি থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে আসছিলেন। মাঠের মধ্যে একটি অপরিচিত যুবককে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন খেলা, তারপর নিজেই মাঠের মধ্যে ঢুকে বললেন, কই, দাও দেখি, আমার দিকে বলটা দাও একবার।
প্রায় ষাটের কাছাকাছি বয়েস হলেও সত্যেন গুহর স্বাস্থ্যটি এখনো মজবুত

আছে। রোগা পাতলা বেঁটে খাটো মানুষ, মাথার চুলগুলো পেকে গেলেও হাঁটচলা খুব সাবলীল। বলে জোরে এক কিক কষিয়ে তিনি বললেন, হেড করো।

সূর্য ছুটে এসেও বলটা মাথায় লাগাতে পারলো না। স্কুলে পড়ার সময় সে ভালোই খেলতো, তারপর অনেক দিন অভ্যেস নেই।

সত্যেন গুহ তাকে বললেন, একটা হাই কিক্ করো তো, দেখি কত জোরে মারতে পারো!

সূর্য বলটা হাতে ধরে কিক্ করলো, বেশ উঁচুতেই উঠলো, কাছাকাছি গাছগুলোর মাথা ছাড়িয়ে। সত্যেন গুহ বললেন, বাঃ!

দুজনে কেউ কারুর পরিচয় জিজ্ঞেস করেনি এখনো। খেলার মাঠে তার দরকার হয় না বলেই। ছেলেদের দল দু' ভাগ করে দুজনে দু' দলে গিয়ে খেললো আরও কিছুক্ষণ। শেষ পর্যন্ত সত্যেন গুহ একবার কাদার মধ্যে আছাড় খেয়ে পড়লেন। সূর্য দৌড়ে এসে ওঁর হাত ধরে তুললো। তিনি কোমরে হাত দিয়ে বললেন, উ-হু-হু-হু—

—খুব বেশী লেগেছে?

—কোমরটা আজকাল বড় জ্বালাতন করে। শরীরটা আর নিজের বশে নেই, বুঝলে!

—আপনি তো এখনো বেশ ভালোই খেলেন।

—এক কালে এরিয়ান্স টীমে খেলতাম। তুমি খেলোটেলো নাকি?

—না।

—তুমি কোথায় থাকো?

সূর্য হাত দেখিয়ে বললো, এই আশ্রমে।

সত্যেন গুহ মুচকি হাসলেন। তারপর বললেন, বটে! এই আশ্রমে থাকো? আর আমিই সেটা জানি না। তুমি কোথা থেকে এসেছো?

—কলকাতা থেকে।

—ও বুঝেছি। তোমার নাম নিশ্চয়ই সূর্য?

সূর্য বললো, আপনিই কি সত্যেন গুহ?

সত্যেন গুহ মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, আমি তো শুনেছি তুমি অতি বদ ছেলে। তুমি এখানে এসেছো কি করতে?

—আমি আপনার এখানে থাকবো।

—তোমাকে খাওয়াবে কে? আমি কি এখানে দানছত্তর খুলেছি যে, যে আসবে তাকেই খাওয়াবো?

—আপনারা যা খান তাই খাবো। তার বদলে কাজ করবো।

—তুমি কি কাজটা করবে শুনি?

কথা বলতে বলতে ওরা চলে এলেন টিনের ঘরটার সামনে। দরজা এখন খোলা, ভেতরে একটা বিরাট শতরঞ্চি পাতা। দরজার ঠিক বিপরীত দিকে দেয়াল ঘেঁষে একটি ছোট বেদীতে গান্ধীজীর একটি চন্দন চর্চিত ফটো, সামনে ধূপ জ্বলছে। এক পাশে আশ্রমের বড় মা পূজারিণীর ভঙ্গিতে বসে আছেন।

সত্যেন গুহ হাত পা ধুয়ে সেখানে গিয়ে বসলেন। ছেলেরাও সবাই হাতে পায়ে জল দিয়ে বসলো এসে শতরঞ্চির ওপর, হাঁটু মুড়ে। দীপ্তি একটা ধুপদানি এনে ঘর ভরিয়ে দিলেন ধূপের ধোঁয়ায়। সত্যেন গুহ রামধুন গান ধরলেন, ছেলেরা গলা মেলালো।

সূর্য দাঁড়িয়ে রইলো দরজার পাশে। দৃশ্যটা দেখে, অনেক দিন আগে মেদিনী-পুরের এক গ্রামে তমোনাশ ডাক্তারের বাড়ির কথা মনে পড়লো। যদিও কিছুটা তফাৎ আছে। তমোনাশ ডাক্তার খানিকটা পাগল ধরনের ছিলেন, গানের সঙ্গে সঙ্গে হাত তালি দিয়ে নাচতে শুরু করতেন। সত্যেন গুহর মধ্যেও অন্যরকম পাগলামি আছে নিশ্চয়ই। গান্ধীবাদীরা পাগল ছাড়া আর কি!

গান শেষ হবার পর, সূর্য আশা করেছিল, সত্যেন গুহ নিশ্চয়ই ছোটখাটো একটা বক্তৃতা দেবেন, অন্তত হরিজন পত্রিকার পুরোনো ফাইল থেকে কিছু পড়ে শোনাবেন তো বটেই।

কিন্তু সে রকম কিছু হলো না। গান শেষ হবার পর সত্যেন গুহ চোখ বন্ধ করে হাত জোড় করে রইলেন। অন্য সবাই ওঁকে অনুসরণ করলো। অর্থাৎ এটা নীরব প্রার্থনার সময়। প্রার্থনার জন্য কোনো সমবেত ভাষা নেই।

সব ছেলেই যদিও চোখ বন্ধ করে ছিল, কিন্তু সত্যেন গুহ চোখ খোলা মাত্রই তারাও চোখ খুলে উঠে দাঁড়ালো। কেউ কোনো গোলমাল করলো না, নীরবে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাইরে বেরুবার পর তাদের ছোটখাটো চেঁচামেচি শোনা গেল।

ঘর ফাঁকা হয়ে যাবার পর সত্যেন গুহ কাছে আসবার জন্য ইঙ্গিত করলেন। সূর্য হাঁটু গেড়ে বসলো। সত্যেন গুহ জিজ্ঞেস করলেন, মাথা ন্যাড়া কেন?

সূর্য কারণটা জানালো।

—তুমি জেল খেটেছিলে না এক সময়?

—হ্যাঁ।

—কোন দলে ছিলে?

—আমি রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু কখনো ঠিক রাজনীতি করিনি।

—এখন?

—এখন ওসব থেকে দূরে থাকতে চাই।

—এখনই তো বেশী কাজ করবার সময়।

—কাজ করবার জন্যই তো আপনার কাছে এসেছি।

—মিথ্যে কথা বলো না, মিথ্যে কথা শুনলে আমার গা জ্বলে যায়।

—আপনি ঠিক মানুষ চিনতে পারেন না বোধ হয়। মিথ্যে কথা বলা আমার স্বভাব নয়।

সত্যেন গুহ মুখ তুলে সূর্যর দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, পৃথিবীতে মানুষের অনেক সমস্যা আছে। কারুর হৃদয়ঘটিত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই।

সূর্য ওঁর চোখে চোখ রেখে বললো, আমি আপনার কাছে কোনো সমস্যা নিয়ে আসিনি। আমি স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছি। আমি এখানে থাকতে চাই, তারপর যা হবার তাই হবে।

এই সময় দীপ্তি দরজার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন মামাবাবু, আমি একটু আসবো?

সত্যেন গুহ দীপ্তিকে দেখে যেন বেশ স্বস্তি পেলেন। বললেন, হ্যাঁ, আয়, আয়। এই ছেলেটাকে আমি একলা সামলাতে পারছি না।

দীপ্তি তাঁর পাশে এসে বসার পর তিনি বললেন, এই ছেলেটি এখানে থাকতে চায়

বলছে।

দীপ্তি খুব শান্তভাবে বললেন, আজকের রাতটা তো থাকবেই, আজ তো আর ফিরে যাবার উপায় নেই, কাল চলে যাবে।

সূর্য বললো, না।

সত্যেন গুহ এবার একটু হেসে বললেন, এ তো মনে হচ্ছে পাকাপাকিই থাকতে চায়। এ বিষয়ে তোর কি মত?

—আমার মত নেই।

সূর্য দীপ্তির চোখে চোখ ফেলার চেষ্টা করলো। দীপ্তি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন।

সত্যেন গুহ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সূর্যকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে থাকতে চাও কেন?

—আপনাকে তো বলেইছি, আমি কিছু কাজ করতে চাই।

—তুমি বড়লোকের ছেলে, তুমি এখানে কি কাজ করবে?

—আপনি বুঝি গরীব? যাদের মনটা ছোট তারাই মুখে সব সময় গরীব গরীব করে।

—ওরে দীপ্তি, এ যে বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে!

দীপ্তি ভর্ৎসনার সুরে বললেন, সূর্য তুমি বড়মামার সঙ্গে এরকমভাবে কথা বলো না।

সত্যেন গুহ তাড়াতাড়ি বললেন, না, না, আমি কিছু মনে করিনি। পরিষ্কার কথা বলাই তো ভালো। কিন্তু আমি একটাই কথা শুধু বুঝতে পারছি না, একে আমরা কোন কাজে লাগাবো।

দীপ্তি বললেন, ওর জন্য সে রকম কোনো কাজ আমাদের এখানে নেই।

সূর্য বললো, দীপ্তিদি, আমি তো চাকরি খুঁজতে আসিনি। এটা আশ্রম, এখানে তো যত বেশী কাজের লোক পাওয়া যাবে ততই কাজ বাড়বে।

—তোমার বাবাও তো একটা অনাথআশ্রম চালাতেন কলকাতায়। তুমি তো সেখানেই কিছু করতে পারতে। সেটাই তোমার উচিত ছিল। সেটা না করে তুমি এখানে চলে এলে কেন?

সূর্য এতক্ষণে দীপ্তির চোখের দৃষ্টি ছুঁতে পেরেছে। চাপা রাগে তীব্রভাবে সেই দিকে তাকিয়ে বললো, দীপ্তিদি, আমাকে এত জেরা করো না। আমি যুক্তি সাজিয়ে কথা বলতে পারি না। কিন্তু আমার এখানেই কাজ করতে ভালো লাগবে। কলকাতায় আমার মন টেঁকে না! আমিও তো কিছু লেখাপড়া জানি, আমি এই আশ্রমের ছেলে-মেয়েদের পড়াতেও পারি।

সত্যেন গুহ বললেন, তোমরা যা লেখাপড়া শিখেছ, আমি আমার আশ্রমের ছেলে-মেয়েদের তা শেখাতে চাই না। ঐ বিদেশী ধাঁচের কুশিক্ষা দেশ থেকে যত তাড়াতাড়ি দূর হয়ে যায় ততই মঙ্গল। ঠিক আছে, তোমাকে আমি অন্য কাজ দেবো। তার আগে আর একটা কথা বলবো, শুনবে?

—বলুন!

—আমি সব মানুষকেই সন্ন্যাসী হতে বলি না। তবে প্রত্যেকেরই জীবনের কতক-গুলো আলাদা আলাদা ক্ষেত্র আছে। আমি আমার এই আশ্রমটিকে সংসারী মানুষদের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে চাই। তোমার মধ্যে যে রকম প্রাণশক্তি আছে, তোমাকে

নিজে থেকে আমি সংযমী হবার উপদেশ দিতে পারি না। সেইজন্যই বলছিলাম, তোমার মতন ছেলের জায়গা এটা নয়!

—পরীক্ষা করে দেখুন।

—তুমি পারবে?

—পারবো কিনা জানি না। পরীক্ষা করে দেখতে ক্ষতি কি?

—ঠিক আছে। দীপ্তি, তুই ছেলেদের ঘরে ওর শোবার জায়গা করে দে আজকের মতন। কাল থেকে অন্য যা হোক ব্যবস্থা করা যাবে।

সূর্য সেখানেই রয়ে গেল। সকাল থেকে সে ছেলেদের সঙ্গেই সারাক্ষণ থাকে। মাঠে গিয়ে মাটি কোপায়, পুকুরে তাদের সাঁতার শেখায়, দুধেলা গরুটা কখনো দড়ি খুলে পালিয়ে গেলে দৌড়োদৌড়ি করে ধরে আনে। খেলার মাঠে তো সে আছেই। শুধু সন্ধ্যেবেলার প্রার্থনায় সে যোগ দেয় না। গান্ধীজীর ছবির সামনে সে কখনো বসবে না—এ কথা সে সত্যেন গুহকে আগেই বলে নিয়েছে। এর সঙ্গে তার বর্তমান জীবন-যাত্রার কোনো সম্পর্ক নেই। এ শুধু অতীতের অভিমান।

আশ্রমের পেছন দিকে অনেকখানি জমি পড়ে আছে। সেটা আশ্রমেরই সম্পত্তি। সেটাকে কাজে লাগাবার জন্য সত্যেন গুহ একটা নতুন পরিকল্পনা নিয়েছেন। সেখানে একটা ইঁটখোলা হবে। আশ্রমেরই ছেলেরা মাটি কেটে ইঁট বানাবে। তারপর সেগুলো পুড়িয়ে যা ইঁট তৈরী হবে—তার অর্ধেক বিক্রি করা হবে খরচ তোলার জন্য, বাকি অর্ধেক গ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে বিলি করা হবে। তাদের ঘর তুলে দিতে ছেলেরাই সাহায্য করবে। একজন মাত্র পেশাদার মিস্ত্রিকে নিযুক্ত করা হয়েছে কাজ শেখাবার জন্য।

সূর্য স্বভাবতই এই পরিকল্পনাটার দায়িত্ব নিয়ে নিল। সারাদিন সে অসুরের মতন পরিশ্রম করে। বইটই-এর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই এখন, কোনো রকম নেশাও নেই, এই কাজই যেন তার একমাত্র নেশা।

শুধু দীপ্তির সঙ্গে তার একবারও সে রকমভাবে দেখা হয় না। কখনো কখনো দূরে থেকে একপলক দেখতে পায়। লোকজনের মাঝখানে দীপ্তি সূর্যর সঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলেন, কিন্তু সূর্যকে একা তাঁর কাছাকাছি আসার সুযোগই দেন না। সে রকম সম্ভবনা দেখা দিলেও আগে থেকেই এড়িয়ে যান।

কখনো কখনো দীপ্তিকে টুকিটাকি কাজের জন্য যেতে হয় জলপাইগুড়ি শহরে। একা যাবার নিয়ম নেই, অনন্ত নামের একটা কিশোর ছেলেকে নিয়ে যান। সূর্যর মনটা তখন একটু ছটফট করে কিন্তু মুখে কিছু বলে না।

সত্যেন গুহ প্রথম প্রথম কয়েকদিন সূর্যর দিকে বিশেষ নজর রেখেছিলেন। কোনো ত্রুটি ধরতে পারেন নি। সূর্য একবারও লুকিয়ে চুরিয়ে দেখা করার চেষ্টা করেনি দীপ্তির সঙ্গে, কোনো রকম দাবিও জানায় নি—সে নিজেকে কাজের মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দিয়েছে। এই কাজই যেন তার নিজের কাছ থেকে নিজের মুক্তি।

মাটি কাটতে কাটতে হঠাৎ কখনো মুখ তুলে সূর্য দেখে দূরে ক্ষীণ মেঠো রাস্তা ধরে দীপ্তি হেঁটে যাচ্ছেন। গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে আকাশ। দীপ্তির সমুন্নত বরাঙ্গ সূর্যর চোখের সামনের আকাশ ঢেকে দেয়। যতদূর দেখা যায় সূর্যর চোখ তাঁকে অনুসরণ করে।

সেই সময় সূর্যর মুখ দেখলে মনে হয়, তার মতন অতৃপ্ত মানুষ এ পৃথিবীতে আর একজনও নেই।

॥ ৬৮ ॥

সূর্যর চালচলন ক্রমশ বেশ স্বাভাবিক হয়ে এলো। তার ছটফটানি এখন আর নজরে পড়ে না। দীপ্তির দিকে আর তাকায় না ঘোর লাগা চোখে। দীপ্তির সঙ্গে আড়ালে দেখা করার ছুতো খোঁজে না। তাছাড়া তার সময়ই বা কোথায়। সব সময়েই তো সে নানান কাজে ব্যস্ত। এক সময় সূর্যর মনে হয়েছিল, তার কোথাও যাবার জায়গা নেই, কোনো বন্ধু নেই, কোনো দায়িত্বে আস্থা নেই, সেই জন্য দীপ্তির বুকই তার মুখ লুকোবার একমাত্র জায়গা। এখন সূর্য তার মুক্তির একটা ক্ষেত্র পেয়ে গেছে।

এর আরেকটা দিকও আছে। তার রাগ এবং জেদের মতন অভিমানও খুব তীব্র। দীপ্তির প্রতি সে এখন একটা প্রচণ্ড অভিমান বোধ করে। দীপ্তির জন্য সে সব কিছু ছাড়তে রাজি ছিল, তবু দীপ্তির এই রকম ব্যবহারের কোনো কারণই সে খুঁজে পায় না। এই অভিমান বশে সে একলা ঘরে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতে পারতো কিংবা দীপ্তিকে খুন করতেও পারতো, তার বদলে সে নিজেকে বাইরের জীবনে ছড়িয়ে দিল। কারুকে সে কিছু বুঝতে দেয় না। সত্যেনবাবুর মতন ভূয়োদর্শী মানুষও এক সময় মনে করলেন, এই ছেলেটির সম্পর্কে তিনি আগে ভুল ভেবেছিলেন। টেররিস্টগুলোর মতন গোঁয়ার্তুমি থাকলেও এর নৈতিক চরিত্র সন্দেহের ঊর্ধ্বে।

সত্যেন গুহ তাঁর আশ্রমটি যেরকম গড়তে চেয়েছিলেন, সূর্য এসে তার রূপ অনেক পালটে দিল। গরীবের ছেলেদের পড়ানো, মাঠে শাক-সব্জী লাগানো আর প্রার্থনা ট্রার্থনার মতন নিরামিষ ব্যাপারে সে আবদ্ধ রইলো না। আগে যে একটি চুপচাপ শান্ত পরিবেশ ছিল, সূর্য তার মধ্যে এনে দিল প্রাণের চাঞ্চল্য ও হুল্লোড়। আশ্রমের ছেলেগুলোর মধ্যে এনে দিল অ্যাডভেঞ্চার স্পৃহা। আগে এখানকার ছেলে-দের অন্য স্কুলের ছেলেরা 'গেঁধো আশ্রমের চ্যালা' বলে বিদ্রূপ করতো—কয়েক মাসের মধ্যে এরা সূর্যর প্রেরণায় জেলা স্কুলের ফুটবল টিমকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সাত গোলে হারিয়ে সম্মান আদায় করে নিল। আগে এদের পোশাক ছিল ঠেঙো ধুতি ও খদ্দরের ফতুয়া, সূর্য সে সব ছাড়িয়ে এদের হাফ প্যাণ্ট ও হাফ সার্টের ফিটফাট পোশাকের প্রবর্তন করেছে। প্যান্টের সঙ্গে বেল্ট পরা বাধ্যতামূলক। এখানে আশ্রমে চরকায় সুতো কাটা হয় বটে, কিন্তু সূর্য সেই সুতো খাদি ভাণ্ডারে বিক্রি করে আসে, ছেলেদের ব্যবহার করতে দেয় না। সে পষ্ট বলে দিয়েছে, খদ্দর টদ্দর বড়দের ব্যবহার করার জন্য চলতে পারে, ছোটদের জন্য দরকার নেই। আমেদাবাদ জায়গাটা তো ভারতবর্ষেই, সেখানকার মিলে তৈরী ছিট কাপড় ব্যবহার করায় দোষের কি আছে? সত্যেন গুহ প্রথম প্রথম ক্ষীণ আপত্তি তুলেছেন, কিন্তু জোর করে বাধা দেননি।

আশ্রমের ছেলেগুলো এসেছে খুবই গরীবের সংসার থেকে—অনেকের বাড়িতেই খাবার জুটতো না। এই সব ছেলেদের বা তাদের বাবা মা'র একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, যদি ওরা এখানে থেকে লেখাপড়া শিখে কোনোক্রমে ভদ্রলোক হতে পারে। সূর্য ওদের মধ্যে মানুষের মতন মানুষ হয়ে বাঁচবার মতন একটা দৃঢ়তা এনে দিচ্ছে। কেউ মিনমিনে গলায় কথা বললে সূর্য তাকে এক ধমক দেয়।

মাঝে মাঝে সে ওদের নিয়ে যায় দূরের জঙ্গলে শিকার করতে। আশ্রমে অবশ্য পিকনিকের কথা বলে যায়। এর মধ্যে ওরা দুটো বুনো শুয়োর ও একটা হরিণ

মেরেছে। হরিণটা অবশ্য মারার ইচ্ছে ছিল না, ধরতেই চেয়েছিল ওরা। কিন্তু ঝটাপটিতে সেটার শিরদাঁড়া ভেঙে যায়। হরিণটাকে নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। হরিণের মাংস আশ্রমে নিয়ে আসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আবার ফেলে দিয়ে আসার কথাও কি চিন্তা করা যায়? আশ্রমের ছেলেদের আমিষ আহার নিষিদ্ধ। জঙ্গলের মধ্যেই গোপনে সেটা কেটে-কুটে রান্না করে খেয়ে ফেলার লোভ সূর্য অতি-কষ্টে দমন করেছে। দলবল নিয়ে তিন মাইল দূরের একটা আদিবাসীদের গ্রামে দিয়ে এসেছে হরিণটা। হরিণটা পেয়ে আদিবাসীদের উল্লাস দেখাও একটা উপভোগ্য ব্যাপার। এর কয়েকদিন বাদে আবার সূর্য তার ছেলেদের নিয়ে এই আদিবাসী গ্রামটিতে একটি মস্ত বড় কুয়ো খুঁড়ে দিয়ে আসে।

সূর্যর মধ্যে যে প্রাণশক্তি আছে, তা প্রকাশের একটা পথ পেয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার সরল জেদ কোনোরকম বাধাকেই অনতিক্রম্য মনে করে না।

এতকাল সত্যেন গুহর নিরীহ সর্বোদয় আশ্রমটি সম্পর্কে কারুর কোনো ঔৎসুক্য ছিল না। সূর্য আসার পর অনেকেরই এদিকে চোখ পড়ে, তার সম্পর্কে অনেকেরই বিভিন্ন ধরনের আগ্রহ জাগে। প্রথমত সে অত্যন্ত সুপুরুষ, তার দিকে সকলের চোখ পড়বেই। তাছাড়া, সে যে এক সময় বোমা-পিস্তল নিয়ে কারবার করেছে এবং জেল খেটেছে—এ খবরও সহস্র-কান জনতার জানা হয়ে যায়—এ সম্পর্কে অনেক রোমাণ্টিক গল্পেরও জন্ম হয়। এবং সে নাকি বড়লোকের ছেলে, সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে এসেছে। সর্বত্যাগী বড়লোকের ছেলেরা এখনো এদেশে বেশী শ্রদ্ধা পায়। সুতরাং জনশ্রুতির নায়ক হবার সব রকম যোগ্যতাই তার আছে। আসলে যে সে একটি ছেলেমানুষ ধরনের জেদী মানুষ—এই সত্য পরিচয়টাই লোকের চোখে ধরা পড়ে না।

ফরোয়ার্ড ব্লক, কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং আর সি পি আই-এর কর্মীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তার সঙ্গে ভাব জমাতে আসে। তাকে দলে টানার জন্য সকলেই উৎসুক।

সূর্য সকলকেই এক রকম উত্তর জানিয়ে দিয়েছে। সে বলেছে, আপনারা পলিটিক্স বোঝেন, আমি রাজনীতিফিতি একেবারেই বুঝি না। আমি সমাজ-তন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমি এ-ও জানি, এদেশে সমাজতন্ত্র আনতে হলে একটা যুদ্ধ করতে হবে। আগের থেকেও অনেক বড় যুদ্ধ। দেখছেন না, পুঁজিপতি ব্যবসায়ী আর দালালরা এদেশের শাসন যন্ত্রটা কি রকম ভাবে দখল করে নিচ্ছে। যুদ্ধ ছাড়া এরা কেউ সে অধিকার ছাড়বে না। সেই যুদ্ধে আমিও লড়াই করতে রাজি আছি। দরকার হলে আমাকে ডাকবেন। কারণ গান্ধীবাদ আমার অস্থি মজ্জায় নেই। গান্ধীবাদ একজন মানুষের নিজস্ব জীবনের ক্ষেত্রে খুবই ভালো, কিন্তু এই আদর্শে দেশ চালাবার চিন্তা করা বোকামি ছাড়া কিছুই না। এদেশের সরকারও যে খুব শিগ্‌গিরই গান্ধীবাদের ভেক ছেড়ে দেবে তাও আমি ভালোভাবে জানি।

তবে, আমার আর একটা কথা আছে। সমাজতন্ত্রের জন্য সেই লড়াইটা চালাবে কে? যুদ্ধ তো শুধু সোলজার দিয়ে হয় না, তার জন্য একজন সেনাপতি লাগে। কে সেই সেনাপতি হবে। সেইটা আগে আপনারা ঠিক করে নিন। আপনারা এক মার্কসবাদের নাম করেই পাঁচ-ছ'টা আলাদা পার্টি খুলেছেন, আমি এর মানে বুঝতে পারি না, কোনোদিন আমার মাথাতে ঢুকবেও না। আপনারা আগে সবাই একমত হয়ে নিন, কে হবে ভারতের লেনিন। আমি সে রকম কারুকে দেখি না। যদি সে

রকম কারুকে পাওয়া যায়, আর বিপ্লবের লড়াইয়ের ঠিক মতন প্রস্তুতি হয়, তাহলে আমাকে খবর দেবেন। আমি একজন সামান্য সোলজার হিসেবে যথা সম্ভব লড়াই দিয়ে আসবো। সে রকম দিন যতদিন না আসে, ততদিন আপনারা যত ইচ্ছে পলিটিকস করুন, আমি যে রকম জীবন নিয়ে আছি, তাতেই বেশ আছি।

সূর্যর কথাটা কোনো দলের কর্মীদেরই পছন্দ হয় না। কেননা, সব দলেরই রিজিওন্যাল কমিটির কে সেক্রেটারি আর কে প্রেসিডেণ্ট হবে, এ নিয়ে সব সময় চলছে একটা ঠাণ্ডা লড়াই। রিজিওন্যাল কমিটি থেকে কে কবে যাবে সেণ্ট্রাল কমিটিতে—তারও একটা চিন্তা আছে। এই সব জরুরি বিষয় সমাধানের পর তো অন্য কথা। সত্যিকারের বিপ্লবের জন্য কোনোদিন লড়তে হবে, একথা কেউই মনের নিভৃততম প্রদেশে বিশ্বাস করে না। ওরকম যদি কখনো হয় তো হঠাৎ হয়ে যাবে। তার আগে, ব্যক্তিগত জীবনে বা দলগতভাবে যত রকম দোষ-ত্রুটি সব কিছু ঢাকবার জন্যই বিবেকের কাছে আছে এক মহৌষধ, মূল সমস্যার সমাধান না করতে পারলে এরকম তো হবেই!

যাকে দলে টানতে পারা যায় না, তাকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে, এটাই আধুনিক রাজনীতির নিয়ম। সূর্যর অজ্ঞাতে তার শত্রুসংখ্যা বাড়তে লাগলো। কখনো সখনো সে যখন শহরে আসে, তখন ওই সব কর্মীদের সঙ্গে দেখা হলে সে সাধারণ ভদ্রতা রক্ষার জন্য কথা বলতে যায়। কিন্তু তারা কাষ্ঠ হাসি দিয়ে সরে পড়ে একটু বাদেই। এই সব ছেলেদের মধ্যে অনেকে আছে আন্তরিক দেশকর্মী, কিন্তু নিছক থিয়োরির মন্ত্রে মাথা ঘুলিয়ে ফেলেছে, অন্যের সঙ্গে তর্ক হলেই নানান বইয়ের লাইন উদ্ধার করে উদাহরণ দেয়—মানুষকে তার স্থান কালের পটভূমিতে বিচার করতে ভুলে যায়। সূর্যর মনের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা কেউ করলো না।

কয়েকদিন পর আচমকা একটা গুজব ছড়িয়ে পড়লো এলাকাটা জুড়ে। সত্যেন গুহর আশ্রমটা আসলে একটা বেলেল্লাপনার জায়গা। সূর্য আর দীপ্তি বিয়ে না করেও স্বামী-স্ত্রীর মতন একসঙ্গে থাকে। সন্ধ্যেবেলা মাঠের মধ্যে ওদের বেসামাল অবস্থায় কত লোক স্বচক্ষে দেখেছে। কলকাতা থেকে তাড়া খেয়ে ওরা এখানে পালিয়ে এসেছে। কয়েকজন কলকাতা থেকে টাটকা এবং পাকা খবর নিয়ে এসেছে—এককালের চন্দননগর মামলার বিখ্যাত দীপ্তি সরকার এক ছোকরার সঙ্গে বিশ্রী কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এখন এখানে এসে আবার সেই লীলাখেলা শুরু করেছেন। এমন কি ওই আশ্রম পরিচালনার টাকা কোন্ গোপন সূত্র থেকে আসে সে বিষয়ে তদন্ত করার জন্যও জেলা শাসকের কাছে উড়ো চিঠি গেল।

এসব কথা একবার বাতাসে ছেড়ে দিলেই হলো। তারপর বাতাস নিজের গুণেই তা উড়িয়ে বেড়াবে। এবং যত বেশী ছড়ায় ততই এর বলবৃদ্ধি হয়। যৌন ব্যভিচার এবং গুপ্তচর বৃত্তি এই দুটি অভিযোগের মজা এই, যে-কেউ একবার শুনবে, কিছুতেই পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারবে না। যত বিশ্বাসের পাত্রই হোক, তবু মনে হবে ভেতরে একটা কিছু নিশ্চয়ই ব্যাপার আছে। যা রটে তার কিছু অন্তত বটে।

উড়তে উড়তে গুজবটা একদিন আশ্রমে এসেও পৌঁছোলো। প্রথম কয়েকদিন কেউ এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করলো না, প্রত্যেকেই অপরের কাছে এমন ভাব দেখাতে লাগলো যে, সে কিছু শোনে নি।

গুজবটার সবচেয়ে নির্মল দিক এই যে, এটা যে সময় ছড়ালো, সে সময় সূর্য আর দীপ্তি সম্পূর্ণ নির্দোষ জীবন কাটাচ্ছে। সূর্য মেতে আছে ছেলেদের নিয়ে, দীপ্তি

আশ্রম পরিচালনার দিকটা দেখেছেন। আর, হাতে কিছুটা সময় পেয়ে সতোন গুহ 'নোয়াখালিতে গান্ধীজীর সঙ্গে' এই নামে স্মৃতিকথা রচনায় ব্যাপৃত।

দীপ্তি আশ্রমের একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে শহরে গিয়েছিলেন তেল, নুন, মশলা কিনে আনতে। মাসে দু-তিনবার তাঁকে এ রকম আসতে হয়। দোকানের লোকদের সঙ্গেও চেনা হয়ে গিয়েছিল। সেদিন তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, দোকানের লোকজন যেন তাঁর দিকে একটু বিশেষ দৃষ্টিতে দেখছে। এই রকম দৃষ্টি গায়ে বেঁধে। কিন্তু এসব ব্যাপার শুধু অনুভব করা যায়, মুখে কিছু তো বলা যায় না।

তাড়াতাড়ি কেনাকাটি সেরে দীপ্তি ফিরে আসছিলেন, বাবুপাড়ায় দুটি ছেলে একেবারে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। দীপ্তিকে দেখে একজন বেশ জোরে বললো, এই সেই মাগীটা না?

—মাগীটার বেশ চটক আছে কিন্তু। এই চটক দেখেই ছেলেটা মজেছে।

—ছেলেটার চেহারাও তো কার্তিকের মতন লালটু মার্কা। দেখিস নি?

আর একজন বললো, হ্যাঁ। ছেলেটা বড় না মেয়েটা বড় রে?

এই রকম আরও কিছু কথা দুজনে বলাবলি করলো। মনে হয় যেন কথাগুলো আগে থেকেই তৈরি করা।

যৌবনে নির্লজ্জতার মধ্যে এক রকম আনন্দ আছে। কেউ কেউ সেই আনন্দের স্বাদটাই একটু বেশী করে পেতে চায়। এই যুবক দু'টির মধ্যেও লজ্জা বা গোপনীয়তার চিহ্নমাত্র নেই। তারা দীপ্তিকে কথাগুলো শোনাতেই চেয়েছে। এমন কি, দীপ্তির সঙ্গে যে একটি ছোট ছেলে আছে—ততটা ছোট নয় যাতে এসব বুঝতে পারবেনা—তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই।

যুবক দুটির বয়েস কুড়ি-একুশ হবে। ওরা যখন নিতান্ত বালক ছিল, তখন দীপ্তি এক রাত্রে পুলিসে বাড়ি ঘিরে ফেলায় পেছনের পাঁচিল থেকে নীচে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, তার পর অন্ধকারের মধ্যে দৌড়তে গিয়ে একটা পানা পুকুরে পড়ে যান এবং তাঁর চুলের মুঠি ধরে তাঁকে টেনে তোলা হয়। মেয়ে বলেও তাঁকে পরে থানার অত্যাচার থেকে রেহাই দেওয়া হয় নি। বেয়াল্লিশে কোনো দয়ামায়া ছিল না—স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাঁর হাতের আঙুলের নোখের মধ্যে পিন ফোটানো হয়েছিল। তাঁরা এই সব সহ্য করেছিলেন শুধু একটা স্বপ্ন দেখে। একদিন এই দেশ স্বাধীন হবে, তারপর এখানে সুস্থ মানব সমাজ গড়ে উঠবে।

যুবক দুটি এসব জানে না। তাদের জানবার কথাও নয়, তাদের বাবা মা'রাই এর মধ্যে ভুলে গেছে। ওই যুবক দুটির চোখে দীপ্তি একটি নারী মাত্র, যার যৌবন এখনো অক্ষুণ্ণ আছে—খানিকটা কলঙ্ক রটায় যাকে আরও মোহময়ী মনে হয়।

কথাগুলো শুনে দীপ্তির শরীরে যেন একটা ঝাঁকুনি লাগলো। সাধারণত এই সব ক্ষেত্রে মেয়েরা মাথা নীচু করে চলে যায়; না শোনার ভাণ করে। কিন্তু দীপ্তি জীবনে অনেক কিছু দেখেছেন। তিনি মুখ ফিরিয়ে তাকালেন।

যুবক দুটি সোজাসুজি দীপ্তির চোখে চোখ রাখলো। তারা তৈরী হয়ে আছে। দীপ্তি কিছু বললেই তারা আরো অনেকগুলো কুবাক্য ছড়াবে। এমন কি তারা একটা খারাপ গানও গাইতে পারে। কেউ তাদের সেই অধিকার কেড়ে নিতে পারে না।

দীপ্তি কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন নির্নিমেষে। তাঁর চোখে রাগ নেই। অত্যন্ত

সূক্ষ্ম একটা অভিমান ঠেলে আসতে চাইছে তাঁর বুক থেকে। তিনি বলতে চাইলেন, তোমরা আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখো, আমার মুখে যদি কোনো পাপ দেখতে না পাও, তাহলে ফিরিয়ে নাও তোমাদের কথা।

কিন্তু মুখে এসব উচ্চারণ করা যায় না। তিনি আবার মুখ ফিরিয়ে সঙ্গের ছেলেটিকে বললেন, চল্।

তিনি কিছুদূর চলে যাবার পর যুবকরা আবার মুখ খুললো। তারা বুঝিয়ে দিতে চায়, তারা ঐ রমণীর ব্যক্তিত্ব দেখে অভিভূত হয়ে যায় নি। অত সোজা নয়।

একজন বললো, এঃ, আবার তেজ দেখানো হচ্ছে।

আরেকজন বললো,............

অর্থাৎ কোনো নারী বা পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়েও যদি কাছাকাছি আসে, তাহলে তাদের তেজ দেখাবার কোনো অধিকার নেই। বরং অন্য সকলের অধিকার আছে তাদের ভর্ৎসনা করার। তুমি আমি যা খুশী করি, লোককে ঠকাই, বাবা মাকে অযত্ন করি, শিশুদের কুশিক্ষা দিই—এ সবই চলতে পারে, কিন্তু সমাজের স্বীকৃতি ছাড়া দুজন নারী পুরুষের মিলন—এ কক্ষনো হতেই পারে না।

আশ্রমে ফিরে এসে দীপ্তি কারুকে কিছু বললেন না, বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদলেন কিছুক্ষণ। তারপর চোখ মুছে উঠে পড়ে ভাবলেন, ছিঃ, আমি এত দুর্বল হয়ে পড়ছি কেন? লোকের কথায় কি আসে যায়?

সূর্যর কানেও যখন এসব কথা আসতে লাগলো, তাকেও কিছু কিছু টিট্‌কিরি সহ্য করতে হলো। তখন সে বড় বিপর্যস্ত বোধ করলো। এ কি ধরনের অদ্ভুত শত্রুতা, যার প্রতিরোধ করার কোনো উপায় তার জানা নেই। শত্রু এখানে বস্তুত অদৃশ্য। গুজব কে বা কারা ছড়াচ্ছে তা জানার উপায় নেই। রাস্তায় ছেলেরা অন্য-দিকে মুখ ফিরিয়ে বাঁকা বাঁকা উক্তি করলেও তা নিয়ে ঝগড়া করা যায় না। সেটা আরও বিসদৃশ ব্যাপার হয়।

সূর্য খানিকটা মুষড়ে পড়লো। সে বেশী শঙ্কিত বোধ করলো দীপ্তিদির জন্য। তার এতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু দীপ্তিদি কি এতটা সহ্য করতে পারবেন?

এ রাস্তায় নতুন বাস চলতে শুরু করেছে। বাস এলেই আশ্রমের ছেলেরা ছুটে তা দেখতে যায়। একদিন সত্যেন গুহ সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, চলন্ত বাস থেকে একদল নব্য যুবা তাঁর উদ্দেশ্যে কতকগুলো অশ্রাব্য উক্তি ছড়িয়ে গেল। তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। বিস্ফারিত চোখে তাকালেন আশ্রম-বালকদের দিকে। ফিরে এসেই তিনি প্রার্থনায় বসলেন, প্রায় এক ঘণ্টা সেখানেই রইলেন চোখ বুঁজে, কি সমাধান তিনি পেলেন কে জানে!

সূর্য শিলিগুড়ি স্টেশনে গিয়েছিল একটা কাজে। কাজ সেরে ফেরার জন্য বাস ধরতে যাচ্ছে, দেখলো বাসের জানলার পাশের সীটে বসে আছেন দীপ্তি। সূর্য তৎক্ষণাৎ মুখ ঘুরিয়ে উল্টো দিকে ফিরে হন হন করে হাঁটতে লাগলো। কাছাকাছি একটা চায়ের দোকান দেখে ঢুকে পড়লো তার মধ্যে।

দীপ্তি সূর্যকে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি নেমে এলেন বাস থেকে। সূর্যর কাছে এসে একটু রুক্ষভাবে বললেন, তুমি আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে এলে কেন?

সূর্য তক্ষুনি কোনো উত্তর দিল না। প্রায় তিন-চার মাস বাদে দীপ্তি এই রকম-ভাবে আলাদা কোনো জায়গায় সূর্যর সঙ্গে কথা বললেন। তাও অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত

সময়ে।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে সূর্য বললো, আমাদের একসঙ্গে এক বাসে না যাওয়াই তো ভালো।

—কেন?

—আপনি তো তাই চান।

—কে বলেছে তোমাকে? আমরা এক আশ্রমে এক জায়গায় থাকি—অথচ বাইরে দেখা হলে কেউ কারুকে চিনতে পারবো না—মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবো—এটা কি সম্মানজনক ব্যাপার? লোকের কথার বেশী মূল্য দিলে তারা আরও বেশী পেয়ে বসে।

—আপনি আমার সঙ্গে কখনো একসঙ্গে বেরুতে চাননি।

—সেটা আলাদা কথা।

সূর্য মুখ ভরিয়ে হাসলো। চুম্বক আকৃষ্টের মতন দীপ্তির চোখে চোখ রেখে মনে মনে বললো, পৃথিবীতে তোমার চেয়ে সুন্দর কেউ নেই। আমি অন্তত আর কারুকে দেখি নি। এখনো তোমাকে দেখলে আমার বুকের মধ্যে কাঁপে।

সূর্য বুক ভরে নিশ্বাস নিল, উজ্জ্বল চোখে তাকালো দীপ্তির দিকে। তারপর বললো, তুমি যদি মনে জোর আনতে পারো, তা হলে আমি কারুকে গ্রাহ্য করি না। আমি তোমার জন্যই চিন্তিত বোধ করছিলাম। কারণ, তুমি লোকলজ্জাকে ভয় পাও। এই সামান্য লোকলজ্জার কারণেই তুমি একদিন আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছো। এর জন্য তুমি তোমার নিজের মনটাকেও গুটিয়ে রেখেছিলে।

দীপ্তি মৃদুস্বরে বললেন, না ও জন্য নয়। আমি নিজের বিবেক ছাড়া আর কারুর কাছে দায়ী নই।

সূর্য স্পষ্ট গলায় বললো, তাহলে তোমার বিবেক পরিষ্কার করে নাও। আমরা কোনো অন্যায় কাজ করছি না। আমরা পরস্পরকে চাই। এটা সম্পূর্ণ আমাদের দুজনের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর সঙ্গে আমাদের কাজের কোনো সম্পর্ক নেই। সমাজের জন্য আমরা যা কাজ করছি তার ভালো মন্দের বিচার হতে পারে, কিন্তু আমাদের নিভৃত জীবনের ব্যাপারে মাথা ঘামাবার অধিকার কারুর নেই। তবু যদি কেউ সেদিকে নোংরা চোখ ফেলতে আসে জোর করে তা অস্বীকার করতে হবে। তুমি যদি ঠিক থাকো, তাহলে আমি প্রকাশ্য রাস্তায় তোমার সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটবো, আড়ালে লুকবো না, দরকার হলে হাতে একটা চাবুক রাখবো—সামনের বাধা সরিয়ে দেবার জন্য। ক্যারাভান যখন যায়, তখন কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, তাতে ক্যারাভান কখনো থামে না।

দীপ্তি বললেন, এসব কথা আলোচনার জায়গা এটা নয়। চলো বাসে উঠবে না?

সূর্য দীপ্তিকে নিয়ে এসে বাসের জানলার কাছে বসলো। তারপরেও অবিরাম কথা বলে যাচ্ছে। অন্য কে দেখছে বা শুনছে সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। এই ক'মাসে দীপ্তি একদিনও তার সঙ্গে ভালো করে কথা বলেন নি, আজ নিজে এসে প্রকাশ্যে তার সঙ্গে কথা বলায় সূর্যর সমস্ত অভিমান যেন এক ফুৎকারে উড়ে গেছে।

বাস থেকে নেমে সে আবার বললো, তুমি তো জানো, তোমার জন্য আমি সব কিছু ছাড়তে পারি। তবু তুমি কেন আমাকে এড়িয়ে থাকতে চেয়েছিলে এতদিন? আমি এর কোন যুক্তির মাথা মুণ্ডু বুঝতে পারি না।

দীপ্তি বললেন, সূর্য, তুমি আমার একটা কথা শুনবে?

—বলো।

—তুমি অন্য একটি বিয়ে করো। তারপর তুমি যদি চাও তাহলেও এই আশ্রমে থাকতে পারো—আমি বড় মামাকে বলে কয়ে রাজি করাবো। এতেই লোকের কথাবার্তা সব থেমে যাবে।

সূর্য প্রস্তাবটা একেবারে উড়িয়ে দিয়ে বললো, এ তুমি কি ছেলেমানুষের মতন কথা বলছো? আমি চাই তোমাকে, আর বিয়ে করবো অন্য একটা মেয়েকে? এরকম ভণ্ডামি তুমি আমার কাছ থেকে আশা করো?

—আমার সম্পর্কে টানটাও তোমার আস্তে আস্তে কমে যাবে—

—তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছো?

—না না, সে কথা বলছি না। আমি বলছি যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে সব কিছুই অন্যরকম হয়ে যায়।

—পরে কি হবে, সে কথা ভেবে হাত গুটিয়ে বসে থাকা আমাদের মানায় না দীপ্তিদি। আমরা জীবনে অনেক রকম ঝুঁকি নিয়েছি। পরে সে জন্য কখনো কি অনুতাপ করেছি? দীপ্তিদি, তুমি আর কোনো দ্বিধা করো না। আমাকে তোমার পাশে থাকতে দাও। তোমার জন্য আমি সব সময় ছটফট করি। কতদিন তোমাকে ছুঁইনি, তবু এখনো আমার হাতে তোমার শরীরের গন্ধ লেগে আছে। সত্যি করে বলো তো, তুমি আমাকে ভালোবাসো না!

দীপ্তি তক্ষুনি কথাটার উত্তর দিতে পারলেন না। মুখ ফিরিয়ে রইলেন। কিন্তু বুঝতে পারছেন, সূর্য প্রতীক্ষা করে আছে, বলতে তাঁকে হবেই। মন্থর ভাবে রাস্তার পাশ থেকে একটা বুনো ফুল ছিঁড়ে নিলেন। তারপর বললেন, কি জানি! ভালো-বাসা কাকে বলে আমি ঠিক জানি না বোধহয়। তুমি আমাকে উতলা করে দাও। কিন্তু তোমাকে আমি আগে যা অনেকবার বলেছি সেইটাই সত্যি। মনে মনে সারা জীবন আমরা খুব কাছাকাছি থাকবো—তা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

—মনে মনে কাছাকাছি থাকা নিতান্ত ছেলেমানুষী ব্যাপার। আমরা সেই বয়েস পেরিয়ে এসেছি।

—সূর্য, আমি জানতাম, এই আশ্রমের জীবন তোমার জন্য নয়।

—এতদিনের মধ্যে একবারও কি আমি অন্যায় কিছু করেছি? এখন তুমি অন্য-লোকের কথা শুনে আমাকে এই কথা বলছো। তবে, একথা ঠিক, আমি শুকনো সন্ন্যাসী কিংবা দাঁত-মুখ খিঁচোনো পলিটিশিয়ান হতে পারবো না কখনো। আমি কাজ করতে ভালোবাসি, মানুষের উপকার চাই, তা বলে নিজেকেই বা বঞ্চনা করবো কেন? ভবিষ্যৎ জেনারেশানের সুখ সমৃদ্ধির জন্য আমরা খাটবো ঠিকই, তা বলে নিজেরা সব কিছু ত্যাগ করবো—এটা ঠিক নয়। এটা অবৈজ্ঞানিক! যারা মুখে এক কথা বলে আর কাজে অন্য রকম করে—আমি তাদের দলে নই, তুমি তা ভালো করেই জানো।

দীপ্তি মুখ নীচু করে নিঃশব্দে হাঁটছেন। সূর্য তার হাত ধরে দাঁড় করিয়ে আবেগ কম্পিত গলায় বললো, দীপ্তিদি, আমি তোমাকে কি ভীষণ ভাবে চাই, তুমি বুঝতে পারো না? তুমি আমাকে দূরে ঠেলে দিও না। আমরা দুজনে যদি পাশা-পাশি থাকি, আমরা একসঙ্গে অনেক বড় কাজ করতে পারি এখনো। আমরা কারুকে গ্রাহ্য করবো না। কেউ আমাদের বাধা দিতে এলে তার মুখে থুতু দেবো।

দীপ্তি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ম্লান গলায় বললেন, সূর্য আমি কোনোদিন তোমাকে পাবো না। আমি তোমার যোগ্য নই।

—এ কথা বলো না।

—তুমি মেয়েদের কথা বুঝবে না। যেসব মেয়েরা বিয়ে করে, তারা ছেলেবেলা থেকেই বিয়ের কথা ভাবে। তারা না-দেখা স্বামীর স্বপ্ন দেখে, না-জন্মানো ছেলে-মেয়েকে মনে মনে আদর করে তখন থেকেই। আমি ছেলেবেলা থেকে কখনো বিয়ের কথা ভাবিনি। আমি অন্যরকম ব্রত নিয়েছিলুম। এখন আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, এখন কি আমার পক্ষে নতুন করে বিয়ের কথা ভাবা সম্ভব? সে সাহসও আমার নেই, সে ইচ্ছেও নেই। তুমি আমার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট, আমাদের সমাজ সেটা সহজে মেনে নেয় না, তাছাড়াও সাংসারিক জীবন, ছেলে মানুষ করা—এসবের সঙ্গে আমি আর নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবো না।

—তুমি বয়েসের কথা বলো না। তোমার কোনো বয়েস নেই। তুমি চিরকালের সুন্দর।

—এটা ছেলেমানুষী কথা। আমার তিরিশ বছর পার হয়ে গেছে।

—বিয়ে করার ব্যাপারে আমার নিজেরও কোনো ইচ্ছে বা অনিচ্ছে নেই। বিয়ে না করলে কি হয়?

—এ আশ্রমে থেকে সেটা সম্ভব নয়, বুঝতেই পারছো।

—আমরা আজই এ আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে পারি। এ আশ্রম ছাড়া কি সারা দেশে আর কোনো কাজের জায়গা নেই?

—তারপর সারাজীবন আমরা সমাজ থেকে পলাতক থাকবো? কিংবা কোনো অচেনা জায়গায় গিয়ে মিথ্যে পরিচয় দেবো? ওরকম পাশ্চাত্ত্য ধরনের জীবন আমার জন্য নয়। তোমাকে আর একটা সত্যি কথা বলি, না হলে আমার পাপ হবে!

দীপ্তি গাঢ় চোখ তুলে সূর্যর দিকে তাকালেন। স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁর চোখে জল এসে গেছে। তিনি বললেন, তুমি যখন এই আশ্রমে জোর করে থাকতে এলে, তখন আমি সব সময় তোমার ওপর রাগ করতুম। কিন্তু আমি তখন তোমার চেয়েও বেশী দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। তোমাকে দেখলে আমি দুর্বল হয়ে পড়ি বলেই তো তোমার কাছ থেকে পালাতে চাই। এখানে, প্রথম দিকে রাত্তিরবেলা আমার ঘুম আসতো না, বিছানায় এপাশ ওপাশ করতাম, খালি ইচ্ছে করতো, উঠে তোমার ঘরে চলে যাই, তোমার ঘুমন্ত মুখে একবার হাত ছোঁয়াই। কত কষ্টে যে নিজেকে দমন করেছি। নইলে যে আমি নিজের কাছেই ছোট হয়ে যেতাম! এখন আমি নিজেকে সামলে নিতে পেরেছি। এখন আমার বাসনা মরে গেছে। ভালোবাসার জন্য যারা সমাজ থেকে পলাতক হতে পারে, আমি আর তাদের মতন নই।

সূর্য কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, দীপ্তি তাকে বাধা দিয়ে বললেন, আমাকে আর একটু বলতে দাও। যারা একবার রাজনীতি বা সমাজ সেবার কাজে আসে, তারা এর থেকে আর বেরিয়ে যেতে পারে না! এটা একটা সাংঘাতিক নেশা। আমিও এর থেকে দূরে গিয়ে আর কোনোদিন স্বস্তি পাবো না। তুমি রাজনীতিতে এসেছিলে ঝোঁকের মাথায়, তুমি সব কিছুই করো ঝোঁকের মাথায়, সেইটাই তোমার চরিত্র! কিন্তু আমার ব্যাপার তা নয়, আমি ছেলেবেলা থেকেই এর সঙ্গে মিশে আছি।

আর একটা কথা ভেবে দেখো। আমাদের জন্য বড় মামার আশ্রমটা ভেঙে যেতে বসেছে। আমাদের বয়েস আছে, আমরা তবু অন্য কিছু করতে পারি, কিন্তু উনি কি করবেন? এই আশ্রমই ওঁর জীবনের সব কিছু—এটা নষ্ট হয়ে গেলে কি নিয়ে আর বাঁচবেন? দেখছো না, ক'দিন ধরে কি রকম গুম হয়ে আছেন! জানি, কোনোদিন

আমাদের কিছু বলবেন না মুখে—

সূর্য বললো, তা হলে কতকগুলো নীচ চরিত্রের লোকের কথা মতনই আমাদের চলতে হবে? তারা একটা অপবাদ রটাবে বলেই আমরা মাথা নীচু করে থাকবো? এ অন্যায় আমি কিছুতেই সহ্য করবো না। আমি দেখতে চাই, ওরা কত দূর যেতে চায়—

এর পরবর্তী অধ্যায় হিসেবে সূর্য একদিন সন্ধ্যের অন্ধকারে কয়েকজন আততায়ীর হাতে প্রচণ্ড মার খেলো। সূর্য তার বেপরোয়া স্বভাবের জন্যই বিপদটা ডেকে আনলো। সে তার কাজকর্ম, ছেলেদের নিয়ে হইচই চালিয়ে যাচ্ছিল পুরো মাত্রায়। জলপাইগুড়ি শহরে যখন তখন যায়। পূর্ববর্তী পরিচিত লোকদের সঙ্গে ডেকে ডেকে কথা বলে। কথা বলার সময় সরাসরি তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কেউ অন্য প্রসঙ্গে কিছু বললেই সে উত্তর দেবে।

কেউ কিছু বলে না। এমনকি কয়েকদিন পর গুজবটা একটু কমেছেও মনে হয়। তারপর সন্ধ্যের অন্ধকারে কয়েকজন এসে সূর্যকে লাঠি ও লোহার রড দিয়ে খুব পিটিয়ে যায়। সূর্য হাত পা ছুঁড়ে যতদূর সম্ভব বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু অতর্কিত আক্রমণের জন্যই নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি।

সেইসব দিন তো এখন আর নেই, যখন শত্রুকে পেছন থেকে আঘাত করতো না মানুষ। নিরস্ত্র শত্রুকে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র দেওয়া ছিল শৌর্যের নিদর্শন। এখন চুপিচুপি তিন চারজন মিলে অসহায় একজনকে মারতেও কোনো দ্বিধা নেই। শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে-কোনো পন্থাই নেওয়া চলে, এই রীতি প্রতিষ্ঠার পর যে কোনো কুকর্মও মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের অঙ্গ হিসেবে চলে যায়। স্বাধীনতার পর দলের শক্তি বাড়ানোর জন্য কংগ্রেস দলই প্রথমে গুণ্ডা শ্রেণীকে প্রশ্রয় দেয়—তারপর পরম্পরা অনুযায়ী অন্য দলগুলিও সেই পথ গ্রহণ করে—এবং এর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী চলে।

সূর্যকে একেবারে প্রাণে মেরে ফেলার বোধহয় ইচ্ছে ছিল না আততায়ীদের, খানিকটা শাস্তি দিতেই চেয়েছিল। সে মরে গেলে এই মুখরোচক প্রসঙ্গটা থেমে যেতে পারে—তার বদলে দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার মেরে এটাকে জিইয়ে রাখা দরকার। তাছাড়া যে মরে, সে অনেক সময় শহীদ হয়ে যায়—এও একটা ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। আধ-মরা হলে খবরের কাগজে তার নামও ওঠে না, পুলিসও বিশেষ মাথা ঘামায় না।

আশ্রমের ছেলেরা অনেক খোঁজাখুঁজি করে একটু বেশী রাত্রে মাঠের মধ্যে সূর্যকে পেয়ে যায়। ধরাধরি করে তাকে নিয়ে আসে ভেতরে। অনেকখানি রক্ত ঝরেছে তার শরীর থেকে। কিন্তু যে বেড়াল অনেক মার খেয়েছে, সে সহজে মরে না।

সত্যেন গুহ পুলিসে খবর দিলেন না, কোনো রকম হা হুতাশও করলেন না। তিনি দীপ্তি এবং বড় মা মিলে প্রাণপণে সেবা করতে লাগলেন সূর্যর। দীপ্তি রাত জেগে বসে রইলেন সূর্যর শিয়রের কাছে।

মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরে পেয়ে সূর্য দীপ্তির হাত চেপে ধরে এবং বড় বড় নিশ্বাস ফেলে। মনে হয় সে খুব সুখে আছে। যদিও তার একটা চোখ বুজে গিয়ে অনেকটা ফুলে গেছে, মাথায় মস্ত বড় ব্যাণ্ডেজ।

দিন চারেক পর সূর্য একটু সুস্থ হয়েছে সবে, তখনও বাইরে বেরোয় না, দীপ্তিকে দেখে সে খুব শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বললো, এই সামান্য ব্যাপারে ওরা আমাকে ভয় দেখাবে ভেবেছে? আমাকে চেনে না এখনো। আমি আবার যাবো ওদের কাছে।

আমি দেখে নেবো সবাইকে।

গান্ধী আশ্রমের খাটে শুয়ে যে এরকম উক্তি মানায় না, সেদিকে খেয়াল নেই সূর্যর।

দীপ্তি কোনো উত্তর দিলেন না।

সূর্য আবার বললো, রিভলবারটা হাত ছাড়া করা উচিত হয়নি। আমি মারতাম না ওদের, শুধু একটু ভয় দেখালেই চলতো।

দীপ্তি ঘর থেকে চলে গেলেন।

আশ্রমের ছেলেরা মাঝে মাঝে দরজার বাইরে থেকে উঁকি মারে। সূর্য তার চেনা ছেলেদের অনেককেই দেখতে পায় না। তাদের কথা অন্যদের কাছে জিজ্ঞেস করে, ছেলেরা একজন আর একজনের মুখের দিকে তাকায়, উত্তর দেয় না। আস্তে আস্তে অনেক ছেলেই আশ্রম ছেড়ে যাচ্ছে।

সূর্য লক্ষ্য করলো, সত্যেন গুহ, বড়মা কিংবা দীপ্তিদি যখন তার অসুখের অবস্থা দেখতে কিংবা খাবার দিতে আসেন, তাঁরা কেউই বিশেষ কিছু বলেন না। যেন সূর্যর সঙ্গে মামুলি দু' একটা কথা ছাড়া আর কিছুই বলার নেই। সূর্য যে প্রতিশোধ নেবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে ফেলেছে, সে কথা শোনবার মতন কারুকে পায় না।

একদিন সকালবেলা দীপ্তি এসে বসলেন সূর্যর বিছানার কাছে একটা টুল নিয়ে। এর মধ্যে স্নান সেরে নিয়েছেন, চুল তখনও ভিজে, বাইরে যাবার উপযোগী শাড়ি পরেছেন। কয়েক রাত ভালো করে না ঘুমোবার জন্য চোখের নীচে কালো ছাপ। চিবুকে একটা দুঃখের দাগ। দীপ্তির এই রূপই সূর্যর বুকে একটা ঝাপটা মারে।

দীপ্তি বললেন, শোনো, সূর্য, তোমাকে না বলেই যাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু মনকে শক্ত করতে পারলাম না, তাই তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি।

সূর্য অবাক হয়ে বললো, কোথায় যাচ্ছো?

—আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

—কেন?

—আমি অনেক ভেবে দেখেছি। আমাদের দুজনের একসঙ্গে এক জায়গায় থাকা আর কোনোদিন সম্ভব নয়।

—শোনো, শোনো, দীপ্তিদি—

—সূর্য, এ নিয়ে আর কোনো কথা কিংবা যুক্তিতর্কের দরকার নেই। আমি মন একেবারে ঠিক করে ফেলেছি। আমি যাবোই।

—তাহলে আমিও যাবো তোমার সঙ্গে। আমি এখানে কি করবো?

—না, তুমি আমার সঙ্গে যাবে না।

—নিশ্চয়ই যাবো। তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাবো।

—তুমি যদি আমাকে অনুসরণ করো তা হলে আমার আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় নেই। আমি একথাও ভেবে রেখেছি।

দীপ্তির কথার মধ্যে এমন একটা সুর ছিল, যা শুনলেই বোঝা যায় প্রতিবাদ করা এখন অর্থহীন। দীপ্তি খুব শক্ত ধাতুর মেয়ে।

সূর্য শুধু বললো, এতদূর?

তারপর চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। দু'জনেই।

একটু বাদে একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে সূর্য বললো, ঠিক আছে, তাহলে আমিই

চলে যাচ্ছি এখান থেকে। তুমি যাবে কেন? এটা তো তোমারই নিজের জায়গা।

দীপ্তি বললেন, সত্যি যেতে চাও?

—হ্যাঁ।

—তাতে আমি আপত্তি করবো না। আমার জন্য তুমি আর নিজের বিপদ ডেকে এনো না।

সূর্য গম্ভীর ভাবে বললো, ঠিক আছে। আমি কালই চলে যেতে পারবো। তাতে তুমি খুশী হবে তো?

—হ্যাঁ। আর কখনো এখানে এসো না।

—আসবো না।

—সূর্য, আমি জানি সারা জীবনে আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। না হওয়াই ভালো।

সূর্যর চলে যাওয়ার ব্যাপারে সব ঠিক ঠাক হয়ে যাবার পরেও দীপ্তি আর একটাও কোমল কথা বললেন না তার সঙ্গে। আর নিভৃতে দেখা হলো না। সত্যেন গুহ দীপ্তিকে কিছু একটা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, দীপ্তি উত্তর দিলেন, না, বড়মামা আর কোনো কথা বলো না। এইটাই সবচেয়ে ভালো পথ। এতে ও আর আমি দুজনেই ভালো থাকবো।

সূর্য যখন আশ্রম থেকে বিদায় নিল তখন আশ্রমের অনেকেরই এমন কি, সত্যেন গুহর পর্যন্ত চোখে জল এসে গিয়েছিল, কিন্তু সূর্যর চোখ শুকনো।

শিলিগুড়ি স্টেশনে সে ট্রেনের কাছে দাঁড়িয়েছে। আশ্রমের যে দুটি ছেলে তার সঙ্গে এসেছিল তারা চলে গেল এইমাত্র। সূর্য শেষবার ঘাড় ঘুরিয়ে চতুর্দিকে তাকালো। তার মনে হলো, সমস্ত লোকজন যেন আড়চোখে তার দিকেই দেখছে এবং মুখ ফিরিয়ে হাসছে। সকলেই ভাবছে, সে হেরে গেছে, সে কাপুরুষ, সে মার খেয়ে ভয়ে পালাচ্ছে।

সেই সময় সূর্যর উষ্ণ নিশ্বাসের কাছাকাছি যদি কেউ থাকতো, তাহলে বোধহয় দগ্ধ হয়ে যেত।

আবার শুরু হলো সূর্যর ভ্রাম্যমান জীবন।

॥ ৬৯ ॥

রেণুর একটা নিজস্ব জগত আছে। তাদের এত বড় বাড়িটাতে অনেক মানুষ-জন, কিন্তু অন্য কারুর সঙ্গেই যেন তাকে ঠিক মেলানো যায় না। রেণু সকলের সঙ্গে মিশে আনন্দ এবং হৈ চৈ করতে পারে, আবার এক এক সময়ে সে একদম আলাদা হয়ে যায়। তার সমবয়েসী কিংবা বয়েসে বড়দের মধ্যেও কেউ কেউ তাকে একটু যেন ভয় পায়। ভয় কিংবা সমীহ। অথচ এর কারণটা কেউ বুঝিয়ে বলতে পারবে না। কেউ কোনো খারাপ কথা ওর সামনে বলে ফেললে, রেণু চুপ করে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, সেই সময় ওর মুখে একটা দুঃখের রেখা ফোটে, কিন্তু বলে না কিছুই।

এই সব বনেদী বাড়িতে অনেক লোক এক সঙ্গে থাকলেও ভেতরে ভেতরে রেশা-রেশি থাকে অনেক রকম। এক ছাদের নীচে অনেকগুলো গোষ্ঠী তৈরি হয়ে যায়, বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও। অমুক নাকি তমুক সম্পর্কে এইসব কথা বলেছিল, এই-

রকম একটা কিছু সূত্র ধরেই এক ঘরের সঙ্গে আরেক ঘরের মনোমালিন্য হয়ে যায়, কথা ঠিক বন্ধ হয় না, মুখের হাসি শুকনো হয়ে যায় শুধু। কিছুদিন আগে বাড়ির দারোয়ানের কাছে দুই গিন্নি দু'রকম নির্দেশ দেবার উপলক্ষে বিষ্ণুর মা আর রেণুর মায়ের মধ্যে মন কষাকষি হয়ে গেছে। এই সব সময়ে দু' ঘরের ছেলেমেয়েদের যাতায়াতও খুব একটা ভালো চোখে দেখা হয় না। বিষ্ণু অবশ্য বিলেতে চলে গেছে। বিষ্ণুর মা'র আর ছেলেপুলে নেই—এবং তাঁর যাবতীয় বাৎসল্য রস ঐ ছেলের ওপরেই খরচ হয়ে গেছে। তিনি সাধারণ অল্প বয়েসী ছেলেমেয়েদের পছন্দ করেন না।

রেণু কিন্তু এসব ভ্রূক্ষেপ করে না। সে যখন তখন কাকীমার ঘরে আসে। কেননা বিষ্ণুর বই কেনার বাতিক ছিল, প্রচুর বই সে রেখে গেছে, রেণু সেই বই-গুলির সদ্ব্যবহার করে। বিষ্ণুর মা ঠিক আপত্তি করতে গিয়েও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। শুধু বলেন, দেখিস ছেঁড়ে টেড়ে না যেন। ওর যা বইয়ের ওপর মায়া!

রেণু মুচকি হেসে বলে, ন' কাকীমা এই বইটার মলাট কিন্তু ছিঁড়ে গেছে!

তিনি আঁতকে ওঠেন। তাড়াতাড়ি এসে মহামূল্য সম্পদের মতন বইখানা তুলে নেন। সেটার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বলেন, ইস, তুই এটা ছিঁড়ে ফেললি? এত দামী বইখানা?

রেণু বলে, এই বইয়ের মলাটটা ছোড়দা থাকবার সময়েই ছিঁড়েছিল। আপনি কিছুই দেখেন না।

—সত্যি তখন ছেঁড়া ছিল?

—হ্যাঁ। ছিঁড়লেই বা। বই তো পড়তে গেলে একটু আধটু ছিঁড়বেই!

বিষ্ণুর মায়ের মন তবু খুঁত খুঁত করে। পরবর্তী বিলেতের চিঠিতে তিনি অন্যান্য কথার পর বইখানার নাম-উল্লেখ করে এটাও জানতে চান যে, মলাটটা সত্যিই ছেঁড়া ছিল কিনা। বিষ্ণু তখন স্কটল্যাণ্ডে এক বান্ধবীর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে, সেখানে এক নিঝুম সন্ধ্যায় বান্ধবীর কাছে মায়ের চিঠি পড়ে শোনায়। তখনই সে ঠিক করে, রেণুকে একটা চিঠি লিখতে হবে।

রেণুদের বাড়ির ছেলেরা এখনো কেউ চাকরি করে না। অবস্থা অনেক পড়ে এসেছে। তবু নানান বাড়ি ভাড়া আর বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার থেকে চলে যায়। বাড়িখানার অবস্থা অনেক জীর্ণ হয়েছে, সারাবার দায়িত্ব কারুর নেই। সিঁড়িতে একদা কার্পেট পাতা থাকতো, তা ছিঁড়ে ঝুলি ঝুলি হয়ে গেছে কবে। লণ্ঠন-গুলোতে ময়লা জমে আছে। একতলার বারান্দার দেয়ালগুলোতে ড্যাম্পের ছাপ—একটুক্ষণ তাকালেই নানারকম অতিকায় জন্তুর অবয়ব কল্পনা করা যায়।

পুরোনো কলকাতার ক্ষয়িষ্ণু বংশ গুলির মতন এ বাড়িতেও মাঝে মাঝে হঠাৎ এক একটা কেলেংকারীর ঝড় আসে। হঠাৎ জানা যায়, কোন্ জ্যাঠামশাই হরিদ্বারে গিয়ে গোপনে আর একটা বিয়ে করে এসেছিলেন, তার বংশধর একদিন এসে সম্পত্তির অংশ দাবি করে। শুরু হয় মামলা মকদ্দমা। কিংবা, কোনো ঘরের পুত্রবধূ—যে তার বাপের বাড়ির বড়লোকি চাল নিয়ে সব সময় দেমাক দেখাতো—তাদের নাকি বাড়ি বন্ধক পড়েছে। তখন অন্যান্য ঘরে এই নিয়ে বেশ সরস আড্ডা জমে ওঠে।

আর মামলা মকদ্দমা তো লেগেই আছে। রেণুর ছোটকাকা এখন সব মামলা টামলা পরিচালনা করেন। এর মধ্যেই তাঁর মাথায় টাক পড়েছে।

রেণুর বড়দাদা দিল্লিতেই ব্যবসা করছেন, কলকাতায় আসেন খুব কম। তিনি

বিয়ে করেছেন একটি পাঞ্জাবী মেয়েকে, সেই বউ প্রথমবার কলকাতায় এসে শাশুড়ির সামনে সিগারেট খেয়েছিল। ওদের ছেলেমেয়েরা বাংলাতে কথা বলতেই শেখেনি।

সুপ্রকাশ বছর দুই এক আগে মেনেনজাইটিস রোগে হঠাৎ মারা যায়। তার স্বাস্থ্য ছিল চমৎকার, প্রাণশক্তি ছিল অন্য অনেকের চেয়ে বেশী, তবু কেন সে পৃথিবীতে বেশীদিন বেঁচে থাকার অধিকার পেল না কে জানে। তার বিয়ের কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল, বিয়ের তারিখের ঠিক এক মাস আগে সে অসুখে পড়ে, তার ভাবী বধূ তার মৃতদেহের সামনে অশ্রুবর্ষণ করে গেছে। মেয়েটির এখন বিয়ে হয়ে গেছে অন্য জায়গায়—তবু রেণুর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব আছে।

এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যাওয়াই নিয়ম। বিধবা, স্বামীতে নেয় না, এরকম মহিলা এ বাড়িতে আছেন কয়েকজন, কিন্তু আঠেরো বছরের বেশী কোনো কুমারী মেয়ে নেই। রেণু সদ্য আঠেরো বছর পার হয়েছে। অংশুর বিয়ে হয়ে গেছে, একটি বাচ্চাও হয়েছে—লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে অংশু—এখন সে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে আলাদা হবার তালে আছে।

এ বাড়ির দুটি ছেলে মেয়েই শুধু ব্যতিক্রম। বিষ্ণু আর রেণু। বিষ্ণু কবে ফিরবে ঠিক নেই। রেণু ছেলেবেলায় আর যাদের সঙ্গে খেলা করতো, তারা সবাই এখন কি রকম বদলে গেছে। ছেলেমানুষী ভাব কারুর মধ্যে নেই। হয় ভদ্দরলোক ভদ্দরলোক অথবা গিন্নী গিন্নী ধরন ধারন।

রেণুর মা সরল সাদাসিধে মানুষ, কিন্তু বড্ড অভিমানী। অনেকগুলো শোক দুঃখ পেয়ে মাথাটাও যেন একটু গোলমাল হয়ে গেছে। আগে খুব হাসিখুশী ছিলেন। এখন কথায় কথায় বাড়ির অন্য শরিকদের সঙ্গে ঝগড়া করেন। তিনি যদি ঘুণাক্ষরেও টের পান যে, কেউ তাঁকে সহানুভূতি কিংবা করুণা দেখাতে আসছে, তাহলেই তিনি দপ করে জ্বলে উঠবেন। আর সব কিছুই গেছে, শুধু রয়ে গেছে বনেদী তেজ।

রেণুই তার মাকে সামলে রাখবার চেষ্টা করে। এক এক সময় সে তার মাকে ধমকও দেয়। কিন্তু অংশু বা তার স্ত্রীকে কখনো ভুলেও একটা কঠিন কথা বলে না।

এই বাড়ির পরিবেশ যেন রেণুকে স্পর্শ করে না। সে পড়াশুনো নিয়ে ডুবে থাকে, কলেজে যায়, ঠিক সময় বাড়িতে ফিরে আসে, রেডিওর সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গায়, বাচ্চাদের সঙ্গে হুটোপুটি করে। কিন্তু বাড়ির বড়োরা কেউই রেণুর কাছে মনের কথা বলবে না। সবাই অনুভব করে, রেণু তাদের থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

রেণু এখনো ঠিক টাকা পয়সার হিসেব বোঝে না। তার কখনো কিছু দরকার হলেই সে বাদলকে হুকুম করে। দুর্লভ কোনো বই, ঠিক কালো রঙের পেনের কালি, ন্যাশনাল লাইব্রেরির কার্ড—এ সব কিছুই বাদলকে এনে দিতে হয়। রেণু কখনো ভাবে না, বাদল কোথা থেকে পয়সা জোগাড় করবে। সে শুধু বোঝে, সে যখন তার দাদাদের কাছ থেকে কিছু চাইতে পারবে না, তখন বাদল ছাড়া আর কার কাছে চাইবে?

বাদল রেণুকে কিছুই বুঝতে দেয় না। ধার করে হোক যেমন করেই হোক, ঠিক সময় জিনিসটা নিয়ে আসবেই।

বাদল এম-এ ক্লাসে ভর্তি হয়নি। তার বাবা খরচ চালাবার বিষয়ে কি একটা মন্তব্য করেছিলেন, সেই অভিমানে সে আর পড়লো না। সত্যিই তো, তার বাবার কোনো রোজগার নেই, পড়াশুনো চালাবার খরচ আসবে কোথা থেকে!

বাদল এখন সকালে বিকেলে দুটো টিউশানি করে। আর চাকরির জন্য দরখাস্ত

পাঠাচ্ছে। তার বন্ধুরা হৈ হৈ করে ইউনিভার্সিটিতে যায়, কফি হাউসে আড্ডা মারে—বাদল সেসব জায়গা থেকে দূরে থাকে। আড্ডা দিতেও যেতে চায় না! বন্ধুরা কখনো এসে জেরা করলে সে চাল মেরে বলে, ক্লাসে গিয়ে পড়াশুনো করা মানে সময় নষ্ট। কোনো মাস্টার আমাকে আর কিছু শেখাতে পারবে না!

গোপনে গোপনে সে অবশ্য তার সাবজেক্টের এম এ কোর্সের সিলেবাস জোগাড় করে রেখেছে। তিন বছর পরে প্রাইভেটে পরীক্ষা দেওয়া যায়—তখন পরীক্ষা দেবে কিনা সে ভেবে দেখবে।

রেণুও বাদলের এম এ না-পড়ার কারণটা ঠিক বুঝতে পারেনি। সে বাদলের জীবনের সব কিছু জানে, বাদল তো তার শুধু বন্ধু বা প্রেমিক নয়, আবাল্য সঙ্গী --তবু আজকাল সব সময় ওর মনের ভাব ধরতে পারে না।

বাদল রেণুদের বাড়িতে আসাও বন্ধ করে দিয়েছে। রেণুর মামলাবাজ ছোটকাকা বাদলকে একদিন অপমান করেছিলেন। বাদল সেদিন রেণুকে ডাকতে আসছিল, সদর দরজার কাছেই ছোটকাকার সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, কি হে বাদলকুমার কেমন আছো!

এক একজন মানুষের সঙ্গে এক একজনের কিছুতেই জমে না। বাদল কোনো-দিনই এই ছোট কাকাটিকে পছন্দ করতে পারে নি। দেখা হলেই তিনি নানারকম কথা বলার চেষ্টা করেন। মুখ মিষ্টি লোক, তবু এঁর স্বভাবে কি রকম যেন একটা ভাল্-গার ব্যাপার আছে।

বাদল সংক্ষেপে বললো, ভালো।

তারপর সে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, ছোটকাকা আবার বললেন, বিষ্ণু তো নেই, কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছো? অংশুও তো বেরিয়ে গেল দেখলাম।

—রেণুর সঙ্গে একটা দরকার আছে।

—অ!

এই 'অ' কথাটা উচ্চারণের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যে বাদলের সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। সে থমকে দাঁড়ালো। ছোটকাকা দারোয়ানের সঙ্গে কি একটা কথায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বাদল কি তাঁর সামনে গিয়ে বলবে, আপনি ঐ রকম ভাবে অ বললেন কেন? কিন্তু এরকম প্রশ্ন করা যায় না। অন্তত বাদল তা পারবে না।

ওপরে না উঠে সে ফিরে যেতে লাগলো। ছোটকাকা তাই দেখে বললেন, ওকি চলে যাচ্ছো কেন? রেণুকে ডেকে দেবো? তুমিই ওপরে উঠে যাও না!

—না, থাক, দরকার নেই।

তারপরই বাদল রেণুকে জানিয়ে দিয়েছে, বিষ্ণু না ফেরা পর্যন্ত সে আর ঐ বাড়িতে কখনো যাবে না। রেণু অনেক পেড়াপেড়ি করেছে, বাদল শোনেনি।

ঐ বাড়িতে তো যায়ই না, ঐ রাস্তা দিয়েও পারতপক্ষে হাঁটে না। ঐ দিকেই কাছাকাছি একটা জায়গায় তাকে সন্ধ্যেবেলা টিউশানি করতে যেতে হয়—সে তখন অন্য-দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

আজকাল ধুতি পরে বাদল, শীত এসে গেছে বলে গায়ে একটা র‍্যাপার জড়িয়ে নেয়। সিগারেট ধরিয়ে সে মন্থর ভাবে রাস্তা দিয়ে হাঁটে—মনে হয় যেন জগৎ সংসার সম্পর্কে তার কোনো আগ্রহ নেই। এই কলকাতার মানুষের ভিড়ের মধ্যে সে মিশে যাবে, তাকে আর আলাদা করে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কবিতা লেখা সে একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে।

রেণুর সঙ্গে প্রায়ই বাইরে দেখা হয়। কিংবা রেণুই বাদলদের বাড়িতে যায়। কলেজ থেকে ফেরার সময় সে ঐ বাড়ির কাছে বাস থেকে নেমে পড়ে। বাদল বাড়িতে না থাকলেও সে তার মায়ের সঙ্গে গল্প করে কিংবা বাদলের বইপত্র ঘাঁটে। বাদলের পুরোনো বি এ ক্লাসের খাতাগুলোর সাদা পাতায় ছবি আঁকে সে, কবিতার খাতাটা খুঁজে পায় না।

এ বাড়িটা এখন ভীষণভাবে ফাঁকা লাগে। সারি সারি ঘর তালাবন্ধ পড়ে আছে। চিররঞ্জন হঠাৎ খুব বুড়ো হয়ে পড়েছেন, হিমানীর শুচিবায়ু হয়েছে। এই বয়েসেও তিনি কপাল চাপড়ে বলেন, বাবা কার সঙ্গে যে আমার বিয়ে দিল, জীবন-টাই নষ্ট হয়ে গেল!

বাদলের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর রেণু ফিরে যাচ্ছে এমন সময় মোড়ের কাছে বাদলের সঙ্গে দেখা। বাদল দুটি ছেলের সঙ্গে খুব তর্কে মত্ত ছিল, রেণু একটু দূরে দাঁড়ালো। চার পয়সার চিনে বাদাম কিনলো সময় কাটাবার জন্য। একটু বাদে বাদল এসে বললো, কি রে, কখন এসেছিলি?

—অনেকক্ষণ।

—আজ কলেজে যাসনি?

—হ্যাঁ। কেন যাবো না।

—দুপুরবেলা তোদের কলেজের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম।

—আজ দুপুরে তো আমার বেরোবার কথা ছিল না।

—তবু দাঁড়িয়েছিলাম, যদি দেখা হয়।

—বাঃ, আমি তোমার বাড়িতে এসে বসে আছি, আর তুমি এমনি এমনি রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছো।

বাদল রেণুর কাছ থেকে বাদাম নিয়ে ভাবতে থাকে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তারপর আবার চোখ তুলে বললো, আজ সকালে তুই কি করছিলি?

—কেন?

—এই ধর, সাড়ে আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত? তোর সঙ্গে তখন আমার ভীষণ দরকারী একটা কথা বলার ছিল। তক্ষুনি দেখা করা দরকার। কিন্তু কি করে করবো?

—বাঃ, আমাদের বাড়িতে গেলেই হতো।

—না, আমি তখন মনে মনে দারুণভাবে তোর কাছে ডাক পাঠাতে লাগলাম। রেডিও ট্রান্সমিশানের মতন। আমি ভেবেছিলাম সেই ডাক শুনে তোকে চলে আসতেই হবে। তুই শুনতে পাসনি?

রেণু বললো, না। তোমার কি হয়েছে বলো তো। ক'দিন ধরেই কি রকম যেন মন খারাপ দেখছি?

—রেণু তোর কাছে আমি একটা জিনিস চাই। কাল দুপুরে তিনটের সময় আমাদের বাড়িতে আসবি? তখন মা-বাবা বাড়িতে থাকবেন না।

রেণু একটু চুপ করে থেকে বললো, আচ্ছা আসবো।

॥ ৭০ ॥

হিমানীর বাবা-মা এবং দাদারা এসে আশ্রয় নিয়েছেন বেলেঘাটায়। হিমানীর বাবার বয়েস অনেক হয়েছে, তবু বেশ শক্ত সমর্থ ছিলেন এতদিন, হঠাৎ তাঁর শ্বাসকষ্ট দেখা দিয়েছে। মাস খানেক ধরে শয্যাশায়ী, প্রত্যেকদিনই মনে হয়, শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো বুঝি, কিন্তু বৃদ্ধের প্রাণশক্তি প্রচণ্ড।

হিমানী প্রায় রোজই বাবাকে দেখতে যান। দু' দিন ধরে বেশী বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে সেদিন তিনি সকালেই চলে গেলেন স্বামীকে নিয়ে। বাদল কিছুতেই গেল না। সে আগে কয়েকদিন গেছে। কিন্তু অসুখের বাড়িতে তার কিছুই করার থাকে না, ও বাড়িতে বই পত্রও বেশী নেই—তার সময় কাটানোই এক সমস্যা হয়।

ছোটবেলায় এই দাদামশাই বাদলকে কত ভালোবাসতেন। তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুতেন রোজ। সেই যুদ্ধের সময়, যখন বাদলরা সবাই পূর্ব বাংলায় মামাবাড়িতে চলে গিয়েছিল। গ্রামের সেই বাড়িও নেই, মানুষগুলোও কেমন যেন বদলে গেছে। মামা মামীমাদের সঙ্গে বাদল কিছুতেই ভাব জমাতে পারলো না। সে একেই তো একটু মুখচোরা লাজুক, তা ছাড়া বাদল যে জগৎ নিয়ে চিন্তা করে—সে জগৎ সম্পর্কে এঁদের কারুর মাথাব্যথা নেই। এই দোর্দণ্ডপ্রতাপ দাদামশাই সম্পর্কে বাদলের আগে একটা বিরাট ধারণা ছিল, এখন কলেজে-পড়া মন নিয়ে বাদল দেখতে পায় দাদামশাইয়ের ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যও তাঁকে অনেক সংস্কার থেকে মুক্ত করতে পারেনি।

বাদল দাদামশাইকে অসুখের সময় দেখে এসেছে। তিনি এখন মানুষ চিনতে পারেন না। ও বাড়িতে কাজের লোকের অভাব নেই, তা হলে বাদল শুধু শুধু গিয়ে কি করবে? খালি ভিড় বাড়ানো। তবু হিমানী বলেন, তাঁর দাদা বউদিরা নাকি রোজই জিজ্ঞেস করেন, বাদল এলো না? কেন, এলো না কেন? শুনেই বাদলের রাগ ধরে যায়। বাঙালদের সব ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি। কোনো কাজ নেই, তবু মুখ দেখাবার জন্য যেতে হবে?

সেদিন সকালে হিমানী অনেক করে বললেন। বাদল যাবে না একেবারে প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছে।

হিমানী জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে তুই খাবি কোথায়? হোটেলে-মোটেলে খেতে চাস বুঝি?

বাদল বললো, আমি রান্না করে খাবো।

—রান্না করে খাবি? হেঃ, কোনোদিন রান্নাঘরের ধারেই যেতে দেখলুম না।

—সে তোমাদের ভাবতে হবে না। আমি ঠিক ব্যবস্থা করে নেবো। তোমরা এখন যাও তো—দশটার সময় বেরোবে বলেছিলে, এখন এগারোটা বাজে—

হিমানী বললেন, বাড়িতে বুঝি বন্ধুবান্ধবদের ডেকে আজ আড্ডা বসানো হবে? নিজের দাদুর এ রকম অসুখ—

বাদল বললো, না, না, আড্ডা হবে না। আমার নিজস্ব কাজ আছে।

একমাত্র ছেলে, সেই জন্যই হিমানী কিছুতেই ইচ্ছে থাকলেও প্রাণ খুলে বকতে পারেন না বাদলকে। চিরঞ্জন তাঁর একমাত্র স্বামী হলেও তাঁকে বকুনি দেবার ব্যাপারে কোনো কার্পণ্য নেই। স্বামীকে বকেই তিনি আশ মিটিয়ে নেন।

মা-বাবা চলে যাবার পর বাদল সত্যিই রান্নার যোগাড়যন্ত্র করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কোনোদিন সে রান্না করেনি, তাতে কি। ভাত আর আলুসেদ্ধ সবাই রাঁধতে

পারে। ইস, রেণুকে দুপুরের বদলে এই সময় যদি আসতে বলতো, তাহলে দু'জনে মিলে দারুণ রান্না করা যেত। শুধু দু' জনের পিকনিক। এখন এক ছুটে গিয়ে রেণুকে ডেকে আনলে কেমন হয়? কিন্তু বাদল যে রেণুদের বাড়িতে আর কখনো যাবে না ঠিক করেছে। রেণুদের বাড়িতে টেলিফোনটাও যে থাকে ছোট কাকার ঘরে। বাদল কিছুতেই ছোটকাকাকে বলতে পারবে না, রেণুকে ডেকে দিন। তিনি যদি আবার সেই রকম 'অ' বলেন!

থাক, রেণু তো দুপুরে আসবেই—এখন আর তাকে ডাকার চেষ্টা করার দরকার নেই। বাদল রান্না ঘরে গিয়ে স্টোভ জ্বাললো।

এ বাড়িতে ঠাকুর-চাকর সব ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একজন ঠিকে ঝি শুধু সকালে-বিকেলে এসে বাসন মেজে দিয়ে যায়। ঠাকুর চাকর রাখার সঙ্গতি এদের আর নেই। বাড়ির নিচতলাটা ভাড়া দিলে কিছু আয় হয়। ইদানীং হঠাৎ কলকাতায় ভাড়া বাড়ির খুব চাহিদা হয়েছে, ভাড়া বেড়েছেও দ্বিগুণ—প্রায়ই এ বাড়ির একতলাটা ভাড়া হবে কিনা খবর নেবার জন্য লোকজন আসে। একতলাটা একদম খালি, কেউ ব্যবহার করে না, তবু চিররঞ্জন ভরসা করে ভাড়া দিতে পারছেন না। সূর্যকে জিজ্ঞেস না করে ভাড়া দেবেন কি করে? সূর্যর তো পাত্তাই নেই।

বাদল স্টোভের উপর হাঁড়ি চাপিয়ে তাতে জল আর চাল ঢেলে দিল। তারপর সামনে বই খুলে বসলো। কিন্তু বই পড়ায় মন বসবে কি করে, প্রতি মিনিটে একবার হাঁড়ির ঢাকনা খুলে দেখছে। ভাত তৈরি হতে এতক্ষণ সময় লাগে? টগবগ করে ফুটে উঠলে তখন ঢাকনা খুলে দিতে হয় এবং হাতায় করে খানিকটা তুলে টিপে দেখতে হয় সেদ্ধ হয়েছে কিনা—এটুকু বাদল জানে।

এক সময় টগবগ করলো এবং ভাত টিপেও দেখা হলো। সব ঠিক আছে। বাদল ফ্যানও গেলে ফেললো হাত না পুড়িয়ে। তবে, চালের আন্দাজ ঠিক করতে পারেনি, যা ভাত রান্না হয়েছে তাতে অন্তত চারজন লোক পেটভরে খেতে পারে। প্রথমেই আলুগুলো ছেড়ে দেবার ফলে সেগুলো গলে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

যাই হোক, তবু এতখানি সার্থকতায় সে বেশ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলো। তা হলে, এবার একটা কিছু ভেজে ফেললেই বা কেমন হয়? বাদল চাকা চাকা করে একটা বেগুন কেটে ফেললো, তাতে হলুদ গুঁড়ো মাখালো কিন্তু নুন মাখাতে ভুলে গেল। সসপ্যানে তেল ঢেলে চাপালো, কিন্তু তেলটা যে গরম হবার পর বুদবুদশূন্য হলে তারপর বেগুন ছাড়তে হয় এতটা সে জানবে কি করে? সুতরাং কাঁচা তেলে জলেভেজা বেগুন ছাড়তেই চটপট করে ঝাঁঝিয়ে উঠলো, তার মুখ চোখে ছিটে ফোঁটা লাগতে পারতো, কিন্তু লাগেনি।

পোড়া পোড়া বেগুন ভাজা আর ঈষৎ গলে যাওয়া ভাতে মাখন মেখে বাদল দিব্যি তৃপ্তি করে খেলো। অনেকদিন সে এত ভালো করে খায়নি। নিজের হাতের রান্না তো!

খেয়েদেয়ে সে সবেমাত্র সিগারেট ধরিয়ে বারান্দার রোদে বসেছে, এমন সময় মনে হলো যেন নিচের দরজায় একটা শব্দ। নিশ্চয়ই রেণু এসেছে। বাদল উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো। নিচে গিয়ে দেখলো কেউ নয়। ঘড়িতে দেখলো মাত্র সোওয়া একটা বাজে। রেণু এর মধ্যে আসবে কি করে? তার তো আসার কথা সেই সাড়ে তিনটের সময়।

এই অতক্ষণ সময় কাটানো বাদলের পক্ষে একটা বিরাট সমস্যা হয়ে উঠলো। প্রতিটি মিনিটকে মনে হয় এক ঘন্টা। যতবার ঘড়ির দিকে তাকায়, মনে হয় কাঁটা থেমে আছে। আরও দু' বার তাকে নিচে নেমে যেতে হলো শুধু শুধু।

সময় কাটাবার জন্য সে রেডিওটা খুলেছিল। আবার তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিল সেটা এই ভেবে যে রেডিওর জন্য নিচে দরজার কড়া নাড়ার আওয়াজ যদি সে শুনতে না পায়? অনেক বাড়িতে আজকাল কলিংবেল বসানো হয়েছে—এ বাড়িতে কে এসব কথা ভাবে?

আজ আবার এই সময় হঠাৎ কোনো উটকো বন্ধুবান্ধব না এসে পড়ে। জিতেনটা আসতে পারে। মাঝে মাঝেই এসে লম্বা লম্বা কবিতা শোনায়। বাদল কতবার বলেছে, তার আজকাল কবিতা-টবিতা ভালো লাগে না। তবু সে শোনাবেই। হঠাৎ এসে পড়লে তো তাকে আর তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। তা হলে আজকের দিনটাই নষ্ট হবে। হে ভগবান, আজ যেন জিতেন না আসে।

কথাটা ভেবেই বাদল আপন মনে হেসে ফেললো। সে ভগবানে বিশ্বাস করে না, বন্ধুদের কাছে এই নিয়ে অনেক বড়াই করেছে—কিন্তু বিপদের চিন্তায় কিরকম ভগবানের নাম মনে এসে গেল। আজ যদি জিতেন না আসে এবং রেণু ঠিক সময় আসে, তাহলে বাদল মাসে একদিন ভগবানকে মানতে রাজি আছে।

বাড়িটা অদ্ভুত রকম নিস্তব্ধ। বাড়িতে আর কেউ নেই। এই কথাটা মনে এলেই এরকম নিস্তব্ধতার অনুভূতি হয়। অনেক সময় তো বাবা দুপুরে দুপুরে বেরিয়ে যান, মা ঘুমিয়ে থাকেন, বাদল একা একা নিজের ঘরে বই পড়ে—তখন তো এরকম ঠাণ্ডা নিস্তব্ধতার বোধ আসে না। একদম ফাঁকা বাড়িতে বেশীক্ষণ একা থাকলে কি রকম গা শিরশির করে। বড়বাবু এক সময় দিনের পর দিন এ বাড়িতে একা থাকতেন। অনেকদিন পর বড়বাবুর কথা মনে পড়লো। বড়বাবুর একটা জীবনী লেখার কথা একবার সে ভেবেছিল, এখন সেসব চিন্তা ঘুচে গেছে।

ঘড়িতে মাত্র পৌণে তিনটে বাজে। আরও অনেকক্ষণ। রেণু কি একটু বুদ্ধি করে আগে আসতে পারে না? বাদল দারুণ উত্তেজিত বোধ করতে লাগলো। এখন তার গা ছুঁলে মনে হবে, তার জ্বর হয়েছে। সত্যি সত্যি তার চোখ ও কানের পাশটায় যেন আগুনের হল্কা লাগছে। সে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারছে না। তখন তার মনে হলো, বার বার দোতলা থেকে একতলায় নেমে যাবার বদলে বৈঠকখানায় বসে থাকলেই তো হয়।

বৈঠকখানায় বসে সে ঘন ঘন সিগারেট খেতে লাগলো। ঘড়ি আর দেখবেই না।

তার ছেলেবেলার আপন মনে কথা বলার স্বভাব এখনো রয়ে গেছে। দিবাস্বপ্ন দেখাও তার রোগ। সে কল্পনায় দেখতে লাগলো, রেণু আসার পর সে কি রকম ভাবে কথা বলছে।

দরজা খুলে দিতেই দেখা গেল রেণু। হাতে দু'খানা মোটা মোটা বই। বাদল জিজ্ঞেস করলো, এত দেরি করলে যে?

—কোথায় দেরি? ঠিক তো সাড়ে তিনটে।

—ভুল করেও কি একটু আগে আসতে নেই?

—তুমি কোনোদিন ঠিক সময় আসো? তুমি তো সব সময় দেরি করো—

নাঃ, এতো ঝগড়ার মতন হয়ে যাচ্ছে শুরু থেকেই। আজ রেণু এলে সে ঝগড়া করবে নাকি? এরকম ভাবে নয়।

রেণুর হাতে দু'খানা মোটা মোটা বই। বাদল জানে, আজ কলেজ বন্ধ। বাদল জিজ্ঞেস করলো, কি বই দেখি? আমার জন্য এনেছো?

—এ বই তোমার পড়া। লাইব্রেরির বই। মাকে বললাম কিনা, সাহিত্য পরিষদ

লাইব্রেরিতে যাচ্ছি।

—আজকাল বাড়ি থেকে বেরুবার সময় কিছু বলে বেরুতে হয় বুঝি!

—বাঃ, এই দুপুর রোদে বেরোলে মা জিজ্ঞেস করবে না? তাও তো মা আসতে দিচ্ছিল না। এত রোদে বেরুলে রং কালো হয়ে যায়!

এই কথা বলে রেণু হাসলো। তার উত্তরে বাদল দুম করে বললো, জানো, আজ আমি নিজে রান্না করে খেয়েছি।

—সত্যি? যা মিথ্যুক—

—বিশ্বাস করো। মা-রা তো দশটার সময় বেরিয়ে গেছেন—হোটেলে না খেয়ে আমি নিজেই রান্না করে খেলাম।

—কি কি রাঁধলে?

ধুৎ! রেণু আসতে না আসতেই সে রান্নার কথা বলবে নাকি? ভারি একটা কৃতিত্বের ব্যাপার যেন। এটা বড্ড বোকা বোকা হচ্ছে। রেণু যদি জিজ্ঞেস করে, তা হলে বলা যেতে পারে।

দরজার সামনে রেণু। হাতে বই নেই। রেণু বললো, আমার দেরি হয়ে গেছে বুঝি?

বাদল বললো, ভীষণ, ভীষণ দেরি করেছো। আমি ভাবছিলাম, তুমি আসবেই না।

—সত্যিই বোধহয় আসতে পারতাম না। সেজোকাকীমা চারটে সিনেমার টিকিট কেটেছিলেন, তার মধ্যে বেবীমাসীর মাথা ধরেছে বলে যেতে পারবেন না, তাই সেজো-কাকীমা বললেন আমাকে যেতে। আমি দেখলাম, দারুণ বিপদ। আমি তো মাথা ধরার কথা বলতে পারি না, কারণ একটু বাদেই বেরুবো। বললুম, ছবিটা আমার দেখা। তাও শোনে না—একবার দেখলে কি দু' বার দেখা যায় না? কবে আমি দেখলাম, এই সব। তোমার জন্য আমাকে মিথ্যে কথা বলতে হলো।

—আমার জন্য না হয় বললিই একদিন।

—আমি মিথ্যে কথা বলি না সবাই জানে। আমার কি রকম অস্বস্তি হয়।

—একদিন বললে কিছু ক্ষতি হয় না। তুই আজ না এলে আমি আজ ভীষণ রেগে যেতাম।

—আমি তোমার রাগকে বড্ড ভয় পাই। হঠাৎ আজ ডেকেছো কেন?

—আজ অনেকক্ষণ ধরে গল্প করবো। কতদিন তো ভালো করে গল্প করা হয়নি। তা ছাড়া আমার কয়েকটা দরকারী কথা আছে।

—মাসীমা নেই বাড়িতে?

—না, ওরা সাতটা আটটার আগে ফিরবে না। কাছাকাছি আর কেউ না থাকলে, বেশ একটা, বুঝলি না, বেশ সহজ ভাবে কথা বলা যায়।

হঠাৎ এরকম গল্প করবার ইচ্ছে হলো যে! আজকাল তুমি সব সময় কি রকম গম্ভীর গম্ভীর হয়ে থাকো—

—রেণু, আমার খুব মন খারাপ যাচ্ছে।

—কেন?

—সেই কথাই তো বলবো বলে তোকে ডেকেছি। তোকে ছাড়া আর তো কারুকে বলতে পারি না!

—আমি তোমার মন ভালো করে দিতে পারি?

—শুধু তুইই পারিস। তুই আমার চোখের দিকে তাকাবি, ম্যাজিশিয়ানের মতন ঐ

হাত তুলে—

—তুমি এই রকম একটা কবিতা লিখেছিলে না?

—চল, আমরা ওপরে গিয়ে বসি। চা খাবি? আমি চা তৈরি করে দিতে পারি।

—না, চা-টা খাবো না। তুমি আজকাল কবিতা-টবিতা লেখো না কেন?

—কি হবে লিখে? তা ছাড়া, তুই-ও তো আমার কবিতা লেখার প্রেরণা দিচ্ছিস না আজকাল।

—আমি আবার কি করে প্রেরণা দেবো? ধ্যাৎ!

—আমি তোর কাছাকাছি থাকতে চাই। আমার তো এখন আর কোন বন্ধু নেই—

দরজায় এবার সত্যিই শব্দ। বাদল তড়াক করে লাফিয়ে এসে দরজা খুলে দেখলো এবার সত্যিই রেণু। হাতে একখানা মাত্র বই, মোটা নয় সরু।

বাদল কোনো কথাই বললো না। রেণু ভেতরে ঢুকে বললো, এরকম অন্ধকার ঘরে বসে আছো কেন?

বাদল সে কথার কোনো উত্তর দিল না। কোনো কিছু চিন্তাও করলো না, দরজাটা বন্ধ করেই রেণুকে জড়িয়ে ধরলো দু' হাতে। রেণু বাধা দেবার আগেই তার ঠোঁটে ঠোঁট ডোবালো।

রেণু নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, একি?

একটু সরে গিয়ে রেণু দুঃখ ও অভিমান মিশ্রিত গলায় বললো, তুমি আমাকে এই জন্য ডেকেছিলে?

বাদল অপরাধীর মতন দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্ব সংসারের বিনিময়েও সে শপথ করে বলতে পারে যে, এক মিনিট আগেও সে এরকম কোনো কথা ভাবে নি। রেণুকে দেখার পরেই মুহূর্তেই কি যে ঘটে গেল!

কিন্তু অপরাধবোধ থেকে ক্ষমা চাইবার বদলে তার মেজাজ হঠাৎ চড়ে গেল। সে ভাবলো, আমি কি দোষ করেছি? রেণু তো আমার নিজস্ব। তাকে নিয়ে আমি যা খুশী করতে পারি।

মনোবল সুদৃঢ় করার জন্য সে ফস করে একটা সিগারেট ধরালো। বেশ কায়দা করে ধোঁয়া ছেড়ে সে বললো, কি হয়েছে কি?

রেণু বললো, তুমি জানো, আমি এসব পছন্দ করি না।

—আমার যা খুশী আমি তাই করবো।

—না।

দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ। মনে হয়, এক্ষুনি ওরা খুব ঝগড়া করবে। তখন বাদলের মনে পড়লো, রেণু আসবার আগে কত কি কল্পনা করেছিল সে।

বাদল হেসে ফেলে বললো, রেণু, তুই এ রকম কেন রে?

রেণু তবু গম্ভীর ভাবে বললো, আমি তো এই রকমই। তুমি খুব সিগারেট খেতে শুরু করেছো আজকাল। আমার মোটেই ভালো লাগে না।

বাদল রেণুকে আরও রাগাবার জন্য সিগারেট সুদ্ধু হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, তুই একটু খাবি? একবার টেনে দেখ না!

রেণু বাদলের হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল। তারপর একটা চেয়ারে বসলো অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে। হাতের বইটা খুলে বসলো। যেন, সে বাদলের সঙ্গে আর কথা বলতে

চায় না।

বাদল ভেতরে অত্যন্ত উত্তেজিত বোধ করছে। তার শরীরের মধ্যে এমন একটা চাঞ্চল্য এসেছে, যাতে সে নিজেও একটু বিস্মিত হয়। রেণু তার কতদিনের চেনা, তবু আজ তাকে দেখে সে কেন এমন ভাবে বদলে যাচ্ছে? ইদানীং রেণুকে দেখলেই তার হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুত হয়ে যায়। কেন? এ কি রেণুকে হারাবার ভয়ে? ঐ তো বসে আছে রেণু, এক শাশ্বত দৃশ্যের মতন বসে থাকা, সে কোথায় হারাবে?

সিগারেটটা শেষ করে বাদল রেণুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। রেণু মুখ তুললো না। বাদল নরম গলায় জিজ্ঞেস করলো, কি বই পড়ছিস?

রেণু গম্ভীর ভাবে বললো, বইটা তোমার জন্য এনেছিলাম।

—কি বই?

—'সাতটি তারার তিমির'। এ বইটা দেখেছো আগে? তুমি জীবনানন্দ দাসের নাম শুনেছ?

বাদল অবহেলার সঙ্গে বললো, কবিতার বই? ধুৎ! আমার আর ওসব পড়তে ভালো লাগে না।

এবার রেণু মুখ তুলে তাকালো। বাদলের মুখে সে খুঁজতে লাগলো কি যেন।

বাদল বইটা ছুঁয়েও দেখলো না, বললো, তুই কি বইটা কিনেছিস নাকি? হঠাৎ আমার জন্য পয়সা খরচ করতে গেলি কেন?

—গতকাল আমার জন্মদিন ছিল। তাই তোমার জন্য একটা কিছু...

—তোর জন্মদিন তো আমার জন্য উপহার কেনার কি মানে হয়? আমারই তো একটা কিছু...মানে, কাল তোর জন্মদিন ছিল আমাকে বলিস নি তো?

—আমি বুঝি এ কথা সবাইকে বলে বলে বেড়াবো?

—গত বছর তোর জন্মদিনে আমরা কি করেছিলাম যেন?

—ও কথা থাক্। আগে তুমি এত কবিতার বই ভালোবাসতে, আর এখন আমার বইটা তুমি নিলে না কেন?

—কি হবে কবিতা পড়ে! এসব কবিতা টবিতা তো বুর্জোয়াদের বিলাসিতা।

—তুমি আজকাল বড্ড বোকা বোকা কথা বলো।

বাদল আরও কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। যতবার সে ভাবছে রেণুর সঙ্গে ঝগড়া করবে না ততবারই একটা কিছু ঝগড়ার প্রসঙ্গে এসে যাচ্ছে।

এবার সে বইটা তুলে নিল। দ্বিতীয় সাদা পৃষ্ঠাতে রেণু তার সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখেছে, 'বাদলকে—আমি'। বাদল একটু হাসলো। রেণু এই কায়দাটা তার থেকেই নিয়েছে। সে আগে যতবার রেণুকে বই উপহার দিয়েছে, কোনোবার নিজের নাম লেখে নি। সব সময়ই লিখেছে, আমি।

বইটা উল্টে পাল্টে বাদল বললো, অনেকেই বলে, এঁর কবিতা বুঝতে পারা যায় না।

—আমিও বুঝতে পারি না সব। ভেবেছিলাম দু' জনে এক সঙ্গে পড়বো।

এই নির্জন বাড়িতে রেণুর সঙ্গে পাশাপাশি বসে কবিতা গ্রন্থ পাঠ—এই দৃশ্যটির মধ্যে যে রোমান্টিক আবেদন আছে, তা বাদলকে তৎক্ষণাৎ স্পর্শ করে। সে তো এই ধরনের ব্যাপারেই আনন্দ পায়, জীবনের অনেক বড় কৃতিত্বের চেয়ে এই রকম একটা ঘটনার মূল্য তার কাছে অনেক বেশী। তবু সে জোর করে এই দুর্বলতাটা সরিয়ে দেয় মন থেকে। একটু নির্লিপ্ত ভাবে বলে, কবিতা পড়ে জীবনটা কাটিয়ে দিতে

পারলে তো কথাই ছিল না। কিন্তু বাস্তবটা বড় কঠিন। তোর সঙ্গে অনেক দরকারি কথা আছে।

রেণুর কাঁধ ছুঁয়ে সে বললো, চল, আমরা ওপরে গিয়ে বসি।

রেণু উঠে দাঁড়ালো। তারপর টপ করে নিচু হয়ে প্রণাম করলো বাদলকে। বিস্মিত বাদল বাধা দেবারও সময় পেল না। রেণু লজ্জারুণ মুখে বললো, কাল আমার জন্মদিনে তোমাকে প্রণাম করতে এসেছিলাম, তুমি বাড়িতেই ছিলে না।

বাদলের আবার শরীরটা কাঁপছে। রেণু তাকে চুম্বকের মতন টানছে। ইচ্ছে করছে রেণুকে জড়িয়ে ধরে বুকের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে। কবিতা পাঠের মতন এ দুর্বলতাও সে দমন করলো।

সে বললো, আগে আমিও জন্মদিনে গুরুজনদের প্রণাম করতাম। এখন সূর্যদার দেখাদেখি আর কারুকে প্রণাম করি না।

—সূর্যদা এখন কোথায়?

—কি জানি! এলাহাবাদ না গোয়ালিয়ার কোথায় যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাত্তাই পাওয়া যায় না।

দু'জনে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো দোতলায়। শব্দহীন নির্জন বাড়ি। এরকম নির্জনতার মধ্যে রেণুর বয়েসী কোনো মেয়ে বাদলের বয়েসী কোনো ছেলের সঙ্গে স্বাভাবিক থাকতে পারে না। অথচ রেণুর কাছে কিছুই যেন অস্বাভাবিক নয়। এই রকম ফাঁকা বাড়িতে বাদলের সঙ্গে দেখা করতে আসাকেও সে যেমন বিসদৃশ মনে করে না, আবার বাদল এই নির্জনতার সুযোগ নিতে চাইলে প্রথমেই ভৎর্সনা করেছে।

দোতলার সিঁড়ির পাশেই সূর্যর ঘর। আজকাল সব সময় তালা বন্ধ থাকে।

রেণু জিজ্ঞেস করলো, মাসীমারা কোথায় গেছেন?

বাদল বললো বেলেঘাটায়। জানিস আজ আমি নিজে রান্না করেছি!

একটুও অবাক না হয়ে রেণু জিজ্ঞেস করলে, কি কি রাঁধলে?

রেণুর উৎসাহের অভাব দেখে বাদল একটু দমে গেল। বললো, ভাত, ডাল, বেগুন ভাজা, মাছ ভাজা—

—হাতটাত পোড়াও নি তো?

—কিচ্ছু না। রান্না করা তো খুব সহজ।

ডাল আর মাছ ভাজা—এই দুটো পদ কল্পিত। কেন যে বাদল এই সামান্য মিথ্যে কথাটুকু বলতে গেল রেণুকে তার কোনো যুক্তি নেই। এই দুটো জিনিসের জন্য তার কৃতিত্ব কি বাড়লো খুব? তবু, এক এক সময় এরকম ছোট্ট মিথ্যে কথা মুখে এসে যায়।

এই মিথ্যেটুকু বলবার জন্য বাদলের অনুতাপ হলো। কিন্তু এখন আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। সে যদি এখন হঠাৎ আবার বলে না রে, আজ ডাল আর মাছ ভাজা খাইনি, মিথ্যে কথা বলেছিলুম, তা হলে কি রকম শোনাবে?

তার বদলে বাদল অকস্মাৎ থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, রেণু, তুই কার?

রেণু বললো, হঠাৎ এ কথা কেন?

—না, আমি শুনতে চাই?

—তোমার।

—ঠিক?

—ঠিক।

—আমি যতই দোষ করি কিংবা অন্যায় করি, তোর সঙ্গে যদি আমার অনেকদিন দেখা নাও হয়, তবু তুই আমারই থাকবি তো?

—তোমার আজ কি হয়েছে বলো তো?

বাদল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, তোর সঙ্গে হয়তো আমার আর অনেক দিন দেখা হবে না।

—তার মানে?

—বলছি, একটু পরে বলছি।

বাদলের ঘরে এসে রেণু বসলো বাদলের পড়ার টেবিলের চেয়ারে। বাদল তার কাছেই টেবিলের ওপরেই উঠে বসে বললো, তোকে ডেকে এনেছি এই জন্য যে, অনেক দিন এরকমভাবে বসে কথা বলা হয় নি। তা ছাড়া, আর হয়তো বহুদিন তোর সঙ্গে দেখা হবে না। আমি চলে যাচ্ছি।

—কোথায় যাচ্ছো? চাকরি পেয়েছো কোথাও?

—না। চাকরি আমাকে কে দেবে?

—আমি জানি, তুমি চাকরির চেষ্টা করছো। সেই জন্যই এম এ পড়লে না।

—পড়লুম না নয়। পড়া হলো না। আমার একটা চাকরি এক্ষুনি পাওয়া দরকার। কিন্তু কোথাও কোনো চাকরি নেই। চারদিকে শুধু ছাঁটাই। যুদ্ধের সময় যে লাখ লাখ লোকের চাকরি হয়েছিল, এখন তাদের সব ছাঁটাই করা হচ্ছে। বিচ্ছিরি অবস্থা। সেদিন শুনলাম ইকনমিকসে এম এ পাশ এক ভদ্রলোক মাত্র তিরিশ টাকা মাইনের একটা চাকরি নিয়েছেন।

রেণু এ সব ব্যাপার ভালো বোঝে না। সে চুপ করে রইলো।

বাদল বললো, টিউশানি ফিউশানি করে কোনো রকমে চালাচ্ছিলাম। হঠাৎ গত মাসে একদিন মনে হলো, আমি হেরে যাচ্ছি। আমি কি এই রকম করে জীবন কাটাবো নাকি? এই রকম সামান্য হয়ে থাকবো? এ হতে পারে না। অনেক ভেবে একটা পথ খুঁজে পেয়েছি। আমার পক্ষে একমাত্র উপায় এখন বাইরে চলে যাওয়া। ওয়েস্ট জার্মানিতে এখন অনেক লোক নিচ্ছে। যুদ্ধের পর ওদের দেশে শক্ত সমর্থ পুরুষ তো খুব কমে গেছে, তাই গেলেই যেকোনো চাকরি পাওয়া যায়। আমি আর্টস না পড়ে সায়েন্স যদি পড়তাম, অনেক সুবিধে হতো—যাই হোক, আর কিছু না হোক, কুলি মজুরের কাজ অন্তত পাওয়া যাবেই একটা। তারপর আস্তে আস্তে...। আমার চেনাশোনা এরকম তিন চারজন গেছে। কোনো রকমে ভাড়ার টাকাটা জোগাড় করতে পারলেই হলো—জার্মানিতে আমাদের ইন্ডিয়ানদের ভিসা লাগে না—

—মাসীমা যেতে দেবেন তোমাকে?

—কিছুতেই না। এক ছেলে হওয়ার এই এক ঝামেলা। বিষ্ণুও ওর মায়ের এক ছেলে—কিন্তু বিষ্ণু বিলেতে পড়তে গেছে সব ব্যবস্থা ট্যাবস্থা করে—বাড়ি থেকে নিয়মিত টাকা পাঠানো হয়। আমার মতন শূন্যে ঝাঁপিয়ে তো পড়ে নি।

—মাসীমা আপত্তি করলেও কি করে যাবে তুমি?

—কিছু বলি নি এখন পর্যন্ত। সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাক, তারপর যতই আপত্তি করুক, আমি যাবোই। আমার ইচ্ছে আছে জার্মানি থেকে একদিন রাশিয়া চলে যাওয়ার। রাশিয়া দেখতেই হবে আমাকে। রাশিয়া আমার স্বপ্নের দেশ—সেখানে সব মানুষ সমান, পৃথিবীর ইতিহাসে যা কখনো হয়নি।

রেণু নত মুখে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কতদিনের জন্য যাবে ভাবছো?

উৎসাহের ঝোঁকে বাদল বললো, চার বছর, পাঁচ বছর, ছ' বছর—

—এরকম তো অনেকেই বিদেশে যায়। তারা সবাই কি জিতে যাওয়া মানুষ?

—তা জানি না। এখানে আমি এরকম ভাবে পড়ে থাকতে পারবো না।

—মাসীমা মেসোমশাইকে দেখবার কেউ নেই। ওঁরা এতদিন তোমাকে ছেড়ে কি করে থাকবেন?

—আমি যদি কালকেই হঠাৎ গাড়ি চাপা পড়ে মরে যাই, তা হলে কি হবে? সব কিছুই সহ্য হয়ে যায়। এত পিছুটান থাকলে জীবনে কিছু করা যায় না। তা ছাড়া, আমি তো টাকা পাঠাবো।

রেণু বললো, আমরা একবার একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মনে আছে! সেই প্রথম স্বাধীনতার দিনে? তুমি, আমাকে যা বলবে আমি শুনবো। আমি যা বলবো, তোমাকে শুনতে হবে। আমি যদি—

বাদল রেণুর কাঁধ চেপে ধরে ব্যাকুলভাবে বললো, না, রেণু না, তুই কিছুতেই আপত্তি করতে পারবি না! প্লিজ...

এ কথার মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই যে বাদল তার বাবা মায়ের ঘোর অমত সত্ত্বেও বিদেশে চলে যেতে পারে কিন্তু রেণু একবার না বললেই সে অসহায় হয়ে পড়বে। এখন তার কাছে রেণুর মতামতের দামই সবচেয়ে বেশী। জন্মের পর মায়ের নাড়ির সঙ্গে সন্তানের নাড়ির যে যোগ থাকে, তা কেটে ফেলা হয়। সন্তান যৌবনে পৌঁছলে অদৃশ্য নাড়ির যোগটাও ছিন্ন হয়ে যায়।

সে তখন মা-বাবাকে ধরে নেয় রোদ বৃষ্টি বা শীত—এই রকম কয়েকটি প্রাকৃতিক ঘটনার মতন—রক্তের তেজে যা সে যখন তখন অবজ্ঞা করতে পারে। সে জানে, তার রোদ্দুরে ঘোরাঘুরি, বৃষ্টিভেজা কিংবা শীতের মাঠেও বোতাম খোলা সার্ট পরা মা-বাবা পছন্দ করেন না—অথচ এইগুলোই তার ভালো লাগে। সুতরাং বাবা মায়ের অন্য সব কথাও অগ্রহনীয়। যেমন, মাঝে মাঝেই, তার ইচ্ছে করে আত্মহত্যা করতে, হঠাৎ এই পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হবার মোহময় চিন্তা তাকে পেয়ে বসে—সত্যি সত্যি আত্মহত্যা না করলেও এই চিন্তাটার যে সুখ, সে কথা কি বাবা কিংবা মাকে কখনো জানাতে পারবে?

রেণুর কথা আলাদা। রেণু কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা নয়। রেণুকে সে একটু একটু করে সৃষ্টি করছে—আবার তার বাইরেও রেণুর যে রহস্যময় অস্তিত্ব, তাকে আয়ত্ত করতেই হবে। এটা একটা চ্যালেঞ্জ। মৃত্যু কিংবা বেঁচে থাকার চেয়ে বাদল এখন এটাকে বড় মনে করে।

রেণু জিজ্ঞেস করলো, তুমি বিদেশে যাবার ব্যাপারটা একেবারে ঠিক করে ফেলেছো?

বাদল বললো, হ্যাঁ।

রেণু বললো, আমাকেও নিয়ে চলো।

—তুই সত্যি যাবি? যেতে পারবি?

—কেন পারবো না?

—বাড়ির সবাইকে ছেড়ে থাকতে পারবি? তোদের বাড়িতে যে কেউ তোকে যেতে দেবে না—এ তো জানাই কথা।

—যদি বি এ-টা পাস করে নিই, তারপর পড়তে যেতেও পারি। লণ্ডনে ছোড়দার

কাছে থাকবো।

—বি এ পাসের তো এখনো অনেক দেরি।

—তুমি আর দু' বছর অপেক্ষা করতে পারবে না?

—না। তা ছাড়া আমি লণ্ডনে যাবো না, আমি যাবো জার্মানিতে। ওখানে এখন অনেক চাকরি।

—জার্মানির তো এখন কিছুই নেই। সব ভেঙেচুরে গেছে।

—সেই জন্যই তো অনেক কাজের লোক দরকার। রেণু, তোকে বেশ একটা ছেলে সাজিয়ে, প্যাণ্ট সার্ট পরিয়ে, মাথায় পাগড়ি বেঁধে আমার সঙ্গে নিয়ে গেলে হতো!

—কেন, মেয়েদের বুঝি যেতে দেবে না?

—জার্মানিতে এখন মেয়েই বেশী। ওরা এখন—

হঠাৎ থেমে গিয়েই বাদল প্রসঙ্গ বদলালো। বললো, এখনো জরুরি কথাটাই কিছু বলা হয় নি। আমি যে এতগুলো বছর থাকবো না, তুই কি আমার জন্য অপেক্ষা করবি?

রেণু একটু অবাক হয়ে বললো, অপেক্ষা মানে?

—তোদের বাড়ি যা কনজারভেটিভ, এই চার পাঁচ বছরের মধ্যে নিশ্চয়ই তোর বিয়ে দিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। তা হলে কি হবে?

রেণু ভ্রূকুটি করে বললো, কি সব আজে বাজে কথা!

—আজে বাজে নয়। এইটাই কাজের কথা। তোদের বাড়িতে তো সবারই খুব কম বয়েসে বিয়ে হয়ে যায়।

—জোর করে কারুর বিয়ে হয় না।

—ছেলেদের হয় না, মেয়েদের হয়।

—তুমি আজকে বড্ড ছেলে ছেলে মেয়ে মেয়ে হিসেবে কথা বলছো। জার্মানি যাবার চিন্তাতেই এরকম হয়েছে বুঝি?

—রেণু, আমরা আর ছেলেমানুষ নই। আমরা একটা ব্যাপার জোর করে অস্বীকার করার চেষ্টা করছি। তোকে আর আমাকে এরকম ভাবে আর বেশীদিন মেলামেশা করতে দেওয়া হবে না। আমাদের বাড়ি থেকে না হলেও তোদের বাড়ি থেকে বাধা দেবেই।

রেণু এসব ব্যাপার সত্যিই যেন বোঝে না। তার সারল্য তার চরিত্রে একটা বিশুদ্ধ তেজ দিয়েছে। সে বললো, মেলামেশা কে করতে দেবে না? আমাদের ইচ্ছে আমরা দেখা করবো। আমি এ বাড়িতে এলে মাসীমা কি আপত্তি করবেন?

—কি জানি, করতেও পারেন একদিন। সবকিছুই তো দেখছি অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। একটা ছেলে ও মেয়ের সাধারণভাবে মেলামেশা করার ব্যাপারটা কেউ মেনে নিতে পারে না সহজভাবে। বিয়ে ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক নেই। আজ থেকে কুড়ি কি তিরিশ বছর বাদে হয়তো এই ব্যাপারটা স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিংবা আমরা যদি অন্য কোনো দেশে জন্মাতাম—

রেণু বললো, আমার এই দেশই ভালো লাগে।

বাদল রেগে গিয়ে বললো, এটা একটা পচা গলা দেশ। এ দেশের কিস্যু হবে না। ভেবেছিলাম, স্বাধীনতার পর সব কিছু বদলে যাবে। দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে। সারা দেশ জুড়ে হতাশা—

—জার্মানি যাচ্ছো তো, তাই এ দেশ আর পছন্দ হচ্ছে না।

—শুধু সে জন্য নয়। আমার মতন ছেলের কোনো সুযোগ আছে এখানে? বি এ-তে অনার্স পেয়েছি, তবু এম এ পড়তে পারলুম না। একটা কোনো চাকরি করা দরকার, কোনো চাকরি নেই। আমি যে-কোনো কাজ করতে চাই, কেউ কাজ দেবে না। দিন দিন লক্ষ লক্ষ বেকার বাড়ছে—তাদের কাজে লাগাবার কথা কেউ ভাবছে না। পণ্ডিত নেহরু এখন বিশ্বশান্তির ওপর বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন!

বাদল উত্তেজিত হয়ে গেছে দেখে রেণু চুপ করে বসে রইলো। দর্শকের বা শ্রোতার প্রতিক্রিয়া ঠিক মতন বোঝা না গেলে বক্তৃতা জমে না। বাদল একটু বাদেই তাই চুপ করে গেল।

বিক্ষুব্ধভাবে আবার বললো, বিয়ে করলেই যদি লোকে শান্তি পায়, তাহলে আমি তোকে বিয়ে করতেও রাজি। কিন্তু বিয়ে করার যোগ্যতাও নেই আমার। যার চাকরি বাকরি নেই, সে আবার বিয়ে করবে কি? সাধ করে কি আমি দেশ ছেড়ে যাচ্ছি। দেখছি তো, কত অর্ডিনারি ছেলে দু' এক বছর একটু বিলেতে ঘুরে গায়ে পালিশ লাগিয়ে আসছে, অমনি লোকে তাদের সম্পর্কে একেবারে গদগদ। আমিও জার্মানি থেকে এক গাদা টাকা নিয়ে ফিরবো।

—জার্মানিতে বুঝি টাকার ছড়াছড়ি যাচ্ছে?

—যে খাটতে পারে, তার সুযোগ আছে। ওখান থেকে রাশিয়ায় যাবো—যদি থাকতে দেয়, তাহলে রাশিয়াতেই থাকবো। মাঝখানে একবার দেশে ফিরে তোকে নিয়ে যাবো জোর করে। জোর করতেই হবে, কারণ এমনিতে তোর সঙ্গে আমার বিয়েতে রাজি হবে না কেউ। আমার মা যে তোকে এত ভালোবাসেন, আমার মা-ও আপত্তি করবেন দেখিস! তোরা যে কায়স্থ!

রেণু খিলখিল করে হেসে উঠে বললো, তুমি এমনভাবে কায়স্থ কথাটা উচ্চারণ করলে, যেন এর চেয়ে নীচু জাত আর নেই!

বামুনরা তো অন্য কারুকেই গ্রাহ্য করে না। আমি যদি তোকে কেড়ে নিতে চাই, তবে অবশ্য আটকাবার সাধ্য কারুর নেই। দরকার হলে এ বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় থাকবো। কিন্তু তার আগে একটা কিছু যোগ্যতা অর্জন করতে হবে আমাকে।

রেণুর ঠোঁটে হাসির রেখা লেগে রয়েছে তখনো। সে বললো, সেই যোগ্যতা বুঝি শুধু জার্মানিতে গিয়েই অর্জন করা যায়। আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি একদিন খুব বড় লেখক হবে। সবাই তোমার নাম জানবে। তোমার লেখা পড়ে অনেকে কাঁদবে। সেটাও কি একটা যোগ্যতা নয়?

বাদল একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপর বললো, রেণু তুই আমাকে লেখার কথা আর বলিস না। ওটা আমার একটা দুর্বল জায়গা।

—তুমি লেখা কেন ছেড়ে দিয়েছো, বল তো? আজ তোমাকে বলতেই হবে?

—আমি লিখতে জানি না।

—আমার তো ভালো লাগতো!

—তুই বললেই তো হবে না! আমি মানুষের সাম্যে বিশ্বাস করি। সেই বিশ্বাস নিয়ে পার্টির কাজও করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা সবাই আমাকে বললো, আমার লেখাগুলো প্রতিক্রিয়াশীল। তখন আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম। আমি নিজে প্রতিক্রিয়াশীল নই, তা হলে আমার লেখা কি করে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যায়? আমি তাহলে কি লিখবো? শুধু শ্লোগান? আবার ওরা বলে, বিষ্ণু দে খুব প্রগতিশীল লেখক—অথচ তাঁর কবিতা পড়ে আমি সব মানে বুঝতে পারি না। আমার মাথা

গুলিয়ে যায় এসব ভাবতে গিয়ে। তার থেকে লেখা ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

—তুমি অন্যদের কথা শুনে লিখবে কেন? তোমার নিজের কোনো ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই?

—আমার ইচ্ছে করে শুধু তোকে নিয়ে লিখতে। কিন্তু তুই তো শুধু একটা মেয়ে, তুই একটা জ্যান্ত প্রতিক্রিয়াশীল। পৃথিবীতে তার কোনো মূল্যই নেই এখন। পৃথিবীতে মানুষের এখন অনেক কাজ। শুধু আমিই কোনো কাজ খুঁজে পাচ্ছি না।

—তাহলে একমাত্র জার্মানিতে যাওয়াই তোমার মুক্তির উপায়।

—তাই তো দেখছি।

—তা হলে ঘুরে এসো।

—তুই আমার জন্য অপেক্ষা করবি তো?

—তুমি ঠিক সময়ে ফিরে এসো।

—তুই যদি এর মধ্যেই আমাকে হঠাৎ ডেকে পাঠাস, তা হলে আমি যে-কোনো উপায়েই হোক চলে আসবো। অবশ্য যাওয়ার ব্যাপারে অনেক বাধা আছে এখনো। পাশপোর্ট দেবার আগে পুলিশের ভেরিফিকেশন লাগে। খুব কড়াকড়ি শুনেছি। আমি কিছুদিন পার্টির কাজ করেছি, সেই জন্য আমাকে নাও দিতে পারে। তারপর আছে ভাড়া জোগাড় করার চিন্তা। বাবা মায়ের কাছ থেকে কিছু নেবো না!

—কত টাকা লাগবে?

—জাহাজ ভাড়া চোদ্দোশো—সব মিলিয়ে হাজার দুয়েক জোগাড় করতেই হবে। সূর্যদা থাকলে ধার চেয়ে নিতাম। সূর্যদা তো বড়বাবুর সব টাকা ফুঁকে দিচ্ছে।

দু' হাজার টাকা জোগাড় করা খুব শক্ত বুঝি?

বাদল এবার হেসে বললো, তুই একদম ছেলেমানুষ রেণু। দু' হাজার টাকার দাম ঠিক দু' হাজার টাকা। তোকে বললাম না, লোকে আজকাল তিরিশ চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরির জন্য হন্যে হয়ে যাচ্ছে! তা হলে দু' হাজার টাকা কত হয়?

রেণু বললো, আমারই তো পোস্ট অফিসে তিন হাজার টাকা আছে। বাবা রেখে গিয়েছিলেন আমার নামে। একটা সই করলেই তো সেই টাকা তোলা যায়।

বাদল গম্ভীর হয়ে গেল। বললো, তুই আমার এই বাইরে যাওয়ার ব্যাপারটা এখন কারুকে বলিস না। বিষ্ণুকেও কিছু লেখার দরকার নেই।

রেণু বললো, তোমাকে ঐ টাকার জন্য আর কোথাও ঘোরাঘুরি করতে হবে না। টাকাটা আমি তুলে দেবো পোস্ট অফিস থেকে। একদিন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেও।

—তোর টাকা আমি নেবো না।

—কেন?

—ও কথা থাক। এখন অন্য কথা বল্!

রেণু উঠে বাদলের সামনে এসে দাঁড়ালো। ক্রুদ্ধ চোখে বললো, তুমি যদি আমার টাকা না নাও, তাহলে জীবনে আমি তোমার মুখ আর দেখবো না।

বাদল বললো, রেণু, এরকম ছেলেমানুষী করিস না। টাকা জোগাড় করার চেষ্টা আমি করবো, খুব সম্ভবত পেয়েও যাবো। তোর কাছ থেকে টাকা নিতে আমি পারি না।

রেণু বললো, কেন পারো না। সেটাই আমি জানতে চাই।

বাদল একটু অসহায়ভাবে হাত নাড়তে লাগলো। ঠিক যুক্তিটা তার মনে আসছে না। তারপর বললো, এটা হয় না। এটা ঠিক মানায় না! আমি তোর কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিদেশে যাবো, এটা কি সম্ভব?

রেণু বললো, আমার যদি টাকার খুব দরকার হতো কখনো, আমি তো তোমার কাছেই চাইতাম। আর কার কাছে চাইবো?

—সেটা আলাদা ব্যাপার।

—আমি এই আলাদা ব্যাপারটাই বুঝতে পারি না। আমার কাছে টাকা থাকলেও তুমি নেবে না, আর অন্য লোকজনের কাছ থেকে অনুগ্রহ চাইবে—এর মানে কি?

বাদল বললো, আচ্ছা ঠিক আছে। অন্য কোথাও না পেলে তোর কাছ থেকেই নেবো।

রেণু এতেও খুশি নয়। সে কঠিন মুখ করে বললো, না, ওসব চলবে না। তুমি অন্য কারুর কাছে চাইতেই পারবে না।

—তুই এত জোর করছিস কেন?

—কারুর কাছে টাকা চাইবার পর সে যদি না দেয়, তা হলে অপমান লাগে না? আমি চাই না, কেউ তোমাকে সেরকম অপমান করুক।

—তুই যেন আমাকে জার্মানিতে পাঠাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস?

—বাঃ, নিজেই তো এতক্ষণ ধরে বলছিলে এই সব কথা। বিদেশে না গেলে নাকি তোমার জয় হবে না!

—যেতে আমাকে হবে ঠিকই। আমি যে চার পাঁচ বছর বাইরে থাকবো, তাতে তোর মন খারাপ লাগবে না তো?

রেণু ভুরু কুচকে বললো, না, মন খারাপ লাগবে কেন?

রেণু খুব চাপা মেয়ে, তার মনের ভাব বাদলও সব সময় বুঝতে পারে না।

বাদলের মনে হলো, যেন তার বিদেশে যাওয়া সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এক্ষুনি সেই বিচ্ছেদের মুহূর্ত। আসলে তার যাওয়ার ব্যাপারে এখনো কিছুই ঠিক নেই। তবু, সে বিচ্ছেদের নাটকীয় মুহূর্তটিকে মনে মনে কল্পনা করে ফেলে।

মাদ্রাজ গিয়ে তাকে জাহাজ ধরতে হবে। সুতরাং ট্রেনে চেপে যাবে মাদ্রাজে। হাওড়া স্টেশনে কি রেণু যাবে তাকে বিদায় দিতে? বোধ হয় পারবে না। তা হলে, রেণুর সঙ্গে বাদলের শেষ দেখা কোথায় হবে? রেণুর বাড়িতে তো বাদল আর যাবে না কখনো। এই বাড়িতেই, নাকি কোনো পার্কে বা রেস্তোঁরায়?

এইরকম ভাবতে ভাবতে বাদল রেণুর কাঁধে দু'হাত রাখলো। আবেগ কম্পিত গলায় বললো, রেণু, তোর কথা সব সময় আমার মনে থাকবে। যদি প্রতি সপ্তাহে তোর চিঠি না পাই—

রেণু হেসে ফেললো। তারপর বললো, তুমি একটা পাগল!

মেয়েদের এই সব সময়কার হাসি ছেলেদের হতবুদ্ধি করে দেয়। বাদল ঘাবড়ে গেল। সে বুঝতে পারলো, রেণুর সামনে সে পুরুষোচিত সপ্রতিভ হতে পারছে না।

তখন সে সবচেয়ে সহজ পুরুষোচিত কাজটি করে ফেললো। সে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো রেণুকে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, রেণু এবার বাধা দিল না। বাদলের বুকে মুখ রেখে চুপি চুপি বললো, আমার কথা একদম চিন্তা করতে হবে না তোমাকে। শুধু শুধু চিন্তা করে নিজের কাজ নষ্ট করো না!

এবারেও বাদল একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে ফেললো। সে বললো, রেণু, আমি তোকে ভালোবাসি। দারুণ ভালোবাসি।

রেণু খুব সংক্ষিপ্তভাবে বললো, জানি।

তারপর সে আঙুল দিয়ে বাদলের বুকে দাগ কাটতে লাগলো। হিজিবিজি রেখা অথবা কোনো অক্ষর।

বাদল রেণুর ঐ 'জানি' কথাটাই শুধু শুনলো, আঙুলের রেখার ভাষা বুঝলো না।

রেণুর এত শান্ত ব্যবহার ঠিক পছন্দ করতে পারলো না সে। নিভৃত গোপন জীবনে একটু নাটকীয়তার দিকে তার ঝোঁক।

সে আবার হঠাৎ কাঁপানো গলায় বললো, রেণু, তোর কাছে একটা জিনিস চাইবো, দিবি?

—কি বলো?

—না বলতে পারবি না কিন্তু?

—আচ্ছা দেবো। কি?

—আমাকে একটু আদর করতে দিবি! আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে। আমি এটাকে স্মৃতি হিসেবে নিয়ে যাবো।

রেণু এবার রীতিমতন কাবু হয়ে পড়লো। এতক্ষণ সে কথায় বার্তায় বাদলকে মাথা তুলতে দেয়নি। কিন্তু এই একটা ব্যাপারে সে অসহায়। আগে থেকেই হ্যাঁ বলে ফেলেছে।

খুব অস্ফুট গলায় বললো, এসব কি ভালো?

—এতে কিছু দোষ নেই। তুই তো আমারই।

—তবু আমার মনে হয়, সবাইকে লুকিয়ে চুরিয়ে এটা যেন একটা পাপ।

বাদলের গলায় এবার দৃঢ়তা এসেছে। সে জোর দিয়ে বললো, না, পাপ নয়।

রেণু মুখ না তুলেই বললো, আচ্ছা, একবার!

বাদল আঙুল দিয়ে রেণুর থুতনিটা উঁচু করে তুলে ধরলো। চোখে রাখলো চোখ। দেখলো ঝরনার জলের মতন স্বচ্ছ মুখখানি, খুব যত্নের সঙ্গে সে চুমু খেল রেণুকে। জোরজারি বা ছটফটানি নেই, খুব শান্ত ভাব। শারীরিক বাসনা নয়, সে যেন শিল্প সম্ভোগ করছে। তার নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। রেণু লজ্জায় বাদলের দিকে তাকাতে পারছে না, ফিরিয়ে নিল মুখ।

বাদল উৎসুকভাবে জিজ্ঞেস করলো, তোর ভালো লাগে নি?

রেণু মুখ অন্যদিকে রেখেই বললো, জানি না।

বাদল দু'হাতে রেণুর মুখখানা নিজের দিকে নিয়ে এলো আবার। রেণুর ঠোঁটের ওপর রাখলো নিজের একটা আঙুল।

রেণু বললো, আর নয়।

বাদল হুকুমের সুরে বললো, আর একবার।

—তুমি কথা রাখছো না। দেখো বৃষ্টি এসে গেছে। জানলা দিয়ে জল আসছে।

—আসুক!

বাদল আবার তার ঠোঁট রাখলো রেণুর ঠোঁটে। রেণু চুম্বনের মর্ম বোঝে না। সে শুধু দেখছে বাদলের চোখ, যা এখন অসম্ভব জ্বলজ্বলে। বাদল রেণুর নিচের ঠোঁট, যাকে অধর বলে, নিয়ে নিল নিজের মুখের মধ্যে এবং সে অনুভব করলো, রেণু

সত্যিই আমার।

এবার মুখ সরিয়ে নিয়ে রেণু বললো, আমার গায়ের মধ্যে যেন কিরকম করছে। আমার সত্যিই দুর্বল লাগছে শরীরটা।

বাদল অভিজ্ঞের মতন বললো, ও কিছু না। ওরকম হয়।

রেণু বললো, ভীষণ জোরে বৃষ্টি আসছে। কি করে বাড়ি যাবো?

—একটু পরেই থেমে যাবে।

বাইরে শোনা যায় ঝড়ের শনশন আওয়াজ। জানলার পাল্লাটা ঠকাস ঠকাস শব্দে দেওয়ালে আছড়ে পড়ছে। রেণুর গলা জড়িয়ে ধরে তাকে সঙ্গে নিয়েই বাদল চলে এলো জানলার কাছে। দুজনেই চোখ রাখলো বাইরের রুদ্ধ বন্য ঝড়-বৃষ্টির দিকে।

রেণু বললো, আমি তোমার কথা যখন ভাবি, এই সব কথা কিন্তু কখনো ভাবি না। এই সব ছাড়াও কি আমরা খুব কাছাকাছি থাকতে পারি না?

বাদল বললো, আমি ওসব জানি না। তুই সুন্দর, তাই আমি তোকে ছুঁয়ে থাকতে চাই। কলেজে পড়ার সময় আমার বন্ধুরা মেয়েদের সম্পর্কে কত রকম কথা বলতো। আমার শুধু মনে পড়তো তোর কথা।

রেণু বাদলের বুকে আঙুল দিয়ে আবার কিছু আঁকিবুকি বা লিখতে লাগলো।

বাদল বললো, রেণু, তোর গালে আমি একটা দাগ করে দেবো?

রেণু লজ্জিতভাবে বললো, অন্যরা দেখে যখন জিজ্ঞেস করবে, কি বলবো?

—বলবি কোনো পোকায় কামড়ে দিয়েছে।

—তুমি বুঝি পোকা?

—আচ্ছা, এমন জায়গায় দাগ করে দিচ্ছি, কেউ দেখতে পাবে না।

রেণু কিছু বলছে না। বাধা দিচ্ছে না, দেখছে বাদলকে। বাদল রেণুর ডান হাতে, কাঁধের কাছটায় ব্লাউজটা সরিয়ে দাঁত দিয়ে আলতো ভাবে কামড়ে ধরলো। বাদলের চুলসুদ্ধু মাথাটা রেণুর গালের কাছে। রেণু অন্য হাতটা রাখলো বাদলের চুলে। মনে মনে সে-ও ভাবলো, এই মানুষটা আমার।

এই উপলব্ধি তার শরীরে একটা শিহরণ এনে দেয়। মনে হয়, এই পৃথিবীটা এই মুহূর্তে শুধু ওদের দুজনের জন্য। আর কেউ নেই কোথাও। পৃথিবীর বুকে যেন একটা কাঁটা ফুটে ছিল, এইমাত্র সেই কাঁটাটা কেউ তুলে নিল।

রেণু নিজেই বাদলের মাথাটা টেনে এনে চেপে ধরলো নিজের বুকে। খুব জোরে। তারপরেই সরিয়ে দিল।

বাদল কোনোদিন রেণুর হাতের আদর পায়নি। কাঙালের মতন চোখ করে তাকালো। তারপর বললো, আমি অনেকক্ষণ তোর বুকে মাথা রাখতে চাই।

রেণু সরে গিয়ে ব্লাউজের হাতাটা টেনে ঠিক করলো। তারপর বললো, না। আর কোনোদিন এরকম করো না।

—কেন?

—আমাদের পবিত্র থাকতে হবে।

—আজকেই নিজেকে সবচেয়ে বেশি পবিত্র মনে হচ্ছে আমার।

—যেদিন আমারও সেই রকম মনে হবে, সেইদিন আবার, কেমন!

বাদল আর কিছু বলতে সাহস পেল না। বৃষ্টির ছাঁট এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে রেণুকে। বাদল জিজ্ঞেস করলো, জানলা বন্ধ করে দেবো?

—না থাক। বৃষ্টি দেখতে ভালো লাগছে।

বাদল সিগারেট ধরিয়ে রেণুর পাশে দাঁড়িয়ে রইলো। জলের ঝাপটায় দুজনেরই জামা কাপড় ভিজে যাচ্ছে, তবু খেয়াল নেই।

॥ ৭১ ॥

সূর্য অনেকটা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে উত্তর ও মধ্যভারতে। তার সাত আট বছরকার পলাতক জীবনের সঙ্গে এই ভ্রমণের অনেক তফাত। এখন তার পকেট ভর্তি টাকা। এবং টাকা পয়সা খরচ করে অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে।

বড়বাবু মৃত্যুর আগে তাকে বারবার গোয়ালিয়ার যেতে বলেছিলেন। কিন্তু সূর্য পথে থামতে থামতে যাচ্ছে। প্রথমে সে নামলো কাশীতে, সেখানে একটি লোককেও চেনে না। হোটেলে থাকে, পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে। সারাদিনে কথা বলে খুব সামান্য। কয়েক দিন বাদে চলে এলো এলাহাবাদ।

যে-কোনো কারণেই হোক, কাশীর তুলনায় এলাহাবাদ তার বেশী পছন্দ হয়ে গেল। এমনকি, এ কথাও তার মনে হলো একবার, আর সে কখনো পশ্চিম বাংলায় ফিরবে না, এই শহরেই থেকে যাবে।

এলাহাবাদ শহরেও কেউ তার চেনাশুনো নেই। কিন্তু একদিন সে হাইকোর্টের সামনে একটা দোকানে বসে চা খাচ্ছে, এমন সময় অন্য টেবিলে তর্কে মত্ত দুজন লোকের মধ্যে একজনের গলার আওয়াজ শুনে সে আকৃষ্ট বোধ করলো। একটু ভাঙা ভাঙা কণ্ঠস্বর এবং ছ-গুলোকে স-এর মতন উচ্চারণ করা, অর্থাৎ গিয়েসেন, করেসেন ইত্যাদি। এই কণ্ঠস্বরটি তার চেনা।

সূর্য ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালো। যে ব্যক্তিটির কণ্ঠস্বর সূর্যের চেনা মনে হচ্ছে, তিনি সূর্যর দিকে পেছন ফিরে বসে আছেন। ধুতি ও খদ্দরের পাঞ্জাবি পরা, মধ্য বয়স্ক। সূর্যর তবু মনে হল লোকটির নাম বরদাপ্রসন্ন। মেদিনীপুর জেলে এক সময় সূর্যর সঙ্গে মাস ছয়েক ছিলেন।

সূর্যর কোনো আত্মীয়স্বজন নেই, কারুর খোঁজও সে রাখতে চায় না। কিন্তু যাদের সঙ্গে জেলে কয়েকটা মাস পাশাপাশি কাটিয়েছে, তাদের সঙ্গে এক সময় যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা আত্মীয়তার চেয়েও বেশী। তাদের দেখলেই এখন সব-চেয়ে আপনজন বলে মনে হয়। বরদাপ্রসন্ন যদিও গান্ধীবাদী কংগ্রেসী ছিলেন সে সময়, জেলখানাতেও থাকতেন আলাদা ব্যারাকে, তবু আলাপ পরিচয় ছিল যথেষ্ট।

সূর্য টেবিল ছেড়ে বরদাপ্রসন্নর সঙ্গে দেখা করতে গেল না। আর এক কাপ চা নিয়ে বসে রইলো। ওদের তর্কাতর্কি শুনতে পাচ্ছে। বলাই বাহুল্য, বরদাপ্রসন্ন রাজ-নীতির আলোচনাতেই উত্তেজিত। রাজনীতিতে যারা একবার ঢোকে, তারা সারা জীবনে আর কিছুতেই বেরুতে পারে না। বরদাপ্রসন্ন চুটিয়ে নিন্দে করছেন পণ্ডিত নেহরুর। মনে হয়, তিনি প্যাটেল নীতির সমর্থক। কিংবা ভাবখানা এই, বরদাপ্রসন্নকেই যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রিত্ব দেওয়া হতো, তা হলে উনি চোখের নিমেষেই সব সমস্যার সমাধান করে দিতেন।

খানিকটা পরে বরদাপ্রসন্ন উঠে পড়লেন। সূর্যর টেবিলের পাশ দিয়েই তিনি বেরিয়ে পড়লেন কথা বলতে বলতে। সূর্য নিজে থেকেই বরদা-দা বলে একবার ডাকতে যাচ্ছিল, কিন্তু সামলে নিল। তার মনের মধ্যে একটা দোলাচল চলছে। অচেনা শহরে একাকিত্ব

বড় মর্মান্তিক। সে চায় কারুর সঙ্গে একটু কথা বলতে, কেউ তার নাম ধরে ডাকবে, হাত চেপে ধরে বলবে, আরে, তুমি?—অমনি এখানকার বাতাস কত হালকা হয়ে যাবে। কিন্তু সূর্য রাজনীতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে চায় না। সে চায় তার অতীতকে একেবারে মুছে ফেলতে।

সূর্যও বেরিয়ে এলো চায়ের দোকান থেকে। বরদাপ্রসন্ন তখনও একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গীর সঙ্গে তর্কে মেতে আছেন। ঘন ঘন নস্যি দিচ্ছেন নাকে। সূর্যর মনে পড়লো, জেলে থাকার সময় বরদাপ্রসন্ন নস্যির অভাবে কি রকম আকুলি বিকুলি করতেন। মেটকে একখানা আস্ত পাঁউরুটি দিয়ে তার বদলে কখনো কখনো পেতেন এক পয়সার এ-জে 'র' নস্যি।

সূর্যর মুখে এক মাসের দাড়ি। বরদাপ্রসন্ন হঠাৎ দেখলে সূর্যকে চিনতে পারবেন না হয়তো। সূর্য তবু সে জায়গা ছেড়ে নড়লো না। তৃষ্ণার্তভাবে তাকিয়ে রইলো এই শহরে তার একমাত্র চেনা মানুষটির দিকে।

একটু বাদে বরদাপ্রসন্ন যখন হাঁটতে শুরু করলেন, সূর্যও যেতে লাগলো তাঁর পেছনে পেছনে। এই অনুসরণের কোনো অর্থ নেই। সূর্য যেন চুম্বক আকৃষ্ট হয়ে হাঁটছে। তা ছাড়া, কিছু তো করার নেই তার।

অল্প দূরেই একটা ইলেকট্রিকের সরঞ্জামের দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়লেন বরদাপ্রসন্ন। সূর্য কাঁচের শো-উইণ্ডোর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। দেখে বুঝলো, বরদাপ্রসন্ন এ দোকানের মালিক নন। কেননা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে তিনি মালিক-চেহারার একটি লোককে বললেন, এক কাপ চা খাওয়াও হে সতীশ।

সূর্য বুঝতে পারলো, বরদাপ্রসন্নও এখন বেকার। ঘুরে ঘুরে আড্ডা দেওয়া ও চা খাওয়াই তাঁর কাজ। সূর্যকে দেখতে পেলে তিনি হাতে চাঁদ পাবেন। মেতে উঠবেন পুরোনো দিনের গল্পে, জেলখানার সতীর্থরা এখন কে কোথায় আছে সেই বৃত্তান্তে।

সূর্য আরও একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে, তবু বরদাপ্রসন্নকে ডাকলো না।

হোটেলে সূর্যর পাশের ঘরেই তিনটি বাঙালী ছেলে এসে উঠেছে দু দিন ধরে। সিঁড়িতে ওঠা-নামার সময় দেখা হয়েছে, কোনো কথা হয় নি।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ওদের মধ্যে একটি ছেলে এসে সূর্যর ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল।

—দাদা, আপনি তো বাঙালী?

সূর্য বললো, হ্যাঁ।

ছেলেটি একগাল হেসে বললো, আমরাও তাই ভেবেছিলুম, তবে ঠিক শিওর হতে পারি নি। আপনি তাশ খেলতে জানেন? আমাদের একজন লোক শর্ট পড়ে গেছে।

—আমি তো তাশ খেলতে জানি না।

—তাশ চেনেন তো? আসুন না, শিখিয়ে দেবো।

সূর্যকে এবার স্বীকার করতে হলো যে, সে তাশও চেনে না!

বাঙালীর ছেলে অথচ তাশ চেনে না, এতে অপর বাঙালীর ছেলেটি বড়ই আশ্চর্য হয়ে গেল। বললো, তা হলে সারা সন্ধ্যেবেলাটা কি করবেন? আসুন না আমাদের ঘরে। একটু গপ্প টপ্পো করা যাক।

অপরিচিত লোকদের সঙ্গে সূর্য একেবারেই ভাব জমাতে পারে না। তবু ছেলেটির আগ্রহ-আতিশয্যে তাকে যেতেই হলো।

দুটো খাট ওরা জোড়া লাগিয়েছে। তার ওপর তাশ ছড়ানো। দুটো অ্যাশট্রে

সিগারেটের টুকরোয় একেবারে ভরে গেছে। সূর্য এসে এক পাশে বসলো।

ছেলে তিনটির নাম অনুপ, সুকল্যাণ আর দেবব্রত। সূর্যরই বয়েসী, তিনজনই চাকরি করে, বেড়াতে বেরিয়েছে। ওরা এখন ফেরার পথে। দিল্লি পর্যন্ত গিয়েছিল। ওদের মধ্যে একজনের অফিসের একটা ব্রাঞ্চ আছে এলাহাবাদে, সুতরাং অন্যরাও কয়েক দিন থেকে যাচ্ছে এখানে।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা নিজেদের সব কথা বলে গেল। খুব সহজেই আলাপ জমিয়ে নিতে পারে ওরা। খাটের তলা থেকে আস্তে আস্তে বার করলো তিনটে গেলাস আর একটা মদের বোতল।

সূর্যকে জিজ্ঞেস করলো, দাদার চলবে?

দৈর্ঘ্য ও স্বাস্থ্যের জন্য সূর্যকে ওদের তুলনায় বড় দেখায়। সেই জন্য ওরা প্রথম থেকেই সূর্যকে দাদা বলতে শুরু করেছে। প্রথমটা লজ্জা ভাঙার আগে ওরা সূর্যকে দেখে মদের বোতল আর গেলাস লুকিয়েছিল খাটের তলায়।

সূর্য বললো, না।

একজন সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বললো, সিগারেট নিন অন্তত।

আমি সিগারেটও খাই না। ধন্যবাদ।

—দাদা দেখছি খুব ভালো ছেলে। আমরা এসব খাচ্ছি টাচ্ছি বলে কিছু মনে করছেন না তো?

সূর্য ফ্যাকাশেভাবে হেসে বললো, না না!

এই ধরনের যুবকদের সঙ্গে আগে মেশার সুযোগ হয় নি সূর্যর। এরা লম্পট দুশ্চরিত্র কিছুই নয়, সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের চাকুরে বাঙালী যেরকম হয়। বছরে একবার ছুটি নিয়ে বেড়াতে বেরোয়, নিবিড় বন্ধুত্ব, প্রবাসে এসে একটু অ্যাডভেঞ্চারের জন্য মদ চেখে দেখে, নিজেদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে কখনো চাকরির আলোচনা কখনো স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে আলোচনায় মেতে থাকে। তিনজনেরই বিয়ে হবে-হবে অবস্থা, বিয়ে হয়ে গেলে এরকম বন্ধুত্ব আর থাকবে না।

সূর্যকে তাশ খেলা শেখাবার চেষ্টা করে একটু পরেই ওরা নিরাশ হলো। যার খেলা শেখার আগ্রহ নেই, তাকে শেখানো যায় না। তখন ওরা মেতে উঠলো গল্পে। ওরা সদ্য আগ্রা থেকে ঘুরে এসেছে, সেখানকার সম্পর্কে ওদের অনেক সরস গল্প আছে, নারীঘটিত।

সূর্য এক সময় বলে ফেললো, আমিও একবার আগ্রায় যাবো ভাবছি।

—আগে যান নি?

—না।

তখন তিনজনেই মহা উৎসাহে সূর্যকে আগ্রা বিষয়ে প্রচুর তথ্য সরবরাহ করতে লাগলো। কিন্তু কোন্ হোটেলে সূর্যর ওঠা উচিত, সে সম্পর্কে একটা মতভেদ দেখা গেল ওদের মধ্যে। দুজনে একটা হোটেলের নাম করে, তৃতীয়জন হাসতে হাসতে বলে, যাঃ, দাদাকে ঐ হোটেলে পাঠাস নি! কেন মিছিমিছি—

তারপর তিনজনেই হাসতে আরম্ভ করে। সূর্য ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না। শেষ পর্যন্ত ওরা তিনজনেই একটি হোটেল বিষয়ে একমত হয় এবং স্টেশনে হোটেলের দালালদের কাছ থেকে, কিভাবে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কোথায় যেতে টাঙ্গার কত ভাড়া, সব জানিয়ে দেয়।

ঐ ছেলে তিনটিকে সূর্যর খারাপও লাগে নি, ভালোও লাগে নি। কিন্তু ওদের

সঙ্গে মেলামেশার কোনো টানও সে বোধ করলো না। নিজে থেকে সে একটাও কথা বলতে পারে না। ওদের রসিকতাগুলোও তার কাছে অন্যরকম মনে হয়। একমাত্র বরদা-প্রসন্নর সঙ্গেই সে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারতো। সূর্য আবার গেল সেই চায়ের দোকানে। বরদাপ্রসন্ন নেই। ইলেকট্রিক-সরঞ্জামের দোকানেও সে বরদাপ্রসন্নকে দেখতে পেল না আর। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সেই দোকানটার সামনে।

সূর্য পর দিনই আগ্রা চলে গেল। সেই যুবক তিনটির নির্দেশিত হোটেলে গিয়েই উঠলো এবং চব্বিশ ঘণ্টা যেতে না যেতেই বুঝলো, ভুল জায়গায় এসেছে। যুবক তিনটি রসিকতা করেছে তার সঙ্গে।

আগ্রাতেও কিছু বাঙালী ভ্রমণকারী রয়েছে। সূর্যর সঙ্গে কারুর ভাব হলো না। প্রায় সকলেই সস্ত্রীক। স্ত্রী সঙ্গে থাকলে বাঙালী যুবকরা অচেনা কোনো যুবকের সঙ্গে কথা বলা পছন্দ করে না।

বিকেলের দিকেই সূর্য গিয়েছিল তাজমহল দেখতে। গাইডের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কিছুক্ষণ দেখার পরই বিরক্ত হয়ে উঠলো। তবে, সবাই বলাবলি করছে, সেদিন পূর্ণিমা। পূর্ণিমার রাতে তাজমহল দেখা নাকি দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

বড় এক ঠোঙা বাদাম কিনে সূর্য গিয়ে বসলো মাঠের মধ্যে। সন্ধ্যের দিকে ভিড় আরও বাড়ছে। বাচ্চারা দৌড়োদৌড়ি করছে, বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের সংখ্যাও অনেক, আর তরুণ তরুণীদের চোখ ভাবে বিভোর—এখানে এলে এরকম হওয়াই নিয়ম বোধ-হয়।

ঘাসের ওপর কাৎ হয়ে শুয়ে পড়লো সূর্য। খোসা ছাড়িয়ে বাদাম মুখে পুরছে আর মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছে তাজমহলের দিকে। যতবার চোখ তুলছে, সে তাজমহল দেখতে পাচ্ছে না ঠিক, দেখছে দীপ্তিকে।

মুখটা কঠিন করে সূর্য মনে মনে বলছে, আমি তোমার কেউ না। তুমি কেন আসছো এখানে, যাও! তুমি তো বলেইছো, তোমার সঙ্গে আর কখনো আমার দেখা হবে না!

দীপ্তি কোনো কথা বলে না। তরল হাওয়ায় মাঝে মাঝে মিলিয়ে যায়। যখন দীপ্তিকে দেখতে পায় না তখন সূর্য বলে, তুমি আমার!

জ্যোৎস্নায় যখন তাজমহলের বিশ্ববিখ্যাত রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, তখনও দীপ্তির মায়াময় মূর্তি এসে দাঁড়ালো সূর্যর সামনে। দীপ্তির স্বভাব-গম্ভীর মুখে যে অকস্মাৎ হাসি দেখে সূর্য একসময় পাগল হয়েছিল, সেই রকম হাসি আঁকা ঠোঁট। সূর্য যেন এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে ঐ ঠোঁট কামড়ে ধরবে।, দীপ্তির ছটফটে শরীরটা বাহুবন্দী করে সে......। অত্যন্ত তীব্র অভিমানের সময়ে সূর্য শারীরিক প্রসঙ্গ ছাড়া ভাবতে পারেন না।

সূর্য চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে তাজমহলকে আড়াল করে দিল। যেন তাজ-মহলও একটা শরীর, সমস্ত সৌন্দর্যের ঘন রূপ, যা শুধু মানুষকে দুঃখ দেয়।

॥ ৭২ ॥

এলাহাবাদের সেই বাঙালী ছেলেগুলির কথা মতন সূর্য আগ্রায় যে হোটেলটাতে উঠেছিল, সেটা একটা গোলমালের জায়গা। বহু পুরনো আমলের বাড়ি এবং অনেক পুরনো পাপ সেখানে বাসা বেঁধে আছে।

সূর্যকে দেওয়া হয়েছে তিনতলার একটি ঘর। ঘরটি ছোট হলেও মোটামুটি পরিষ্কার। জানলা দিয়ে বাইরের অনেকখানি দৃশ্য দেখা যায়। ঘরে একটা পাখা আছে, বিছানায় ধপধপে সাদা চাদর। তবু বিছানায় শুয়ে থাকা যায় না, এত অসহ্য গরম।

সূর্য তাজমহল থেকে ফিরেছে বেশ রাত করে, আসবার পথেই খেয়ে নিয়েছে। টাঙ্গা নিয়ে সে একবার ইতমদৌল্লার দিকে গিয়েছিল, কিন্তু রাত্রে সেখানে কিছুই দেখার নেই। রাত্রে আর কিছু করবারও নেই তার, পুরনো আগ্রার পথে অধিক রাত পর্যন্ত মানুষ জন দেখা যায়, অনেক দোকানপাট খোলা, কোনো কোনো জায়গা থেকে হৈ হল্লার আওয়াজ ভেসে আসে, কিন্তু যে-মানুষ কারুকে চেনে না, সে আর কোথায় যাবে! হোটেলে ফিরে এসে একটা ইংরেজি উপন্যাস খুলে শুয়ে ছিল সে।

কিন্তু বইতে মন বসানো অসম্ভব। ঘামে বিছানার চাদর ভিজে যায়। শরীরে যেন সহস্র সূঁচ বিঁধ হচ্ছে। এক সময় অসহ্য বোধ হওয়ায় সূর্য বই মুড়ে রেখে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

এ বাড়ির গঠন একটু অদ্ভুত ধরনের। চৌকো মতন একটা বড় উঠোনের চারদিকে ঘর, প্রত্যেক ঘরের সামনে দিয়ে অর্থাৎ উঠোনের দিকে রয়েছে টানা বারান্দা, বাইরের দিকে কিছু নেই। প্রত্যেক তলাতেই উঠোনের ওপর অংশটা লোহার শিক দিয়ে ঢাকা। সেই লোহার শিকের ওপর দিয়ে হাঁটা চলা করা যায় স্বচ্ছন্দে, এর ওপরে দাঁড়ালে একতলা পর্যন্ত দেখা যায়। হোটেলের ছোকরা চাকররা অনেক সময় ওখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে একতলার কারুকে ডাকে।

এখন গরমের জন্য অনেক ঘরের বাসিন্দাই বাইরে এসে বসেছে, কেউ কেউ বিছানা পেতেছে সেই লোহার শিকের ওপর। বাইরেও গরম কম নয়, তবে, ঘরের মধ্যে যেমন একটা পোড়া পোড়া ভাব—এখানে সেটা অন্তত নেই।

গেঞ্জি আর পাজামা পরে সূর্য উঠোনের সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। একটু-খানি স্বস্তি পেল যেন।

পূর্ণিমার রাত্রি, মস্তবড় একটা চাঁদ উঠেছে, ঝকঝকে নীল আকাশ—কিন্তু এত অসহ্য গরমের জন্য সৌন্দর্য দেখার দিকে কারুর মন নেই।

সূর্য একবার ভাবলো, বেয়ারাকে ডেকে তার বিছানাটা বাইরেই পাততে বলবে কিনা। এখনো অনেকটা জায়গা আছে। কিন্তু দ্বিধা করতে লাগলো। সে একা-চোরা স্বভাবের ছেলে, এত লোকের পাশাপাশি শুতে তার ইচ্ছে নেই। কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইলো রেলিং-এ ভর দিয়ে।

অনেকেই এখনো জেগে আছে। কোনো বাংলা কথাবার্তা শুনতে না পেয়ে সে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলো। এখন কারুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার ইচ্ছে নেই তার। সন্ধ্যে থেকেই মনটা ভারী হয়ে আছে।

উঠোনের এক কোণে বসে জন চারেক লোক খুব খোলাখুলি ভাবেই মদ্যপান করছে। উঁচু গলায় হাসাহাসি করছে তারা। মাংসের হাড় চিবিয়ে লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে সেই হাড় একতলার কারুর মাথায় ফেলার চেষ্টা করা ওদের অন্যতম

কৌতুক। হোটেলের বেয়ারারা ব্যস্ত হয়ে তাদের জন্য এনে দিচ্ছে ঘন ঘন সোডার বোতল এবং নানা রকম মাংস। লোকগুলির চেহারা ডাকাতের মতন, কিন্তু একজনের গানের গলা চমৎকার।

কাছাকাছি যারা শুয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে কয়েকজন নারী। কিন্তু এই মদ্যপানরত দলটি সম্পর্কে তারা ভ্রূক্ষেপহীন। শুয়ে থাকা লোকদের মধ্য থেকে কেউ কেউ মাঝে মাঝে এদের সঙ্গে রসিকতা বিনিময় করছে।

মাঝে মাঝে একটি যুবতী মেয়ে নিচতলা থেকে আসছে এখানে, মদ্যপদের দলটির পাশে দু' এক মিনিট বসে আবার চলে যাচ্ছে। মেয়েটির আঁটসাঁট স্বাস্থ্য, ঘাঘরা ও কাঁচুলি পরা, শরীরের দর্শনীয় ব্যাপারগুলি প্রকট করে তোলার ব্যাপারে যত্নশীল। মেয়েটি একটু বসেই চলে যাচ্ছে, আবার কয়েক মিনিট বাদেই ফিরে আসছে—তার ও রকম ঘন ঘন আসা যাওয়ার অর্থ বোঝা যায় না।

সূর্য অপলক চোখ মেলে এই সব ব্যাপার লক্ষ্য করছিল। এক সময় ঠিক ঐ একই পোশাক পরা এবং প্রায় এক রকম চেহারার তিনটি মেয়েকে দেখে সে বুঝতে পারলো, বার বার একটি মেয়েই আসে নি, এসেছিল বিভিন্ন জন।

এরা কারা? সে সম্পর্কে সূর্যর কোনো কৌতূহল নেই। তবে, একটি মেয়ে যখন সূর্যর কাছেই রেলিং ঘেঁষে দাঁড়ালো এবং তার দিকে দুষ্টুমীভরা চোখে হাসলো, তখন সূর্যকে সচকিত হয়ে উঠতেই হলো।

সূর্যও একটু হাসলো। মেয়েটিকে সে চিনতে পেরেছে। তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলেও সে জানে, পৃথিবীতে এ রকম মেয়ের সংখ্যা দু' তিন কোটি তো হবেই? ভুরুর ব্যবহারেই এরা আত্মপরিচয় দেয়।

সেই মাতালের দলটি সূর্যকে উদ্দেশ্য করে কি যেন বললো। রাগের কথা কিছু নয়। বোধহয় তারা সূর্যকে তাদের সঙ্গে যোগদান করতে আহ্বান জানাচ্ছে। বাকি দুটি মেয়েও বসে গেছে ওদের পাশে।

সূর্য হাত জোড় করে বললো, মাপ কিজিয়ে।

মেয়েটি এবার সূর্যর কাছ ঘেঁষে এসে বললো, আইয়ে?

সূর্য মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আবার বললো, মাপ কিজিয়ে'

তারপর হোটেলের একজন বেয়ারাকে কাছাকাছি দেখে সে গম্ভীরভাবে ডাকলো। তাকে বললো, বরফের একটা বড় চাঁই আনতে পারো?

এই ব্যাপারটা সূর্যর হঠাৎ মনে পড়েছে। হাজারীবাগে স্কুলে পড়ার সময় সে দেখেছিল, সেখানকার একজন ফাদার কিছুতেই গরম সহ্য করতে পারতেন না। তিনি গ্রীষ্মের দুপুরে তাঁর ঘরে একটা মস্ত বড় বরফের চাঁই রেখে দিতেন পাখার ঠিক নিচে। তাতে হাওয়া খানিকটা ঠান্ডা হতো। সূর্য আজ হোটেলে ঢোকার ঠিক মুখেই দেখেছে, বড় বড় বরফের চাঁই আঁকশি দিয়ে টেনে ভেতরে আনা হচ্ছে।

সূর্যর কথা শুনে বেয়ারাটি গাঁইগুঁই করতে লাগলো। সূর্য ঘরে ঢুকে জামার পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট এনে এগিয়ে দিয়ে বললো, তুরন্ত!

মেয়েটি মুখে ফিকফিকে হাসি নিয়ে সূর্যকে দেখছিল তখনও। সূর্য আর সেদিকে তাকালো না। বেয়ারাটি বরফের চাঁইটা নিয়ে আসার পর সূর্য সেটাকে পাখার ঠিক সামনেই রাখলো একটা টুলে। হাওয়াটা সোজাসুজি যাতে বরফের ওপর লাগে। তারপর সূর্য দরজা বন্ধ করে দিল।

পাখাটার কাছাকাছি দাঁড়াতেই একটু ঠান্ডা হাওয়া পাওয়া গেল এবার। বরফ

গলে জল পড়ে সারা ঘরে ছড়াবে অবশ্য, তা ছড়াক! এতখানি বরফ গলাতেও অনেক সময় লাগবে।

বাইরের মেয়েটির কথা ভাবতে গিয়েই ঝনঝন করে উঠলো একটা কৈশোর স্মৃতি। হাজারিবাগে স্কুলে পড়ার সময় রাত্তিরবেলা সে যখন কয়েকটি ছেলের সঙ্গে পালাতো, হাজির হতো একটা জুয়ার আড্ডায়. সেখানে একদিন একটি মেয়ে নাচ দেখিয়েছিল। ঠিক এই রকমই পোশাক. এই মেয়েটিরই জাতের আর একটি মেয়ে। একই রকম ভুরুর ভঙ্গি আর কাঁচুলি ঠেলে বেরিয়ে আসা স্তন।

কি উদগ্র কৌতূহল ছিল তখন সূর্যর। সেই, কৈশোরে ঐ রকম একটি মেয়ের শারীরিক রহস্য জানবার জন্য সে সর্বস্ব দিয়ে দিতে পারতো। আজকের এই মেয়েটির সেই রহস্যের দাম বড় জোর পাঁচ টাকা বা দশ টাকা. কিন্তু সূর্যর কোনো রকম চিত্তবিকারই হলো না।

মেয়েটি তার কাছে এসে দাঁড়াবার মুহূর্ত থেকেই সূর্যর মনে পড়ছিল দীপ্তির কথা। তাজমহল কিংবা যৌবনবতী কোনো সুলভ নারী—সব কিছুই আড়াল করে দাঁড়াচ্ছে দীপ্তি। তার সেই সরল চোখ—যার দুর্বোধ্য ভাষা সূর্য পড়তে পারে না, চিবুকের দৃঢ় ভঙ্গি। সূর্য অত্যন্ত গভীর ভাবে জেনে গেছে যে. দীপ্তির সঙ্গে তার আর দেখা হবে না—সে আর কখনো দীপ্তির কাছে ফিরে যাবে না। তবু, বার বার দীপ্তি এরকম ভাবে চোখের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে কেন? সূর্য কি আর কোন দিন সুন্দর কিছু উপভোগ করতে পারবে না?

দীপ্তি একদিন বলেছিলেন. সূর্য, তোমাকে দেখার পর আমি একটা দায়িত্ব বোধ করি। আগে আমি অনেক স্বাধীন ছিলাম। যখন যা খুশী করতে পারতাম। এখন তোমার সঙ্গে দেখা করা কিংবা তোমার কাছে কথা রাখার ব্যাপারে আমাকে সব সময় চিন্তা করতে হয়।

সূর্য ভাবলো, দীপ্তিদি কি এখনো তাঁর সম্পর্কে সেই রকম দায়িত্বের কথা ভেবেই......।

সূর্য একটা রুদ্ধ নিশ্বাস ফেললো।

একটু পরে কে যেন দরজায় ধাক্কা দিল। সূর্য আলো নেভায়নি, ঘরের দরজা খুলতেই দেখলো. সেই রকম দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনো কথা না বলে হাসছে মিটিমিটি।

সূর্য ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, কি?

মেয়ে দুটি একজন ঠেলা দিল আরেকজনের গায়ে। ওদের দেখে মনে হয় যমজ। ওদের হাসি ও শরীরভঙ্গির মধ্যে যেন নাচের মুদ্রা আছে।

একজন উর্দু-হিন্দি এবং আশ্চর্যের বিষয়, খানিকটা বাংলা মিশিয়ে বললো, বাবুজী যে আশ্চর্য বুদ্ধি খাটিয়ে এই গরমের মধ্যে বরফের হাওয়া খাচ্ছেন, ওরাও কি একটুক্ষণের জন্য সেই হাওয়া খেতে পারে? স্রেফ পাঁচ মিনিটের জন্য?

সামান্য একটু চিন্তা করে সূর্য বললো, আইয়ে ভিতরমে।

মেয়ে দুটি ঘরে ঢুকে পাখার সামনে দাঁড়ালো। সূর্য খাটে শুয়ে আবার গল্পের বইটা খুললো।

সূর্য মাঝে মাঝে বই থেকে চোখ তুলতেই দেখতে পাচ্ছে. মেয়ে দুটি তাকিয়ে আছে তার দিকেই। চোখাচোখি হতেই ওরা হাসছে, যে হাসিতে স্পষ্ট আহ্বান। সূর্য গম্ভীর হয়ে গিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে।

ব্যাপারটা বেশ অস্বস্তিকর। সূর্য ভাবছে, মেয়ে দুটিকে এবার ঘর থেকে চলে যেতে বলা উচিত, কিন্তু মুখ ফুটে তা বলতে পারছে না। আর মেয়ে দুটিরও হাওয়া খাওয়ার বিরাম নেই। টেবিল ফ্যানের জোরালো হাওয়াতে উড়ছে ওদের ঘাঘরা, এবং দুষ্টুমি করে ওরা ব্লাউজ টেনে ধরে বুক জুড়োচ্ছে। সূর্যর মনে সন্দেহ হয় না যে, ওরা তাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে।

একটু পরেই সূর্যর মনে একটা দ্বন্দ্ব তৈরী হলো। সে রূপপিপাসী, ওদের দুটির ভরাট শরীরের দিকে তাকাতে তার যে ভালো লাগছে, একথা অস্বীকার করতে পারবে না। ওদের স্ফুরিত ওষ্ঠ, সুগোল স্তন এবং সুগঠিত ঊরুর দিকে বারবার তার চোখ চলে যাচ্ছে। কিন্তু, এ কথাও ঠিক, ওদের শয্যাসঙ্গিনী করার একটুও ইচ্ছে জাগছে না তার। সূর্যর নীতিবোধ নেই, নারীসঙ্গ পেলে সে স্পষ্টত উৎফুল্ল হয়, তবু তার লোভ জাগছে না কেন? ওরা এত সুলভ বলে? এ পর্যন্ত যে কটি নারীর গায়ে সূর্য হাত ছুঁইয়েছে, সব জায়গাতেই জোর করতে হয়েছে তাকে।

আর একটা জিনিসও বোঝা যাচ্ছে না, দুটি মেয়ে একসঙ্গে এসেছে কেন? মেয়ে দুটি যেন যমজ, একই রকম চেহারা, একই রকম পোশাক, মুখ দুটি অবশ্য সামান্য আলাদা। বাইরে যে আর একটি মেয়ে রয়েছে, তাকেও এদেরই মতন দেখতে। যদি এদের তিনজনের মধ্যে যে-কোনো একজনকে বেছে নিতে হয়, তা হলে লটারি করতে হবে।

আর একবার চোখ পড়তেই একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপ কাঁহাসে আ রাহা হ্যায়?

সূর্য গম্ভীরভাবে বললো, কলকাতা!

মেয়েটি তখন জানালো যে সূর্যকে দেখলেই বোঝা যায় বাঙালীবাবু। বাঙালীবাবুরা এখানে অনেক আসে। তাদের দিল্ খুব ভালো হয়।

মেয়েটি এগিয়ে এসে সূর্যর খাটে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। তার ভাবখানা এই যে, আমাকে আপনার পছন্দ হচ্ছে না? অন্য মেয়েটি দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে।

সূর্য বললো, এবার আপনারা বাইরে যান। আমি এবার ঘুমোবো।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে দারুণ লজ্জিত হয়ে পড়লো। নানারকম ভাবে দুঃখ জানিয়ে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে বললো, ছি, ছি, ছি, তাদের বিষম অন্যায় হয়ে গেছে। সাহেব ঘুমোবেন জানলে তারা মোটেই হাওয়া খেতে আসতো না।

মেয়ে দুটি দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সূর্য এবার উঠে দরজা বন্ধ করতে যাবে, এর মধ্যেই পুরো মদ্যপায়ী দলটা এসে দাঁড়িয়েছে তার দরজার কাছে। প্রত্যেকের হাতেই গেলাস। একজন বললো, সাহেব নাকি হাওয়া-ঠাণ্ডা করার একটা কল বানিয়েছেন? বাঃ, বেশ আজিব কায়দা তো!

তারা অনুমতি নেবার অপেক্ষা করলো না, সকলে ঢুকে এলো ঘরের মধ্যে। বরফের চাঁইটার সামনে দাঁড়িয়ে তারা বললো, হাঁ, প্রত্যেক ঘরেই এরকম বন্দোবস্ত করা উচিত। যা গরম আজ!

ওদের সঙ্গে যে তৃতীয় মেয়েটি ছিল, সে এসে সরাসরি বসে পড়লো সূর্যর খাটের ওপর। তার হাতের মদের গেলাসটা সূর্যর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, আপ পিতে নেহি?

সূর্য দুদিকে মাথা ঝাঁকালো।

একজন পুরুষ লঘু গলায় জিজ্ঞেস করলো, কেয়া সাব, বেড়াতে এসেছেন তাও

একটু ফূর্তি টুর্তি হবে না?

সূর্য এখন রীতিমতন বিরক্ত বোধ করছে। এই লোকগুলোকে এখন ঘর থেকে তাড়ানো যায় কি করে? কত রাত পর্যন্ত এই মাতালের হল্লা চলবে? মেয়ে তিনটির সঙ্গে এই লোকগুলোর সম্পর্ক কি? এদের তো কোনোরকম লজ্জা শরমের ব্যাপার নেই দেখা যাচ্ছে। কালকেই হোটেল পাল্টাতে হবে।

সূর্য বুঝতে পারছে, এত মাতালের সঙ্গে রাগারাগি করে কোনো লাভ নেই। হোটেলের ম্যানেজারের কাছে অভিযোগ করা যায়, কিন্তু ম্যানেজার কি জানে না যে তিনতলায় এই কাণ্ড চলছে?

খাটের ওপর বসা মেয়েটি তার ব্লাউজ ফাঁক করে ফুঁ দিচ্ছে ঘামে ভেজা বুকে। তার তকতকে মসৃণ পেট ও নাভির দিকে সূর্য কয়েকবার তাকালো। মাত্র কয়েকটি টাকা দিলেই মেয়েটি বাকি বস্ত্র খুলে ফেলবে। সুগঠিত নারী শরীর দেখতে ভালো লাগে। সূর্যর মনের একটা অংশে সেই ইচ্ছেটা প্রবল, আবার মনের অন্য অংশে একটা ঘৃণা জাগছে এদের সম্পর্কে।

সূর্য মৃদুগলায় মেয়েটিকে মিনতি করে বললো, আমি খুব ক্লান্ত, আমার ঘুম পাচ্ছে, তোমরা এবার বাইরে যাবে?

এই মেয়েটিও খুব লজ্জা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। এদের নির্লজ্জতা এবং লজ্জা, দুটোই খুব অদ্ভুত। শারীরিক আমন্ত্রণ জানাবার ব্যাপারে এদের বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই, আবার একটি মাত্র কথাতেই এরা হঠাৎ অনুতপ্ত হয়ে পড়ে।

মেয়েটি উঠে গিয়ে মাতালগুলোকে ধমক দিয়ে বললো, আরে চলো, চলো, শির্গাগর বাহার চলো, সাহেবের ঘুম পেয়েছে!

মাতালের দল সূর্যর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল ঘর থেকে। সূর্য দরজায় খিল তুলে দিল। তৎক্ষণাৎ আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো খাটে।

কিন্তু বহুক্ষণের মধ্যেও তার ঘুম এলো না। ঐ মেয়ে তিনটির শরীর তাকে বিরক্ত করছে। বিশেষত তৃতীয় মেয়েটির বুকে ফুঁ দেওয়ার দৃশ্যটা বারবার ভেসে উঠছে তার চোখে। সে জোর করে ছবিটা মুছে দিতে চাইছে। আবার, এটা ভুলতে চাইলে যা মনে পড়ছে, সেটা যে বড় দুঃখের। জলপাইগুড়ির আশ্রমে থাকার সময়ে দীপ্তিদি কোনোদিন সূর্যর কাছাকাছি আসেন নি, কোনোদিন একটুও প্রশ্রয় দেন নি তবু শেষের দিকে একদিন তিনি বলেছিলেন, সূর্য, এক এক দিন আমার ইচ্ছে করতো, মাঝ রাত্রে উঠে তোমার ঘরে চলে যাই, তোমার শিয়রের পাশে বসি, তোমার ঘুমন্ত মুখে হাত রাখি—কত কষ্ট করে যে নিজেকে দমন করেছি—! কথাটা মনে পড়তেই সূর্যর শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল।

দীপ্তিদি সত্যি যদি কোনদিন মাঝ রাত্রে আসতেন তার কাছে, বসতেন শিয়রের পাশে—তা হলে সূর্যর জীবনটা যেন ধন্য হয়ে যেত। সূর্য দু' হাত তুলে শূন্যতাকে আঁকড়ে ধরলো। ঠিক এইরকম ভাবে দীপ্তিকে সে নিজের বুকের মধ্যে—

না, এ ভাবে চিন্তা করা ঠিক হচ্ছে না। সূর্য মাথা ঠাণ্ডা করলো। দীপ্তিদি আর কোথাও নেই, কোনোদিন ছিল না। সেটা অন্য জীবন। এই তিনটি মেয়ের যে-কোনো একজনের সঙ্গে দীপ্তিদির তফাৎ কি? এই মেয়েগুলিরও শরীরে যৌবন আছে, আনন্দ করার স্পৃহা আছে। তৃতীয় মেয়েটির কথাই ধরা যাক, যে বুকে ফুঁ দিচ্ছিল, তাকে পাশে নিয়ে শুয়ে সূর্য কেন আনন্দ পাবে না? ওর শরীরটা সুন্দর, সুন্দর শরীরই তো উপভোগের, তবু সূর্য কেন ওকে ডাকতে পারলো না? না, লজ্জা নয়, অন্যরকম

বাধা ছিল। আর, দীপ্তিদি এখানে নেই, সূর্যর জীবনেই আর নেই, তবু তার জন্য এখনো এত কাতরতা রয়ে গেছে কেন? এরই নাম ভালোবাসা? পৃথিবীতে এত সুলভ নারী আছে, অথচ যাকে ভালোবাসা যায়, সেই সবচেয়ে দুর্লভ হয়ে ওঠে কেন?

দীপ্তিদি সহজে তাঁর শরীর স্পর্শ করতে দিতেন না, কলকাতায় সেই অদ্ভুত দুরন্ত দিনগুলিতেও। কখন কে দেখে ফেলবে এই চিন্তা তো ছিলই, তা ছাড়া ভেতরের বাধা তিনি কোনো সময়েই ঠিক কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তবু কখনো সামান্য একটু বাহুর স্পর্শ, পিঠে একটু হাত রাখা—তাতেই ছিল কত রোমাঞ্চ। মনে আছে, একদিন মধ্য কলকাতার একটা ছোট চায়ের দোকানে সূর্য আর দীপ্তি বসে ছিল একটা ক্যাবিনে। পর্দা ফেলা ছিল। কথা বলতে বলতে হঠাৎ মুখ তুলে দীপ্তিদিকে এত অসহ্য সুন্দর মনে হলো সূর্যর, যেন ঐ বুকে মাথা রেখে তক্ষুনি মরে যেতে ইচ্ছে হয়। দুজনের মাঝখানে টেবিলের দূরত্বটা মনে হচ্ছিল কি বিশাল, সূর্য দীপ্তিদির গালে শুধু তার হাতটা ছোঁয়াতে চাইলো একবার, দীপ্তিদি মুখটা সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিয়ে বললেন, না, ওসব কি! সূর্য তখন টেবিলের ওপর পড়ে থাকা দীপ্তিদির ডান হাতটা তুলে নিয়ে একটা আঙুল তার মুখে পুরে দিল। আলতোভাবে দাঁতে চেপে ধরে রইলো। দীপ্তিদির আঙুল, কয়েক মুহূর্ত। সামান্য ব্যাপার, অথচ ওতেই দীপ্তিদির মুখে লাগলো লাল রঙের ছোপ, আর সূর্যর শরীরে যেন প্রচণ্ড জ্বরের উত্তাপ। পৃথিবীর আর কোনো মানুষ আর কোনো নারীকে অমন তীব্রভাবে চেয়েছে? কি নিদারুণ অতৃপ্তি!

না, না, সূর্য এ সব ভাববে না, আর কিছুতেই ভাববে না। দীপ্তিদি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বাইরে তখনও হৈ হল্লা চলছে। শোনা যাচ্ছে মেয়েলি গলার চনমনে হাসি। ওরা বেশ জমিয়ে নিয়েছে। এদের জীবন কত সরল। এদের ভালোবাসা টাসার ঝঞ্ঝাট নেই। তিনটি মেয়ে কি সহজভাবে মাতামাতি করছে অতগুলো পুরুষের সঙ্গে, আবার অর্থ উপার্জনের জন্য ওদের সামনেই একজন পরদেশীকে প্রলুব্ধ করতে এসেছিল—তার জন্য পুরুষদের মধ্যেও তো কোনো ঈর্ষার চিহ্ন ছিল না। ওরা এরকম কিভাবে পারে?

সূর্য বিছানা ছেড়ে উঠে এলো দরজার কাছে। আলো জ্বাললো না। দু' এক মিনিট ধরে ভাবতে লাগলো, দরজা খুলে সে-ও ওদের দলে গিয়ে যোগ দেবে কিনা। কেন সে একা একা বিছানায় ছটফট করবে? কিংবা কোনো মেয়েকে ডেকে এনে—

শেষ পর্যন্ত সূর্য দরজা খুললো না। মনের দুটো অংশ কিছুতেই এক হচ্ছে না। অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে সে লোভীর মতন শুনতে লাগলো, বাইরের ওদের হাসাহাসি। দীপ্তিদি কি তাকে সারা জীবনের সব আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে ছেড়ে দিলেন?

পরদিন সকালেই সূর্য হোটেল বদলে ফেললো। দু' দিন ধরে ফতেপুরসিক্রি, সেকেন্দ্রা আর আগ্রা দুর্গ দেখা শেষ করলো। তারপর ট্রেন ধরলো গোয়ালিয়ারের।

বড়বাবু মৃত্যুর আগে বার বার সূর্যকে বলেছিলেন গোয়ালিয়ারের কথা। তিনি চেয়েছিলেন, ছেলেকে নিয়ে নিজেই এখানে আসবেন একবার। কেন? হয়তো, কোনোই মানে নেই, অসুস্থ অবস্থার প্রলাপ। কিংবা তাঁর নিজের জীবনের অনেকগুলি বছর কেটেছে এখানে, সেই স্মৃতি মনে পড়ছিল।

সূর্যর জন্ম হয়েছিল এইখানে। কিন্তু খুব কম বয়েসেই এ জায়গা থেকে চলে

গিয়েছিল। স্মৃতিতে বিশেষ কিছুই নেই।

গোয়ালিয়রে এসে সূর্যর হোটেল পেতে খুব অসুবিধে হলো। ভালো হোটেল নেই এখানে, সাধারণ যে ক'টি আছে, তার কোনোটার জায়গা নেই, কোনোটা তার পছন্দ হয় না। টাঙ্গাওয়ালা তাকে নিয়ে তুললো ডাক বাংলোতে। সেখানেও ঘর খালি নেই। তবে ডাক বাংলোর বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে একটি যুবক খবরের কাগজ পড়ছিল, সে সূর্যকে দেখে বললো, ইফ ইউ লাইক, আই ক্যান অ্যাকোমোডেট ইউ ইন মাই রুম। দেয়ার ইজ অ্যান এক্সট্রা বেড।

অন্য কারুর সঙ্গে এক ঘরে থাকা সূর্য একেবারেই পছন্দ করে না। সেই জন্য সে যুবকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললো, আমার একটা আলাদা ঘরই চাই। আমি বরং সার্কিট হাউসে চেষ্টা করে দেখি।

যুবকটি বললো, সার্কিট হাউসে জায়গা পাবার কোনো আশাই নেই। দু'জন মিনিস্টার এসেছে। আপনি এখানে থাকলে কাল একটা ঘর খালি পেয়ে যাবেন। আপনি কি এখানে বেড়াতে এসেছেন, না কোনো কাজে?

সূর্য টাংগা থেকে সুটকেসটা নামালো।

॥ ৭৩ ॥

যুবকটি সূর্যর চেয়ে বয়েসে কয়েক বছর বড়ই হবে, ছিপছিপে লম্বা চেহারা, দেখলেই বোঝা যায় সে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসে। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। হোটেলে-ডাকবাংলোয় এসে সবাই একটা নিজস্ব আলাদা ঘর পেতে পছন্দ করে, এই ছেলেটি নিজে থেকেই তার ঘরের ভাগ অন্য একজনকে দিতে চাইছে। সুতরাং সে যে খুব মিশুকে প্রকৃতির তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে জানে না, সে সূর্যর মতন কতখানি অমিশুককে ঘরে ডেকে আনলো।

যুবকটি নিজেই সূর্যর সুটকেশটা নিয়ে এলো ঘরে। অন্যদিকের খালি খাটটা দেখিয়ে বললো, চাদর-টাদর সব পরিষ্কারই আছে। ওয়ার্ডরোবটাও আপনি ব্যবহার করতে পারেন। আমার জিনিসপত্র বিশেষ কিছুই নেই। খেয়ে এসেছেন তো?

সূর্য বললো, এখন না খেলেও চলবে। স্নানটা করা দরকার।

—না, না, খাবার দরকার হলে চৌকিদারকে এখনও বলে দিন। খাবার আনিয়ে দেবে। আপনার কি বিজনেস আছে, না সরকারী কাজ?

কথাবার্তা হচ্ছিল ইংরেজিতেই। যুবকটির ইংরেজি নির্ভুল নয়, তবু সে অনর্গল কথা বলে যেতে পারে, ক্রিয়াপদ বা অব্যয়ের নির্ভুল ব্যবহার নিয়ে মাথা ঘামায় না।

সূর্য বললো, না আমি বেড়াতে এসেছি।

যুবকটি একটু অবাক হয়ে সূর্যর মুখের দিকে তাকালো। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলো, যাস্ট ফর সাইট সিয়িং? অ্যালোন?

—হ্যাঁ।

যুবকটি একটু হাসলো। তারপর বললো, এত গরমে কেউ এখানে বেড়াতে আসে? বেড়াতে এসেছেন তো আগে থেকে থাকবার জায়গা ঠিক করে আসেননি? এখানে থাকবার জায়গা পাওয়ার খুবই অসুবিধে।

এই ব্যাপারটাতে সূর্যর মনে একটা অভিমান জন্মেছিল। এই শহরে সে জন্মেছে,

এক সময় এখানে তার বাবার যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি ছিল, আর এখন এখানে সে একটু থাকবার জায়গাও পাচ্ছিল না।

সূর্য বললো, এই সময় কেউ বেড়াতে আসে না, তবু হোটেল ডাক বাংলোয় এত ভিড় কেন?

—আপনাকে বললাম না, মধ্য প্রদেশের দুজন মন্ত্রী এসেছেন, সেই সঙ্গে অনেক গভর্নমেণ্ট অফিসার—আমি তো একমাস আগে রিজার্ভেশান করিয়ে রেখেছিলাম।

ডাক বাংলোর চৌকিদার এসে দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে। যুবকটি তাকে দেখে তাড়া দিয়ে বললো, গোসলখানামে পানি লাগাও পহলে। তারপর সাহেবের জন্য খানা—

যুবকটি সূর্যর দিকে ফিরে বললে, আমাদের এখনো পরিচয় হয়নি—আমার নাম রূপলাল গুপ্তা। আমার একটা ছোটখাটো বিজনেস আছে।

সূর্য নিজের নাম জানালো।

রূপলাল বললো, ভাদুড়ি? আপনি কি শিশির ভাদুড়ির রিলেটিভ?

—না।

—ওঃ, সাচ এ গ্রেট অ্যাক্টর। এতবড় অ্যাক্টর ইণ্ডিয়াতে কেউ নেই।

—আপনি বাংলা থিয়েটার দ্যাখেন নাকি?

যুবকটি তখন বাঙলা বলতে শুরু করলো। বললো, বহুৎ, অনেক! আমি তো পড়া লিখা করেছি কলকাতায়। চিত্তারঞ্জন এভিনিউতে আমাদের বাড়ি আছে। আপনি কলিকাতায় কি কাম করেন?

সূর্য বুঝতে পারলো, যুবকটি তাকে আরও অনেক প্রশ্ন করবে। সে স্নান করার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো।

রূপলাল তারই মধ্যে শুনিয়ে দিল যে কলকাতায় তাদের অনেকদিনের ব্যবসা আছে। সে কলকাতাকে খুবই ভালোবাসে। কলকাতার মতন 'লাইফ' আর কোথাও নেই। তবে সে আর তার দাদা মধ্যপ্রদেশে নতুন একটা কারখানা শুরু করছে। সেইজন্য এখানেই এখন থাকতে হচ্ছে। গোয়ালিয়ারেও এসেছে ব্যবসার কাজে। যে মিনিস্টার দুজন এসেছেন, তাঁদের একজনকে ধরে পারমিট আদায় করতে হবে। জানেন তো, ক্যাপিটালে বসে মিনিস্টারদের মন গলানো খুব শক্ত। তবে বাইরে কোথাও গেলে তাঁরা দিলদরিয়া হয়ে যান, ঝটাকসে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেন। তারপর লেগে থাকতে পারলেই হলো। তবে আজ মিনিস্টাররা মিটিং ফিটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন, আজ কোনো কাজ হবে না, অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে আগামীকাল। আজ সে সূর্যবাবুর সঙ্গে সাইট সিয়িং-এ বেরুতে পারে। দুজনে এক সঙ্গে বেরুবার সুবিধে এই, টাঙ্গা ভাড়া ভাগাভাগি করে দেওয়া যায়।

সূর্য চুপচাপ শুনে গেল। এই বাক্যবাগীশ ছেলেটির সঙ্গে যদি এক ঘরে কাটাতে হয়, তাহলে কালকেই সে গোয়ালিয়ার ছেড়ে চলে যাবে। টাঙ্গা ভাড়া বাঁচাবার জন্য অন্য কারুর সঙ্গে একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছেও তার নেই।

স্নান করে এসে সূর্য চুল আঁচড়াচ্ছে, রূপলাল তার মধ্যেই ভ্রমণের সূচী বানিয়ে ফেলেছে। সে আগে গোয়ালিয়ার দুতিনবার এসেছে অবশ্য, বিশেষ কিছুই দেখেনি।

সে জিজ্ঞেস করলো, আপনি আগে ফোর্ট দেখতে যাবেন নিশ্চয়। ঐটাই তো আসল দেখবার। গুহারী মহলের কাছে তার চেনাজানা একজনের একটা দোকান আছে। তার সঙ্গেও দেখা হয়ে যাবে। এ ছাড়া সূর্য যদি জয়বিলাস আর মতিমহলে

গেছে যায়—

সূর্য বললো, আমি আজ আর বেরুবো না ভাবছি। শরীরটা ভালো নেই। আজ শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম নেবো।

রূপলাল একটু নিরাশ হয়ে গেল। তবিয়ৎ ভালো নেই! কি হয়েছে বলুক না সূর্য! তার কাছে অনেক রকম ওষুধ আছে।

—ওষুধের দরকার নেই। এমনিই শুয়ে থাকবো।

রূপলাল বললো, তাহলে আমিই বা কোথায় ঘোরাঘুরি করতে যাবো? আমিও শুয়েই থাকি!

চৌকিদারকে দিয়ে কিছু খাবার আনিয়ে সূর্য খেয়ে নিল। তারপর নিজের খাটে শুয়ে পড়ে চোখের সামনে মেলে ধরলো একটা বই। রূপলাল টুকিটাকি আরও দু-একটা প্রশ্ন চালালো। তারপর ঘুমিয়ে পড়লো হঠাৎ। বোঝা যায়, সে বেশ সুখী লোক, তার ইচ্ছাঘুম। সূর্যর কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে তার ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হলো না।

দুপুরে ঘুমোনো অভ্যেস নেই সূর্যর। রেলের স্টল থেকে কেনা গ্রেহাম গ্রীনের উপন্যাসটায় সে বেশ রস পেয়ে গেল। পড়তে লাগলো গভীর মনোযোগ দিয়ে। ঝিমঝিম গ্রীষ্মের দুপুর। মাঝে মাঝে শোনা যায় কাকের শুকনো গলার ডাক।

বিশ কিছুক্ষণ পর বাইরের একটা সোরগোলে সূর্যর চমক ভাঙলো। এটা ঠিক বিপদের গোলমাল নয়, অন্যরকম। বই মুড়ে রেখে সূর্য ডাকবাংলোর বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। রূপলালও ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে।

একটা বিরাট মিছিল বেরিয়েছে। তেরঙা ঝাণ্ডা ও ফেস্টুন নিয়ে শ্লোগান দিচ্ছে একদল লোক, তাদের ফিটফাট পোশাক ও মাথায় গান্ধী টুপি, মিছিলের বাদ বাকি লোকেদের চেহারা ও পোশাক মলিন, খালি পা, তারা বন্দেমাতরম শব্দটার অর্থও জানে না, তবু যন্ত্রের মতন গলা মেলায়।

মিছিলের মাঝখানে দুটি মোটর গাড়িতে শুভ্র খদ্দরের পোশাক পরা দুজন স্থূলকায় ব্যক্তি, এঁদেরও মাথায় গান্ধী টুপি, গলায় প্রচুর মালা, হাত জোড় করে দু'পাশের জনতার দিকে নমস্কার জানিয়ে বিগলিত হাস্য বিতরণ করছেন।

রূপলাল বললো, জুলুস বেরিয়ে গেছে, আজ বিকালে খুব বড় মিটিং আছে।

তারপর সে খুব উত্তেজিতভাবে মোটরগাড়ির আরোহী বিশিষ্ট ব্যক্তি দুজনের মধ্যে একজনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, ঐ যে দেখছেন, উনিই হচ্ছেন শ্রীবাস্তবজী। আবগারি মন্ত্রী—কাল উনার সঙ্গেই আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে! পারমিট যদি মিলে যায়—

সূর্য মুখ ফিরিয়ে রূপলালকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার কিসের ব্যবসা?

রূপলাল বললো, মদ। ভোপালে একটি বিয়ার তৈরির কারখানা যদি খুলতে পারি—

সূর্য আবার জিজ্ঞেস করলো, আজ কিসের মিটিং?

—আজ তো আগস্ট দিবস আছে। সেই মিটিং—

—আগস্ট দিবস মানে?

—আজ কত তারিখ আপনার খেয়াল নেই? আজ ৯ই আগস্ট—ফর্টি টুতে যে আগস্ট মুভমেণ্ট শুরু হয়েছিল না—

সূর্য সামান্য একটু চমকে উঠেছিল। তারপরই তার মুখের চেহারা খানিকটা

বদলে গেল। কোনো কারণ নেই, তবু বেশ রাগ হলো তার। আগস্ট আন্দোলন উপলক্ষে এইরকম একটা মিছিল তার মনে হলো অতি কদর্য। যেন ঐ আন্দোলনটা সূর্যর একেবারেই নিজস্ব, অন্য কারুর এ ব্যাপারে কোনো অধিকার নেই।

সে রাগতভাবে জিজ্ঞেস করলো, আগস্ট দিবসে আবগারির মন্ত্রী কি বলবেন?

—বাঃ, আপনি শ্রীবাস্তবজীর কথা জানেন না? সাতারাতে উনি সেই সময় যা লড়েছিলেন—

হয়তো সাতারাতে শ্রীবাস্তবজী সত্যিই খুব বীরত্বের সংগে লড়াই করেছিলেন বেয়াল্লিশ সালে। আজ স্থূল চেহারায় গান্ধী টুপি পরে আবগারি মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করে তিনি সেইসব দিনের স্মৃতি নিয়ে আজ একটা জ্বালাময়ী বক্তৃতা না দিয়ে ছাড়বেন না মনে হয়।

সূর্য হঠাৎ বললো, মিটিংটা কোথায় হবে? আমি শুনতে যাবো।

রূপলাল এক গাল হেসে বললো, বাঙালীরা বক্তৃতা শুনতে বড্ড ভালোবাসে। চলুন, আমিও যাচ্ছি আপনার সংগে।

ঘরে ফিরে এসে সূর্য দ্রুত পোশাক পাল্টাতে লাগলো। চুলে চিরুনি বসিয়ে বুঝলো, বেশ শক্ত হয়ে গেছে চুল, সহজে আঁচড়ানো যায় না। তা ছাড়া চুল আঁচড়াবার জন্য ডান হাতখানা উঁচু করতে গেলেই কাঁধের কাছে খচ করে লাগে। জলপাইগুড়িতে তাকে যে মেরেছিল তার ব্যথার রেশ এখনো রয়ে গেছে। দেশের স্বাধীনতা এবং দীপ্তিদি—এই দুটি কারণে সে দুবার মার খেয়েছে, এই দুটিই তার জীবন থেকে অনেক দূরে এখন। দীপ্তিদি তাঁর লেখা চিঠি সূর্যর কাছ থেকে ফেরৎ চেয়েছিলেন, স্বাধীনতার যুদ্ধ সূর্যর কাছ থেকে আগেই সব কিছু ফেরৎ নিয়ে নিয়েছে।

সূর্য কঠিন মুখ করে রূপলালকে বললো, চলুন।

সূর্য একা থাকতে অভ্যস্ত, সে একাই শহরে বেরুতে চেয়েছিল, কিন্তু রূপলাল তার সংগ ছাড়বে না। ছেলেটির মধ্যে আকর্ষণীয় কিছু নেই, অথচ খুব একটা বিরক্তিকরও বলা যায় না। কথার মাঝখানে হঠাৎ অদ্ভুতভাবে হাসে, তখন তার মুখে একটা সরল সৌন্দর্য আসে। সূর্যর মতন একজন গোমরামুখো ছেলের প্রতি কেন যে সে আকৃষ্ট হলো, বোঝাই যায় না। রূপলাল টাকা তৈরি করার জগতের একটা অংশ এবং সে সেই আনন্দেই মশগুল।

স্টেশন ছাড়িয়ে বিরাট চওড়া রাস্তা। এই ঐতিহাসিক পুরোনো শহরটিতে ঐশ্বর্য এবং দারিদ্র খুব সহজভাবেই পাশাপাশি অবস্থান করে আছে।

মিছিলটি একটু আগে চলে গেছে এই রাস্তা দিয়ে। সূর্য আর রূপলাল হাঁটতে হাঁটতে চলে এলো ময়দানে। মিটিং-এ যথেষ্ট জনসমাগম হয়েছে। সেটা আগস্ট দিবস বলে নয়, মন্ত্রী দুজনের আগমনের কারণে। মন্ত্রীরা এরই মধ্যে বেশ দ্রষ্টব্য বিষয়। মাত্র চার বছর আগে, দেশ যখন পরাধীন ছিল, তখন এই সব মন্ত্রীরা ছিল ছোটখাটো জননেতা, তখন এই সব রাস্তা দিয়েই তাঁরা কত বার পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়িয়েছেন। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে দু' দণ্ড কথা বলেছেন চেনা জানা লোকদের সংগে। এখন মন্ত্রী হবার পর তাঁরা আর পায়ে হেঁটে রাস্তা দিয়ে যান না কখনো। ব্রিটিশ রাজ-পুরুষদের কায়দাতেই তাঁরা নিজেদের আলাদা করে দূরে সরিয়ে রেখেছেন জনতা থেকে। বাইরে বেরুবার সময় পুলিস পাহারা থাকে।

এখানকার মানুষ কলকাতার মতন সভা-সমিতিতে খুব একটা অভিজ্ঞ নয়। সভার

রীতিমতন বিশৃঙ্খলা। মঞ্চের ওপর শুরু হয়েছে উদ্বোধন সংগীত, ওদিকে বিভিন্ন জায়গায় গোলমাল চলছে, অনবরত হুইসল বাজাচ্ছে টুপী পরা স্বেচ্ছাসেবকরা।

সূর্য ভিড়ের একেবারে পেছন দিকে এসে দাঁড়ালো। সে যথেষ্ট লম্বা, তার দেখতে কোনো অসুবিধে হয় না, কিন্তু রূপলাল ঠিক দেখতে পাচ্ছে না, তাকে আঙুলের ভর দিয়ে উঁচু হতে হচ্ছে।

স্বাধীনতার পর সূর্য এই প্রথম কোনো মিটিং শুনতে এলো। আগস্ট আন্দোলনের কথাতেই সে একটু উত্তেজিত বোধ করছে—অনেক রকমের স্মৃতি আসে, শরীরের মধ্যে একটা শিরশিরে ভাব হয়।

জেলা কংগ্রেসের সভাপতি প্রথমে সংক্ষেপে দু' চার কথায় তাঁর বক্তব্য সারলেন। মাননীয় দুজন মন্ত্রীর প্রসঙ্গেই তিনি বেশী বললেন। তিনি বুদ্ধিমান, তিনি বুঝেছেন, আজ তাঁর কথা এখানে কেউ বেশীক্ষণ শুনবে না—মন্ত্রিদ্বয়ই প্রধান আকর্ষণ। ব্রিটিশ রাজত্বের রেশ এখনো যায়নি, যাদের হুকুমে রাস্তায় পুলিস নামে, দোকানপাট খোলা থাকে কিংবা বন্ধ হয়, কলমের খোঁচায় চাকরি হয় কিংবা চাকরি যায়—তারা এখন আর সাহেব নয়, আমাদেরই মতন মানুষ—তবু দেখলে সমীহ জাগে।

প্রথমে বলতে উঠলেন, আবগারী মন্ত্রী শ্রীবাস্তবজী। বিশাল চেহারা, শুভ্র খদ্দরের পোশাক পরা, মাথায় গান্ধী টুপী। মুখখানা গম্ভীর। প্রথমেই তিনি বললেন, আজ আমার মনে পড়ছে—সেই সব সহকর্মীর কথা, যাঁদের আত্মত্যাগের মূলে এসেছে এই স্বাধীনতা। সেই সব শহীদদের স্মরণে আমরা দু' মিনিট নীরবতা পালন করবো।

এই বলেই শ্রীবাস্তবজী চোখ বুজলেন। অনেকে দেখা দেখি চোখ বুজে চুপ করলো। অনেকে তাঁর কথা শুনতে পায়নি বলে তখনও গোলমাল করছে আর ভলান্টিয়াররা বলছে, চুপ, চুপ!

সূর্য চুপ করে রইলো কিন্তু যোগানন্দ ছাড়া আর কারুর কথা তার মনে পড়লো না। যোগানন্দকে কি শহীদ বলা যায়? পথের কুকুরের মতন সে রাস্তায় মরে পড়েছিল, তার কোনো বন্ধু বা আত্মীয় তার কাছে যায়নি। পুলিসের মুর্দফরাস এসে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গিয়েছিল দেহটা। বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ যোগানন্দ, দেশের জন্য প্রাণ দিতেই চেয়েছিল, তবু মৃত্যু এসেছিল অতর্কিতে। সূর্য তাকে ফেলে পালিয়েছিল। কোনো ইতিহাসের পাতায় তার নামটাও থাকবে না। কেন সে প্রাণটা দিতে গেল?

যোগানন্দর স্ত্রী শ্যামলীর কথাও মনে পড়লো একবার। সূর্যর সঙ্গে আর কোনো দিন তার দেখা হয় নি। কিভাবে সে যোগানন্দর মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিল কে জানে! শ্যামলী ছিল একটু গম্ভীর ধরনের, যেন একটু অহংকারী, কিন্তু হঠাৎ যখন হাসতো, অন্যরকম হয়ে যেত তার মুখ। শ্যামলী কি সহ্য করতে পেরেছে? সূর্য নিজেকে অপরাধী বোধ করে।

নীরবতা ভাঙার পর মন্ত্রী মহোদয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আজ এই পুণ্য দিনে আমি এখানে যে আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে পেরেছি, সে জন্য নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই এলাকার যে বিপ্লবী ঐতিহ্য আছে...

সূর্য অবাক হয়ে ভাবলো, বেয়াল্লিশের সময় গোয়ালিয়রে কি কিছু হয়েছিল? সে তো শোনেনি। সে সাতনার কথা শুনেছিল বটে। একটু পরেই বুঝতে পারলো, শ্রীবাস্তজী বলছেন ১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধের কথা। তিনি অতদূর থেকে শুরু করেছেন।

শ্রীবাস্তবজীকে ঠিক মেঠো বক্তা বলা চলে না। গরম গরম বুলি ছাড়ার দিকে তাঁর ঝোঁক নেই। ধীর স্থির ভাবে তিনি ইতিহাস আলোচনা করতে শুরু করলেন, অবশ্য একদেশদর্শী ইতিহাস।

মন্ত্রীটিকে বেশ সৎ বলেই মনে হয়। এই লোকটিকে যেন আবগারি বিভাগের মন্ত্রী পদে ঠিক মানায় না। বোধ হয় আর কোনো দপ্তর খালি ছিল না।

ময়দানের মিটিং-এ এরকম মাস্টারমশাই সুলভ বক্তৃতা কেউ বেশীক্ষণ শুনতে চায় না—একটু পরেই এদিক-ওদিক থেকে গুঞ্জন শুরু হলো। রূপলাল কিন্তু খুব মুগ্ধভাবে শুনছে, এই আবগারি মন্ত্রীর কাছে কাল তার পারমিট আনতে যাওয়ার কথা আছে।

শ্রীবাস্তবজী বেয়াল্লিশের আন্দোলনের বিষয় মাত্র দু'-তিন লাইনে সেরে দিলেন। শুধু জানালেন যে, ঐ সময় তিনি নেহরুজীর সঙ্গে এক জেলে ছিলেন। জেলের ভেতরে থেকে তাঁরা তখন বুঝতেই পারেননি যে, বাইরে এক শ্রেণীর লোক হিংস্র হয়ে উঠে গান্ধীজীর প্রোগ্রাম বানচাল করে দিতে চলেছে। যাই হোক, গান্ধীজী যে স্বাধীনতা আমাদের হাতে দিয়ে গেছেন, তাকে রক্ষা করতে হবে...

কে যেন কি একটা প্রশ্ন করলো চেঁচিয়ে, ঠিক বোঝা গেল না। অমনি খানিকটা গোলমাল শুরু হলো। তারপর দেখা গেল, খাকী পোশাকপরা প্রৌঢ় মতন একজন লোক মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, স্বেচ্ছাসেবকরা জাপ্টে ধরে ফেললে তাকে। খাকী পোশাকপরা লোকটির একটা হাত কনুইয়ের কাছ থেকে কাটা, সে হাউ হাউ করে কাঁদছে আর কি যেন বলতে চাইছে।

শ্রীবাস্তবজী উর্দু মেশানো হিন্দীতে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, সূর্য মোটামুটি বুঝতে পারছিল। খাকী পোশাক পরা লোকটার কথা সে কিছুতেই বুঝতে পারলো না। লোকটা কি পাগল?

সে রূপলালকে জিজ্ঞেস করলো, ব্যাপারটা কি?

রূপলাল বললো, ও লোকটা বলছে, ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সেপাই ছিল। এখন খেতে পায় না। কিছু একটা কাজ চাইছে।

সূর্য হেসে বললো, শ্রীবাস্তবজী তো আজাদ হিন্দ ফৌজের নাম উল্লেখ করেননি। সেই জন্য, ওঁর কোনো দায়িত্ব নেই।

রূপলাল বললো, নেতাজী যখন ফিরে আসবেন, তখন দেখে নেবেন এক হাত!

—ফিরে আসবার কথা আছে নাকি?

—আলবাৎ। তিনি ফিরে এসে যদি তাঁর সব পুরোনো সেপাইদের নিয়ে আবার দল তৈরি করেন, সেই জন্যই তো আজাদ হিন্দ ফৌজের কারুকে আর্মিতে নেওয়া হয়নি।

সূর্য এই অভিনব তত্ত্বটি শুনে চুপ করে গেল। ওদিকে শ্রীবাস্তবজী এবার গলা চড়ালেন। তাঁকে খানিকটা বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। তিনি বললেন, স্বাধীনতা শুধু মুখের কথা নয়, এর জন্য অনেক আত্মদান করতে হবে। প্রথমেই আমাদের রক্ষা করতে হবে গণতন্ত্র। সামনেই যে সাধারণ নির্বাচন আসছে—

পরের বক্তা, কৃষিমন্ত্রী সাকসেনাজীর কথা থেকে আরও স্পষ্ট বোঝা গেল এটা আসলে একটি নির্বাচনী সভা। কয়েক মাস পরেই ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন, তার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। বেয়াল্লিশের আন্দোলনের স্মৃতি উদ্‌যাপন নিয়ে কারুর মাথা ব্যথা নেই।

সাকসেনাজী আগের বক্তার মতন নিছক ইতিহাসের কচকচি নিয়ে সময় কাটাবার মতন ভুল করলেন না। তিনি সরাসরি নেমে পড়লেন আত্মপ্রচারে। সি শার্পের পঞ্চম সুরের নিচে তাঁর গলা নামে না কখনো। তিনি বললেন, তিনি চোদ্দ বছর বয়েসে স্কুল ছেড়ে কংগ্রেসের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। জেল খেটেছেন, পুলিসের হাতে মার খেয়েছেন, তবু মহান কংগ্রেসের আদর্শ থেকে কখনো বিচ্যুত হন নি। তিনি সব মিলিয়ে পাঁচবার জেল খেটেছেন, তার মধ্যে লাহোর জেলে যে ভয়াবহ অত্যাচার করা হয়েছিল, তার বর্ণনা শুনলে রক্ত গরম হয়ে ওঠে। তিনি নাটকীয়ভাবে বোতাম খুলে জামাটা ফাঁক করে গলার কাছে হাত দিয়ে বললেন, এইখানে, ঠিক এইখানে লোহার ডান্ডা দিয়ে আমাকে মেরেছিল, আমি তবুও বলেছি, বন্দে মাতরম! বন্দে মাতরম! যতবার মেরেছে ততবার আমি বলেছি—

সূর্যর মনে হলো, আগ্রা হোটেলের সেই মেয়ে তিনটি যেমন তাদের শরীরের রূপ-যৌবন দেখিয়ে খরিদ্দার আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল, এই ব্যক্তিটিও ঠিক সেই রকমই যেন নিজের ওপর অত্যাচার-নিপীড়নের বিবরণ দিয়ে ভোট আদায় করতে চাইছে। কেন তিনি ভোটে জিততে চাইছেন? অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে বলে এখন একটু আরাম চান? নাকি, দেশের সেবা করা একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে?

সূর্য হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তার মনে হলো, হরকুমার, ব্রজগোপাল, যোগানন্দ—এ'দের স্মৃতিকে অপমান করা হচ্ছে। সেই লোকগুলো কি মূর্খ ও নির্বোধ ছিল, তাই শুধু শুধু প্রাণ দিয়েছে? সে নিজেই বা কেন নষ্ট করলো তার প্রথম যৌবনের শ্রেষ্ঠ কয়েকটা বছর? স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে এক সময় তারা উন্মাদ হয়েছিল, এর নাম স্বাধীনতা? মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছে দুজন হোমরা-চোমরা, অদূরে পুলিসের গাড়ি পাহারায়—আর কতকগুলো ভিখিরী হাঁ করে শুনে যাচ্ছে নানারকম উদ্ভট কথা। কোটি কোটি লোক দিশেহারা হয়ে বসে আছে, দেশের কোন কাজে তারা লাগবে, তাও জানে না—তাদের সামনে আজ দেওয়া হচ্ছে মস্ত বড় একটা কাজ, ভোট দাও!

সূর্য এসব নিয়ে মাথা ঘামাতো না—কিন্তু আগস্ট আন্দোলনের স্মৃতির নাম করে এই সভা ডাকা হয়েছে বলেই তার মধ্যে জেগে উঠছে পুরোনো দিনের উত্তেজনা।

সাকসেনাজী যখন গলায় আওয়াজ আরও উঁচুতে তুলেছেন, সূর্য তখন আরও জোরে চিৎকার করে বললো, শাট্ আপ!

কিন্তু এতে বড় কিছু আলোড়ন দেখা গেল না। কয়েকজন মুণ্ড ফিরিয়ে তাকালো এদিকে। রূপলাল সূর্যর হাত চেপে ধরে বললো, এ কি করছেন?

সূর্য তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভিড় ঠেলে এগোতে যাচ্ছিল। তার মুখ এখন রক্তাভ, কপালে ঘাম জমেছে, সে আত্মবিস্মৃত। সামনে শত বাধাই থাক, সে গোঁয়ারের মতন মঞ্চের ওপর উঠে গিয়ে বক্তার কলার চেপে ধরতে চাইছিল। সে অপমানিত এবং ক্রুদ্ধ। কিন্তু সূর্যকে বেশী দূর এগোতে হলো না, এই সময়েই ময়দানের অন্য অংশ থেকে গোলমাল শোনা গেল। একদল লোক তাদের মধ্যে অধিকাংশই যুবক—উঠে দাঁড়িয়ে হইহই শুরু করেছে। তারা বলছে, তারা মন্ত্রীর বক্তৃতা শুনতে চায় না, চাকরি চায়। ওরা অনেকেই সদ্য চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়েছে।

স্বেচ্ছাসেবকরা আর কিছু জানে না, তাদের ওপর শুধু নির্দেশ আছে, কোনো গণ্ডগোল বাধলেই থামাতে হবে। স্বেচ্ছাসেবকরা ছুটে গিয়ে ওদের ঘাড় ধরে জোর করে বসিয়ে দিতে গেল। ফলে শুরু হয়ে গেল ধাক্কাধাক্কি, হুড়োহুড়ি। এই সব

ঘটনার গতি কখন কোন দিকে যাবে, তা আগে থেকে বলা শিবের বাপেরও অসাধ্য। অনেক সভায় এইরকম সামান্য গোলমাল একটুতেই থেমে যায়, অনেক সময় তাহা রক্তারক্তি পর্যন্ত পৌঁছোয়। সাকসেনাজী অদম্যভাবে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, কম্যুনিস্টরা দেশটাকে টুকরো টুকরো করতে চাইছে। তারা পাকিস্তানের সাপোর্টার। তাদের ষড়যন্ত্র আমরা বার্থ করে দেবোই। স্বাধীনতার পর কম্যুনিস্ট পার্টি ব্যান করার কথা যখন উঠেছিল, তখন আমরা তার বিরোধিতা করেছি। আমরা জনতার পাশে দাঁড়িয়ে ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করবো। আমরা—

পুলিসের লাঠি চার্জে সেই সভা শেষ হয়। আহত হয় এগারোজন, তার মধ্যে একজন সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ এবং একটি এগারো বছরের ছেলে।

সূর্য আর বেশী মাথা গরম করে নি, হঠাৎ নিজেকে সামলে নিয়েছে। বরং নিজেকেই ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছিল তার। এই সাত পাগলের মেলায় তার আসবার দরকার কি ছিল? এই নিরন্ন, বুভুক্ষু, মূর্খের দেশটা উচ্ছন্নে যাক না, তার কি আসে যায় তাতে? হরদা'র কাছে সে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল, তা শেষ হয়ে গেছে, আর কারুর কাছে তো তার মাথার দিব্যি দেওয়া নেই।

ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে সূর্য ময়দানের অন্য প্রান্তে এসে পড়েছিল, রূপলালকে হারিয়ে ফেলেছে, তাতে সে একটু নিশ্চিন্ত বোধ করে। যাক, এখন একটু একা ঘোরাফেরা করা যাবে। মিটিং-এ লাঠি চালনার ফলে রাস্তায় বেশ উত্তেজনার আবহাওয়া রয়েছে, অনেক দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে এর মধ্যেই, লাঠিসোটা হাতে কিছু মানুষও দেখা যায়। সূর্য অবশ্য সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। সে এরকম অনেক দেখেছে, সে জানে কিভাবে এড়িয়ে থাকতে হয়।

কিন্তু রূপলালকে এড়ানো গেল না। সে হঠাৎ আবার ফস করে কোথা থেকে হাজির হলো। মুখ ভর্তি হাসি নিয়ে বললো, এদিকে কোথায় যাচ্ছেন? ডাকবাংলো তো উল্টো দিকে।

সূর্য বললো, আমি একটু দানোলি বাজারের দিকে যাবো।

—সেখানে চেনা জানা কেউ আছে বুঝি?

—সেখানে একটা বাড়ি খুঁজতে হবে।

—চলুন আমিও যাই।

অগত্যা তাকে নিতেই হলো সঙ্গে। খানিকক্ষণ চুপচাপ যাবার পর সে জিজ্ঞেস করলো, হঠাৎ আপনার দেমাগ খারাপ হয়ে গেল কেন?

সূর্য কাঁধ ঝাঁকালো, কোনো উত্তর দিল না।

—আপনি পলিটিকস করেন নাকি?

এ কথার উত্তর না দিয়ে সূর্য ফস করে জিজ্ঞেস করলো আপনি তো কাল মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন?

রূপলাল থমকে দাঁড়িয়ে সূর্যর মুখের দিকে তাকিয়ে এক গাল হাসলো। তারপর বললো, মাথা খারাপ? আপনাকে নিয়ে গিয়ে আমি মরবো? আমি যাচ্ছি পারমিটের জন্য দরবার করতে—সেখানে আপনি গরম গরম বাত বলতে শুরু করবেন—

সূর্য আবার নিজের ওপর খুব বিরক্ত হয়ে উঠলো। একটু আগেই সে ঠিক করেছিল, ওদের কারুর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না, তবু সে এ কথাটা বলতে গেল কেন? রাজনীতির ভূত কি কিছুতেই ঘাড় থেকে নামবে না? না, আর ঐ চিন্তা একদম স্থান দেবে না মাথায়।

সূর্য উষ্ণ গলায় বললো, তা হলে আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন কেন?

রূপলাল বললো, আরে দাদা, আপনি রাগ করছেন কেন? আপনার লাইন আলাদা, আমার লাইন আলাদা। তা বলে কি সন্ধ্যেটা এক সঙ্গে কাটাতে পারি না? আপনি তো আমাকে মিটিং শোনালেন, এবার চলুন, আপনাকে আমি ভালো ভালো জায়গায় নিয়ে যাবো। দেখবেন, পছন্দ হয় কিনা।

॥ ৭৪ ॥

অনেকদিন বাদে সূর্যকে আজ আবার খুব অস্থির মনে হচ্ছে। তোলপাড় চলছে বুকের মধ্যে। মাঝে মাঝে শক্ত হয়ে যাচ্ছে চোয়াল, চোখের দৃষ্টি ধারালো। তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে রূপলাল কত কিছু বলে যাচ্ছে, কিছুই শুনছে না সূর্য।

সূর্যর এই অস্থিরতা কিসের জন্য? তা সে নিজেই জানে না। এক সময় সে মাঠে মাঠে ঘুরেছে, না খেয়ে থেকেছে, জেল খেটেছে, হঠাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেমে না গেলে তার ফাঁসীও হতে পারতো—কিন্তু সেই সব দিনগুলির জন্য তো তার মনে কোনো গর্ববোধ নেই। সে তো বিনিময়ে কিছু চায় নি কখনো। শুধু তার যে সব পরিচিত ব্যক্তি মারা গেছে, অজ্ঞাত থেকে গেছে, তাদের কথা মনে পড়লেই তার নিশ্বাস দ্রুত হয়ে যায়। ওরাই ছিল সূর্যর বন্ধু, আর কেউ নেই এখন। সূর্যর মনে হচ্ছে বারবার, সে নিজেও যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে।

শহীদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় দু'জন মন্ত্রী ভোট ভিক্ষা করছিল নির্লজ্জভাবে, এটা সে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। বারবার তার মনে হচ্ছে, একবার অন্তত মঞ্চে লাফিয়ে উঠে ঐ শ্রীবাস্তব আর শাক্সেনার ঘাড় ধরে একটা ঝাঁকুনি দেওয়া উচিত ছিল। পরক্ষণেই আবার ভাবছে, না, না, আমার ওসব করা উচিত নয়। ওরা যা খুশী করুক, দেশটা জাহান্নামে নিয়ে যাক। আমি একা কি করতে পারি?

সূর্য যখন প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল, তখন সে ছিল প্রায় কিশোর। অনেকখানিই ছিল জেদ আর গোঁয়ার্তুমি। এরপর অনেকগুলো বছর গেছে, বাস্তব সম্পর্কে তার জ্ঞান হয়েছে, বই টইও পড়েছে অনেক। এখন সে জানে, এই পৃথিবীতে মানুষের অধিবাসের মধ্যে কত জটিলতা। মানুষের মঙ্গলের জন্য যে সমাজ-ব্যবস্থা তৈরি হয়, সেটাই আবার এক সময় মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। দু'এক শতাব্দী পর পর মানুষকেই সেই জন্য আবার সেই সব ব্যবস্থা ভাঙতে হয়। যারা এই ভাঙার কাজে অগ্রণী হয়ে পড়ে, তাদের সহজে ফেরার পথ থাকে না। কেউ সেই পথে খানিকটা এগিয়ে আবার ছিটকে পড়লে, তার মতন নিঃস্ব আর কেউ নেই। সে কোথাও আশ্রয় পায় না।

ভারতের এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘুরতে ঘুরতে সূর্য এই কথাই টের পাচ্ছে, তার নিজস্ব কোনো জায়গা নেই। কোথাও সে মিলেমিশে থাকতে পারবে না। সে পরিত্যক্ত। অথবা, এখন তার সামনে দুটি পথ খোলা আছে। হয় সে অন্যদের আঘাত করে নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে পারে ওদের, সে ভাঙার কাজে নামতে পারে। অথবা মিশে যেতে পারে প্রতিবাদহীন গড্ডালিকার স্রোতে। এ বিষয়ে মনঃস্থির করাও সহজ কথা নয়।

রূপলাল বললো, এই তো দারোগি বাজারে এসে গেছি। আপনি কোন্ বাড়িতে থাকেন?

সূর্য দেখলো, দোকানপাট অধিকাংশই বন্ধ, পথে লোকজন কম, মাঝে মাঝে পুলিসের গাড়ি টহল দিচ্ছে।

সূর্য রূপলালের কথার কোনো উত্তর দিল না। একটা রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলো। তার কিছুই মনে নেই। কোথায় সে বাড়ি খুঁজবে?

অন্ধ যেরকম রাস্তা চিনে চিনে যায়, সূর্য সেইরকম ঘুরতে লাগলো। তারপর হঠাৎ একটা সাদা রঙের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বললো, এই যে!

বাড়িটা দোতলা, পুরোনো আমলের, সামনের দিকে এখন একটা কাপড়ের দোকান। দোকান বন্ধ, ওপর তলাটাও অন্ধকার।

রূপলাল জিজ্ঞেস করলো, এই বাড়িতে আপনার চেনা জানা কেউ থাকে?

সূর্যর এতক্ষণ কিছুই মনে পড়ছিল না, কিন্তু এখন তার কোনো সন্দেহ নেই, এই বাড়িতেই তার শৈশবের কয়েকটা বছর কেটেছে। সে চোখ বুজে বলে দিতে পারে, বাড়িটা দু' মহলা, সামনের দিকটা পার হলেই একটা সিমেন্ট বাঁধানো বড় চাতাল, তার এক পাশে একটা ইঁদারা। ইঁদারার উল্টো দিক থেকে দোতলার বাবার সিঁড়ি উঠে গেছে। ওপরে টানা বারান্দা। বারান্দার পাশে একটা ছোট ছাদ।

সূর্য অন্যমনস্কভাবে তার বাঁ হাতের কনুইতে হাত দিল। একটা গভীর কাটা দাগ, অনেক দিনের পুরোনো। সূর্য একবার ঐ ছোট ছাদটায় আছাড় খেয়ে পড়ে হাত কেটেছিল।

হঠাৎ কি করে এসব মনে পড়ে যায়? কোথায় থাকে এসব স্মৃতি? তার একথাও মনে পড়লো, একদিন সে বাবার হাত ধরে মিঞা তানসেনের সমাধি দেখতে গিয়েছিল। বাবা ওখানে প্রায়ই যেতেন, সঙ্গীতের ওপর তাঁর খুব টান ছিল।

সূর্য রূপলালকে জিজ্ঞেস করলো, তানসেনের সমাধিটা কোথায়?

রূপলাল এই যুবকটির ধরন ধারণ বুঝতে পারছে না। সে বিস্মিতভাবে বললো, সেখানে যাবেন? এখন কি টাঙ্গা মিলবে?

সূর্য বললো, না, সেখানে যাবো না। এমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম।

—এ বাড়িতে যাবেন না?

সূর্য ভাবলো, তার জন্মস্থানটি দেখে তার কি খুব রোমাঞ্চ হবার কথা ছিল? বাবা কেন এখানে আসতে বলেছিলেন? অসুখের ঘোরে প্রলাপ্ ছাড়া আর কিছুই না। এখানে এসে তার তো নতুন কিছু বোধ হচ্ছে না। সামান্য কৌতূহল ছাড়া।

তারপর মনে পড়লো, তার জন্ম তো এ বাড়িতে নয়, তার মা তো অন্য বাড়িতে থাকতেন। মা মারা যাবার পর সূর্যকে এ বাড়িতে আনা হয়। কিন্তু আগের বাড়িটা চিনে বার করা তার পক্ষে অসম্ভব, তখন সে খুবই ছোট ছিল।

সে বললো, না, এ বাড়িটা এমনি দেখতে এলাম। আচ্ছা, রূপলালজী, অনেকদিন আগে একজন মারা গেছেন, তিনি কোন্ বাড়িতে থাকতেন, সেটা কি খুঁজে বার করা যায় এখন?

রূপলাল বললো, কে?

সূর্য বললো, তাঁর নাম ছিল নাসিম আরা বানু। ডাক নাম বুলবুল। তিনি খুব নাচ গান জানতেন।

রূপলালের চোখ চকচক করে উঠলো। বললো বাঈজী?

নিজের মা সম্পর্কে এরকম পরিচয় অপরের মুখে শুনতে কারুব ভালো লাগে না। কিন্তু সূর্য বিচলিত হলো না। বললো, হ্যাঁ।

—কারুকে জিজ্ঞেস করে দেখলে হয়।

—সেটা এ পাড়ায় নয়। বোধহয় জনকগঞ্জের দিকে।

—আমি বাঈজীপাড়া চিনি। যাবেন সেখানে?

—চলুন।

এ ব্যাপারে রূপলালের খুব উৎসাহ দেখা গেল। সে সূর্যকে নিয়ে চলে এলো অন্য একটা রাস্তায়। নিচু গলায় বললো, যে মারা গেছে তার খোঁজ নিয়ে কি হবে? আমার চেনা জানা দু'একজন বাঈজী আছে, গান টান শুনবেন? গোয়ালিয়ার ঘরানার গান বড় মিষ্টি।

একটা বাড়ির সামনে একজন মোটা মতন লোক দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ম চোখে রাস্তার দিকে নজর রাখছিল। রূপলাল তাকে কি যেন জিজ্ঞেস করলো। সে আবার রূপলালকে নিয়ে গেল অন্য কয়েকজনের কাছে। অনেক রকম কথা বলাবলি হলো। রূপলাল ফিরে এসে সূর্যকে বললো, না. এরা ও নামে কারুকে চেনে না।

সূর্য একটু হাসলো। সে শুনেছিল, তার মায়ের রূপ এবং নৃত্য-প্রতিভার খুব খ্যাতি ছিল। একবার দেখে কেউ তাকে ভুলতে পারতো না। মৃত্যুর পঁচিশ বছর পর এখানকার কেউ তাকে মনে রাখে নি। সূর্যর ইচ্ছে হচ্ছে, তার মায়ের সমাধির জায়গাটা একবার দেখে আসতে। মায়ের মুখখানাও তার মনে নেই।

সে রূপলালকে অনুরোধ করলো, আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করুন। পুরোনো লোকেরা বোধহয় চিনতে পারবে।

এদিক ওদিক ঘুরে কয়েক জায়গায় খোঁজখবর নেওয়া হলো। কেউ কিছু জানে না, মৃত নর্তকীর সম্পর্কে কেউ উৎসাহই দেখাতে চায় না।

একজন শুধু বললো, আপনারা বুলবুলের কথা বলছেন তো? আমি জানি—আসুন, আমি বাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছি।

লোকটি খুব রোগা এবং লম্বা। মুখখানা ভয়-পাওয়া মানুষের মতন। হাঁটবার সময় বারবার পেছন ফিরে তাকায়। লোকটির বয়েস বছর পঞ্চাশেক, এ হয়তো জানতেও পারে।

লোকটি ওদের নিয়ে একটা মস্ত বড় বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো। ভেতরটা ঘুট-ঘুটে অন্ধকার। সূর্য তার স্মৃতিকে মুচড়ে মনে করবার চেষ্টা করলো, এই বাড়িতেই সে জন্মেছিল কিনা। কিছুই মনে পড়ছে না।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে ওরা উঠে এলো দোতলায়। কয়েকটা ঘরের ভেজানো দরজা থেকে সরু আলো দেখা যাচ্ছে এখন, ভেতরে হার্মোনিয়াম ও ঘুঙুরের শব্দ।

একটা ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল লোকটা। ঝলমলে শালোয়ার কামিজ পরা একটি যুবতী মেয়ে দরজা খুলে বললো, কি?

রোগা লোকটা বললো, মেহমান এসেছে।

রূপলাল হেসে বললো, জিন্দা বুলবুলের কাছে নিয়ে এসেছে। আপনার নাম বুলবুল বুঝি?

মেয়েটি হেসে বললো, জী।

রূপলাল কৌতুকের সঙ্গে সূর্যকে দেখিয়ে বললো, আমার এই দোস্ত আপনাকে দেখতে এসেছেন। ইনি বলছেন, ইনি আপনাকে চেনেন।

মেয়েটি সূর্যর হাত ধরে বললো, আমিও তো অনেকদিন ধরে এঁকে চিনি। আইয়ে, অন্দর আইয়ে।

সূর্য একবার তাকালো মেয়েটির হাতের দিকে। মেয়েটি বিনা দ্বিধায় তার হাত ধরেছে। সূর্য হাত ছাড়িয়ে নিতে পারে। নিল না। মুখ তুলে মেয়েটির চোখের দিকে দৃষ্টি রাখলো। ঝকঝকে দুটি চোখ। গভীর ভুরু। মসৃণ কপাল। কানের লতির পাশে ঢেউ খেলানো দুই গুচ্ছ চুল। শিশুর মতন চিবুক। চিবুকটা সত্যিই বড় সুন্দর। হাত ছোঁয়াতে ইচ্ছে করে।

মেয়েটি রহস্যময়ভাবে হেসে বললো, পরদেশী, আমায় চিনতে পারছেন না? আমার নাম বুলবুল।

সূর্যও হেসে বললো, হ্যাঁ, চিনতে পারছি।

ঘরটি বেশ বড়। মেঝেতে ফরাস পাতা, তার ওপর কয়েকটা লাল ভেলভেটের তাকিয়া ছড়ানো। দেয়ালে রাধাকৃষ্ণের দু-তিনটে ছবি। একটা মোটাসোটা কাবুলী বেড়াল ঘরের কোণে চুপ করে বসে ছিল, ওদের দেখে পিঠ ফুলিয়ে দাঁড়ালো। ঘরটাতে সুন্দর ধূপের গন্ধ।

বুলবুল নামের মেয়েটি সূর্যর হাত ধরে টেনে এনে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রহস্যভরা গলায় বললো, এতদিন আসোনি কেন? আমি কতদিন তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছি!

রূপলাল বললো, দেখুন, কিরকম ঠিক জায়গায় নিয়ে এলাম। মিছিমিছি এদিক ওদিক ঘুরছিলেন!

ওদের পথপ্রদর্শক লম্বা মতন লোকটি দাঁড়িয়ে ছিল দরজার কাছে। রূপলাল তাকে বখশিশ দিল পাঁচ টাকা। সে তবু সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো।

বুলবুল সূর্যর বাহুতে চাপ দিয়ে বললো, তসরীফ রাখিয়ে। কুছ পিয়েঙ্গে?

সূর্য জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম বুলবুল? তোমার ভালো নাম কি?

বুলবুল হাসিতে সারা শরীর দোলাতে লাগলো। নকল হাসি নয়। সে যখন তখন হাসতে ভালোবাসে। হাসতে হাসতেই বললো, বুলবুলের চেয়ে আবার ভালো নাম হয় নাকি? এ নাম তোমার পছন্দ হলো না? আর কি নাম চাও? আমার পাশের ঘরে থাকে পরীবানু, তাকে ডাকবো?

রূপলাল বললো, আরে না না, আমার দোস্ত্ তোমার কাছেই আসতে চেয়েছে। সারা সন্ধ্যে থেকে শুধু বুলবুল বুলবুল করছে।

সে সূর্যকে জোর করে বসালো। তারপর কোলের ওপর একটা তাকিয়া টেনে এনে বললো, গান শুনবো, নাচ দেখবো। দু' আড়াই ঘণ্টা বাদে ফেরার জন্য টাঙ্গা পাওয়া যাবে তো?

বুলবুল এবার মুখে রাগের ভাব আনলো। এটা কপট রাগ। বললো, আসতে না আসতেই যাবার কথা? তোমাদের আমি আজ সারা রাত আটকে রাখবো।

রূপলাল পকেট থেকে দশ টাকার কয়েকটা নোট বার করে বললো, কিছু আনাও টানাও।

বুলবুল জিজ্ঞেস করলো, বীয়ার? না হুইস্কি? আমি ব্রেণ্ডি ভালোবাসি।

রূপলাল বললো, ম্যায় তো দারু পিতে নেহি। এই বাঙালীবাবুকো পুছো। আমার জন্য কয়েক খিলি পান আনিয়ে দাও।

বুলবুল তখন সূর্যকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি খাবে, মেহমান?

সূর্য মাথা নেড়ে বললো কিছু না।

বুলবুল হাঁটু গেড়ে সূর্যর সামনে বসে পড়ে বললো, একদম কিছু না? একটা কিছু খাও!

সূর্যর শান্ত মুখখানা দেখলে মনে হয়, সে যেন এক নবীন সন্ন্যাসী। এক নর্তকী তার মান ভাঙাচ্ছে।

আসলে, বাইরে শান্ত ভাব দেখালেও সূর্য ভেতরে ভেতরে বিচলিত। সে তন্ন-তন্ন করে দেখছে মেয়েটিকে। মেয়েটির রূপের আকর্ষণ আছে, সূর্যর রূপ-পিপাসু মনটা জেগে উঠেছে। মেয়েটির চড়া লাল রঙের পোশাক, অভ্রের গুঁড়ো মাখা মুখ, রক্তবর্ণ আঙুলের নোখ, সব মিলিয়ে একটা ঝকমকে ব্যাপার। চোখের পাতায় ঘন করে আঁকা সুর্মা, ধারালো নাক, টুকটুকে ঠোঁট, গলায় একটা রঙিন পুঁথির মালা, কাচুলি বাঁধা বুক বড় বেশী উদ্ধত, সরু কোমর ও ভারী নিতম্ব, পায়ে রুপোর মল। একে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিতেই ইচ্ছে করে।

বুলবুল লম্বা লোকটাকে কি সব আনতে দিয়ে আবার এসে সূর্যর কাছে বসলো। এবার অভিমান দেখিয়ে বললো, তুমি কোনো কথা বলছো না কেন?

রূপলাল বললো, তুমি একটা নাচ দেখাও। তখন মেজাজ সরীফ হবে।

বুলবুল বললো, তবলচিকে খবর পাঠিয়েছি। সে আসুক।

রূপলাল বললো, না, না, তবলচির কোনো জরুরৎ নেই। তুমি এমনিই নাচ দেখাও। কিংবা একটা গানা শুরু করো!

—তবলচি ছাড়া আমি নাচতেও পারি না, গাইতেও পারি না।

—ঘরে অন্য লোক আমার ভালো লাগে না। গুন গুন করে একটা গান করো। কিংবা তবলা দাও, আমি ঠেকা দিতে জানি। কাজ চলে যাবে।

—দাঁড়াও, ব্যস্ত হচ্ছো কেন? আগে পান টান আসুক। কি গো মেহমান, তোমার কি পছন্দ বললে না?

সূর্য এবার ধীরে ধীরে বললো, তুমি নাচ দেখিয়ে কিংবা গান শুনিয়ে টাকা নাও, তাই না? লোকে টাকা খরচ করে তোমার রূপ দেখতে আসে। তোমার রূপের দাম কত?

বুলবুল আবার হাসিতে গড়িয়ে পড়লো। বললো, কি অদ্ভুত কথা শোন! রূপের আবার দাম! আমার রূপের কিম্মৎ দশ জুতি। যাবার সময় আমাকে দশ ঘা জুতো মেরে যেও, তা হলেই হবে।

সূর্য এরকম হেঁয়ালির কথার মানে বুঝতে পারলো না। বললো, না, তুমি তো সত্যিই সুন্দর। টাকা না নিলে তোমার চলবে কেন?

রূপলাল বললো, আরে দোস্ত, ওরকম ভাবে টাকার কথা বলতে নেই। যাবার সময় ওকে খুশী করে গেলেই হবে।

সূর্য একটা বিরক্তির মুখভঙ্গি করলো। সে তো দরদাম করতে চাইছে না, সে জানতে চাইছে।

বুলবুল বললো, আমি আবার সুন্দর নাকি? কেউ বলে না। এই দেখো না, আমার গালে বসন্তের দাগ!

ঘন প্রসাধনের জন্য আগে দেখা যায় নি। এবার সূর্য লক্ষ্য করলো, সত্যিই বুলবুলের গালে কয়েকটা বসন্তের দাগ আছে। কিন্তু এর জন্য তার রূপের তো কোনো হানি হয় নি। এর মুখে একটা সারল্য আছে। নিত্য নতুন অচেনা লোকদের

মনোরঞ্জন করে, কত রকম মিথ্যে কথা বলতে হয়। তবু মনে এই ধারণা থাকে কি করে? এখনও কেউ এসে নতুন করে একে ভালোবাসতে পারে। সেই ভালোবাসার স্বাদ কি রকম?

বড় রেকাবির ওপরে দশ বারো খিলি পান। তার থেকে এক খিলি পান নিয়ে মুখে পুরে দিয়ে রূপলাল বললো, একটা গান শোনাও। একটা বেশ মিঠে ঠুংরি ধরো তো!

বুলবুল তাকালো সূর্যর মুখের দিকে। সূর্য দু-হাত পেছনে হেলান দিয়ে বসে আছে, চোখ বুলবুলের দিকে স্থির নিবদ্ধ। যেন সে কোনো মানুষকে দেখছে না, দেখছে একটা সুন্দর মূর্তি।

রূপলালের অনুরোধ সত্ত্বেও বুলবুল সূর্যকে জিজ্ঞেস করলো, কি গান গাইবো?

সূর্য মুখে কিছু না বলে মাথা নাড়লো।

বুলবুল বেশ নিচু গলায় গান ধরলো:

বৈঠি শোঁচে ব্রিজবাম
নাহি আয়ে ঘনশ্যাম
ঘোর আই বদরিয়া...

গানের কথা সামান্যই, লাইনগুলো ঘুরে ঘুরে আসে, কণ্ঠস্বর মুচড়ে মুচড়ে প্রণয় ও বেদনার সুর উচ্ছ্বসিত হয়। রূপলাল অনবরত মাথা দোলায় এবং সমের মুখে এসে হাঁটুতে চাপড় দেয়। সূর্য সংগীতের রস তেমন বোঝে না, সে গানের বদলে গায়িকার দিকে সমস্ত মনোযোগ দিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

গানের শেষে রূপলাল আহা-হা-হা শব্দ তুলে প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে। বুলবুল সূর্যর থুতনিতে হাত দিয়ে বললো, কি, তোমার কেমন লাগলো?

সূর্য সংক্ষিপ্তভাবে জানালো, ভালো।

বুলবুল হেসে বললো, আমি গান গাইতে জানিই না। লোকে আমার নাচ দেখতে আসে।

সূর্য বুঝতে পারলো, এইটিই বুলবুলের বৈশিষ্ট্য। তার রূপের প্রশংসা করলে সে বলবে যে সে সুন্দরী নয়। তার গানের প্রশংসা করলে সে বলবে, গান জানে না।

সূর্য বললো, তাহলে এবার নাচ দেখাও!

—তাও কি তোমার পছন্দ হবে? তুমি যা গম্ভীর!

বুলবুল দুটি গেলাসে ব্র্যান্ডি ঢেলে একটা এগিয়ে দিল সূর্যর দিকে। সূর্য বললো, আমার জন্য দরকার নেই।

বুলবুল মিনতি করে বললো, একটুখানি! আমার জন্য!

রূপলাল বললো, খান না। একটু খেয়ে দেখুন।

সূর্য রূপলালের দিকে তাকালো। রূপলাল মনের বাসনা করে, কাল সে পারমিট আদায় করতে যাবে মন্ত্রীর কাছে। কিন্তু সে নিজে মদ খায় না, অন্যদের পেড়াপিড়ি করে।

সূর্য ওদের সঙ্গে তর্ক করলো না। গেলাসটা পাশে সরিয়ে রাখলো। কিছুক্ষণ আগে তার মাথার মধ্যে যে ঝড় বইছিল, এখন তা থেমে গেছে। এখন তার ভালো লাগছে।

বুলবুল অনেকখানি নিট ব্র্যান্ডি এক চুমুকে খেয়ে উঠে দাঁড়ালো। দু'পা জোড়

ঝরা নূপুরের ঝংকার তুললো একবার। তারপর রাগতভাবে বললো, তবলিয়া ছাড়া নাচ হয়? তোমরা কেমন লোক গো!

রূপলাল ঘরের কোণ থেকে বাঁয়া তবলা জোড়া নিয়ে এসে বললো, আমি তাল দিচ্ছি, তুমি ধরো না।

তবলার চাঁটি দিয়ে রূপলাল দেখলো, ঠিক মতন বাঁধা নেই। সুরে লাগছে না। খানিকটা হাতুড়ি ঠোকাঠুকি করে সে যখন আর কয়েকবার আওয়াজ তুললো, তখন বোঝা গেল সে একেবারে অনভিজ্ঞ নয়, মোটামুটি কয়েকটা বোল তুলতে পারে।

বুলবুল একটু দূরে সরে গিয়ে হাত দুটো নিজের বুকের কাছে জোড় করে দাঁড়ালো। পা দুটো পর্যায়ক্রমে ঠুকলো কয়েকবার। তারপর খুব ধীর লয়ে নাচ শুরু করলো।

সূর্যর মনে হলো, ঘরটা যেন কিরকম ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। নাচের সময় ঘর ভর্তি লোক থাকবে, মাইফেলে যেরকম থাকে, এদিক ওদিক থেকে সবাই তারিফ করবে, তাহলেই যেন নাচ ঠিক জমে।

পরক্ষণেই তার মনে হলো, এ ঘরে রূপলাল এখন না থাকলেই ভালো হতো। শুধু সে একা যদি বুলবুলের নাচ দেখতো, তা হলে ব্যাপারটা অন্যরকম হতে পারতো। তবলা ছাড়া নাচ হয় না এ আবার কি অদ্ভুত নিয়ম।

সে তাকিয়ে রইলো বুলবুলের মুখের দিকে। মুখটা এখন অন্যরকম। এই ব্যাপারটা সূর্য আগেও লক্ষ্য করেছে। কোনো শিল্পী যখন তার নিজস্ব শিল্পের মধ্যে ডুবে যায়, তখন তাকে অন্য মানুষের মতন দেখায়। সেই মুখখানা চেনা কারুর মতন নয়।

বুলবুলের হাত ও পা ধারালো অস্ত্রের মতন চতুর্দিকে সঞ্চালিত হচ্ছে। তার শরীরে এখন অনেক তরঙ্গ। বস্তুত, রেখা ও রং এবং সুর ও তালের ঝাপটা ঝাপটির মধ্যে মেয়েটি যেন কোথায় আড়ালে পড়ে গেছে। বুলবুলকে আর দেখা যাচ্ছে না। তার উড়ন্ত গোল ঘাঘরাটিকে মাঝে মাঝে দেখাচ্ছে একটা বিরাট ফুলের মতন।

নাচতে নাচতে বুলবুল যখন দু' একবার রূপলালের মুখের কাছে হাত কিংবা শরীর আনছে, রূপলাল মাথা হেলিয়ে সরে যাচ্ছে। সূর্য লক্ষ্য করলো, রূপলাল প্রত্যেকবারই খুব সাবধানে এড়িয়ে যাচ্ছে বুলবুলের স্পর্শ। যেন সে একটা অচ্ছুত। ছেলেটি অদ্ভুত সত্যিই, সে মদ খায় না কিন্তু মদ কেনার জন্য টাকা দেয়। সে বাঈজীর নাচ দেখে ফুর্তি পায়, কিন্তু তাকে স্পর্শ করে না।

নাচ শেষ হবার পর রূপলাল বললো, ধুর, তোমার নাচের চেয়ে তোমার গানই বেশী ভালো। দ্রুত লয়ে ঠিক ছিল না!

বুলবুল অভিমান করে বললো, আমায় কেউ ভালো বলে না। আমায় কেউ পছন্দ করে না।

সূর্যর দিকে ফিরে বললো, তোমারও ভালো লাগেনি তো?

সূর্য বললো, তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে!

বুলবুল কান্না কান্না গলায় বললো, মোটেই না। আমি ঠিক জানি! তোমরা পরীবানুর কাছে যাবে? আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ঘর!

সূর্য বললো, না, কোথাও যাবো না। তুমি খুব সুন্দর।

বুলবুল গেলাশে অনেকটা ব্রান্ডি ঢেলে লম্বা চুমুক দিল। তারপর সেই এঁটো গেলাশটা সূর্যর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, খাও! আমি বলছি খাও!

সূর্য হাত দিয়ে বাধা দিয়ে বললো, কেন জোর করছো, আমি ওসব খাই না।

বুলবুল তীক্ষ্ম গলায় বললো, আমি জানি, তুমি আমায় ঘেন্না করছো।

সূর্য আহতভাবে বললো, না, তা নয়।

বুলবুল গেলাশটা তুলে ওদের দিকে ছুঁড়ে মারার ভঙ্গি করে বললো, যাও, তোমরা শরাবানুর কাছে চলে যাও! আমি কি তোমাদের ধরে রেখেছি?

এতক্ষণ বাদে সূর্য স্বচ্ছভাবে হাসলো। তারপর হাত বাড়িয়ে বললো, দাও—

সূর্য গেলাশটা নিয়ে একটা চুমুক দিল। বিষম লেগে গেল গলায়। তাই দেখে আবার হাসিতে লুটিয়ে পড়লো বুলবুল। সূর্যর উরুতে চাপড় মেরে বললো, ঠিক হয়েছে! জব্দ করেছি তো! আর খাবে?

রূপলাল হাই তুলে বললো, অনেক রাত হয়ে গেল। এবার ফিরতে হবে। চলুন ভাদুড়ীজী—

সূর্য এই সুযোগটা খুঁজছিল। মুখ তুলে বললো, আপনি যান, আমি এখানে থাকবো।

রূপলাল অবাক হয়ে বললো, এখানে থাকবেন? আর কতক্ষণ?

—তা জানি না। হয়তো অনেক দিন।

—কি বলছেন আপনি? আপনার জিনিস পত্তর।

—সে পরে ব্যবস্থা হবে।

সূর্য বুলবুলের দিকে ফিরে বললো, আমাকে তোমার কাছে থাকতে দেবে?

বুলবুল বললো, সে আপনার মর্জি!

রূপলাল আরও কিছুক্ষণ ধরে চেষ্টা করলো সূর্যকে ফিরিয়ে নেবার। ব্যর্থ হলো। অগত্যা সে উঠে পড়লো একাই চলে যাবার জন্য। বাঈজীর ঘরে রাত কাটাবার কথা সে ভাবতেই পারে না।

রূপলালকে বিদায় দিয়ে এসে বুলবুল দরজা বন্ধ করলো। তারপর বললো, আমি আজ গান গাইবো না, নাচবো না, কিছু করবো না। আমি শুধু শরাব খাবো। মেহমান, তুমি এখানে থাকতে চাইলে কেন?

সূর্য বললো, আমি অনেক খুঁজে খুঁজে তোমার কাছে এলাম। তোমাকে না পেলে আমার সব কিছু নষ্ট হয়ে যেত।

—সত্যি?

—হ্যাঁ। কাছে এসো।

বুলবুল দৌড়ে এসে সূর্যর গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তার একটু নেশা হয়েছে। অতি ব্যস্ততায় সে যেন সূর্যর ঠোঁট খুঁজে পাচ্ছে না। তার চোখ, কপাল, গাল চুমোয় ভিজিয়ে দিল।

সূর্য তাকে ধরে সামনে বসিয়ে দিয়ে বললো, শোনো, আগে তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলি।

বুলবুল পাগলাটে গলায় বললো, আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। আগে বলো, তুমি সত্যিই আমাকে খুঁজতে এসেছিলে?

—হ্যাঁ, সত্যি।

—কে বলেছে আমার কথা?

—কেউ বলেনি।

—আমি জানতাম, তুমি ঠিক একদিন আসবে। তুমি আমার ঘনশ্যাম। যদিও তোমার গায়ের রং খুব গোরা—

বুলবুল তার দুটো হাত চেপে ধরলো সূর্যর গালে। একেবারে স্নেহের দেমন মুখ! সূর্য চোখ বুজলো। কয়েক লহমার জন্য তার মনে পড়লো সেই নারীর কথা যে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। যাকে সে কোনো দিন আর দেখবে না। যে তাকে বলেছিল, তুমি যেখানেই থাকো, আমি সব সময় তোমার সঙ্গে আছি।

সূর্য চোখ খুলে আপন মনে বললো, না, সে নেই। বুলবুল আছে।

একটানে সে বুলবুলকে নিয়ে এলো নিজের বুকের ওপর।

ওড়নাটা আগেই খসে গিয়েছিল বুলবুলের গা থেকে। সূর্য ওর কাঁচুলিটা ছিঁড়ে ফেলার জন্য টানাটানি করতে লাগলো। সহজে ছেঁড়ে না। বুলবুল নিজেই সেটা খুলে ফেলে বললো, কি চাও?

সূর্য বুলবুলের নগ্ন স্তনে মুখ রেখে বললো, তোমাকে। আর কিছু না।

বুলবুল বললো, এই তো আমি। আমাকে নাও।

সূর্য বললো, তুমি আমার ওপর রাগ করবে না? আমাকে তাড়িয়ে দেবে না?

বুলবুল বললো, আমার কি ভাগ্য, তুমি এসেছো। আমায় কেউ পছন্দ করে না। আমার মুখে বসন্তের দাগ—

—তারা অন্ধ, তারা তোমাকে দেখতে পায় না। আমি তোমাকে একটু ভালো করে দেখি?

সে বুলবুলকে সোজা করে বসিয়ে তার পিঠ ও কোমরে নিজের হাত রাখলো। বুলবুলের চোখে ঈষৎ রক্তিম ছটা, সে হাতে আবার ব্র্যান্ডির গেলাশ তুলে নিয়েছে। সূর্যর মধ্যে জেগে উঠছে অসম্ভব রতি সম্ভোগের ইচ্ছে। এখন আর অন্য কিছু মনে পড়ে না।

পুনরায় বুলবুল সূর্যর কণ্ঠলগ্না হয়ে ঠোঁটে ঠোঁট ডোবালো। দীর্ঘস্থায়ী হলো চুম্বন। যেন পরস্পর জীবনী শক্তি বিনিময় করছে। বুলবুল উঠে এসে বসলো সূর্যর কোলের ওপর। সূর্য তার ঘাঘরার দড়ি খোলার জন্য হাত দিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, তোমার বয়েস কত?

বুলবুল বললো, বয়েস? একশো দুশো হবে।

সূর্য মনে মনে বললো, বুলবুলের বয়েস তিরিশের কাছাকাছি নিশ্চয়ই। ঠিক এই রকমই বয়েসে, আর একজন নর্তকী, তার নামও ছিল বুলবুল, তাকে দেখে তার বাবা আকৃষ্ট হয়েছিল। সূর্য যেন সেই একই যায়গায় ফিরে এসেছে।

বুলবুলের শরীরটা পাখির মতনই সূর্যর আলিঙ্গনের মধ্যে ছটফট করে। সূর্যর শার্টের বোতামগুলো খুলে ফেলে তার বুকে মুখ ঘষতে লাগলো বুলবুল। বুলবুলের মসৃণ খোলা পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে সূর্য জিজ্ঞেস করলো। বুলবুল, অনেক দিন আগে আর একজন বুলবুল থাকতো এখানে, সে-ও খুব ভাল নাচতো, তুমি তার নাম শুনেছো?

—না।

—তোমার মা-ও কি নর্তকী ছিল?

বুলবুল মুখ তুলে বললো, তুমি এত প্রশ্ন করছো কেন?

সূর্য তাকে আদর করে বললো, এমনিই। বলো না।

—হ্যাঁ। আমার মা কোথায় চলে গেছে!

সূর্য আপন মনে হাসলো। সে আর বুলবুল তো একই। একজন নর্তকীর ছেলে হিসেবে সে যদি এখানেই থেকে যেত, তা হলে এতদিনে সে গুন্ডা, দালাল কিংবা তবলচি হতো। কিংবা ব্যবসা করতো রূপলালের মতন। তার বদলে কতদূরে চলে গিয়েছিল সে! সেই দূরের জগৎটা বড় জ্বালা যন্ত্রণার। সে আর কোথাও যাবে না।

॥ ৭৫ ॥

আমি ভেবেছিলাম, রেণুর কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে গেলেই আমার আর বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারে বাধা থাকবে না। তারপর থেকে আমি একটু একা থাকলেই স্বপ্ন দেখি। জার্মানির পথে পথে আমি একটা ভারী ওভারকোট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দারুণ শীত। মাঝে মাঝে ফুঁ দিয়ে গরম করে নিচ্ছি হাত দুটো। আমি কথা বলছি জার্মান ভাষায়। দিনের বেলায় কাজ করি কারখানায়, রাত্তিরবেলা কলেজে ক্লাস করি। আমার বাড়ির খুব কাছেই পোস্ট অফিস। এক একদিন মাঝ রাত্তিরে আমি হেঁটে যাই চিঠি ফেলতে—যেন চিঠিখানা তক্ষুনি পোস্ট না করলে পৌঁছোতে অনেক দেরী হয়ে যাবে।

পাসপোর্টের ফর্ম আনবার পর অবশ্য দেখলাম অনেক ঝামেলা। শুধু ভাড়া জোগাড় করতে পারলেই বিদেশে যাওয়া যায় না। একজন কোনো হোমরা-চোমরা সরকারী অফিসারের সই লাগবে, না হলেই পুলিস ভেরিফিকেশান দরকার। সেটা একটা অনিশ্চিত ব্যাপার। তা ছাড়া লাগবে একজন গ্যারান্টর। আমি যদি বিদেশে হঠাৎ মারা যাই কিংবা নিঃস্ব হয়ে পড়ি, তা হলে আমার সৎকার কিংবা আমাকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব ভারতের রাষ্ট্রপতির। তিনি সে ব্যবস্থা করবেন বটে, কিন্তু খরচটা পরে আদায় করে নেবেন আমার গ্যারান্টরের কাছ থেকে। কে হবে সেই গ্যারান্টর? আমি সেরকম কারুকেই চিনি না। তা ছাড়া, আমাকে সব কিছুই করতে হবে খুব গোপনে। বাবা-মাকে আগে কিছুই জানানো চলবে না।

সারা দিন এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করি, কিন্তু কারুকেই কিছু বলতে পারি না মুখ ফুটে। কিন্তু বিদেশে না গেলে আর আমার চলবেই না। একবার যখন মাথায় ঢুকেছে, তখন শুধু মনে হচ্ছে, এইটাই আমার মুক্তির পথ।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল প্রভাস জামাইবাবুর কথা। প্রভাস জামাইবাবুরা বড়লোক, উনি অনায়াসে হতে পারেন আমার গ্যারান্টর। বড়দিকে আর জামাইবাবুকে যদি খুব করে বুঝিয়ে বলি যে বাবা-মাকে এখন কিছু না জানাতে, তা হলে শুনবে না?

কলকাতা এখন বেশ সরগরম। দেয়ালে দেয়ালে ইলেকশানের পোস্টার পড়েছে বিরাট বিরাট। স্বাধীন ভারতের প্রথম জেনারেল ইলেকশান। পৃথিবীর বিভিন্ন সংবাদপত্র সন্দেহ প্রকাশ করছে যে ভারতবর্ষে গণতন্ত্র টিঁকবে না। এশিয়ার গরীব দেশগুলোতে সামরিক শাসনই একমাত্র পথ। পাকিস্তানে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রবল। ওদিকে, চীনের মূল ভূখণ্ড লাল ফৌজের অধিকারে এসে গেছে, ইয়েনানের গুহা থেকে বেরিয়ে এসে মাও সে তুং এত বড় দেশটাকে একতাবদ্ধ করে সারা বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিয়েছেন। চীনের দারুণ সম্মান বেড়ে গেছে। ভারত থেকে কয়েকজন চীন ঘুরে এসে প্রশংসা করছেন উচ্ছ্বসিতভাবে।

তেলেঙ্গানার ব্যর্থতার পর ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার। আমার পুরোনো সহকর্মীদের অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করি। প্রায়ই স্ট্রীট কর্নার মিটিং হয়, একদিন হচ্ছিল আমাদের বাড়ির সামনেই: বক্তৃতা দিচ্ছিলেন আদিনাথদা। আদিনাথদার সঙ্গে আমার অনেকদিন কথা বন্ধ। মণ্টু কিংবা পরিতোষ—যারা লোকাল পার্টি অফিসে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু—রাস্তায় কখনো তাদের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলেও কেউ কথা বলে না আমার সঙ্গে। মুখটা ফিরিয়ে নেয়। চাপা রাগ ও অপমানে আমার শরীর জ্বলে। এক সময় কত আড্ডা দিয়েছি, কতদিন তিন কাপ চা পাঁচজনে ভাগ করে খেয়েছি, আর এখন দেখা হলে একটা সামান্য ভদ্রতার কথাও বলা চলে, না! এখন ওদের সঙ্গে রাস্তায় বেরুলেই ঘন ঘন দেখা হয়, আরও খারাপ লাগে।

তবে, একথা ঠিক, ওরা খাটছে খুব। সবাই বলে, কম্যুনিস্ট পার্টির ছেলেরা ডেডিকেটেড ওয়ার্কার। কংগ্রেস থেকে প্রচুর টাকা ছড়িয়ে ছেলে জোগাড় করছে।

এই রকম সময়ে আমার কোনো অংশ নেই বলেই আমার আরও অসহ্য লাগছিল। মার কাছে অনেক কাকুতি মিনতির পর দশটা টাকা আদায় করে চলে গেলাম বহরমপুরে বড়দির কাছে।

বড়দির শ্বশুর মারা গেছেন। সেই বিশাল একান্নবর্তী পরিবারটি আর একান্নবর্তী নেই। ভাগাভাগির পর প্রভাস জামাইবাবু বাড়িটার একটা অংশ পেয়েছেন, আলাদা সিঁড়ি। প্রভাস জামাইবাবু তিনটি বিষয়ে এম এ পরীক্ষা দেবার পর থেমেছেন, কোনো চাকরি-বাকরি করেন না, কবিতা রচনাতেও ভাটা পড়েছে, তার বদলে স্কুলের টেক্সট বই লেখেন। জমি জমা যথেষ্ট আছে, অবস্থা বেশ সচ্ছল।

বড়দির দুটি ছেলেমেয়ে হলেও চেহারার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। প্রভাস জামাই-বাবুর টাক পড়তে শুরু করেছে।

আমাকে পেয়ে বেশ খুশী হলো বড়দি। বড়বাবুর মৃত্যুর পর আর দেখা হয়নি। কয়েকটা দিন বেশ হই চই করে কাটলো। আমি আমার আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই বলিনি। দিদির বাড়িতে ভাই এমনিই বেড়াতে আসে না? বড়দি আমার আপন দিদি না হলেও নিজের দিদির চেয়েও বেশী ভাব।

সকালবেলা চায়ের টেবিলে বসেই অনেক পুরোনো গল্প শুরু হয়। যে-সময়টা চলে গেছে, মনে হয় যেন সেটাই সবচেয়ে সুখের ছিল। বড়বাবুর বাড়িতে যখন বড়দিরা আর আমরা সকলে একসঙ্গে থাকতাম, মানুষজনে সারা বাড়িটা গমগম করতো, সেই সব দিনের কথা উঠলে মনে হয়, ওরকম আনন্দ আর কখনো ফিরে আসবে না।

কথায় কথায় সূর্যদার প্রসঙ্গও আসে। সূর্যদা সম্পর্কে প্রভাস জামাইবাবুরই আগ্রহ বেশী মনে হয়। তিনি বারবার বলতে লাগলেন, ছেলেটি অদ্ভুত, ছেলেটি অদ্ভুত, ঐ সব ছেলে সাংঘাতিক কাণ্ডকারখানা ছাড়া বাঁচতে পারে না! চোখ দুটো লক্ষ্য করেছো, মোটেই স্বাভাবিক মানুষের মতন নয়।

বড়দি হাসতে হাসতে বলে, বাদল, তোর মনে আছে, সূর্যদাকে আমরা যখন প্রথম দেখি, কি রকম সাহেব ছিল? বাংলাই বলতে পারতো না!

কথার সূত্রে অতীত ও বর্তমান বারবার স্থান পরিবর্তন করে। আমরা কখনো কখনো বয়স্ক কণ্ঠস্বরে ছেলেবেলার মতন হাসতে চেষ্টা করি।

বড়দি জামাইবাবুরা দিন দশেক বাদে পুরী যাবেন বলে সব ঠিকঠাক করা ছিল

আগে থেকেই। বড়দি আমাকে বললো, বাদল, তুইও আমাদের সঙ্গে চল। আমি কাকীমাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি।

প্রভাস জামাইবাবুও খুব উৎসাহের সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, চলো চলো। খুব ভালো হবে। তুমি পুরীতে যাওনি তো আগে?

আমি পুরীতে যাইনি এবং বেড়াতে খুবই ভালবাসি। কিন্তু আমার পক্ষে অতগুলো দিন কলকাতার বাইরে কাটানো এখন সম্ভব নয়। বললুম না, তোমরাই যাও। আমার অনেক কাজ আছে।

বড়দি হেসে বললো, তোর আবার কাজ কি রে?

প্রভাস জামাইবাবু বললেন, ওসব কিছু শুনতে চাই না। তোমাকে যেতেই হবে। শ্রীলেখা, ওকে ধরে রাখতে পারবে না?

আমি ফস করে বলে ফেললাম, তোমরা সমুদ্রের ধারে যাচ্ছো তো, আমি সমুদ্র পেরিয়ে যাচ্ছি।

খানিকটা অবিশ্বাস, খানিকটা কৌতূহল নিয়ে বড়দি জিজ্ঞেস করলো, কি? কোথায় যাচ্ছিস?

আমি লাজুক ভাবে উত্তর দিলাম, আমি জার্মানিতে যাচ্ছি। সেই ব্যাপারেই জামাইবাবুর সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।

বড়দি খুব খুশী হয়ে বললো, জার্মানি যাচ্ছিস? বাঃ, এ তো দারুণ খবর। আগে বলিস নি কেন?

প্রভাস জামাইবাবু জিজ্ঞেস করলেন, এত জায়গা থাকতে জার্মানি কেন? ইস্ট না ওয়েস্ট?

—ওয়েস্ট জার্মানিতেই যাবো। তার কারণ ওখানে এখন খুব চাকরি পাওয়া যাচ্ছে। তারপর ইস্ট জার্মানিও ঘুরে আসার ইচ্ছে আছে।

বড়দি বললো, কাকা-কাকীমা নিশ্চয়ই খুব খুশী হয়েছেন? কাকীমা তো ক'দিন আগেই চিঠি লিখেছেন, কিছু জানাননি তো!

—মা এখনো জানে না। বড়দি, প্লীজ, মাকে কিছু বলো না এখন।

তারপর আমার পরিকল্পনা সব খুলে বললাম। প্রভাস জামাইবাবু খুব আগ্রহী হয়ে পড়লেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন সব রকম সাহায্য করার। প্রভাস জামাইবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল। উনি মানুষটি খুবই কৌতূহলী ধরনের, সব বিষয়েই জানতে চান। ওঁর নিজের জীবনযাত্রার ব্যাপারে কোনো সমস্যা নেই—তবু দুঃখ-দারিদ্র্য অর্থাৎ যাকে বলে 'জীবন সংগ্রাম'—এ সম্বন্ধে প্রতি একটা রোমান্টিক আকর্ষণ আছে। আমাকে বার বার বলতে লাগলেন, তুমি যে নিজে নিজে চলে যাওয়া ঠিক করেছো, এটা খুব ভালো করেছো। যা হয় হোক। দরকার হয় রেল স্টেশনে শুয়ে থাকবে, একটা রুটি খেয়ে সারাদিন কাটিয়ে দেবে, তবু জীবনকে দেখতে হবে—

প্রভাস জামাইবাবু আগে একবার দার্জিলিং-এ বেড়াতে গিয়ে একটা ওভারকোট কিনেছিলেন। পুরোনো তোরংগ খুলে সেটা বার করে আমায় বললেন, দেখো তো বাদল, এটা তোমায় ফিট করে কিনা! তোমার তো একটা ওভারকোট লাগবেই!

ওভারকোটটার দু'এক জায়গায় পোকায় কেটেছে, তবু সেটা গায়ে দিয়ে আমার এত ভালো লাগলো যে আমি আবার স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। ঝুরঝুর করে বরফ পড়ছে, আমি হেঁটে যাচ্ছি জার্মানির একটা গ্রামের রাস্তা দিয়ে—আমাকে একটা পোস্ট অফিস খুঁজে বার করতে হবে। এক্ষুনি একটা চিঠি পোস্ট করা দরকার, রেণুকে কথা দিয়েছি,

প্রত্যেক সপ্তাহে একবার—।

বড়দির স্নেহপ্রবণ মন। প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের পর নানা রকম শঙ্কা দেখা দিল। ঘুরে ফিরে আমাকে এসে বলতে লাগলো, কাকীমা যদি মনে দুঃখ পান? কাকারও বয়েস হয়েছে. বাড়িতে আর কেউ থাকবে না তুই চলে গেলে।

আমি কোনো উত্তর দিই না। বড়দি আমার পিঠে হাত রেখে বলে, বাদল, মায়ের অনুমতি না নিয়ে কোনো কাজ করতে নেই। তুই কাকীমাকে ভালো করে বুঝিয়ে বল—

আমি তখন বড়দিকে সান্ত্বনা দিই, তুমি অত ভাবছো কেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিদেশে যাবার জন্য আমার তখন প্রাণ নাচছে। বারবার মনে হয়, আমি যাবোই, যাবোই, যাবোই, যাবোই!

তিন তলার জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দূরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক সময় মনে হয়. আলোকোজ্জ্বল ইওরোপ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

বড়দি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমি বুঝতে পারিনি। হঠাৎ ফিরে দেখে বললাম, বড়দি, তুমি শুতে যাওনি?

বড়দি হেসে বললো, তোকে দেখছিলাম। সূর্যদাও ঠিক ওই রকম ভাবে জানলাটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতো।

আমি বললাম, সূর্যদা কি এই ঘরে থাকতো নাকি?

—হ্যাঁ। প্রায় দশ বছর হয়ে গেল, না রে? অথচ মনে হয় সেদিনের কথা। কত কি বদলে গেল!

—বড়দি, মানুষ তো বদলাবেই।

বড়দি দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বললো, আমি বোধ হয় বদলাই নি। আমার এখনও পুরোনো সব কিছুর জন্য মন কেমন করে।

—বড়দি, তুমি এখনও সূর্যদাকে ভুলতে পারো নি। সূর্যদা কিন্তু তোমাকে বেমালুম ভুলে গেছে।

—তা তো ভুলবেই। ওর তো কোনো দোষ নেই। আমি তো ওকে কিছু দিই নি।

—সূর্যদা যদি এখন আবার ফিরে আসে, তোমার কাছে কিছু চায়, তুমি দিতে পারবে?

—না। এ কথা জানি, ও আর ফিরে আসবে না। ওর স্বভাব সে রকম নয়।

—তা হলে আর মন খারাপ করে লাভ কি?

—সে তুই বুঝবি না।

—আমি এখন আর সেই ছেলেমানুষটি নেই। এখন সব বুঝি।

—ছাই বুঝিস! কারুকে ভালো না বাসলে এ সব কিছুই বোঝা যায় না। আর ভালোবাসা কখন বোঝা যায় জানিস? বিচ্ছেদের সময়। যখন দেখা হয় না, তখনই বোঝা যায় ভালোবাসা কতটা গভীর।

কথাটা শুনে আমার মন খারাপ হয়ে গেল একটু। ভালোবাসা মানে কি তা হলে দুঃখ পাওয়া? সূর্যদার জন্য বড়দি তো শুধু দুঃখই পেয়েছে, তবু এত ভালোবাসা থাকে কি করে? প্রভাস জামাইবাবুর কথা ভেবেও আমার একটু কষ্ট হতে লাগলো। উনি সুখে আছেন। উনি ভালোবাসা পান নি।

॥ ৭৬ ॥

কলকাতায় ফিরেই শুনলাম, পাড়ার কয়েকটি ছেলে কয়েকদিন ধরে বারবার আমার খোঁজ করে যাচ্ছে। শুনে একটু আশ্চর্য লাগলো, কারণ পাড়ার কারুর সঙ্গেই আমার এখন আর মেলামেশা নেই। একটু সন্ত্রস্ত বোধ করলুম।

পরদিন সকালেই মণ্টু আর অনিমেষ এসে হাজির। খুব খাতির করে বললো, কি রে, তোর খবর টবর কি? আমাদের একেবারেই ভুলে গেলি?

কয়েক দিন আগে পর্যন্ত ওরা আমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলে কথা বলতো না। হঠাৎ ওদের এরকম বাড়িতে চলে আসতে দেখে আমার মধ্যে একটা মেয়েলি অভিমান জাগে। ইচ্ছে হয়, আমিও কথা না বলে মুখ ফিরিয়ে থাকি।

কিন্তু বাড়িতে কেউ এলে এরকম করা যায় না। শুকনো গলায় বলি, কি রে, তোরা হঠাৎ? কি মনে করে?

অনিমেষ বললো, এমনিই। তুই ছিলি না, আমরা মাসীমার কাছ থেকে চা খেয়ে গেছি।

মণ্টু বললো, আদিনাথদা তোকে একবার ডেকেছেন। বিশেষ করে বলেছেন, আজ না কালই দেখা করতে।

এবার আমার ঘাড় শক্ত হয়ে যায়। আমি সোজাসুজি মণ্টুর চোখে চোখ রেখে বলি, আদিনাথদার সঙ্গে আমার তো কোনো দরকার নেই! আমি তো প্রতিক্রিয়াশীল!

—কে তোকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেছে? আদিনাথদা কক্ষনো বলেন নি।

আবার তর্ক বেধে যেতে পারতো। আমি নিজেকে সামলে নিলাম। বললাম, যাক, ওসব কথা তোলার আর কোনো মানে হয় না। আমি নিজেই জানি, আমি প্রতিক্রিয়া-শীল। আমি প্রেমের কবিতা লিখি।

—প্রেমের কবিতা লেখা কি দোষের কিছু নাকি!

—এ যে নতুন কথা শুনছি তোদের কাছে।

অনিমেষ গম্ভীরভাবে বললো, কাজের কথা হোক। আমাদের পার্টি থেকে ওয়াচ রাখা হচ্ছিল, তুই অন্য কোনো পার্টিতে যোগ দিস কিনা। এখন কংগ্রেস থেকে যা টাকা ছড়াচ্ছে, অনেকেই ঐ দিকে ভিড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তুই কোনো দিন ওদের দিকে যাসনি, তোর অনেস্টি আছে।

—কোন পার্টি ফার্টিতেই আর নেই আমি। যদি অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলার থাকে আমি বলতে পারি।

মণ্টু উঠে এসে আমার কাঁধে হাত দিয়ে সস্নেহে বললো, মাথা গরম করছিস কেন? এখন দেশে যে সময় আসছে, তুই তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারবি?

আমার মুখে এসে গিয়েছিল যে, আমি আর এ দেশেই থাকছি না। কিন্তু সেটা এক্ষুনি কারুকে জানানো ঠিক নয়। তাই বললাম, আমি একা একা বেশ আছি।

—আদিনাথদা যদি নিজে তোর বাড়িতে আসেন, তুই কথা বলবি না? উনি আসতেই চাইছিলেন।

—আমার মতন সামান্য একটা ছেলের কাছে উনি কেন আসবেন?

কিছুক্ষণ বাদে মণ্টু আর অনিমেষ চলে গেল। আমি মচকাইনি। কিন্তু সেদিনই এগারোটার সময় যখন রাস্তায় বেরিয়েছি, রেণুর কলেজে গিয়ে একবার দেখা করার জন্য, মোড়ের মাথায় আদিনাথদা অনেকের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি এড়িয়ে যাবার

সুযোগ পেলাম না। চোখাচোখি হতেই আদিনাথদা আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

ঠোঁটে সেই রকম মোটা চুরুট, খুব সাবিবাস ধবলের মুখ করে আমাকে প্রথমেই বললেন, বাদল, আমরা তোমার সাহায্য চাই।

আদিনাথদার মতন গণ্যমান্য নেতার মুখ থেকে সাহায্য কথাটা শুনে বুক কেঁপে ওঠে, মনে হয়, আমিও তা হলে সামান্য কেউ না।

আমাকে কোনো উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়েই তিনি আবার বললেন, আমরা এবার একটা বড় রকমের যুদ্ধে নামছি. এখন তোমাদের মতন পুরোনো ওয়ার্কারদের সাহায্য আমাদের বিশেষ দরকার। বিশেষ করে তোমার মতন যারা পড়াশুনো করেছে, যারা সব বোঝে—

যুদ্ধ কথাটা শুনে একটু খটকা লাগার কথা ছিল। কিন্তু সাধারণ নির্বাচনের এমন প্রচণ্ড ডামাডোল চলছে, তাতে বুঝতে ভুল হয় না যে, তিনি এর কথাই বলছেন।

মুখ নিচু করে বললাম, আমি আর কি সাহায্য করতে পারি বলুন। আমার নিজেরই অনেক রকম দ্বিধা আছে।

—ওসব কথা এখন ভুলে যাও। আমরা নির্বাচনে নামছি, ন্যাশনালিস্ট বুর্জোয়াদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার এই সুযোগ। পিপল আমাদের দিকে, আমরা জিতবোই, শুধু দরকার ঠিক মতন অর্গানাইজ করা। এ ব্যাপারে তোমার মতন ছেলেরা অনেক সাহায্য করতে পারে!

তখন এমন একটা বয়েস, যখন কারুর কাছ থেকে একটুখানি গুরুত্ব পেলেই জীবনটা সার্থক মনে হয়। কেউ যদি স্নেহের সঙ্গে বলে, তুমি আগুনে ঝাঁপ দিতে পারবে? একমাত্র তুমিই পারবে—তখন আর এক মুহূর্তের দ্বিধা থাকে না।

আদিনাথদার কথায় আবেগ ছিল। আদিনাথদার মতন নেতারা পরবর্তীকালে একেবারে পিছু হটে গেছেন, কেউ হয়েছেন অধ্যাপক বা কেউ দুর্মুখ সমালোচক, অনেকে হারিয়েই গেছেন। কিন্তু সেই সময় এই রকমই ছিল নেতৃত্বের ধরন।

আমার এই কয়েক মাসের রাগ-অভিমান সব জল হয়ে গেল, আমি আগেকার চেয়েও বেশী উৎসাহে পার্টির কাজে যোগ দিলাম।

নির্বাচনের কাজে এমনিতেই বেশ উন্মাদনা আছে। তা ছাড়া, সেবারই প্রথম সারা দেশব্যাপী উদ্যোগ হচ্ছে, রীতিনীতি জানা নেই, উৎকণ্ঠা অনেক বেশী। সাধারণ মানুষের মুখের কথা শুনে মনে হয় আমরা জিতবোই। দ্রব্যমূল্য অসম্ভব বাড়ছে, গ্রামে গ্রামে হাহাকার, প্রত্যেক মাসে হাজার হাজার লোক চাকরি থেকে ছাঁটাই হচ্ছে, টাটা-বিড়লা-ডালমিয়া-ইস্পাহানিরাই চালাচ্ছে দেশটাকে, নেহরু কোনো কালোবাজারীকেই ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসীতে ঝোলান নি—লোকে ওদের ভোট দেবে কেন? ওরা শুধু আমাদের জনযুদ্ধের সময়কার কথা বলে আক্রমণ করছে, ওরাই সুভাষ বোসকে তাড়িয়ে এখন সুভাষ বোসের নাম ভাঙাবার চেষ্টা করছে।

কয়েকটা দিন কেটে গেল ঘোরের মধ্য দিয়ে। স্নান খাওয়া ভুলে গিয়েছিলাম। নির্বাচনের দিন আমাকে একটা বুথের মধ্যে পাঠানো হলো অধ্যাপক হীরেন মুখার্জির পোলিং এজেন্ট হিসেবে।

বুথে বুথে পুলিস পাহারা। আমরা কয়েকজন ভেতরে একটা লম্বা বেঞ্চে বসলাম। অ্যাসেম্বলি সীটে অনেক ক্যান্ডিডেট, সকলের পোলিং এজেন্টদের বসবার জায়গা হয় না। আমার ক্যান্ডিডেট লোকসভার—আমার যেন একটু গর্ব বেশী।

আমাদের প্রত্যেকের হাতে ছাপানো ভোটার লিস্ট। লোক দেখে দেখে টিক দিতে

হবে। কারুকে সন্দেহ হলে জেরা করতে পারি। ঘোরতর সন্দেহ হলে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার আছে, তাতে যদিও টাকা জমা দিতে হবে। আমার কাছে অবশ্য কোনো টাকা দেওয়া হয়নি, আমাদের গরীব পার্টি, টাকা কোথায় পাবে। আমার টিফিন অ্যালাউয়েন্স ছ' আনা।

কংগ্রেসের পোলিং এজেন্টটির বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, দেখলেই মনে হয় পকেটে অনেক টাকা আছে। সে আমাদের দিকে তাকাচ্ছেই না।

প্রথম প্রথম খুব কম লোক এলো ভোট দিতে। অনেকক্ষণ বাদে একজন দুজন আসে। তাও বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা। মনটা একটু দমে গেল। বুড়ো-বুড়িরা আমাদের ভোট দেবে না, এটা ধরেই নেওয়া যায়। কিন্তু অন্যরা কোথায়, যাদের বাড়ি বাড়ি ক্যানভাস করতে যাবার সময় হাসি মুখে বলেছিল, নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!

ক্রমে ক্রমে ভিড় হতে লাগলো। সকলেরই মুখ গম্ভীর। কার মনে যে কি আছে, বোঝবার উপায় নেই। আমার দিকে কেউ চোখে চোখ ফেলেও তাকায় না।

কাকে কি জিজ্ঞাসা করবো? দু একজনের নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করি, ঠিক ঠিক মিলে যায়, আমার আর কিছু বলার থাকে না।

কংগ্রেসের ছেলেটি যুবক বা যুবতীদের দেখলেই নানা রকম জেরা করে। রীতিমতন ধমক দেয়। কারুর বয়েসের গরমিল দেখলেই বলে, রেশান কার্ড এনে দেখাতে পারবেন?

কেউ মুখে মুখে কথা বললেই সে চ্যালেঞ্জ করে।

কংগ্রেসের ছেলেটি হঠাৎ এক সময় আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনারা গোলমাল করলেন না?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি গোলমাল?

—শুনেছিলাম, আপনারা বোমাবাজি করবেন?

—তাতে তো আপনাদেরই সুবিধে হবার কথা। কারণ, আমরাই তো জিতছি।

—তাই নাকি? হাঃ হাঃ হাঃ—

প্রিসাইডিং অফিসার এই সময় আমাদের কাছে এসে বললেন, আপনারা প্লীজ এই ধরনের আলোচনা এখানে করবেন না।

কংগ্রেসের ছেলেটি বললো, ঠিক আছে চা খাওয়া যাক তা হলে। আমি সকলের জন্য এক রাউন্ড বলছি।

বেয়ারা এসে দশ কাপ চা দিয়ে গেল। আমি আবার দ্বিধায় পড়ে গেলুম। কংগ্রেসের ছেলের পয়সায় কি চা খাওয়া উচিত? এ সম্পর্কে পার্টির পলিসি কি? মুশলীম লীগের ছেলেটাও খাচ্ছে অবশ্য।

চায়ের কাপ না ছুঁয়ে আমি মনোযোগ দিয়ে ভোটার লিস্টটা পড়তে লাগলুম। পাশ থেকে একজন বললো, দাদা, আপনার চা যে জুড়িয়ে গেল?

আমি বললাম, আমি চা খাই না।

কংগ্রেসের ছেলেটি উঠে এসে বললো দাদা, রাগ করলেন? একটু হাসি ঠাট্টাও করা যাবে না?

—আমি সত্যি চা খাই না।

—আজকে অন্তত খান। আমার কথায় খান। না হলে মনে খুব দুঃখ পাবো।

বেশীক্ষণ না না বলতে আমার ভালো লাগে না। সেই ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া চা এক ঢোঁকে খেয়ে ফেললাম। ওরকম বিস্বাদ চা জীবনে খাইনি। সেই মুহূর্তে পি সি রায়ের কথাই ঠিক, চা পান না বিষ পান!

মুখ তুলেই দেখি সামনে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রেণু! আমার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠলো। আসলে রেণু নয়, রেণু হতেই পারে না, ওর ভোট নেই। আমারই নেই তো রেণুর থাকবে কি করে। মেয়েটির সঙ্গে রেণুর মুখের খুব মিল—আমি নির্লজ্জের মতন মেয়েটির মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিলাম, তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিলাম।

মেয়েটি আমাকে রেণুর কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে গেল। কলকাতায় ফেরার পর রেণুর সঙ্গে একবারও দেখা হয় নি। কয়েকদিন হৈ চৈ-এর মধ্যে অন্য কিছুই করা যায় নি। একই শহরে আছি অথচ সাত আট দিন রেণুর সঙ্গে দেখা হয়নি, এও কি সম্ভব? রেণু যদি এর মধ্যে ভুলে যায় আমাকে?

না, এসব কথা চিন্তা করা উচিত নয় আমার। আমার ওপর এখন কত দায়িত্ব। আমি পরবর্তী লোকটিকে অকারণে নানা প্রশ্ন করে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করি।

ক্যান্ডিডেটরা ঘুরে যাচ্ছেন মাঝে মাঝে। অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি আসতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। এর আগে দুবার মাত্র ওঁকে দেখেছি। উনি আমার কাঁধ চাপড়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?

একটু পরে এলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। বৃদ্ধ খুব দুঃখিতভাবে বললেন, ওহে, তোমরা আমার পোলিং এজেন্টকে বসতে দাওনি? সে বেচারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

আমাদের মধ্য থেকে একজন বললো, তাকে তো বলেছিলাম এই ধারটায় বসতে। দেখছেন তো জায়গা কম!

আমার আজও মনে আছে, বৃদ্ধ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ দু হাত নেড়ে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, যদি হয় সুজন, তবে তেঁতুল পাতায় নজন! ইচ্ছে থাকলেই জায়গা হয়ে যায়।

আমার পোলিং বুথটা ছিল দর্জিপাড়ার এক স্কুলে। টিফিনের সময় বেরিয়ে একটা চায়ের দোকান খুঁজছি—দেখি একটু দূরেই মন্টু, অনিমেষরা দাঁড়িয়ে আছে।

ওরা এসে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলো, কি রে, এদিকে আমাদের অবস্থা কি রকম?

আমি বললাম, তা তো ঠিক বুঝতে পারছি না। লোকজন চুপচাপ এসে ভোট দিয়ে যাচ্ছে। কাকে দিচ্ছে কে জানে!

—ওরা কারুকে চ্যালেঞ্জ করেছে?

—সব মিলিয়ে আট দশজন।

—শোন, এদিকে আমাদের পজিশন খুব ভালো। তোর আর ভেতরে গিয়ে দরকার নেই। বাগবাজারের দিকে খুব খারাপ অবস্থা—চল বাগবাজারে চল, অন্য কাজ আছে।

আমার মনে হলো, সত্যিই আর ভেতরে বসে শুধু ভোটার লিস্টে টিক মারার কোনো মানে হয় না। আমি ওদের সঙ্গে বাগবাজার চলে এলাম।

রাস্তায় প্রচুর মানুষ জন। দেখে মনে হয় সকলেই যেন শ্যামবাজার-বাগবাজারের দিকে যাচ্ছে। নির্বাচন নাকি ঐ দিকেই দারুণ জমেছে। বাগবাজারের দিকে আমাদের কোনো চিন্তা থাকার কথা নয়, ওদিকে আমাদের পার্টির ভালো ভালো ওয়ার্কার আছে, বরং যত বেশী ভোট পড়ে ততই ভালো। কিন্তু মন্টু আর অনিমেষের মুখ গম্ভীর।

বাগবাজারে এসে শুনলাম, এখানে দু' তিনটে সেণ্টারে প্রচুর ফল্‌স ভোটিং হচ্ছে। কংগ্রেস থেকে লরি ভর্তি করে নিয়ে আসছে লোক বাইরে থেকে, তারা হুড়হুড় করে ঢুকে ভোট দিয়ে আসছে।

পরিতোষ আমাদের এদিককার ইনচার্জ, তার চুল উস্কোখুস্কো, পাঞ্জাবিটা অনেকখানি ছেঁড়া, দারুণ উত্তেজিত হয়ে আছে। সে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে পরাজয়।

পরিতোষ আমাদের তিনজনকে দেখে বললো, আমার সঙ্গে আয় এদিকে, একটা জরুরি পরামর্শ আছে।

পরিতোষের সঙ্গে দ্রুত পা ফেলে আমরা চলে এলাম বৃন্দাবন পাল লেনে। সেখানে আগাছা ভর্তি একটা মাঠের ওপাশে একটা ভাঙা বাড়ি অনেক দিন খালি পড়ে থাকতে দেখেছি। শুনেছি বাড়িটার কোনো মালিক নেই। পরিতোষ আমাদের নিয়ে এলো সেই বাড়িটার মধ্যে, একেবারে ভেতরের দিকে একটা অন্ধকার ঘরে। যেকোনো সময় মাথায় ইঁট খসে পড়তে পারে। ঘরটার মধ্যে আমাদের পার্টির অনেকগুলো ছেলে রয়েছে, কয়েকটা লোহার রড, ফ্ল্যাগ, পোস্টার।

জায়গাটাকে দেখলেই বোঝা যায় একটা গুপ্ত আস্তানা। একটু রোমাঞ্চ বোধ হয়। এর আগে যখন শুনতাম পার্টির লীডাররা আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে গেছে, তখন আমার মনে হতো সত্যিই বোধহয় মাটির তলায় সুড়ঙ্গ কেটে কোনো লুকোবার জায়গা আছে। সে বিষয়ে অনেকদিন আমি নিঃসংশয় হতে পারিনি। এই পোড়োবাড়ির ভাঙা ঘরটা দেখেও মনে হয় সেই রকম কিছু। কিংবা গোপন যুদ্ধের হেড কোয়ার্টার।

যুদ্ধ কিংবা বিপ্লব সম্পর্কে অন্যরকম ছবির কথা চিন্তা করে চিত্ত আন্দোলিত হতো। সেই রকম যুদ্ধের সম্ভাবনা এখন অনেক দূরে সরে গেছে। এখন আমরা ভোট-যুদ্ধে মেতেছি। প্রথমবারে তাতেও উত্তেজনা কম অনুভব করিনি।

দুটি লম্বা মতন রাগী চেহারার ছেলে পরিতোষকে জিজ্ঞেস করলো লেটেস্ট পজিসন কি?

পরিতোষ বললো, এইট্টি কিংবা নাইনটি পার্সেন্ট পোলিং হচ্ছে এক একটা সেন্টারে। তার মধ্যে একটিও জেনুইন কিনা সন্দেহ! শংকর বোস ক্যানটার করে দিচ্ছে একেবারে।

শংকর বোসের নামটা আমার কাছে যেন চেনা মনে হলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, শংকর বোস কে রে?

মণ্টু অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, তুই গ্রেট ডিগবাজি মাস্টার শংকর বোসকে চিনিস না? আগে টেররিস্ট পার্টিতে ছিল, তারপর ফরটি টু-তে জেলে গিয়ে আমাদের পার্টিতে যোগ দিল, খুব বড় বড় কথা বলতো, এখন ইলেকশানের ঠিক আগে কংগ্রেসে গিয়ে ভিড়েছে। নিজে দাঁড়ায় নি, কিন্তু এ পাড়ার কংগ্রেস ক্যান্ডিডেটকে তো সে-ই জিতিয়ে দিচ্ছে। টাকাও পেয়েছে অঢেল!

আমার মনে হলো, এই শংকর বোসের নাম আমি সূর্যদার মুখে দু একবার শুনেছি, সূর্যদাদের দলেই ছিল এক সময়। সূর্যদা যদি এখন এখানে থাকতো, কোন পার্টিতে যোগ দিত? বোধহয় ভোটই দিত না। সূর্যদা রাজনীতি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু টাকা ছড়ালেও এত লোক পানে কোথা থেকে? এদের সকলেরই তো অন্য জায়গায় ভোট আছে।

পরিতোষ বললো, তুই ইলেকশানের কিছু বুঝিস্ না। অনেকেরই ভোটার লিস্টে নাম থাকে না। তা ছাড়া রেফিউজিদের তো প্রায় কারুরই ভোট নেই—শংকর বোসের খুব হোল্ড আছে রেফিউজি কলোনিগুলোতে—ওখান থেকে গাড়ি ভর্তি করে করে নিয়ে আসছে।

রাগী চেহারার লম্বা ছেলে দুটি বললো, ওরা এ রকম ফল্‌স ভোটিং চালাবে, আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো? তার চেয়ে আমরা সবাই মিলে এক সঙ্গে চার্জ করি, ইলেকশান ভণ্ডুল হয়ে যাক।

মণ্টু বললো, ওখানে অনেক পুলিস আছে।

—থাক পুলিস। আমরা আধলা ইঁটে তুষ্টিনাশ করে দেবো।

পরিতোষ বললো, শুধু পুলিস নয়, ওরা ওখানে অনেক গুণ্ডা লাগিয়ে রেখেছে। ইলেকশান ভাঙতে দেবে না—ওদের কাছে ড্যাগার আছে। আমরা প্রিপেয়ার্ড নই। কাশীপুরে ওরা দুজনকে স্ট্যাব করেছে।

অনিমেষ দাঁতে দাঁত চেপে বললো, শালা! আমরা কি তা হলে কিছুই করবো না!

পরিতোষ বললো, আমরা কাউণ্টার অ্যাকশান নেবো। আদিনাথদা খবর পাঠিয়েছেন, আমরা যতজনকে পারি জোগাড় করে আমাদেরও ফল্‌স চালাতে হবে।

পরিতোষ ঘাড় ফিরিয়ে অন্য কয়েকটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলো, দাগ তুলতে পেরেছিস।

একজন বললো, ঈজি! পাঁচ সাত মিনিট লাগে।

সে কাছে এগিয়ে এসে আঙুলটা দেখালো। তর্জনীর পাশের দিকে কালির ফোঁটা যেখানে থাকার কথা, সে জায়গাটা ফর্সা। দেশলাই কাঠির বারুদের দিকটা জলে ডুবিয়ে পাঁচ সাত মিনিট ঘষলেই উঠে যাচ্ছে দাগটা। শুধু দেশলাই কাঠির বারুদ ঘষলেই যে দাগটা ওঠে, তা এত তাড়াতাড়ি কি করে সকলে জেনে ফেললো, সেটাই আশ্চর্য ব্যাপার।

মণ্টু বললো, বাদল, তোর দাগটা তুলে ফেল!

আমি একটু লজ্জা পেয়ে গেলাম। আমার এ বছর ভোটিং রাইট হয়নি। যদিও আমার এখন একুশ হয়ে গেছে, কিন্তু ভোটার লিস্ট তৈরি করার সময় কম ছিল।

সে কথা বলতেই ওরা সবাই একসঙ্গে হৈ হৈ করে উঠলো। আমি এখনো একটাও ভোট দিই নি, এ তো ম্যান পাওয়ার নষ্ট করা। তক্ষুনি ভোটার লিস্ট দেখে একটা নাম বার করলো, সাধন রায়, বয়েস চব্বিশ, বাবার নাম শশাঙ্ক রায়। পরিতোষ জানালো, এই সাধন রায় পাটনায় গেছে, ওরা খুব ভালো ভাবে জানে, সুতরাং কোনো রিস্ক নেই।

আমাকে ঠেলতে ঠেলতে ওরা পাঠিয়ে দিল। আমি ভয় পাচ্ছিলাম। যদিও একটু আগে আমি নিজে পোলিং এজেন্ট হিসেবে দেখে এসেছি যে ভয়ের কিছু নেই—নাম টাম ঠিক বলতে পারলে আর কিছু জিজ্ঞেস করে না, তবু আমার বুক কাঁপছিল। এই প্রথম আমি সজ্ঞানে একটা অন্যায় করতে যাচ্ছি। অন্যরা অন্যায় করছে বলেই আমার নিজের অন্যায়টা ছোট হয়ে যায় না।

মণ্টু আমাকে এগিয়ে দিল বুথের কাছাকাছি। শেষকালে বলে দিল, আমাদের পোলিং এজেন্ট যদি তোকে চিনতে না পেরে বেশী জেরা করে তা হলে ডান দিকে কানের পাশটা চুলকোতে থাকবি। তা হলেই বুঝতে পারবে।

আমি সাধন রায় ও শশাঙ্ক রায়ের নাম জপ করতে করতে লাইনে দাঁড়ালাম। বারবার মনে হচ্ছে, এই সামান্য নাম দুটো শেষ মুহূর্তে ভুলে যাবো। মুখখানা হাসি হাসি করে রাখবার চেষ্টা করতে গিয়েও বুঝতে পারলাম, ঠিক মতন হাসি ফুটছে না। আমার বুকের মধ্যে যে এত জোরে ধড়াস ধড়াস শব্দ তা কি অন্যরা শুনতে পাচ্ছে না? রেণু যদি জানতে পারে কখনো? রেণু একটু মিথ্যে কথা বলাও সহ্য করতে

পারে না। আর আমি অন্য লোকের নামে পরিচয় দিয়ে—। রেণু যদি আমাকে ভালো না বাসে, তা হলে কি আমি পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারবো? নাঃ, রেণুকে বোঝাতে হবে, এটা একটা স্ট্র্যাটেজি।

শেষ পর্যন্ত কোনো অসুবিধে হলো না। যন্ত্রের মতন আমি নাম ও ঠিকানা বলে গেলাম, পোলিং এজেন্টরা বললো, নেক্সট্! এখানে দেখলাম, কংগ্রেসের পোলিং এজেন্টরা দারুণ প্রতাপের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। প্রিসাইডিং অফিসারটি মিনমিনে। তাকে বোঝানো হয়েছে যে, লাইন বিরাট হয়ে গেছে, সুতরাং এখন বেশী জেরা করে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

আঙুলে ফোঁটা দিয়ে, ব্যালট পেপারটা বাক্সে ফেলার পরের মুহূর্তে আমার সমস্ত গ্লানি কেটে গেল। আমার মনে হলো, আমি একটা দারুণ ব্যাপার করে ফেলেছি। আমি অসৎ লোকদের ঠকাতে পেরেছি।

লাফাতে লাফাতে ফিরে এলাম সেই ভাঙা বাড়িতে। আমি অত্যন্ত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতাটা বর্ণনা করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কেউ তেমন উৎসাহ দেখালো না। পরিতোষ বললো, দাগটা মুছে ফ্যাল। তোকে আবার যেতে হবে।

সকলেই তিনবার চারবার করে যাচ্ছে। কংগ্রেসের অর্থবল আছে, লোকবল আছে। আমাদের এ দুটোর একটাও নেই বলে এক একজনকেই যেতে হচ্ছে বারবার। এই গোপন ঘরটায় একটা কারখানা বসে গেছে। এক একজন ভোট দিয়ে আসছে, আর তিনজন এক্সপার্ট ব্যস্ত হয়ে পড়ছে তাদের দাগ তুলে ফেলার জন্য। আমাদের যেখানে যত ওয়ার্কার আর ভলান্টিয়ার ছিল সকলকেই ডেকে আনা হয়েছে এখন—আর মাত্র দেড় ঘণ্টা সময় আছে, এর মধ্যে যতগুলো তুলতে পারা যায়। অনিমেষ ভেতরে ঢুকে ভোটার লিস্ট বার করে এনেছে কায়দা করে, কোন কোন নামের পাশে এখনো টিক পড়েনি দেখবার জন্য।

এবার আমাকে দেওয়া হলো সুশান্ত তালুকদার, বাবা জয়দেব তালুকদার, বাড়ির নম্বর সাতাশের দুই, হলদে রঙের বাড়ি। এবার অন্য বুথে, তেমন একটা ভয়ও করছে না। লাইনে দাঁড়িয়ে আরাম করে সিগারেট ধরালাম। লাইনে আমার সামনে পেছনে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তারা কোনোক্রমেই বাগবাজারের লোক নয়—বাগবাজারের লোক দেখলেই চেনা যায়।

খানিকটা এগিয়েই বুঝতে পারলাম, এই বুথের চেহারা অন্যরকম। আমাদের পার্টির কোনো পোলিং এজেন্ট এখানে আছে বলে মনে হচ্ছে না। যারা বসে আছে তারা যাকে তাকে ধরে হঠাৎ জেরা করছে, ছেলে ছোকরা দেখলে আর রক্ষে নেই। ভেতরে পুলিস রয়েছে, উঠোনের মধ্যে কয়েকজন ভোটারকে বসিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের মিথ্যে পরিচয় প্রমাণিত হয়ে গেছে, গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওদের। এবং স্বয়ং শংকর বোস ঐ বুথ পরিদর্শন করতে এসেছেন। সেই প্রথম আমি দেখলাম শংকর বোসকে—তখন ঘুণাক্ষরেও অনুমান করা সম্ভব নয়, ভবিষ্যতে এঁর সঙ্গে আমাদের পরিবারের অনেক কিছু জড়িয়ে আছে।

লোকজনের কথাবার্তা শুনেই আমি চিনতে পারলাম শংকর বোসকে। খুব রোগা আর লম্বা মতন মানুষ, চল্লিশের কাছাকাছি বয়েস। আমার বন্ধুরা যেমন বলেছিল, সে রকম কোনো ফন্দীবাজ মানুষের মতন মুখ নয়, বরং যেন একটু বেশী অভিজ্ঞ আর ক্লান্ত মনে হয়। মোটামুটি চেহারা দেখলে খারাপ ধারণা কিছু হয় না।

আমার শরীরে ভয়টা আবার ফিরে এলো। স্পষ্ট টের পাচ্ছি পা কাঁপছে। সুশান্ত

তালুকদারের বাবার নাম যেন কি? বাড়ির নম্বর সাতাশের দুই না সাঁইত্রিশের দুই! ইস, কাগজে লিখে আনি নি কেন? এই সামান্য ব্যাপারটাও মনে থাকে না? এখনো চলে যাবো? বড্ড কাছাকাছি এসে গেছি, এখন চলে যেতে গেলে যদি কিছু মনে করে! শংকর বোসের সামনেই ধরা পড়বো, যদি উনি কোনক্রমে জানতে পারেন আমি নর্মদার ভাই—।

শংকর বোস সেই মুহূর্তেই সেখান থেকে চলে গেলেন বলে আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো কিছুটা। নাম ঠিকানা সব ঠিক ঠাক মনে পড়ে গেল।

—নাম?

—সুশান্ত তালুকদার।

—বাবার নাম?

—জয়দেব তালুকদার, সাতাশের দুই...

পোলিং এজেন্টটি আমাকে ছেড়ে দিয়ে টিক দেওয়ার জন্য মাথা নিচু করেছিল, হঠাৎ আবার মাথা তুলে জিজ্ঞেস করলো, আপনার বাবা তো মারা গেছেন?

এক মুহূর্তও চিন্তা না করে আমি বললাম, না তো!

লোকটি এবার রাগী গলায় জিজ্ঞেস করলো, আপনার বাবা মারা যাননি?

আমিও জোর দিয়ে বললাম, না!

প্রথমবার প্রশ্নের সময় অতর্কিতে আমি নিজের বাবার কথাই ভেবেছিলাম। পরের বার খেয়াল হয়েছে। তবু, সামান্য কুসংস্কার, মুখ ফুটে বলতে পারলাম না, আমার বাবা মারা গেছেন। আমার বাবা বড় নিরীহ মানুষ, তাঁকে মুখের কথাতেও আমি মেরে ফেলতে পারি না।

লোকটি ধমক দিয়ে বললো, জয়দেব তালুকদার আমার মাস্টার মশাই ছিলেন, উনি মারা যাবার পর ওঁর ডেড বডি আমি নিজে কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে গেছি, আর আপনি বলছেন, উনি মারা যান নি!

আমার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমি ধরা পড়ে গেছি। কাছেই পুলিস। হয়তো এই লোকটা অত্যন্ত চালু, জয়দেব তালুকদারের মারা যাবার ব্যাপারটাও বানিয়ে বলছে, কিন্তু আমার আর জোর দিয়ে কিছু বলার উপায় নেই।

দু' এক মুহূর্ত আমি চুপ করে ছিলাম শুধু। সেই সময়টুকুতে পৃথিবীর আর কিছু নয়, শুধু চোখের সামনে ভেসে উঠলো রেণুর মুখ। রেণুই যেন আমার বিচারক। রেণু কি আমার সব দোষ ক্ষমা করবে? রেণুর চোখের দিকে তাকালেই ও কি বলবে, আমি রাগ করি নি!

আমি খুব দুর্বল গলায় লোকটিকে বললাম, দাঁড়ান, আমি বাড়ি থেকে রেশান, কার্ড নিয়ে আসছি!

—রেশান কার্ড এনে কি দেখাবেন? আমি জানি না?

আমি আর অপেক্ষা করলাম না, পেছন ফিরেই দৌড়োলাম।

কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো, ধরুন, ধরুন, ঐ ছেলেটাকে ধরুন তো!

কিন্তু তখন আমি অন্ধ, আমি কারুকেই দেখতে পাচ্ছি না, শুধু দৌড়োচ্ছি। অত জোরে জীবনে কখনো ছুটিনি আগে।

এক সময় বুঝতে পারলাম, আমি বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরেছি, আমি ধরা পড়িনি, বেঁচে গেছি। তবু দৌড় থামালাম না। তীব্র গতিতে ছুটছি। সেই ভাঙা বাড়ির দিকে নয়, বন্ধুদের দিকে নয়। কোনদিকে জানি না। ভয় চলে গিয়ে এখন

ফিরে এসেছে লজ্জা। আমি হেরে গেলাম। অন্যরা কি রকম অনায়াসে তিন চার বার ফল্‌স দিয়ে এসেছে। আমি পারলাম না। আমি হেরে যাই বারবার। আমি ভয় পাই।

কিন্তু ফিরে গিয়ে আবার চেষ্টা করার ইচ্ছে হলো না। আমি বুঝতে পারলাম, এই সব পথ আমার জন্য নয়। আমি অযোগ্য। আমাকে একাই থাকতে হবে।

ছুটতে ছুটতেই আমি দেখলাম, সার সার লরি ভর্তি নকল ভোটার তখনও আসছে। গণতন্ত্রের বিচিত্র রূপ আমার সেইদিনই দেখা হয়ে গেল।

॥ ৭৭ ॥

কিছুক্ষণ ছোটার পর আমি যত না বেশী হাঁপিয়ে পড়লাম, তার থেকেও বেশী মন খারাপ হয়ে গেল। বারবার মনে হতে লাগলো, আমি একটা অপদার্থ। পৃথিবীতে আমার কোন মূল্যই নেই। আমি অন্যায়কে ভয় করি, আবার ন্যায়ের পথে যাবারও দৃঢ়তা নেই। কিংবা সে পথ কোনটা আমি জানি না।

এই যে মানুষজন, রাস্তায় এত ভিড়, হৈ চৈ, হাসি ও ঝগড়া—এই সবেরই কি কোনো উদ্দেশ্য আছে? আমি কোথায় যাবো? শৈশবের এক একটা স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে, আর চতুর্দিক প্রকম্পিত হচ্ছে যেন সেই ভাঙার ঝনঝন শব্দে।

কোথায় যাবো, এই প্রশ্ন মনে এলে তৎক্ষণাৎ একটা সহজ ও অবধারিত উত্তর মনে আসে। রেণুর কাছে।

আমার মাথার মধ্যে অনেকরকম প্রশ্ন এবং অনেকরকম সমস্যা এসে ভিড় করে। অনেক সময় দিশেহারা হয়ে যাই। কিন্তু দুটি ব্যাপারে আমার উত্তর সব সময়ই সরল। খিদে পেলে খেতে হবে, আর মন খারাপ হলেই রেণুর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

এখন মাথা থেকে আর সব কিছু জটিল ব্যাপার সরিয়ে ফেলে এই সরল দুটি পথ বেছে নিলাম।

প্রথম কথা, দারুণ খিদে পেয়েছে। সকাল থেকে শুধু কয়েক কাপ চা ছাড়া আর কিছুই খাইনি। এই কথা মনে পড়তেই আরও অসম্ভব বেশী খিদে পেয়ে গেল।

পকেটে কিছু খুচরো পয়সা আছে। দু' আনি এক আনি দু' পয়সা মিলিয়ে প্রায় বারো আনা। যথেষ্ট খাওয়া হয়ে যাবে। ইচ্ছে করলে এক কোয়ার্টার মাংস, দু'খানা রুটি আর পাঁচটা সিগারেট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে একা খাবো কি করে? কোনোদিন আমি একলা কোনো হোটেল রেস্তোরাঁয় ঢুকিনি। একলা বসে বসে কোনো দোকানে চুপচাপ খাবার খেয়ে যাওয়া আমার কাছে একটা অত্যন্ত ভালগার দৃশ্য মনে হয়। অনেককে দেখেছি একরকম ভাবে খেতে, তারা নিশ্চয়ই মফঃস্বলের লোক।

আমি শ্যামপার্কের রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। খালি পেটে সিগারেট টানলে পেটের ভেতরটা চিনচিন করে, তাতেও এক ধরনের নেশা নেশা হয়। অনেকদিন আগে নিরু আমাকে বলেছিল, জ্বর হলে ওর খুব ভালো লাগে। খুব বেশী জ্বর বাড়লে যখন একটা ঘোরের মতন হয়, তখন কতরকম দৃশ্য দেখা যায়, মনটা খুব চমৎকারভাবে হালকা হয়। এখন আমি নিরুর ঐ কথাটার মর্ম বুঝতে পারি। শরীরকে কষ্ট দেবার মধ্যেও একটা আরাম আছে। খালি পেটে সিগারেট খাওয়ার কোনো যুক্তি নেই, অথচ ইচ্ছে করে। বিশেষ করে যখন মন খারাপ থাকে

তখন শারীরিক কষ্ট দিলে অন্যরকম উপকার পাওয়া যায়।

খিদে পেলেই খেতে হবে, এই সিদ্ধান্ত খুব সরল হলেও গ্রহণ করা সহজ নয়। যেমন আমার খিদে পেয়েছে পকেটে পয়সা আছে, তবু আমি খেতে যেতে পারছি না। আমার কোনো বন্ধু যদি একা আমাকে কোনো দোকানে বসে খেতে দেখলে ঠাট্টা করে! আমার কোনো বন্ধুর সঙ্গে এখন দেখা হয়ে গেলে আমি তাকে অনায়াসেই দ্বারিকের দোকানে লুচি আর আলুরদম খাওয়াতে পারতাম। ওরা বিনে পয়সার যে ডালটা দেয়, সেটার স্বাদই সবচেয়ে ভালো। মনে করলেই জিভে জল আসে।

পংকজ কিংবা ভাস্কর কলকাতায় থাকতে পারে এখন। অনেকদিন ওদের বাড়ি যাই না, এখন একবার গেলে হয়। ভাস্করের বাড়িতে গেলেই খিদের সমস্যা মিটে যায়—এরকম বিকেলবেলা ওদের বাড়িতে যে-কেউ গেলেই তার জন্য ওপর থেকে খাবার আসে।

কিন্তু এখন ভাস্করের কাছে গেলে আর সহজে ওর হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে না। তাহলে রেণুর সঙ্গে দেখা হবে কি করে?

চার পয়সার চিনে বাদাম কিনে নিয়ে তাই খেতে খেতে হাঁটতে লাগলাম। একা একা চিনে বাদাম খাওয়া যায়। ঝালনুনটা কি অসম্ভব ঝাল। চোখের জল বার করে দেয়।

মন খারাপ হলেই রেণুর সঙ্গে দেখা করতে হবে—এই ব্যাপারটাও খুব সরল মনে হলেও আসলে খুব সরল নয়। ইচ্ছেটা সরল, কিন্তু পৃথিবী বড় জটিল। তীব্র ইচ্ছে থাকলেও রেণুর সঙ্গে দেখা করবো কি করে?

রেণু অনেক সময় অভিযোগ করেছে যে বেশীর ভাগ সময় ওই আমার কাছে দেখা করতে আসে, আমি ওর কাছে যাই না। কথাটা অনেকটা সত্যি, আমার মন-প্রাণ রেণুর দিকে সব সময় ছুটে যেতে চায়, কিন্তু পথে অনেক বাধা। রেণুকে যখনই জিজ্ঞেস করেছি, আবার কবে দেখা হবে, রেণু বলেছে তুমি আমার বাড়িতে আসবে। আমি বলেছি যাবো, তবু যাওয়া হয় না। কেন যে যাই না, তা রেণুকেও বুঝিয়ে বলতে পারি না।

বিষ্ণু চলে যাবার পর আর যখন তখন ওদের বাড়িতে যেতে পারি না। শেষের দিকে বিষ্ণুই ছিল ঐ বাড়িতে আমার একমাত্র বন্ধু। রেণুর দাদা অংশুর সঙ্গে কিছুতেই আমার বনলো না। এখন শুধু রেণুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া কি যায়? কেউ বারণ করেনি, রেণুর ছোটকাকা একদিন শুধু একটু বক্র ইঙ্গিত করেছিলেন। ওদের পুরোনো আমলের বনেদী বাড়ি—বাইরের কোনো ছেলে ও-বাড়ির কোনো মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যায় না। আমি এত ছেলেবেলা থেকে ওদের বাড়িতে যাচ্ছি যে নিজেকে বাইরের ছেলে বলে কখনো ভাবিনি। কিন্তু রেণুর ছোটকাকার ইঙ্গিতটাতে আমার গা জ্বলে গিয়েছিল। সেই থেকে আর ওদের বাড়িতে কখনো যাইনি। আর কিছু নেই, শুধু আমার বাণ্ডিলের গোটুকু এখনো আছে।

খঙ্গপুর থেকে ফেরার পর আর রেণুর সঙ্গে দেখা হয়নি। অনেকদিন রেণুর কোনো খবর জানি না, আজ তো কলেজ ছুটি, রেণু কোথায় থাকতে পারে?

ঘুরতে ঘুরতে আমি রেণুদের বাড়ির রাস্তায় চলে এলাম। একবার হেঁটে গেলাম বাড়িটার সামনে দিয়ে। সদর দরজাটা খোলা, ভেতরের উঠোনটার একটা অংশ দেখা যায় ফাঁকা। অনেকদিন ও বাড়িতে নতুন শিশু জন্মায়নি। ঐ উঠোনে এখন কেউ আর খেলাধুলো করে না।

খানিকটা দূরে গিয়ে আবার ফিরে আসতেই হলো। ঐ বাড়িটা আমাকে চুম্বকের মতন টানছে। অনায়াসে সদর দরজা দিয়ে ঢুকে পড়তে পারি। রেণুর ছোটকাকার চোখ এড়িয়ে যদি দোতলায় উঠে যাই রেণুর মা আমাকে দেখলে নিশ্চয়ই খুশী হবেন। উনি তো এক সময় আমাকে খুবই ভালোবাসতেন। উনি কি কখনো রেণুর কাছে আমার কথা জিজ্ঞেস করেন না?

যেমন পকেটে পয়সা থাকা সত্ত্বেও আমি খাবারের দোকানে ঢুকতে পারিনি, সেই-রকম, এখানে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমি রেণুদের বাড়িতে ঢুকলাম না। এরকম ভাবে যাওয়া যায় না।

ওদের বাড়ি থেকে একটু দূরে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। নিজেকে আমার আরও নিঃস্ব মনে হতে লাগলো। কিংবা ভিখারী। কিংবা চোর। রাস্তায় প্রতিটি মানুষ কি আমার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে না? যারা হেঁটে যাচ্ছে, তারা প্রত্যেকেই কোথাও না কোথাও যাচ্ছে, আমি শুধু এখানে দাঁড়িয়ে আছি কেন?

সত্যিই তো, কেন দাঁড়িয়ে আছি? রেণু যে আজ বাড়ি থেকে বেরুবে, তার কি কোনো মানে আছে? কিংবা রেণু বেরিয়ে গেছে অনেক আগেই, ফিরবে বেশী রাত্রে' ভবানীপুরে ওর মাসীর বাড়িতেও যেতে পারে। একমাত্র আমার ইচ্ছেশক্তির জোরেই আমি রেণুকে এখানে টেনে আনতে পারি। এর জন্য কতখানি ইচ্ছাশক্তি দরকার? পি সি সরকারের একটা বইতে পড়েছিলাম, রোজ সকালবেলা সবুজ গাছপালার দিকে তাকিয়ে চোখের একটা ব্যায়াম করলে দৃষ্টিশক্তি এত দূর বেড়ে যায়—। ইস, কেন যে সেই চোখের ব্যায়ামটা করিনি।

পেছন থেকে কে একজন আমার কাঁধে একটা চাপড় মেরে বললো, কি রে বাদল!

এই ব্যাপারটা আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল। এ পাড়ায় অনেকেই আমাকে চেনে। এইরকম কোনো জায়গায় চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে কেউ না কেউ এসে কথা বলবেই।

তাকিয়ে দেখলাম, সুবীর। আমার বয়েসী হলেও বিরাট লম্বা চওড়া চেহারা। রেণুদের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে থাকে। এ পাড়ার প্রত্যেকটি মেয়ে ওকে ভয় পায়, আর সুবীর নিজেকে প্রত্যেকটি কুমারী মেয়ের অভিভাবক হিসেবে মনে করে।

আমি সুবীরের দিকে অসহায়ভাবে তাকালাম। সবল প্রতিদ্বন্দ্বীর মন জয় করার জন্য হাসলাম ফ্যাকাসে ভাবে। যদি সুবীর আমাকে এক্ষুনি ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, তাহলে আমি আগামী এক সপ্তাহের জন্য ভগবানে বিশ্বাস করতে রাজি আছি।

সুবীর বললো, এখানে চুপ মেরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন রে?

সুবীর জানে না, আমি এখন আর বিষ্ণুদের বাড়ির ভেতরে ঢুকি না। সুবীর জানে, আমি যে-কোনো সময়েই রেণুর সঙ্গে দেখা করতে পারি। সুতরাং ও সেদিকে কিছু সন্দেহ করবে না।

সম্ভবত ঈশ্বরই আমার মাথায় বুদ্ধি জুটিয়ে দিলেন। আমি বললাম, ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে আছি। অনেকক্ষণ ট্রাম আসছে না।

—মল্লিকাদের বাড়িতে গিয়েছিলি?

এই প্রশ্নে আমি আরও বেশী চমকে উঠি। এটা আবার সুবীরের কি কায়দা? রেণুদের বাড়ির কথা জিজ্ঞেস না করে মল্লিকাদের বাড়ির কথা বলার মানে কি? মল্লিকা নামটা চেনা চেনা, কিন্তু আমার সঙ্গে আলাপ নেই।

উত্তর না দিয়ে আমি এমন একটা মুখভঙ্গি করলাম, যার অনেক রকম মানে হতে

পারে। এবং কথা ঘোরাবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, সুবীর, তুমি ইলেকশানের সময় কিছু করো নি?

সুবীর অত সহজে ভুললো না। ইলেকশানের ব্যাপারে গুরুত্ব না দিয়ে বললো, মল্লিকাদের বাড়িতে খুব রসের কারবার জমেছে, না রে?

আমাকে সাবধান হতে হবে। সুবীরের কাছে দুর্বলতা দেখালে চলবে না। কোনো রকম যুক্তি মানে না সুবীর। যে কোনো সময় গালাগালি দিতে বা হাত চালাতে পারে। আমি ওকে একটা সিগারেট দিলাম।

সিগারেটে টান দিয়ে সুবীর বললো, বাদল, তুই থিয়েটার করছিস না?

প্রথম দেখার পর আমি সুবীরকে এড়াতে চেয়েছিলাম, ভয় পেয়েছিলাম, এখন আমার কৌতূহল বেড়ে উঠলো, সুবীর এ-সব বলছে কি?

সুবীর আবার বললো, তুই পার্ট ফার্ট করছিস না? দেবুদা তোকে পার্ট দেয় নি?

তৎক্ষণাৎ সুবিধেমতন কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে আমি সোজা কথাটাই বললাম। মাথা নেড়ে জানলাম, না।

—দেবুদা নিজেকে মস্ত বড় ডাইরেক্টার ভাবে কিনা। মাইরি যেন সেকেন্ড শিশির ভাদুড়ী। শিশির ভাদুড়ীর সংগে টেক্কা দেবার জন্য মাল খাওয়া শুরু করেছে, জানিস তো?

এ সব কিছুই আমার জানার কথা নয়। কারণ, আমি দেবুদাকেই চিনি না। আমি সোজা সুবীরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, যাতে আমাকে প্রশ্ন করার বদলে ও নিজেই কিছু বলে।

সুবীর এর পর যে-কথাটা বললো, সেটা আমার পক্ষে হজম করা শক্ত।

—দেবুদা রেণু আর মল্লিকা দু'জনের সংগেই হিড়িক দিচ্ছে শালা।

রেণুর নাম নিয়ে কেউ কোনো প্রকার খারাপ কথা বললে আমার শরীর জ্বলে যায়। আমার উচিৎ ছিল সুবীরের নাকে বিনা বাক্যব্যয়ে একটা ঘুষি মারা। কিন্তু তার উপায় নেই, সুবীরের শরীরের ওজন আমার অন্তত দ্বিগুণ। এবং নিতান্ত বোকা গোঁয়ার ছাড়া কেউ এই সময় মারামারি করে না। আমি তক্ষুনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম ভবিষ্যতে কোনো না কোনো একদিন আমি সুবীরকে কঠিন শাস্তি দেবো। সেদিন হয়তো ও বুঝতেই পারবে না, কি অপরাধের জন্য ঐ শাস্তি।

সুবীরের সংগে আমার আর একটাও কথা বলার ইচ্ছে নেই। আমি আপন মনেই বললাম, ঐ তো ট্রাম এসে গেছে।

ছুটে গিয়ে উঠে পড়লাম ট্রামে। সুবীর আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল, শুনতে পেলাম না। সুবীরের দিকে তাকাতেও আমার ঘৃণা হচ্ছিল। ট্রামটা একসময় এসে শ্যামবাজার ডিপোর মধ্যে ঢুকলো, তবু আমি বসেই রইলাম। ট্রাম থেকে নামলেই কোনো একটা জায়গায় যাওয়ার কথা ঠিক করতে হবে। কিন্তু কোথায় যাবো? এই সময় বাড়ি ফিরে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। মুখের ভেতরটা তেতো তেতো লাগছে। আমি রেণুর কাছে যেতে চাই, কিন্তু যাওয়ার কোনো উপায় নেই।

সুবীরের কথা শুনে বোঝা গেল, মল্লিকাদের বাড়িতে কোনো একটা নাটকের রিহার্সাল হচ্ছে। রেণু কি তাতে অভিনয় করছে? রেণু কোনো নাটকে অভিনয় করছে, আর আমি তার কিছুই জানি না, এ কি কখনো হতে পারে? অবশ্য, আমিও যে এ ক'দিন ইলেকশানের কাজে মেতে ছিলাম, রেণু তা জানে না। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, রেণু তো বাইরে কারুর সংগে বেশী মেশে না, নাটক করবে কি করে?

মল্লিকাদের বাড়ি রেণুদের বাড়ির পেছনেই। কোনোদিন আমি সেখানে যাই নি। কিন্তু রেণুকে কয়েকদিন ও বাড়িতে যেতে দেখেছি গল্পের বই আনবার জন্য। রেণু সেখানে এখন রিহার্সাল দিচ্ছে, আর আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবো? এই মুহূর্তে হাজার হাজার ডিনামাইট দিয়ে কলকাতা শহরটা ধ্বংস করে দিলে কি হয়?

এক সময় দেখি যে আমার ট্রামটা আবার চলতে শুরু করেছে। আবার রেণুদের বাড়ির সামনে দিয়েই যাবো। আমি উদাসীনভাবে বসে রইলাম। যেখানে খুশী যাক্।

হাতিবাগান থেকে ট্রামটা ঘুরতেই আমি নেমে পড়লাম ঝপ করে। এবারও যদি সুবীর আমাকে দেখতে পায়, কি করবে জানি না। আমি কোনোদিকে না তাকিয়ে রেণুদের বাড়ির পাশের গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

মল্লিকাদের বাড়িটা চিনতে কষ্ট হলো না। জোরে জোরে কথাবার্তার আওয়াজ হচ্ছে একতলার একটা ঘর থেকে। জানলার বাইরে অনেকগুলি কৌতূহলী ছেলেমেয়ে এবং কয়েকটি লোভী ছোকরা। তাদের মধ্যে সুবীরও আছে।

সুবীর আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলো, কি রে?

আমি ওকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে গম্ভীরভাবে বললাম, একটা জিনিস ফেলে গিয়েছিলাম।

আমি সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলাম। এক নজরে তাকিয়ে দেখে নিলাম, রেণু ছাড়া আর একজনও চেনা নেই।

আমি হঠাৎ ঢুকে পড়ার জন্য কেউ আমাকে কিছু বলবে কিনা এ চিন্তা আমার মনেই আসে নি। আমি প্রগাঢ় অভিমানবোধ করছিলাম। কেন কি জানি।

আজ সারা দেশ জুড়ে সাধারণ নির্বাচনের উত্তেজনা, খানিকক্ষণ আগেই আমি দারুণ এক ভিড় ও হুড়োহুড়ির মধ্যে থেকে এসেছি—অথচ এখানে তার চিহ্নমাত্র নেই। এরা নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছে। এ রকম হয়, আমি আগে খেয়াল করিনি। গত কয়েকটা দিন ধরে আমি ভাবছিলাম যে, এই নির্বাচনের ফলাফলের ওপর দেশের ভাগ্য নির্ভর করছে। এখন দেখতে পাচ্ছি অনেকে এ ব্যাপার নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামায় না।

রিহার্সাল তখন মধ্যপথে। রেণুকে একটা চেয়ারে বসিয়ে আর একজন মাঝবয়সী লোক হাউ হাউ করে কান্না কান্না গলায় বলছে, মা জননী, মা জননী, তুমি একবার মাজাবাবুকে বলো—

রেণু আমার দিকে একবার চেনা চোখে তাকালো, কোনো কথা বললো না। আমি দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়ালাম।

রেণুকে অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে। ঘরের সকলের দৃষ্টি তার দিকে। রেণুর ঈষৎ কোঁকড়া চুল শুধু একটা রিবন দিয়ে বাঁধা। একটা সাদা-সিল্কের শাড়ি পরে আছে। সবচেয়ে সুন্দর লাগে ওর গম্ভীর ধরনের অথচ ছেলেমানুষী মুখখানা। রেণুর মতন একটুকু একটা মেয়েকে একজন বয়স্ক লোক মা জননী বলছে, এটা হাস্যকর। অবশ্য এই সব অ্যামেচার নাটকগুলো হাস্যকরই হয় সাধারণত। দু' একটা লাইন শুনলেই বোঝা যায় একবিন্দুও সাহিত্যরস নেই।

পরিচালককে সহজেই চেনা যায়। একজন ফর্সা ও দীর্ঘকায় লোক, চুল ওল্টানো, দীর্ঘ নাসা, গিলেকরা পাঞ্জাবি ও ধুতি পরা। এই তা হলে দেবুদা।

ঘরে আরও আট দশজন ছেলে ও মেয়ে আছে। সকলেই চুপচাপ। এদের মুখ চোখে বেশ একটা সাংস্কৃতিক ভাব আছে। আমি চিনি এই সব ছেলেমেয়েদের—এরা সংস্কৃতির চর্চা করতে ভালোবাসে, অন্য সময় প্যাণ্ট শার্ট পরা থাকলেও সংস্কৃতি করার সময়

ধুতি পাঞ্জাবি পরবেই।

পরিচালক এগিয়ে এসে রেণুর থুতনিতে হাত ঠেকিয়ে বললো, মুখটা তোলো, মুখটা তোলো, অডিয়েন্সের দিকে তাকাও।

রেণু হেসে ফেলে বললো, বললাম তো আমি পারবো না। আমি একদম পারবো না।

—কেন পারবে না? পারবে কি পারবে না তা তুমি নিজে কি জানো, সে তো আমরা বলবো।

রেণু চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আজ আর থাক বরং।

—না, না, না—থার্ড সীনটা হয়ে যাক।

পরিচালক দেবুদা রেণুর পেছন দিকে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর ঠিক যেন আমার দিকেই তাকিয়ে বললো, ঠিক এই ভাবে হেসে হেসে, মুখটা তুলে বলো, আপনি বোধহয় জানেন না, আমি মানুষ চিনতে কখনো ভুল করি না।

রেণু সেই কথাগুলো উচ্চারণ করলো কিন্তু এখনো মুখ নিচু করে। সে যেন আমার দিকে তাকাতে পারছে না।

দেবুদা আবার রেণুর থুতনিতে হাত দিয়ে বললো, মুখটা তোলো, মুখটা তোলো, সোজা ঐ দিকে—

আমার চোখ আটকে আছে দেবুদার আঙুলের দিকে। সেই আঙুল রেণুর থুতনি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। দেবুদা নামের এই লোকটির সঙ্গে সারা জীবনে কখনো যে আমার বন্ধুত্ব হবে না তখনই তা ঠিক হয়ে গেল।

আমি এই সময় আবার মনে মনে কথা বলা শুরু করে দিলাম। অনেক লোকের মাঝখানে একা হয়ে পড়লেই এরকম হয় আমার।

আমি রেণুর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি কোথাও আছি? রেণু উত্তর দিল কেন?

—তুমি আমাকে মনে রেখেছো?

—তার মানে?

—তুমি কি এই ক'দিনে একবারও আমার কথা ভেবেছো?

—কি মনে হয়?

—আমি বুঝতে পারি না, আমি বুঝতে পারি না। আমার ভয় হয়।

দেবুদা তখনও রেণুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। উনি কি অভিনয় শেখাচ্ছেন, না নাচ শেখাচ্ছেন? হাত ধরে, কাঁধ ধরে বুঝি অভিনয় শেখাতে হয়? আমি সেদিকে চেয়ে থাকতে পারছি না। গত দু' তিন সপ্তাহের মধ্যেই কি পৃথিবীটা আমার জন্য বদলে গেল? আমার খিদে পেয়েছে, আমি ক্লান্ত, এই সময় রেণুকে আমি কাছে পাবো না, অন্য একজন তার গা ছুঁয়ে থাকবে?

বাড়ির ভেতর থেকে অনেকগুলি কাপ ভর্তি করে চা আসছে। চায়ের ব্যাপারে যে মেয়েটি তদারকি করছে, সেই-ই যে মল্লিকা, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। একটু মোটাসোটা ধরনের। কিন্তু বেশ আকর্ষণীয় চেহারা, মুখখানা সব সময় হাসিখুশী।

আমার অস্বস্তি বেড়ে গেল অনেকটা। এরা আমাকে চেনে না, নিশ্চয়ই আমাকে চা দেবে না। আমি যে চা খাবার জন্য মরে যাচ্ছি তা নয়, কিন্তু অন্য সকলকে চা দেবার পর আমাকে যদি না দেয়—

মল্লিকা প্রথমেই এসে আমার দিকে এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে হেসে বললো, নিন।

আমি নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে চা নিলাম।

মল্লিকা আবার বললো, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন না! রেণুকে কতবার আপনার কথা জিজ্ঞেস করেছি, এর আগে একদিনও আপনাকে নিয়ে আসে নি।

আমার সঙ্গে মল্লিকার কোনোদিন আলাপ হয়নি। তবু মল্লিকা আমাকে চিনলো কি করে? মেয়েরা বোধহয় এরকমভাবে অন্যাদের অজ্ঞাতসারে অনেক কিছু জেনে ফেলে।

আমি লাজুকভাবে বললাম, আমি কলকাতায় ছিলাম না অনেক দিন।

—কোথায় গিয়েছিলেন?

—খড়কপুরের দিকে।

দেবুদা হাত তুলে বললো, আস্তে আস্তে!

রেণু আবার উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আজ আর ভালো লাগছে না। এবার অন্য সীন হোক।

সেই দৃশ্য শেষ হয়ে যাবার পর আবার অন্য দৃশ্যের রিহার্সাল শুরু হলো, তার মধ্যে রেণু নেই। রেণু কিন্তু উঠে এসে আমার সঙ্গে কথা বললো না। একবার তাকালোও না। হঠাৎ কি একটা আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো মল্লিকার সঙ্গে।

আমি রেণুর চোখে চোখ ফেলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু রেণু যেন আমার উপস্থিতির কথা ভুলেই গেছে। মল্লিকার সঙ্গে ওর কি এত কথা?

এদিকে পরিচালক দেবুদা নিজেই এখন অন্য আর দুজনের সঙ্গে একটা দৃশ্যের রিহার্সাল দিতে শুরু করেছেন। সংলাপ শুনে মনে হয় উনিই নায়ক। পেছনে একটি ছেলে বসে প্রমটিং করছে, কিন্তু দেবুদার দরকার হচ্ছে না প্রমটিং-এর। নাটকটাও কি ওঁরই লেখা নাকি? একই সঙ্গে নাট্যকার, পরিচালক ও নায়ক—এতগুলি গুণ সমন্বিত কোনো লোক যদি রেণুর থুতনিতে হাত ছোঁয়ায়, তবে আমি তাকে কিছুতেই পছন্দ করতে পারি না।

এখানে আর একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না আমার। রেণু আমার কাছে আসছে না কেন? আমিও তো কাছে গিয়ে রেণুকে ডাকতে পারি। এটা তো খুবই স্বাভাবিক। অথচ আমি কিছুতেই ডাকবো না। রেণু নিজে থেকে আমার সঙ্গে কথা না বললে আমি ডাকতে পারি না।

তখন আমি পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরালাম। রেণুর সামনে সচরাচর সিগারেট খাইনা। রেণু জানে, আমি সিগারেট আবার ছেড়ে দিয়েছি। ও ভীষণ রেগে যাবে। কিন্তু এইটাই আমার প্রতিবাদ। আমি কোনো ঘরে ঢুকলে রেণু আর সবাইকে ফেলে প্রথমেই আমার সঙ্গে কথা বলবে, আমি এটা চাই।

পরিচালক দেবুদা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, এই কবি, কবি, তুমি এবার এদিকে এসো!

বড় চুল-ওয়ালা একটি ছেলে উঠে দাঁড়ালো। চোখে একটা উদাস উদাস ভাব। ছেলেটিকে দেখে আমার বেশ মজা লাগলো। এর নামই কি কবি, না কবিতা লেখে? অথবা কবির ভূমিকায় অভিনয় করছে? মুখের মধ্যে একটা পান্তুয়া ভরে কথা বললে যে-রকম হয়, এর গলার আওয়াজ সেই রকম।

দেবুদা তাকে ঠিক মতন দাঁড় করিয়ে দিলেন। বাঁ হাতটা বাউলের মতন উঁচুতে তোলা। সে এই ভাবে কবিতা বলতে বলতে মঞ্চে ঢুকবে। সে একজন আধুনিক কবি। অর্থাৎ আধুনিক কবির ব্যঙ্গ চিত্র। শনিবারের চিঠি এবং প্রমথনাথ বিশীর লেখা-লেখির জন্য আধুনিক কবিদের নিয়ে ব্যঙ্গ করা বেশ ফ্যাসন হয়েছে। একটু ক্ষণের

মধ্যেই জানতে পারলাম, যে ছেলেটি অভিনয় করছে, সে নিজে সত্যিই একজন কবি। প্রত্যেক পাড়াতেই যেমন একজন পাড়া-কবি থাকে। সে পান্তুয়া-গলায় উদ্ভট সব লাইন বলে যেতে লাগলো।

আমার অসহ্য বোধ হলো। আজকাল আমি কবি-টবিদের দু' চক্ষে দেখতে পারি না। ছেলেটির অভিনয়ে ঘরের মধ্যে হাসির ফোয়ারা পড়ে গেছে। আমি রেণুর দিকে একবার তীব্র চোখে তাকিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

হনহন করে হেঁটে এসে দাঁড়ালাম মোড়ের মাথায়। রেণু আজ আমাকে অপমান করেছে। এক একটা দিন আসে এই রকম। প্রত্যেকটি ঘটনাই আমার বিরুদ্ধে যায়। ঘটনাগুলো ষড়যন্ত্র করে ঘটতে থাকে। বিকেলবেলা আমার অতখানি মন খারাপ হবার পর রেণুর কাছে এসে একটু শান্তি কি প্রাপ্য ছিল না?

এখন সত্যিই আর আমার যাবার কোনো জায়গা নেই। যাবার জায়গা নেই বলেই আমি বাড়িতে গিয়ে পালিয়ে থাকবো না। সারা রাত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবো।

—খুব সিগারেট খাওয়া হচ্ছে?

চমকে পাশে তাকালাম। কখন যেন ম্যাজিকের মতন রেণু এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে।

কোনো কথা না বলে আমি রেণুর দিকে কড়া ভাবে তাকিয়ে রইলাম। রেণু আবার বললো, সিগারেট ফেলে দাও এক্ষুনি।

—না। কেন ফেলবো?

—তুমি আমাকে না ডেকেই চলে এলে যে?

—আমি তো তোমাকে ডাকতে যাই নি।

—তবে? রিহার্সালের ওখানে গিয়েছিলে কেন?

—এমনিই।

রেণু এক পা এগিয়ে এসে বললো চলো, আমাদের বাড়িতে চলো। ওখানে বসে কথা বলবো।

—না, তোমাদের বাড়িতে যাবো না।

—এত রাগ রাগ করে কথা বলছো কেন? কি হয়েছে কি?

—তুমি ওদের ওখানে আমার সঙ্গে কথা বলো নি কেন?

—এর উত্তরটা খুব সোজা। তোমার বোঝা উচিত ছিল।

—না, আমি অতসব বুঝতে পারি না। কি?

—আমার লজ্জা করছিল।

একটু থেমে রেণু আবার মিনতি করে বললো, আমাদের বাড়িতে আজ একবারটি এসো। নিচেই বসবে—লক্ষ্মীটি এসো।

—তোমার ছোটকাকা—

—বাজে কথা বলো না। ছোটকাকা তোমাকে কোনোদিন বারণ করেন নি।

বিকেল থেকেই মনটা খুব দুর্বল হয়ে আছে, তাই আর বেশী জেদ দেখাতে পারলাম না। অনেকদিন পর রেণুদের বাড়িতে ঢুকলাম। ঢুকেই কয়েকটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। বড় গেট দিয়ে ভেতরে এসে উঠোন ও ঠাকুরদালানের পাশেই একটা নতুন পাঁচিল উঠেছে। উঠোনের পাশে আর একটা ঘর। প্রশ্ন-চোখে রেণুর দিকে চাইতেই ও জানালো ভাড়া দেওয়া হবে।

বুঝতে পারলাম, এ বাড়ি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়তে আর বেশী দেরি নেই। এই সব

খনেদী পরিবার—নিজের বসত বাড়িতে বাইরের লোককে এনে ভাড়াটে বসাবে, আগে চিন্তাও করা যেত না। রেণুদেরই আর দু' তিনটি ভাড়া বাড়ি এবং মফঃস্বলে জমিদারী ছিল শুনেছিলাম। কিন্তু এদের বাড়িতে অধিকাংশ পুরুষই কোনো কাজ করে না, অথচ সকলেরই ব্যয়বহুল বিলাসী জীবন—বিষয় সম্পত্তিগুলো তাই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। রেণুর ছোটকাকার একমাত্র কাজ মামলা-মোকদ্দমা করা।

যেটা বিজুর পড়ার ঘর ছিল সেটা এখন বারোয়ারি বসবার ঘর হয়েছে। সোফার ঢাকনাগুলো ময়লা। দেয়ালগুলো চুনকাম হয়নি বহুদিন। সেই ঘরে এসে বসলাম।

রেণু জিজ্ঞেস করলো, মায়ের সঙ্গে দেখা করবে না?

রেণুর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে ওপরে যেতে হবে। তা হলে বিজুর মায়ের সঙ্গেও দেখা করা উচিত। অনেকদিন পরে এসেছি। ওপরে গেলে রেণুর অন্যান্য কাকা-কাকীমাদেরও প্রণাম করা দরকার। একটু ইতস্তত করে বললাম, পরে যাবো।

—তুমি কি করে জানলে আমি মল্লিকাদের বাড়িতে আছি?

—সুবীর বললো।

—সুবীর কে?

—ঐ যে লম্বা সুবীর, তোমাদের পাড়ার।

—ও বুঝি আজকাল তোমার বন্ধু?

—হ্যাঁ বন্ধুই তো। যদি হয়ই বন্ধু, তাতে কি হয়েছে?

—কিছু না। তুমি আজকাল কোথায় থাকো, কাদের সঙ্গে মেশো, আমি কিছুই জানি না। এতদিন কোথায় ছিলে?

—যেখানেই থাকি না কেন, তোমার তো কোনো ক্ষতি হয় নি! তুমি তো দিব্যি নাটক-ফাটক নিয়ে মেতে আছো।

—আমার সঙ্গে রাগ-রাগ করে কথা বলবে না বলে দিচ্ছি।

—বেশ করবো! তুমি যে নাটকে অভিনয় করছো, আমাকে তা জানাও নি কেন?

—তুমিও তো ইলেকশান নিয়ে খুব হৈ হল্লা করছিলে খবর পেয়েছি। সে সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে, আমি পছন্দ করি কিনা? যত সব বখাটে ছেলের সঙ্গে মিশে বিড়ি সিগারেট খেতে শিখছো।

—মোটেই তারা কেউ বখাটে নয়। রাজনীতি করা আর এইসব নাটক করা কি এক হলো? রেণু তুই কি দিন দিন ইডিয়েট হয়ে যাচ্ছিস?

একবার মুখ থেকে কথা বেরিয়ে গেলে তা আর ফেরানো যায় না। এই সুরে রেণুর সঙ্গে কখনো কথা বলি নি। কিন্তু রেণুকে আজ আঘাত দিতেই ইচ্ছে করছে। রেণুর হাতটা চেপে ধরে কঠোর ভাবে বললাম, লোকজনের সামনে আমার সঙ্গে কথা বলতে তুই বুঝি অপমানিত বোধ করিস? আজকাল প্রায়ই দেখছি...

রেণু আস্তে আস্তে বললো, হাত ছাড়ো।

—ঐ দেবুদা লোকটা ভালো নয়। আমি দেখেই বুঝতে পেরেছি।

—আমি বুঝি আর কারুর সঙ্গে মিশবো না? তুমি তাই চাও?

চট করে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। আসলে আমি তাই চাই। মুখে এটা বলতে পারা সম্ভব নয়। আর কেউ রেণুর দিকে গভীরভাবে তাকাবে কিংবা কেউ অভিনয় শেখাবার ছলে ওর চিবুক স্পর্শ করবে, এই চিন্তাও আমার পক্ষে অসহ্য। আমার সাংঘাতিক ঈর্ষা।

মুখে কিছু বলতে না পেরে আমি চট করে উঠে দাঁড়িয়ে রেণুকে জড়িয়ে ধরলাম। রেণু কিছু বলবার আগেই আমি ওকে টানতে টানতে নিয়ে এলাম দরজার পাশেই, দেয়ালের গায়ে। ওর বুকের ওপর রাখলাম আমার মুখ।

রেণু বললো, বাদলদা, তুমি অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছ।

—হয়েছিই তো। আরও হবো।

—আমি কিন্তু চেঁচিয়ে কারুকে ডাকবো এবার।

রেণুকে ছেড়ে দিয়ে আমি সরে দাঁড়ালাম। রেণু এরকম নীরস গলায় কখনো আমাকে নিষেধ করেনি। আমি ভালো হতে চাই। আমি উঁচু মানুষ হতে চাই। আমি অন্য সব জায়গায় হেরে গেলেও রেণুর কাছে এসে সান্ত্বনা পেতে চাই। কিন্তু আজ রেণুই বলছে, আমি খারাপ হয়ে গেছি। হঠাৎ আমার চোখে জল এসে গেল, রেণু যাতে দেখতে না পায় তাই আমি মুখটা ফিরিয়ে নিলাম।

রেণু বললো, তুমি পাগলের মতন যখন তখন এরকম যা তা কাণ্ড করবে না বলে দিচ্ছি।

—রেণু, তুমি আমার নও?

কি গভীর আর্তি নিয়ে যে এ প্রশ্ন করেছিলাম, তা আর কারুকে বোঝানো যাবে না। ছেলেবেলা থেকে জানি, রেণু আমার। সুতরাং তাকে নিয়ে আমি যা খুশী করতে পারি। রেণু কি তা অস্বীকার করতে পারবে? এটা যেন একটা চ্যালেঞ্জ।

এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া হলো না। বাইরের উঠোনে অনেক লোকের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। রিহার্সাল ভাঙার পর দেবুদা তাঁর দলবল নিয়ে এ বাড়িতে চলে এসেছেন।

এ বাড়ির পরিবেশ সত্যি অনেক বদলে গেছে। রেণুদের বাড়ি রীতিমতন রক্ষণশীল ছিল, যখন তখন বাইরের লোকেরা এসে এ বাড়িতে কোনো মেয়ের সংগে কথা বলতে পারতো না আগে।

দেবুদা জিজ্ঞেস করলেন, রেণু, হঠাৎ তুমি চলে এলে যে?

আমি লক্ষ্য করলাম, দেবুদাকে রেণু বেশ সমীহ করে। কয়েক মাস আগেও দেখেছি, রেণু বাইরের লোকজনের সংগে সহজভাবে কথা বলতে পারতো না। সবাই ওকে গম্ভীর বলতো। এখন রেণু অনেক কথা বলে। মেয়েরা এত তাড়াতাড়ি বদলে যায়!

রেণু বললো, বাঃ, আমার তো আজ হয়ে গেল। আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। দেবুদা, বসুন।

সকলের বসবার জায়গা নেই। আমি উঠে দাঁড়ালাম। দেবুদা ব্যস্ত হয়ে বললেন, আপনি উঠলেন কেন, বসুন, বসুন।

রেণু আমার সংগে দেবুদার আলাপ করিয়ে দিল। দেবুদা সোৎসাহে বললেন, হ্যাঁ, একটু আগে রিহার্সাল রুমে দেখলাম না? আপনাকে মশাই আমাদের খুব কাজে লাগবে। ঠিক এইরকম একটা রোগা লম্বা চেহারা আমাদের দরকার। আপনি অভিজিতের রোলটা করবেন। কি রেণু এঁকে অভিজিতের রোলে মানাবে না?

রেণু মুচকি হেসে বললো, হ্যাঁ, মানাবে।

আমি শুকনোভাবে জানালাম, অভিনয় টভিনয় আমার আসে না।

দেবুদা বললেন, সে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা সবাই তো অ্যামেচার—

রেণু বললো, বাদলদা, তুমি করো না একটা পার্ট।

রেণু আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছে। আমাকে লোকজনের সামনে রাগিয়ে দিতে চাইছে। আমি চুপ করে রইলাম।

দেবুদা বললেন, আচ্ছা, আপনি অরুণের ভাই ভাস্করের বন্ধু না? অরুণের কাছে আপনার কথা শুনেছি। আপনি তো কবিতা টবিতা লিখতেন। এখন আর লেখেন না?

এর প্রত্যেকটি কথায় যেন আমার গালে ঠাস ঠাস করে চড় মারা হচ্ছে। কেউ আমার কবিতা লেখার প্রসঙ্গ তুললেই অপমানে আমার গা জ্বলে যায়।

দেবুদা লোকটি বেশ হাসিখুশী স্বভাবের। আমার ব্যবহারের আড়ষ্টতা তিনি লক্ষ্য করলেন না। দু' এক মিনিটের মধ্যেই আবার নাটকের আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়লেন। থিয়েটারের নেশায় যাদের পেয়ে বসে, তারা এরকমই হয়। রেণুরও বেশ উৎসাহ আছে দেখছি।

ওদের কথা শুনে বোঝা গেল, দেবুদার সঙ্গে মল্লিকার চেনা ছিল। মল্লিকার উৎসাহেই রেণুকে নাটকের দলে যোগ দিতে হয়েছে। নাটকের অভিনয়ের ব্যাপারে সে রেণুর কোনো আগ্রহ আগে দেখিনি। এখন খানিকটা মেতে উঠেছে মনে হয়। নিশ্চয়ই এতে রোমাঞ্চ আনে।

হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম আমি। রেণুর সঙ্গে আর একটাও কথা বলি নি। বাইরে এসেই ঠিক করে ফেললাম, রেণু যদি নাটকের অভিনয় না ছাড়ে, তা হলে রেণুর সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। দেবুদা যদি পারে তো রেণুকে নিয়ে নিক। আমার চাই না। পৃথিবীতে আমার আর কিছুই দরকার নেই।

॥ ৭৮ ॥

বুলবুল চেয়েছিল সূর্যকে নিয়ে সে আলাদা কোথাও বাড়ি ভাড়া করে থাকবে। এমনকি, সে এ শহর ছেড়ে চলে যেতেও চেয়েছিল। সূর্য রাজি হয়নি। এ বাড়িতেই সে বেশ আছে।

এতগুলো দিন কেটে গেল, তবু বুলবুল বুঝতে পারে না, সূর্য কি চায়। ও কক্ষনো নিজের কথা কিছু বলে না। তবে, লোকটা তাকে ভালোবাসে, এটা সত্যি। এত যত্ন করে তো আগে কেউ বুলবুলকে ভালোবাসে নি। কিন্তু মেয়ে মানুষ হয়ে বুলবুল এইটুকু অন্তত বুঝেছে যে শুধু মেয়েমানুষের ভালোবাসায় পুরুষ মানুষের মন ভরে না। ওদের আরও কিছু দরকার। বুলবুল ভেবেই পায় না, সূর্যকে নিজের সব কিছু উজাড় করে দিয়েও আর কি দিতে পারে। এই বন্ধ বাড়িটার পরিবেশ ছেড়ে বাইরের খোলামেলা হাওয়ায় গেলে হয়তো আরও আনন্দ পাওয়া যেত। বুলবুলের বড় সাধ, একবার সে সূর্যকে নিয়ে সমুদ্রের ধারের কোনো দেশে বেড়াতে যাবে। কিন্তু সূর্য গা করে না।

দিনের বেলা বাড়িটা নিঝুম হয়ে থাকে। সকালে দশটা-এগারোটার আগে কেউ বিছানা ছেড়ে ওঠে না। ঘুম থেকে ওঠার পরও সব কিছুর মধ্যেই একটা আলস্যভাব। যখন তখন হাই ওঠে। এ বাড়ির বাসিন্দাদের কারুর যেন খিদে নেই, তৃষ্ণা নেই। নারীদের চুল বিস্রস্ত, ঠোঁটে গত রাত্রির পান খাওয়ার দাগ, চোখের সুর্মা খানিকটা

মুছে গেছে, পোশাকের দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। শুকনো ফুলের মালাগুলো ছড়িয়ে থাকে বারান্দায়।

অনেকের ঘরেই প্রত্যেকদিন রান্না হয় না। নোকররা দোকান থেকে খাবার এনে দেয়। সেই দোকানের শালপাতার ঠোঙা থেকেই খাওয়া হয়ে যায়, থালা বাসন বার করার ঝামেলাও নেয় না। আবার কেউ যদি শখ করে রান্না করতে বসে, অন্য ঘরের মেয়েরা ভিড় করে এসে দাঁড়ায় তার রান্না ঘরের দরজায়।

অধিকাংশ ঘরের মেয়েরাই একলা থাকে। এদের মধ্যে যাদের বাঁধা প্রেমিক আছে, তাদের সেই সব প্রেমিকরাও দিনের বেলা থাকতে চায় না কখনো। তবলচি বা দালালরা কখনো কখনো টাকা চাইতে আসে, বারান্দার উবু হয়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে যায়—দিনের বেলা সময়ের কোনো দাম নেই এখানে। কারুর কারুর ঘরে বুড়ি মা এবং দু' একটা বাচ্চাও থাকে। সব মিলিয়ে সাত আটটি বাচ্চা আছে এ বাড়িতে। তাদের হুটোপুটির শব্দ ক্বচিৎ শোনা যায় বটে, কিন্তু ঠিক সন্ধের পর বাচ্চাগুলো যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় কে জানে!

সূর্য সারাদিন প্রায় শুয়ে শুয়েই কাটায়। বুলবুল হাজার চেষ্টা করেও তাকে বাইরে পাঠাতে পারে না। বিছানায় মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকাই সূর্যর সব চেয়ে প্রিয় ভঙ্গি। বুলবুল খাবার নিয়ে এসে ডাকাডাকি করলে সূর্য উঠে বসে, মুখ-টুখ না ধুয়েই খাবার খায়। এ বাড়িতে চায়ের রেওয়াজ নেই। পাথরের মস্ত বড় গ্লাস ভর্তি গরম দুধ খেতে হয় তাকে। তারপর সিগারেট ধরিয়ে ধীরে সুস্থে গোসলখানায় যায়। ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়ে।

দুপুরে আর একবার স্নান করার জন্য উঠতে হয়। প্রত্যেকদিন স্নান করার ইচ্ছে হয় না তার, কিন্তু বুলবুল এ ব্যাপারে খুব কড়া। ঠেলেঠুলে তাকে পাঠাবেই। বুলবুলের স্নানের বাতিক আছে। সারা দিনে সে নিজে অন্তত তিনবার স্নান করে, জ্বরজারি হলেও বাদ দেয় না।

স্নান করতে যাবার আগে সূর্য তার শরীরের জড়তা ভাঙবার জন্য হঠাৎ লাফা-লাফি শুরু করে। প্রথমে শ' খানেক ডন বৈঠক দেয়, তারপর এদিক-সেদিক শরীর মোচড়ায় আর লাফায়। লাফিয়ে লাফিয়ে সে ঘরের ছাদ পর্যন্ত ছোঁবার চেষ্টা করে, কখনো এলোমেলো তাণ্ডব নৃত্য লাগিয়ে দেয়। সেই সময় বুলবুল হেসে একেবারে কুটিকুটি হয়।

এই ব্যায়ামের সময় সূর্যর নৃত্যস্পৃহা দেখে বুলবুল প্রথম প্রথম কয়েকদিন চেষ্টা করেছিল সূর্যকে নাচ শেখাবার। কয়েকদিন পরেই সে চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়েছে। সূর্যর ব্যায়াম করা শক্ত শরীরে এখন আর ভারতীয় নৃত্য আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

সূর্যর আসল নামটি আর কেউ মনে রাখে নি, তাকে সকলে ডাকে বাঙ্গালীয়া বলে। প্রথম প্রথম বাঙ্গালীয়া বাবু বলতো, এখন বাবু শব্দটাও অতিরিক্ত হয়ে গেছে। এখানকার সকলের সঙ্গেই তার বেশ ভাব। অন্য ঘরের মেয়েরা তার সঙ্গে খুব সহজ ব্যবহার করে, কখনো কখনো প্রয়োজন হলে তারা নিঃসংকোচে এসে বলে, বাঙ্গালীয়া, পাঁচ ঠো রূপিয়া দেও তো।

দিনের বেলা মেয়েরা এখানে শুধু একটা ঘাগরা আর কাঁচুলি পরে থাকে। কারুর কারুর আবার কাঁচুলিরও বালাই থাকে না, শুধু ঘাগরাটাই বুক পর্যন্ত টেনে গিঁট বেঁধে রাখে—সেই অবস্থায় সূর্যর সামনে পড়ে গেলে তারা একটুও লজ্জা পায় না। এত বড় বাড়িতে গোসলখানা মাত্র দুটি এবং স্নানের জায়গাটি একতলায় ইঁদারার

ধারে এবং উল্মুক্ত। সব সময়েই ভিড় লেগে থাকে। স্নান করতে এসে সূর্যকে প্রায়ই আধঘণ্টা একঘণ্টা দাঁড়াতে হয়, অন্য মেয়েরা স্নান করতে করতেই সূর্যর সঙ্গে গল্প এবং রঙ্গরস করে।

গোড়ার দিকে সূর্যকে দেখে সকলেই নিশ্চিত দারুণ বিস্ময় হয়েছিল। একটা লোক অন্য এক বাবুর সঙ্গে ফূর্তি করতে এসে তারপর একেবারে থেকেই গেল। সেই যে এলো আর একদিনের জন্যও আর কোথাও গেল না? কোনো মেয়ের জন্য কেউ কি এ রকম সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে থাকতে পারে? তাও কিনা বুলবুলের সঙ্গে? এ-বাড়ির মেয়েদের মধ্যে বুলবুলেরই আকর্ষণ সব চাইতে কম, তাকে কেউ সুন্দরী মনে করে না, তার গালে বসন্তের দাগ এবং সে ভালো গানও জানে না। নাচতে জানে বটে, কিন্তু সুরৎ না থাকলে মেয়েমানুষের নাচের আবার দাম কি? সেই বুলবুলের কাছেই কিনা চলে এলো কোথা থেকে এক রাজপুত্তুর। যেমন সুন্দর স্বাস্থ্য, তেমন ফর্সা গায়ের রং। টাকা পয়সাও খরচ করে এন্তার। সবচেয়ে বড় কথা, মানুষটার শরীরে এক বিন্দু রাগ নেই, যে যা বলে তাই শোনে। —

কারুর কারুর মনে এক সময় সন্দেহ হয়েছিল যে সূর্য বোধহয় কোনো ফেরারী আসামী, এখানে এসে লুকিয়ে আছে। এরকম ঘটনা বিরল নয়। কিন্তু কয়েক মাস কেটে গেল, সে রকম কিছুই বোঝা গেল না। মাঝে মাঝে এখানে পুলিসের লোকও আসে, কিন্তু তারা সূর্যকে নিয়ে মাথা ঘামায় নি। অন্য ঘরের মেয়েরা এখন বুলবুলের ভাগ্যকে ঈর্ষা করে। তবে এখানে একরকমের কঠোর নীতিবোধ আছে। অন্য ঘরের কোনো পুরুষকে কক্ষণো কেউ ছলাকলায় ভুলিয়ে নিজের ঘরে ডেকে আনবে না। সেই পুরুষ নিজে থেকে আসতে চাইলেও রাজি হবে না।

সারাদিন সূর্য পড়ে ঘুমোয়। সন্ধেবেলায় এ বাড়িতে যখন একটা সাজসাজ রব পড়ে যায়, তখন সেও জেগে ওঠে। মেয়েরা যেমন সাজ-সজ্জা বদলে প্রসাধন সেরে নেয়, সূর্যও তেমনি একটু সাজগোজ করে। বুলবুল তার জন্য কয়েকটা শেরওয়ানি আর কলিদার সিল্কের পাঞ্জাবি বানিয়ে দিয়েছে। সূর্যর এখন মস্তবড় গোঁফ এবং মুখভর্তি দাড়ি। ঐ সব পোশাকে তাকে আর বাঙালী বলে চেনাই যায় না। রাজপুত কিংবা শিখ বলেই মনে হয়। জামা কাপড় বদলানো হয়ে গেলে বুলবুল নিজের হাতে সূর্যর চুল আঁচড়ে দেয়, আতর মাখিয়ে দেয় গোঁফে। বুলবুল নিজেও খুব পরিপাটি করে সাজে। হাতে আঁকে মেহেদি, ঠোঁট দুটো লাল টুকটুকে করে, লম্বা বেণী ঝোলায়। একটা মোতির মালা গলায় পরে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে আয়নার সামনে। তারপর মুচকি হেসে ভাঙা ভাঙা বাংলায় সূর্যকে জিজ্ঞেস করে, কেমুন দেখাচ্ছে? এই, বলো না?

বুলবুলের সব সাজগোজই এখন সূর্যর জন্য। তার ঘরে এখন আর অন্য কেউ আসে না। অন্য ঘরে নিত্য নতুন বাবু আসে, নাচ গান যখন জমে ওঠে, তখন বুলবুল আর সূর্য পরস্পরকে নিয়ে মত্ত থাকে।

এক-একটা দিন অবশ্য অন্য ঘরের কোনো কোনো মেয়ে তাদের বাবুদের নিয়ে চলে আসে এ ঘরে। সকলে মিলে এক সঙ্গে হই চই হয়। গান বাজনা সাধারণত বেশী লোক না হলে জমে না। অন্য কোনো ঘরে মাইফেল বসলেও তারা সূর্য আর বুলবুলকে ডেকে নিয়ে যায়। সকলের কাছেই ওরা দু' জন প্রিয়। সূর্য সারাদিন প্রায় চুপচাপ কাটালেও এই সময়ে বেশ ফূর্তিবাজ হয়ে ওঠে। প্রচণ্ড মদ খায় আর প্রচুর সিগারেট ফোঁকে। যে-কোনো রসিকতায় হেসে ওঠে হো-হো শব্দে। মাত্র কয়েক

মাস আগেও সে যে মদ বা সিগারেট স্পর্শ করতো না—এখন তাকে দেখে তা কল্পনাও করা যায় না। শেষ রাত্রের দিকে অন্যরা ক্লান্ত হলেও সে ক্লান্ত হয় না একটুও। তার দিন বেশ ভালোই কেটে যাচ্ছে।

বিকেলের পড়ন্ত আলোয় টানা বারান্দায় গোল হয়ে তাস খেলছিল আট দশটি নারী, এদের রূপ ও যৌবন ছাড়া আর কোনো পরিচয় নেই। এরা আনন্দের পণ্য। সাধারণ সংসারী নারীদের তুলনায় এদের দুঃখ বোধ কম। তাস খেলাটা একটা নিমিত্ত মাত্র, আসলে ওরা রসের গল্পে বসেছে। সকলেরই চুল এখন খোলা। পিঠের ওপর ছড়ানো, এ ওর গায়ের ওপর ভর দিয়ে পা মেলে বসেছে, অনেকেরই বুক ও পেটের অনেকখানি অংশ অনাবৃত, কারণ কাছাকাছি কোনো পুরুষ নেই। হঠাৎ হঠাৎ উলু দেবার মতন ওরা কলস্বরে হেসে ওঠে, গড়িয়ে পড়ে একজন আর একজনের গায়ে—কেউ কেউ নিজের উরুতে চাপ চাপড় মারে। ওদের এই সময়কার হাসিতে অসভ্যতার ঝংকার আছে, তার মানেই গত রাত্রের কোনো গূঢ় গল্প।

ক্রমে আলো মিলিয়ে আসে, নোকররা ঘরে ঘরে ধূপ জ্বালিয়ে যায়, ফুলওয়ালা মালা নিয়ে এসে সিঁড়ির কাছে দাঁড়ায়। ওদের তবু ওঠার নাম নেই। একজন বুড়ি এসে ওদের বকাবকি করতে শুরু করে, গা ধুয়ে সেজেগুজে নেবার জন্য তাড়া দেয়। আঁধার হয়ে এলো, এক্ষুনি যে বাবুরা আসতে শুরু করবে। ঐ বুড়ি পরীবানুর মা—এ বাড়িতে পরীবানুই সবচেয়ে রূপসী, তার কাছে বেশী লোক আসে। সকলের ধারণা ঐ বুড়ি এত টাকা জমিয়েছে যে ভালো মহল্লায় তিনখানা বাড়ি কিনতে পারে।

অগত্যা খেলা ভাঙবার পর যে-যার ঘরে ফিরে যায়। হাসির রেশ তখনও লেগে থাকে। বুলবুল নিজের ঘরে এসে সেদিন সাজগোজের দিকে গেল না, ধুপ করে বিছানায় শুয়ে পড়লো। সূর্য ততক্ষণে জেগে উঠে সিগারেট ধরিয়ে নিঃশব্দে কি চিন্তা করছিল। বুলবুলকে শুয়ে পড়তে দেখে একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, একি, শুয়ে পড়লে যে?

বুলবুল মুখ দিয়ে একটা শুধু আদরের উঁ উঁ শব্দ করলো।

সূর্য নিজে উঠে বসে বললো, এই, সন্ধ্যেবেলা শুয়ে থাকে নাকি? ওঠো। আজ ঠাকুরসাহেবের আসবার কথা না?

বুলবুল বুকের কাছে হাত দুটি এনে গুটি শুটি হয়ে বললো, আমার শীত লাগছে।

সূর্য বুলবুলকে ছুঁয়ে দেখলো তার তার গা ছ্যাঁকছেঁকে, প্রায়ই বুলবুলের একটু আধটু জ্বর হয়। কিন্তু এমন পাগল মেয়ে কিছুতেই ওষুধ খাবে না। কাছাকাছি এক বৃদ্ধ হেকিম সাহেব থাকেন, তিনি এদের চোখে একেবারে ধন্বন্তরি—তাঁর দেওয়া পুরিয়া খায় মাঝে মাঝে। জ্বর কমুক বা না কমুক সেই অবস্থাতেই খুব করে আবার চান করে, তারপর ছলছলে চোখে সুর্মা মাখে।

সেদিন ঠাকুরসাহেবের আসবার কথা। ঠাকুরসাহেব যেদিন আসেন সেদিন সারা বাড়িতে এক বিরাট উৎসব পড়ে যায়। ঠাকুরসাহেব নিজেও সংগে আনেন সাত আট জনের একটি দল—সারা বাড়ির সবাইকে এক ঘরে জড়ো করে নাচগানের এক জলসা বসিয়ে দেন। খাবার দাবার মদ ইত্যাদি সব কিছুরই খরচ ঠাকুরসাহেবের। তাঁর চেহারাটা পুরোনো আমলের জমিদারদের মতই—পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েস, গলার আওয়াজটা বাজখাঁই। ঠাকুরসাহেবের রোজগারের সূত্র কি কেউ জানে না, তবে এখানে

অনেকের ধারণা, চম্বলের ডাকাতদের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ আছে। তবে লোকটি গান বাজনার প্রকৃত সমঝদার।

সেদিন রাত আটটার পর ঠাকুরসাহেব দলবল নিয়ে পরীবানুর ঘরে জমিয়ে বসেছেন, তখনও বুলবুলের ঘর অন্ধকার। একটি মেয়ে বাইরে থেকে এসে ডাকাডাকি করতে লাগলো। বুলবুল, বুলবুল, এ বাঙ্গালীয়া—

ঠাকুরসাহেব এর আগে কয়েকবার এসেছিলেন, সূর্যর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে। তিনি নিজেই খোঁজ করেছেন সূর্য আর বুলবুলের।

সূর্য মেয়েটিকে জবাব দিল, আজ আমরা যাবো না। বুলবুলের তবিয়ৎ ভালো নেই।

বুলবুল সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে বললো, আমি যাবো না, তুমি যাও।

সূর্য বললো, না, আমারও ইচ্ছে করছে না।

বুলবুল অনুযোগ করে বললো, আমার জন্য তুমি শুধু শুধু ঘরে বসে থাকবে কেন! এ কি রকম মরদ।

সূর্য একদৃষ্টে বুলবুলের দিকে তাকিয়ে রইলো। সেই দৃষ্টিতে কি রকম যেন অস্বস্তি লাগে। চেনা মানুষকে কি কেউ এতক্ষণ ধরে দেখে? বুলবুল জিজ্ঞেস করলো, কি দেখছো, অমন করে?

সূর্য বললো, তুমি বুঝতে পারো না?

—না। তুমি প্রায়ই এরকম সোজাসুজি তাকিয়ে থাকো, আমি মানে বুঝতে পারি না।

—তোমার মধ্যে যে আর একটা বুলবুল আছে, আমি তাকে দেখি।

—আর একটা বুলবুল? আর কেউ নেই, আমার ভেতরে আর কিছু নেই!

—আমি ঠিক দেখতে পাই।

—তোমার ভেতরে যে আর একজন সূরয আছে, তা কিন্তু আমি ঠিক জানি। তুমি যদিও আমাকে বলো নি।

—বলার দরকার কি! আমার ভেতরের মানুষটাই তো তোমার ভেতরের মানুষটাকে ভালোবাসে।

—বুলবুল বললো, ঠিক আছে, ওঠো, ওঠো,। তুমি যাও, ঠাকুরসাহেব তোমাকে ডাকাডাকি করছেন।

সূর্য তবু যেতে রাজি নয়। ওদিকে পরীবানুর ঘর থেকে প্রবল হুল্লোড়ের আওয়াজ ভেসে আসছে। আলাহিয়া বিলাবলে গান ধরেছে কেউ। অনেকে মিলে এক সঙ্গে হাততালি বাজিয়ে তাল দিচ্ছে। বুলবুল জানে, সূর্য এসব ভালোবাসে।

সে তখন উঠে পড়ে বললো, ঠিক আছে, চলো আমিও যাচ্ছি।

সূর্য বললো, তুমি এই জ্বর গায়ে নিয়ে কোথায় যাবে? না, আজ যেতে হবে না।

—আমার কিছু হবে না।

বাতি জ্বালিয়ে বুলবুল প্রসাধন করতে বসলো। সূর্য অনেক করে নিষেধ করলো তাকে, কিছুতেই শুনবে না। শেষ পর্যন্ত সূর্য বললো, তুমি সাজলে কি হবে। আমি যাবো না। আমার আজ আর ইচ্ছে নেই।

বুলবুল বললে, তুমি থাকো তা হলে। আমি একলাই যাই?

বুলবুল জানে, সূর্যকে তা হলে যেতেই হবে। সে কক্ষণো বুলবুলকে ছেড়ে একা ঘরে বসে থাকবে না।

একটু বাদে ওরা দুজন শরীবাবুর ঘরে ঢুকতেই সকলে এক সঙ্গে অভ্যর্থনা করলো ওদের। ঠাকুরসাহেব সূর্যকে রসিকতা করে বললেন, বাঙালীবাবু, আপনাকে এতক্ষণ দেখিনি! ফুল আর বুলবুল, একি কেউ একা একা ভোগ করে!

এখানে এই আনন্দের পরিবেশে অসুখের কথা বলা মানায় না। সূর্য বললো না বুলবুলের জ্বরের কথা। আর বুলবুলকে দেখে তো এখন আর কিছুই বোঝা যাবে না। সে এখন পাখির মতনই ছটফট করছে।

ঠাকুরসাহেব নিজের পাশে বসালেন সূর্যকে। ঠাকুরসাহেবের স্বভাব আছে, পুরুষদেরও কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলা। উৎসাহের আতিশয্যে এক একবার তিনি সূর্যর কাঁধ আঁকড়ে ধরে ধরে কাছে টেনে আনছেন আর সূর্যর কনুইতে একটা কঠিন কিছুর খোঁচা লাগছে। সূর্য সহজেই বুঝতে পারে, ঠাকুর সাহেবের কোমরে পিস্তল গোঁজা আছে। কোমরে পিস্তল গুঁজে নাচ গানের আসর জমানোটা মন্দ ব্যাপার নয়। ঠাকুরসাহেবের মুখে জর্দার ভুরভুরে গন্ধ—সেই গন্ধটা তাড়াবার জন্য সূর্য ঘনঘন হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দেয়।

বুলবুলকে দেখে কেউ ভাবতেই পারবে না যে তার শরীর খারাপ। ছুন্নির গানের সংগে তবলচি একটা চমৎকার বোল দিতেই বুলবুল পায়ে ঘুঙুর বেঁধে উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে লাগলো। সকলে একটা উল্লাসের শব্দ করলো। বুলবুলের পাতলা ছিপ-ছিপে দেহটা বিদ্যুতের মতন ঘুরতে থাকে। ছুন্নি আর তবলচি ক্রমশ লয় বাড়িয়ে দেয়। বুলবুল যেন চ্যালেঞ্জের সুরে তাদের কাছে ভাও বাৎলায়।

ঠাকুর সাহেব যত বেশী মাতাল হন, ততই তাঁর ফুর্তি বাড়ে। লোকটির প্রাণ শক্তি আছে বটে, সারারাতেও ক্লান্ত হন না। কাছাকাছি বসে থাকা যে কোনো নারী পুরুষের উরুতে চাপড় মেরে তিনি হৈ হৈ করে হাসতে থাকেন। আজ বুল-বুলের নাচ তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে—এ জন্য সব কৃতিত্ব যেন সূর্যর, সেই চোখে তিনি তাকান সূর্যর দিকে।

বুলবুলের এক-একটা নাচ শেষ হতেই সকলে বলে ওঠে, আরো, আরো! বুল-বুলের কোনো আপত্তি নেই, সে যেন বেশী উৎসাহ পেয়ে গেছে। এক একবার বিরতির সময় বুলবুল সূর্যর কাছে আসে তার গ্লাস থেকে মদে চুমুক দিতে। সূর্য তাকে চোখের ইশারায় জানাতে চায়, আর না। আজ আর থাক। বুলবুল ভ্রূক্ষেপ করে না, মুখ ফিরিয়ে নেয়। আজ এখানকার সবাইকে সে একাই মাতিয়ে রেখেছে।

রাত আড়াইটের সময় বুলবুল হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লে সূর্য তাকে কোলে করে নিয়ে আসে নিজের ঘরে।

॥ ৭৯ ॥

ভারতের যে কোনো শহরেই একজন না একজন বাঙালী ডাক্তার, উকিল বা অধ্যাপকের দেখা পাওয়া যাবেই। বুলবুল বেশ কয়েকদিন অসুখে ভোগার পর সূর্য যে ডাক্তারটিকে ডাকতে গেল, তাঁর নাম রাধাগোবিন্দ কর। অত্যন্ত রাশভারী মানুষ। সূর্যকে তিনি গ্রাহ্য করলেন না, গম্ভীরভাবে বললেন, পেসেন্টকে এখানে নিয়ে এসো। আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

সূর্য জানালো যে, রোগিণীর হাঁটাচলার ক্ষমতা নেই।

ডাক্তার বললেন, হাঁটতে না পারেন মাইজীকে বলো টাঙ্গা নিয়ে আসতে। আমার যাবার সময় হবে না।

সূর্য তখন ইংরেজিতে বললো, পুরো ভিজিট দিলে ডাক্তারদের কি রুগী দেখতে যাবার নিয়ম নেই?

ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মুখ তুলে তাকালেন। অবাক হলেও তিনি মুখের ভাবে তা প্রকাশ করেন না। সূর্যকে তিনি বাড়ির দারোয়ান-টারোয়ান মনে করেছিলেন—অনেক চাকর বা দারোয়ানের চেহারাও সুদর্শন হয়। সূর্য ডাক্তারবাবুকে যে বাড়িটিতে নিয়ে যেতে চাইছে—তিনি সেই বাড়িটির পরিচয় জানেন, সেই জন্যই আপত্তি। কিন্তু সে বাড়ির দারোয়ান ইংরেজি বলে না। তিনি বিরক্ত হলেন। তিনি ধমকের সুরে বললেন, আমার ইচ্ছে না হলে আমি রুগী দেখতে যাবো না, আমাকে কেউ জোর করতে পারে?

সূর্য একদৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে চেয়ে রইলো। বুলবুলরা ওদের চেনা হেকিম সাহেবের ওষুধ খায়। কিন্তু কদিন ধরে কিছুতেই বুলবুলের কাশির রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছে না। যে কয়েকজনের কাছে সে একজন বড় ডাক্তারের নাম জিজ্ঞেস করেছে, প্রত্যেকেই এই রাধাগোবিন্দ করের নাম বলেছে। কিন্তু কে জানতো, তিনি শুচিবায়ু-গ্রস্ত?

এখানে রাগারাগি করে লাভ নেই, তাই সূর্য অনুনয় করে বললো, আপনি গেলে বিশেষ উপকার হতো। আপনি দয়া করে চলুন না।

—ভিজিটকা রুপিয়া কৌন দেগা?

—ম্যায়—

চশমখোরের মতন ডাক্তার তক্ষুনি হাত বাড়ালেন। সূর্য একটি একশো টাকার নোট এক টাকার নোটের ভঙ্গিতে রাখলো টেবিলের ওপর। তিনি সেটা নিয়ে পকেটে পুরে উঠে দাঁড়ালেন। আদেশ করলেন, আমার ব্যাগটা নিয়ে চলো। গাড়ি ডাকো।

গাড়িতে ডাক্তার একটাও কথা বললেন না। বাড়ির সামনে এসে নাক কুঁচকোলেন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময়, অন্য একটি মেয়ে নামছিল—ডাক্তার এমনভাবে দেয়াল ঘেঁষে সরে দাঁড়ালেন, যাতে মেয়েটির হাওয়াও তাঁর গায়ে না লাগে।

বুলবুল বিছানার শুয়ে আছে চোখ বুজে। কুলসম নামে একটি মেয়ে হাওয়া করছে মাথার পাশে বসে। ডাক্তার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, এঃ, কি বিশ্রী অস্বাস্থ্য-কর ঘর! সব জানলা খুলে দাও। পর্দা সরাও!

বুলবুলের ঘরে খাট নেই, মেঝের ওপর পাতা বিছানা। সেখানে ডাক্তার বসলেন না। কুলসম ছুটে গিয়ে নিজের ঘর থেকে একটা মোড়া নিয়ে এলো। সেখানে বসে, রুগী দেখবার আগে ডাক্তার সূর্যকে প্রশ্ন করলেন ইয়ে জেনানা তুমহারা কোন হ্যায়?

সূর্য বললো, শী ইজ মাই ওয়াইফ।

ডাক্তার বিশ্রীভাবে হাসলেন। তারপর বললেন, জল গরম করতে বলো এক বাটি। রুগীকে উঠে বসতে বলো।

মনে হচ্ছে, তিনি সরাসরি রোগীর সঙ্গে কথা বলবেন না। তা হলে চিকিৎসা করবেন কি করে?

তিনি কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন বুলবুলের দিকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্টেথোসকোপটা বাড়িয়ে রাখলেন রোগিণীর পিঠে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন এবং নিজেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে লাগলেন ঘন ঘন।

কুন্দন গরম জলের বাটি নিয়ে এলো। আরও কয়েকজন এসে ভিড় করেছে দরজার সামনে। কুন্দন সূর্যকে বললো, বাঙালীয়া, ডেটল আউর সাবুন উধার রাখ দিয়া—

ডাক্তার এবার সত্যি সত্যি চমকে উঠলেন। আপাদমস্তক দেখলেন সূর্যকে। তারপর কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বাঙালী?

—হ্যাঁ।

ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর শুধু নীতিবাগিশ তাই নয়, অত্যন্ত বেশী রকমের প্রাদেশিক। রোগিণীর দিক থেকে নজর ফিরিয়ে তিনি ধমকে জিজ্ঞেস করলেন, হোয়াট আর ইউ ডুইং হিয়ার?

সূর্য উত্তর না দিয়ে কাঁধ ঝাঁকালো।

—তুমি কোথায় থাকো?

—এখানেই।

—কেন?

—আপনি রুগীকে কি রকম দেখলেন?

ডাক্তার ততক্ষণে স্টেথোস্কোপ গুটিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। অবজ্ঞার সুরে বললেন, এখানে এর কিছু করার নেই। একে হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও।

—ও হাসপাতালে যাবে না। যেতে চায় না।

—তা হলে আমার আর কি করার আছে?

—ওর কি হয়েছে কি?

—ওর কি হয়েছে, তা যে-কোনো অন্ধও বুঝতে পারে। এক্স-রে নিতে হবে, থুতু পরীক্ষা করাতে হবে—কিন্তু তার আগেই সঠিকভাবে বলে দেওয়া যায়, ওর দুটো লাংসেই ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। আগে কোনো রকম চিকিৎসা করায় নি?

—আগে তো ঠিক বোঝা যায় নি।

—এরা সাধারণত বুঝতে দেয় না। রোগের চিকিৎসা করালে আর অন্য পুরুষ মানুষের সর্বনাশ করবে কি করে?

ডাক্তার শেষের দিকে বাংলা কথা বলছিলেন বলে সূর্য একটু আশ্বস্ত বোধ করলো। বুলবুলের এসব কথার মর্ম বোঝার দরকার নেই। অন্য একজন সহৃদয় ডাক্তার ডাকলেই হবে। এই কাঠখোট্টা লোকটিকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না।

ডাক্তার গরম জলে অনেকক্ষণ ধরে হাত ধুলেন। ওদের তোয়ালে না ছুঁয়ে বার করলেন নিজের পকেটের রুমাল। সূর্যকে বললেন, চলো।

বাইরের দরজা পর্যন্ত এসে সূর্য হাত তুলে নমস্কার করে বললো, আচ্ছা—

ডাক্তার বললেন, আচ্ছা মানে? আমাকে চেম্বারে পৌঁছে দাও।

—আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি একটা গাড়ি ডেকে দিচ্ছি। আমি নিজে যদি না যাই।

—তোমাকে যেতে হবে।

—আমি তো এক্ষুনি যেতে পারছি না। পরে যদি আবার আপনার সঙ্গে দেখা করি—

—পরে আবার কি? তুমি এখনো এখানে থাকবে নাকি? তোমাকে আমি এখানে থাকতে দেবো না। তোমার লজ্জা করে না? দেখে তো ভদ্রলোকের ছেলে বলেই মনে হয়। বাঙালী জাতির কলঙ্ক!

সূর্য দৃঢ়ভাবে বললো, আমাকে এখানেই থাকতে হবে!

ডাক্তার আবার নাক কুঁচকে সূর্যর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, আমার স্ত্রী যদি শোনে, আমি এই বাড়িতে চিকিৎসা করতে এসেছি, তা হলে আমাকে এলাহাবাদে গিয়ে গঙ্গায় চান করে আসতে হবে, তা জানো? তোমার কথা শুনে আমি এলাম, আর তুমি আমার কোনো কথা শুনবে না?

সূর্য চুপ করে রইলো।

—ঐ মেয়েটির জন্য আর চিন্তা করে কোনো লাভ নেই।

—আপনি তো ওর চিকিৎসার কথা কিছুই বললেন, না।

ডাক্তার আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, নামকরা ডাক্তারদের একটা ট্র্যাজেডি কি জানো? তাদের হাতেই বেশী রুগী মরে! সকলে একেবারে শেষ সময়ে নিয়ে আসে আমাদের কাছে। এখানে আসবার আগেই আমি জানতাম!

—আপনি কি বলছেন?

—হাসপাতালে নিয়ে যাও আর যেখানেই চিকিৎসা করো—মাস দুএকের বেশী ঐ মেয়েটি বাঁচবে না।

—মাত্র চার পাঁচ দিন আগেও সুস্থ ছিল, কোনো কিছু বোঝা যায় নি।

—মেয়েছেলেরা পারে, মেয়েছেলেরা পারে। ওদের অনেক কিছুই বোঝা যায় না। এই সব রুগীকে বিধান রায়, নলিনী সেনগুপ্ত বা আসরফউল্লার মতন ডাক্তাররা হয়তো বাঁচাতে পারে, আমি পারি না।

সূর্য স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। এ সব কি বিশ্বাস করা যায়? বুলবুল, এত প্রাণবন্ত বুলবুল—

ডাক্তার পকেট থেকে একশো টাকার নোটটি বার করে বললেন, নাও—

—না, না, আপনার ফি আপনি নেবেন না কেন?

আবার বাঁকা হাসিতে তিনি ধিক্কার দিলেন সূর্যকে। নোটটা মুড়ে বাজে কাগজের মতন তিনি ছুঁড়ে দিলেন। আর কোনো মন্তব্য না করে হাত তুলে ডাকলেন একটা চলন্ত টাঙ্গা।

সূর্য নিজের ঘরে ফিরে আসার পর অনেকে মিলে ঘিরে ধরলো তাকে। কি বললেন, ডাক্তারসাব?

সূর্য হেসে বললো, খুব রাগ করলেন ওঁকে ডেকে এনেছি বলে। কিছুই হয়নি। সর্দি জমে গিয়ে রক্ত পড়ছে। অত বড় ডাক্তার এত ছোট অসুখ দেখেন না!

সকলে মত প্রকাশ করলো, তারাও এই কথাই বলেছিল। হেকিম সাহেবের দাবাই খেলে কোনো শক্ত অসুখ হয় না। বুলবুলকে আজই অনেকটা ভালো দেখাচ্ছে না?

বুলবুল বিছানায় উঠে বসে ক্লিষ্টভাবে হাসতে চেষ্টা করছে। মুখখানা চুপসে গেছে এই কদিনেই। তবুও বিশীর্ণ চন্দ্রলেখার মতন একটা রূপ আছে সেই মুখে। চুলে চিরুনি পড়ে নি দুতিনদিন।

সূর্য বললো, হ্যাঁ, আজ অনেক ভালো দেখাচ্ছে। ডাক্তারবাবু তো কোনো দাবাই পর্যন্ত দিতে চাইলেন না। বললেন, এমনিই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সেদিন সারা দিন ধরে সূর্য বারবার চোরা চোখে তাকাতে লাগলো বুলবুলের দিকে। আগের মতন আর সোজা তাকাতে পারছে না। জেলে থাকার সময় সে একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে দেখেছিল। সকলেই তার দিকে দারুণ সমীহের সঙ্গে তাকাতো। যেন তার শরীরে লেগেছিল মৃত্যুর প্রগাঢ় গাম্ভীর্য। বুলবুলও অনেকটা

সেই রকম। মাত্র দু'তিন মাস? এ কি স্বপ্ন?

সারা দিন সে বুলবুলকে হাসি খুশীতে রাখার চেষ্টা করলো। ভেতরে ভেতরে তার অসম্ভব দ্বন্দ্ব চলছে। এখন কি করা উচিত? হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করা উচিত নয়? তা হলে বুলবুলকে জানাতে হবে। হাসপাতালের খাটে বুলবুল একা শুয়ে আছে, এটা সে কিছুতেই কল্পনা করতে পারছে না।

জীবন থেমে থাকে না। সেদিনও অন্যান্য ঘরে সন্ধেবেলা বাবুরা এলো, হারমোনিয়াম, ঘুঙুর ও তবলার আওয়াজ শুরু হলো, যারা বুলবুলকে ভালোবাসে খুব, তারাও এক সময়ে নেশাগ্রস্ত গলায় খিলখিল করে হাসে।

বুলবুলের ঘরে সেদিন আলো জ্বললো না। সন্ধ্যে থেকে বুলবুলের আবার জ্বর এসেছে, মাঝে মাঝে কাশির দমকে বেঁকে যাচ্ছে পিঠ। সূর্য তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লো বুলবুল। সূর্য জেগে রইলো ঠায়।

একাগ্র হয়ে সে শুনতে লাগলো বুলবুলের নিশ্বাসের শব্দ। এখন থেকেই তার ভয় হচ্ছে, হঠাৎ বুঝি নিশ্বাস থেমে যাবে। মৃত্যু জিনিসটা কি রকম, তার কোনো নির্বাচন নেই? পৃথিবীতে এত মানুষ রয়েছে, তবু বুলবুলকেই মরতে হবে কেন? বুলবুল জীবনকে এত ভালোবাসে, আনন্দে ফুর্তিতে তার কখনো কোনো ক্লান্তি নেই, সেই বুলবুলকে মৃত্যু এসে কেড়ে নিয়ে যাবে? মৃত্যুর এলাকা কত বড়? তার বাইরে কোথাও বুলবুলকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া যায় না?

জানলার বাইরে একটা নিঃসঙ্গ তারা দেখা যায়। বড় বেশী জ্বলজ্বল করছে। একটা সময় যেন তারাটা সরে গেল মনে হলো। কে যেন বলেছিল তারারা মাঝে মাঝে স্থান বদল করে? মানুষের জীবনের বিশেষ কোনো মুহূর্তেই দেখা যায় তারা সরে যাবার দৃশ্য। কি এর মানে?

এক সময় শুনতে পেল কান্নার শব্দ। বুলবুল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

সূর্য তার পিঠে হাত দিয়ে বললো, এ কি, কাঁদছো কেন? এই, তোমার কষ্ট হচ্ছে?

বুলবুল বললো, ডাক্তার সাহেব কি বলেছে আমি জানি। আমি আর বাঁচবো না!

—আরে, তুমি বলছো কি? মোটেই ডাক্তার সাহেব এ কথা...

—আমার কাছে আর মিথ্যে বলো না। আমি সব বুঝে গেছি।

সূর্যর হাতটা আপনিই গুটিয়ে এলো। মেয়েরা শুধু যে অনেক কিছু গোপন করতে পারে তাই নয়, অনেক গোপন খবরও জেনে যায় অনায়াসে।

সূর্য হঠাৎ বিছানার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তোমাকে আমি অত সহজে মরতে দেবো ভেবেছ? না! তোমাকে আমি মরতে দেবো না!

বুলবুল তার সজল চোখ দুটি তুলে বললো, আমি তো আর বাঁচতে চাই না!

সূর্য ক্রুদ্ধস্বরে বললো, মরা অত সোজা নাকি! আমি তোমাকে কিছুতেই মরতে দেবো না!

সূর্যর গলার আওয়াজে শিশুসুলভ দৃঢ়তা ছিল। যেন সে সত্যিই মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে চায়। শুধু বুলবুলকে বাঁচাবার জনাই নয়, মৃত্যুকে পর্যন্ত হারাবার স্পৃহাও তার মধ্যে জেগে ওঠে। মৃত্যুকে সে তো অনেকবার অনেক রূপে দেখেছে। তাই তার রাগ বেশী।

বুলবুল আর কোনো কথা বলার বদলে কাঁদতে শুরু করে। যুক্তির বদলে কান্নাই

তার পক্ষে প্রশস্ত মনে হয়। যদিও এই কান্না নিজেকে বাঁচাবার জন্য নয়, নিজেকে ধ্বংস করার জন্য।

বুলবুলের এ-ধরনের যুক্তিবোধ সূর্যকে কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢ় করে দেয়। তারপর সে বুলবুলের কাঁধ কাঁপিয়ে বলে, তুমি বলছো কি? তুমি মরতে চাও?

বুলবুল তার কৃশ মুখখানি তুলে বলে, আমি আর কেন বাঁচতে চাইবো বলো? আমার কি আছে?

—বুলবুল, আমি আছি! তুমি আমার কথা চিন্তা করছো না?

—বাঙ্গালীয়া, আমি তোমার যোগ্য নই! আমি তোমাকে পেলাম না।

—তুমি এ কি বলছো?

—আমি ঠিকই বলছি! আমি আর কি চাইতে পারি? আমার মতন মেয়ে আর কি আশা করতে পারে? তোমার মতন একজন পুরুষ, এত যার রূপ, এত বড় যার হৃদয়, তাকে পাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা? তবু আমার ভাগ্যে সইল না! আমার নসিবটাই খারাপ! আমার নিজের মা কিভাবে মারা গেছে তুমি জানো? ঠিক, আমারই মতন—

—বুলবুল, ছিঃ, এমন কথা বলে না। আমার মা কিসে মারা গিয়েছিলেন তাও তুমি জানো না। তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। তা বলে, আমিও কি আত্মহত্যা করছি!

—বাঙালীয়া, তুমি কেন আত্মহত্যা করবে? তুমি আমাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাও!

—পাগলীর মতন কথা বলো না! তোমার কি হয়েছে কি, কিছু হয়নি!

সূর্য তার পরদিন থেকে তোলপাড় কাণ্ড করতে থাকলো। ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের কাছে সে আর গেল না—তার বদলে সে অন্য তিনজন ডাক্তার ডেকে আনলো। সব রকম পরীক্ষা ও ফোঁড়াফুঁড়ি চললো। তখনো, পাঁচের দশকের গোড়ার দিকে, যক্ষ্মাকে রাজরোগ মনে করা হতো। এর মধ্যে একজন ডাক্তার আবার অভিমত দিয়ে ফেললেন যে বুলবুলের মোটেই টি বি হয়নি। এক্স-রে রিপোর্ট সত্ত্বেও তিনি দৃঢ়স্বরে তাঁর মত ঘোষণা করতে লাগলেন। এই ডাক্তারটি, যদিও ছিলেন এম বি বি এস, তবু ছিলেন জল চিকিৎসার ভক্ত। দিনের বিভিন্ন সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণে জল পান করিয়েই যে এক প্রকার চিকিৎসা পদ্ধতি আছে, তিনি তাই নাপাশিশ করলেন। এবং, আশ্চর্যের বিষয়, বুলবুলের কিছুটা উন্নতি হতে লাগলো। তার জ্বর ছেড়ে গেল, কাশির দমকেও আর কষ্ট পায় না।

চিকিৎসার সময়ে প্রায় এক মাস সূর্য একবারও বুলবুলের পাশ ছেড়ে নড়েনি। সূর্যর স্বাস্থ্যজ্ঞান আছে, সে জানে টি বি রোগীর পাশে ও-রকম শুয়ে থাকা উচিত নয়, কিন্তু সে গ্রাহ্য করেনি। ওদিকে, বুলবুলের স্বাস্থ্যজ্ঞান নেই, সে জানে না, তার থুতু বা কাশি অন্য কেউ ছুঁলে কি হয়—তবু সে প্রত্যেক দিন সূর্যকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছে অন্য কোনো ঘরে চলে যেতে। অন্য কোনো ঘর মানেই অন্য কোনো মেয়ের ঘর। এ বাড়িতেই আর তো কোনো খালি জায়গা নেই। সে কথা বুঝেও বুলবুল সূর্যকে চলে যাবার জন্য জোর করে। সূর্যকে অন্য কোনো মেয়ের হাতে সঁপে দিতেও তার কোনো আপত্তি নেই এখন। প্রতি রাত্রে এই বিষয়ে পনেরো-কুড়ি মিনিট কথা কাটাকাটি হয়ে উঠেছিল একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার।

বুলবুল ঘুমিয়ে থাকার পরও সূর্য জেগে থেকেছে। তার ভিতরে সব সময় এই চাপা ভয়টা ছিল যে বুলবুল বুঝি যেকোনো সময়ে নিঃশব্দে মরে যাবে। সূর্য মৃত্যুর মুখোমুখি হতে চায়—সে কিছুতেই বুলবুলকে একা ছাড়বে না। কোনো কোনো

দিন বুলবুলের বুকে খুব বেশী ব্যথা হলে সূর্য সেখানে হাত বুলিয়ে দিয়েছে। কাঁচুলি খোলার পর বুলবুলের উন্নত বুকে হাত বুলিয়ে সূর্যর মনে হয়েছে, কিছুই তো বদলায় নি। বুলবুল তো ঠিক সেই রকমই আছে। মৃত্যুটা তাহলে নিশ্চয়ই একটা অবাস্তব ঘটনা!

বুলবুল যখন অনেকটা ভালো হয়ে উঠছে, সেই রকম সময়ে একদিন মাঝ রাত্রে সূর্য একটি ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল! সেদিন সূর্যর একটু তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ বমির শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙে যায়। সূর্য ধড়ফড় করে উঠে দেখলো, বুলবুল বিছানায় নেই।

বাথরুম অনেক দূরে, সেই জন্য ঘরের কোণে একটা বড় গামলা রাখা ছিল। বুলবুল সেখানে বসে আছে। সূর্য তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। সে দেখলো, বুলবুল গলায় হাত দিয়ে ইচ্ছে করে বমি করছে। গল্‌গল করে বেরুচ্ছে কাঁচা রক্ত।

সূর্য কোমলভাবে বুলবুলের কাঁধে হাত দিয়ে বললো, কি হয়েছে বুলবুল? তোমার বুকে ব্যথা করছে?

বুলবুল এক ঝটকায় সূর্যর হাত সরিয়ে দিয়ে বললো, ছোড়্ দেও মুঝে—

সূর্য অবাক ভাবে চেয়ে রইলো বুলবুলের চোখের দিকে। বুলবুলের দৃষ্টি উন্মাদিনীর মতন। সে চিৎকার করতে লাগলো, নিকাল যাও! তুম্ মেরা ঘরসে নিকাল যাও!

বুলবুলের অসুখ পুরোনো হয়ে গেছে। এখন আর তার আকস্মিক চিৎকার শুনলে অন্য ঘর থেকে মেয়েরা ছুটে আসে না। এই রাত্তিরেও কোনো কোনো ঘর থেকে ঘুঙুরের আওয়াজ ভেসে আসে। রক্ত-মাংসের উল্লাসময় যে জীবন, তা অন্য কারুর দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামায় না।

দৈত্যের হাতের খেলনার মতন সূর্য জোর করে বুলবুলকে কোলে তুলে নিয়ে আসে। বুলবুল ছটফট করে, সূর্যকে আঁচড়ে কামড়ে ব্যতিব্যস্ত করে দিতে চায়। সেই সংগে তার মুখ দিয়ে ফোয়ারার মতন বেরোয় অজস্র গালাগালি। এমনকি সূর্যকে সে রেণ্ডিকা বাচ্চা বলতেও দ্বিধা করে না। আশ্চর্য, যে নিজে রেণ্ডি, তার কাছেও রেণ্ডির বাচ্চাই একটা চূড়ান্ত গালাগাল।

পরপর কয়েক দিন বুলবুল সূর্যকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। সে কিছুতেই আর সূর্যর সংগে থাকতে চায় না। তার ব্যবহারে খুব সহজেই বুঝতে পারা যায় যে সে আর নিজের ভাগ্যের সংগে সূর্যকে জড়াতে চায় না। সে সূর্যকে মুক্তি দিতে চাইছে। বুলবুল তো আর সূর্যর গৌরাত্মার পূর্ব পরিচয় পায়নি!

দিন দশেক বাদে বুলবুলের অবস্থা আবার হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে পড়ে। জল চিকিৎসার সেই ডাক্তার খুঁটিনাটি ব্যাপারে ভুল ধরে সূর্যকে তিরস্কার করেন। অন্য ডাক্তাররা বলেন, কাছাকাছির মধ্যে ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর ছাড়া অন্য কেউ আর বুলবুলকে বাঁচাতে পারবে না। সূর্য আবার রাধাগোবিন্দ করের কাছে গিয়ে কাকুতি-মিনতি করে তাকে ডেকে এনেছিল। তিনি খিটখিটে মেজাজ নিয়ে আবার এলেন, বুলবুলের সংগে একটিও কথা না বলে ভালো করে পরীক্ষা করলেন—তারপর সূর্যকে বাংলাতে জানালেন, আর দিন দশেকের মধ্যে মেয়েটা এই পাপ জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।

সূর্যর দিকে ফিরে তিনি জ্বলন্ত চোখে বললেন, তোমারও মুক্তি!

ডাক্তার চলে যাবার পর সূর্য জিজ্ঞেস করলো, বুলবুল, তোমার কি ইচ্ছে করে?

তুমি কিছু খেতে চাও? তুমি কোনো জিনিস চাও?

বুলবুল আগের তুলনায় অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে গেছে। সে তার শীর্ণ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, বাঙ্গালীয়া, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না!

মৃত্যুর বোধ যে কি প্রগাঢ়, তা বুলবুলকে দেখলে এখন বুঝতে পারা যায়। সব রকম অতৃপ্তি, ছটফটানি থেমে গেছে তার, সে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছে। কয়েকদিন আগেও সে সূর্যকে তাড়িয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এখন তার কথা শুনলে মনে হয়, সকলে এসে মৃত্যুকে সম্মান করুক। ভয় পাবার কিছু নেই।

সূর্য বুলবুলের উষ্ণ কপালে ওষ্ঠ ছুঁইয়ে বললো, তোমাকে আমি কক্ষনো ছেড়ে যাবো না। আমার তো আর কোথাও যাবার জায়গা নেই!

সূর্য একটু অনামনস্ক হতেই বুলবুল বিছানার ওপর উঠে দাঁড়ালো। টলটলে পায়ে একটু হেঁটে বললো, তুমি নাচ ভালোবাসো। আমি এখনো নাচতে পারি। দেখবে?

সূর্য এক লাফে বুলবুলের কাছে এসে তার কাঁধ চেপে ধরে ধমকে বললো, কি হচ্ছে কি?

বুলবুল হাসতে হাসতে শরীর দোলাতে লাগলো। পরক্ষণেই সূর্যর বুকে মাথা গুঁজে কাঁদতে লাগলো হু হু করে।

সব ব্যাপারটা অতি নাটকীয় মনে হয়। কিন্তু মৃত্যুর চেয়ে বড় আর কোনো নাটক নেই।

কয়েকদিন বাদে, বুলবুলের যখন কণ্ঠস্বর পর্যন্ত অত্যন্ত দুর্বল হয়ে এসেছে, সেই সময় সূর্যর একটা কথা মনে পড়লো। বুলবুল এক সময় প্রায়ই বলতো, সে কখনো সমুদ্র দেখেনি। গোয়ালিয়ার ছেড়ে সে বাইরেই গিয়েছে খুব কম—তবু সে পাহাড় ও নদী দেখেছে, কিন্তু সমুদ্র দেখা হয়ে ওঠে নি। কয়েকবার সে সূর্যর কাছে আবদার করেছিল, বাঙ্গালীয়া, আমাকে একবার সমুদ্র দেখাবে?

সূর্যর মনে হলো, জীবনটা শেষ হয়ে যাবার আগে, বুলবুলের এই বাসনাটা অতৃপ্ত থাকে কেন? সে কানে কানে জিজ্ঞেস করলো, বুলবুল তুমি সমুদ্র দেখতে যাবে?

বুলবুল চোখ অর্ধেক খুলে বললো, সেখানে তুমি আমার পাশে থাকবে তো?

—হ্যাঁ। আমি সব সময় তোমার পাশে থাকবো। আমি আর ভয় পাই না। কিন্তু বুকের মধ্যে বড্ড কষ্ট হয়।

—সেখানে আমার অসুখ কি কমবে? ওগো, আমার বড় কষ্ট—আমার কষ্টটা একটু কমিয়ে দাও না!

—এবার তোমার কষ্ট কমে যাবে।

—আমার বড্ড বাঁচতে ইচ্ছে করে! আমি জীবনে কি পেলাম? বড় কষ্ট...তুমি বুঝবে না...সত্যি সমুদ্র দেখতে পারবো? তোমার পাশে দাঁড়িয়ে?

—নিশ্চয়ই। সমুদ্রের ধারে কারুর অসুখ থাকে না! সেই জনাই তো সমুদ্রের কাছে যাবার কথা বললাম।

বুলবুলের মতন সামান্য মেয়ে তখন অসামান্য চোখে সূর্যর দিকে তাকায়। সূর্যর এই স্তোকবাক্য শুনে সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দার্শনিকের চেয়েও গভীরভাবে একটা নিশ্বাস ফেলে। তারপর বলে, যদি আর একটা বছরও বাঁচতে পারতাম!

আর একটা বছর বাঁচলে বুলবুলের কোন্ পরমার্থ সাধিত হতো, তা সূর্য জানেনা

হয়, সে তীব্র ভাবে চিন্তা করতে লাগলো, মাত্র একটা বছর সে কোনো জায়গা থেকে ধরে আনতে পারে না? তার নিজের জীবন থেকে অনেকগুলো বছর তো সে যে-কোনো মুহূর্তেই দিতে রাজি আছে!

ট্রেনে বুলবুলকে এই অবস্থায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই ঠাকুর সাহেবের সহায়তায় সূর্য একটা মস্ত বড় স্টেশন ওয়াগন ভাড়া করলো। বুলবুলকে সে বোম্বাইতে নিয়ে যাবে। গাড়ির ঝাঁকানিতে পাছে বুলবুলের কষ্ট হয়, তাই সূর্য তার মাথাটা কোলে নিয়ে বসে রইলো। বুলবুল সূর্যর বাহু চেপে ধরে বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলো, সত্যিই আমরা সমুদ্র দেখতে যাচ্ছি!

সমুদ্র দেখার সম্ভাবনায় সে যেন ঠিক শিশুর মতন কৌতূহলী ও খুশী।

গোয়ালিয়ার শহর ছাড়াবার আগেই বুলবুলের হেঁচকি উঠতে লাগলো এবং অসম্ভব বমি। সে এখন কথাও বলতে পারছে না। শুধু ফ্যাসফেসে গলায় মাঝে মাঝে বলতে লাগলো, পানি, একটু পানি দাও, বড্ড তেষ্টা—অল্পক্ষণের মধ্যেই সূর্য বুঝতে পারলো, বুলবুলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

হাসপাতালের গেটে পৌঁছে বুলবুলকে গাড়ি থেকে নামাতেও হলো না। একজন ডাক্তার তখন সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি একটু উঁকি দিয়েই বললেন, এ তো মুর্দা হ্যায়।

সূর্যর কোলে মাথা রেখে বুলবুল একটু আগেই মারা গেছে।

সূর্য কাঁধ দুটো আড়ষ্ট করে অন্য দিকে মুখ ফেরালো। তার ঠোঁটে একটা তিক্ত হাসি ফুটে উঠেছে। যেন, বুলবুলের মৃত্যুর জন্য নয়, বুলবুলকে শেষ পর্যন্ত সমুদ্র দেখানো গেল না বলেই সে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে।

॥ ৮০ ॥

অনেকদিন বাদে আমার বাবাকে খানিকটা উত্তেজিত এবং খুশী দেখা গেল। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। উনি আমার জন্য একটা চাকরি জোগাড় করে ফেলেছেন প্রায়।

ইদানীং বাবা-মা দু'জনেই আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। সন্তানের জীবনের সুসামঞ্জস্য সম্পর্কে বাবা-মায়ের তো চিন্তা থাকবেই। আমাদের মতন পরিবারের ছেলেরা লেখাপড়া শেষ করে চাকরিতে ঢোকে, তারপর চাকরি পাকা হলেই বিয়ে করে, ক্রমে সে-ও সংসারী হয়। আর একজন বাবা হয়ে গিয়ে আবার নিজের ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে থাকে। কিন্তু আমার ব্যাপারে এটা ঠিক মিলছিল না। আমার পড়াশুনো মাঝপথে থেমে গেল, কিছুদিন কবিতা-টবিতা লেখা, কিছুদিন রাজনীতি নিয়ে মেতে রইলাম—কোনোটাতেই বেশীদিন লেগে থাকতে পারি না। চাকরির ব্যাপারেও কোনো আগ্রহ নেই। দুটো একটা টিউশানি করি, বাড়ির কাছ থেকে হাত খরচ চাইতে হয় না, এই যা।

বাবা আর মা ধরেই নিয়েছিলেন যে রেণুকে আমি বিয়ে করবো—সেইজন্যই আমাকে একটা চাকরি খুঁজতে হবে মরীয়া হয়ে। কিন্তু চাকরির জন্য কখনো আমি গা করি নি—এদিকে যখন বাবা-মা শুনতে পেলেন যে রেণুর বিয়ের জন্য ওর মা চেষ্টা করছেন ইদানীং—তখন তাঁরা রীতিমতন হতভম্ব হয়ে পড়লেন। আসলে, বাবা-

মায়েরা তাঁদের যুবক সন্তানদের সম্পর্কে খুবই কম জানেন।

ইদানীং দেখতাম, বাবা প্রত্যেকদিন সকালবেলা খবরের কাগজে চাকরির খালি বিজ্ঞাপনগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। সেরকম বিজ্ঞাপন অবশ্য ক্রমেই কমে আসছে। মাঝে মাঝে বাবা কোনো একটা বিজ্ঞাপনের পাশে লাল দাগ দিয়ে আমার পড়ার টেবিলের ওপর কাগজটা ফেলে রাখতেন, কিন্তু তা নিয়ে আমি কখনো কোনো উচ্চবাচ্য করিনি। আমার বাবা নিজে কখনো চাকরি-জীবনে সার্থক হতে পারেন নি, এখানে-সেখানে টুকটাক কাজ করেছেন মাত্র। তবু শেষ জীবনে চাকরির ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস দেখা গেল।

অবশ্য, এর একটা কারণও ছিল। দারিদ্র্যের ছায়া আস্তে আস্তে ঘনিয়ে আসছিল এ সংসারে। আমরা পরের বাড়িতে থাকি। বাবার এখন নিজস্ব আর কোনো আয় নেই। একতলার দুটি ঘর ভাড়া দেওয়া হয়েছে, সেই টাকা খরচ হচ্ছে আমাদের সংসারে—যদিও আইনত সে-টাকা সূর্যদার প্রাপ্য। সূর্যদার পাত্তা নেই বহুদিন, ঐ ঘর দুখানা ভাড়া দেবার কথাও সে জানে না। আমার বাবার এই পরভৃতিক জীবনে সব সময় শংকা লেগেই থাকে। প্রতিদিনই মনে হয়, আগামীকাল একটা সাংঘাতিক কিছু বিপদ ঘটবে। শেষ জীবনটাই বা কি ভাবে কাটবে? সূর্য বাইরে কোথাও থাকে, নিয়মিত ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নেয়। সেইভাবেই যদি বাইরে থেকে হঠাৎ বিক্রী করে দেয় বাড়িটা? তখন কি পথে বসতে হবে? কাঁটার মতন এই চিন্তাটা বাবাকে সব সময় বিদ্ধ করে।

আমার হিসেবটা ছিল অন্যরকম। সূর্যদা আর কোনোদিন ফিরবে কি ফিরবে না, তার ঠিক নেই। যদি কখনো ফেরেও, বাবা-মাকে কখনো এ-বাড়ির আশ্রয়চ্যুত করবে না। কারণ, বড়বাবু নিজে আমার বাবা-মাকে ডেকে এনেছিলেন। সুতরাং বাবা-মায়ের থাকার জায়গার জন্য কোনো চিন্তা নেই। আর কিসের চিন্তা? বড়বাবু বাবার নামেও কিছু টাকা রেখে গিয়েছেন উইলে, ঠিক কত আমি জানি না—সাত হাজার বা দশ হাজার। এছাড়া বাবার একটা ইনসিওরেন্স ও মায়ের কিছু গয়না আছে—এ দিয়ে ও'দের বাকি জীবনটা চলে যাবে। দিদি বিয়ের পর এখন বেশ ভালোই আছে, পর পর দুটি সন্তান হবার পর মাথার গোলমাল একেবারে সেরে গেছে। বাকি রইলাম আমি। আমি পৃথিবীর ভিড়ে মিশে যাবো—আমার জন্য কারুকে ভাবতে হবে না। তাছাড়া, আমি তো এদেশে থাকছিই না।

বাবা নিজেই একটি চাকরির দরখাস্ত টাইপ করে এনে আমাকে বললেন, সই করে রাখ। সার্টিফিকেটগুলোও গুছিয়ে রাখিস। সন্ধেবেলা তোকে নিকুঞ্জবাবুর বাড়িতে নিয়ে যাবো।

—নিকুঞ্জবাবু কে?

বাবা বললেন, দাদার বাড়িতে পূর্ণবাবু বলে একজন কাজ করতো তার কথা তোর মনে আছে তো? সেই পূর্ণবাবুই নিকুঞ্জবাবুর সন্ধান দিলেন। পূর্ণবাবুর ছেলের চাকরি ও-ই করে দিয়েছে। নিকুঞ্জবাবুর হাত দিয়ে অনেক ছেলের চাকরি হয়েছে রেল কোম্পানিতে।

রেল এখন আর কোম্পানির নেই, সরকারের—তবু সে কথা পুরোনো লোকদের মনে থাকে না। রেলের চাকরি এখনো নাকি দারুণ লাভজনক। বাবা যে চাকরির সন্ধান এনেছেন, সেটা কেরানিগিরি—কিন্তু উপরি আছে, তা ছাড়া আরও কত সুবিধে।

বাবার মুখের ওপর কিছু না বললেও মাকে গিয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম,

বাবা এ-সব কি শুরু করেছেন? এ চাকরি আমি কিছুতেই করবো না।

মা শুনে একেবারে আঁতকে উঠলেন! করবি না কি? আজকাল কেউ মাথা খুঁড়েও চাকরি পায় না আর এমন সোনার চাকরি তুই—

—সোনার চাকরি না ছাই! একটা কেরানিগিরি কি আমি নিজে চেষ্টা করলেও জোগাড় করতে পারতাম না?

—পারলি কোথায়? এতদিন তো দেখলাম—

—আমি কেরানিগিরি করতে চাই না।

—কেরানিগিরি আবার কি? একশো সাতান্ন টাকা মাইনে হলেও নিকুঞ্জবাবু বলেছেন, মাস গেলে সাত আট শো টাকা হাতে আসে।

—এটা চাকরি, না চুরির ব্যবসা?

—বাজে কথা বলিস না। আজকাল সবাই এই করে। তাছাড়া, রেলের পাস পাবি—মা-বাবার জন্যও পাস দেয়—কোথাও তো কখনো বেড়াতে যাইনি—কতকালের ইচ্ছে একবার হরিদ্বার ঘুরে আসবো।

—মা, আমি তোমাকে একদিন না একদিন ঠিক হরিদ্বার ঘুরিয়ে নিয়ে আসবো, কিন্তু তুমি আমাকে এ-চাকরি নিতে বোলো না!

মা আর কথা না বলে কাঁদতে বসলেন। কান্নার কাছে আর কোনো যুক্তি নেই। মায়ের কান্নার সময় যত রাজ্যের পুরোনো কথা মনে পড়ে। কেন তাঁর এই পরিবারে বিয়ে হয়েছিল, এই আফসোস থেকে শুরু করে, কেন তাঁর আজও মরণ হলো না—এইখানে এসে থামে। আমি চুপ করে বসে রইলাম। কান্নার মধ্য দিয়ে মা এই কথাও জানালেন যে, আমি যদি বাবার সঙ্গে নিকুঞ্জবাবুর কাছে না যাই, তাহলে বাবা ভীষণ দুঃখ পাবেন মনে। একেই তো ওঁর শরীর আর মন দিন দিন ভেঙে যাচ্ছে। তাছাড়া নিকুঞ্জবাবুকে এক হাজার টাকা ঘুষ দিতে হবে—কত কষ্ট করে সেই টাকা জোগাড় করেছেন—।

মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা দুটি ব্যাপারে বাঁধা পড়ে যায়। এই সব পরিবারের মেয়েরা যতই প্রগতিশীলা হোক, বিয়ের সম্বন্ধের সময় মেয়ে-দেখার আসরে তাকে হাজিরা দিতেই হয়। তার কোনো আপত্তিই টেঁকে না। বরপক্ষের লোকের সামনে তাকে একবার না একবার সঙ সেজে দাঁড়াতেই হবে না হলে তার মা-বাবা যে মনে দুঃখ পাবেন।

ছেলেদের ব্যাপারেও তাই। বাবা যদি নিজে থেকে কারুকে ধরাধরি করে ছেলের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করেন, ছেলেকে সেখানে একবার অন্তত যেতেই হবে। না হলে মা-বাবার মনে দুঃখ দেওয়া হয়।

মায়ের কান্না থামাবার জন্য আমাকে রাজি হতেই হলো। নিকুঞ্জবাবু নামক লোকটিকে একবার অন্তত চোখে দেখবার লোভটুকুও আমি সামলাতে পারলাম না। লোকটি এক হাজার টাকা ঘুষ চায় চাকরি করে দেবার জন্য? গল্পে-টল্পে এইসব লোকের কথা পড়েছি, কিন্তু সত্যি সত্যি কি এরকম কেউ থাকে? এরা কি রকম মানুষ! বাইশ-তেইশ বছরেও ন্যায়-নীতি সততার ওপর অগাধ বিশ্বাস থাকে। কোনো মানুষকেই কিছুতেই ঠিক অসৎ বলে মানতে ইচ্ছে করে না।

নিকুঞ্জবাবুর বাড়ি বণ্ডেল রোড দিয়ে গিয়ে একেবারে রেল লাইনের ধারে। বাড়িটি দোতলা এবং নতুন। ইনিও রেলের কেরানী—নতুন বাড়ি বানিয়েছেন। সে বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাবা আমাকে সপ্তমবার মনে করিয়ে দিলেন যে নিকুঞ্জবাবুকে

দেখামাত্রই যেন আমি প্রণাম করি। কারণ, উনি ব্রাহ্মণ। বড়বাবুর প্রভাবে বাবা এক সময় অনেকখানি সংস্কারমুক্ত হয়েছিলেন—এখন বার্ধক্যের দুর্বলতায় আবার সব মিলিয়ে যাচ্ছে।

নিকুঞ্জবাবু ঘরে ঢুকেই বললেন, এ হে হে, আপনারা বড় দেরি করে ফেললেন। সাড়ে ছ'টার সময় আসতে বলেছিলাম আপনাকে।

বাবার মুখটা ম্লান হয়ে গেল। তখন সাতটা বাজতে দশ। বাবা শুকনো গলায় বললেন, এদিককার বাস এত দেরি করে আসে—তার ওপর আবার জ্যাম—

—একটু আগেই আর একজন এসেছিল, তার একেবারে কান্নাকাটি করার মতন অবস্থা।

—কিন্তু আমাকে কথা দিয়েছিলেন—

ঘরে সোফা-সেট ছিল, কিন্তু নিকুঞ্জবাবু আমাদের বসতে বলেন নি। মানুষটি বেঁটে ও রোগা—খুবই ছোটখাটো চেহারা, শরীরের তুলনায় মুখখানা আরও ছোট্ট মনে হয়। আমি ওঁর মুখখানা তন্নতন্ন করে দেখতে চাইছিলাম, কিন্তু উনি কারুর চোখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারেন না। এই সব মানুষ রাস্তায়-ঘাটে খুবই অকিঞ্চিৎকর, ভিড়ের মধ্যে নগণ্য, পৃথিবীতে এদের ভূমিকা সম্পর্কেই সংশয় জাগে। সেইজন্যই এরা নানারকম ষড়যন্ত্র ও প্যাঁচ কষে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে। আমার বাবার মতন একজন মানুষকে কৃপাপ্রার্থী করতে পেরেছেন তো!

বাবা আমার দিকে বারবার চোখের ইসারা করছিলেন ওঁকে প্রণাম করার জন্য। আমি বাবার দিকে আর না তাকিয়ে একটা সোফায় বসলাম। তখন নিকুঞ্জবাবু বাবাকে বললেন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন না।

বাবা বিগলিতভাবে বললেন, আপনি আমার ছেলেকে দেখতে চেয়েছিলেন, এই যে আমার ছেলে—

নিকুঞ্জবাবু আমার দিকে তাকালেন না। কিংবা উনি আমাকে আগেই দেখে নিয়েছেন। বাবাকে বললেন, আপনাকে কথা দিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু একটু আগে আর একজন এসে পড়লো—সে আবার আমার ভায়রা ভাইয়ের বন্ধুর ছেলে, এমন কান্নাকাটি করতে লাগলো—।

বাবা বোধহয় চিন্তা করতে লাগলেন, তিনিও কান্নাকাটি করবেন কিনা। একটু ধরা-ধরা গলায় বললেন, আমি অনেক আশা করে এসেছিলুম—

—তা তো ঠিক। কিন্তু একটা মাত্র পোস্ট খালি আছে। সেই কথাই তো চিন্তা করছি।

—পূর্ণবাবু আমাকে বলেছিলেন, আপনি ইচ্ছে করলে ঠিকই পারেন। দরখাস্ত টরখাস্ত সবই নিয়ে এসেছি। বাদল, বার কর না।

আমি চুপ করে বসে রইলাম। নিকুঞ্জবাবু এবার আমার দিকে এক পলক তাকালেন। তারপর বাবাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, ছেলের বিয়ে দিয়েছেন?

—আজ্ঞে না। একটা চাকরি বাকরি না জুটলে—

—আপনার তো এই একটিই ছেলে। বিয়ে দেবেন না? আমার হাতে ভালো সম্বন্ধ আছে—

নিকুঞ্জবাবুর কথার মধ্যে কোনোরকম ভদ্রতা সভ্যতার সম্পর্ক নেই। নিছক চাঁচা-ছোলা কাজের কথা ছাড়া আর অন্য কোনো কথাই উনি জানেন না। পৃথিবীতে আছে এইরকম এক ধরনের মানুষ, যারা চাকরি বা ব্যবসা, বাড়ি বানানো, ছেলে মেয়ের বিয়ে

দেওয়া ছাড়া আর কিছুই জানে না।

বাবাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমার সামনে ঐ বিয়ের প্রসঙ্গটা তোলা একেবারেই ঠিক হয়নি। সেইজন্যই তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পালটে ফেললেন।

বাবা বললেন, আপনার বাড়িতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন শুনেছিলাম? পূর্ণবাবু বলছিলেন...

—হ্যাঁ। মন্দির মানে কি, তিনতলায় একটা ঠাকুরঘর করে রাধা-মাধবের প্রতিষ্ঠা করবো—আমাদের বংশের বিগ্রহ, এখন পড়ে আছে আমার ছোটকাকার কাছে। কি বাড়িটার দোতলা তুলতেই সব পয়সা খরচ হয়ে গেল। তাই লোকের কাছে চেয়েচিন্তে যদি জোগাড় করে ঠাকুরঘরটা তুলতে পারি—একটা ভালো কাজ তো, লোকে দেয়ও—

—তা তো বটেই, তা তো বটেই। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করবেন—এ রকম একটা ভালো কাজ উপলক্ষে সবাই যথাসাধ্য দেবে—

—কেউ কেউ দিচ্ছে—

—আমিও এনেছিলাম হাজারখানেক—

নিকুঞ্জবাবু এবার একটু উৎসাহিত হয়ে উঠলেন মনে হলো। আমার দিকে আবার এক পলক তাকিয়ে বললেন, তা আপনাদের শুভেচ্ছায় যদি ঠাকুরের একটা জায়গা হয়—শুনুন, আপনার ছেলের চাকরি হয়তো হয়ে যাবে, তারপর ছেলের বিয়ে দেবেন।

—বিয়ের কথা তো এখনো কিছু ভাবিনি—

—ভাবুন, এখন থেকে ভাবুন—

বাবার জন্য আমার কষ্ট হতে লাগলো। বাবা খুবই অসহায় অবস্থায় পড়েছেন। এই লোকটিকে আমার সামনেই ঘুষ দিতে যে তিনি মরমে মরে যাচ্ছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এদিকে, বাবা কিংবা মা ঘুণাক্ষরেও জানেন না যে, আমার বাইরে চলে যাবার ব্যাপারে অনেকখানি ঠিকঠাক হয়ে গেছে। পাসপোর্ট পর্যন্ত তৈরি।

নিকুঞ্জবাবু বললেন, ঠিক আছে কাল ঠিক দশটায় ছেলেকে নিয়ে আসুন অফিসে। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটায়। আমেরি সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবো। আর একটা কথা। আপনিও বামুন, আমিও বামুন। আমেরি সাহেবকে বলবো, এ ছেলেটি আমার ভাইপো। ভেরি নিডি। চাকরি না হলেই নয়। আমেরি সাহেব যখন কিছু জিজ্ঞেস করবেন, তখন আপনার ছেলে যেন আমার ভাইপো হিসেবেই পরিচয় দেয়। ভাইপো ইংরেজি জানে তো?

সেই মুহূর্তে আমি কি করছিলাম, তা জানতে পারলে নিকুঞ্জবাবু আঁতকে উঠতেন। সোফার পাশেই জানলার বেদিতে আমি একটা ব্লেড পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। সেখানে কে এবং কেন ঐ ব্লেডটা ফেলে রেখেছে, আমি তা জানি না। কিন্তু ওটা দেখেই আমার কল্পনা শক্তি বেড়ে যায়। ব্লেডটা এক সময় চলে এসেছে আমার হাতে। সম্প্রতি আমি ব্লেডটা দিয়ে ফালা ফালা করে চিরে দিচ্ছিলাম নিকুঞ্জবাবুর সোফার গদি। তবু আমার রাগ কমছিল না। আমি মনে মনে ঠিক করে রাখলাম, ঘুষের টাকায় নিকুঞ্জবাবুর তিনতলায় ঠাকুর ঘর যেদিন উঠবে—সেদিন যে-কোনো উপায়ে এসে আমি লাথি মেরে ওর ঠাকুরকে উল্টে ফেলে দিয়ে যাবো।

ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বাস স্টপে দাঁড়িয়ে বাবা আমাকে উৎসাহের সঙ্গে বললেন, চাকরিটা শেষ পর্যন্ত হয়ে যাবে মনে হচ্ছে, না রে? কাল সকালে যখন যেতে বললেন—

আমি নীরস গলায় বাবাকে প্রশ্ন করলাম, আপনি টাকাটা ওকে দিয়ে দেননি তো?

—না। কেন?

—কাল সকালে আমি যাবো না!

—যাবি না? কি বলছিস কি, যাবি না?

—না। এ চাকরি আমি করবো না।

বাবার সঙ্গে আমি কোনোদিন ঝগড়া করিনি, মুখে-মুখে তর্কও করিনি। সেই প্রথম। আমার বাবা পৃথিবীর সব মানুষকে যেমন ভয় পান, সেই রকম আমাকেও ভয় আমার শান্ত বিদ্রোহ দেখে তিনি রেগে উঠলেন না। স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে শুধু। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, তাহলে আমাকে এতদূরে নিয়ে এলি কেন?

আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

বাস এসে গেছে। আমি হাত দেখিয়ে বাস থামালাম। বাবা উঠে পড়ার পর আমি বললাম, আপনি যান, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

বাস ছেড়ে দিয়েছে বলে বাবা আর নামতে পারলেন না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

আমার ইচ্ছে করছিল আবার নিকুঞ্জবাবুর বাড়িতে ফিরে যেতে। আমার শরীর রাগে জ্বলছিল। কিন্তু আমার রাগ বেশী হলেও মারামারি করার অভ্যেস নেই আমার। আমি হঠাৎ অন্ধের মতন ছুটে গিয়ে কারুকে আঘাত করতে পারি না। একা একা নিকুঞ্জবাবুর বাড়িতে ফিরে গিয়ে আমি কি বলবো?

অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে। বাড়ি ফিরে আবার মায়ের কান্নাকাটির সম্মুখীন হওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই। সমস্ত পৃথিবীর ওপর ঘৃণা বোধ হচ্ছে।

টো-টো করে বহুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম রাস্তায় রাস্তায়। যেন আমি শেষবার কলকাতা শহরটাকে দেখে নিচ্ছি। তোমাকে ছেড়ে চলে যাবো, তোমাকে ছেড়ে চলে যাবো। আমি আর এখানে থাকবো না, আমার কথা কেউ মনেও রাখবে না।

হাজরার মোড়ে এসে একজন মহিলাকে দূর থেকে দেখে বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠলো। মহিলার হাতে দু' তিনটে জামা-কাপড়ের প্যাকেট, কোনোরকমে হাত তুলে ট্যাক্সি থামাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছেন। দীপ্তিদি না? হ্যাঁ, দীপ্তিদিই তো। দ্রুত এগিয়ে গেলাম সেদিকে।

দীপ্তিদিকে দেখে আমার বুক কেঁপে ওঠবার কারণ কি? জানি না। তবু কি রকম যেন একটা দুঃখ মুচড়ে মুচড়ে উঠতে লাগলো। দীপ্তিদি যেন আমার অনেক দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। আমার তো না, সূর্যদার। অথচ, মনে হয় যেন আমারও।

দীপ্তিদি সেই রকম আগেকার মতন সুন্দর আছেন। বয়েস বাড়লেও এক একজন নারীর রূপ অম্লান থাকে। খুব সাধারণ সাজগোজেও কি অপরূপ লাবণ্যময়ী দেখাচ্ছে দীপ্তিদিকে। দীপ্তিদির পা দু'খানাও সুন্দর—বার বার তাকাতে ইচ্ছে করে।

—দীপ্তিদি।

—আরে, বাদল না? কি খবর তোমার?

—আপনি কলকাতায় কবে এলেন। আপনি তো জলপাইগুড়িতে থাকতেন।

—কয়েক মাস ধরে কলকাতাতেই আবার চলে এসেছি।

—সেই বাড়িতেই আছেন? আপনার হাতে এতগুলো প্যাকেট, দিন না, আমি ধরছি, পৌঁছে দিচ্ছি আপনার বাড়িতে।

—না, বাদল, আমি সে বাড়িতে থাকি না। তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে না,

আমি ট্যাক্সি নেবো। আমি এখন থাকি ব্যালিগঞ্জ প্লেসে, একদিন এসো, আমার বাড়িতে।

—ট্যাক্সি ডেকে দেবো আমি?

এই সময় আর একজন লোক এসে দীপ্তিদির হাতে একটা বিস্কুটের টিন দিয়ে বললেন, এটা ধরো। ট্যাক্সি পেলে না এখনো? ট্যাক্সি দাঁড় করাও, আমি আসছি, আর একটা জিনিস বাকি আছে।

লোকটিকে আমি চিনতে পেরেছি। ইলেকশানের দিন দেখেছিলাম, সেই শংকর বোস। এক সময় সূর্যদাদের দলে ছিলেন, এখন কংগ্রেসের বড় ওয়ার্কার। ইলেকশানের সময় খুব নাম করেছেন। শুনেছি, কাশীপুরের বাই-ইলেকশানে উনি নিজেই এবার দাঁড়াবেন। জিতলে নির্ঘাৎ মন্ত্রী হবেন—এরকম জোর গুজব। দীপ্তিদি শংকর বোসের সঙ্গে যাবেন।

আমি দৌড়োদৌড়ি করে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করালাম। দীপ্তিদি জিনিসপত্র নিয়ে তার মধ্যে উঠে বসে বললেন, তুমি কোন দিকে যাবে, বাদল? তোমাকে নামিয়ে দিতে পারি।

—না, আমি অন্য দিকে।

ট্যাক্সির পাশ থেকে সরে এসেছিলাম। আবার ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, দীপ্তিদি, আপনি সূর্যদার কোনো খবর জানেন?

দীপ্তিদি ভারি নরমভাবে তাকালেন আমার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, আমিও তোমাকে সেই কথাটা জিজ্ঞেস করবো ভাবছিলাম। কেন, সূর্য কলকাতায় নেই বুঝি?

—না, সূর্যদা তো অনেকদিন কলকাতায় নেই। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন—চিঠিও লেখেন না। আপনাকে চিঠি লেখেননি?

—না—আমাকে লিখবে কেন?

দীপ্তিদি আর কোন কথা না বলে মুখটা নিচু করলেন। দীপ্তিদি আমাকে ছেলে মানুষ ভাবেন। তাই আমার কাছে কিছু বলবেন না। উনি যেন সূর্যদাকে ভুলেই গেছেন, এই রকম ভাব দেখালেন। অথচ আমি তো সব জানি! এই সময় শংকর বোস এসে গেলেন, আমার দিকে এক পলক তাকালেন, চিনতে পারলেন না। আমি সরে দাঁড়ালাম। আর কোনো কথা হলো না, ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

॥ ৮১ ॥

জাহাজ ছাড়বে কোচিন থেকে। পঙ্কজকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে একদিন আমার প্যাসেজ বুক করে এলাম। পঙ্কজকে সব কথা খুলে বলতেই হয়েছে। একা একা সব কিছুর ব্যবস্থা করা আমার সাধ্যাতীত হয়ে উঠেছিল। অন্তত আলোচনা করার জন্যও তো একজন কারুকে দরকার। রেণু এখন থিয়েটার নিয়ে খুব ব্যস্ত।

পঙ্কজের সঙ্গে কিছুদিন আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আমি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার পর পঙ্কজের সঙ্গে আর দেখাই হতো না। পঙ্কজ ভালো ছাত্র হিসেবে খুব সুনাম করেছে, রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে ঘুরে বেড়ানোকে সে বাজে সময় নষ্ট বলে মনে করে। আগেকার তুলনায় পঙ্কজ এখন অনেক গম্ভীর।

অন্যান্য সংগীদের হারিয়ে আমাকে আবার আমার এক বাল্যবন্ধুর কাছেই ফিরে যেতে হলো।

পংকজ প্রথমে আমার সমস্ত পরিকল্পনাটাই উড়িয়ে দিয়েছিল ছেলেমানুষি বলে। ধমক দিয়ে বলেছিল, বোকার মতন এম-এ-টা কমপ্লিট করলি না কেন? তা হলে কোনো কলেজে লেকচারারের কাজ পেয়ে যেতিস। বিদেশে গিয়ে কি হাতি-ঘোড়া হবে?

কিন্তু আমার কাছে বিদেশ যাত্রা মানে শুধু জীবিকার্জন নয়। আমার মনে হচ্ছে, এর মধ্যেই রয়েছে আমার মুক্তির পথ। এই বদ্ধ গণ্ডি ভেঙে আমাকে বেরুতেই হবে।

পংকজ ইচ্ছে করলেই একটা স্কলারশিপ জুটিয়ে অন্য দেশে পাড়ি দিতে পারতো। কিন্তু পংকজ বিদেশ-বিমুখ। আমাকে আবার বললো, অন্য দেশে গিয়ে সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন হয়ে থাকতে তোর ভালো লাগবে? আমি তো ভাবতেই পারি না।

আমি বললাম, কোনো একটা দেশেই আমি বেশী দিন থাকবো না। ঘুরে ঘুরে বেড়াবো। নাগরিকত্ব নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। এখানেই বা কি ভালো আছি?

বেশ কিছুক্ষণ তর্কবিতর্কের পর পংকজ আমাকে সাহায্য করতে রাজী হয়েছিল। পংকজের মাথা ঠাণ্ডা, সে সব দিক চিন্তা করতে পারে। কোনো রকম কাজকর্ম না জুটিয়ে হঠাৎ জার্মানি চলে যাওয়ার প্রস্তাবটা ও বাতিল করে দিল প্রথমেই। অজানা অচেনা দেশে ও-রকমভাবে গিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি অবশ্য বলেছিলাম যে, আমি দরকার হলে কুলিগিরি করতেও পারবো। পংকজ হেসে উঠেছিল সেই কথা শুনে। বলেছিল, এ তো আর কলকাতা শহর নয় যে, যে ইচ্ছে সেই এসে যা খুশি করবে! ওসব দেশে কুলিগিরি করতে গেলেও সরকারের অনুমতি লাগে। আর, নিজেকে চিনতে শেখ। দরকার হলে যারা কুলিগিরিও করতে পারে, তারা অন্য টাইপের মানুষ। তুই পারবি না। তুই না খেয়ে কিংবা অভিমান করে মরবি।

পংকজ বললো, প্রথমে আমার ইংলণ্ডে যাওয়া উচিত। ওখানে বিষ্ণু আছে, তার কাছে থাকতে পারবো কয়েকদিন। বিষ্ণু অনেক রকম সাহায্য করতে পারবে, দরকার হলে জার্মানিতে চিঠিপত্র লিখে কাজের ব্যবস্থাও করে দিতে পারবে। মোট কথা, দেশের বাইরে গিয়ে প্রথমেই অকূল পাথারে পড়বো না।

এই উপায়টিই যে যুক্তিসম্মত, তা মেনে নিতেই হয়। তবে, একটা জিনিস আমি দৃঢ়ভাবে ঠিক করে রেখেছিলাম। শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডে আমি কিছুতেই থাকবো না। ইংরেজ জাতটার ওপর আমার জাত-ক্রোধ রয়ে গেছে, ওদের কাছে গিয়ে কোনো-ক্রমেই কৃপা চাইবো না। যদি প্রচুর টাকা নিয়ে বেড়াতে যেতে পারতাম, সে আলাদা কথা।

বিষ্ণুকে চিঠি লেখার পর অতি দ্রুত উত্তর চলে এলো। বিষ্ণুর দারুণ উৎসাহ। বিষ্ণু ইদানীং ওর সব চিঠিতেই ক্যারল নাম্নী একটি মেয়ের কথা লেখে। সেই ক্যারল নাকি ওর কবি-বন্ধুকে দেখার জন্য দারুণ এক্সাইটেড। আমি যেন ক্যারলের জন্য খাঁটি দার্জিলিং পিকো চা নিয়ে যাই কয়েক পাউণ্ড।

পংকজের চেষ্টাতেই একটা কারগো জাহাজের টিকিট কাটা হলো সস্তায়। পংকজের সাহায্য না পেলে পাসপোর্টও অত সহজে হতো না। পংকজরা কলকাতার পুরোনো লোক, অনেক রকম জানাশুনো। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেকেই সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে এবং পুলিস বিভাগে ছড়িয়ে আছে। সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করার জন্য আমার পুলিস ভেরিফিকেশনে গোলমাল দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, আর একজন বাদল মুখার্জির সন্ধান পাওয়া গেল যে বরানগরের বাসিন্দা এবং দু' বছর জেল খেটেছে। পুলিস এই দুই বাদল মুখার্জির রেকর্ড গুলিয়ে ফেলেছিল, আমার নামে ছিল জেল খাটার অভিযোগ—পংকজের এক পুলিস আত্মীয়ের সহায়তায় সেই অভিযোগ থেকে মুক্ত হওয়ায় আমার অন্য অসুবিধেগুলোও দূর হয়ে যায়। দুর্বল গণতন্ত্রের স্বভাবই এই, যার ঘুষ দেবার ক্ষমতা আছে কিংবা ওপর মহলে চেনাশুনো আছে, তার কোনো ব্যাপারেই কোনো অসুবিধে হয় না।

আমাকে টাকা খরচ করতে হচ্ছিল টিপে টিপে। রেণুর টাকাটা এখনও ছুঁইনি। টিউশানির টাকা থেকে জমিয়ে জমিয়ে ন' শো টাকা পুঁজি করেছিলাম—বইটই বিক্রি করে আরও দু' শো টাকা জুটলো। পংকজ ধার দিয়েছে সাত শো টাকা, খড়্গপুরে ভাস্করের কাছে চিঠি লিখে আরও পাঁচ শো টাকা পাওয়া গিয়েছিল। লণ্ডনে যখন নামবো, তখন আমার হাতে কয়েক পাউণ্ড মাত্র অবশিষ্ট থাকবে।

পংকজ টাকা বাঁচাবার আর একটা ব্যবস্থা করে দিল। কারগো জাহাজ ঠিক নির্দিষ্ট দিনে নাও ছাড়তে পারে। তা হলে আমাকে কোচিনে কয়েক দিন হোটেলে থাকতে হবে। পংকজের এক জামাইবাবু থাকেন মহীশুরে, বিরাট চাকরি করেন, একটা ওষুধ কোম্পানির এরিয়া ম্যানেজার। আমি জাহাজ ছাড়ার কয়েক দিন আগেই মহীশুরে গিয়ে পৌঁছবো। জামাইবাবুকে অফিসের কাজে প্রায়ই গাড়ি নিয়ে উটকামণ্ড, এর্নাকুলাম যেতে হয়। উনি ঠিক দিনে আমাকে কোচিনে জাহাজে তুলে দেবেন। একজন চেনা কেউ জাহাজে ওঠার সময় আমার পাশে থাকবেন, এটা ভেবে আমি একটু ভরসা পাই। কখনো একা একা দূরে কোথাও যাইনি।

আর আট দিন পরে যাত্রা। বাড়ি ফিরেই শুনলাম, রেণু এসে অনেকক্ষণ বসে ছিল। মা বললেন, এইমাত্র তো গেল, তোর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়নি?

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, না।

—প্রায় এক ঘণ্টা বসে ছিল বেচারা।

—কোনো দরকার ছিল?

—তিনখানা টিকিট দিয়ে গেছে আমাদের। ও কি একটা থিয়েটার করছে, আমাদের সবাইকে বিশেষ করে যেতে বলেছে। তোর বাবা যাবে কি না জানি না, তুই আমাকে নিয়ে যাবি তো?

আমি কার্ডটা দেখলাম। যেদিন রেণুদের থিয়েটার, তার আগের দিনই আমি হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে চাপবো। রেণু যখন মঞ্চের ওপর কৃত্রিম কাহিনীর দুঃখের দৃশ্যে কাঁদবে, সেই সময় আমি দু-তিনটে প্রদেশ পার হয়ে গেছি।

খুব উৎসাহ দেখিয়ে মাকে বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো।

মা আবার জিজ্ঞেস করলেন, রেণুরা যে নাটক করছে, তুই নেই তার মধ্যে? তুই কিছু করছিস না?

মা ধরেই নিয়েছিলেন, আমাকে বাদ দিয়ে রেণু কখনো কিছু করতেই পারে না। অনেকগুলো বছর ধরে এই রকমই হয়ে আসছে।

মায়ের চোখের দিকে না তাকিয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরালাম। এখনো মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারি না। মায়েদের কি একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে, যাতে সন্তানের মিথ্যা কথা অনায়াসেই ধরে ফেলতে পারে।

অবহেলার সুর ফুটিয়ে বললাম, আমাকে অনেক করে ধরেছিল, কিন্তু আমার একদম সময় নেই। মাঝে মাঝে রিহার্সালে যেতে হয় অবশ্য।

—সময় নেই? কি এমন রাজকার্য করছিস?

—খাবার দাও না, খিদে পেয়েছে। খুব কড়াইশুঁটির কচুরি খেতে ইচ্ছে করছে।

—ইচ্ছে করছে তো দোকান থেকে কিনে নিয়ে আয়!

—কেন, তুমি বানাতে পারবে না? আগে তো বানাতে—

—আহা-হা! বললেই হলো কিনা!

একমাত্র খাবারের কথা তুলেই মাকে অন্যমনস্ক করে তোলা যায়। আমি কিছু খেতে চাইলে মা শত অসুবিধে সত্ত্বেও সেটা করে দেবেনই। বাড়ির বেকার ছেলে সাধারণত খাবার-দাবারের জন্য বায়নাক্কা করতে লজ্জা পায়। আমারও লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কয়েক দিন ধরে আমি ছোট ছেলের মতন আদুরে স্বভাবের অবুঝ হয়ে উঠছি। নিজে মনে মনে বুঝতে পারলেও দমন করতে পারি না। আমার যা যা প্রিয় খাবার, তা এক-একদিন এক-একটা তৈরি করে দেবার জন্য আবদার তুলছি। এখন চালতা পাওয়া যায় না। তবু আমি কয়েক দিন ধরে চালতার ডালের কথা বলায়—মা শিয়ালদা বাজারে বাবাকে পাঠিয়ে চালতা খুঁজে আনিয়েছেন। আমি নির্লজ্জের মতন সেই ডাল একবাটি খেয়ে আর এক বাটি চেয়েছি।

এইসব খাবার খেয়েও ঠিক তৃপ্তি হয় না, মনটা বিষাদে ভরে যায়। বারবার মনে হয়, আমি চলে যাবো। আমি আর সারা জীবনে কখনো চালতার ডাল খাবো না। অন্তত মায়ের হাতের রান্না আর খেতে পাবো না। যদিও আমার চলে যাওয়া মানে চিরবিদায় নয়, তবু এই রকম মনে হয়।

ভেতরে ভেতরে আমার অসম্ভব উত্তেজনা, তবু বাইরে সেটা লুকিয়ে রাখার জন্য আমি সদাসতর্ক। একটু এদিক-ওদিক হলেই মায়ের কাছে ধরা পড়ে যাবো। তবু মা মাঝে মাঝে আমার দিকে তীক্ষ্ন চোখে তাকান। কিছু সন্দেহ করেছেন কি? কিংবা আমারই চোখের ভুল।

প্রস্তুতি চলছে অত্যন্ত গোপনে। একটা সুটকেস কিনে পংকজের বাড়িতে রেখেছি। প্রভাস জামাইবাবু যে ওভারকোটটা দিয়েছিলেন, সেটাও একদিন সরিয়ে দিয়েছি পংকজের সংগে। পাসপোর্ট-টাসপোর্ট কিছুই বাড়িতে আনিনি। একটা সুটও করাতে হয়েছে। গরম গেঞ্জি, গ্লাভস, ড্রয়ার অন্যদের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে যোগাড় হয়েছে। আমার মধ্যে এখনো বাঙালত্ব রয়ে গেছে, কি কি বিছানাপত্তর নিয়ে যাওয়া যায়, তা নিয়ে চিন্তিত ছিলাম—পংকজ খুব ঠাট্টা করেছে তাই নিয়ে। বিলেতে কেউ বেডিং নিয়ে যায়, শুনেছিস? বাঙাল কোথাকার!

রেণুর সংগে আমার ঝগড়া চলছে। প্রতিদিন একখানা করে চিঠি বিনিময় হয়। কোনো কোনোদিন রেণু এক সংগে দুটো চিঠিও লেখে। চিঠিগুলো ডাকে আসে, অনেক দিন রেণুর সংগে দেখা হয়নি। যাবার আগে রেণুর সংগে দেখা না করে চিঠিতেই সব কথা জানিয়ে যাবো ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু সেই চিঠিটা আর কিছুতেই মনঃপূত হয় না। অনেকবার লিখে লিখে ছিঁড়ে ফেলতে হলো। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, খুব সংক্ষিপ্ত চিঠিতেই আসলে সব চেয়ে বেশী কথা বলা যায়। রেণু, আমি চলে যাচ্ছি। আবার দেখা হবে। ভালো থেকো। ইতি—বাদল।

একটা ফুলস্কাপ কাগজের পৃষ্ঠার ঠিক মাঝখানে এই তিন লাইনের চিঠিটা লিখে ফেললাম। বেশ পছন্দ হলো। ভালো দেখাচ্ছে। রেণু সব বুঝতে পারবে। রেণুকে আমার মনের সব কথা খুলে বোঝাতে হবে কেন? ওর তো নিজে নিজে বুঝে যাওয়া উচিত।

অনেক স্থির সিদ্ধান্তই দু-এক মুহূর্ত পরে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। চিঠিখানা লিখে, স্ট্যাম্প সেঁটে তাকে ফেলার জন্য তৈরি হবার পরও আমি অন্ধের মতন ছুটে গেলাম মল্লিকদের বাড়ির সামনে। যেখানে রেণুদের নাটকের রিহার্সাল হবার কথা। সেখানে ওরা নেই। আজ ওদের স্টেজ রিহার্সাল হচ্ছে স্টার থিয়েটারে। রাস্তা পেরিয়ে চলে এলাম স্টার থিয়েটারে। যেন আর এক ঘণ্টা বা দু' ঘণ্টাও অপেক্ষা করা চলবে না—এই বিশেষ মুহূর্তেই রেণুর সঙ্গে দেখা করা দরকার।

দেবুদা আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। এই যে ভাই, আপনি এসে গেছেন। খুব ভালো হয়েছে। আপনি গোটা নাটকটা দেখে একটু অনেস্ট ওপিনিয়ান দিন তো! মন রাখা কথা বলবেন না, অনেস্ট ওপিনিয়ান চাই কিন্তু। যদি কিছু সাজেশান থাকে—

দেবুদা ভাঁড়ে চা খাচ্ছিলেন। একজন কাকে ডেকে বললেন, এই বাদলবাবুকে চা দে রে!

দেবুদার সঙ্গে মাঝে দু' তিনবার দেখা হয়েছে। প্রত্যেকবারই ওঁর ব্যবহারে অতিরিক্ত খাতিরের ভাব থাকে মনে হয়। ওঁর বন্ধুর ছোট ভাই হিসেবে আমাকে এতটা মূল্য দেবার তো কোনো কারণ নেই। তা হলে, উনি আমাকে নিয়েছেন রেণুর বন্ধু হিসেবে। উনি আমাকে রাগাতে চান না। অত্যন্ত চতুর লম্পটরা এরকম হয়।

এসব বুঝেও আমি অসহায়। কেউ বেশী খাতির করলেই আমি অতি বিনয়ে একেবারে বিগলিত হয়ে যাই। মুখ দিয়ে একটাও সত্যি কথা বেরোয় না। আমি বললাম, আপনার নাটক তো দুর্দান্ত হচ্ছে, আমি যেটুকু রিহার্সাল দেখেছি...

উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে রেণু আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো মঞ্চের ওপর উঠে আসার জন্য। তখন বিরতি চলছে। অডিটোরিয়ামে কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেবুদা গল্প করায় ব্যস্ত। মঞ্চটা ফাঁকা।

আমি একটু লজ্জিতভাবে এদিক-ওদিক তাকালাম। আমি ওপরে উঠে গেলে কেউ কিছু মনে করবে না তো! পরমুহূর্তেই সাহস সঞ্চয় করে ওপরে উঠে এলাম।

রেণুকে রাজেন্দ্রাণীর মতন দেখাচ্ছে। রেণুকে আমি বেশী সাজগোজ করতে কখনো দেখিনি। নাটকে জমিদার-দুহিতা সেজেছে বলেই এত জমকালো পোশাক। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো, কখন এসেছো?

—অনেকক্ষণ। তোমাদের অভিনয় দেখছিলাম। নাটকটা সত্যিই খুব দারুণ হচ্ছে—মানে, সকলেরই বেশ ভালো—অ্যামেচার গ্রুপ হিসেবে এত ভালো প্রোডাকশান—

বেশ কয়েক মিনিট আমি নাটক সম্পর্কে কথা বলে গেলাম।

রেণু বললো, কার্ড দিয়ে এসেছি। মাসীমা, মেসোমশাই আসবেন তো?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসবেন। মায়ের তো দারুণ আগ্রহ—শোনো তোমরা খবরের কাগজের লোকদের কার্ড দিয়েছো? 'পরিচয়' পত্রিকায় আমার এক বন্ধু আছে, তাকে বলে দিতে পারি—

আমার ঔদাসীন্য দেখে রেণু যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেইজন্যই আমি বেশী উৎসাহ দেখাচ্ছিলাম। যদিও আমার বুকটা ঈর্ষায় হা-হা করে জ্বলে যাচ্ছিল। সেই ঈর্ষার কি প্রচণ্ড উত্তাপ! কোনো ব্যক্তিবিশেষকে নয়, এমন কি দেবুদাকেও নয়—সমগ্র নাট্য-জগৎকে আমি ঈর্ষা করছিলাম—কেন তারা রেণুকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে? যাবার আগে কয়েকটা দিন কি রেণুকে আমার সর্বক্ষণের জন্য পাওয়া উচিত ছিল না? ঠিক এই সময়েই রেণুকে নাটকের রিহার্সাল নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে? তবু

আমার মুখে হাসি মাখানো।

নাটকের কথায় রেণু আনন্দ পাচ্ছিল। ওর বাড়ির দমবন্ধ পরিবেশ থেকে একটু মুক্তির জন্য রেণু যেন এই নাটকটাকে পেয়েছে।

—পরের সীন কখন আরম্ভ হবে?

রেণু হেসে বললো, একটু দেরি আছে। একটা বন্দুকের শব্দ করতে হবে—কিছুতেই শব্দটা ঠিক হচ্ছে না।

আমি বললাম, আচ্ছা, স্টেজের পাশে কোথাও একটা গ্রীনরুম থাকে না? আমি কখনো দেখিনি। ঘরটা কি সত্যিই সবুজ?

রেণু আবার হাসতে হাসতে বললো, গ্রীনরুম দেখবে? এসো আমার সঙ্গে।

বাঁ দিকের উইংসের পাশ থেকে মঞ্চের ওপর দিয়েই রেণু আমাকে ডান দিকে নিয়ে এলো। মঞ্চের ওপর দিয়ে যাবার সময় আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। আগে কখনো আমি মঞ্চে উঠিনি, এই প্রথম, অথচ আমি অভিনেতা নয়। আমি বাদল হলেও আমার পাশে রেণু নেই—ও এক জমিদার-নন্দিনী। আমি একবার রেণুর মুখের দিকে আর একবার অডিটোরিয়ামের দিকে তাকালাম। এখানে আমি কি বিশ্রী রকমের বেমানান!

মঞ্চের ওপর দিয়ে যেতে যেতেই রেণু জিজ্ঞেস করলো, তোমার বাইরে যাওয়ার কিছু ঠিক হয়েছে?

আমি বললাম, এখনো বিশেষ কিছুই ঠিক হয়নি।

মঞ্চের ওপর তো মানুষ মিথ্যে কথাই বলে।

ডান দিকের উইংসের পাশে অনেকে চা খেতে খেতে জটলা করছিল। দেওয়ালে গিরিশ ঘোষের একটা মস্ত বড় ছবি। রেণু আমাকে নিয়ে এলো গ্রীনরুমে। সৌভাগ্যবশত সেখানে কেউ ছিল না। একটা রঙের তুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ আমি ফিরে দাঁড়ালাম। বিদ্যুৎবেগে রেণুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম।

রেণু আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। রেণুকে আমি যতবারই চুমু খেয়েছি, রেণু আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। আমাকেও এমন সব অসম্ভব জায়গা ও সময় বেছে নিতে হয়! যখন ইচ্ছে তখনই রেণুকে পাই না বলেই যে আমি এ রকম করি, তা কি রেণু বোঝে না?

ত্রাস ও ক্ষোভ মেশানো গলায় রেণু বললো, তুমি কি কিছুতেই এসব ছাড়বে না?

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

—তুমি যদি এই রকম ব্যবহার করো...

আমি আবার হাত তুলতেই রেণু সরে গিয়ে দরজার কাছে এমন জায়গায় দাঁড়ালো, যাতে ওকে বাইরে থেকে দেখা যায়। যাতে আমি ওকে আর ধরতে না পারি।

আমি বললাম, ভয় নেই, আমি আর কিছু করবো না। আমি ক্ষমা চাইছি। রেণু, আমাকে একটা কথা দেবে? আমাকে একদিন তোমার বুকে জড়িয়ে ধরবে?

—আবার ঐ সব কথা? আমি ওসব কিছু শুনতে চাই না।

—আজ নয়। কোনো একদিন তুমি আমাকে তোমার বুকে জড়িয়ে ধরবে? শুধু কথা দাও তা হলেই হবে।

—আচ্ছা, সে দেখা যাবে।

—রেণু, আমার বাইরে যাওয়ার দিন ঠিক হয়ে গেছে।

—কবে?

আমি ইচ্ছে করেই দিন দশেক পরের একটা তারিখ বললাম। রেণু অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলো। ওর নাটকের ফাইনাল অভিনয়ের আগে কোনোরকম বিঘ্ন ঘটাতে আমি চাই না।

—তোমার যাওয়ার দিন আমি স্টেশনে যাবো!

রেণু জানে না, আজই ওর সঙ্গে আমার শেষ কথা হয়ে গেল।

আমার ট্রেন বিকেলবেলা। সকাল থেকে হঠাৎ বিমর্ষ বোধ করতে লাগলাম। শেষ মুহূর্তে মায়ের কাছে ধরা পড়ে যাবো না তো? জানতে পারলে মা কিছুতেই যেতে দেবেন না। একমাত্র ছেলে হওয়ার অনেক ঝামেলা। কত লোক দিব্যি টিকিট কেটে প্রকাশ্যে আনন্দ করতে করতে বিদেশে যায়। বাড়ির সব লোক স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসে। আমার বেলায় এত লুকোচুরি, গোপনতা। শেষ সময়টুকুও সুখের হবে না।

বাবা খেয়েদেয়ে তাড়াতাড়ি কোথায় বেরিয়ে গেলেন। সেদিনকার সেই চাকরির ঘটনার পর থেকে বাবার সঙ্গে আমার কথাবার্তা খুবই কমে গেছে। বাবাকে এখন সব সময়েই চিন্তাক্লিষ্ট মনে হয়। বাবার কাছ থেকে আমার বিদায় নেওয়া হলো না।

মা-ও শুয়ে পড়লেন একটু বাদে। দু দিন ধরে মায়ের ডান পায়ের পাতাটা একটু ফুলেছে। ইদানীং বাতের কষ্ট পাচ্ছেন। আমি মায়ের ঘরের পাশে ঘুরঘুর করতে লাগলাম। পঙ্কজরা অপেক্ষা করছে। আমার এক্ষুনি যাওয়া উচিত, তবু যেতে পারছি না। এর আগে বাইরে কোথাও গেলে মাকে প্রণাম করেছি। আজ প্রণাম করার প্রশ্নই উঠে না। একটা কথা অন্তত বলা উচিত, কিন্তু কি বলবো? যে-কোনো কথা বলাই বিপজ্জনক। বুদ্ধ কিংবা চৈতন্য যখন গৃহত্যাগ করেছিলেন—তখন কারুর সঙ্গে একটিও কথা বলে যাননি। আমি তা জানি, কিন্তু আমি তো সন্ন্যাসী হতে পারিনি!

মা ঘুমিয়ে পড়লে চুপিচুপি প্রণাম করে পালাতে পারতাম। কিন্তু মা 'মরণের পরপারে' নামে একখানা বই খুলে শুয়েছেন। এই বই পড়তে পড়তে কারুর ঘুম আসে?

বারবার উঁকি দিয়ে যাচ্ছি। একবার দেখলাম, মা সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছেন। বইখানা ওল্টানো। কিন্তু আমি ঘরে পা দিতেই মা বললেন, কি রে? কিছু চাইছিস?

—না।

—কোথাও বেরুবি নাকি?

আমার আর সময় নেই। মাথায় একটা বুদ্ধি এলো সেই মুহূর্তে। পকেট থেকে রুমালটা বার করে মুখ মোছার ছলে সেটা ফেলে দিতে চাইলাম মায়ের পায়ের ওপর। দুর ছাই, সেটা ঠিক পায়ের ওপর পড়লো না। সেটা তুলতে গিয়ে মায়ের পায়ের সঙ্গে আমার পা ছুঁয়ে গেল। গুরুজনদের পায়ে পা ঠেকলে প্রণাম করতে হয়। এর মধ্যে অস্বাভাবিক তো কিছু নেই। টপ করে মাকে প্রণাম করে বললাম, মা আমি একটু ঘুরে আসছি!

আর কোনো কথা না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম এক বস্ত্রে। পঙ্কজের বাড়িতে ভাস্করও অপেক্ষা করছিল। ভাস্কর দু' দিন ধরে কলকাতায় আছে। ওর এখন ছুটি নেই—ভাস্কর যে আমাকে ট্রেনে তুলে দেবার জন্যই কলকাতায় থেকে গেছে আমি জানি। কিন্তু ও সে কথা কিছুতেই স্বীকার করবে না। মুখে বলছে, ওর কত সব জরুরি কাজ আছে, বাড়ির ব্যাপার। ভাস্কর কারুর কাছেই নিজের কোনোরকম

দুর্বলতা দেখাতে চায় না।

আমি পৌঁছতেই ভাস্কর ধমক দিয়ে বললো, তুই কি ডোবাবি নাকি? আর মাত্র এক ঘণ্টা বাকি! আমি তো ভাবছিলাম, তোর বদলে আমিই চলে যাবো।

আমার গলা ভারী হয়ে আছে, সহজে কথা বলতে পারছি না। ভাস্কর নিজেই দৌড়াদৌড়ি করে ট্যাক্সি ডেকে আনলো। পঙ্কজ জিনিসপত্র সব তুলে দিয়ে বললো, চল, চল, ট্রেন না মিস করিস।

ট্যাক্সি ছাড়ার আগে ভাস্কর জিজ্ঞেস করলো, আর কেউ যাবে না? আর কারুকে বলিসনি?

—না।

—রেণুকেও না?

পঙ্কজ বললো, চল, এখন আর ওসব ভাববার সময় নেই। বলেই নি যখন—এখন আর কি করা যাবে!

ভাস্কর আমার সঙ্গে রেণুর ব্যাপারটা জানে। ভেংচি কেটে বললো, ইডিয়েট, এই সময় মান-অভিমান করার কোনো মানে হয়? এখনো যথেষ্ট সময় আছে, যদি চাস তো রেণুকে বাড়ি থেকে তুলে নিতে পারি।

আমি জোরে জোরে মাথা নেড়ে না না বলতে লাগলাম। ভাস্কর আপন মনে হেসে উঠলো।

হাওড়া স্টেশনে যখন পৌঁছলাম, তখন সত্যিই বেশী সময় ছিল না। জায়গা রিজার্ভ করাও ছিল না। ভাস্কর আর পঙ্কজ উঠে পড়ে ঠেলাঠেলি করে থার্ড ক্লাস কামরায় আমার জন্য জানলার ধারেই একটা জায়গা ঠিক করে ফেললো। বন্ধুরা না থাকলে আমি কি করতাম?

আমাকে বসিয়ে দিয়েও ওরা প্লাটফর্মে নেমে ছোটাছুটি করতে লাগলো। পঙ্কজ কিনে আনলো কমলালেবু আর আমার পছন্দমতন এক গাদা সিগারেটের প্যাকেট। ভাস্কর কয়েকটা গুলিসুতো আর সূঁচ কিনে এনে একটা প্যাকেটে মুড়ে নিয়ে বললো, রেখে দে, দেখবি অনেক দরকারে লাগবে। হঠাৎ যদি প্যান্টের বোতাম ছিঁড়ে যায়—

হুইশল দেবার পর ট্রেন নড়ে উঠলো। আমি ওদের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলাম। পঙ্কজ বললো, মাইশোরে পৌঁছেই একটা চিঠি দিস। জামাইবাবুকে বলিস—

ভাস্কর চালাক ছেলে। ও ঠিক বুঝেছিল, শেষ মুহূর্তে আমার চোখে জল আসবে। সেই জন্যই ওর নাকের ওপর দু হাতের আঙুল জুড়ে, যাকে প্যাঁক-দেওয়া বলে, সেই-রকম অদ্ভুত ভঙ্গি করতে লাগলো। আমি না হেসে পারলাম না।

২

ট্রেন ছাড়ার পরই মনে হলো, শেষ হয়ে গেল আমার জীবনের একটা অংশ। এর পর থেকে আমার কাছে সব-কিছুই নতুন। জীবনের এই কটা বছর ধরে যে-সব মানুষ-জন সংগ্রহ করেছিলাম, তাদের কারুর সঙ্গেই আমার আর দেখা হবে না। রেণুকে একদিন গঙ্গার ঘাটে খুঁজে পেয়েছিলাম, আজ আবার হারালাম।

প্রথম কয়েক ঘণ্টা আড়ষ্ট হয়ে বসেছিলাম ট্রেনে। কোনো সহযাত্রীর সঙ্গে একটাও কথা বলিনি। যেন, আমি কথা বললেই ওরা জেনে ফেলবে, আমি পালিয়ে যাচ্ছি। কি অকারণ এই ভয়! জীবনটা তো আমারই, এ জীবন নিয়ে আমি যা খুশী করতে পারি! আজ থেকে আমি স্বাধীন, তবু স্বাধীনতা পেয়েও কেন এত অবশ হয়ে থাকে? মানুষ কী রকম স্বাধীনতা চায়?

মহীশূরে পংকজের জামাইবাবুর বাড়িতে পোঁছে মনটা আরও দমে গেল। দারুণ সাজানো-গোছানো বিরাট প্রাসাদ একেবারে। অচেনা লোকের কাছে আমি কিছুতেই সহজ হতে পারি না। এ রকম আড়ম্বরপূর্ণ বাড়িতে এলে সব সময় মনে হয়, প্রতি মুহূর্তেই যেন আমি কোনো নিয়ম-কানুনের ভুল করে ফেলছি। যে-সব ঘরে কার্পেট পাতা থাকে, সে-সব ঘরে কি জুতো পরে ঢুকতে হয়? কোনো কোনো বাড়িতে জুতো বাইরে রাখার প্রথা, আবার কোনো কোনো বাড়িতে কেউ জুতো খোলে না।

গেট পর্যন্ত পোঁছেও একবার মনে হয়েছিল ফিরে যাই। কোনো একটা ছোট-খাটো হোটেলে থাকলে ক্ষতি কি? আমি কখনো একলা কোনো হোটেলে থাকিনি। কিন্তু ফিরে যাওয়া হলো না, পংকজের জামাইবাবু আমাকে দেখতে পেয়ে গেলেন।

ওঁর নাম সুব্রত মৈত্র। খুব রোগা আর লম্বা মতন মানুষটি, বাংলা সিনেমার নায়িকাদের বাবার মতন ড্রেসিং গাউন পরা এবং মুখে পাইপ। সাহেবী ধরনের মানুষ। তবে, ওঁর কথা শুনে আমাকে চমকে উঠতে হলো। উনি দু' হাত বাড়িয়ে আমাকে বললেন, আরে আসো আসো ট্রেন ল্যাট ছিল কয় ঘণ্টা?

সুব্রতদা কাঠ-বাঙাল। বাংলা কথার উচ্চারণ একেবারে যাচ্ছেতাই—উনি শোধরাবার চেষ্টাও করেন না। স্বাধীনতার পর বাঙালরা এদিকে দলে ভারী হয়ে ওঠার ফলে, উচ্চারণ নিয়ে আর মোটেই লজ্জা পায় না। সুব্রতদার মতন এমন সাহেবী-ধরনের বাঙাল আমি আগে কখনো দেখিনি। চায়ের স্বাদ একটু খারাপ হলে উনি কাপ সরিয়ে রাখেন, নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথাবার্তাতেও প্লিজ আর থ্যাংক ইউ যোগ করেন, কুকুরের সঙ্গে কথা বলেন ইংরেজিতে—কিন্তু বেড়ালকে বলেন বিলোই।

সুব্রতদা খুব সহজেই আমাকে আপন করে নিলেন। ওঁর স্ত্রী সুধাদি একটু গম্ভীর ধরনের হলেও যথেষ্ট স্নেহশীলা। প্রথম প্রথম সুধাদিকে দেখে একটু ভয় ভয় করছিল, মনে হয়েছিল, উনি বোধ হয় বাড়িতে অতিথি আসা পছন্দ করেননি। পরে বুঝেছিলাম, ওঁর স্বভাবই কম কথা বলা—মানুষকে যত্ন করার ব্যাপারে ওঁর কোনো ত্রুটি নেই। ওঁদের তিনটি ছেলেমেয়ে। ছেলেটি ছোট, পাঁচ ছ' বছরের, আর মেয়ে দুটির বয়স পনেরো আর ষোলো, হঠাৎ দেখলে যমজ বলে মনে হয়। একই রকমের পোশাক, একই ধরনের বেণী ঝোলানো, দু' জনেই বাড়িতে সব সময় লাল রঙের চটি পরে থাকে। ওদের নাম যমুনা আর সরস্বতী ছেলেটির নাম সুভাষ। সুভাষের সঙ্গেই আমার ভাব হলো আগে।

আমাকে থাকতে দেওয়া হলো একতলার একটি ঘরে। সেই ঘরে বিছানা থেকে আরম্ভ করে বাথরুমের তোয়ালে সাবান পর্যন্ত সবই আগে থেকে সাজানো, এটা ওদের বাড়িতে গেস্ট রুম। কোনো বাড়িতে যে এ রকম ঘর সাজানো থাকে, আগে আমার জানা ছিল না।

সুব্রতদা আগেই খবর নিয়ে রেখেছিলেন, আমার জাহাজ ছাড়তে আরও ছ' দিন দেরি আছে। এই ক'দিনে আমাকে বিলেতি আদব-কায়দায় দীক্ষা দেবার জন্য সুব্রতদা উঠে-পড়ে লাগলেন। সুব্রতদা সাত বছর লণ্ডনে ছিলেন—অনেকদিন বাদে তাঁর প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতা শোনাবার মতন একজন শ্রোতা পেয়েছেন। সব বিলেত-ফেরতই বিলেতের গল্প করতে ভালোবাসে। হ্যাণ্ড শেক করার সময় ঠিক কতটা হাত ঝাঁকাতে হবে এবং হাউ ডু ইউ ডু-র উত্তরে যে হাউ ডু ইউ ডু-ই বলতে হয়—এসব আমি মনোযোগী ছাত্রের মতন শিখতে লাগলাম।

এক সময় সুব্রতদা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বিলাতে কি পড়তে যাইত্যাছো?

আমি বললাম, পড়তে তো যাচ্ছি না। চাকরি করতে—

সুব্রতদা ভুরু কুঁচকে বললেন, চাকরি? চাকরির জন্য অত দূরে যাওয়া ক্যান?

আমি বললাম, কি করবো বলুন। এদেশে তো আর চাকরি পেলাম না। আমাদের দেশ তো আমাদের দেশের ছেলেদের চাকরি দিতে পারে না।

সুব্রতদার কথাটা পছন্দ হলো না। সুব্রতদার মতে ইউরোপীয়রা জ্ঞানে বিজ্ঞানে অনেক এগিয়ে আছে— সুতরাং ওদের কাছে সে সব শেখার জন্য যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ওদের অধীনে চাকরী করা, ছি ছি—এটা বড় হীনতার কাজ।

আমার কাছে এখন এ সব কথার আর কোনো মূল্যই নেই। আমি চুপ করে রইলাম।

সুব্রতদা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে চাকরি করবে? আমার অফিসে তোমাকে এক্ষুনি একটা চাকরি দিতে পারি।

এরকম হয়। যখন প্রয়োজন থাকে না, তখন অনেকেই কিছু দিতে চায়। আমি বড় একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, নাঃ, এদেশে আর আমি থাকবো না।

সুব্রতদার চাকরিটা ভারী আরামের। অফিস না গেলেও চলে। অফিসের লোকেরাই বাড়িতে কাগজপত্তর নিয়ে আসে। এ ছাড়া অসংখ্য টেলিফোন আসে, সারা দিনে সুব্রতদা নিজেও অন্তত ছ'টা সাতটা ট্রাংক কল করেন। বাড়িতে বসে টেলিফোনে কাজ সেরেও এত বড় চাকরি পাওয়া যায়।

বিকেলের দিকে পর পর তিন দিন সুব্রতদা আমাকে অনেক জায়গায় বেড়িয়ে নিয়ে এলেন। ছেলেমেয়েরাও সঙ্গে আসে। সুধাদি বেড়াতে ভালোবাসেন না। এই-ভাবে আমার চামুণ্ডী পাহাড় এবং বৃন্দাবন গার্ডেনস দেখা হয়ে গেল। একদিন বেড়াতে গেলাম চন্দনের বনে। হাত দিয়ে একটা চন্দন গাছ প্রথম ছুঁয়ে শরীরে রোমাঞ্চ হয়। ঠিক যেন একটা অলৌকিক সৌভাগ্যের মতন। আগে তো কখনো ভাবিনি, আমি একদিন এই রকমভাবে চন্দন গাছের ছায়ায় দাঁড়াবো। কাবেরী নদীর কাছে গিয়েও অনেকটা এই রকমই মনে হয়েছিল। আর কিছুই নয়, অন্য যে-কোনো নদীর মতনই তো—তবু কাবেরী নামটা যেন শুধু কবিতার মধ্যেই ছিল—হঠাৎ সেই নামের নদীর কাছে চলে এলে মনে হয়, এটা যেন ঠিক কোনো বাস্তব ঘটনা নয়।

যমুনা আর সরস্বতী এই দুই বোনের মধ্যে সরস্বতী একটু বেশী লাজুক। যমুনা আমার সঙ্গে অনেক গল্প করে—কিন্তু বার বার আমার চোখ চলে যায় সরস্বতীর দিকে। এক এক সময় বুকটা কেঁপে ওঠে। মনে হয়, সরস্বতীকে যেন অবিকল রেণুর মতন দেখতে। যদিও ঠিকঠিক বিচার করলে, রেণুর সঙ্গে ওর বিশেষ কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না—ওর মুখের গড়ন আলাদা, নাক চোখও অন্য রকম, তবু সরস্বতীর মুখের কোনো একটা রেখায়, কিংবা তাকানোর ভঙ্গিতে দপ করে রেণুর কথা মনে পড়ে যায়। ট্রেনে আসবার সময় এই রকম আরও দু-তিনটি মেয়েকে দেখে ঠিক রেণুর মতন মনে হয়েছিল। রেণুর কথা ভুলতে চাইছি বলেই বোধহয় রেণু বার বার নানা চেহারায় আমার চোখের সামনে এসে হাজির হচ্ছে।

বৃন্দাবন গার্ডেনস দেখতে গিয়ে যেদিন আমরা কাবেরী নদীর ধারে দাঁড়িয়েছিলাম, সেদিন সরস্বতী বলেছিল, দিদির নামের সঙ্গে মিলিয়ে আমার নাম কাবেরী রাখলে অনেক ভালো হতো। ঠাকুর দেবতার নাম আমার একটুও ভালো লাগে না!

ও জানে না যে সরস্বতী নামেও নদী আছে। আমি ওকে বললাম, তুমি এলাহা-

শুনেছি ত্রিবেণী সঙ্গমের কথা শোনেননি? সেখানে গংগা, যমুনা আর সরস্বতী—এই তিনটে নদী এক সঙ্গে মিশেছে?

যমুনা জিজ্ঞেস করলো, আপনি এলাহাবাদে গেছেন?

মেয়েদের সামনে মিথ্যে কথা বলতে আমার একটুও আটকায় না। আমি ঘাড় হেলিয়ে বললাম, হ্যাঁ—

—কি রকম দেখতে সেই জায়গাটা? যেখানে তিনটে নদী একসঙ্গে মিশেছে?

কল্পনা করা এমন কিছু শক্ত নয়। তা ছাড়া নদীর বর্ণনা দেওয়া আর এমন কি কথা। মনশ্চক্ষে আমি প্রয়াগের ত্রিবেণীসঙ্গম দেখতে পেলাম, সেখানে দুর্গের ছায়া পড়েছে। সুব্রতদা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার বর্ণনা শুনে খুব হাসতে লাগলেন।

যমুনা-সরস্বতী প্রায় জন্মকাল থেকেই প্রবাসে আছে। ওদের ব্যবহার অনেক সহজ, শাড়ির বদলে স্কার্ট পরে। যমুনা আমার হাত ধরে বললো, বাদলদা, একটা জিনিস দেখবেন আসুন। আসুন না—

একটা গাছের পাতায় একটা পরিত্যক্ত বোলতার বাসা—ঠিক একটা বড় কদম ফুলের মতন—যমুনা আমাকে সেটা দেখাতে আনে। জিনিসটা সত্যি সুন্দর। কাছাকাছি কোনো বোলতা নেই দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি সেটাকে ভেঙে নিয়ে এলাম। সেটাকে দেখবার জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্যবশে যমুনা আমার কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো—ওর শরীরের গরম স্পর্শ আমি টের পেলাম। সেই মুহূর্তেই আমার মুখখানা অপরাধীর মতন বিবর্ণ হয়ে গেল। যেন আমি রেণুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছি। যে কয়েকবারই যমুনা সাধারণ সরলতায় আমার হাত ধরেছে কিংবা শরীরের সঙ্গে ছোঁয়া লেগে গেছে—প্রত্যেকবারই আমার এরকম মনে হয়েছে। রেণু ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে আমি স্পর্শ করতে পারি না। কদাচিৎ অন্য কোনো মেয়ের বুকের অনাবৃত অংশের দিকে আমার চোখ পড়ে গেলেও আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছি। নারীর কাছ থেকে আমার যা কিছু পাবার—তা সবই রেণুর কাছে গচ্ছিত রয়েছে। মাঝে এ রকম কথাও আমার মনে হয়েছে যে থিয়েটারের সেই দেবুদা যদি রেণুর গায়ে হাত দিয়ে কথা বলতে পারে, তা হলে আমিই বা অন্য কোনো মেয়েকে ছুঁতে পারবো না কেন? কিন্তু আমার এ বিদ্রোহ বেশী দূর দানা বাঁধেনি। এখন রেণুর কাছ থেকে দূরে আছি বলেই যেন আমার কঠোরতা আরও বেড়ে যায়।

আমার কোচিন যাবার আগের দিন এ বাড়িতে একটা ছোটখাটো উৎসব হয়ে গেল। উৎসবের উপলক্ষটা আমি সারাদিনের মধ্যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত জানতে পারিনি কিংবা আমার কাছে গোপন করে রাখা হয়েছিল। সেদিন সরস্বতীর জন্মদিন—আমি যাতে উপহার-টুপহার কিনে টাকা খরচ করে না ফেলি, সেই জন্য সুব্রতদা আমাকে বলতে চাননি। সন্ধেবেলা সুভাষ দৌড়তে দৌড়তে এসে আমাকে খবর দিয়ে গেল, এবার দিদির নামে কেক কাটা হবে—আপনি শিগগির আসুন!

ওপরে গিয়ে দেখলাম সরস্বতী একটা উজ্জ্বল লাল রঙের শাড়ি পরেছে। তার প্রথম শাড়ি। তার লাজুকতার সঙ্গে ওই লাল রং মানিয়েছে ভারী চমৎকার। ওর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, ঠিক যেন রেণুকে দেখছি। রেণুর জন্মদিনটা যেন কবে? আমার কিছুতেই মনে থাকে না। গত বছর রেণুর জন্মদিনে আমি কোনো উপহার দিইনি, রেণুই আমার জন্য একটা বই কিনে এনেছিল।

কারুকে কিছু না বলে টুপ করে এক ফাঁকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। উপহার কেনার অভ্যেস নেই, কি কিনবো জানি না। বই কেনার কথাই প্রথমে মনে পড়ে। কিন্তু

সুব্রতদার বাড়ি ভর্তি বই। অনেক ভেবেচিন্তে এখানকার বিখ্যাত সাবান কিনে ফেললাম এক বাক্স। আশ্চর্য ব্যাপার, দোকানদারের হাত থেকে যখন সাবানের বাক্সটা নিচ্ছি—তখনও আমার মনে হচ্ছে, যেন রেণুই এই সাবান মাখবে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বাথরুমে রেণু...। এই ক'দিনে বাবা-মা'র কথাও আমার তেমন করে মনে পড়েনি, রেণুর স্মৃতিই জ্বালাতন করছে সবচেয়ে বেশী।

সুব্রতদার পরিচিত কিছু নারী-পুরুষ এসেছিলেন নেমন্তন্ন খেতে। বাইরের সবাই চলে যাবার পর আমরা দোতলার বড় হলঘরটাতে বসে গল্প করছিলাম। সুব্রতদা খুব রাগাবার চেষ্টা করছিলেন সুধাদিকে। মিঃ আয়েঙ্গার নামে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি নাকি সুধাদির প্রেমে পড়েছেন। ছেলেমেয়ের সামনেই সুব্রতদার এই ধরনের রসিকতার ব্যাপারটা আমার বেশ ভালো লাগে। সুব্রতদা যমুনাকে জিজ্ঞেস করলেন, খুকু তুই দেখিসনি, আয়েঙ্গার তোর মায়ের দিকে কি রকম ঢুলুঢুলু চোখে তাকাচ্ছিল? তোর মা-ও কি রকম লজ্জা-লজ্জা ভাবে—

এই সময় ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে উঠলো। সুব্রতদা উঠে গিয়ে টেলিফোনটা তুলে নিয়ে চিৎকার করে কথা বলতে লাগলেন। অর্থাৎ ট্রাঙ্ক কল। একটু বাদেই সুব্রতদা আমার দিকে ফিরে বললেন, বাদল, তোমার—। তারপর হাসতে হাসতে সকলকে জানালেন, বাদলের আর যাওয়া হলো না। ওর বাড়ি থেকে ডাক এসেছে—

আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল বিস্ময়ের। আমাকে এখানে কে টেলিফোন করবে! আমার বাড়ির কারুর পক্ষে জানা তো অসম্ভব! আমার দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া হলো, কঠিন প্রতিজ্ঞার। যাই হোক না কেন, আমি কিছুতেই ফিরে যাবো না। কিছুতেই না। টেলিফোন তুলে দৃঢ় গলায় বললাম, হ্যালো—।

এটাই আমার ভুল হলো। টেলিফোন যন্ত্রটা হাতে নেওয়াই আমার ঠিক হয়নি। আমার উচিত ছিল সুব্রতদাকে দিয়েই বলানো যে আমি চলে গেছি।

ট্রাঙ্ক কল করেছেন বাবা। আমাকে ধমকালেন না, কান্নাকাটি করলেন না। খুব শান্ত গলায় বললেন, তোমার বাবা বলছি। তোমার মায়ের খুব অসুখ। তিনি তোমাকে বার বার দেখতে চাইছেন। তোমার ইচ্ছে হলে আসতে পারো। তবে তুমি আসবে কি না-আসবে, তা তুমিই ঠিক করবে। আমি শুধু খবরটা জানিয়ে দিলাম, না হলে তোমার মা শান্ত হচ্ছিলেন না।

আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মাথার মধ্যে প্রবলবেগে অনেক কিছু ঘুরছে। বাবা আমাকে সত্যিই চমকে দিয়েছেন। যে-সব ছেলে বাড়ি থেকে চলে যায়, তাদের সকলেরই মায়েরা গুরুতর অসুখে শয্যাশায়ী হয়। এটা নতুন কিছু নয়। এই খবরে আমি বিচলিত হতাম না। কিন্তু বাবার ওই শান্ত কণ্ঠস্বরে আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছি। আমাকে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ বা আদেশ না করে এরকমভাবে কথা বলার মানে কি? ফিরবো কি না তা আমাকেই ঠিক করতে হবে। এই অসুখের ফলে যদি মা মারা যান, তা হলে আমিই হবো সেই মৃত্যুর জন্য দায়ী। যেন সবাই মিলে একটা ষড়যন্ত্র করছে আমার বিরুদ্ধে। মায়ের অসুখটাও সেই ষড়যন্ত্রের অংশ। পরিবার এবং সমাজ নামে দুটি অদ্ভুত প্রতিষ্ঠান আমাকে বলতে চাইছে, তোমাকে দায়িত্ব নিতে হবে, তোমাকে পালাতে দেবো না আমরা। তোমার মায়ের মৃত্যুর দায়িত্ব তুমি নেবে কিনা তা এখনো ভেবে দেখো! আমার ইচ্ছে হলো টেলিফোনটা আছড়ে ভেঙে ফেলি।

॥ ৮২ ॥

মহাশূরে সুব্রতদাদের বাড়িতে থাকার কালে আমি যদি কোচিনের কোনো হোটেলে উঠতাম, তাহলে আমার ভবিষ্যৎ জীবনটা অন্যরকম হতো। মায়ের অসুখের খবর কোনোক্রমে আমার কাছে পৌঁছোতো না, আমি বিদেশের পথে পাড়ি জমাতাম। আর কোনোদিন ফিরতাম কিনা কে জানে! কোচিনে কোনোক্রমে আমার কাছে খবর পৌঁছোলেও সেখানে আমি অন্যরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম, একা হোটেলের ঘরে নিজেকে প্রশ্ন করতে পারতাম আমি। কিন্তু এখানে সুব্রতদা, সুধাদি, যমুনা ও সরস্বতী তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

সুব্রতদা জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে কি করবে? আমার তো মনে হয়, তোমার ফিরে যাওয়াই উচিত।

আমার মুখে কোনো উত্তর এলো না। ওরা কেউ দেখতে পাচ্ছে না, আমার পা কাঁপছে গলা শুকিয়ে এসেছে। একতাল ছানা কাপড়ে জড়িয়ে নিংড়ে নিংড়ে যেমন জল বার করে, সেই রকমভাবে আমার ভেতরটা কেউ নিংড়োচ্ছে। মায়ের অসুখ, আমার উচ্চাকাংখা এবং সুব্রতদারা কি মনে করেছেন, এই তিনরকমের চিন্তা আমাকে দিশেহারা করে দেয়। আমি এত ভাবতে পারি না, এত দায়িত্ব, এমনকি নিজের সম্পর্কেও, নেবার অভ্যেস নেই আমার।

সুধাদি কিংবা যমুনা-সরস্বতী আমার টেলিফোনের বৃত্তান্ত জানে না। যমুনা বললো, কি হলো? বাদলদা, আপনার বিলেত যাওয়া হবে না?

আমি দুদিকে মাথা নাড়লাম। অর্থাৎ, আমার আর কিছুই হবে না।

এরপর সকলে মিলে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রশ্ন করতে লাগলো আমাকে। সুধাদি যখন জানলেন যে আমি বাড়িতে কারুকে কিছু না জানিয়ে চলে এসেছি, তখন রেগে গেলেন। খুব। আমাকে আশ্রয় দেবার জন্য যেন তিনিও অপরাধী। তৎক্ষণাৎ সুব্রতদাকে বললেন, তুমি ট্রেনের খোঁজ করো। ওর এক্ষুনি বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত।

সুব্রতদা একটা উপায়ান্তর খুঁজে বার করলেন। তিনি জাহাজ কোম্পানিকে টেলিফোন করে দেখবেন, টিকিট ক্যানসেল করা যায় কিনা। সেটা সম্ভব হলে তিনি দু'তিন মাস পরে আবার কোনো জাহাজে সীট বুক করে রাখবেন। ইতিমধ্যে আমি বাড়ি থেকে ঘুরে আসবো এবং মায়ের অসুখ নিশ্চয়ই সেরে যাবে।

ট্রেন রাত তিনটেয়। সুব্রতদাদের বাড়ির সকলে মিলে আমাকে তুলে দিতে এলো স্টেশনে। যমুনা আর সরস্বতীর সঙ্গে এই কদিনে আমার বেশ একটা বন্ধুত্বের মতন হয়ে গিয়েছিল। ওদের মুখ দেখে বোঝা যায়, আমার বিদেশ যাওয়া হলো না বলে ওরা খুব দুঃখিত হয়েছে। আন্তরিক দুঃখ। কেউ কোথাও আমার জন্য দুঃখ পেয়েছে—এটা টের পেলেই মনের মধ্যে অসম্ভব একটা মায়া জেগে ওঠে কেন?

ফেরার পথ সম্পূর্ণ অন্যরকম। আমার চিন্তাশক্তিও যেন অসাড় হয়ে গেছে। বার-বার একটা ছবিই ভেসে আসছে চোখের সামনে। আমি ফিরে গিয়ে মাকে আর দেখতে পাবো না। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, শ্মশান থেকে ফিরে সবাই নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে সিঁড়ির ওপরে। আমাকে দেখে বাবা বললেন, যদি এত দেরিই করলি, তা হলে আর এলি কেন?

বাঙ্কের ওপর শুয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একজন সহযাত্রী আমাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তুলে জিজ্ঞেস করলো, ও ভাই, কি হয়েছে আপনার? অসুখ

ধরেছে?

আমি কোনো উত্তর দিতে পারলাম না।

ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে আমার কাছে। নানা প্রাদেশিক ভাষায় নানা প্রশ্ন। আমি ঘুমের মধ্যে কাঁদছিলাম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। সেইজন্যই সহযাত্রীরা আমার সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়েছে। আমার অসম্ভব লজ্জা করতে লাগলো। ইস, এরা কি ভাবছেন—এত বড় একটা ছেলে ঘুমের মধ্যে কাঁদে? অনেকেই অবশ্য ধরে নিয়েছেন, আমি কোনো অসুখের কষ্ট পাচ্ছি। এঁরা কেউ জানেন না, আমি সদ্য মাতৃহীন। একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক অতি সহৃদয়ভাবে প্রশ্ন করলেন, আপনার কি পেট ব্যথা করছে? আমার কাছে ভালো ওষুধ আছে।

আমি পেটের ব্যথার কথাই স্বীকার করলাম। মানুষের মনের কষ্টের কথা অন্য কারুকে বোঝানো যায় না, তাই শারীরিক কষ্টের কথাই সকলে জানতে চায়। মাদ্রাজী ভদ্রলোক একটা টিনের কৌটো থেকে কি একটা কালো গুঁড়ো মশলার মতন বার করে দিলেন, খেয়ে ফেললাম বিনা দ্বিধায়। জিনিসটা বেশ সুস্বাদু। হাত বাড়িয়ে বললাম, আর একটু দিন।

দু'দিন ট্রেন জার্নির পর অস্নাত রুক্ষ চেহারায় পৌঁছোলাম কলকাতায়। ট্যাক্সি যখন বাড়ির সামনে থামলো, তখন পর্যন্ত আমার বুকের মধ্যে কাঁপুনি ছিল কিন্তু বাড়ির দিকে একবার তাকিয়েই আমার মনে হলো, এটা শোকের বাড়ি নয়। এখানে মৃত্যুর গন্ধ নেই। যদিও সদর দরজা বন্ধ, বাইরে কেউ নেই, দু' একদিন আগে কোনো ঘটনা ঘটে গেলে বাড়ি এরকমই থাকবে—তবু শোকের বাড়ি দেখলে চেনা যায়। মৃত্যু যেখানে একবার আসে, সেখানে দরজায় চিহ্ন থাকে।

তখন আমার মনে হলো, মায়ের অসুখের কথাটাই পুরোপুরি মিথ্যে। খবরের কাগজের 'খোকা ফিরে এসো'র বিজ্ঞাপনের মতন! সামান্য মিথ্যে কথায় আমার বিদেশ যাত্রা বন্ধ করে দেওয়া হলো? আমি কাল পরশুই আবার তাহলে ফিরে যাবো।

একটু জোরেই দরজায় ধাক্কা দিয়েছিলাম। দরজা খুলে দিলেন বাবা। শুধু বললেন, এসেছিস?

—এখানকার সব খবর ভালো তো?

—এই একরকম।

আমি তখনো দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। দরজার ওপাশে বাবা। ট্যাক্সির ভাড়া মেটানো হয় নি। আমি আবার ছুটে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে পড়বো? এ-বাড়ির সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক কি? আমি এ বাড়ির কেউ না—আমি এত কষ্ট করে ফিরে এলাম, বাবা যেন সেটা গ্রাহ্যই করছেন না। শুধু আমার দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে আছেন।

ট্যাক্সিওয়ালা হর্ন দিতেই আমি সজাগ হলাম। হঠাৎ নাটকীয় কিছু করে ফেলা আমার ধাতে নেই। ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে সুটকেসটা নামিয়ে নিলাম। বাবা দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। একবার শুধু বললেন, সুটকেসটা আমাকে দে।

আমি বললাম, না, ঠিক আছে। আমিই নিচ্ছি।

সিঁড়ি দিয়ে বাবার পেছনে পেছনে ওঠবার সময় আর একটাও কথা হলো না। দোতলায় ওঠার ঠিক আগেই মনে হলো, বাবাকে আমার প্রণাম করা উচিত ছিল। বরাবরই তো এরকম হয়ে এসেছে, বাইরে থেকে ফিরেই বাবাকে-মাকে প্রণাম করেছি। দরজা খোলার পরই বাবা সেইজন্যই বোধহয় আর কোনো কথা না বলে আমার প্রণামের অপেক্ষায় ছিলেন। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। এসব আর এখন আমার মনে থাকে না।

মাত্র বছর খানেকের মধ্যে বাবার সঙ্গে আমার কতটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেল। এখনো সুটকেসটা নামিয়ে রেখে প্রণামটা সেরে ফেলা যায়। সুটকেসটা নামিয়েও রাখলাম-- কিন্তু বাবা তখন বারান্দা দিয়ে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। প্রণাম করার জন্য কেউ কি গুরুজনদের ডাকে?

মায়ের ঘরে বড়মামা আর বড়মামীমা বসে আছেন। বিছানার ওপর মা, চোখ বোজা। মার সত্যিই অসুখ। আমি মাথার কাছে বসলাম। মার অসুখের জন্যই বেলেঘাটা থেকে বড় মামীমাদের আনানো হয়েছে। বাইরের লোকের উপস্থিতির জন্যই আবহাওয়া অনেক সহজ হলো। নইলে, বাবা বোধহয় আর আমার সঙ্গে কথা বলবেনই না ঠিক করেছিলেন।

বড়মামা বললেন, এসেছিস? ওঃ, যা চিন্তায় ফেলেছিলি! এরকমভাবে কেউ যায়? ইডিয়েট, একফোঁটা বুদ্ধি নেই মাথায়।

বড়মামীমা বললেন, থাক্, ছেলেটাকে এখন বকো না। হিমানীকে ডাকবো?

—এখন ডেকো না। এইমাত্র তো ঘুমোলো।

—একবার ঘুম ভাঙালে কিছু হবে না। সারাক্ষণ ছেলেটার নাম করছিল!

—আস্তে, আস্তে। হঠাৎ না চমকে ওঠে। চিত্তরঞ্জন নিজে টেলিফোন করেছে, ছেলেটার গলার আওয়াজ শুনছে—তাও হিমানী বিশ্বাস করে না। মায়ের মনে কষ্ট দিয়ে এরকমভাবে কেউ যায়?

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বসে রইলাম। ঠিক ভেবে পেলাম না, এ ক্ষেত্রে কষ্ট দেওয়া না কষ্ট পাওয়া, কোনটা অপরাধ?

বড়মামীমা বললেন, যা বাদল, হাত মুখ ধুয়ে জামাকাপড় ছেড়ে আয়। চেহারার কি ছিরি হয়েছে তোর?

আমি তবু বসেই রইলাম। বাবা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছেন। যেন এ ঘরের কোনো ব্যাপারের সঙ্গে তাঁর কোনো সংযোগই নেই।

বড়মামীমা মায়ের গায়ে হাত রেখে আস্তে আস্তে ঠেলা দিয়ে ডাকলেন, হিমানী ও হিমানী।

মা চোখ না খুলেই বললেন, উঃ?

—এখনো ব্যথা আছে?

—আছে।

—খুব!

—কি জানি!

—শোনো, বাদল এসেছে।

মা সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে উঠে বসবার চেষ্টা করলেন। ব্যাকুলভাবে বললেন, কই? কই?

এর পরের দৃশ্য বর্ণনার কোনো প্রয়োজন নেই। মায়ের চোখের জল দেখে আমাকেও আবার কাঁদতে হলো। এরই মধ্যে একটা কথা ভেবে সান্ত্বনা পেলাম। আমার ফিরে আসা সঠিক হয়েছে। আমি চলে যাবার পরদিনই মায়ের হার্ট স্ট্রোক হয়েছিল, ডাক্তারের মতে মাইল্ড ধরনের হলেও প্রাণ সংশয় ছিলই। এখন, মায়ের বিছানার পাশে বসে থেকে বুঝতে পারি, মায়ের মৃত্যুর বিনিময়ে আমার কোথাও যাওয়া চলে না। আমার সম্পর্কে আমার মায়ের টানটা সম্পূর্ণ জৈবিক, এখানে যুক্তির কোনো প্রশ্ন নেই।

কান্নাকাটি ও বিষণ্ণ পরিবেশই রইলো বাড়ীতে। বড়মামা চলে গেলেন, বড়মামীমা

ক'দিন ধরেই এখানে থাকছেন। আমার মামার বাড়িতে সকলেরই ধারণা, আমার বাবা নিতান্তই অকর্মা এবং অপদার্থ। মাকে তাঁরা বেলেঘাটায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন. কিন্তু এখন মাকে নড়া-চড়া করানো ঠিক নয় এবং মা যেতেও চান নি।

বড়মামীমাই খাওয়াদাওয়ার পর দুপুরে আমাকে জোর করে ঘুমোতে পাঠালেন। একটা লম্বা ঘুম দিলাম। জেগে ওঠার পর আবার মন খারাপ হয়ে গেল। এই মন খারাপের নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই। চুপচাপ দু'তিনটে সিগারেট শেষ করে আবার এসে বসলাম মায়ের বিছানার পাশে। মা এখন আবার অনেকটা নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন।

রেণু এলো সন্ধ্যের দিকে। আমিই দরজা খুলে দিয়েছিলাম। আমাকে দেখে রেণু চমকে উঠলো না, উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো না, শুধু জিজ্ঞেস করলো, মাসীমা কেমন আছেন?

আমি অপরাধী। সকলের চোখেই আমি তাই। সকলে মিলে শুধু একজনকে বার-বার বিদ্ধ করলে তার ফল কি ভালো হয়? রেণু এরকম না করলেও পারতো।

এরপর আমিও একটা ভুল করলাম। আমার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, তুমি কেমন আছো? কিংবা, তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছো? কিংবা, তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারো না? কিংবা, রেণু আমার চোখের দিকে তাকাও, আমাকে চিনতে পারছো না?

কিন্তু, এরকম কোনো ব্যক্তিগত কথার বদলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের থিয়েটার কেমন হলো?

রেণুর বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ম। ও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে, আমি ওর থিয়েটার করা পছন্দ করিনি। এবং এখনো সেই রাগ পুষে রেখেছি। রেণুও রাগের সঙ্গেই বললো, খুব ভালো হয়েছে।

তারপর আর একটাও কথা না বলে উঠে এলো দোতলায়। বেশ কয়েকদিন পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যে আমি হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে চলে গেছি এই খবর পেয়ে থিয়েটারের আসল অভিনয়ের দিন রেণু বলেছিল, ও পার্ট করবে না। সর্বক্ষণ কান্না-কাটি করেছে। শো ভণ্ডুল হয়ে যাবার আশঙ্কায় অনেকে মিলে প্রায় জোর করেই রেণুকে ধরে নিয়ে গিয়ে তুলে দিয়েছিল স্টেজে। কেন জানি না, এই কথাটা শুনেও আমার রাগ হয়েছিল।

রেণু মায়ের ঘরে বসে রইলো। কথা বলতে লাগলো বড় মামীমার সঙ্গে। আমার সঙ্গে আলাদা কথা বলার কোনো আগ্রহই নেই ওর। আমার দিকে তাকাচ্ছেও না। আমি সিগারেট খাবার ছলে কয়েকবার উঠে গেলাম নিজের ঘরে। সেখানে গিয়ে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম, রেণু যেকোনো মুহূর্তে চলে আসবে আমার কাছে। রেণু এলো না। এ কথাও আমার মাথায় আসে না যে, আমি নিজে না-ডাকলে রেণু আসবে না। বরং আমার অভিমান হয়, আমি এত দূরে গিয়েও আবার ফিরে এলাম, তবু রেণু একবারও আমার হাতে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো না, তোমার কোনো কষ্ট হয়নি তো?

এরপর আরও এক দঙ্গল আত্মীয় স্বজন এসে পড়লেন। প্রতিদিন সন্ধ্যে বেলাতেই এ'রা আসেন। আজ এ'রা দাদামশাইকেও নিয়ে এসেছেন। দাদামশাই প্রায়ই কঠিন অসুখে ভোগেন, আবার সকলকে অবাক করে দিয়ে সুস্থ হয়ে উঠে হাঁটাচলা করতে শুরু করেন। বয়েস হয়ে গেলেও চেহারাটি এখনো সোজা আছে। মামাবাড়ির গ্রামে যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ মানুটিকে দেখেছিলাম, এখন আর তাঁর কিছুই অবশিষ্ট নেই, বেলে-

ঘাটার জবর দখল কলোনির সামান্য পরিবেশে এই মানুষটিকে আঁটানো যায় না। প্রায় সারাজীবন যিনি সকলের ওপর হুকুম চালিয়ে এসেছেন আজ তাঁকে অর্থকষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। তাঁর বেশ কিছু টাকা তিনি কলকাতার একটি ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন, পঞ্চম দশকে একাধিক ব্যাঙ্কের সঙ্গে সেই ব্যাঙ্কটিও হঠাৎ একদিন গণেশ উলটেছে।

অন্যদের নিষেধ সত্ত্বেও দাদামশাই আজ দেখতে এসেছেন তাঁর ছোট মেয়েকে। সিঁড়ি দিয়ে তাঁকে ধরে ধরে ওঠানো হলো। মেয়ের কপালে হাত রেখে বললেন, হিম্‌, কেমন আছিস, মা? সব ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কোথায় গিয়েছিলি?

কী তীব্র সেই চোখের দৃষ্টি, আমি বেশীক্ষণ চোখ রাখতে পারি না। বড় মামীমাই আমাকে বাঁচিয়ে দেবার জন্য বললেন, ওতো ওর ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে গিয়েছিল। ও কিছুই জানতো না।

বুঝলাম, দাদামশাইকে সব কথা জানানো হয়নি। দাদামশাই আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে আবার বললেন, অনেকদিন তোকে দেখি না কেন?

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় ঘুচেই গেছে। কিন্তু দাদামশাইরা যে-কালের মানুষ, তাতে ওঁদের কাছে বয়ঃকনিষ্ঠ আত্মীয় মানেই অনুগত প্রজার মতন, নিয়মিত হাজিরা দেওয়া তাদের কাজ।

এই বৃদ্ধ তাঁর ব্যক্তিত্বে ঘরের সবাইকে চুপ করিয়ে রেখেছেন। রেণুকেও উনি দু' তিনবার দেখলেন। তারপর সস্নেহে বললেন, তোমার মা এখন একটু ভালো আছেন তো দিদি?

রেণু একটু অবাক হলো। তারপর ঘাড় নেড়ে বললো, হ্যাঁ।

—তুমি তো দিদি, এ বুড়োকে একদিনও দেখতে গেলে না!

রেণু বুঝতে না পারলেও ঘরের আর সবাই বুঝতে পেরেছে যে দাদামশাই রেণুকে আমার জ্যাঠামশাইয়ের কোনো মেয়ে বলে ধরে নিয়েছেন। অসুস্থ কারুকে দেখতে এসেও উপস্থিত অন্য সকলের কুশল প্রশ্ন করাও পুরোনো প্রথা।

মা কথা না বলে চুপ করে শুয়ে আছেন। কথা বলতে গেলেই কষ্ট হয়। দাদামশাই আবার তাঁর মেয়ের দিকে ফিরে বললেন, তোর কোনো চিন্তা নেই, মা। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার কোনো ছেলেমেয়ে আমার আগে যাবে না। বুঝলি?

দাদামশাই আমার কাঁধ ধরে এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বসলেন, ভালো করে চিকিৎসা করাবি, বুঝলি? সেরা ডাক্তার দেখাবি। আমার তো এখন আর কিছুই করার সাধ্য নেই। এক দুটো রাখ, এই দুটো বেচে চিকিৎসাপত্তর করাবি।

দাদামশাই তাঁর ফতুয়ার পকেট থেকে বার করলেন দুটি মোহর। আমি দেখলাম, আমার সব মামা-মামীমা ও মাসীদের বিস্মিত চোখ পড়লো সে দুটোর দিকে। দাদা-মশাইয়ের এই গুপ্ত সম্পদের কথা ওঁরা কেউ জানতেন না, বোঝাই যায়। দাদামশাই কারুকে গ্রাহ্য না করে আমার হাতে সে দুটো তুলে দিয়ে বললেন, নে! সাবধানে রাখবি।

মোহর দুটো বাবাকে দেবার বদলে আমার হাতে দেবার মধ্যে যে একটা তীব্র তাচ্ছিল্য ও অপমান আছে, তা আমিও বুঝতে পারি। আমি তক্ষুনি মোহর দুটো বাবার সামনে টেবিলের ওপরে রাখলাম। বাবা সেদিকে তাকিয়েও দেখলেন না।

আত্মীয়-স্বজনরা চলে যাবার পর আমি রেণুকে বড় রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দেবারও সুযোগ পেলাম না। এর মধ্যেই পঙ্কজ এসে গেল। রেণু চলে গেল একা।

দিন দশেকের মধ্যে মায়ের অসুখের সঙ্কট অনেকটা কাটলো বলা যায়। এখন দীর্ঘ চিকিৎসার দরকার। আমার বিদেশে যাবার সম্ভাবনা মুছে গেল একেবারেই। তবু মহীশূর পর্যন্ত যাওয়ার একটা উপকারিতা পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত। সুব্রতদা ওখান থেকে নিয়মিত খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন—এক মাসের মধ্যে আমার জন্য একটা চাকরির জোগাড় করে দিলেন, ওঁদের কম্পানির কলকাতা শাখায়। সে চাকরি প্রত্যাখ্যান করার কোনো যুক্তিই রইলো না আমার। চাকরিতে জয়েন করার দিন মাকে যেন আরও অনেক সুস্থ মনে হলো। অনেকদিন বাদে বাবা আমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বললেন। বাবা-মাকে খুশী করার জন্য সুযোগ্য সন্তানরা যা করে, আমিও শেষপর্যন্ত তাই করলাম বলা যায়।

কয়েকদিনের মধ্যেই প্রায় রুটিন বাঁধা হয়ে গেল আমার জীবনটা। সকালবেলা প্রায় ঘুম থেকে উঠেই অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হতে হয়। বিলিতি কম্পানি, সুতরাং সেখানে হাজিরা দিতে যাতে আমার এক মিনিটও দেরি না হয়, সে জন্য বাবা আর মা-ই বেশী ব্যস্ত হয়ে থাকেন। একজন রাঁধুনি রাখা হয়েছে, মা বিছানায় শুয়ে থেকেই তাকে নির্দেশ দেন। দাড়ি কামিয়ে, ফিটফাট জামা-প্যাণ্ট জুতো পরে আমি গরম গরম ভাত খেয়েই দৌড়াই বাস ধরবার জন্য। বাবা পরামর্শ দিয়েছিলেন, একটু আগে বেরিয়ে আমি যেন উল্টোদিকের ট্রাম ধরে শ্যামবাজার চলে যাই, তা হলে সেখান থেকে বসবার জায়গা পাবো। সে পরামর্শ মানা হয় না, ভিড়ের বাসে কোনক্রমে হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলতে ঝুলতে ডালহৌসি পৌঁছে যাই। অফিসটাতে অধিকাংশ বাঙালী কর্মচারী হলেও যেহেতু এখনো কয়েকজন ইংরেজ আছে, তাই সব কিছুই চলে সাহেবী কায়দায়। অফিসে ঢোকার মুখে অন্যদের সঙ্গে দেখা হলেই গুড মর্নিং বলতে হয়। আমি টাই পরি না বলে ইতিমধ্যেই একজন শুভার্থী আমাকে মৃদু ধমক দিয়েছেন।

একটা বড় হলঘরের মধ্যে আমার ডেস্ক। টেবিলে অনেক কাগজপত্র, তবু আমাদের সকলের মূল কাজ, বেল বাজিয়ে কোনো সাহেব ডেকে পাঠালেই অতি দ্রুত তাঁর ঘরে গিয়ে তটস্থ হয়ে দাঁড়ানো। টেবিলে বসে এক এক সময় অন্যমনস্ক হয়ে যাই। বড় বড় নিশ্বাস পড়ে। সাধারণ চাকুরিজীবীদের মতন জীবন কাটাবো—এরকম কখনো ভাবি নি। অথচ সেই জীবনই আমাকে নিতে হল। এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি? মাত্র একটি দিনের ব্যবধান। আর একটি দিন খবর পেতে দেরি হলেই আমি সমুদ্রে ভেসে পড়তাম। এতদিনে আমি জার্মানিতে—

অফিস থেকে বেরিয়ে প্রায় প্রত্যেক দিনই ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্তর চেম্বারে যেতে হয়। মায়ের অসুখের রিপোর্ট দেওয়া ও নির্দেশ নেওয়া। অপেক্ষা করতে হয় অনেকক্ষণ। বড় ডাক্তারের কাছে ভিড় হয়ই, তা ছাড়া ইদানীং উনি পয়সা নিচ্ছেন না।

বাড়ি ফিরে কিছুক্ষণ মায়ের দেখাশুনো করা। কোনো কোনোদিন পঙ্কজ কিংবা অন্য কোনো বন্ধুবান্ধব আসে। কিছুক্ষণ আড্ডা। তারপরই খাবার খেয়ে নিয়ে একটা বই হাতে নিয়ে শুয়ে পড়া। কখনো বা বই মুড়ে রেখে সিগারেট ধরিয়ে আবোলতাবোল চিন্তা।

জীবনটা যখন এই রকম প্রায় ছকে বাঁধা হয়ে এসেছিল সেই সময় হঠাৎ আবার সূর্যদার আবির্ভাব। সূর্যদা কলকাতায় এসে আবার সব কিছু তছনছ করে দিল।

॥ ৮৩ ॥

সূর্য কলকাতায় এসে পেঁছোলো রাত দুপুরে। পরনে চোস্ত আর শেরওয়ানি, বেশ ময়লা, গলায় মোটা মাফলার, এক মুখ দাড়ি, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। সঙ্গে আরও দুজন কাঠখোট্রা চেহারার লোক, ট্যাকসি নিয়ে হাজির হলো বাড়িতে। বাদলরা সবাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

দরজার শব্দ শুনে জেগে উঠলো সকলে। বাদল ছাড়া আর কেউ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো না। চিররঞ্জন খানিকটা ভর্ৎসনার সঙ্গে বললেন, একটা কোনো খোঁজ খবর নেই। বহুদিন কোনো চিঠিপত্র নেই, কোথায় ছিলে?

সূর্য প্রশ্নটাকে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে উত্তর দিল, এই, ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম নানা জায়গায়। আপনারা সবাই কেমন আছেন?

বাদলের মায়ের অসুখের কথা শুনেও সূর্য বিশেষ কোনো ঔৎসুক্য দেখালো না। দুচার কথার পরেই জিজ্ঞেস করলো, বাড়িতে কিছু খাবার দাবার আছে? আমার সঙ্গে দুজন লোক এসেছে, তারা আজ রাত্রে এখানেই থাকবে।

এত রাত্রে তিনজন লোকের মতন খাবার আর কি করে থাকবে? কিছুই নেই। চিররঞ্জন একটু অপ্রস্তুত বোধ করলেন। একজন রাঁধুনি রাখা হয়েছে, তাকে ডেকে তুলে কিছু তৈরি করতে বললেও অনেক রাত হয়ে যাবে।

বাদল বললো, আমি খাবার কিনে আনবো? পাঞ্জাবীদের দোকান অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে।

সূর্য পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট বার করে দিয়ে বললো, যা তো, কিছু রুটি আর মাংস নিয়ে আয় তো চট করে। ট্যাকসি নিয়ে চলে যা।

বাদল একটা চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে। নিঝুম নিস্তব্ধ রাস্তা, দুপাশের আলোগুলো ঝকমক করছে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়েও বাদল কোনো ট্যাকসি পেল না। শ্যামবাজারের মোড়ের মাথায় একটা দোকান অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে, সেখানে গেলে কিছু পাওয়া যাবেই। বাদল আর দেরি না করে হনহন করে হাঁটতে লাগলো। সে একটুও কষ্ট বা বিরক্তি বোধ করছে না। সূর্যদাকে দেখলেই তার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য আসে। সূর্যদার জন্য সে কিছু একটা করতে পারছে—এইটাই যেন ধন্য হয়ে যাবার মতন ব্যাপার। সূর্যদা ফিরে এসেছে, আবার সব কিছু বদলে যাবে—এই চিন্তা তাকে একটা চাপা উত্তেজনা দেয়। তবু, এক একবার মনের কোণে আর একটা কথাও উঁকি মারে, সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে সে ভুলতে চায়, আবার মনে আসে। সূর্যদা যেন খানিকটা দেরি করে ফেলেছে। ফিরলোই যখন—।

শ্যামবাজারের কাছে বাদল যখন এসে পেঁছোলো, তখন সে রীতিমতন ঘামছে। মাংসের দোকানটা সেইসময় ঝাঁপ ফেলার উপক্রম করেছে। নতুন করে কিছু রুটি বানাতে হলো, মাংস খানিকটা ছিলই। একটা ট্যাকসি পাওয়া গেল সেখান থেকে। ট্যাকসি নিয়ে ফিরে আসতে আসতে তার মনে হলো, সূর্যদার প্রত্যাবর্তনের সংবাদটা যেন এক্ষুনি সারা কলকাতায় জানিয়ে দেওয়া দরকার। যেখানে বাদলের যত চেনাশুনো মানুষ আছে, সকলকে এই সময়েই জানিয়ে এলে কেমন হয়! এবং রেণুকে?

বাড়িতে ফিরে বাদল দেখলো, চিররঞ্জন ইতিমধ্যেই আবার শুয়ে পড়েছেন। অনেক আলোই আবার নেবানো। তিনতলা থেকে সূর্যদাদের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। রান্নাঘর থেকে কয়েকটা প্লেট নিয়ে বাদল খাবারগুলো সমেত উঠে এলো ওপরে।

তিনতলায় বড়বাবুর ঘর অনেকদিন খোলা হয়নি। আসবাবপত্র ধুলোয় ধূসর। বাদল সেখানে এসে দেখলো, সেই ধুলোর মধ্যেই মেঝেতে সতরঞ্চি বিছিয়ে ওরা তিন-জন বসে গেছে, সামনে গেলাস ও মদের বোতল।

সূর্য বললো, খাবার পেয়েছিস? আয়, বোস এখানে!

বাদলের সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময় ও আঘাত লুকোতে পারছে না। সূর্যর সংগী দুজন দুর্বোধ্য হিন্দীতে কিছু প্রশ্ন করলো, বাদল ঠিক বুঝলো না, সূর্য উত্তর দিল সেই রকম ভাষায়। ওদের মধ্যে একজন, যার চেহারা অনেকটা সিনেমার অমর মল্লিকের মতন, নিজের পাশের জায়গাটা হাত দিয়ে চাপড়ে বললো, বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে, ইধার বৈঠিয়ে।

বাদল হাঁটু মুড়ে বসে প্লেট ক'খানাতে মাংস ঢেলে রুটি সাজিয়ে দিল। সূর্য এক টুকরো মাংস মুখে দিয়ে বললো, বাঃ বেশ।

গলা থেকে মাফলারটা খুলে সূর্য তাতে হাত মুছলো। তারপর মদের বোতলটা ধরে বাদলকে জিজ্ঞেস করলো, তুই একটু খাবি, তাহলে গেলাস নিয়ে আয়!

বাদল শুকনো গলায় বললো, না, না, দরকার নেই।

—তুই খাস না?

—না।

—সিগারেট টিগারেট খাস তো। এই নে, নিতে পারিস।

সূর্য একটা সিগ্যারেটের টিন এগিয়ে দিয়েছে। ঠিক ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় নয়, যান্ত্রিক ভাবে হাত বাড়িয়ে বাদল একটা সিগারেট তুলে নিল। দেশলাই জ্বেলে ধরাতে গিয়ে সে টের পেল, তার হাত কাঁপছে। সূর্যদাকে সে অনেক রকম অবস্থায় দেখেছে, কিন্তু এই রকম অবস্থায় দেখবার কথা সে কল্পনাও করে নি। মদ খাওয়া সম্পর্কে যে তার খুব একটা ভীতি আছে তা নয়। অনেক বিদেশী গল্প-উপন্যাস পড়ার পর সে এ সম্পর্কে সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। কিন্তু নীচে বাবা-মা রয়েছেন, এতদিন পরে বাড়িতে ফিরেই সূর্যদা, বিশেষত বড়বাবুর ঘরে এ রকম আসর জমিয়ে বসেছে—এ ব্যাপারটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। সূর্যদার আগেকার সেই গাম্ভীর্যও আর নেই, লোক দুটির সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে অনর্গল।

এক সময় সূর্য বাদলের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, তারপর তোদের খবর টবর কি বল?

বাদল বললো, নতুন খবর কিছু নেই। বড়দিরা অনেকদিন কলকাতায় আসে নি। আমি কিছুদিন আগে খড়কপুরে বড়দিদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম—

প্রথমে শ্রীলেখার কথাই মনে এলো বাদলের। তাই সে সবিস্তারে শ্রীলেখার কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সূর্য কোনো আগ্রহই দেখালো না। হঠাৎ মাঝপথে বাদলকে জিজ্ঞেস করলো, তুই এখন কি করছিস, পড়ছিস?

লজ্জায় অবনত মুখে বাদল বললো, না, চাকরি করছি।

বাদল ভেবেছিল, সাধারণ ছেলের মতন সেও যে শেষ পর্যন্ত চাকুরিজীবী হয়ে গেছে, একথা শুনে সূর্য নিশ্চয়ই উপহাস করবে। কিন্তু সূর্য এ ব্যাপারেও কোনো মন্তব্য করলো না। যেন নিছক প্রশ্ন করে যাচ্ছে, উত্তরগুলি সম্পর্কে তার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই।

বাদল এবার জিজ্ঞেস করলো, তুমি এত দিন কোথায় ছিলে সূর্যদা?

—অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম। গোয়ালিয়ার, গাজিয়াবাদ, সিমলা—এদিকে

কন্যাকুমারিকা পর্যন্তও গিয়েছিলাম।

—এখন থেকে কলকাতাতেই থাকবে তো?

—কি জানি!

—কতদিন আর ঘুরে বেড়াবে। তোমাকেও একটা কিছু করতে হবে তো!

সূর্য এবার হাসলো বেশ উঁচু গলায়। তারপর বললো, একটা কিছু করতে হবে, তাই না। দেখা যাক!

সূর্যর সংগীরা গপাগপ করে মাংস রুটি খাচ্ছে। মাংসের ঝোল পড়ছে জামা-কাপড়ে, তাতে কোনো হুঁস নেই। সিগারেটের টুকরোগুলো ছুঁড়ে দিচ্ছে ঘরের যেদিকে সেদিকে। একজন তার লম্বা পা ছড়িয়ে দিয়েছে দেয়ালের দিকে, সেখানে গাদা করা বইতে যে তার পা লাগছে, সেটা খেয়ালই করছে না। বাদল সজ্ঞানে কখনো বইতে পা ছোঁওয়ানোর কথা চিন্তাই করতে পারে না। তার বারবার মনে হচ্ছে, বড়বাবুর ঘরটাকে যেন অপবিত্র করা হচ্ছে। এ ঘরে এলে বড়বাবুর কথা বড় বেশি মনে পড়ে—যেন বড়বাবুর প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক দৃষ্টি ভেসে আছে সর্বত্র। সূর্যদার কি একবারও মনে পড়ছে না সে সব কথা!

পরদিন সকাল ন'টার মধ্যেও সূর্য আর তার সঙ্গীদের ঘুম ভাঙলো না। বাদল দু' তিনবার ওপরে এসে দেখে গেল। ওদের জন্য তৈরি করা চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল দুবার। ওরা কাল কত রাত্রে ঘুমিয়েছে কে জানে, তাই বাদল ডাকতে সাহস করলো না।

এদিকে বাদলের অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে। একবার সে মনে মনে ভেবেছিল, আজ আর অফিসে যাবে না। কিন্তু সে কথা উত্থাপনেরই সুযোগ পেল না। তার বাবা-মাই বারবার তাড়া দিতে লাগলেন। নতুন চাকরি, এরই মধ্যে কামাই করা চলে নাকি? বিলেতি কোম্পানি—ওদের নিয়মকানুন খুব কঠোর। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে বাদল অফিসে গেল। এতদিন পরে সূর্যদা এসেছে, কত কি গল্প করার আছে।

অফিস ছুটির পর একটুও দেরি না করে বাড়ি ফিরে এলো বাদল। তখন সূর্য বেরিয়ে গেছে। দুপুরে খেয়ে দেয়েই সে বেরিয়েছে, কখন ফিরবে বলে যায় নি। সারা সন্ধ্যে সে অপেক্ষা করে রইলো।

সূর্য ফিরলো প্রায় রাত বারোটার সময়, সংগীদের নিয়ে হল্লা করতে করতে। ওরা যে যথেষ্ট মাতাল হয়ে এসেছে, তা বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না। গোপন করারও কোনো চেষ্টা নেই ওদের। ওপরতলায় উঠে গিয়ে গান বাজনা জুড়ে দিল।

দু তিনদিনের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে সূর্য কলকাতায় ফিরে এসেছে শুধু উপদ্রব করতে। বাদলের বাবা-মাকে গুরুজন হিসেবে ও সামান্য সমীহও করে না। ওঁদের সংগে বিশেষ কথা বলারও সময় নেই তার। অধিকাংশ সময়েই সে বাড়িতে থাকে না, আবার নিতান্ত অসময়ে অজানা-অচেনা লোকদের বাড়িতে ডেকে আনে। সূর্য চিরকালই একরোখা ছেলে, যখন যেটাকে ধরে সেটাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে থাকে। এখন ও বেলেল্লাপনাতেই শুধু আনন্দ পাচ্ছে।

হিমানী ও চিররঞ্জন আবার দারুণ অশান্তিতে পড়লেন। এখন সব সময় একটা কথা কাঁটার মতন বেঁধে, সূর্যই এই বাড়ির মালিক। তাকে জোর করে কিছু বলা যায় না। কিন্তু বাড়ির মালিক হলেই যে সে যা খুশি তাই করবে, এটাই বা সহ্য করা যায় কি করে? ভদ্র-সমাজে সম্মানরক্ষা করে বাঁচতে হবে তো!

হিমানী হঠাৎ একদিন জেদ ধরে বললেন, তিনি আর এ বাড়িতে থাকবেন না। বিয়ের পর থেকে এতগুলো বছর তাঁকে কত রকম অপমান সহ্য করতে হয়েছে, এখন

মরার আগে তিনি একটু শান্তি পেতে চান। চিররঞ্জনকে তিনি বললেন, আমার ছেলে এখন চাকরি করে, সে কি এখন আলাদা একটা বাড়ি ভাড়া করে আমাদের নিয়ে যেতে পারে না। কেন আমরা অপমান সহ্য করে এখানে থাকবো। যতসব ম্লেচ্ছদের উৎপাত শুরু হয়েছে।

বাদলের দিকে ফিরে তিনি বললেন, কি রে, তুই পারবি না? তোর বাবা তো সারাজীবন আমাদের জন্য একটা বাসা জোগাড় করতে পারলো না! পাঁচজনকে আমি বলতে পারবো তবু আমার ছেলে আমার জন্য...

পুত্রগর্বে হিমানী তাঁর স্বামীকেও অপমান করতে দ্বিধা করেন না। চিররঞ্জন প্রতিবাদ করে বললেন, কেন, আমরা এ বাড়ি ছাড়বো কেন? এতদিন রইলাম, দেখা-শুনো করলাম—এখন এখানে থাকার একটা রাইট আছে আমাদের। কাগজপত্তরও সব আমার কাছে। আমরা না থাকলে তো এ বাড়ি এতদিনে বেওয়ারিশ হয়ে যেত!

হিমানী ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, লাথি ঝাঁটা খেয়েও তুমি এখানে থাকতে চাও! বেশ তো, তুমি থাকো। ছেলেকে নিয়ে আমি আলাদা থাকবো।

—বাড়ি ভাড়া করে আলাদা সংসার করা কি কম খরচের কথা। বাদল কতই বা মাইনে পায়। এর ওপর তোমার চিকিৎসার খরচ আছে।

—দরকার নেই আমার চিকিৎসার। না হয় আধপেটা খেয়ে থাকবো—তবু এই কুলাঙ্গারের সঙ্গে এক বাড়িতে...

মা কোনোদিনই সূর্যদাকে ঠিক পছন্দ করেন নি।

সূর্যদার জন্ম-বৃত্তান্ত মা কখনো ভুলতে পারেন না। সামাজিক রীতি-নীতিগুলোকে মা বড় বেশী মূল্য দেন। সমাজও যে বদলায়, মা'র সেদিকে খেয়াল নেই। সূর্যদার স্বভাবের ছেলেমানুষী দিকটাও মা'র চোখে পড়ে না।

মা বাবার বচসার সময় বাদল কোনো কথা বলে না। তার মনটা বিস্বাদ হয়ে যায়। আজকাল যখন তখন হঠাৎ টাকা পয়সার প্রশ্নটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। টাকা পয়সাকে কেন্দ্র করেই যা কিছু শান্তির চিন্তা। যে-চাকরিটাকে সে একেবারেই পছন্দ করে না, সেই চাকরির কয়েক শো টাকা মাইনের ওপরেই নির্ভর করছে তাদের পারিবারিক নিরাপত্তা। যতদিন বাবা-মা বেঁচে থাকবেন, ততদিন তাকে এই চাকরি থেকে উপার্জন করে যেতে হবে। এর নাম দায়িত্ব। সে নিজের ইচ্ছে মতন বাঁচতে পারবে না। যাদের টাকা আছে, শুধু তারাই নিজের ইচ্ছে মতন বাঁচবে। যে শ্রেণীহীন সমাজের স্বপ্ন সে কলেজ জীবনে দেখেছিল, তা আজ কত দূরে সরে গেছে। কোনো সমাজেই আর মানুষের মুক্তি নেই। এখনো মানুষ আলাদাভাবে নিজের চেতনার জগতেই শুধু মুক্তি খুঁজতে পারে। বাদল নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে।

সব অশান্তির মূল যে, সেই সূর্যদার ওপরে বাদল তবুও রাগ করতে পারে না। সেই ছেলেবেলা থেকেই তার ধারণা, সূর্যদা একদিন না একদিন বড় কিছু একটা করবে। এখনো সেই ধারণাটা ছাড়তে পারে না। সূর্যদা এ পর্যন্ত একবারও সুস্থির হতে পারলো না। একটু সুস্থির হলেই সূর্যদা অনেক কিছু করতে পারে।

অফিস থেকে দুপুরবেলা বেরিয়ে এসে বাদল প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে রইলো। রেণুর সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি। অনেকদিন দেখা না হলেও রেণু কি বুঝতে পারে যে ওকে দেখার জন্য সে সব সময় ছটফট করছে? কম বয়েসে সন্দেহ কিংবা ঈর্ষা—এসব কিছুই থাকে না। কয়েক বছর আগেও পরস্পরের ওপর নির্ভরতা ছিল, তা কি করে চলে গেল? এখন কয়েকদিন চোখের আড়াল হলেই

বাদলের মনে হয়, রেণু বুঝি তাকে ভুলে গেছে। কিংবা, অন্য কোনো রূপবান, গুণবান যুবকের সঙ্গে কথা বলছে হেসে হেসে। দেখাদার পর্বটা অনেকটা চুকেছে। মহীশূর থেকে ফেরার কয়েকদিন পর বাদল নিজেই রেণুর সঙ্গে দেখা করে তার মান ভেঙেছিল। তখন সব মিলিয়ে বাদলের অপরাধবোধ খুব প্রবল ছিল।

অফিসে চাকরি নেবার পর রেণুর সঙ্গে আর নিয়মিত দেখা হয় না। রেণু কখনো কখনো বাড়িতে আসে। আজ সকাল থেকে নানারকম পারিবারিক ঝামেলার কথা চিন্তা করতে করতে বাদলের এক সময়ে মনে হয়েছে, রেণুকে আমার চাই। রেণুকে আরও বেশি সময়ে খুব কাছাকাছি না পেলে আমি বেঁচে থাকতে পারবো না।

ক্লাস শেষ হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে আসছে, গেটের কাছে রেণুকে দেখতেও পেল বাদল। কিন্তু রেণু রাস্তা পার হবার পরেই একটা মিছিল এসে পড়লো। পরপর তিনটি গাড়ি আসছে ধীর গতিতে, তার সামনে পেছনে এক দল ছেলে লাফালাফি করছে মহা উৎসাহে। বিরাট বড় কংগ্রেসের পতাকা, গান্ধীজীর ছবি, সেই সঙ্গে ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি। মাঝখানের জিপ গাড়িতে ফুলের মালা গলায় এক ব্যক্তি হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। বাদল চিনতে পারলো। শংকর বোস। কাশী-পুর বাই ইলেকশনের ফলাফল বেরিয়েছে আজ, শংকর বোস বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হয়েছেন। উনি যে জিতবেনই সবাই জানতো—তবু এই আনন্দ উৎসবের মিছিল।

বাদল ঐ মিছিলের সব মানুষ এবং গাড়ি তিনটের মধ্যে দ্রুত চোখ বোলালো একবার। শংকর বোসের গাড়িতেই সে দেখতে পেল দীপ্তিদিকে। মৃদু হাসিমাখা মুখে দীপ্তিদি আরও দুতিনজন মহিলার সঙ্গে বসে আছেন পেছনের সীটে। বাদলের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। এই জন্যই তার মনে হয়েছিল, সূর্যদা যখন ফিরলোই, এত দেরি করে ফিরলো কেন?

বাদল এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলো দীপ্তিদির দিকে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল এক-দিনের কথা। বড়বাবু যেদিন সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন সেদিন বাদল সূর্যকে খুঁজতে গিয়েছিল দীপ্তিদির বাড়িতে। ঘরের মধ্যে সূর্যদা আর দীপ্তিদি ছাড়া আর কেউ ছিল না। ওদের চোখের দৃষ্টি দেখেই বোঝা গিয়েছিল, ওরা পরস্পরকে গভীর ভাবে ভালোবাসে। তবু ওরা এত দূরে সরে গেল কেন?

উল্লাস-মিছিলটা এইটুকু পথ পেরিয়ে যাবার জন্য যতটুকু সময় লাগা উচিত ছিল, তার চেয়েও বেশি সময় লাগছে। সামনের দিকটা থেমে পড়েছে হঠাৎ, তরুণ ভলান্টিয়াররা নাচানাচি শুরু করে দিয়েছে। সাধারণত বিপক্ষ দলের শক্ত ঘাঁটিগুলোর সামনেই জয়ের আনন্দ বেশি করে দেখাবার নিয়ম। কলেজ পাড়ার ইউনিয়নগুলো অধিকাংশই এখন এস এফ-এর দখলে, তাই কংগ্রেসের ছেলেরা এখানে বীরত্ব দেখাতে চায়। বাদল যদিও আবার তার পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছে, তবু রক্তের মধ্যে তার রেশ রয়ে গেছে এখনো। সে নির্বিকার থাকতে পারে না, ভোট-জেতা কংগ্রেসীদের এই আস্ফালন দেখে তার রাগ হয়, দাঁতে দাঁত চেপে সে চোয়াল শক্ত করে।

জিপের ওপর দাঁড়িয়ে শংকর বোস হাত জোড় করে, এদিকে ওদিকে মাথা ঝুঁকিয়ে জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করছেন। তবে সাধারণত এইসব পরিস্থিতিতে এইসব লোকের মুখে যে একটা বিগলিত হাসি থাকে, ওঁর মুখে সে রকম হাসিটা নেই। বরং বেশ খানিকটা ক্লান্ত ভাব। দেখলেই মনে হয়, মানুষটি তাঁর জীবনে বহু পথ ও বহু সংঘর্ষ পার হয়ে এসেছেন। এখন যেন তাঁর খানিকটা বিশ্রাম ও আরামের প্রয়োজন। খবরের কাগজগুলো আগে থেকেই ভবিষ্যৎবাণী করে রেখেছে, ভোটে জিতলেই শংকর

বোস অন্তত রাষ্ট্রমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী হবেনই। অর্থাৎ ক্লান্ত বিপ্লবীর জন্য এবার আরামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে।

মিছিলটা পার হতে হয়তো সময় লেগেছিল দশ বা বারো মিনিট। কিন্তু বাদলের মনে হলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে যাচ্ছে। সে অধীর হয়ে উঠলো। তার মনে হলো, এই মিছিলটা একটা অজগর সাপের মতন তার আর রেণুর মাঝখানে পড়ে আছে—কিছুতেই দুজনকে কাছাকাছি আসতে দিচ্ছে না। ভিড়ের আড়ালে রেণুকে আর দেখা যাচ্ছে না এখন। এরপর কি আর রেণুকে সে খুঁজে পাবে? মনশ্চক্ষে সে একটা অজগর সাপই দেখতে পাচ্ছিল, ঘোর ভেঙে সে নিজেকে ভর্ৎসনা করলো। মনে মনে বললো, আমি বড় বেশী রোমান্টিক, তাই আমার এতদিনেও একটুও বাস্তব বুদ্ধি হলো না। শুধু শুধু মনগড়া দুঃখে আমি কষ্ট পাই। মিছিল আর কতক্ষণ থাকবে, এক্ষুনি চলে যাবে, রেণুকে আমি খুঁজে পাবো। ঐ তো, মিছিল নড়তে শুরু করেছে, অজগর নয়, মিছিলই। সে আবার তাকালো দীপ্তিদির দিকে। দীপ্তিদি বড় সুন্দর। যেন দীপ্তিদি বাদলেরই প্রেমিকা, এই ভাবে বাদল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। বস্তুত বাদলের দীর্ঘশ্বাসের কারণ এত সরল নয়, আরও অনেক জটিল।

বাদল রেণুকে আগেই দেখেছিল, কিন্তু রেণু তো তাকে দেখেনি। রেণু তার দুজন বান্ধবীর সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিল বাস স্টপের দিকে, বাদল দ্রুত হেঁটে তার আগেই সেখানে দাঁড়ালো। রেণুর চোখে চোখ ফেলার চেষ্টা করলো। রেণু কি একটা গল্পে মত্ত। অন্যদিন হলে বাদল অন্য মেয়ের সামনে রেণুর সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পেত, কিন্তু আজ সে কিছুতেই রেণুকে চোখের আড়াল হতে দিতে পারে না। সে কাছে গিয়ে ডাকলো, ইন্দ্রানী!

রেণু মুখ ফিরিয়ে বাদলকে দেখলো, তারপর বান্ধবীদের কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই এগিয়ে এলো বাদলের দিকে। অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে? কি?

বাদল হকচকিয়ে গিয়ে বললো, কিছু হয়নি তো? কেন?

—তুমি হঠাৎ দুপুর বেলা—

—এমনিই। মানে—

—কিছু হয়নি তাহলে? বাবাঃ!

রেণু হেসে ফেললো। মেয়েদের এরকম আকস্মিক হাসির অর্থ ছেলেরা আবার কবে বুঝতে পেরেছে! বাদল বিমূঢ় ভাবে তাকিয়ে রইলো।

রেণু মুখ তুলে তার সঙ্গিনীদের উদ্দেশ্যে বললো, তোরা যা, আমি একটু পরে যাবো।

তারপর আবার বাদলের দিকে ফিরে বললো, মুখ চোখের কি রকম চেহারা হয়েছে তোমার, গলার আওয়াজ অন্যরকম—আমি ভয় পেয়ে ভাবলাম কিছু একটা বিপদ হয়েছে বুঝি!

—মুখ চোখের চেহারা কি রকম?

—জানো না? ঐ পানের দোকানের আয়নায় মুখটা দেখে নাও? মাসীমা কেমন আছেন?

বাদল এর মধ্যে একদিনও অফিস কামাই করেনি, দুপুরে পালায় নি, সুতরাং হঠাৎ তাকে দেখে রেণু ধরে নিয়েছে অন্য কিছু। কিন্তু মুখ চোখের চেহারা পাল্টালো কেন? বাদল জানে না। রেণু কি ভেবেছে, বাদল আর কখনো হঠাৎ যে-কোনো সময়ে রেণুর

সঙ্গে দেখা করতে আসবে না?

রেণু খবর জানতে চেয়েছিল বলেই বাদল বললো, জানো, সূর্যদা ফিরে এসেছে।

রেণু উৎসাহিত হয়ে বললো, তাই নাকি? কোথায় ছিলেন এতদিন? কি রকম চেহারা হয়েছে?

—মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁপ।

—আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। একদিন আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসো না!

—খুব ব্যস্ত। তুমি এসো আমাদের বাড়িতে। এখন চলো না।

—এখন? এখন যে আমাকে একবার বাড়িতে ফিরতেই হবে।

—প্লিজ রেণু, আজ একটু থাক আমার সঙ্গে। আমি তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

কয়েকটা কথা মানে আগে থেকে ঠিক করা বিশেষ কোনো কথা নয়। বাদল চাইছে রেণুর সঙ্গ। শরীরের যে একটা দুরন্ত পিপাসা আছে, তা কিছুক্ষণের সান্নিধ্য ও কথাবার্তাতেও অনেকখানি মেটে। আজ সকালেই বাদল ঠিক করেছে, রেণুকে অনেক-ক্ষণের জন্য কাছাকাছি না পেলে তার চলবে না, সে বিদেশে পালাতে পারেনি, এবার রেণুর বুকের কাছে আশ্রয় নেবে। আর দু বছরের মধ্যেই বিয়ে করবে সে, ততদিনে রেণুর পরীক্ষা হয়ে যাবে। এ কথাটা রেণুকে এখন জানাবার দরকার নেই।

রেণু বললো, কিন্তু আমার যে বাড়ি ফেরা বিষম দরকার এখন?

—কেন, কেউ আসবে বুঝি?

বাদলের এই প্রশ্নের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিল, রেণু তা পছন্দ করলো না। সে দৃষ্টিতে সামান্য ছিঃ দিয়ে তাকালো বাদলের দিকে। তারপর বললো, তুমিও চলো আমার সঙ্গে।

বাদল দুঃখিত ভাবে বললো, তোর কাজ থাকলে আমি আর গিয়ে কি করবো?

—আমি শাড়িতে বাটিকের কাজ করছি। রং টং সব ভিজিয়ে রেখে এসেছি। এখন না গেলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি চলো আমার সঙ্গে, আমি রং করবো, তুমি পাশে বসে গল্প করবে।

বাদলের মনের মেঘ কেটে গেল। এটা একটা ভালো আহ্বান। মেয়েদের কোনো রকম মেয়েলি কাজ করতে দেখলে বাদলের সেই সময়টা বেশ ভালো লাগে। যেমন রান্না ঘরে কুটনো কুটতে বসা কিংবা স্নান করার পর চুল ঝাড়ার সময়, কিংবা মেয়েরা যখন কাচের চুড়ি পরে, তখন বাদলের চোখে তাদের অন্য রকম একটা রূপ ভেসে ওঠে, যাতে অন্যরকম মোহ। রেণুর বাটিক রচনার দৃশ্যও সে উপভোগ করবে।

উৎসাহে দরাজ হয়ে বাদল একটা ট্যাক্সি ডেকে বসলো। রেণুর আপত্তি শুনলো না। ট্যাক্সিতে উঠে সে রেণুকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি তোমার দুজন বন্ধুর সঙ্গে বাসে উঠতে যাচ্ছিলে—তারপর আমার সঙ্গে চলে এলে, ওরা কিছু ভাবলো না?

রেণু বললো, ভাবুক না! তুমি একদিন বলেছিলে, অন্য লোকের সামনে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলি না। আসলে তা নয়। তুমিই অন্যলোকের সামনে আমার সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পাও! তোমার মনের মধ্যে সব সময় থাকে, অন্য কে কি ভাবছে। আমি তা গ্রাহ্য করি না।

এটা তর্ক করার বিষয় নয়। বাদল সন্ধি করার কার্যক্রম হিসেবে রেণুর একটা হাত তুলে নিল নিজের হাতে। কি পরিচ্ছন্ন নরম হাত। আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে রং লেগে আছে, না, মেহেদি নয়, সকালবেলা বাটিকের রং গুলেছিল। অনেকদিন পর

বাদলের মাথায় দু' লাইন কবিতা জেগে উঠলো অকস্মাৎ! প্রথম শ্লোক উচ্চারণের পর বাল্মীকি যেমন বিস্মিত হয়েছিলেন, ততটা না হলেও বাদল রীতিমতন অবাক হয়ে মনে মনে বলেছিল, একি! আবার কবিতার উৎপাত কেন? পরে বাদলের সেই কবিতাটি ছাপা হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকায় এবং আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর মতন বিদগ্ধ সমালোচক দু' একজনকে বলেছিলেন, ছেলেটি কে? বেশ লিখছে তো!

কবিতার সৌরভ অবশ্য বেশীক্ষণ রইলো না। রেণুদের বাড়ির গেটে ওর ছোট কাকা দাঁড়িয়েছিলেন। রেণু ও বাদলকে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখে তিনি সরু চোখে তাকালেন। তারপর তাঁর অখুশী মুখে অনাবশ্যক হাসি ফুটিয়ে বললেন, এই যে, বাদলকুমার যে, অনেকদিন দেখিনি! কোতায় ছিলে?

ছোটকাকা সম্পর্কে বাদলের মনোভাব রেণু জানে। তাই সে তাড়াতাড়ি বাদলকে বললো, চলো, ওপরে চলো—।

কিন্তু ছোটকাকা বাদলের হাত ধরে বললেন, আরে বসো বসো। এখানে একটু বসো, তোমার সঙ্গে গল্প করি। চাকরি-বাকরি পেয়েছো?

বাদলকে ফেলেই রেণু তরতর করে ওপরে উঠে গেল। দু' তিন মিনিটের মধ্যেই আবার নেমে এসে বললো, এই ওপরে এসো। মা তোমাকে খাবার দিয়েছেন!

ছোটকাকার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাদল রেণুর সঙ্গে উঠতে লাগলো সিঁড়ি দিয়ে। মনটা আবার একটু বিস্বাদ হয়ে গেছে। মামলাবাজ ছোটকাকাটি অতি পাজী, হাসতে হাসতে অনেকখানি বিষ ঢেলে দিয়েছে বাদলের কানে।

সিঁড়ির বাঁক ঘুরে রেণু থমকে দাঁড়ালো। তারপর বললো, এই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে প্রথম স্বাধীনতার দিনে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মনে আছে?

বাদলের মনে ছিল না। মনে পড়লো। সে ঘাড় নাড়লো।

রেণু বললো, তুমি আমার জন্য অন্তত আমাদের বাড়ির কারুর ওপর কখনো রাগ করবে না। পারবে?

—পারবো।

মুড়ি, চিঁড়েভাজার সঙ্গে নারকোলকোরা আর চিনি মিশিয়ে এক বাটি দেওয়া হলো বাদলকে। রেণুদের বাড়িতে এই সুখাদ্যটি বাদল আগে অনেকবার খেয়েছে। আজ অবশ্য অনেকদিন পরে ওপরে এসেছে। কিন্তু রেণুকে আর নিরিবিলি পাওয়া গেল না। সে বাটিকের রং করতে বসতেই তার কাকীমা, পিসীমা এবং অন্য ছেলে-মেয়েরা এসে ভিড় করে রইলো।

একটু বাদে সেখানে এসে দাঁড়ালেন রেণুর মা। মুখখানায় গাম্ভীর্য ও দুঃখ মাখা। ছেলেবেলায় বাদল সব সময় রেণুর মাকে হাসিখুশী দেখেছে। দেখলেই মনে হতো, খুব সরল ধরনের ভালোমানুষ। পরপর কয়েকটা নিদারুণ শোক পেয়ে ওঁর আর মাথার ঠিক নেই এখন।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর তিনি বাদলের দিকে তাকালেন। বাদল তাড়াতাড়ি হাতের বাটিটা নামিয়ে রেখে ওঁকে প্রণাম করলো। রেণুর মা বললেন, বাদল, আমার সঙ্গে একটু এসো তো, তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে।

॥ ৮৪ ॥

রেণু এলো পরদিন সকাল বেলা। বাদল তখন খেতে বসেছে। নীচে সদর দরজায় একজন ভিখিরি সেই সময় গান করছিল খঞ্জনী বাজিয়ে। গরম ডাল আর ভাত মাখতে মাখতে বাদল মনোযোগ দিয়ে শুনছিল সেই গান। ভিখিরিটি অনেককাল ধরেই আসে, ভাঙা ভাঙা গলায় গায়ঃ

নিম খাওয়ালে চিনি বলে
কথায় করে ছল-ও-ও—
মিঠার লোভে তিতো মুখে
সারা দিনটা গেল-ও-ও—

বাদল এই সব গান শুনতে ভালোবাসে। ভিখিরিটিকে একটা পয়সা দেওয়া দরকার। কিন্তু কে দেবে? চিররঞ্জন বেরিয়ে গেছেন, হিমানী স্নানের ঘরে। রাঁধুনিটি কানে ভালো শোনে না, তা ছাড়া এত বেশী বুড়ি যে তাকে নিচে পাঠাতে মায়া হয়। বাদল নিজেই খাওয়া ছেড়ে উঠে গিয়ে পয়সা দিয়ে আসবে ভাবছিল, এই সময় দেখতে পেল, দোতলার সিঁড়ি দিয়ে রেণু উঠে আসছে।

বাদল রেণুকেই বললো, আমার জামার পকেট থেকে পয়সা নিয়ে নীচে ঐ লোকটাকে দিয়ে এসো না!

রেণু বাদলের কাছ থেকে পয়সা নিল না, নীচে নেমে গেল। নিশ্চয়ই অনেক বেশী পয়সা দিয়েছে। বাদল উপর থেকেই শুনতে পেল, লোকটি রেণুকে আশীর্বাদ করছে, বেঁচে থাকো, সুখে থাকো মা। ধনে পুত্রে সৌভাগ্যবতী হও, রাজ রাজেশ্বরী হও—

বাদল একটু হাসলো এবং একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর সে গুনগুন করতে লাগলো গানটা। এক একটা গানের লাইন হঠাৎ বিনা কারণে মাথায় গেঁথে যায়। বেগুন ভাজাতে কামড় দিয়েও বাদল গাইছে, 'মিঠার লোভে তিতো মুখে সারা দিনটা গেল-ও-ও-ও—'।

রেণু ফিরে এসে বললো, তুমি এরই মধ্যে খেতে বসে গেছ? ক'টায় বেরুতে হয়?

বাদল বললো, ন'টা কুড়ি। এখন ক'টা বাজে? ন'টা পাঁচ টাচ হবে বোধ হয়।

—মাসীমা কোথায়?

—চান করছেন। বসো না এখানে। তুমি কিছু খাবে?

—না, আমি কিছু খাবো না। আমার সামনে খেতে তোমার লজ্জা করবে না তো? ছেলেদের এরকম হয় শুনেছি।

বাদল হঠাৎ অনুভব করলো, রেণু আর ছেলেমানুষ নেই। বয়েসের তুলনাতেও সে এখন অনেক বেশী পরিণত। তার চলা ও দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে ফুটে ওঠে ব্যক্তিত্ব, সে একটি পরিপূর্ণ যুবতী। এক নিমেষের জন্য রেণুকে বাদলের খুব অচেনা লাগে।

বাদল খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করছে আর রেণু দেখছে তাকে। দাঁড়িয়েই আছে। প্রায় দিনই সকালে মাছটাছ রান্না হয় না, বাদলের সেজন্য একটু লজ্জার ভাব এসেছিল, কিন্তু রেণু সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করলো না। জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের বাড়িটা এত চুপচাপ কেন? সূর্যদা কোথায়?

—সূর্যদা ঘুমোচ্ছে এখনও।

—এত বেলা অবধি? সূর্যদা না আগে ভোরবেলা উঠে এক্সারসাইজ করতেন?

—সে সব কতকাল আগেকার কথা।

—সূর্যদাকে আমি ডাকবো?

বাদল কিছু উত্তর দিল না। সূর্যদা কাল কত রাত্রে ফিরেছেন, বাদলও তা জানে না। কেউ ডাকে না ওকে, যখন খুশী ওঠে, যখন খুশী স্নান খাওয়া করে।

রেণু সূর্যকে ডাকবার জন্যই চলে যাচ্ছিল। আবার ফিরে এলো। জিজ্ঞেস করলো, কাল আমার মা তোমাকে ডেকে নিয়ে কি বললেন?

বাদল ভাতের থালার দিকে মনোনিবেশ করে বললো, কিছু না তো! ও এমনিই জিজ্ঞেস করছিলেন আমার মায়ের অসুখের কথা—

—আর কিছু বলেন নি?

বাদল মুখ তুললো না। থালার ওপর দাগ কাটতে কাটতে বললো, না তো। আর কি বলবেন?

—তুমি আর ভাত নেবে না? এইটুকু মোটে খাও?

—অনেক খেয়েছি। এক্ষুনি দৌড়াদৌড়ি করে যেতে হবে।

বারান্দার বেসিনে হাত ধুতে ধুতে বাদল আবার সেই গানটা গাইতে লাগলো মুখ বুজে। সে যে গান গাইছে তার নিজেরই খেয়াল নেই।

জুতোর ফিতে বেঁধে, শোওয়ার ঘরের ঘড়িতে উঁকি মেরে দেখে বললো, এখনো পাঁচ সাত মিনিট সময় আছে।

এই সময় ওপর থেকে সূর্যর গলা ভেসে এলো, বাদল, এক কাপ চা পাঠিয়ে দিতে বল তো।

সূর্য এখন দোতলার নিজের ঘরটা ছেড়ে তিনতলার বড়বাবুর ঘরটাতেই পাকাপাকি আশ্রয় নিয়েছে। তার খাবার টাবার ওখানেই পাঠাতে হয়।

বাদল বললো, সূর্যদা জেগে উঠেছে, তুমি দেখা করবে বলছিলে তো, চলো—

রেণু একটু একটু অবাক চোখে বাদলের দিকে তাকায়। বাদলের কিছু একটা হয়েছে আজ। তার ব্যবহারে যেন খানিকটা শুকনো ভদ্রতার ছাপ। তিন তলার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বাদল বললো, সূর্যদা, রেণু এসেছে তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

যদিও বাতাসে শীতের আমেজ রয়েছে, তবু সূর্য তিন তলার বারান্দায় একটা খাঁকি রঙের প্যান্ট পরে খালি গায়ে দাঁড়িয়েছিল। মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ও দাড়ি গোঁপের জন্য তাকে পশ্চিমী সৈন্যের মতন দেখায়। অল্প নিদ্রার ক্লান্তিতে চোখের নীচে গভীর কালো দাগ।

ভরাট গম্ভীর গলায় সূর্য বললো, ও, এই রেণু। চিনতেই পারিনি, এর মধ্যে এত বদলে গেছে।

রেণু বললো, আমিও আপনাকে চিনতে পারিনি। এ কি বিশ্রী চেহারা হয়েছে আপনার!

—বিশ্রী চেহারা। তাই বুঝি!

—শেষ বার যখন আপনাকে দেখি, তখন আপনার মাথা ন্যাড়া ছিল, ঠিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মতন দেখাচ্ছিল।

সূর্য হেসে উঠে বললো, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী? হ্যাঁ, মনে আছে বটে, তুমি তাই বলেছিলে আমাকে। তখন ন্যাড়া ছিলাম, এখন পাঁচ ছ' মাস চুলই কাটিনি।

—কেন কাটেননি কেন?

—কি দরকার? বেশ তো আছে।

—মোটেই বেশ নেই। এ রকম চেহারায় থাকতে কারুর ভালো লাগে বুঝি? আজই চুল কেটে আসুন।

এই কথাটা বাদল এবং তার বাড়ির সকলে সূর্যকে অনেকবার বলবে ভেবেছে। কিন্তু বলতে পারেনি। রেণু অনায়াসে বলতে পারে। সূর্য তার কথাটা হেসে উড়িয়ে দেয়। ঘরে ঢুকে একটা বোতামহীন শার্ট পরে নিয়ে বললো, বসো!

কোথায় বসবে রেণু। ঘরটা নোংরা হয়ে আছে। খাটের ওপর এলোমেলো বিছানা পাতা। মেঝেতে কার্পেটের ওপর ছেঁড়া কাগজ। দেশলাই কাঠি, সিগারেটের প্যাকেট। দরজার পাশেই গড়াচ্ছে দুটো খালি মদের বোতল।

বড়বাবুর ইজি চেয়ারটা হাত দিয়ে খানিকটা পরিষ্কার করে বাদল রেণুকে বললো, তুমি এখানে বসো। সূর্যদার সঙ্গে কথা বলো, আমি চলি তা হলে?

সূর্য জিজ্ঞেস করলো, তোকে এক্ষুনি যেতে হবে। তোর কি অফিস রে? কোন কোম্পানি?

গত বারো দিনের মধ্যে এ প্রশ্ন করার অবকাশ বা ইচ্ছে হয়নি সূর্যর। বাদল সংক্ষেপে অফিসের কথা জানালো। সূর্য বললো, আমাকেও একটু বাদে বেরুতে হবে।

বাদল বললো, রেণু ততক্ষণ বসুক। আমি দু' কাপ চা পাঠিয়ে দিতে বলছি এককড়ির মাকে।

রেণু বললো, মাসীমার স্নান হয়ে গেলে আমি মাসীমার সঙ্গে দেখা করে তারপর যাবো।

বাদল আর অপেক্ষা করলো না। বেরিয়ে পড়লো। রাস্তার মোড়ে এসেই সে লাফিয়ে উঠে পড়লো একটা চলন্ত বাসে। তখনও সে গুন গুন করছে সেই গানের লাইনটা, 'মিঠার লোভে তিতো মুখে সারা দিনটা গেল—ও—ও—'। সারা দিনেও এই লাইনটা তার মাথা ছাড়লো না, অফিসে প্রায় সর্বক্ষণ, এমনকি, সাহেবের ঘরে গিয়েও সে মনে মনে লাইনটা নিয়ে খেলা করতে লাগলো।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সূর্য রেণুকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি এখন কি করছো। পড়াশুনো?

—হ্যাঁ।

—যথেষ্ট বড় হয়ে গেছ তো। আর পড়াশুনো করার কি দরকার?

—বাঃ, পড়বো না? বড় হওয়ার সঙ্গে পড়াশুনোর কি সম্পর্ক?

—হুঁ। তোমার কি সাব্জেক্ট? আর্টস না সায়েন্স?

—আর্টস। আমি ইক্‌নমিক্‌সে অনার্স নিয়েছি। আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন ছিল। আপনার সম্পর্কে আমার ক্লাসের ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প করেছিলাম। তখন তারা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে বলেছিল। কিন্তু আপনাকে তো কতদিন খুঁজেই পাওয়া যায়নি।

—আমার কাছে আবার কি প্রশ্ন?

—আপনারা এই যে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করলেন, এত কষ্ট সহ্য করলেন, তারপর একদিন স্বাধীনতা এলো—কিন্তু তাতে আমাদের কতটুকু লাভ হলো! দেশ কতটা বদলালো?

—আমি স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলুম নাকি? ভুলে গেছি সেসব কথা।

—আপনি ভোলার চেষ্টা করলেও আমরা তো ভুলবো না।

—যারা এখন দেশটা চালাচ্ছে, তাদের গিয়ে জিজ্ঞেস করো।

—তারা তো আছেই। কিন্তু আপনারাই বা দায়িত্ব অস্বীকার করবেন কি করে? শুধু স্বাধীনতা এনেই কি আপনাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল? অবশ্য আমার অনেক বন্ধুরা বলে, দেশে এখনো আসল স্বাধীনতা আসেইনি। একটা নকল স্বাধীনতার নাম করে আমাদের ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে।

রেণুর কণ্ঠস্বরে একটু উত্তেজনা ছিল, সূর্য তা গ্রাহ্য করলো না। সে দু' হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে বললো, আমি স্নান করতে যাবো। তুমি এবার নিচে যাও।

লালচে হয়ে গেল রেণুর মুখ। ঝট করে অপমানের ছোঁয়া লেগেছে। তীব্র চোখে সূর্যর দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি আমাকে চলে যেতে বলছেন; আপনি আমার এসব কথার উত্তর দেবেন না?

সূর্য নিরাসক্তভাবে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লো। তারপর বললো, আমার ওসব কিছু মনে নেই। প্লিজ, আমার কাছে এসব প্রশ্ন তুলো না। আমি নিরিবিলিতে থাকতে চাই।

—আপনি যে এতদিন পাহাড়ে না জঙ্গলে কোথায় পালিয়ে ছিলেন, সেখানে আপনাকে কেউ এসব প্রশ্ন করতে যাবে না ঠিকই। কিন্তু কলকাতায় থাকলে আপনাকে এ প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে।

—আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম বুঝি?

—নিশ্চয়ই।

সূর্য কয়েক পলক রেণুর দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে রইলো। নতুন যৌবনে ঝকমক করছে রেণুর শরীর, মুখে চোখে একটুও মালিন্য নেই, দ্বিধা নেই। সূর্যর দৃষ্টিতে ফুটে উঠলো মুগ্ধতা। সে বললো, মেয়েদের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয়, তা আমি জানি না। আমি দুঃখিত, রেণু, তোমাকে কোনো কথাই আমি ঠিক মতন বলতে পারবো না।

—মেয়েদের আবার কি! আপনি আমাকে কতদিন ধরে চেনেন, সহজভাবে কথা বলতে পারেন না?

—তোমাকে কি আমি খুব বেশী দিন চিনি?

—বাঃ চেনেন না? মনে নেই, সেই কতদিন আগে, প্রথম যেদিন আপনি আমাদের বাড়িতে এলেন—আপনার মাথা ফেটে গিয়েছিল, বাদলদা আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো।

—গিয়েছিলাম বুঝি? আমার তো মনে পড়ে না।

—আমার সব মনে আছে।

—তোমার নিশ্চয়ই অত্যাশ্চর্য স্মৃতিশক্তি। সেই তুলনায় আমি একটা গবেট।

—আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি সব কথা এড়িয়ে যেতে চাইছেন। আপনার কি হয়েছে বলুন তো?

সূর্য উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমার মাথা ধরে আছে। স্নান করে দুটো অ্যাসপ্রো না খেলে সারবে না।

নীচে গিয়ে বাদলের মায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করার পর রেণু রাস্তায় বেরিয়ে দেখলো, সূর্য বাস স্টপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। রেণুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেও সূর্য অন্যমনস্কভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল। রেণু ওর কাছে পৌঁছোবার আগেই সূর্য উঠে পড়লো একটা ট্যাকসিতে। রেণুর মুখে একটা দুঃখের ছাপ পড়লো। কোনো

মানুষের কাছেই সে এরকম ব্যবহার আশা করে না। রেণুর নিজস্ব জগতে প্রত্যেক মানুষই সহজ, স্বাভাবিক এবং সুস্থ।

বাদল অফিস ছুটির পর বাড়ি ফেরা বন্ধ করে দিয়েছে। মায়ের অসুখটায় এক-ঘেয়েমি এসে গেছে। হিমানী কখনো একটু ভালো হয়ে ওঠেন, আবার কিছুটা অনিয়ম করলেই শয্যাশায়ী হতে হয়। সম্পূর্ণ সেরে ওঠার আর বুঝি কোনো আশা নেই। মায়ের বিছানার পাশে বাদল এখন কদাচিৎ বসে, কারণ, বসলেই হিমানীর মুখে একটা না একটা অভিযোগ শুনতে হবে। চিররঞ্জন বাড়ি খোঁজা শুরু করেছেন, হিমানী এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার জন্য বদ্ধপরিকর। সূর্যর ব্যবহার দিন দিন তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠছে।

অফিস ছুটির পর বাদল ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে চলে যায় ইদানীং। প্রথম কয়েকদিন এলোমেলো বই পড়ছিল, তারপর সে সুনির্দিষ্টভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে পড়াশুনো শুরু করে। পৃথিবী ও প্রাণের সৃষ্টি সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত তাকে আকৃষ্ট করতে লাগলো খুব।

ন্যাশানাল লাইব্রেরি বন্ধ হয় ন'টার সময়। সেখান থেকে বেরিয়ে তার কোনো তাড়াহুড়ো নেই বাড়ি ফেরার জন্য। বাসে না উঠে সে ময়দানের মধ্য দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে। অলস, মন্থর তার গতি, আপনমনে সিগারেট টানে কিংবা বাদামভাজা কিনে চিবোয়।

বাড়ি সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই বাদলের, অথচ তার অন্য কোথাও যাবার জায়গাও নেই। তার বয়েসী ছেলেরা রাজনীতি অথবা নাটক করে, রবীন্দ্র সংগীত গায় অথবা সাহিত্য নিয়ে তর্ক করে—কিংবা স্রেফ আড্ডা দিয়ে সময় কাটায়। বাদল এর সবকটা দল থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরলে তার মেজাজ গরম হয়ে যায়। সূর্য সত্যিই খুব বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। বাড়িতেই এখন তার মূল আড্ডা। কী সব অদ্ভুত চেহারার লোক আসে তার কাছে, কারুর মাথা কামানো, কারুর গলায় রুমাল বাঁধা, এদের মধ্যে অনেকের চাউনির ধরন ধারণ দেখলে ভয় লাগে। সূর্য যেন প্রতিজ্ঞা করেছে, কোনো শিক্ষিত, ভদ্রলোকের সঙ্গে আর মিশবেই না। ওই লোকগুলোর বাড়িতে আনাগোনার একটি কারণ, সূর্য নাকি ওদের সঙ্গে কি একটা সাপ্লাই-এর ব্যবসা শুরু করবে ঠিক করেছে। 'ভাদুড়ি ট্রেডার্স' নামে একটা সাইনবোর্ডও লাগানো হয়েছে বাড়ির সামনে।

সূর্যর এখন টাকায় টান পড়েছে বলেই বোধ হয় কলকাতায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়ে পড়েছিল। বড়বাবুর জমানো টাকা পয়সার প্রায় সবটাই সে উড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। চিররঞ্জনের সঙ্গে টাকা পয়সা সংক্রান্ত আলোচনায় সূর্য একবার এ কথাও বলেছে যে, তার ব্যবসায়ের বিনিয়োগের প্রয়োজনে তাকে হয়তো বাড়িটাই বিক্রি করতে হবে। তা হলেই আর কিছু বাকি থাকে না! একথা সকলেই জানে, সূর্যর দ্বারা কোনোদিনই ব্যবসা হবে না। সে সব কিছু উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেবে। সূর্যর কাছে যে-সব লোকেরা আসে, তারা ব্যবসা নিয়ে কতটা আলোচনা করে তা বোঝা যায় না, শুধু মদ খায় আর হই-হল্লা করে, এক একদিন মাঝ রাত্তিরেও সূর্যকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যায়!

রেণু সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে এসে পড়লে আরও মুশকিল হয়। রেণু দেখা করতে চায় সূর্যর সঙ্গে। বাদলরা কেউ আর এখন সূর্যর ঘরে যায় না। ওপরের ঘরে খাবার পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া বাড়ির কারুর আর কোনো সম্পর্ক নেই তার সঙ্গে। কিন্তু রেণু

যেতে চাইলে বাদলকেও সঙ্গে যেতে হয়। সে এক অস্বস্তিকর অবস্থা। সূর্য রুক্ষভাবে অপমান করে কথা বললেও রেণু তার সঙ্গে তর্ক করতে চায়। আগে দেশের অবস্থা কিংবা রাজনীতি সম্পর্কে রেণুর কোনো আগ্রহ ছিল না। কলেজে ভর্তি হবার পর সে এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। কলেজে তো রাজনীতিই এখন প্রধান আলোচ্য বিষয়। মাত্র তিন চার বছরের মধ্যে প্রতিবেশী চীনের অগ্রগতি দেখে সবাই মুগ্ধ, পদে পদে ভারতের সঙ্গে তুলনা এসেই যায়।

বাদল হাঁটতে হাঁটতে এসে একটা রেইনট্রির নীচে দাঁড়ালো। রাত্রের দিকে ময়দানের মধ্যে একা একা হাঁটা খুব নিরাপদ নয়। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কেপমারি গ্যাঙের অত্যাচারের কথা খুব শোনা যায়। প্রায়ই মাঠের মধ্যে রেস খেলায় জেতা লোকদের লাশ পড়ে থাকে। কিন্তু বাদলের মাথায় কোনো চিন্তা নেই। সে আত্মবিস্মৃতের মতন গাছটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগলো কিছুক্ষণ। তারপর সে গাছের গুঁড়িতে হাত দিয়ে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলো, বলো তো, কেন আমি রেণুর টেলিফোন ধরিনি?

অনেকক্ষণ থেকেই একটু একটু হাওয়া দিচ্ছে। বাদল ওই প্রশ্নটা করার পর রেইনট্রি থেকে কয়েকটি পাতা খসে পড়লো তার গায়ে-মাথায়। বাদল আগ্রহের সঙ্গে পাতাগুলো তুলে নিল হাতে। তার মনে হলো, গাছটি তার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। পাতা ঝরানোই তো গাছের ভাষা। কিন্তু বাদল সে ভাষা জানে না। তা ছাড়া অন্ধকার।

সেদিনই দুপুরবেলা বাদলের অফিসে রেণু ফোন করেছিল। বাদলের নিজের টেবিলে টেলিফোন নেই। তা ছাড়া সেই সময় সে বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। কোনো নিষেধ না থাকলেও সে অফিসে বয়স্ক লোকদের সামনে সিগারেট টানতে লজ্জা পায়, তাই তাকে উঠে যেতে হয়। একটি বেয়ারা এসে তাকে খবর দিল যে বড়বাবুর টেবিলে তার একটি টেলিফোন এসেছে, একজন মেয়েছেলে তাকে ডাকছে।

বাদলের বুকটা ধক্ করে উঠেছিল। নিশ্চয়ই রেণু। রেণু ছাড়া আর কোন্ মেয়েছেলে তাকে ফোন করবে? একরকমের খুশীর চাঞ্চল্যে তার মুখটা রক্তাভ দেখায়। কয়েকদিন রেণুর সঙ্গে দেখা হয়নি, তাই রেণু খোঁজ নিচ্ছে। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বাদল এগিয়ে গিয়েছিল বড়বাবুর টেবিলের দিকে। তিনি তখন চেয়ারে ছিলেন না, সুতরাং বাদলের কথা বলার কোনো অসুবিধে ছিল না। রিসিভারটা হাতে তুলে নেবার আগের মুহূর্তেও বাদল ভাবে নি সে এরকম কিছু করবে। হঠাৎ তার মাথার মধ্যে কি হয়ে গেল, সে রিসিভারটা তুলে গম্ভীর গলায় বললো, বাদলবাবু অফিসে নেই। এবং কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করেই রেখে দিল রিসিভারটা। কেন সে এরকম করলো, নিজেই জানে না। রেণু হয়তো তার গলা চিনতে পারবে না—এর আগে রেণুর সঙ্গে কখনো টেলিফোনে কথা বলেনি সে। তবু সে নিজেই রেণুকে—কি এর মানে! মানুষ কেন এরকম করে? যাকে যে ভীষণভাবে চায়, তাকেও কেন এক এক সময় ফিরিয়ে দেয়? কোনো সৃষ্টিতত্ত্বের বইতে এর ব্যাখ্যা নেই।

বাদল আবার গাছটাকে প্রশ্ন করলো, তুমিও বলতে পারলে না? হাতের শুকনো পাতাগুলো মুড়মুড়িয়ে ভেঙে বাদল গন্ধ শুঁকে কিছু বোঝবার চেষ্টা করলো।

রেণুর সঙ্গে দেখা হলো রবিবার সকালে। রেণুর মুখ চোখে রাগ। সে অভিমান কিংবা রাগ মনের মধ্যে চেপে রাখে না। বাদল নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে কাগজ

পড়ছিল। রেণু সেখানে এসে প্রথমেই বললো, তোমার ব্যাপার কি বলো তো?

একটা লাল রঙের শাড়িতে রেণুকে জ্বলজ্বলে দেখাচ্ছে। ফাঁকা ঘর। বাদলের প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো, এক লাফে উঠে রেণুকে জড়িয়ে ধরা। রেণুর চেহারার মধ্যে এমন একটা টাটকা ভাব আছে যে স্পর্শ না করলে যেন সবটুকু দেখা হয় না। কিন্তু বাদল আশ্চর্যভাবে নিজেকে দমন করে অত্যন্ত নিরুত্তাপ গলাতেই বললো, কতদিন তোমার দেখা পাই না!

—তোমার কি হয়েছে বলো তো সত্যি করে?

—কিছু হয়নি তো।

—নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। ক'দিন ধরেই তোমার কি রকম যেন আলগা আলগা ভাব দেখছি। তোমাকে কেউ কিছু বলেছে?

—কে কি বলবে আমাকে? বসো, বসবে না?

রেণু চেয়ারটা একটু দূরে টেনে নিয়ে বসলো। রেণুরও অভিজ্ঞতা এই যে তাকে নিরালায় পেলেই বাদল বড্ড ছেলেমানুষ হয়ে যায়, চুমু খাওয়ার জন্য অন্ধের মতন ঠোঁট খোঁজে। রেণু এখন আর এসব ব্যাপারকে অসভ্যতা কিংবা খারাপ ব্যাপার বলে মনে করে না ঠিকই, তবু মেয়েদের প্রাথমিক সতর্কতা থাকে, অন্য কেউ যেন দেখে না ফেলে।

বাদল আজ সেরকম কোনো চেষ্টাই করলো না দেখে রেণু সামান্য একটু অবাক হলো। খুশীও হলো বোধহয়। রাগের ভাবটা সরিয়ে ফেলে বললো, এখনো শুয়ে আছো কেন, ওঠো! ক'টা বাজে জানো?

বাদল হাতের খবরের কাগজখানা সযত্নে ভাঁজ করে রেখে দিল বালিশের তলায়। তারপর উঠে বসলো। রেণুর দিকে তাকিয়ে ভাবলো, এরকম একটা দিন আসা উচিত ছিল, যখন সে আর রেণু এক বিছানায় শুয়ে রাত কাটাবে। সকালে রেণু আগে ঘুম থেকে উঠবে, তারপর তার গায়ে ঠ্যালা দিয়ে বলবে, এখনো শুয়ে আছো কেন, ওঠো!

আঙুলগুলো মাথার চুলের মধ্য দিয়ে চিরুনির মতন চালিয়ে বাদল বললো, তোমার সব কিছুই সুন্দর। কিন্তু আমি এর যোগ্য নই।

রেণু ধমক দিয়ে বললো, ওসব আজেবাজে কথা অনেক শুনেছি। তুমি সাতদিন আমার সঙ্গে দেখা করো নি কেন? আমি তোমার অফিসে টেলিফোন করেছিলাম।

—অফিসের কাজটা আমার একটুও ভালো লাগছে না। আমি পড়াশুনো করতে চাই। অনেকদিন বাদে আমার কিছু লিখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তার সময় নেই।

—চাকরিটা ছেড়ে দাও।

—তা সম্ভব না। বাড়িতেও নানা রকম অশান্তি চলছে।

—কি অশান্তি?

—তোমার তা শোনার দরকার নেই। অশান্তির কথা, দুঃখের কথা অন্যকে বলতে নেই। শুধু শুধু বিব্রত করা।

—আমি কিছু করতে পারি না?

—পারো।

—কি?

যে-রকমভাবে দু' আঙুল দিয়ে নুন তোলে, বাদল আঙুলের সেই রকম ভঙ্গি করে বললো, আমাকে এইটুকু ভালোবাসবে? এইটুকু ভালোবাসাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। বাসবে?

উত্তর না দিয়ে রেণু হেসে ফেললো। পরিষ্কার নির্ভেজাল হাসি। ভালোবাসার কথা শুনলে সে হাসে।

—অফিসে কিংবা বাড়িতে ঝঞ্ঝাট থাকলেই কি একেবারে হাল ছেড়ে চুপচাপ বসে থাকতে হবে? আমি লক্ষ্য করছি, তুমি দিন দিন আরও বেশী মুখচোরা আর গম্ভীর হয়ে যাচ্ছো। এসব চলবে না। তোমাকে লোকের সঙ্গে মিশতে হবে, তোমার যেটুকু গুণ আছে, তা প্রকাশ করতে হবে।

—ইন্দ্রানী দেবী, আপনি আজ প্রচুর উৎসাহ নিয়ে এসেছেন মনে হচ্ছে? আপনি বুঝি অধঃপতিত মানুষদের উদ্ধার করার দায়িত্ব নিয়েছেন?

—শোনো। আমাদের ক্লাসের ছেলেমেয়েরা মিলে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করছি।

—আবার নাটক?

—না, নাটক নয়। আলোচনা, কিছু গান, আবৃত্তি। তোমাকে যেতে হবে।

—আমি গিয়ে কি করবো? তোমার কলেজের বন্ধুরা আমাকে পাত্তা দেবে কেন? আমি সামান্য একটা কেরানী।

—তুমি একজন কবি।

—ছিলাম, তাও খুব এলেবেলেভাবে।

—এখনো তুমি কবি এবং থাকবেও। মোট কথা তোমাকে যেতেই হবে এবং অনেক সাহায্য করতে হবে। আচ্ছা, সূর্যদাকে নিয়ে যাওয়া যায় না?

—সূর্যদার কথা ছেড়ে দাও। হি ইজ লস্ট!

—কেন, ছেড়ে দেবো কেন? একটা লোক শুধু শুধু নিজেকে এরকমভাবে নষ্ট করবে, আর আমরা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখবো?

—রেণু, তুমি কি আজ ত্রাণকর্ত্রীর ভূমিকায় নেমেছো নাকি?

—চলো, সূর্যদার সঙ্গে দেখা করে আসি।

—সূর্যদা এখনো ঘুমুচ্ছে।

—দশটা বেজে গেছে, এখনো ঘুম? এই করলে কারুর স্বাস্থ্য থাকে? চলো ডেকে তুলবো।

বাদল আজকাল পারতপক্ষে সূর্যর সঙ্গে দেখা করতে চায় না। সূর্য সম্পর্কে যে উজ্জ্বল ছবিটা তার মনের মধ্যে ছিল সেটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সে-ই দুঃখ পেয়েছে বেশী। কিন্তু রেণুকে একথা বলা যায় না।

রেণু প্রবল উৎসাহে টেনে নিয়ে গেল অনিচ্ছুক বাদলকে। সূর্যর ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, বাদল ডাকলো বাইরে থেকে।

সূর্য রুক্ষভাবে বললো, কে? দরজা খোলাই আছে, ধাক্কা দে।

সূর্য টানটান হয়ে শুয়ে আছে খাটের ওপর। ঘুমোচ্ছিল না। তার বুকের ওপর একটা বই খোলা। দরজা খুলতেই উগ্র অ্যালকোহলের গন্ধ। বাদল ভাবলো, সূর্যদা কি সকাল থেকেই মদ খাচ্ছে? কিংবা কাল বোধহয় অনেক রাত পর্যন্ত চলেছে।

সূর্যর চোখ দুটো নেশাগ্রস্তর মতন। রেণুকে দেখেও সে কোনো ভাবান্তর দেখালো না। বাদলকে বললো, টেবিলের ওপর থেকে সিগারেট দেশলাই দে তো!

রেণু বললো, এখনো শুয়ে আছেন কেন? উঠুন! ঘরের জানলা টানলাও খোলেন নি!

সূর্য খানিকটা জড়ানো গলায় বললো, না, আমি এখন উঠবো না। সারা রাত

আমার ঘুম হয়নি, এখনো ঘুম আসছে না।

রেণু তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সূর্যকে নিয়ে যাবার কথা বলতেই সূর্য হঠাৎ খুব রেগে উঠলো। বাদলের দিকে তাকিয়ে বললো, এই মেয়েটা আমাকে প্রায়ই জ্বালাতন করতে আসে কেন? বারণ করতে পারিস না? আমি এসব পছন্দ করি না।

বাদল আড়ষ্টভাবে বললো, ও তো অন্যায় কথা কিছু বলে নি!

—বলছি তো আমি এসব পছন্দ করি না। ওকে অন্য জায়গায় যেতে বল। দেশে অনেক বড় বড় নেতা আছে, যারা দেশের জন্য এক সময় জেল খেটেছে, এখন তারাই ক্ষমতা নিয়ে দেশটা চালাচ্ছে—ও তাদের কাছে যাক না! আমাকে বিরক্ত করা কেন? আমি এসব পছন্দ করি না।

রেণু কোমর বেঁধে লেগে গেল ঝগড়া করতে। সূর্যর আজ আর মাথার ঠিক নেই, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সে রেণুর সামনেই খারাপ ভাষা ব্যবহার করছে। সমস্ত পৃথিবীর ওপরেই তার একটা ঘৃণার ভাব। অন্যান্য মাতালদের মতনই তার মুখ দিয়ে ইংরেজির স্রোত বইছে। পৃথিবীতে সবাই বাস্টার্ড কিংবা সন অব এ বীচ! সকলেই নরকে যাবার যোগ্য।

বাদল বিরক্ত বোধ করতে লাগলো। সূর্যদাকে নিয়ে বেশী বেশী বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে। এক সময় গোঁয়ারের মতন টেররিস্ট মুভমেণ্টে গিয়েছিল, এখনও গোঁয়ারের মতন নিজেকে নষ্ট করতে চাইছে। একে আর পাত্তা দেওয়া উচিত নয়। রেণুকে অপমান করার কোনো অধিকার নেই সূর্যদার।

তবু পুরোনো দুর্বলতায় বাদলের বুকটা মুচড়ে উঠলো একবার। তার মনে হলো, সূর্যদার জন্যই সে নিজেও কিছু করতে পারলো না জীবনে। তার অনেক দিনের বিশ্বাস ছিল, সূর্যদা আর সে এক সঙ্গে মিলে কোনো কাজে নামলে দারুণ কিছু করতে পারতো! সে আবেগের সঙ্গে বলে ফেললো, সূর্যদা, কেন নিজেকে নষ্ট করছো। এখনো সময় আছে। আমরা একটা কিছু করতে পারি না? কোনো একটা কাজের মধ্যে না থাকলে তুমি শান্তি পাবে না! কি ব্যবসা-ট্যাবসার কথা ভাবছো—এসব কি তোমাকে মানায়! তুমি আরও অনেক বড় কিছু করতে পারো। তোমার সঙ্গে যারা কাজ করেছে, যারা জেল খেটেছে—দ্যাখো, তারা আজ অনেকেই দেশের হর্তাকর্তা—তুমি এখনো যদি একবার তাদের কাছে যাও, তাদের কিছু বুঝিয়ে বলো—

সূর্য উগ্র মুখ করে প্রচণ্ড জোরে বললো, হোয়াট? আমি কাদের কাছে যাবো?

—এখন যারা মিনিস্টার, তারা তোমার...

বাদল কথাটা শেষ করতে পারলো না, সূর্য সারা মুখটা কুঁচকে বললো, 'শ্যাল আই, হু স্ট্রাক দা লায়ন, পে দা উলভ্স হোমেজ? ব্যাস্টার্ডস! অল ব্যাস্টার্ডস! তুই চাকরি করিস, তুই ওদের পা চাট গিয়ে!

অপমানে রক্তশূন্য হয়ে গেল বাদলের মুখ। সে রেণুর দিকে তাকিয়ে বললো, চল, এখানে আর বসে থেকে কোনো লাভ নেই।

সূর্য হুংকার দিয়ে বললো, গেট দা হেল আউট অব হিয়ার! আমাকে আর কক্ষনো বিরক্ত করতে আসবি না আমি সাবধান করে দিলাম!

অন্যদিন সূর্য বেশী কথা বলে না কিংবা প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যায়। আজ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তার মাথায় রাগ চড়ে গেছে। বাদল আর রেণু চলে আসবার পরেও সে উন্মত্তের মতন চ্যাচাঁতে লাগলো। কিসের ওপর যেন সে দুমদুম করে ঘুষি মারছে। সারা বাড়ি কেপে উঠছে তার চিৎকারে।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে রেণু কম্পিত গলায় বললো, এরকম করলে তো উনি পাগল হয়ে যাবেন!

সকালবেলা কোনো মাতালের চিৎকার শোনার অভিজ্ঞতা নেই রেণুর। তার অস্তিত্বও জগতে বড় রকমের একটা ধাক্কা লেগেছে। তার দু'চোখে ঘনিয়ে এসেছে করুণা।

রেণু বললো, আমাদের উচিত ওঁকে সাহায্য করা।

বাদল নীরস গলায় বললো, তুমি যাও—।

রেণু আবার ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে। সূর্যর বাহুতে হাত রেখে বললো, সূর্যদা, একি করছেন? শান্ত হোন। আমরা ঐ সব কথা আর কখনো বলবো না।

বাদল আশঙ্কা করেছিল, সূর্য বোধ হয় রাগের মাথায় রেণুকে ধাক্কা দেবে কিংবা চড় মেরেই বসবে। সূর্য তা করলো না, রেণুর হাত সরিয়ে দিয়ে বললো, তুমি যাও।

রেণু দৃঢ় গলায় বললো, না, আমি যাবো না। আপনি শান্ত না হলে আমি যাবো না।

বাদল একটুক্ষণ স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে। তারপর নীচে নেমে গেল। নিজের ঘরে গিয়ে বালিশের তলা থেকে টেনে বার করলো খবরের কাগজটা। শেষ পৃষ্ঠার একটা ছবির দিকে চেয়ে রইলো। সূর্যদার মন ফেরাবার জন্য এই একটাই মাত্র উপায় আছে বোধহয়। বারাসাতে একটি হাসপাতালের উদ্বোধন করছেন নতুন মন্ত্রী শংকরলাল বসু। তাঁর পাশে দাঁড়ানো দীপ্তিদিকে স্পষ্ট চেনা যায়। সূর্যদা কি জানে, প্রায় দু' মাস আগে দীপ্তিদির সঙ্গে শংকরলাল বসুর বিয়ে হয়ে গেছে; কারুর কাছ থেকেও কি শোনে নি?

বাদল খবরের কাগজটা নিয়ে আবার ওপরে উঠে আসছিল, সিঁড়িতে পা দিয়েও ফের মত পাল্টালো। তার মুখ রাগে গনগন করছে। তবু সে খবরের কাগজটা ছিঁড়ে ফেললো টুকরো টুকরো করে।

॥ ৮৫ ॥

বরানগর-আলমবাজারের দিকে একটা দোতলা বাড়ি। সামনে ছোট্ট একটি মাঠ, যা বাগান হওয়ার প্রতীক্ষায় আছে, উঁচু পাঁচিল তোলা হচ্ছে সেটাকে ঘিরে, বসানো হয়েছে লোহার গেট। বাড়ির দেওয়ালগুলোতে নতুন রং করা হয়েছে, তাই বেশ একটা টাটকা টাটকা গন্ধ। এই বাড়িতে শংকর বসু সদ্য উঠে এসেছেন।

সকালের দিকে বাড়ির সামনে মানুষের ভিড় লেগেই থাকে। গেটের দু' পাশে বসা দু'জন পুলিস সেই ভিড় সামলায়। তবে এ বাড়ি থেকে যেন কোনো ভিখিরিকেও ফিরিয়ে দেওয়া না হয়, সে ব্যাপারে কড়া নির্দেশ আছে। একতলার বসবার ঘরে একটি নারকেলমালায় অনেক খুচরো পয়সা রাখা আছে, ভিখিরি এলে পুলিসের লোকই সেখান থেকে পয়সা এনে দিয়ে দেয়। পুলিস কারুর হাতে পয়সা তুলে দিচ্ছে, এই দুর্লভ দৃশ্য এ বাড়িতে এলেই দেখা যাবে শুধু।

ভিখিরি ছাড়াও নানারকম প্রার্থী ও উমেদার আসে। সকালবেলা শংকরবাবু দু' ঘণ্টা নীচে এসে বসেন, এক এক করে তাদের সকলেরই কথা শোনেন এবং সাধ্য-মতন সাহায্য করেন। বহু লোকের বহু রকমের দরখাস্তে তিনি কখনো লাল ও কখনো নীল পেন্সিলে সুপারিশ লিখে দেন। তবে মন্ত্রীদের দু'রকম রঙের পেন্সিল

ব্যবহার করার পেছনে যে একটা রহস্য আছে, তা অনেকেই জানে না।

রুক্ষ চুলদাড়ি সমন্বিত চেহারায় সূর্য সেই গেটের সামনে এসে দাঁড়াবার পর পুলিসরা তার আপাদমস্তক কয়েকবার দেখলো বিতৃষ্ণার সঙ্গে, তবু ঢুকতে দিল ভিতরে। মাঠটা পেরিয়ে এসে বারান্দায় উঠলেই চোখে পড়বে দেয়ালের গায়ে একটা লাল রঙের তীর আঁকা, তার পাশে লেখা আছে—এই দিকে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী গেলে যে ঘরটি পড়বে, সেখানে বসে থাকেন শংকর বসুর সেক্রেটারি রাখাল চট্টরাজ, যিনি বরানগর পাড়ায় রাখালদা নামে অত্যন্ত জনপ্রিয়। সেই ঘরের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে আলোচনারত শংকর বসুর একটি বাঁধানো ফটোগ্রাফ।

রাখাল চট্টরাজ সূর্যকে অবাঙালী মনে করে তার দিকে ভিজিটিং স্লিপের প্যাড এগিয়ে দিয়ে বললেন, কেয়া নাম আর কেয়া কাম—হিঁয়া লিখ দিজিয়ে।

সূর্য নাম লিখতে গিয়েও ঘরের মধ্যে অপেক্ষমান আরো অনেক দর্শনপ্রার্থী দেখে বললো, আমার খুব জরুরী দরকার।

রাখাল চট্টরাজ এক গাল হেসে বললেন, এখানে আর যারা বসে আছে, তাদের কার না জরুরী দরকার? ঠিক আছে বুঝেছি, বুঝেছি। একটু বসো ভাই, বেশীক্ষণ লাগবে না।

হাসির উত্তরে হাসিমুখ দেখানেই মনুষ্যসমাজের নিয়ম। কিন্তু সূর্য মুখখানাকে রেখাহীন করে রাখলো। সে বসলো না, দাঁড়িয়ে রইলো দেয়ালে হেলান দিয়ে।

রাখাল চট্টরাজ বললেন, বসো না, দাঁড়িয়ে কেন?

সূর্য উত্তরও দিল না, বসলোও না। ঘরে কয়েকখানা চেয়ার ও তিনটি বেঞ্চ, এর মধ্যে বেঞ্চগুলিতে একটু জায়গা থাকলেও সূর্য যেন অন্য কারুর পাশে বসবেই না ঠিক করেছে।

সূর্যর যখন ডাক পড়লো শংকর বসুর ঘরে, তখনও সেখানে দু' তিনজন লোক রয়েছে। যদিও সূর্যর চেহারা অনেক বদলে গেছে এই কয়েক বছরে, মুখ দাড়িগোঁফে ঢাকা—তবু, আশ্চর্যের বিষয়, শংকরবাবু তাকে দেখা মাত্রই চিনতে পারলেন। বিস্মিত হয়ে চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে বললেন, আরে, সূর্য, এসো এসো! কোথায় ছিলে এতদিন?

শংকরবাবুর কন্ঠস্বরে উত্তাপ আছে। এক পার্টিতে থাকবার সময় তিনি কোনো দিনই সূর্যকে ঠিকমতন পছন্দ করতে পারেন নি, কিন্তু আজ সূর্যকে দেখে তিনি সত্যিই খুশী হয়েছেন মনে হলো। সূর্যকে পাশের চেয়ারে বসিয়ে অনেক প্রশ্ন করতে লাগলেন।

—তারপর কেমন আছো, বলো।

—ভালো।

—চেহারাটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে। কোথায় ছিলে এতদিন?

—ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

—ভারত দর্শনে বেরিয়েছিলে? খুব ভালো—এত বিরাট এই দেশ, এর কতটুকু আমরা দেখেছি বা জানি! কয়েক মাস ধরে তোমার খুব খোঁজ করেছিলাম।

—ও।

—তোমার এক মাসতুতো না পিসতুতো ভাই আছে না? তার কাছেও খোঁজ করা হয়েছিল, সেও কিছু বলতে পারে না—কারুর কাছে ঠিকানাও রেখে যাও নি!

—ঠিকানা ঠিক ছিল না।

—এখন এখানেই থাকবে ঠিক করেছো তো? কি করবে কিছু ঠিক করেছো?

—কি জানি!

—তুমি অনেক কিছু করতে পারবে—আমার দ্বারা যদি কোনো সাহায্য করা সম্ভব হয়।

শংকরবাবু নিতাই নামে একজন লোককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, বউদি ফিরেছেন? ফেরেননি এখনো? ঠিক আছে, ফিরলেই এখানে একবার খবর দিস।

সূর্যর দিকে ফিরে বললেন, দীপ্তি এখনো স্কুলে পড়ানো ছাড়ে নি। এখানকার একটা স্কুলে হেড মিস্ট্রেস হয়েছে, একটু বাদেই আসবে। তুমি বসো, ওর সঙ্গে দেখা করে তারপর যাবে। আমি ততক্ষণ এঁদের সঙ্গে একটু কথাবার্তা সেরে নিই।

সূর্য চুপ করে বসে রইলো এমন একটা ভঙ্গিতে যেন অন্য কারুর কথা সে শুনতে পাচ্ছে না। পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরালো। শংকরবাবুর কথাবার্তা আগে একটু রুক্ষ ধরনের ছিল, এখন বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক মিষ্টভাষী হয়েছেন। যদিও জহর কোট ও গান্ধী টুপি পরে চেহারাটা বদলেছেন, তবু অনর্থক লম্বা লম্বা কথা বলেন না, কাজের কথাই সংক্ষেপে সেরে নিতে চান।

কতরকম লোকের কতরকম চাহিদা। এত বছর পরাধীনতার পর লোকে হঠাৎ কতকগুলো নতুন ঠাকুরদেবতা পেয়ে গেছে, যাদের কাছে এলে সবরকম মনস্কামনা-সিদ্ধি হতে পারে, অন্তত যাদের কাছে মনস্কামনার কথা জানানো যায়। সকলেই এসে পৃথক পৃথকভাবে বলছে, আমাকে দাও, আমাকে দাও! আমার ছেলের জন্য, আমার ভাইয়ের জন্য, আমার নিজের জন্য—অর্থাৎ আমাকে কেন্দ্র করে যে পরিবার, শুধু তার উন্নতির জন্য আমি কিছু একটা চাই, দাও দাও দাও! এর বাইরে যে দেশ, যে সমাজ—তার যা হয় হোক, তুমি শুধু আমাকে দাও! ভোটে জেতার আগে কিংবা পরে এই সব দেবতারাও যাকে যতটা সম্ভব পাইয়ে দিয়ে মনে করলেন, তবু তো কিছু একটা করলাম ওদের জন্য। যেন এইটাই দেশের কাজ। যারা চোখের সামনে আসে, তারা এইরকমভাবে কখনো কিছু পায়। যারা চোখের আড়ালে রইলো, সেই পিণ্ড পিণ্ড জনসমষ্টি, তাদের যেন কোনো অস্তিত্বই নেই, গ্রামে গঞ্জে হাটে বাজারে তাদের হাড়ে ঘুণ ধরতে লাগলো। শংকর বসুও মানুষটা অসৎ না, তিনি মনে করছেন, তিনি সতিাই দেশের কাজ করছেন আন্তরিকভাবে, তিনি চোখে একটা ভুল চশমা পরে আছেন।

দীপ্তি এ ঘরে ঢুকে পড়ে শংকরবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার যে আজ রানাঘাটে যাবার কথা আছে, কখন বেরুবে?

শংকরবাবু তখন একটা দরখাস্তে মন্তব্য লিখছিলেন, অন্যমনস্কভাবে বললেন, রাখালকে জিজ্ঞেস করো। বোধ হয় গাড়ি পাওয়া যাবে না, ট্রেনে যেতে হবে।

—ক'টার সময় ট্রেন?

—আমি ঠিক জানি না, রাখাল বলতে পারবে।

সেই সময় দুনিয়া কাঁপিয়ে একটা দুম দুম শব্দ হচ্ছে। তোলপাড় করা ঝড়ে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে চরাচর। অন্ধকারে বিদ্যুতের মতন ঝলসে উঠলো একটা ছুরি। কে যেন আকুল আর্তনাদে বলছে, আমাকে তাড়িয়ে দিও না, আমাকে তাড়িয়ে দিও না!

চেয়ারে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে সূর্য। মুখ নীচু করা। শংকরবাবু কথার মাঝখানে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এক গাল হেসে দীপ্তিকে বললেন, আরে, তোমাকে বলতেই ভুলে গেছি। দেখেছো কে এসেছে?

দীপ্তি তাকালেন সূর্যর দিকে, আপনা আপনি তাঁর ভুরুটা কুঁচকে গেল। তিনি প্রথম পলকেই সূর্যকে চিনতে পারলেন না, কিংবা চিনতে চান নি। সূর্যর চোখে তাঁর চোখ থেমে রইলো।

শংকরবাবু বললেন, চিনতে পারলে না? এ তো আমাদের সেই সূর্য।

দীপ্তি আস্তে আস্তে বললেন, ও সূর্য? সত্যিই আমি চিনতে পারিনি। অনেক বদলে গেছ তুমি!

সূর্য বললো, কেমন আছেন, দীপ্তিদি?

শংকরবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো ভেতরে চলো। আজকের মতন আমার এখানে কাজ শেষ।

তিনি অন্তরঙ্গভাবে সূর্যর কাঁধে হাত রেখে বললেন, এসো! কত দিন পর তোমার সঙ্গে দেখা, অনেক গল্প করার আছে।

জেলখানায় থাকার সময় শংকরবাবু সূর্যর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেছিলেন, কারণ তিনি তখন দল বদলেছিলেন। এখন তিনি আবার এমন দলে এসেছেন, যেখানে সকলকেই উদার প্রশ্রয় দেওয়া যায়। নির্বাচনের পর বোঝা গেছে, ভারতে আসলে এখন একটিই দল আছে।

একতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে দোতলার প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দাতেই কয়েকখানা বেতের চেয়ার ও টেবিল পেতে একটা বসবার জায়গা। লম্বা দেয়ালে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের ছবি, মাঝখানে হঠাৎ বেখাপ্পাভাবে রবীন্দ্রনাথের।

চেয়ারে বসবার আগেই শংকরবাবু বললেন, সূর্য কিন্তু আজ এখানেই খেয়ে যাবে। দীপ্তি, তুমি ঠাকুরকে বলে দাও!

দীপ্তি বললেন, আচ্ছা। তিনি সূর্যকে নিজে থেকে আর কিছু বললেন না। সূর্যও ভদ্রতাবশত আপত্তি জানালো না।

দীপ্তি পরে আছেন একটা কালো পাড়ের সাদা তাঁতের শাড়ি। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, মাথায় কোঁকড়া চুল—সব কিছুই আগের মতন, শুধু পরিবর্তনের মধ্যে তাঁর সিঁথিতে সূক্ষ্ম সিঁদুরের চিহ্ন। হাত দুটি সম্পূর্ণ নিরাভরণ—হিন্দু সধবা মেয়েদের মতন এক গাছা নোয়া কিংবা রুলিও নেই। চেয়ারে বসে তিনি শান্তভাবে তাঁর উরুর কাছের শাড়ি প্লেন করলেন হাত দিয়ে, এটাও তাঁর পুরোনো অভ্যেস। মুখ তুলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?

সূর্য সংক্ষেপে উত্তর দিল, নানান জায়গায়।

শংকরবাবু বললেন, তোমার সঙ্গে লাস্ট দেখা হয়েছিল কবে যেন? দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি বলছি, নাইটিন ফরটি ফোর-এর জুলাইতে। তারপর আমি অন্য জেলে চলে গেলাম। তোমার অতুলদাকে মনে আছে? অতুলদা এখন কি করছেন জানো তো?

সূর্য মাথা ঝাঁকিয়ে জানালো, না।

শংকরবাবু আফসোসের সুরে বললেন, ভেরি স্যাড! মানুষটাকে সে সময় আমরা কত সম্মান করতাম। জেল থেকে বেরিয়ে উনি পলিটিক্স প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন, একটা আশ্রম করেছিলেন অনাথা মেয়েদের নিয়ে—তারপর এই বুড়ো বয়েসে একটা বিশ্রী মেয়েঘটিত কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়লেন। আমার কাছে এসেছিলেন, আমি অনেক চেষ্টা করেও কেসটা ছাড়াতে পারলাম না—এর মধ্যে আবার একটা অ্যাবর্শান আছে। উনিই যে জোর করে অ্যাবর্শান করিয়েছেন তার একেবারে অকাট্য প্রমাণ আছে।

শংকরবাবু দীপ্তিদির দিকে তাকিয়ে বললেন, ওসব আশ্রম-টাশ্রম করে যে কিছু

হয় না, তা আমি অনেকবার বলেছি।

সূর্য চুপ করে রইলো। অতুলদার কথা মনে পড়লো তার। ঋষিকল্প মানুষ ছিলেন, জেলের মধ্যে সকলেই ওঁকে শ্রদ্ধা করতো। আঁস্তাকুড়ের মধ্যে একটা লেবুগাছের চারাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ওঁর কি আপ্রাণ চেষ্টা ছিল, সূর্যকে সেই গাছটার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই মানুষ—

শংকরবাবু সূর্যকে বললেন, জলপাইগুড়ির আশ্রমে তোমার ওপর যে কি অবিচার করা হয়েছে, তা সবই শুনেছি। তখন যদি আমাকে একবার খবর দিতে! আমি খবর পেলাম আশ্রমটা উঠে যাবার পর। ওখানকার ব্যাড এলিমেণ্টসদের অবশ্য আমরা এখন একেবারে উৎখাত করে দিয়েছি!

শংকরবাবুর কথাবার্তা ও বিশ্বাসের মধ্যে একটা ক্ষমতার চিহ্ন ফুটে উঠছে। তিনি অনেক কিছু করতে পারেন। যেখানে যে বিপদে পড়েছে, তাঁর কাছে আসুক, তিনি সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন।

—তুমি আর কোনো পার্টিতে যোগ দাও নি? তোমাদের আগেকার পার্টি তো একেবারেই ভেঙে গেছে!

—না, আমি আর কোথাও যাই নি।

—আমার কি মনে হয় জানো! টেররিস্ট পার্টিগুলোকে একেবারে ভেঙে দেওয়া ঠিক হয়নি! যাঁরা এখনো বেঁচে আছেন, তাঁরাও অন্যান্য দলে ভিড়ে গেছেন। তার বদলে ওঁরা সকলে মিলে যদি আলাদা একটা দল গড়ে রাখতেন, তা হলে ডেফিনিটলি একটা ফোর্স থাকতো। আমি অবশ্য ঐ মতবাদ অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছি।

দীপ্তি বললেন, ওদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু দেশের স্বাধীনতা আনা। সেইজন্যই এখন আর ওদের আলাদা কোনো অস্তিত্বের দরকার নেই।

—সেইটাই তো ভুল হয়েছে। স্বাধীনতা চেয়েছিল ওরা—কিন্তু স্বাধীনতা পাবার পর কি প্রোগ্রাম হবে—তার কিছুই ঠিক ছিল না। তার মানেই আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল—কোনো দিনই ওরা ভাবেনি যে, সত্যিই একদিন স্বাধীনতা আসবে।

—কংগ্রেসেরও তো প্রোগ্রাম ছিল না।

—কংগ্রেস চট করে সেটা তৈরি করে নিতে পেরেছে। সবচেয়ে বড় কথা, কংগ্রেস দেশের মানুষদের বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে। টেররিস্টদের মধ্যে যারা মারা গেছে—লোকে তাদের ছবি বাঁধিয়ে ঘরে টাঙিয়ে রাখে। যারা বেঁচে আছে, তাদের কথা কেউ মনেও রাখেনি।

—তুমি ওদের টেররিস্ট বলো কেন? ওটা তো বৃটিশদের দেওয়া নাম।

—ঐ হলো। অন্য নাম দাও আর যাই দাও, আর একটা স্যাড ব্যাপারও আছে। ওদের মধ্যে অনেকে হিন্দু মহাসভা কিংবা এই ধরনের কমুনাল পার্টিতেও যোগ দিয়েছে। কেউ তো মার্কসবাদ পড়ে নি ভালো করে। শুধু ইমোশান দিয়ে কি আর...

সূর্য চুপ করে স্বামী-স্ত্রীর মত-বিনিময় শুনছিল। ওঁদের কথার মধ্যে তর্কের ঝাঁজ নেই—যেন পরস্পরের মতামতের স্বাধীনতা আগে থেকেই স্বীকৃত।

একটু বাদে শংকরবাবু বললেন, তা হলে সূর্য তুমি এখন কি করতে চাও? কিছু একটা কাজ-টাজ করতে হবে তো!

সূর্য বিনীতভাবে বললো, হ্যাঁ, কিছু তো করতেই হবে। সেইজন্যই তো আপনার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি।

শংকরবাবু তৃপ্ত হলেন। আর একজন পথভ্রষ্টকে তিনি পথ দেখাবেন। এই তো দেশের কাজ। তিনি দীপ্তির দিকে তাকিয়ে বললেন, সূর্যকে দিয়ে অনেক ভালো কাজ করানো যাবে! কি বলো? যাক্, ব্যস্ততার কিছু নেই, আস্তে আস্তে ভেবেচিন্তে তোমার জন্য ঠিক করা যাবে কিছু একটা কাজ। কলকাতায় তোমাদের সেই বাড়িটা এখনো আছে তো?

—হ্যাঁ।

—ঠিক আছে। নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে আমার সঙ্গে। আমি সব সময় না থাকলেও দীপ্তি তো আছেই, ও সাহায্য করবে তোমায়। তবে দাড়িটাড়িগুলো কামিয়ে ফেলো, কিরকম যেন বিদঘুটে দেখাচ্ছে তোমায়।

আর কিছুক্ষণ কথা বলে শংকরবাবু উঠলেন স্নান করার জন্য। তারপর সূর্যর সঙ্গে তিনি খেতে বসবেন। শংকরবাবুকে কথা বলার উৎসাহে পেয়ে বসেছে। গায়ে তেল মাখতে মাখতেও তিনি কথা বলতে লাগলেন সূর্যর সঙ্গে। তারপর তিনি বাথরুমে ঢুকে যেতেই দীপ্তি বললেন, সূর্য, তুমি ব'সো, আমি আসছি।

সূর্যও উঠে দাঁড়ালো।

দীপ্তি অবাক হয়ে বললেন, এ কি উঠছো কেন? ব'সো, তুমি তো এখানে খেয়ে যাবে।

সূর্য এক পা এগিয়ে গেল দীপ্তির দিকে। এখন তার মুখের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। চোখ দুটি অত্যন্ত চঞ্চল।

দীপ্তি এবার হুকুম করার ভঙ্গিতে বললেন, বললাম না তোমাকে বসতে? কোথায় যাচ্ছো?

সূর্য তবু এগিয়ে আসতে লাগলো দীপ্তির দিকে। যেন আকস্মিক কোনো আঘাত সামলাচ্ছেন, এইভাবে দীপ্তি মুখের সামনে একটা হাত তুললেন। তিনি আঘাতেরই প্রত্যাশা করেছিলেন বোধ হয়, কিন্তু সূর্য তাঁর একেবারে মুখোমুখি এসে চুপ করে দাঁড়ালো।

এই মুহূর্তটার জন্য কি দু'জনেই অপেক্ষা করে ছিল না? এতক্ষণ অন্য সমস্ত কথাই কি দূরাগত অর্থহীন শব্দের মতন নয়? অনেকদিন পর দু'জনে মুখোমুখি। দু'জনের দৃষ্টির কাছে সমস্ত ভাষা পরাজিত হয়ে যায়। কোথাও যেন কিছু একটা ঝনঝন করে ভেঙে যাচ্ছে।

হাতটা সরিয়ে নিয়ে দীপ্তি আস্তে আস্তে দুঃখিত নরম গলায় বললেন, সূর্য, তুমি কেন এসেছো?

সূর্য বললো, আসবার কথা ছিল না, তাই না?

—তুমি বলেছিলে, তোমার সঙ্গে আমার আর সারা জীবনে দেখা হবে না।

—আমি বলেছিলাম? হয়তো। আমি কথা রাখিনি।

—সূর্য, তুমি ফিরে যাও।

—কোথায়? কোথায় ফিরে যাবো? দীপ্তিদি, তুমিও কথা রাখো নি!

দীপ্তি আর কিছু না বলে দ্রুত চলে গেলেন রান্না ঘরের দিকে। সূর্য ফিরে গিয়ে ধপ করে চেয়ারে বসলো। তারপর এমন ভঙ্গিতে সিগারেট ধরালো, যেন এটাই তার নিজের বাড়ি।

শংকরবাবু স্নান সেরে এসে বললেন, এসো সূর্য, চট করে খেয়ে নেওয়া যাক্। সামান্য যা আছে—

সূর্য ভদ্রতা করেও আপত্তি জানালো না। হঠাৎ কারুর বাড়িতে উপস্থিত হবার পর ভাত খাবার আমন্ত্রণ পেলে মানুষ একবার অন্তত না বলে। সূর্য সঙ্গে সঙ্গে এসে খাবার টেবিলে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো।

শংকরবাবু বললেন, হাত-টাত ধোবে না?

—না, ঠিক আছে।

—নেমন্তন্নর দিন তুমি বাদ পড়ে গেছ, তোমাকে একদিন ভালো করে খাওয়াতে হবে। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে কোনো কাজ করতে চাও—কোনো একটা চাকরি-টাকরির তো ব্যবস্থা করা যেতেই পারে, তা ছাড়া যদি পার্টির কাজে তোমার আগ্রহ থাকে—আমার তো মনে হয়, পার্টির কাজেই অনেক বেশী থ্রিল আছে।

—আমি কিছু একটা করতে চাই।

—আচ্ছা, দু' এক দিন পরে ধীরেসুস্থে ভেবেচিন্তে একটা কিছু ঠিক করা যাবে।

শংকরবাবুর মুখে বেশ একটা সন্তুষ্ট ভাব ফুটে ওঠে। মানুষের উপকার করার ক্ষমতা আয়ত্তে এলে চমৎকার আরাম পাওয়া যায়।

দীপ্তি নিজেই খাবার পরিবেশন করলেন। খুবই সংক্ষিপ্ত ও অনাড়ম্বর খাদ্যসূচী। ভাত, নিম-বেগুন, ডাল, পেঁপেসেদ্ধ, ফুলকপির তরকারি এবং দই। মাছমাংস নেই। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই এখন নিরামিষাশী।

সাধারণ লোকে এখন মন্ত্রীদের জীবনযাত্রার বিলাসিতা নিয়ে অনেকরকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। বিরোধী দলগুলোর নীতিই হচ্ছে সরকারী দলের ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের চরিত্রহনন করা। তাদের সুনির্দিষ্ট প্রচারে সাধারণ লোকের ধারণা, মন্ত্রীরা সবাই টাকা চুরি করে, বাড়িতে সোনারুপো চিবিয়ে খায় এবং ডিস্ট্রিক্ট ট্যুর প্রোগ্রামের সময় ডাকবাংলোতে মদ ও মেয়েমানুষ নিয়ে ফূর্তি করে।

শংকরবাবু বললেন, মাছ মাংস ছাড়া সূর্যর নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে। দীপ্তি, ওকে একটা ডিম ভেজে দাও না।

দীপ্তি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে ডিম ভেজে দেবো?

সূর্য ঘাড় হেলিয়ে বললো, হ্যাঁ, দিন।

নিরামিষাশীদের বাড়িতে ডিমও থাকে না। লোক দিয়ে দোকান থেকে ডিম আনিয়ে ভেজে দিতে অনেক সময় লাগলো, সূর্যর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বসেই আছে খাবার টেবিলে। ডাল দিয়ে ভাত মেখে বসে আছে ডিম ভাজার প্রতীক্ষায়। শংকরবাবু নিজের খাবার শেষ করেও বসে রইলেন একটুক্ষণ। তারপর চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি ব্যস্ত লোক, খাবার টেবিলে বেশী সময় নষ্ট করতে পারেন না। একটু বাদে তিনি ভদ্রতা করে বললেন, তুমি যদি কিছু না মনে করো, তা হলে আমি উঠি? আমাকে আবার এক্ষুনি বেরুতে হবে তো—তুমি লজ্জা ক'রো না, ভালো করে খাও—

সূর্যর লজ্জা পাবার কোনো প্রশ্নই নেই। সে খুব মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছে। দীপ্তির হাতের রান্না বলেই তার এই উপভোগ। হয়তো দীপ্তি নিজের হাতে রাঁধেন নি, একজন ঠাকুর বা রাঁধুনী থাকাই সম্ভব, তবু তো পরিবেশন করছেন নিজে।

শংকরবাবু বললেন, দীপ্তি, আমার ব্যাগটা তা হলে গুছিয়ে দিও। আমি ততক্ষণ নীচে গিয়ে কাগজ-পত্তরগুলো—

দীপ্তি বললেন, আমি ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছি। আমিও তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি।

তাঁর স্বামী একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যাবে? তুমি কি করতে যাবে—মাত্র এক দিনের তো প্রোগ্রাম।

—না, আমিও ঘুরে আসবো ঠিক করেছি। ওদিকটায় কখনো যাইনি।

—এমন কিছু জায়গা নয়। তুমি বরং সূর্যর সঙ্গে গল্প-টল্প করো—এতদিন পরে এলো—

—সূর্য তো আবার আসবেই। আমি তোমার সঙ্গেই আজ যাবো।

শংকরবাবু নীচে নেমে গেলেন। দীপ্তি সূর্যকে জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য, তোমার আর কিছু লাগবে? আর একটু ভাত আর তরকারি নেবে?

সূর্য জিজ্ঞেস করলো, আপনি খাবেন না?

—হ্যাঁ, এবার বসছি।

দীপ্তি খেতে বসেও বারবার নানা অজুহাতে তাঁর পরিচারিকাকে ডেকে নানারকম ফরমাশ করতে লাগলেন। স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি সূর্যকে বেশী কথা বলার সুযোগ দিতে চান না।

সূর্য এক দৃষ্টিতে দীপ্তির দিকে তাকিয়ে আছে তো তাকিয়েই আছে। তার বিমর্ষ মুখখানি দেখলে মনের কথা কিছুই বোঝা যায় না। যে নারীটি তার সামনে বসে আছে, এক সময় দিনের পর দিন সূর্য তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে থেকেছে। এমনও দিন গেছে, যখন চব্বিশ ঘণ্টাই তারা কাটিয়েছে এক ঘরে। ওই নারীর নগ্ন শরীরটিও তার চেনা—যে শরীরে রয়েছে তার নিজস্ব প্রিয় আগুন কিংবা শান্তি কিংবা অমৃত। এখন তার সঙ্গে কথা বলতে হবে, অল্প-চেনার মতন। অদূরে দেখা যায় দীপ্তির শয়নকক্ষ, দরজা খোলা, শুভ্র চাদর পাতা বিছানা—ওই বিছানায় এই নারী এখন অপর পুরুষের সঙ্গে শোয় প্রতি রাত্রে। এখন দীপ্তি তাকে এড়াবার জন্যই শুধু স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে রানাঘাট বা বনগাঁর মতন কোনো অকিঞ্চিৎকর জায়গায়।

সূর্য একটা নিশ্বাস ফেলে বললো, আমি হঠাৎ এসে পড়ায় তুমি খুব বিরক্ত হয়েছো, তাই না?

দীপ্তি শুকনো ভদ্রতার সুরে বললেন, না বিরক্ত কেন হবো?

—তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে—

—তখন সেটাই একমাত্র পথ ছিল।

—তুমি বলেছিলে, তুমি কখনো বিয়ে করবে না। যে-সব মেয়েরা বিয়ে করে সুখে-শান্তিতে থাকে, তুমি কিছুতেই তাদের মতন হতে পারবে না।

—জীবন বড় নিষ্ঠুর। মানুষ যা ভাবে, কিছুতেই তা শেষ পর্যন্ত ঠিকঠাক মেলে না। বড়মামা মারা গেছেন, তুমি শুনেছো বোধ হয়!

—ওঁর যথেষ্ট বয়েস হয়েছিল।

—তবু শরীর ভালো ছিল যথেষ্ট। জলপাইগুড়ির ছেলেরা ওঁকে উত্ত্যক্ত করে মারতো, তবু উনি একটুও ভেঙে পড়েননি, কিন্তু নিয়তি যে কখন কোন্ দিক দিয়ে ছোবল দেয়! ওঁকে সাপে কামড়েছিল।

সত্যেন গুহকে সূর্য বেশ পছন্দই করতো। কিন্তু তাঁর অপঘাতে মৃত্যুর সংবাদ শুনেও সে কোনো দুঃখ প্রকাশ করলো না, চুপ করে রইলো। মনে হয় যেন সে খুব অন্যমনস্ক।

দীপ্তি আবার বললেন, বড়মামার মৃত্যুর পর আমি আর কিছুতেই আশ্রমটাকে বাঁচাতে পারলাম না। অনেক চেষ্টা করেছিলাম। আশ্রমটাও ভেঙে যাবার পর আমি এই পৃথিবীতে একা হয়ে গেলাম। তখন কেউ আমাকে খুঁজতে আসেনি। আমি অন্ধের মতন এদিক-ওদিক হাতড়ে একজন কারুকে খুঁজেছি। দুঃখের সময় মেয়েরা কিছুতেই

একা থাকতে পারে না।

—কলকাতা ছেড়ে তুমি ওই আশ্রমে পালিয়ে গিয়েছিলে কেন? ওটা কি তোমার জায়গা?

—হ্যাঁ। আমি এরকম কোনো একটা জায়গাতেই থাকতে চেয়েছিলাম। তা হলে আমি শান্তিতে থাকতে পারতাম। কিন্তু কেউ আমাকে থাকতে দিল না। মানুষের অনেক আশাই মিথ্যে হয়ে যায়।

—এটাও মিথ্যে!

—কোন্‌টা?

—এই যে তোমার এই বিয়ে—

দীপ্তি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে খানিকটা কৈফিয়তের সুরে বললেন, তোমাদের শংকরদা বারবার আমাকে স্নেহ করতেন। আমার অনেক বিপদ-আপদে উনি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আশ্রমটা উঠে যাবার পর আমি যখন একেবারে ভেঙে পড়েছিলাম, তখন উনিই আমাকে খুঁজে বার করেন. আমি ডাকিনি, উনি নিজেই গিয়ে আমাকে সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এমন কি, আশ্রমটা আবার গড়ে দেবার কথাও বলেছিলেন, কিন্তু তখন সেটা আর সম্ভব ছিল না। একা ওই আশ্রম চালানো যে আমার পক্ষে অসম্ভব তা বুঝে গিয়েছিলাম। উনিও বুঝেছিলেন, একটা কোনো কাজের মধ্যে ডুবে পড়তে পারলেই আমি আবার সুস্থ-স্বাভাবিক হতে পারবো। তাই আমাকে এনে জুড়ে দিলেন এখানকার নারীমঙ্গল সমিতির সঙ্গে। তুমি তো জানোই, কোনো একটা কাজ ছাড়া আমি কিছুতেই ঠিক থাকতে পারি না। আর এ-দেশে কোনো একজন পুরুষ যদি একজন মেয়েকে কিছু সাহায্য করে, তা হলেই নানারকম কথা ওঠে। ওইরকম কথা শুনে শুনে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আগেকার মতন আর অগ্রাহ্য করতে পারি না, সে জোর নেই—তাই দু'জনেই ঠিক করলাম, বিয়ে করাটাই—

সূর্য আবার সেই একই সুরে বললো, না, এটা মিথ্যে!

—সূর্য, আমি এখন খুব ভালো আছি।

—আমি ভালো নেই।

দীপ্তি একটু যেন কেঁপে উঠলেন। সূর্য তাঁকে হারিয়ে দিয়েছে, কারণ সে স্পষ্ট বলতে পারে, আমি ভালো নেই। তিনি কথাটা ঘোরাবার জন্য জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তো বললে না, এতদিন কোথায় ছিলে?

সূর্য বললো, আমি কোথাও স্থির হয়ে থাকতে পারলাম না। অনেক চেষ্টা করেছি, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দেবার পর সারা ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে একটা আশ্রয় খুঁজেছি। গোয়ালিয়ারে একটা মেয়ের কাছে ছিলাম। আমার মায়ের নামে তার নাম। ভেবেছিলাম তাকে নিয়েই আর সব কিছু ভুলে থাকবো, কিন্তু সে-ও আমাকে ছেড়ে গেল। তোমার কাছে ফিরে আসাই আমার নিয়তি।

—তোমার সব কিছু আবার কি ঠিক হয়ে যাবে। তুমি যদি একটা কাজ-টাজের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে নাও—এই দেশের কোনো না কোনো কাজের মধ্যে আমাদের থাকতেই হবে—আমরা দূরে গিয়ে কিছুতেই বেশী শান্তি পেতে পারি না—

—দীপ্তিদি, চন্দননগরের সেই বাড়িটার কথা তোমার মনে আছে? যেখানে তোমাকে প্রথম আমি দেখেছিলাম?

—কেন মনে থাকবে না?

—সেখানে তোমাকে আমি বিবাহিতা মহিলা হিসেবেই জানতাম। আসলে সেটা ছিল মিথ্যে। তোমরা নকল স্বামী-স্ত্রী সেজে থাকতে। সেইরকম এটাও মিথ্যে।

—সূর্য, কি বলছো তুমি?

—আমি ঠিকই বলছি।

—তোমার মাথার ঠিক নেই। তুমি এবার ওঠো তো!

সূর্য টেবিলে একটা চাপড় মেরে কড়া গলায় বললো, না মিথ্যে মিথ্যে! আমি বলছি, এটাও মিথ্যে!

॥ ৮৬ ॥

হিমানী বললেন, তুই আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর!

বাদল এসে হাঁটু গেড়ে বসলো খাটের পাশে। হিমানীর হাতের ওপর হাত রেখে বললো, মা, এই তো আমি তোমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, আর এক মাসের মধ্যে আমরা অন্য বাড়িতে উঠে যাবো। সূর্যদার বাড়িতে আর থাকবো না।

—বাড়ি খুঁজে পাবি?

—হ্যাঁ, ঠিক পেয়ে যাবো। আজ থেকেই খুঁজতে শুরু করছি।

—বাদল আমি আর বেশীদিন বাঁচবো না রে। শেষ কটা দিন আমাকে একটু শান্তি দে। আমার নিজের মনের মতন আলাদা একটা বাড়ি, নিজের সংসার—সারা জীবনে কখনো পেলাম না। তুই এবার বিয়ে করবি না?

—এখনো সময় হয় নি।

—আর দেরি করিস না। আমাকে দেখে যেতে দে। আমিই এবার রেণুকে বলবো। হ্যাঁ রে, রেণুর মা নাকি ওর অন্য কোথায় বিয়ে দেবার চেষ্টা করছে?

—কে বললো তোমায়?

—বিছানায় শুয়ে থাকলেও অনেক কথাই আমার কানে আসে। কিন্তু রেণু লক্ষ্মী মেয়ে, ও কক্ষনো অন্য কোথাও বিয়ে করতে রাজি হবে না। রেণু ঐ সুথ্যিটার সঙ্গে এত মেলামেশা করে কেন? তুই বারণ করতে পারিস না? আজই বারণ করে দিবি।

—আচ্ছা।

হিমানী আপন মনেই বলতে লাগলেন, কতদিন মেয়ে-জামাইকে ডাকতে পারিনি। নিজের একটা বাড়ি, সেখানে মেয়ে-জামাই আসবে, নাতি-নাতনী, ছেলে-ছেলের বউ থাকবে পাশে—মানুষ এইটুকু সুখ চায়, আমি তাও পেলাম না।

—মা, এবার তুমি সব পাবে।

—আলাদা সংসার হলে তুই খরচ চালাতে পারবি?

—পারবো। দুটো টিউশানি নিয়েছি!

বাদল মায়ের মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। হিমানীর মুখের রংটা যেন কেমন বদলে গেছে। ঠিক ফ্যাকাসে নেই আর, বরং খানিকটা অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল। কোনো সন্দেহই নেই মৃত্যু খুব কাছে এসে গেছে। আগে মায়ের গুরুতর অসুখের সময়ও বাদলের এ কথা মনে হয়নি, কিন্তু এখন সে চিনতে পারছে মৃত্যুর ছায়া। মৃত্যু পথযাত্রিণীকে যে-কোনো মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া যায়, এতে কোনো পাপ

নেই। ভোগ করার জন্য যে বেঁচে থাকবে না, তার জন্য স্তোক বাক্যই তো যথেষ্ট।

মনের অনেক অনেক ভেতরে যেখানে কোনো প্রশ্ন পৌঁছোয় না, সেখানে বাদল টের পেয়ে গেছে যে তার মা-বাবা দু'জনেই আর বেশী দিন থাকবেন না। কিছুদিনের মধ্যেই সে একা হয়ে যাবে। এই উপলব্ধি তাকে বিষণ্ণ করে না, বরং যেন একটা স্বস্তি দেয়। সে কি সন্ন্যাসীর মতন একা হয়ে যেতেই চাইছে না? রেণুও সেখানে নেই, তাই সে একাকীত্ব এত বিশাল। নিজেও সে অনুভবের মধ্যে বিশাল হয়ে ওঠে, অহংকারীর মতন উঁচু করে মাথা, একাকীত্বে সে স্রষ্টা হতে পারে। বাদলের সাজপোশাকে কোনো আড়ম্বর নেই, চেহারায় কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবার মতন মানুষ, তবু সাংসারিক বন্ধন কেটে যাবার উপক্রম হওয়ায় সে মনে মনে গিয়ে দাঁড়ায় এক আদিগন্ত নির্জনতার মধ্যে, তার চিত্ত প্রশান্ত হয়ে যায়, কিছুই চাইবার কিংবা ত্যাগ করার নেই বলে সে অত্যন্ত শক্তিমান মনে করে নিজেকে। অসুস্থ মায়ের খাটের পাশে বসে বাদল হঠাৎ আপন মনে একটু হাসে।

রেণুর সঙ্গে দেখা হয় পরদিন সকালবেলা। বাদল তখন বেরোচ্ছিল, সিঁড়িতে পা দিয়েছে, নীচে দেখলো রেণুকে। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে থমকে দাঁড়ালো। বিদ্যুৎ চমকের মতন একটা কথা তার মনে আসে। রেণুদের বাড়িতে সে বহুবার রেণুকে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। সেই ছেলেবেলা থেকে। রেণুর কথা ভাবলেই একটা সিঁড়িতে দাঁড়ানো মূর্তির ছবি তার চোখে ভাসে। কখনো ফ্রক পরা, কখনো শাড়ী। সিঁড়ির ওপর থেকে যেন ঝাঁপ দিয়ে উড়ে এসেছে তার কাছে। আজ রেণু নীচে দাঁড়ানো, সে সিঁড়ির ওপরে। এর কি কোনো তাৎপর্য আছে? কিছুই না, তাত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার—তবু এই সব নিয়েই বাদল চিন্তা করে।

রেণু জিজ্ঞেস করলো, তুমি বেরুচ্ছো?

বাদল বললো, হ্যাঁ।

—খুব জরুরি কোনো কাজ আছে?

—হ্যাঁ, একটু।

বাদল কি আগে বহুবার বলে নি যে রেণুর সঙ্গে দেখা হলে পৃথিবীতে তার আর কোনো কাজ থাকে না! তা ছাড়া সে এমন কি কাজের মানুষ, যাতে তার জরুরি কাজ থাকবে? তবু এ কথা সে কেন বললো, নিজেই জানে না।

এই সময় ওপরের সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হলো। বাদল দেখলো সূর্যদা নেমে আসছে। সে পথ দেবার জন্য একটু দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালো।

রেণু সূর্যকে জিজ্ঞেস করলো, আপনিও এক্ষুনি বেরুচ্ছেন?

সূর্য বললো, হ্যাঁ।

—একটু দাঁড়ান না, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা দরকারি কথা আছে।

—আমার সঙ্গে আবার কি কথা?

—দশমিনিট সময় দিতে পারবেন না?

রেণু বাদলকে থাকবার জন্য বলে নি, সূর্যকেই একটু অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করছে। এ জন্য কি বাদল দুঃখিত হবে? বাদল জানে, রেণু বিশেষ কিছু চিন্তা করে কথা বলে না। যত রাজ্যের চিন্তা শুধু বাদলেরই মাথায়।

বাদল একবার ভাবলো, রেণুকে সে বলবে, তুমি আমার সঙ্গে বড় রাস্তা পর্যন্ত চলো, যেতে যেতে তোমার সঙ্গে কথা বলবো। শুধু বড় রাস্তা কেন, বাদল রেণুকে সঙ্গে নিয়েই যেতে পারে তার জরুরি কাজে, অর্থাৎ ডাক্তারখানায় কিংবা পার্কে কিংবা

চায়ের দোকানে। এইভাবে সে রেণুকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে সূর্যদার কাছ থেকে। সে তো পারেই। সে একদিন দেখেছিল, রেণু সূর্যদার বাহু চেপে ধরে মিনতি করছে। রেণু ছেলেমানুষ, সে সূর্যদাকে ভালো করতে চায়। রেণুকে কি ঠিক সময় সাবধান করে দেওয়া উচিত নয়?

বাদল রেণুকে কিছুই বললো না। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো সূর্যদার দিকে। হঠাৎ সে দারুণ চমকে উঠলো। সূর্যদার মুখের রংটাও বদলে গেছে না? অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল, ঠিক যেমন বাদল তার মায়ের মুখের রং বদলাতে দেখেছে! না, না, না, এই দু'জনের মধ্যে কোনো মিল থাকতেই পারে না। সূর্যদা দীপ্তিদির সন্ধান পেয়ে গেছে, তাই উত্তেজনায় তার মুখ চোখ অন্যরকম, বাদল তাই ভুল দেখেছে।

বাদল সূর্যকে কিছুই বললো না। সূর্য একদিন খুব অপমান করার পর বাদল তার সঙ্গে কথা বন্ধ রেখেছে। সে হালকা গলায় রেণুকে বললো, তুমি গল্প করো, আমি তা হলে বেরুচ্ছি, অ্যাঁ?

তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল সে। রেণু তার পাশ দিয়ে ওপরে উঠে এলো।

রেণু সূর্যকে বললো, আপনি আপনার ঘরে চলুন।

রেণুর কন্ঠস্বর পরিষ্কার, তার কথা আদেশের মতন। সে যা ভালো বোঝে, সেটাই জোর দিয়ে বলে। অন্য কে কি ভাবলো না ভাবলো, গ্রাহ্যই করে না।

সূর্য খানিকটা বিস্মিত, খানিকটা বিরক্তভাবে বললো, কেন?

রেণুর হাতে একটা ব্রাউন কাগজের প্যাকেট, সেটা এগিয়ে দিয়ে বললো, আপনার জন্য একটা জামা এনেছি, চলুন একবার পরে দেখবেন, আপনাকে ঠিক ফিট করেছে কিনা।

—জামা? আমার জন্য? কেন?

—আমি ক'দিন ধরেই আপনার একটা জামা কেনার কথা ভাবছিলাম।

—তুমি আমার জামা নিয়ে ভাবছিলে?

—আপনি সব সময় এই রকম একটা বিচ্ছিরি, নোংরা জামা পরে থাকেন কেন? আপনার বুঝি আর জামা নেই? আমি যে কদিন এসেছি, এই একটাই জামা দেখেছি।

—দরকার হলে আমি কি জামা কিনতে পারি না! তোমার কাছ থেকে নেবো কেন?

—কেন, আমি দিলে নেওয়া যায় না? পরে দেখুন, ঠিক হয়েছে কিনা, না হলে আজই বদলে আনবো।

—আমার সময় নেই।

রেণু সূর্যর হাত ধরে টান দিয়ে ধমকের সুরে বললো, একটা জামা পরে দেখারও সময় নেই? আসুন আমার সঙ্গে। এই দাড়ি গোঁপের জঞ্জালও কেটে ফেলতে হবে আজ।

রেণুর পথটাই ঠিক। সূর্য যদি রেণুর কথা শুনে ওপরে উঠে আসতো, তবে তার জীবন অন্যরকম হতে পারতো। কিন্তু তার মুখের রং বদলে গেছে, সে চলে যাবেই। সে রেণুর কাঁধ আঁকড়ে ধরে নিষ্ঠুরের মতন বললো, দ্যাখো খুকি, তুমি আর এ রকম কক্ষনো করবে না! আমি তোমার জন্য নয়!

স্বচ্ছ দিঘির জলে একটা একটা বিরাট পাথর পড়েছে যেন। রেণু কেঁপে উঠে বললো, এ কি বলছেন আপনি?

—আমি তোমার জন্য নই।

—কে আবার কার জন্য?

—আমার নিয়তি ঠিক হয়ে গেছে। তুমি আমার চোখের সামনে কখনো আর এসো না, তা হলে তোমাকে আমি ধ্বংস করে ফেলবো।

রেণুর কাঁধটা সূর্য প্রায় খামচে ধরে আছে। রেণু শান্ত গলায় বললো, আপনি আমায় ছেড়ে দিন, আপনি পাগল হয়ে গেছেন।

সূর্য তবু রেণুকে ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললো, আমি চাই না, আমি আর কারুকে চাই না, আমার কাছে কক্ষনো আসবে না—

রেণুর হাত থেকে জামার প্যাকেটটা নিয়ে সে ছুঁড়ে ফেলে দিল সিঁড়ির নীচে। চিররঞ্জন ঠিক সেই সময় বাড়িতে ঢুকছিলেন, জামাটা আর একটু হলে তাঁর গায়ে লাগতো। এই দৃশ্যের মধ্যে এসে পড়ে তিনি চোরের মতন সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়ালেন। লজ্জায়, রাগে কেঁদে ফেললো রেণু। সেদিকে আর না তাকিয়ে সূর্য হনহন করে বেরিয়ে গেল।

বরানগরের বাড়িতে গেটের সামনে দাঁড়াতেই একজন পুলিশ সূর্যকে জানালো যে শংকরবাবু বা দীপ্তি কেউই বাড়িতে নেই। সূর্য প্রত্যেকদিনই আসে বলে প্রহরীরা তাকে চিনে গেছে। তারা এ কথাও বললো, যে পি এ বাবু অবশ্য আছেন, সূর্য ইচ্ছে করলে বসতে পারে।

সূর্য ভেতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে রইলো বারান্দায়। মন্ত্রীমশাই কখন ফিরবেন তার ঠিক নেই, কিন্তু দীপ্তি স্কুল ছুটি হলে ফিরবেনই। দীপ্তি কিছুতেই তাকে একা কথা বলার সুযোগ দিচ্ছে না।

এক সময় রাখাল চট্টরাজ তাকে দেখতে পেয়ে বললো, আরে, আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এসে বসুন!

তার মালিকের সঙ্গে সূর্যর কি সম্পর্ক তা রাখাল চট্টরাজ এখনো ঠিক বুঝতে পারে নি, কিন্তু যেহেতু সূর্য দোতলায় উঠে যায়, তাই তাকে একটু খাতির দেখাতেই হয়।

সূর্য বললো, না, আমি এখানেই ঠিক আছি।

—আপনার কি শরীর অসুস্থ নাকি?

—না।

—মুখ চোখ কি রকম যেন দেখাচ্ছে। চা-টা কিছু খাবেন?

—না।

রাখাল চট্টরাজ একটা দুর্বোধ্য মুখভঙ্গি করে আবার নিজের ঘরে ফিরে গেল। সূর্য সম্পর্কে তার কৌতূহল বাড়ছে। লোকটা আলাপ করতে গেলেও একটা আধটার বেশী কথা বলে না।

সরকারী গাড়িতে শংকরবাবু দীপ্তিকে সঙ্গে নিয়েই ফিরলেন। সূর্যকে দেখে বললেন, কতক্ষণ এসেছো। শোনো, তোমার জন্য একটা কাজ ঠিক করেছি। দীপ্তি, তুমি সূর্যকে নিয়ে ওপরে যাও, আমি নীচে কাগজ পত্তরগুলো একটু দেখে আসছি।

দীপ্তি বললেন, তোমাকে এখন আর কাগজপত্র দেখতে হবে না। ওপরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নেবে চলো।

—আমি তো ক্লান্ত হইনি।

—এক ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা করলে, তারপর এক্ষুনি ফিরে এসে কাজ নিয়ে আর বসতে হবে না। আবার তো বিকেলেই বেরুতে হবে।

শংকরবাবু হেসে বললেন, ঠিক আছে, চলো তা হলে, সূর্যর সঙ্গেই কাজের কথাটা

সেরে ফেলা যাক্।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তিনি নীচু গলায় সূর্যকে বললেন, সি ডি পি-তে একটা ভালো কাজ খালি আছে, তুমি নেবে?

সূর্য জিজ্ঞেস করলো, সি ডি পি কি?

—কম্যুইনিটি ডেভেলাপমেণ্ট প্রজেক্ট। মাইনে ভালোই, কাজটাও খারাপ না।

—চাকরি?

—তোমার বুঝি চাকরি করতে ইচ্ছে করে না? স্বাধীন দেশের সরকারী কাজটাও এক হিসেবে দেশেরই সেবা করা।

—শংকরদা—

কিছু বলতে গিয়েও সূর্য থেমে গেল। শংকরবাবু একটুক্ষণ উৎসুক ভাবে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। তরপর জিজ্ঞেস করলেন, কি, বলো?

—আপনি কি সুখী?

—তার মানে?

—আপনি কি সত্যিই ভাবছেন, আপনি দেশের জন্য কিছু করতে পারছেন?

—এ কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?

—আমি তো সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার এখানে পরপর কয়েকদিন এসে আমার কি রকম খটকা লাগছে। আমাদের আমলের লোকেরা সত্যি কি করছে দেশের জন্য? তারা তো কেউ ভণ্ড ছিল না।

—আমার যতটা সাধ্য আমি তা করছি। এক একটা রাতে আমার ঘুম আসে না। দীপ্তি জানে, আমি মাঝরাত্রে জেগে উঠে বসে থাকি। আমি ভাবি, এই দেশের এত সমস্যা, ভাষার সমস্যা, ধর্মের সমস্যা, সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো মানুষকে দু'বেলা দুটো খেতে দেওয়া—কি করে এর সমাধান হবে—তবু আমাদের যার যতটুকু সাধ্য—

শংকরবাবুর মুখে একটা আন্তরিক দুঃখের ছায়া পড়ে, কিন্তু সূর্যর মুখে স্পষ্ট বিদ্রূপ।

—শংকরদা এটা কি স্বাধীন দেশ? এ দেশের মানুষ কি পেয়েছে?

—আরে, আস্তে আস্তে সব হবে। এটা একটা শিশু রাষ্ট্র, মাত্র ছ' বছর বয়েস।

—যুদ্ধে যে-সব দেশ ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল, যেমন জার্মানি, জাপান, চীন—তারা এই কয়েক বছরেই—

—আমাদের দেশটার সমস্যা আরও অনেক জটিল।

কথা বলতে বলতে ওরা দোতলার বারান্দায় এসে বসে। শংকরবাবু বিশ্রাম নেবার ভঙ্গিতে ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পা ছড়িয়ে দিয়েছেন। দীপ্তি তিনটি গেলাসে লেবুর সরবৎ বানাচ্ছেন! সূর্য দীপ্তির দিকে একবারও তাকায় নি, সে তীব্র চোখে চেয়ে আছে শংকরবাবু দিকে। সে আবার বললো, শংকরদা, সেই দিনের কথা আপনার মনে আছে? খিদিরপুরে সিয়াজুল তারিখ সাহেবের দোকান ঘরে বসে আপনি আমাকে বিদ্রূপ করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি অ্যাকশনে যেতে ভয় পাবো কিনা? আমি ভয় পাই নি। আমি এখনো তৈরি আছি, আপনি আমাকে আবার অ্যাকশনে পাঠান।

শংকরবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন তুমি কি স্বপ্নের ঘোরে আছো নাকি? সে সব দিন কবে চুকে বুকে গেছে! এখন অ্যাকশন বলতে কি বোঝাচ্ছো তুমি? এখন কি খুনোখুনির সময়? এখন দেশ গড়ার সময়।

—না, এখন ভাঙার সময়।

—কি ভাঙবে?

—কুমীরের বাসা। যে সব কুমীররা দেশের সব কিছু গিলে গিলে খাচ্ছে, তাদের বাসাগুলো আগে চুরমার করে দিতে হবে!

—এ সব শস্তা কথা। অ্যাকচুয়াল কাজ হাতে নিয়ে আমরা দেখছি...

—আপনারা কোনো কাজই হাতে নেন নি। আপনারা শুধু পারমিটের কারবার করছেন।

দীপ্তি মৃদু গলায় বললেন, সূর্য, তুমি বড্ড জোরে কথা বলছো। চ্যাঁচামেচি করলেই সব কিছুর সমাধান হয় না। তাছাড়া তুমি তো রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে না, তুমি তো সব ছেড়ে দিয়েছিলে।

—তা হলে শংকরদারও ছেড়ে দেওয়া উচিত।

শংকরদা হাত উঁচু করে দীপ্তিকে থামার ইঙ্গিত করে বললেন, শোনো সূর্য, গণ-তন্ত্রে পার্টিই প্রধান। পার্টিকে শক্ত না করতে পারলে কোনো কাজই করা যায় না। তুমি একবার পার্টিতে ঢুকে দেখো, সবাইকে সামলে কাজ করা কত শক্ত। বিধানবাবু পর্যন্ত সব সময় পার্টিকে সামলাতে পারেন না। যাই হোক, তুমি কি কাজ করতে চাও সেটা বলো। তোমার জন্য আমি কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবো।

—আমি ফাইটার। আমি লড়াই করতে চাই।

—কি মুশকিল, এখন কার সঙ্গে লড়াই করবে? হাওয়ার সঙ্গে? পুরোনো সে সব কথা মাথা থেকে একেবারে তাড়িয়ে দাও! সে আমলে দু' চারটে খুনোখুনি করে আমরা দেশের কি উপকার করতে পেরেছি?

—জানি, এই কথাই এখন আপনারা বলবেন। সেই জন্যই হরদা, ব্রজগোপালদা, যোগানন্দ—এদের নামও কেউ আজকাল উচ্চারণ করে না। ওরা জীবন নষ্ট করেছে।

—তুমি এখনো তোমার জীবনটা অন্তত ঠিক করতে পারো—

—চাকরি নিয়ে?

—তা হলে কি করতে চাও? বেশ তো গ্রামে যাও না—

—শংকরদা, আপনি হাতের আঙুল কেটে এক সময় প্রতিজ্ঞা করেন নি?

দীপ্তি আবার বাধা দিয়ে বললেন, এসব এখন থাক।

শংকরবাবু প্রশ্রয়ের সুরে বললেন, আহা কি বলতে চায়, বলুক না। ছেলেটা আজ বড্ড রেগে আছে।

সূর্য হঠাৎ চুপ করে গেল। তারপর সে একটা দুঃসাহসিক কাজ করলো। সিগারেট ধরিয়ে দূরের অ্যাশট্রেতে দেশলাইয়ের কাঠিটা ফেলার ছলে উঠে গিয়ে দীপ্তির কাঁধে হাত রাখলো। দু'এক মুহূর্তের জন্য। দীপ্তি একেবারে শিউরে উঠলেন। শংকরবাবুর মুখটা তখন অন্যদিকে ফেরানো ছিল, তিনি কিছুই টের পেলেন না।

দেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে করতে সে কোনো অতর্কিতে উঠে এসে দীপ্তিকে স্পর্শ করে, তা ঠিক বোঝা যায় না। হয়তো এই বিশাল দেশটির মর্ম সে এখনো ঠিক বুঝতে পারছে না বলেই দীপ্তিকে ছুঁয়ে সে বাস্তবে ফিরে আসে। শংকরবাবু এই দেশ এবং দীপ্তি নামক এই নারী—দু'জনের ব্যাপারেই বেশ নিশ্চিন্ত এবং তৃপ্ত—আর সূর্যর চোখে বিশাল মরুভূমির মতন অতৃপ্তি হা হা করে জ্বলে।

শংকরবাবু একটা হাই তুলে বললেন, আজ বিকেলেই নদীয়ায় যেতে হবে। কৃষ্ণনগরে একটা কনফারেন্স আছে কাল সকালে।

সূর্য সঙ্গে সঙ্গে বললো, আমাকেও সেখানে নিয়ে চলুন।

—তুমি যাবে? তুমি গিয়ে কি করবে?

—এমনিই যাবো।

—জরুরি সব সরকারী কাজ, তার মধ্যে তুমি, মানে তোমারই ভালো লাগবে না।

দীপ্তি মাথা নেড়ে বললেন, না, তা হয় না। আমাদের ওখানে তিন চারদিন থাকতে হতে পারে।

নীচ থেকে একজন পরিচারক এসে শংকরবাবুর হাতে একটা স্লিপ দিল। দু'জন এম এল এ এসেছেন দেখা করতে, এঁদের বসিয়ে রাখা যায় না। শংকরবাবু ব্যস্ত সমস্ত হয়ে নেমে গেলেন।

শংকরবাবু যাবার সঙ্গে সঙ্গে দীপ্তিও উঠে দাঁড়িয়েছেন। গম্ভীরভাবে তিনি বললেন, সূর্য, তুমি রাজনীতি নিয়ে আর আলোচনা করো না। ওসব তোমার জন্য নয়। তোমার মাথা গরম। তুমি তো ওসব ছেড়েই দিয়েছিলে।

—হ্যাঁ দিয়েছিলাম।

—তা হলে আবার...

—এখানে কয়েকদিন এসে আবার বুঝতে পারলাম তো, কি সব কান্ডকারখানা চলছে।

—তা হলে এখানে আর না আসাই ভালো—

—এখানে আসবো না? আমি কোথায় যাবো।

—তা তুমিই জানো।

—তুমি আমাকে এখানে আসতে বারণ করছো?

—সূর্য, আমরা শান্তিতে আছি, কেন তুমি তা ভেঙে দিতে চাও।

—হ্যাঁ, আমি ভেঙে দিতেই এসেছি। সবাই সব কিছু পাবে, আর আমি বুঝি কিছুই পাবো না? আর আমি আমার অধিকার ছাড়বো না।

—কি তোমার অধিকার?

—আমি তোমাকে চাই, অথবা শংকরদাকে চাই। তোমরা এক সঙ্গে কিছুতেই থাকতে পারবে না। কিছুতেই না।

—এ সব কি বলছো পাগলের মতন?

—মোটেই পাগলের মতন নয়। আমরা হরদার সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম দেশের জন্য প্রাণ দেবো। রাইটার্স বিল্ডিংস-এর গদিতে বসে বাবুগিরি করার তো কথা ছিল না! এক সময় আমি ভেবেছিলাম, দেশের স্বাধীনতা এলেই আমাদের কাজ শেষ। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, স্বাধীনতা আজও আসে নি, নানা চক্রান্তের জালে মানুষকে আরও বেঁধে ফেলা হচ্ছে। আমি শংকরদাকে ঐ গদি থেকে টেনে নামাবো।

—তুমি এখনও ছেলেমানুষ আছো। তুমি কিছুই পারবে না। আমার স্বামী সত্যিই খাঁটি লোক, তিনি তাঁর মতন এদেশের উন্নতির জন্যই কাজ করে যেতে চান। তিনি যে তোমার সঙ্গে এতটা ভালো ব্যবহার করছেন...

—ভালো ব্যবহার নয়, দয়া করছেন, কৃপা করছেন। উনি তোমাকে কেন কেড়ে নিয়েছেন আমার কাছ থেকে?

—কেড়ে তো নেন নি? আমি স্বেচ্ছায়—

সূর্য চিৎকার করে উঠলো, দীপ্তিদি—।

তারপর চোখ বুজে রইলো কিছুক্ষণ। তার সেই চিৎকার নিশ্চয়ই নীচতলা থেকে শুনতে পাওয়া গেছে। তবু শংকরবাবু তৎক্ষণাৎ উঠে এলেন না।

সূর্য চোখ খুলে ধীর স্বরে বললো, তোমার স্বামী যদি এই সব মন্ত্রিত্ব ফন্ত্রিত্ব ছেড়েছুড়ে না দেন, তাহলে ওঁকে আমি খুন করবো। নিশ্চিত খুন করবো—এ বিষয়ে মনে কোনো সন্দেহ রেখো না।

দীপ্তি কেঁপে উঠলেন। কয়েক পা এগিয়ে এসে ব্যাকুলভাবে বললেন, তুমি এসব কি বলছো? সূর্য, আমার দিকে তাকাও—

দীপ্তি ভয় পেয়েছেন। সূর্যকে তিনি ভালোভাবেই চেনেন। সে একটা গোঁয়ার, এ রকম কিছু করে ফেলা তার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। দীপ্তি সূর্যর পিঠে হাত রাখলেন।

সামান্য একটা ছোঁয়ায় কি হয় মানুষের? শান্ত শরীরে হঠাৎ কেন মনে হয় এত লক্ষ লক্ষ স্নায়ু সত্যিই ছিল। এত শান্তি, এত আকাঙ্খা, এত অতৃপ্তি। নদীর ওপরে পড়েছে জ্যোৎস্নার আলো, যেন সেইখানে কেউ ডাক দিয়েছে।

সূর্য সেই হাতটা ধরে ফেলে বললো, ওকে আমি ছেড়ে দিতে পারি মাত্র একটা শর্তে—যদি তোমাকে ফিরিয়ে দেয় আমার কাছে। আমাকেও তো কিছু পেতে হবে। সবাই সব কিছু পাচ্ছে, আর আমি কিছু পাবো না?

দীপ্তি হাতটা আবার সরিয়ে নিলেন। বললেন, তা হয় না।

তারপর একটু থেমে আবার বললেন, আমি একটা সামান্য মেয়ে, তার জন্য তুমি এরকম করছো কেন? তুমি তো ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই পেতে পারো।

—আমি তোমাকেই চাই।

—আমি কেউই না।—

দীপ্তি নিজেকে কঠোর করে বললেন, সূর্য, তুমি এ বাড়িতে আর এসো না। আমি বলছি, তুমি কক্ষনো আসবে না।

—আমি আসবোই!

—না, আসবে না। পাহারাদারদের বলে দিলে তোমাকে আর ঢুকতেই দেবে না ওরা। সেটা কি তোমার পক্ষে খুব সম্মানজনক হবে?

ভিখিরির আবার মান সম্মান কি। কিন্তু তুমি জেনে রেখো, আমি আসবোই, কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না।

—আমরা এখান থেকে চলে যাবো। কলকাতাতেই থাকবো না।

—তুমি যেখানেই যাও—

—না। আমি মিনতি করছি, এ রকম করো না।

—বললাম না, আমি আর আমার অধিকার ছাড়বো না।

—তোমার কোনো অধিকার নেই।

তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে সূর্য দীপ্তির থুতনিটা ধরে উঁচু করে বললো, আমার চোখের দিকে তাকাও, তাকিয়ে বলো তো, কোনো অধিকার নেই? একদিন তুমি বলোনি যে তুমি আমাকে ভলোবাসো? বলো নি, যে তোমার আর আমার জীবন এক হয়ে গেছে? তুমি আমার বুকে মাথা রাখো নি? তুমি বলো নি, মাঝ রাত্রে আমার ঘুমন্ত মাথার পাশে এসে বসে থাকতে তোমার ইচ্ছে করে? তবে তুমি কেন আমার জন্য অপেক্ষা করলে না?

দীপ্তি আর কথা বলতে পারলেন না। সূর্যর উন্মাদের মতন দৃষ্টিও সহ্য করতে পারলেন না তিনি। মুখ ফেরালেন। চোখ দিয়ে অজস্রধারে জল পড়তে লাগলো। এই অশ্রুময় মুখের কোনো উপমা নেই।

সূর্য দীপ্তির কোমরের দিকে হাত বাড়ালো। মুহূর্তের মধ্যে সে বোধহয় দীপ্তিকে আঁকড়ে এনে বুকে চেপে ধরতো। ঐ শরীরের রমণীটি তার জীবনসর্বস্ব। জিভ দিয়ে ঐ মুখের অশ্রু মুছে নেবার জন্য তার এক জীবনব্যাপী সাধ। তবু এই সময়েই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ ওঠে। সূর্যকে সরে যেতে হয়। চাপা গলায় সে বলে, আমি নষ্ট হয়ে যাবো, আমি কুকুরের মতন মার খেয়ে পালাবো—আর তোমরা এখানে আরামে থাকবে—শান্তিতে থাকবে তা আমি সহ্য করবো ভেবেছো? কিছুতেই না।

দীপ্তি চোখের জল মুছে ফেলার কোনো চেষ্টা করলেন না। তাঁর স্বামী এসে তাকে দেখতে পেলেন সেই অবস্থায়। ঈষৎ ঠাট্টার সুরে তিনি বললেন, কি, সূর্য বুঝি তোমাকে পুরোনো সব কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে?

যেন হাসির কথা, এই ভাবে তিনি শুকনো গলায় হাসলেন এর পরে।

সূর্য শংকরবাবুর দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললো, এই দয়ালু, উদার, পরোপকারী, দেশের সেবকটিকে আমি খুন করবো। নিশ্চিত খুন করবো। এ দীপ্তিদিকে ছুঁয়েছে। আমার কথা জানার পরেও ছুঁয়েছে। এই লোকটি তার মাথার পেছনে দেশ নামক একটা ছবি টাঙিয়ে রাখে সব সময়। দেশ মানে ভণ্ডামি, দেশ মানে অহংকারে সুড়সুড়ি—এ সব আমি জেনে গেছি।

॥ ৮৭ ॥

কৃষ্ণনগর শহরের রাস্তা দিয়ে জোরে জোরে হাঁটছে সূর্য। অনেক রাত হয়ে গেছে। রাস্তায় মানুষজন খুব কম, এক আধটা পানের দোকানের সামনে অলস লোকের জটলা দেখা যায়। তাদের দেখলেই সূর্য এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করছে, সার্কিট হাউসটা কোথায়!

লোকেরা হাত তুলে রাস্তা নির্দেশ করে, তবু সূর্যর দিকভ্রম হয়। কিছুদূরে গিয়ে আবার কারুকে জিজ্ঞেস করলে, সে সম্পূর্ণ উল্টোদিক দেখায়। কিছুক্ষণ বাদে সূর্য একটা সাইকেল রিকশা পেয়ে গেল। রিকশাওয়ালা এত রাত্রে ভাড়া যেতে চায় না, তাকে অনুনয় বিনয় করতে লাগলো, মোড়ের মাথা থেকে দু'চারজন লোক সেই কথা শুনে আকৃষ্ট হয়ে এসে তারাও রিকশাওয়ালাকে বললো, আরে ভাই নিয়ে যাও না, উনি বলছেন যখন বিশেষ দরকার—।

বিশাল মাঠের মধ্যে সার্কিট হাউস, বেশ খানিকটা দূরে গেট। এখন সেই গেট বন্ধ, সেখানে পাহারা দিচ্ছে শান্ত্রী। সে সাইকেল রিকশাকে কিছুতেই গেট দিয়ে ঢুকতে দেবে না। সেখানে একটা বচসা বেধে গেল। সার্কিট হাউসের বাইরের সিঁড়িতে বসে থাকা দু'জন সেপাইও ছুটে এলো সেদিকে।

সারাদিন বহু স্মারকলিপি, বিক্ষুব্ধ কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য কমিটি স্থাপন এবং দুটি জনসভা সেরে মন্ত্রী শংকর বসু খুব ক্লান্ত হয়ে এই একটু আগে ঘুমিয়েছেন। মাথার কাছে এক কাপ দুধ ঢাকা রয়েছে, ভোর বেলা উঠে তিনি ঠাণ্ডা দুধ খান। ঘুমের মধ্যেও চিন্তাক্লিষ্ট তাঁর মুখভঙ্গি।

দীপ্তি জেগেই ছিলেন। ঘুম আসছিল না কিছুতেই, তিনি যেন উৎকর্ণ হয়ে ছিলেন কিছুর অপেক্ষায়। তাঁর হৃৎস্পন্দন এখন দ্রুত, হাতের তালুতে জ্বালা জ্বালা করছে। দীপ্তি ঘুমন্ত স্বামীর পাশ থেকে উঠে পড়লেন। একটা পাতলা শাল জড়িয়ে

নিয়ে বসবার ঘর পেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়।

সামনের বাগানে ফুটে আছে এক ঝাড় চন্দ্রমল্লিকা। বিরাট বিরাট আকাশিয়া গাছগুলির চিকন পাতায় হাওয়ার সর্‌সর্‌ শব্দ শোনা যায়। পাতলা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে চরাচরে। সেই জ্যোৎস্না পড়েছে দীপ্তির মুখে। তাঁর মুখখানি বিবর্ণ।

দীপ্তি তাকালেন গেটের দিকে। ওখানে কি হচ্ছে তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন। তবু তিনি অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, রামরতন, কি হয়েছে? ওখানে গোলমাল হচ্ছে কেন?

রামরতন এসে জানালো যে সাইকেল রিকশা চেপে একজন আদমি এত রাত্রে ভেতরে ঢুকতে চাইছে। সে বলছে, সাহেবের সঙ্গে তার জরুরি দরকার। বোধহয় মাতোয়ালা-টাতোয়ালা হবে।

দীপ্তি বললেন, এখন দেখা হবে না, ওকে চলে যেতে বলো।

দূর থেকে সূর্য ডেকে উঠলো, দীপ্তিদি—

দীপ্তি আবার বললেন, ওকে চলে যেতে বলো। বলো, কাল সকালে আসতে—

এই কথা বলার পর দীপ্তির মুখখানা কুঁকড়ে গেল। চোখ বুজে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর আবার চোখ খুলে দেখলেন, রামরতন এগিয়ে যাচ্ছে গেটের দিকে। তিনি বললেন, না, না, রামরতন, তাড়িয়ে দিও না, ওকে ভেতরে আসতে দাও।

গেট খোলা পেয়ে সূর্য সাইকেল রিকশা থেকে নেমে প্রায় দৌড়ে চলে এলো বারান্দার কাছে। তারপর উত্তেজিত অভিযোগের সুরে বললো, তুমি আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে বারণ করেছিলে?

সেই উত্তেজনা দীপ্তিকে স্পর্শ করলো না। তিনি নিষ্প্রাণ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য, তুমি কেন এসেছো?

জ্যোৎস্নায় দীপ্তির হালকা ছায়া পড়েছে সিঁড়িতে। সূর্য সেই ছায়াতে দাঁড়িয়ে। তার দীর্ঘ শরীর দীপ্তির চোখের সামনে থেকে দূরের বাগানটা আড়াল করে দেয়।

সূর্য বললো, আমি থাকতে পারলাম না। ট্রেন খুব লেট ছিল, তাই আমার এত দেরি হলো।

দীপ্তি দেখলেন রামরতন অদূরে দাঁড়িয়ে, তার সন্দেহ মেটেনি, সে সরু চোখে দেখছে সূর্যকে। দীপ্তি অত্যন্ত সঙ্কুচিত বোধ করলেন। চাকরবাকর-দেহরক্ষী-পাহারাদার এরা তাঁর সম্পর্কে কি ভাবছে কে জানে। তিনি আড়ষ্টভাবে বললেন, ওঁর সঙ্গে যদি তোমার দরকার থাকে—উনি তো রাত্রে আর উঠবেন না, সকালবেলা আসতে পারো—কিংবা বসবার ঘরের সোফায় যদি রাতটা কাটাতে চাও...

—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

—আমি এখন শুতে যাবো।

—এক্ষুনি? একটু দাঁড়াও—

দীপ্তি অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে রামরতন, তুমি শুতে যাও—। তিনি সেদিকেই কিছুক্ষণ চেয়ে রামরতনের চলে যাওয়া দেখলেন, তারপর মুখ ফিরিয়ে অত্যন্ত ম্লান গলায় বললেন, সূর্য, তুমি আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখো। আমি একটা সামান্য মেয়ে। আমার কিছুই নেই। আমার মনের জোর ছিল না, আমি মাথা ঠিক রাখতে পারিনি, আমি হেরে গেছি। আমি একেবারেই হেরে গেছি। তুমি আমার ওপর রাগ করতে পারো, আমাকে ঘেন্নাও করতে পারো, কিন্তু তুমি নিজেকে নষ্ট করো না। তোমার শক্তি আছে, তুমি এখনো অনেক কিছু পারবে।

সূর্য বললো, সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে, চলো ঐ মাঠের মধ্যে একটু বেড়িয়ে আসি।

—তা হয় না।

—কেন? তুমি তোমার স্বামীকে ভয় পাও?

—ওর সঙ্গে আমার ভয়ের সম্পর্ক নয়!

—তাহলে?

—তুমি কিছুই বুঝতে পারো না! তুমি কি ভাবো, তুমি যা চাও, তাই হবে? তোমার ভালোর জন্যই আমি তোমাকে চলে যেতে বলছি।

—তুমি আমার ভালো চেয়ে চেয়েই আমার সর্বনাশ করেছো।

—কি বললে?

—কতদিন তোমাকে দেখিনি, কতদিন যে তোমার আঙুলগুলোতে চুমু খাইনি।

দীপ্তি দু'কানে হাত চাপা দিলেন। তাঁর সারা মুখটা কাঁপছে। অতিকষ্টে কান্না সামলে তিনি বললেন, ছিঃ, ওসব বলো না! কেন আমাকে কষ্ট দিতে চাও? আমি খুবই সাধারণ একটা মেয়ে। তুমি যাও—

সূর্য এগিয়ে এসে দীপ্তির একখানা হাত শক্ত করে চেপে ধরে বললো, আমি কোথাও যাবো না। এবার আমাকে এত সহজে তাড়াতে পারবে না।

দীপ্তি ত্রাসের সঙ্গে চাপা গলায় বললেন, ছাড়ো, আমাকে, শিগগির ছাড়ো!

—আমি তোমাকে এক্ষুনি নিয়ে চলে যাবো।

—এভাবে তুমিও বাঁচতে পারবে না, আমিও বাঁচতে পারবো না!

—দীপ্তিদি, আমার কোথাও আর যাবার জায়গা নেই। আমি তো তোমার কাছ থেকে অনেক দূরেই চলে গিয়েছিলাম। কোনো জায়গায় আমি শান্তি পাইনি। সবাই আমাকে ছেড়ে চলে যায়। আমার জীবনটা কি এই রকমভাবে নষ্ট হবে? তোমার কথা চিন্তা করলেই একমাত্র আনন্দ পাই, আমার আবার ভালোভাবে বাঁচতে ইচ্ছে করে—তোমাকে পেলে আবার আমি অনেক কাজ করতে পারবো, সব মানুষকে ভালোবাসতে পারবো।

—লক্ষ্মীটি হাত ছাড়ো—

—না।

—তোমার পায়ে পড়ি, সূর্য, আমাকে ছেড়ে দাও। এখানে অনেক মানুষজন আছে। আমি যদি ওদের বলতাম তোমাকে ঢুকতে না দিতে?

—তুমি তা পারতে?

—আমি তা পারি না বলেই কি তুমি জোর করবে?

—জোর করবো না। তুমি আমার সঙ্গে স্বেচ্ছায় চলে এসো। এক্ষুনি। সামনেই রাস্তা খোলা আছে। আবার আমাদের নতুন জীবন শুরু হোক।

—ভুল করি আর ঠিক করি, আমার বিয়ে হয়ে গেছে অন্য একজনের সঙ্গে।

—এটা নকল বিয়ে। সেই যেরকম চন্দননগরে—

—না, না, এটা তা নয়।

—দীপ্তিদি, একটা কথা সত্যি করে বলো তো, তুমি আমাকে কোনোদিন ভালোবাসো নি? আমাকে কখনো চাও নি?

—হাত ছাড়ো, বলছি—

সূর্য হাতটা ছেড়ে দিতেই দীপ্তি কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। জ্যোৎস্নাটা সরে গেল তাঁর মুখ থেকে। শাড়িটা ঠিক করার জন্য তিনি আঁচল সমেত বাঁ হাতটা একবার তুললেন। সেই আবছা অন্ধকারে এক মুহূর্তের জন্য আঁচল-ছড়ানো বাঁ হাত

সমেত তাঁর সম্পূর্ণ দেহটা ভারতের মানচিত্রের মতন মনে হয় যেন। সূর্যর চোখে ধাঁধা লেগে যায়।

দীপ্তি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, আমি যদি সত্যি কথাটা বলি, তারপর তুমি এখান থেকে চলে যাবে বলো? কথা দাও?

—আগে বলো। সত্যি কথাটা বলো—

—সূর্য, তোমাকে আমি কখনো ভালোবাসিনি। তোমাকে আমি কখনোই চাইনি। আমি খুব খারাপ—

কথাটা শেষ করেই দীপ্তি দ্রুত ঢুকে যাচ্ছিলেন ভেতরে, সূর্য দৌড়ে এলো সেদিকে। ড্রয়িং রুমে ঢুকে দীপ্তি দরজাটা বন্ধ করার চেষ্টা করেও পারলেন না, সূর্য জোর করে ভেতরে ঢুকে পড়লো। দীপ্তির শরীর তখন কান্নায় দুলে দুলে উঠছে, তিনি দেয়ালে ঠেস দিয়ে না দাঁড়ালে পড়েই যেতেন।

সূর্য তাঁর পিঠে হাত দিয়ে শান্ত গলায় বললো, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ঐ কথাটা আর একবার বলো—

দীপ্তি কান্না থামাতে পারলেন না। সেই অবস্থাতেই বললেন, ও এক্ষুনি জেগে উঠবে।

—উঠুক।

—সবই আমার দোষ। আমি তোমাকেও নষ্ট করলাম।

—এখনো সব কিছু করার সময় আছে।

দীপ্তি ভেজা মুখখানা ফেরালেন। তারপর হঠাৎ শান্ত হয়ে গিয়ে বললেন, আমি মরে গেলেই সব কিছু ঠিক হয়ে যায়, তাই না?

—না। এই বিয়ে ভেঙে দিয়ে এক্ষুনি যদি আমরা এখান থেকে চলে যাই, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যেতে পারে।

—বিয়ে ভাঙা যায় না। সমাজ থেকে পালিয়ে পালিয়ে কিছুতেই আমি বাঁচতে পারবো না। আজ থেকে কুড়ি তিরিশ বছর বাদে হয়তো এ সবই স্বাভাবিক হয়ে যাবে, কিংবা অন্য কোনো দেশে, কিন্তু আমাদের নিয়তি অন্যরকম। আমি তোমার সঙ্গে কোথাও যাবো না—এটা আমার শেষ কথা।

—তা হলে আমার কথাও শুনে রাখো, আমি তোমাকে আর শংকরদাকে কিছুতেই এক সঙ্গে থাকতে দেবো না। আমি ত্যাগ জানি না।

—সূর্য, শান্ত হও! একটু চিন্তা করে দেখো। শুধু রাগারাগি করলেই সব পাওয়া যায় না!

—আমি শান্ত হতে পারছি না।

—তুমি ভালো হয়ে ওঠো, তোমার এসব পাগলামি সেরে যাক। তোমার একটা সুখী জীবন দেখলে পৃথিবীতে আমার চেয়ে আর কেউ বেশী সুখী হবে না।

—আমার সব সুখ তোমার কাছে জমা আছে।

—সূর্য, তুমি শুধু শুধু আমাকে বেশী মূল্য দিচ্ছো। আমার যে কিছুই নেই।

—তোমার কি আছে তা আমি জানি না। কিন্তু আমি তোমাকে যতটা ভালোবাসি, দশ হাজার শংকর বোসও ততটা ভালো বাসতে পারবে না। আমি তোমাকে চাই—আমরা একটা পাহাড়ের ওপর বাড়ি করে থাকবো, অনেক উঁচু পাহাড়, মেঘ এসে লাগবে তোমার...

এই সময় শংকর বসুর শয়ন কক্ষে খুট করে একটা শব্দ হলো। দীপ্তির পিঠে

তখনও সূর্যর হাত, তিনি বিদ্যুৎগতিতে সরে যেতে চাইলেন। সূর্য তবু তাঁকে সবলে ধরে রইলো।

দীপ্তি আকুলভাবে বললেন, কি করছো কি, ছাড়ো, ও জেগে উঠেছে।

সূর্য কোনো কথা না বলে সেই দরজার দিকে তাকিয়ে রইলো।

দীপ্তি নীচু হয়ে সূর্যর পা ছোঁয়ার চেষ্টা করে বললেন, আমায় ছেড়ে দাও, আমি তোমার কেউ না, কোনোদিনই আমি তোমার কাছে যাবো না—

সূর্য চেয়েছিল, সেই মুহূর্তেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাক। শংকরবাবু মধ্য রাত্রে ঘুম ভেঙে এসে দেখবেন তাঁর স্ত্রী পর-পুরুষের আলিঙ্গনে। সূর্যর এ জন্য কোনো লজ্জা নেই। সে শংকর বসুকে স্পষ্ট বলবে, এই নারী আমার। তুমি এই দেশ নাও, যত ইচ্ছে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা নাও, কিন্তু এই নারীকে পাবে না। কিন্তু দীপ্তি যখন বললেন, কোনো দিনই আমি তোমার কাছে যাবো না, তখন তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল যা সূর্যকে আমূল নাড়িয়ে দেয়। তার যুক্তিহীন উত্তেজিত হৃদয়ও যেন অনুভব করতে পারে যে এর পরে আর কোনো জোর চলে না। সূর্য হঠাৎ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লো। সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে দীপ্তির দিকে তাকালো আর একবার। মনে হলো, এই মুখ তার অচেনা। বুক খালি করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

সূর্য দীপ্তিকে এবার ছেড়ে দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে ডাকলো, শংকরদা—

ড্রয়িং রুমের পর বিরাট ডাইনিং রুম, তার ডান দিকে শোবার ঘর। সেই ঘরের দরজা খুলে এসে দাঁড়ালেন শংকর বসু। পাজামা পাঞ্জাবি পরেই শুয়েছিলেন, সেই অবস্থায় উঠে এসেছেন, চুল অবিন্যস্ত, এখন তাঁকে নিজের বয়েসের চেয়েও বেশী বয়স্ক দেখাচ্ছে। চোখে লেগে আছে ঘুম, চিবুকের কাছে শ্রান্তি।

তিনি বললেন, কে ওখানে? সূর্য?

সূর্য উত্তর দেবার আগেই দীপ্তি তাঁর স্বামীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, সূর্য হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে—

শংকরবাবু মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে হাই তুলে বললেন, কি ব্যাপার, সূর্য? হঠাৎ চলে এলে যে?

সূর্য বললো, আমি তো বলেইছিলাম আমি আপনাদের সঙ্গে আসবো। আপনারা নিয়ে এলেন না, তাই আমি নিজেই এলাম।

—এখানে তো আমাদের অনেক কাজ। তুমি এখানে কি করবে? আমরা তো আর প্রমোদ ভ্রমণে আসিনি।

—আপনার সঙ্গেও আমার অনেক কাজের কথা আছে।

—সময় তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না। তা বলে এখানে—

শংকরবাবু হঠাৎ হাসলেন। দীপ্তির দিকে ফিরে বললেন, সূর্য বুঝি তোমাকে খুব কষ্ট দিয়েছে? আমাকে ডাকলে না কেন!

দীপ্তি কোনো উত্তর দিলেন না।

শংকরবাবু সেই রকম হাসিমুখেই সূর্যকে বললেন, দীপ্তির সঙ্গে যদি তোমার আলাদা কিছু বলার থাকে, তুমি অনায়াসেই তা বলতে পারো, আই ডোণ্ট মাইণ্ড। কিন্তু এত রাত্রে, এইরকম জায়গায়—ব্যাপারটা ভালো দেখায় না—

সূর্য চুপ করে রইলো।

শংকর বসু ডাইনিং রুমের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে সূর্যকে বললেন, বসো, এখানে এসে বসো। দীপ্তি তুমি—

দীপ্তি ততক্ষণে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছেন। বাথরুমে জলের শব্দ হচ্ছে।

শংকরবাবু হাত বাড়িয়ে বললেন, দাও, একটা সিগারেট দাও। আছে?

সূর্য পকেট থেকে সিগারেট প্যাকেট বার করলো। দু'জনেই ধরালো সিগারেট। শংকরবাবু থুতনিতে বাঁ হাতের তালু ঘষতে ঘষতে বললেন, সূর্য, তুমি এখন আর ছেলেমানুষটি নেই। বড় হয়ে উঠতে শেখো। ঝোঁকের মাথায় কিছু একটা তো করলেই হয় না। সব কিছুর দায়িত্ব নিতে হয়। দীপ্তিকে যে তুমি শুধু শুধু কষ্ট দিচ্ছো, এতে তোমার কি লাভ?

এ সব যুক্তিতর্কের কথা। সূর্য যুক্তি তর্ক কিছুই বোঝে না। সে বকুনি খাওয়া গোঁয়ার বালকের মতই গুম হয়ে রইলো।

শংকরবাবু আবার শুরু করলেন, তোমার আর দীপ্তির মধ্যে কি হয়েছিল, আমি তা জানি। আমাকে ও সব বলেছে। স্বাধীনতার ঠিক আগে সবাই যখন ছত্রভঙ্গ, বিশেষত তোমাদের মতন যাদের কোনো পার্টি ছিল না, তাদের নিজস্ব কোনো দাঁড়াবার জায়গাও ছিল না—সেই সময় তোমরা কয়েকজন কাছাকাছি এসেছিলে। তোমার তখন বয়েস কম—তাই তুমি আঁকড়ে ধরেছিলে দীপ্তিকে। দীপ্তি সত্যিই মানুষকে শান্তি দিতে পারে—শুধু ওর রূপ নয়, চরিত্রটাই অসাধারণ। তার ফলে তোমার দিক থেকে খানিকটা ইনফ্যাচুয়েশন হয়েছিল। তুমি হয়তো তাকে লাভ বলে ভেবেছিলে, কিন্তু আমি ইনফ্যাচুয়েশনই বলবো। কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তো এটা কেটে যাবার কথা। তুমি কি চিরশিশু হয়ে থাকতে চাইছো নাকি! তোমার মতন বয়েসে আমি প্রেম-ভালোবাসা টাসার কথা চিন্তা করারই সময় পাইনি। দীপ্তিকে আমি বহুকাল ধরে চিনি—কোনো দিন অন্যরকম কিছু ভাবিনি—এখন বুঝতে পারছি, প্রেম-ভালোবাসার চেয়ে পরস্পরকে বুঝতে পারাই বড় কথা। আমরা দু'জনকে যে-রকম...

সূর্য অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললো, শংকরদা, অগাস্ট আন্দোলনের সময় আমি নিজের হাতে তিনজন মানুষকে খুন করেছিলাম। কেন করেছিলাম?

শংকরবাবু একটু চমকে গিয়ে বললেন, হঠাৎ একথা কেন?

—এই মুহূর্তে আমার মনে পড়লো।

—ওসব পুরোনো কথা এখন একেবারে ভুলে যাও। ওসব আর মনে স্থান দিও না।

—আমার দোষ এই, আমি কোনো পুরোনো কথাই ভুলতে পারি না। তার বদলে কি আমি কিছুই পাবো না?

—তোমাকে তো কতবার বললাম, একটা কোনো কাজ নিতে। আমি তো রাজিই আছি।

—আমি চাকরি করবো, আর আপনি মন্ত্রিত্ব করবেন?

—মন্ত্রিত্বটা বুঝি খুব আরামের! নাঃ, তোমার দেখছি মাথাটা এখনো গরম হয়ে আছে।

শংকরবাবু গলা চড়িয়ে ডাকলেন, দীপ্তি!

দীপ্তি দরজার কাছে এসে দাঁড়াতে শংকরবাবু বললেন, তোমার এই আদরের ছোট ভাইটি দেখছি সব সময় রেগে টং হয়ে আছে। একে নিয়ে কি করা যায় বলো তো!

সূর্য দীপ্তির দিকে তাকিয়ে প্রায় ধমকের সুরে বললো, দীপ্তিদি, তুমি এখানে একটাও কথা বলবে না!

শংকরবাবু বললেন, আরে একি! সূর্য, তুমি আমার স্ত্রীকে এখনো দিদি বলে

ডাকো, অথচ সম্মান দিয়ে কথা বলো না, এটা ঠিক না! ব্যবহার-ট্যাবহার একটু ঠিক করো। যাক্‌ শোনো, অনেক রাত হয়েছে, এখন আর কথাবার্তা বলে লাভ নেই। এসেই যখন পড়েছো, তখন রাতটা কাটিয়ে যাও এখানে। দীপ্তি তুমি ওর একটা শোওয়ার ব্যবস্থা করে দাও—উত্তরের ঘরটা বোধ হয় খালি আছে।

সূর্য বললো, আমার জন্য কোনো ব্যবস্থা করার দরকার নেই।

শংকরবাবু বললেন, দরকার নেই মানে? তুমি ঘুমোবে না? আমাদের তো ঘুমোতেই হবে।

দীপ্তিও খুব কোমল গলায় বললেন, সূর্য, এবার শুয়ে পড়ো। অনেক রাত হয়ে গেছে, প্রায় একটা।

দীপ্তির কণ্ঠস্বর এখন স্বাভাবিক। একটু আগে তিনি যে ব্যাকুলভাবে কেঁদেছিলেন, তার কোনো চিহ্নই নেই। এই সংযমের জন্য তাঁর মুখখানা যে রক্তশূন্য হয়ে গেছে, সূর্য তা লক্ষ্যই করলো না।

শংকরবাবু উঠে এসে সূর্যর কাঁধে হাত রেখে বললেন, আরে চলো, চলো, আবার কাল সকালে কথা হবে। দীপ্তি, দেখো তো বিছানা পাতা আছে কিনা।

শংকরবাবু সূর্যকে ধরে দরজার পাশে দাঁড়ালেন। দীপ্তি ঘরের মধ্যে ঢুকে ঠিকঠাক করে দিলেন বিছানার চাদর বালিশ। বেরিয়ে এসে বললেন, যদি রাত্তিরে তোমার জল তেষ্টা পায়—এই ডাইনিং রুমে জল আছে।

যে-কারণেই হোক, সূর্য আর আপত্তি করলো না। ঘরে ঢুকে সে খাটের ওপর বসলো। সেখান থেকে সে দেখলো, শংকরবাবু আর দীপ্তিদি ঢুকে গেলেন তাঁদের ঘরে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সূর্যর শরীরটা জ্বলছে তখন, হাত দুটো শক্ত হয়ে গেছে, চোখ দুটি বিস্ফারিত। তার মুখটা দেখলে এখন চেনাই যায় না। অন্তত দশজন মানুষের সারা জীবনের রাগ সে অনুভব করছে এই মুহূর্তে। যে-নারীকে পেলে সে পূর্ব-জীবনের সব কিছু ভুলতে পারে, যে নারীর জন্য সে আবার সব কোমলতা, দয়া, মায়া, ফিরে পেতে পারে—সেই নারী আজ তারই চোখের সামনে অপর পুরুষের সঙ্গে শয়ন কক্ষে চলে গেল।

ক্রোধ মানুষকে অসহায় করে দেয়। সূর্য নিশ্চল হয়ে বসে রইলো সেখানে। সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ করে শুনতে চাইলো, ও ঘর থেকে কোনো শব্দ আসে কিনা। ও ঘরের আলো নিবে গেছে, কোনো শব্দ নেই।

সূর্য সেখানে কতক্ষণ বসে আছে, তার খেয়াল নেই। দরজা খোলা, সে খরচক্ষে চেয়ে আছে দরজার দিকে। তার মনে হচ্ছে, যে-কোনো সময় দরজার কাছে দীপ্তিদির চুম্বকময় শরীরখানি দেখতে পাবে। সূর্য ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা—দীপ্তিদি কি তা দেখতে আসবে না, দীপ্তিদি যে বলেছিল, সূর্যর ঘুমন্ত মুখের পাশে তাঁর বসে থাকার খুব সাধ ছিল। সে কি মিথ্যে? আজ এত কাছে—সেই জন্যই কি সূর্য এ ঘরে শুতে আসার জন্য সহজে রাজি হয়নি? এই বিছানায় আছে দীপ্তিদির হাতের স্পর্শ...

কত অনুপল, পল, দণ্ড, প্রহর কেটে গেল সূর্য জানে না। বাইরে ঝিমঝিম করছে রাত। কোথাও একটাও শব্দ নেই। সূর্যর কানে এসে লাগছে নৈঃশব্দের অসহ্য শব্দ। পৃথিবীতে আর সবাই ঘুমন্ত। শুধু সে একা জেগে আছে। সবাই সব পুরোনো কথা ভুলে যেতে পারে, শুধু সে পারে না। তার চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠছে, হাজরা রোডের একখানা ঘর, সেখানে সে আর দীপ্তিদি—বাইরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা,

দীপ্তিদি তার বুকের মধ্যে ছটফট করতে করতে বলেছিলেন, সূর্য, তুমি আমাকে নাও, তুমি আমাকে নাও, আরও জোরে চেপে ধরো—তারপর মনে পড়লো যোগানন্দর কথা, সে বলেছিল, এবার সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে ভালো করে বাঁচবো বুঝলি, তোর বোনের বাড়িতে গিয়ে ভালো করে খাবো—

এই সময় যোগানন্দর কথা মনে পড়ায় সূর্য নিজেই একটু অবাক হয়। যোগানন্দর মৃত মুখখানি তার চোখের সামনে ভাসে। সমস্ত মৃত সহকর্মীদের জন্য শোক অনুভব করে সে। ব্রজগোপালদা বলেছিলেন, যে ভাবেই হোক বিশ্বাসঘাতক যোগানন্দকে খুঁজে বার করতেই হবে। সূর্য খুঁজে বার করেছিল। তার স্ত্রীর কাছ থেকে যোগানন্দকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। যোগানন্দর সঙ্গে কি আজকের শংকর বসুরও মিল নেই?

সূর্য উঠে দাঁড়ালো। সে বুঝে গেছে, কেউ আসবে না। এক-একদিন নিস্তব্ধতার মধ্যেই বোঝা যায়, এর মধ্যে কোনো সম্ভাবনা নেই। সূর্য কি এখন চলে যেতে পারে এখান থেকে? সেও কি অন্য রকম ভাবে বাঁচতে পারে? অন্য রকম কি ভাবে বাঁচা যায়, সে জানে না, এখন তার আর কিছুই মনে পড়ছে না। আর কোনোদিকে রাস্তা নেই।

সূর্য পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালো শংকর বসুর ঘরের দরজার সামনে। চোরের মতন কান পেতে শুনতে চাইলো কোনো শব্দ। কিছুই নেই। এখনও সূর্য ফিরে যেতে পারে। কিন্তু তার ফিরে যাবার সাধ্য নেই। সে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিল দরজায়।

ভেতর থেকে শংকর বসু বললেন, কে?

—আমি সূর্য, দরজা খুলুন।

—কি চাই?

—শিগগির দরজা খুলুন।

—আঃ, কিঁ চাও এখন? যাও, ঘুমোও—

—শিগগির দরজা খুলুন।

শংকর বসু ভীরু মানুষ নন। তিনি দরজা খুলে বিরক্ত মুখে দাঁড়ালেন। আগেকার সব ভদ্রতার চিহ্ন মুছে গেছে।

সূর্য উঁকি দিয়ে ভেতরে দীপ্তিকে একবার দেখবার চেষ্টা করলো তৃষ্ণার্তের মতন। শংকরবাবু দরজা আড়াল করে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, আবার কি হলো? একটু শান্তিতে ঘুমোতেও দেবে না?

—আপনি বাইরে আসুন, আপনার সঙ্গে দরকারি কথা আছে।

শংকরবাবু এবার প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বললেন, এসব কি পাগলামি হচ্ছে? তোমার সঙ্গে আমার কোনো কথা নেই। যত সব ন্যাকামি।

শংকর বসু ধমক দিয়ে একটু ভুল করলেন। ধমকে ভয় পাবার ছেলে তো এ নয়। সূর্য শংকর বসুর হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বাইরে বার করে এনে ভয়ংকর মুখ করে বললো, আপনি চলুন আমার সঙ্গে।

—সূর্য, বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিন্তু। তুমি আমার বন্ধু হিসেবে কিংবা দীপ্তির ছোট ভাই হিসেবে যতবার ইচ্ছে আমাদের বাড়িতে আসতে পারো—কিন্তু এরকম যদি করো—

—আমি আর কোনোদিন আসবো না। আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

দীপ্তি উঠে এসেছেন। দু' জনের মাঝখানে হাত রেখে বললেন, একি! সূর্য একি

করছো? ছেড়ে দাও। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।

সূর্য তার সেই অস্বাভাবিক হিংস্র মুখটা দীপ্তিকে দেখিয়ে বললো, তুমি এর মধ্যে এসো না। তোমার সঙ্গে আর আমার কোনো দরকার নেই। কিন্তু আমি একেও এখানে থাকতে দেবো না।

শংকরবাবু ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, এ তো একেবারে পাগল হয়ে গেছে। এখন একে আটকে রাখা ছাড়া—

সূর্য শংকরবাবুর কথা শেষ করতে দিল না। তার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে দৌড় করিয়ে সোজা নিয়ে এলো বাইরে। দীপ্তি চেঁচিয়ে উঠলেন, রামরতন, রামরতন—। তারপরই নিজের মুখে হাত চাপা দিলেন। তিনিও ছুটে এলেন বাইরে।

সূর্য ততক্ষণে শংকরবাবুকে নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। শংকরবাবু প্রাণপণে চ্যাঁচাচ্ছেন ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। তিনি দুর্বল মানুষ না হলেও সূর্যর গায়ে এখন অসুরের মতন শক্তি। সে শংকরবাবুকে কোথায় নিয়ে যাবে জানে না, নিজে কোথায় যাবে তাও জানে না, শুধু জানে দীপ্তিদির কাছ থেকে এই লোকটাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। সে দূরে সরে যাবে, এই লোকটাকেও এখানে রেখে যেতে পারবে না। সে একা সব কিছু ছাড়বে কেন। সেপাই শান্ত্রীরা জেগে উঠেছে, সূর্যর ভ্রূক্ষেপ নেই।

শংকরবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, তুমি কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও?

সূর্য বললো, চুপ! আমি যদি গ্রামে গিয়ে মাটি কোপাবার কাজ করি, আপনাকেও তাই করতে হবে।

সেই সময় রামরতন পেছন থেকে জাপটে ধরলো সূর্যকে। সূর্য যন্ত্র-মানুষের মতন প্রচন্ড ধাক্কায় তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে। রামরতন এত জোরে আছড়ে পড়লো যে তার নাকটা ঘষটে গিয়ে রক্ত বেরুতে লাগলো গলগল করে। নিজের রক্ত দর্শনে রামরতন দিশেহারা হয়ে যায়। সেই অবসরে একটু আলগা পেয়ে শংকর বসু ছুটতে লাগলেন ফুল বাগানের দিকে।

সূর্য বাঘের মতন তাড়া করে গেল তাঁর দিকে। ফুলবাগান লণ্ডভণ্ড করে সে যখন শংকর বসুকে প্রায় ধরে ফেলেছে, তিনি মাটিতে বসে পড়ে চিৎকার করলেন, মেরো না, আমাকে মেরো না—ভয়ে তাঁর মুখ সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বহীন।

রামরতনের প্রথম গুলিই সূর্যর পিঠে লাগে। কিন্তু সূর্য যেন টেরই পায়নি। তখনও সে শংকরবাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে বললো, মারবো না, উঠে আসুন!

সেইটাই সূর্যর শেষ কথা। রামরতনের দ্বিতীয় গুলি লাগবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য পড়ে গেল মাটিতে। কয়েকবার উল্টে পাল্টেই তার শরীরটা স্থির হয়ে গেল।

রামরতন ততক্ষণে কাছে এসে গেছে। শংকরবাবু বিহ্বলভাবে একবার তার দিকে আর একবার সূর্যর দিকে তাকালেন। তারপর ঠাস করে রামরতনের গালে এক থাপ্পড় মেরে বললেন, উল্লুক, একি করলি?

দীপ্তি ছুটতে ছুটতে এসে বললেন, সূর্য গুলি করেছে! তোমার লেগেছে?

শংকরবাবু বললেন, না। ওই দ্যাখো।

দীপ্তি নীচু হয়ে সূর্যর গায়ে হাত দিয়ে বললো, এ কি, ও উঠছে না কেন? অজ্ঞান হয়ে গেছে?

শংকরবাবু বললেন, সব শেষ।

দীপ্তিকে যেন কেউ চুলের মুঠি ধরে হ্যাঁচকা ভাবে টানলো। তিনি সূর্যর বুকের

ওপর হাতটা রাখলেন, আর একটাও কথা বলতে পারলেন না। সেই সময় তাঁর চোখে কান্না এলো না। সমস্ত শরীরের মধ্যে এলেমেলো গরম হাওয়া ঘুরছে। একটা চিন্তাই তাঁর মাথায় গেঁথে গেল, আমি কেন জন্মেছিলাম? এই ব্যর্থ ভীতু জীবন নিয়ে আমি কি করবো?

শংকরবাবু বিহ্বল ভাবটা হঠাৎ কাটিয়ে উঠলেন। অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে বললেন, দারুণ কেলেংকারি হয়ে যাবে। আমার মান-সম্মান—খবরের কাগজে যদি...দীপ্তি, শিগগির ওঠো, ঘরে যাও, সূর্যর সঙ্গে তোমার আজ দেখা হয়নি, ও জোর করে এখানে ঢুকে আমাকে মারতে এসেছিল, থানায় খবর দাও, এই রামরতন, দৌড়ে যা—ও যে রিকশায় করে এসেছিল, সেই রিকশাওয়ালাকে ধর, সে সাক্ষী দেবে—এই তোমরা কেউ ওর বডি এখন ছোঁবে না—

শংকরবাবু দীপ্তিকে ধরে তুললেন। তারপর সান্ত্বনা দেবার জন্য বললেন, ছেলেটা একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিল, চলো, তুমি শুয়ে পড়বে চলো—। তোমার যতটা কষ্ট হচ্ছে, আমারও তার চেয়ে কম নয়...

দীপ্তিকে ধরে ধরে তিনি নিয়ে গেলেন ভেতরে। কয়েকটা ফুলগাছ দলিত করে সূর্যর দেহটা পড়ে রইলো সেখানে। রক্তের গন্ধ পেয়ে একটা কুকুর কাছাকাছি আসবার চেষ্টা করছিল, দু' জন সেপাই সেটাকে তাড়াচ্ছে।

দূরে একটা রাত চরা পাখি হঠাৎ অলৌকিক ভাবে ডেকে ওঠে। আরও দূরে শোনা যায় একটি শিশুর কান্না। হাওয়ায় বড় বড় গাছ গুলি থেকে টুপটাপ করে পাতা ঝরে। নির্জন রাস্তায় ভয় তাড়াবার জন্য একজন লোক জুতোর শব্দ তুলে ও গান গাইতে গাইতে যায়। গীর্জায় ঘণ্টা বাজে। বোঝা যায়, জীবন ঠিক বয়ে চলেছে।

সূর্যর মুখখানা আকাশের দিকে ফেরানো। ফিকে জ্যোৎস্নাতেও স্পষ্ট দেখা যায়, এখনো সেখানে রাগ আর অভিমানের আঁকাবাঁকা রেখা পড়ে আছে। আর কোনোদিন মুছবে না।

॥ ৮৮ ॥

পাহাড়ে দ্রুত উঠতে নেই, সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়তে হয়, তবু আমি জেদ করে তাড়াতাড়িই উঠেছিলাম। জলাপাহাড়ের ওপরটাতে কোনো দিন ওঠা হয়নি, আজ উঠবোই। ঘোড়া নিইনি। কয়েকদিন ঘোড়ায় চড়ে দেখেছি, ভালো লাগে না, জোরে ঘোড়া ছোটাতে না পারলে আনন্দ নেই।

বিশ্রাম নেবার জন্য একটা কচ্ছপের পিঠের মতন পাথরের ওপর বসে সিগারেট ধরাতেই চোখে পড়ে শ্বাসরোধকারী দৃশ্য। বহু নীচে উপত্যকায় আমার সিগারেটের ধোঁয়ার মতনই হালকা কিন্তু বিপুল পরিমাণে ধোঁয়ার মতন মেঘ কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরছে, যেন জীবন্ত। পুরু সবুজ গালিচার মতন অরণ্য মাঝে মাঝে ঢাকা পড়ে যায়, আবার যখন দৃশ্যমান হয়, তখন মনে হয়, সব কিছুই যেন অপরূপ ভালোবাসার মতন স্তব্ধ হয়ে আছে। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করি, জমাট মেঘের আড়াল থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা জেগে উঠেছে কিনা। জাগে নি। অথচ মাথার ওপরে আকাশ এত নীল।

পথ ঘুরে গেছে নীচে। অনেক নীচে কয়েকটি ঘোড়ার পিঠে দুটি রমণী ও একজন পুরুষ। এত দূর থেকেও চিনতে অসুবিধে হয় না।

সিগারেটটা শেষ করে আমি আবার উঠতে শুরু করি। একটা লজেন্স পুরে দিই মুখে। টক-মিষ্টি স্বাদটা ভালো লাগে। আজ সব কিছুই ভালো লাগছে। আজ আমি নিজেকেও ক্ষমা করতে পারি। এই সমূহ প্রকৃতির মধ্যে এত নিবিড়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে এমন অসম্ভব মায়া জেগে ওঠে যে, ইচ্ছে হয় নিজের জীবনটাকে নিজেই আদর করি।

অথচ আমি ভেবেছিলাম, প্রকৃতির কাছে আমার কোনো সান্ত্বনা নেই। এর রূপও আমাকে মুগ্ধ করতে পারবে না। এই আকাশ ও পটভূমিকার গম্ভীর পাহাড়—এ সবই তো পুরোনো। উপত্যকার অরণ্য কিংবা খেলনার শহর অথবা এই সঞ্চরমান মেঘ—এ সবই তো বহুকালের পুরোনো দৃশ্য। যা পুরোনো, তা আমাকে আনন্দ দেবে কি করে! তবু এই জলাপাহাড়ে এসে যুক্তি হার মেনে যায়। ভালো যে লাগছে, প্রকৃতির মধ্যে এসে প্রায় অতিপ্রাকৃত ভালোলাগা, তা অস্বীকার করি কি করে?

দার্জিলিং-এ না আসতেও পারতাম এই সময়ে। যেমন, মানুষ হয়ে না জন্মাতেও পারতাম, কিংবা অন্য কোনো বাবা-মায়ের সংসারে, অন্যরকম মানুষ হয়ে, আর একরকম কাহিনীর মধ্যে জীবনটা কাটতে পারতো। আমার পুরী যাবার কথা ছিল। হঠাৎ দার্জিলিং চলে আসা।

না, আসলে, এই রকম নির্জনে, নিজের কাছেও সত্যি কথাটা প্রকাশ করতে দ্বিধা হয়। রেণুরা দার্জিলিং বেড়াতে আসছে শুনেই কি আমি পুরী যাওয়ার পরিকল্পনাটা বদলাই নি? আমি আজ মনে মনে বলেছিলাম, রেণুরা যাচ্ছে তো কি হয়েছে। আর কেউ কি দার্জিলিং যেতে পারে না? কাকে এই কথাটা বোঝাচ্ছিলাম, আমাকে তো কেউ দার্জিলিং আসতে বারণ করে নি! এই এক রকমের লুকোচুরি খেলা। আমি রেণুকে এড়িয়ে যাই, আবার দূর থেকে ওকে দেখি। রেণুকে আমার ঠিকানা জানাই না, অথচ ইউনিভার্সিটির ছুটির পর দূর থেকে রেণুকে এক ঝলক দেখে নেবার জন্য ছটফট করি। আমার এই ছেলেমানুষীতে আমিই অনেক সময় ভ্রূকুটি করেছি কিংবা হেসেছি। একই শরীরের মধ্যে আমি ছেলেমানুষ এবং সমালোচক। এরকম হয় না বুঝি?

একটা পাথরের গায়ে কারা যেন নাম লিখে গেছে। কয়েকটি নাম বেশ টাটকা, পার্থ প্লাস ব্রততী; মীনা প্লাস শীতল; ঝুমু, কুমু, ঝরনা এবং খোকন; একজন লিখেছে স্বপ্না আমি তোমাকে—। তারপর একটি অসভ্য শব্দ। খড়ির লেখা, আমি ঐ শব্দটা হাত দিয়ে মুছে ফেললাম। যে লিখেছে সে বোকা, ঐ শব্দটা এত প্রকটভাবে বলার তো দরকার নেই। শুধু 'আমি তোমাকে—' বললেই তো সব কিছু বোঝা যায়। পাথরটার সামনে একটা খালি সিগারেটের প্যাকেট, পুরোনো খবরের কাগজ ও একটি মেয়েদের চুলের কাঁটা পড়ে আছে যেন একটা গল্প। আমি চুলের কাঁটাটা তুলে নিলাম, মনে হয় রূপোর তৈরি, কিংবা জার্মান সিলভারেরও হতে পারে। আসল রূপো না জার্মান সিলভার—এ সমস্যার মীমাংসা করার বদলে অনেক সহজ কাঁটাটা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। আমি তাই দিলাম, অনেক দূরে, উপত্যকার দিকে, কোনো পাহাড়ী মেয়ে একদিন ঐটা কুড়িয়ে পেয়ে খুশী হবে হয়তো, আমি দেখতে পেলাম সেই মেয়েটির উৎফুল্ল মুখ। কাঁটাটা হাতে নেওয়ার ফলে আমার হাতে কি একটা মিষ্টি গন্ধ লেগে গেছে, আমি পাচ্ছি যেন, কিংবা কল্পনা।

আজ যে এখানে আর কোনো লোকজন নেই, এটা একটা বেশ ভালো ব্যাপার। বেশী লোকজন থাকলে একটুও আরাম পেতাম না। একা থাকা আমার অভ্যেস হয়ে

গেছে। মায়ের মৃত্যুর পর আমার আর কোনো বন্ধন নেই। এবার বিদেশে যাবো। লুকিয়ে চুরিয়ে নয়, বিমানবন্দরে সবাই আমাকে বিদায় জানাতে আসবে। অসংখ্য রুমাল উড়বে, বিদায়, বিদায়।

বাবা হরিদ্বারে থাকেন। আমৃত্যু ঐখানেই থাকতে চান। সেটাই সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা। কলকাতায় থাকার আর তো কোনো যুক্তি নেই। একমাত্র আকর্ষণ ছিল বাড়িটা। বাবা ভেবেছিলেন, সূর্যদার অবর্তমানে ঐ বাড়িটা আমাদের হয়ে যাবে। তাঁর মতন সংসারে-ব্যর্থ মানুষেরও ঐটুকু বিষয়বুদ্ধি থাকে। মৃত্যুর আগে মা এই বিশ্বাস নিয়েই গেছেন যে, তাঁর স্বামী ও পুত্রের একটা নিজস্ব বাড়ি হয়েছে। মা খুশী মনেই গেছেন, কিন্তু বাবাকে নিরাশ হতে হয়েছে। সূর্যদা ব্যবসা করার ঝোঁকে তার বন্ধুদের প্ররোচনায় মাত্র দশ হাজার টাকায় বাড়িটা বন্ধক দিয়েছিল। আমার তো মনে হয়, ভালোই করেছিল। সর্বস্ব উড়িয়ে দেবার নেশায় পেয়ে বসেছিল সূর্যদাকে, যে তার জীবনটাকে ঐরকমভাবে খরচ করে দিতে পারে, সে কেন এ বাড়িটাকে রাখতে যাবে? এতেই সূর্যদাকে মানিয়েছে। কিন্তু বাবা ঐ বন্ধকের খবর জানতে পেরেও আশা করেছিলেন, দশ হাজার টাকা ফেরত দিয়ে বাড়িটা পেয়ে যাবেন। কিন্তু কোন্ অধিকারে বাবা সূর্যদার উত্তরাধিকারী হবেন? বাবা এই নিয়ে মামলা মোকদ্দমা করতে গিয়ে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

বাড়িটা ছেড়ে আসার পরও দু'একদিন ঐ বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটেছি। সেই সময় মনের মধ্যে যে এক রকম দুঃখ দুঃখ ভাব হয়, সেটা আসলে আরামদায়ক। না হলে স্বেচ্ছায় ঐ দিকে যাওয়া কেন?

আমি পাহাড় শিখরে উঠবো। আর কত দূর?

আমাকে উঁচুতে উঠতে হবে। যে-জায়গায় আছি, তার চেয়েও উঁচুতে। যেখানেই যাই, মনে হয়, আরও দূরে কোথাও আরো সুন্দর জায়গা আছে। এই জীবনের বদলে অন্যরকম জীবন।

অশ্বারোহীরা অনেকটা এগিয়ে এসেছে। আমি দ্রুত পা চালালাম। তবু বাধা পড়ে। এই সুন্দর ঘাসফুলটা ছিঁড়বো না? পাহাড় শিখরে যারা দ্রুত উঠতে চায়, তারা কি কখনো কয়েক মুহূর্ত থেমে একটা ফুলের গন্ধ নিতে চায় না? এই প্রশ্নটা আমাকে একটা দ্বিধার মধ্যে ফেলে দেয়।

সেখানে, সেই ফুলটার সামনে দাঁড়াতেই অকস্মাৎ মনে হয়, এত নির্জন জায়গায় আমি জীবনে কখনো আসিনি। এই পাহাড়, আকাশ, মেঘরাশি ও অরণ্য কি অদ্ভুত নিস্তব্ধ হয়ে আছে। দূরের শহরের কোনো আওয়াজ এখানে এসে পৌঁছোচ্ছে না। এখানে আমাকে কেউ দেখছে না, এখানে ক্ষমা চাওয়া যায়।

আমি হাত জোড় করে বললাম, হে দশদিক, আমি ক্ষমা চাইছি। হে দশদিক, আমাকে ক্ষমা করো।

কিসের জন্য ক্ষমা? আমি তো কোনো অন্যায় করি নি? দোষ না করলে বুঝি ক্ষমা চাওয়া যায় না? এই বিরাট সুন্দরের কাছে এসে ক্ষমা চাওয়া ছাড়া আর কি করার থাকতে পারে? এই পৃথিবীতে জন্মেছি অথচ তার এই বিপুল রূপরাশির যোগ্য হয়ে উঠতে পারি নি আমি, এজন্যও তো ক্ষমা চাইতে হয়।

একটু পরে, একজন অশ্বারোহিণী চিৎকার করে ডাকলো, বাদলদা—

আমার প্রথম ইচ্ছে হল, সাড়া না দিয়ে তরতর করে আরও ওপর দিকে উঠে যাওয়া। কিংবা লুকিয়ে পড়া। এখানে লুকোবার অনেক জায়গা আছে। তবু আমি

তৎক্ষণাৎ পেছন ফিরে সাড়া দিলাম, এই যে—

বোধ হয় শুনতে পায় নি, আবার ডাকলো, বাদলদা—

আমি আরও জোরে বললাম, রেণু, আমি দাঁড়িয়ে আছি, আয়—

আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি ঠিকই তবু আমার চিত্ত খুব চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগলো। যেন এটা ঠিক সেই জায়গা নয়, যেখানে দাঁড়িয়ে সত্যের সম্মুখীন হওয়া যায়। এখনো লুকিয়ে পড়ার সময় আছে।

অংশু, অংশুর স্ত্রী আর রেণু আমার কাছাকাছি এসে পৌঁছোলো অল্পক্ষণের মধ্যেই। আমি ছুটে গিয়ে সাহিসের মতন রেণুর ঘোড়ার জিন ধরে থামালাম।

অংশু বললো, কি রে বাদলা, এখানে একা একা কি করছিস? পদ্য লিখছিস?

আমি বললাম, তোরা কবে এসেছিস রে অংশু?

এটা মিথ্যে কথা। রেণুরা কবে দার্জিলিং-এ এসেছে আর কোথায় উঠেছে, সবই আমি জানি। তবু এরকম মিথ্যে কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

অংশু বললো, লাস্ট শনিবার। তুই কোথায় উঠেছিস?

রেণু বললো, তোমাকে তো আমরা অনেক আগেই দেখতে পেয়েছি। কতক্ষণ ধরে ডাকছি, শুনতে পাওনি?

আমি বললাম, শুনতে পেলে কি দাঁড়াতাম না?

অংশুর স্ত্রী হাঁপিয়ে গেছে। এই শীতের মধ্যেও তার মুখে অল্প অল্প ঘাম। সে বললো, কি উৎকট শখ বাপু তোমাদের। শুধু শুধু এতটা ওঠার কোনো মানে হয়?

আমি তাকে বললাম, অলকা, তুমি নামবে না? ঘোড়া থেকে নেমে একটু জিরিয়ে নাও।

অলকা বললো, এবার ফেরো। আপনিও ফিরবেন তো আমাদের সঙ্গে?

—না, আমি আর একটু থাকবো।

অংশু বললো, আর এখানে থেকে কি করবি? আমাদের সঙ্গে চল্। আমাদের বাড়িটা দেখিস নি তো।

—আমি এখানে আর একটু থাকবো। তোরাও থাক না।

অলকা বললো, আমি ত বাবা আর একটুও দেরি করতে পারবো না। আমার বাচ্চা দুটোকে বাড়িতে রেখে এসেছি।

অংশুও তার স্ত্রীর সঙ্গে একমত। আমি জানতাম অংশু আর থাকতে চাইবে না, সেই জন্যই ওকে থাকতে বলছিলাম। রেণুর দিকে ফিরে বললাম, আমি শেষ পর্যন্ত যাবো।

রেণু জিজ্ঞেস করলো, আমি যাবো না?

অংশু বললো, না, না, খুকী, তুই চল আমাদের সঙ্গে। আবার একদিন আসা যাবেখন।

আমি বললাম, অংশু, তোরা যা—আমি রেণুকে পৌঁছে দেবো।

রেণু বললো, আমিও শেষ পর্যন্ত না গিয়ে ফিরবো না।

অংশু রেণুর দাদা হলেও সে রেণুকে ভয় পায়। রেণুর জেদকে সবাই ভয় পায়। রেণুকে জোর করে কোনো কথা কেউ বলতে পারে না। অংশু অপ্রসন্নভাবে আমার দিকে তাকালো, কিন্তু ও জানে, আমাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেও কোনো লাভ নেই, সেই জন্য রেণুকে বললো, বেশী দেরি করিস না কিন্তু—।

ওরা ফিরে গেল। রেণুর ঘোড়াটাও দিয়ে দিলাম ওদের সঙ্গে। নীচে নামবার

সময় বেশী পরিশ্রম নেই। ওরা দৃষ্টির আড়াল না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলাম সেইখানে। তারপর বললাম, চল—

কয়েক পা নিঃশব্দে হাঁটার পর রেণু জিজ্ঞেস করলো, তুমি কেমন আছো?

—ভালো। আর তুই?

—ভালো। এখনো রাগ আছে?

—কিসের রাগ?

—রাগ নেই? আমার কিন্তু এখনো খুব রাগ আছে তোমার ওপরে। তুমি এরকম অদ্ভুত হয়ে যাচ্ছো কেন? আমার মোটেই এসব পছন্দ হয় না।

—তা হলে কেন এলি আমার সঙ্গে। এখনো ফিরে যেতে পারিস।

—আমি ফিরে যাবো?

—যেতে পারিস। আমি খানিকটা রাস্তা এগিয়ে দেবো।

—তুমি আমাকে আর চাও না!

—এ কথার মানে কি?

—আমাকে তোমার আর ভালো লাগে না?

—রেণু, এ রকম প্রশ্ন আমাকে করা চলে না।

—তুমি উত্তর দেবে না?

—শোন রেণু, পৃথিবীতে যত সত্য আছে, তার চেয়েও বড় সত্য এই যে, আমি শুধু তোকেই চাই। সারা জীবনের মতন এটা ঠিক হয়ে গেছে। আমি তোকে পাবো কি পাবো না, তুই আমাকে অগ্রাহ্য করিস কিংবা ভুলে যাস—এসব কিছুর ওপরেই আমার চাওয়াটা নির্ভর করে না।

—তা হলে আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছো কেন এক বছর ধরে? আমি ভেবেছিলাম, তুমি প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেলেছো।

—ঐ যে বললাম, আমার দিকটা সারা জীবনের মতন ঠিক হয়ে গেছে। তোর দিকটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি বলেই দূরে সরে গিয়েছিলাম।

—আমার দিকটায় তুমি অন্য রকম কি বুঝলে? আমি বুঝি খারাপ?

—রেণু, তুই কখনো খারাপ হতে পারিস না। আমি তোর অযোগ্য বোধ হয়. সব সময়েই আমার এই কথাটা মনে হয়—

রেণু একটু থমকে দাঁড়ালো, তার মুখে হালকা মেঘের ছায়া। না ছায়া নয়, এখন সত্যিকারের মেঘ ঘিরে আছে আমাদের। আমরা পরস্পরের কাছে একটুক্ষণের জন্য অস্পষ্ট হয়ে যাই। সেই মেঘের মধ্যেই রেণু তার হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, তুমি আমার হাত ছুঁয়ে আবার প্রতিজ্ঞা করো, আর কোনোদিন এরকম কথা ভাববে না।

আমি রেণুর হাতটা নিজের মুঠোয় নিলাম। বড় ঠাণ্ডা, জিজ্ঞেস করলাম, তোর শীত করছে?

রেণু মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, না।

রেণু শরীরের ওপরে একটা লাল রঙের স্টোল পরে আছে। আমার গায়ে ওভার-কোট, সেই প্রভাসজামাইবাবুর যে কোটটা নিয়ে আমার বিদেশে যাবার কথা ছিল। আমি কোটের বোতামগুলো খুলতে লাগলাম।

রেণু বললো, আমরা অনেকক্ষণ ধরে তোমাকে ডাকছি। তুমি সাড়া দাওনি; তুমি যদি শেষ পর্যন্ত সাড়া না দিতে কিংবা কোথাও লুকিয়ে পড়তে তা হলে সারা জীবনে আর কখনো আমার মুখ দেখতে পেতে না।

কেন পালালে? কেন?

—তুমি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলো, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আছো কেন?

একটু আগে আমি বললাম যে পৃথিবীর সব সত্যের চেয়েও বড় সত্য এই যে আমি রেণুকে চাই। তবু আমি রেণুর কাছ থেকে পালাতে চাইছিলাম, এটাও ঠিক। এবং এখন আমি তাকে মিথ্যে কথা বলছি। আমি মুখে হাত দিয়ে চোখ দুটো ভালো করে রগড়ে নিলাম। দেখতে চাইলাম যেন। এখানে আমিই দাঁড়িয়ে আছি কিংবা অন্য কেউ।

মেঘটা সরে গেছে। ঝট করে এক ফালি রোদ এসে গায়ে পড়লো। কাঞ্চনজঙ্ঘার সামনেকার জমাট মেঘও পাতলা হতে শুরু করেছে। মুহূর্তে মুহূর্তে এই মেঘ ও রোদ্রের খেলাটাই বড় মজার। আমি কোটটা ফাঁক করে বললাম, এটা বেশ ঢলঢলে আছে, তুই এর মধ্যে চলে আয়, তা হলে আর শীত করবে না।

রেণু বললো, ঐ তো আমরা সবচেয়ে উঁচু জায়গাটায় প্রায় এসে গেছি, চলো ঐ পর্যন্ত আগে যাই।

রেণুর হাত ধরে আমি ছুটতে ছুটতে চলে এলাম সেখানে। এখন আমাদের নিশ্বাসের সঙ্গেও ধোঁয়া বেরুচ্ছে, কত উচ্চতা এখানে? সাত হাজার কি সাড়ে সাত হাজার ফিট? তবু মনে হচ্ছে যেন আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি। সমস্ত দুনিয়াটা আমাদের পদানত।

রেণু শীতে রীতিমতন কাঁপছে। আমি ওকে নিয়ে এলাম আমার কোটের মধ্যে। পকেটে হাত দিয়েও থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, রেণু, আর একটা সিগারেট খেতে পারি?

ঠিক যেন সেই কলেজ জীবনের মতন আমি রেণুর সামনে সিগারেট খেতে ভয় পাচ্ছি। রেণুও সেটা বুঝতে পেরে একটু হাসলো। তারপর বললো, আচ্ছা খাও!

আমি সিগারেটটা ধরিয়ে ধোঁয়া ছড়িয়ে দিলাম রেণুর চুলের মধ্যে। আস্তে আস্তে ধোঁয়াগুলো ওর গুচ্ছ গুচ্ছ চুল ভেদ করে বেরুচ্ছে।

রেণু জিজ্ঞেস করলো, চুলে গন্ধ হয়ে যাবে না?

আমি বললাম, হোক।

পুনরায় ধোঁয়া ছেড়ে আমি বললাম, এই এক বছর তোর কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়ে খুব ভালো করেছি। তাই তো এত সুন্দর জায়গায় তোকে ফিরে পেলাম।

ফিরে পাওয়ার কথাটা খুব হালকা শোনায়। যেন এটা ঠিক আমার ভাষা নয়। আমি একটু লজ্জিত ভাবে আবার বলি, তোকে এত কাছে পেলাম।

—আমার মা তোমাকে বকেছিলেন, তাই না?

—সে কিছু না। মাসীমা আমাকে ভালোবাসেন। শুধু ওঁর মনে একটু ভয় ঢুকেছিল।

—তুমি কেন আমাকে বলো নি? সেইজন্যই তুমি আমাদের বাড়িতে আর আসতে না, আমি টেলিফোন করলে কিংবা তোমাদের বাড়িতে গেলে তুমি আমাকে এড়িয়ে গেছো—তুমি আমাকে অনেক কিছুই বলো নি।

রেণুকে চুপ করাবার জন্য আমি ওর থুতনিটা উঁচু করে ধরলাম, তারপর ওর ঠোঁটে ছোঁয়ালাম ঠোঁট। রেণু প্রথমে মুখটা সরিয়ে নিচ্ছিল, আবার এগিয়ে এলো, আমি ওকে এক কল্পান্ত সময় নিয়ে চুমু খেলাম। যেন ওর ঠোঁটটা গলে গলে যাচ্ছে

আমার ঠোঁটের মধ্যে। আমার জিভটা ওর জিভটাকে খুঁজে বার করে আলিঙ্গন করে রইলো। এর আগে রেণুকে জোরজার করে বা তাড়াহুড়ো করে কয়েকবার চুমু খেয়েছি বটে; কিন্তু এটাই আসলে আমাদের জীবনের প্রথম চুম্বন।

চুম্বন মুক্ত হবার পর রেণু দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার কাঁধে মাথা রেখে বললো, আর কখনো পালিয়ে যেও না।

আমার ওষ্ঠের সুস্বাদ উপভোগ করার জন্য আমি একটুক্ষণ চুপ করে থাকি। একটু একটু দুঃখও হয়। জীবনের কত সুন্দর সময় নষ্ট হয়ে গেছে। রেণু আমাকে পালিয়ে যাবার কথা বলে, আমার ইচ্ছে হয় ওকে আমার শরীরের মধ্যে একেবারে মিশিয়ে দিতে।

আমি বললাম, রেণু, আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে তোকে দেখতে?

—দেখতে পাচ্ছো না?

—কি জানি, মনে হচ্ছে, কখনো তোকে দেখিনি। তুই এত নতুন হয়ে উঠলি কি করে?

—আমি সেই রকমই আছি।

—তোকে সম্পূর্ণ দেখতে চাই।

—দেখো না।

—জামা কাপড় ছাড়া।

রেণু মুখ সরিয়ে বললো, এই শীতের মধ্যে? তুমি কি পাগল? আমাকে মেরে ফেলতে চাও?

—আমি এই শীতের মধ্যে সমস্ত জামা কাপড় খুলে এক ঘণ্টা দু' ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। আমার এত আনন্দ হচ্ছে, আমি এখন সব পারি।

—না, লক্ষ্মীটি এরকম কথা বলো না! আমার কি রকম গা শিরশির করছে।

—তা হলে তোর বুকে মাথা রাখি?

আচ্ছা রাখো!

আমি রেণুর স্টোল ও শাড়ির আঁচল সরিয়ে ওর বুক খুঁজে বার করলাম। আমার রূপপিপাসু চোখ শরীরের রূপের মধ্যে বেশী আনন্দ পায়। নদী, ফুল, পর্বত শিখরের চেয়েও এই সদ্য যুবতী রমণীর স্তনদ্বয়কে আমার বেশী আকর্ষণীয় সুন্দর বলতে দ্বিধা নেই। যে-প্রকৃতির দৃশ্য দেখে একটু আগে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম, এখন আর সেদিকে ভ্রুক্ষেপ হয় না। ব্লাউজ সরিয়ে রেণুর গোলাপি আভাময় দুই বুকের দিকে আমি কিছুক্ষণ নির্ণিমেষে তাকিয়ে থাকি। হঠাৎ একবার মনে হয়, রেণুর বুকে যেন একটা জল রঙের মাছ আঁকা আছে। কিসের যেন সাঙ্কেতিক চিহ্ন। দৃষ্টিবিভ্রম হয় আমার, তবু সেই চিহ্নটা আবার দেখি, সেটার মানে বোঝার চেষ্টা করি। তারপর সেখানে মুখটা রেখে গরম গরম নিশ্বাস ফেলে রেণুর শীত তাড়িয়ে দিই। মনে হয়, পৃথিবীতে এই আমার একমাত্র আশ্রয়।

সেখানে মুখ রেখেই আমি ফিসফিস করে বললাম, রেণু, সূর্যদার মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নই।

রেণু চমকে উঠলো। আমার মুখটা জোর করে তুলে ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে বললো, আর ও কথা একবারও উচ্চারণ করো না।

আমি ওর আঙুলটা সরিয়ে বললাম, না, বলতে হবে। এই তো শ্রেষ্ঠ জায়গা এইসব কথা বলার। তুই ভেবেছিলি—

রেণু আমাকে বাধা দিয়ে বললো, আমি ভুল ভেবেছিলাম। তুমি আমাকে শুধরে দিতে পারো নি? একটা কথাও না বলে চলে গেলে—

সূর্যদার আকস্মিক মৃত্যুর কথা শুনে রেণু এমন আঘাত পেয়েছিল যে আমাকে বলে উঠেছিল, তুমি কেন সূর্যদাকে দীপ্তিদিদের সন্ধান দিলে? ওখানে যদি না যেত—

রেণু সত্যিই ভুল করেছিল। আমি সূর্যদাকে দীপ্তিদির বিষয়ে একটাও কথা বলিনি কখনো। দীপ্তিদি একজন মন্ত্রীর স্ত্রী, একথা সূর্যদা কোনো না কোনো উপায়ে ঠিকই জেনে যেত। সেইভাবেই জেনেছে। এতে আমার কোনো ভূমিকা নেই।

তবু একটা সূক্ষ্ম অপরাধবোধ আমাকে সব সময় খোঁচা দিয়েছে। আমি সূর্যদাকে মুখে কিছু না বললেও মনে মনে অন্তত একবার ভেবেছিলাম, সূর্যদাকে আমিই বলে দেবো দীপ্তিদির কথা। সে সময়ে আমার মাথার ঠিক ছিল না। বাড়িতে অশান্তি, মায়ের অসুখ, অনিচ্ছুক চাকরি জীবন—তার ওপরে আবার রেণুর মা আমাকে ডেকে বারণ করে দিয়েছিলেন রেণুর সঙ্গে মিশতে—তখন আমার মনে হয়েছিল, সবাই সব কিছু কেড়ে নিচ্ছে আমার কাছ থেকে। তার ওপর সূর্যদার মতি পরিবর্তনের জন্য রেণু এগিয়ে গেল, সূর্যদার গায়ে হাত রাখলো—তখন আমার সব রাগ পড়েছিল সূর্যদার ওপরে, আমি ভেবেছিলাম, যে খবরের কাগজে দীপ্তিদি আর শংকর বোসের ছবি বেরিয়েছে, সেই কাগজখানা সূর্যদার সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বলবো, এই নাও, এই দ্যাখো তোমার নিয়তি! শুধু আমি কষ্ট পাবো কেন সূর্যদাও পাক।

কিন্তু কাগজটা আমি দিইনি শেষ পর্যন্ত, ছিঁড়ে ফেলেছিলাম, তবু যে মনে এসেছিল সেই কথাটা—রেণু বোধহয় আমার মুখ দেখে সেটা পড়ে ফেলেছিল। এ জন্য, রেণুর অভিযোগ শোনার পর অনেকদিন আমি নিজেকে দায়ী করেছিলাম, চিন্তারও তো একটা পাপ আছে। কিন্তু আজ, এই প্রকৃতি ও রেণুর নগ্ন বুকের সামনে এসে মুহূর্তে আমার উপলব্ধি হয়, শুধু একটা চিন্তার জন্য মানুষ মরে না। তা ছাড়া, মৃতদের থেকে জীবিতরা অনেক বেশী মনোযোগের যোগ্য।

রেণু আমার অন্যমনস্ক মুখখানা নিজের করতলে নেয়। তারপর বলে, এবার আমি তোমার বুকে একটু মাথা রাখি?

আমার একটু লজ্জা করে। আমার বুকে লোম আছে, রেণু তা দেখবে। আমি ওকে সামান্য বাধা দিতে যাই। রেণু হাসলো। তারপর বললো, আমার থিয়েটার করা তোমার পছন্দ হয়নি। সে কথা তখন বলো নি কেন? বারণ করলে কি আমি যেতাম ওখানে? তুমি কেন নিজেকে লুকোও?

আমি রেণুর বুকে আবার হাত রাখলাম যেন প্রতিজ্ঞা করছি কিছু একটা। তবু মনে হয়, মাঝখানে একটা দেওয়াল উঠে গেল। রেণু এখনো অনেক দূরে—ওর কাছেও আমি সব কথা বলতে পারি না। সত্যি নিজেকে লুকোতে হয়। কেন?

ও নিজেই আমার জামার বোতাম খোলে। আমার লোমশ বুকে ওর মুখখানা চেপে ধরে। ওর পিঠের ওপর হাত রেখে আমার মনে হয়, রেণুর শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। রেণু কি কাঁদছে?

সেটা দেখা গেল না। হঠাৎ ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামলো। বেশ তো রোদ উঠেছিল, এখন আর একটুও রোদের চিহ্ন নেই, মেঘে সব দিক ঢেকে গেছে—তবে তো এই বৃষ্টি সহজে থামবে না। যেটাকে আমি দেয়াল ভেবেছিলাম, সেটা আসলে মেঘ—আমাদের মাঝখানে কখন আবার এসে গেছে। রেণুর হাত ধরে আমি নীচের দিকে ছুট

লাগালাম।

রেণুরা উঠেছে বিষ্ণুদের বাড়িতে। বিষ্ণুদের কেউ অনেককাল আর এদিকে আসে না, বাড়িটা খালিই পড়ে থাকে। সে বাড়ির জানলার রঙিন কাচের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। অনেক বছর আগে বিষ্ণুর সঙ্গে আমার এই বাড়িতে আসবার কথা ছিল, বাবা আসতে দেন নি। পাতলা অভিমানে মনটা ভিজে যায়। সারা শরীর আগেই বৃষ্টিতে ভিজে জবজবে।

রেণু বললো, বাড়ির মধ্যে আসবে না?

আমি রাজি হলাম না। এক্ষুনি অংশুর সঙ্গে কথাবার্তা বলার ইচ্ছে আমার একটুও নেই। রেণুর সৌরভটা অনেকক্ষণ ধরে লালন করতে চাই। অংশু বড্ড বাজে কথা বলে।

আমি বললাম, তুই আয় না আমাদের হোটেলে! আমি তোকে লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে চলে যাবো।

রেণু উজ্জ্বল মুখে বললো, বেশ হয় তা হলে না? তোমার ঘরটা কি রাস্তার দিকে না পাহাড়ের দিকে।

—পাহাড়ের দিকে জানলা আছে একটা। সেখানে তোর জন্য আমি ম্যাজিকে একটা স্বর্গের দৃশ্য এনে দিতে পারি।

—কিন্তু আমার শাড়িটা যে একেবারে ভিজে গেছে? শাড়ি বদলে আসবো? তুমি চলে যাও, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে আসছি। আমাকে ঢুকতে দেবে?

—তোকে কেউ কখনো কোথাও আটকাতে পেরেছে? তোর কথা শোনে নি, এমন কেউ আছে?

রেণু হাসলো। দরজায় হেলান দিয়ে বললো, একজন ছিল। না, দু'জন। সূর্যদা আর তুমি। তোমরা দু'জনে একই রকম।

সূর্যদার সঙ্গে আমার কোনোই মিল নেই। আর কেউ কখনো বলে নি একথা, শুধু রেণুই বললো আমরা দু'জনে একরকম। হোটেলের ঘরে ফিরে এই কথাটাই আমার মাথায় ঘুরতে লাগলো। সূর্যদা আর আমি যদি এক সঙ্গে কোনো কাজে নামতে পারতাম! আমার অনেক আশা ছিল, সূর্যদা কিছুতেই আমাকে সঙ্গে নিল না।

রেণুর জন্যই সূর্যদার কথা আজ নতুন করে মনে পড়ে। সূর্যদার মৃত্যুর পর বেশ আলোড়ন হয়েছিল। একজন মন্ত্রীকে হত্যার চেষ্টায় চারদিকে বেশ সাড়া পড়ে যায়। অনেকে বলেছিল, সূর্যদা আর সি পি আই-এর মেম্বার। সেই পার্টি থেকে আবার প্রতিবাদ করা হয়। শংকর বোসকে সূর্যদা পিস্তল হাতে নিয়ে বাংলোর মাঠে তাড়া করেছিল, এই দৃশ্যটা সূর্যদার চরিত্রের সঙ্গে মানায় বটে তবু আমরা অনেকেই বিশ্বাস করতে পারিনি। সূর্যদা খুন জখমের লাইন ছেড়ে দিয়েছিল। তা ছাড়া, ব্যক্তিগত কারণে যারা খুন করে তারা খুনী, সূর্যদা সে চরিত্রের নই। বড়দিও বিশ্বাস করে নি। বড়দি বলেছিল, বেয়াল্লিশ সালে যে সময় সূর্যদা আশ্রয় নিয়েছিল ওদের বাড়িতে, সেই সময়ই বড়দি ওর পিস্তলটা সরিয়ে নেয়। সূর্যদা তো আর কোনো-দিন সেটার খোঁজ করে নি। সেটা বহুদিন পড়েছিল বড়দির কাছে, বছর তিনেক আগে বড়দি সেটা গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। সূর্যদার মৃত্যুতে একেবারে ভেঙে পড়ে-ছিল বড়দি—হঠাৎ বুড়ি হয়ে গেল। আমি দীপ্তিদিকেও দোষ দিতে পারি না। হঠাৎ একটা আগুনের গোলা ছুটে এলে সবাই ছুটে বাঁচবার চেষ্টা করে। দীপ্তিদিও বাঁচতে চেয়েছিলেন। কিংবা, তিনি তাঁর নিজস্ব উপায়ে বাঁচাতে চেয়েছিলেন সূর্যদাকে।

যে-ভালোবাসা দূরে ঠেলে দেয় তার দহন অনেক বেশী। শুনেছি, দীপ্তিদিকে এখন বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। দীপ্তিদি এখন বুঝতে পারবেন, শুধু মৃত্যু নয়, অনেক সময় বেঁচে থাকাও কত মর্মহীন। সূর্যদার চেয়েও দীপ্তিদির জন্য আমার বেশী কষ্ট হয়।

রেণু আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসবে। কতক্ষণ পর সেই আধ ঘণ্টা শেষ হবে। আমি জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম। জানলার ঠিক নীচেই পাহাড়ীদের একটা বস্তি। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে খেলা করছে সেখানে। একটা কুকুর তাদের পাশে পাশে এমন-ভাবে ঘুরছে, যেন সে বলতে চায়, আমায় খেলাতে নিচ্ছো না কেন? বৃষ্টির জল নানা ধারায় গড়িয়ে পড়ছে। রোদ উঠে গেছে আবার। অলৌকিক দৃশ্যের মতন জেগে ওঠে দূরের পাহাড়। রেল লাইন ঝকঝক করছে, দুটি তরুণী মেয়ে ঠিক লাইনের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছে, মুখে তারা শব্দ করছে ঝিকঝিক ঝিকঝিক।

হঠাৎ মনে পড়লো, মৃত্যুর আগে বড় বাবু বলেছিলেন, দেখে গেলাম। একটা বিরাট বৈচিত্রময় জীবন কাটিয়ে এসে তিনি শেষ মুহূর্তে উচ্চারণ করেছিলেন তাঁর উপলব্ধি। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রেণুর জন্য অপেক্ষা করতে করতে আমার মনে হয়, বড়বাবু ঠিকই বলেছিলেন, দেখে যাওয়া ছাড়া আর কি!

॥ **সমাপ্ত** ॥